সাহিত্য-সংহিতা।

সাহিত্য সভার মাসিক পত্রিকা।

নবম খণ্ড।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩১৫

কলিকাতা।

১২নং শিমলা ষ্ট্রীট্ বাই-লেন

কবিরত্ন যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫ সালের সাহিত্য-সংহিতার

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অন্নদা	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৮
আত্মা এক না অনেক ...	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী	৪১৩
আদর্শ	শ্রী—	৩৫২
আলিবর্দ্দী	শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র ...	৪২, ৫৭, ১২৫, ১৫১, ১৬১
কপাল	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	১৬০
কবির ইতিহাস ...	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	৮, ৭৭, ১১৫
কয়েকটী তুল্য চিত্র ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯
কলম্বোদর্শন	শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৮৪, ১১৯
কাশ্মীরের পথ ...	শ্রী—	২৪১, ২৬৮, ২৮৭, ৩৪৪
কোরাণ সরিফে জন্মান্তরবাদ	মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন ...	৩৭৫
গৌরাঙ্গের যতিভাব না গোপীভাব	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী	২৭৬
দুগ্ধ	মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ,	১৭১, ২০৬ ২২৫, ২৮২, ৩০১
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী ...	(পরিশিষ্ট) ...	১, ৯, ১৭, ২৫, ৩৩
ধর্ম্মমঙ্গল	স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭৩, ৮১, ৮৯, ৯৭, ১০৫, ১১৩, ১২১, ১২৯, ১৩৭
নকুলীশ পাশুপত দর্শন ...	শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী	১৯৬
পূর্ব্বজন্ম	শ্রীস।	২৬৪
প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রার ঐতিহাসিক বিবরণ	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ...	১৭
প্রাণায়াম ও মন্ত্রশক্তি ...	শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা	২৫৫
প্রেত্যভাব	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী	১৮৫
বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্ত্তিক অবস্থা	শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন	৩৮৭
বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য ...	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী	১
বঙ্গভাষার ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি	শ্রীহরিধন গোস্বামী বি, এ, (বালি—শান্তি-কুটীর লাইব্রেরীর অধিবেশনে পঠিত) ...	৩১৯
বিকালে পল্লী	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়	১৮৪
বিজয়া	ঐ ঐ	২১৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
ব্রহ্মবিদ্যার কথা ...	শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী ...	১২১, ১৪৭,
ভক্তের দেবত্বপ্রাপ্তি ...	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ...	১৬, ১০৭
ভামিনী	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	১২৯
ভারতের বিদ্যা	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	৩০৪
ভূকম্পন	শ্রীজগদানন্দ রায়	২৩৭
সমালোচনা	শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র ...	২৪৭, ২৮৫, ৩১৮, ৩৫৯
সমুদ্রমগ্নাবশিষ্ট মায়াপুরী দর্শনে	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৬৭
সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার স্থান	শ্রীহরিগোপাল বসু ...	...২১৭, ২৭২, ২৯৩
সাহিত্য সমালোচনা ...	শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র	৮৯
সাহিত্যে শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	২৩০
সাহিত্য সভার কার্য্যবিবরণ ...	... ...	২৫২
হিন্দুর পুনরুত্থান ...	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩৫৯

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য।

জাতীয় অভ্যুদয়ের মূলে ভাষার অভ্যুদয় এবং ভাষার অভ্যুদয়েয় মূলে জাতীয় অভ্যুদয়, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব। কোন জাতি আপন জাতীয় ভাষাকে কেবল আবশ্যক লৌকিক ব্যবহার সাধনের উপকরণে পরিণত রাখিয়া সভ্যতার উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা বিরল বলিয়াই বোধ হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষার উন্নতি হইয়া থাকে, সভ্য জাতির উন্নত ভাষাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে অসভ্য জাতির অসভ্য ভাষাও ঐ বিষয়ে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। যখন জাতির উন্নত ভাষা তদীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার অব্যভিচারী চিহ্ন, তখন বরণীয় চতুর্দ্দশ-বিদ্যাময়ী সংস্কৃত ভাষা যে আর্য্য জাতির তাৎকালিক সভ্যতা ও গৌরবের সূচনা করে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

আর্য্যজাতি যদি আদিম ইংরাজজাতির ন্যায় অরণ্যচারী হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তবে কখন তাঁহাদের রসনা হইতে "ঈশাবাস্য" ইত্যাদি অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণী নিঃসৃত হইত না; তবে কখন তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির অন্তিম উৎকর্ষপূর্ণ রচনা করিয়া পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভের অধিকারী হইতে পারিতেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক যে উদার ধর্ম্ম ও নীতির প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত আর্য্যেতর কোন জাতিই তাহার সহিত প্রতিযোগিতা ও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যদি বিভিন্ন প্রদেশবাসী আর্য্যজাতির মাতৃভাষা সংস্কৃত ছিল না এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি সংস্কৃত ভাষা যে তদানীন্তন আর্য্যজাতির সাধারণ ভাষা ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা আর্য্যজাতির মাতৃভাষা নহে বলিয়া যে তাহার প্রাক্তন জাতীয় উন্নতির পরিচয়ে উহা অন্যথাসিদ্ধ, এরূপ আপত্তিরও অবসর রহিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে সংস্কৃত ভাষাকে বর্ত্তমান আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, কেননা, বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃতাভিজ্ঞ আর্য্যজাতির সংখ্যা এত অল্প যে, সত্যের অনুরোধে মুষ্টিমেয় বলিতে পারা যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার স্থান বিদেশীয় ভাষা আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইংরাজি ভাষাই আজ ভারতের সাধারণ ভাষা হইতে চলিল। এরূপ অবস্থাতে ভারতবাসিমাত্রেরই আপনাপন মাতৃভাষার উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করা উচিত। কেবল বাঙ্গালী নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন শ্রেণীই স্ব স্ব মাতৃভাষার অভ্যুদয়সাধনে মনোযোগী

হইয়াছেন। পরন্তু প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে কোন্ ভাষা সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনেক মনীষীর এই মত যে, হিন্দী ভাষা বহুদেশব্যাপিনী এবং আর্য্য ভাষা অপেক্ষা অধিক লোকের ব্যবহার্য্য বলিয়া, তাহাকেই সাধারণ ভাষার পদে অভিষিক্ত করা বিধেয়। এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময় এখনও আসে নাই, এক্ষণে ইংরাজি শিখিতেই অনেকে অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং মাতৃভাষা ব্যতিরেকে ভারতপ্রচলিত অন্য ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে। ইংরাজি ভাষার সহিত ভারতবাসীর যেরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, তদ্রূপ যদি হিন্দীর সহিত হয়, তবে অবিলম্বেই জনসাধারণ ইহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী অনেক বাঙ্গালী যে অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দী জানেন, ইহার মূলে স্বার্থই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী যে ইংরাজি ও মাতৃভাষার মমতা ছাড়িয়া বা তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতার মাত্রা কমাইয়া হিন্দীভক্ত হইবেন, ইহা কেবল কল্পনারই পুষ্টিসাধন করিতে পারে।

বঙ্গভাষা বাঙ্গালীর প্রীতি যেরূপ আকর্ষণ করে, অন্য ভাষা দ্বারা কি কখনও তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে? তাই অনেক ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালীও বঙ্গভাষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বঙ্গভাষা সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। হিন্দী ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতে বঙ্গভাষার পুস্তকাবলীর অনুবাদ ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমরা যদি মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করিতে পারি, তবে যে তাহা কালে সাধারণ ভাষার পদে অভিষিক্ত না হইলেও শিক্ষিত ভারতবাসিমাত্রের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষা উন্নতির ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখনও তাহাকে অভাবের বেদনা সহ্য করিতে দেখা যায়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভাষায় যে সকল উপকরণ দেখিতে পাই, বঙ্গভাষায় তাহা লক্ষিত হয় কি? সকল প্রকার মনোভাব কি নিরঙ্কুশ ভাবে বঙ্গভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি লিখিতে হইলে লেখককে অনেক স্থলে উপযোগী শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয়। হয়ত বাধ্য হইয়া লেখককে ভাবব্যঞ্জক শব্দের অভাবে ভাবের সঙ্কোচ বা বিনিময় করিতে হয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কষ্টে সৃষ্টে যদি কেহ বিজ্ঞান বা দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তবে তাহার উপর নীরসত্ব বা কর্কশত্বের অভিযোগ আনিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ বিসংবাদের কারণ কি ইহাই নহে যে, বঙ্গভাষায় এবংবিধ বিষয়ের প্রচার অতি অল্প। যাঁহারা বারংবার "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে" ইত্যাদির ন্যায় কোমল পদাবলীর অনুশীলন করিয়াছেন এবং দর্শন বা বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বচিন্তনে নিবিষ্ট হইবার অবসর পান নাই, তাঁহাদের কর্ণে যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের অনুধাবনগম্য শব্দগুলি কর্কশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? পরন্তু অভিযোগকারীদিগের পক্ষে ইহা বিবেচ্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের মাধুর্য্য কবিত্বজাতীয় মাধুর্য্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাধুর্য্য কেবল কবিত্বেই আবদ্ধ, ইহাকে অপ্রমা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। বঙ্গভাষায় যদি সংস্কৃত

ভাষার অনুপাতে দর্শন এবং ইংরাজি ভাষার অনুপাতে বিজ্ঞানের প্রচার হইত, তবে কেহই এইরূপ ভিত্তিশূন্য অভিযোগ আনিতে সাহস করিতেন না। জাতীয় উন্নতি বা সামাজিক হিতসাধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কবিত্ব অপেক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনেরই অধিক গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্য জাতি ও সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির দর্শন, বিজ্ঞান ও কবিত্বের অভ্যুদয় সময়ের সামাজিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেই আলোচিত বিষয়ের সমাধান হইয়া যায়। ফলতঃ এক্ষণে আর দন্তপাতি ও অধরামৃতের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গবেষণায় কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই। পক্ষান্তরে শত চেষ্টা করিলেও ইহার বিজয়লাভ বর্ত্তমান ভারতে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যে গবেষণায় ভারতবাসীর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান জাগিয়া উঠে, ও আগন্তুক বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

কেবল কবিত্বের আদর্শেই যদি ভাষার প্রকৃতি গঠিত হয়, তবে তাহা দ্বারা সমাজের আংশিক হিতসাধন হইলেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশাকে দুরাশা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। উর্দ্দুভাষাকে ইহার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যায়। এই ভাষাতে কবিত্ব-রসের কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির অভাব আছে বলিয়া এই ভাষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারকারীদিগের মধ্যে আবিল প্রেম বা তদ্বার্ত্তার যত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শতাংশের এক অংশও নৈতিক জীবন দৃষ্ট হয় না।

সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অপর ভাষার সাহায্য না লইলে একমাত্র উর্দ্দু পড়িয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা কঠিন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, উর্দ্দুভাষীরা বাক্য রচনায় চতুর হইয়া উঠেন, কিন্তু তদীয় বিষয়গাম্ভীর্য্যের বিশ্লেষণে প্রায়ই শূন্য অবশিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। যদ্যপি স্থলবিশেষে এইরূপ নাও হইতে পারে, তথাপি অন্য উন্নত ভাষার সহিত গুরুত্ব পরীক্ষায় তাহা তিষ্ঠিতে পারে না। এইজন্য ভাষার উন্নতি কল্পে যেরূপ কালিদাসের ন্যায় কবির আবশ্যকতা আছে, তদ্রূপ গোতমের ন্যায় দার্শনিক ও টিণ্ডেলের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবও অতীব প্রয়োজনীয়।

ভাষা উন্নতির প্রথম অবস্থাতে উপনীত হইবামাত্র কবিত্ব লইয়া একটা ধুমধাম পড়িয়া যায়, এই উপলক্ষে ভাষার রচনা পরিপাটী সুমার্জিত হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব ও সমাজ শরীরে তাহার উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভাষাগুলি বর্ত্তমান জগতে উন্নতির অন্তিম বা উপান্ত সীমায় অধিরোহণ করিয়াছে, সেই গুলির অবস্থাপরম্পরার আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলেই উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে। আজ কাল শব্দালঙ্কারকে বা অর্থালঙ্কারকে বড় একটা পণ্ডিতদিগের বিচার স্থানে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের বিচারণা ও অধ্যবসায় বক্তব্য বিষয়কে সার্ব্বভৌম ও সাধারণ হিতসাধনে ফলোপধায়ী করিতে নিযুক্ত আছে। বঙ্গভাষা সম্বন্ধেও এই নিয়মের অনুকৃতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী মনীষীই তাহার অভিধেয় ত্রুটি পরিহারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বের মত এক্ষণে আর ইন্দুকলা ও ঈষৎ অলক্তমিশ্রিত দুগ্ধের প্রতি বাঙ্গালা লেখক অথবা পাঠকদিগের অনুরাগ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ এক শ্রেণীর লোক

দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বঙ্গভাষায় প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগবাহুল্য ভালবাসেন, সংস্কৃত শব্দের অধিক সমাবেশ তাঁহাদের নিকট নীরস বলিয়া বোধ হয়। স্বমতের সমর্থনে তাঁহারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন যে, বঙ্গভাষায় যদি সংস্কৃত শব্দপুঞ্জের ছড়াছড়ি করা যায়, তবে সাধারণের সুবোধ্য হইতে পারে না। যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ভাষা সুবোধ্য হইতে পারে না। এইরূপ প্রণালীর আরও যুক্তি আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বিবেচ্য যে, বক্তব্য বিষয় গুরুতর বা সূক্ষ্ম হইলে অতি সহজ ভাষার প্রয়োগেও তাহা কোন প্রকারেই অনভিজ্ঞ শ্রেণীর সুবোধ্য হইবে না। প্রণয়িনীর প্রেমকাহিনী ও লৌকিক ব্যবহারের অদ্ভুত কাহিনীকে বাদ দিয়া রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন বা বিজ্ঞান যে কোন গভীর বিষয় রাম শ্যামের বোধগম্য করা সহজ ব্যাপার নহে। যে কোন ভাষার প্রকৃতি বা অন্তস্তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত করা যায় তাহাতেই দৃষ্ট হয় যে, এক দিকে কঠোরতার তপ্ত কুণ্ড এবং অপর দিকে মৃদুতার শীতল প্রস্রবণ।

চক্ষু সংযোগ হইবামাত্র যাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন নিঃশেষ হইয়া যায়, সেই ভাষার অভিধেয় গৌরব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষাকে সহজ করিতে হইবে বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের অভিপ্রায় ইহা নহে যে, সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া লেখনী চালনা করিও না। দেখিতে পাই, এই মত বাদীদিগের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ ও সাহিত্য অনুরাগের দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গভীরতত্ত্ব বা সূক্ষ্ম বিষয়কে বাদ দিলে কি দেশের বা সাহিত্যের অনিষ্ট হয় না? সংস্কৃত হইতে যদি ন্যায়দর্শন প্রভৃতি অসুবোধ্য কঠোর গ্রন্থগুলাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে কি তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে? কেবল কালিদাসের কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ পড়িয়া কে কবে মহামহোপাধ্যায় হইয়াছেন? ফলতঃ ভাষাকে অংশতঃ সহজ ও কঠিন রাখিতে হইবে। কাশীদাসের কবিত্বকে আদর করা উচিত হইলেও নবীন সেনের গভীর ভাবপূর্ণ ও অনুধাবনগম্য কবিতাবলীকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। কথামালাকে অবশ্যই উপাদেয় মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রভাত চিন্তার চিতা সুসজ্জিত করা বিধেয় নহে।

স্মরণাতীত কাল হইতে যে অধিকারিভেদে গ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে ভিন্নতার নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তদনুপাতে বঙ্গসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৈচিত্র্যই জীবনের চিহ্ন, যে ভাষাতে উহা নাই, তাহাকে মৃত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে যখন সমাজে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রহিয়াছেন, তখন ভাষার প্রকৃতি একমেবাদ্বিতীয়ং করিলে চলিবে না। অনেক সুশিক্ষিত লোক বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগবাহুল্য ভালবাসেন; সুতরাং প্রাকৃত শব্দপুর্ণ পুস্তকাদি তাঁহাদিগের উপযোগী বা মনোভিরাম হইতে পারে না।

বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাত্রের ব্যবহার্য্য একই প্রকার প্রাকৃত দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের। "গাছামু" ও 'টৈ টুম্বুরকে' ইহার উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে। চট্টগ্রামের নাবিকদিগের প্রাকৃত হইতে কলিকাতাবাসীর প্রাকৃতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রদেশ সম্পর্কিত প্রাকৃতেরও এইরূপ দশা।

বাঙ্গালীমাত্রের ভবিষ্যৎ যুগে প্রাকৃতের একীকরণকে মূল লক্ষ্য রাখিয়াই যদি এই মতবাদীরা প্রাকৃত শব্দপুঞ্জে বঙ্গভাষার অবয়ব বৃদ্ধি করিতে চান, তবে তাঁহাদের ইচ্ছাকে সাধু বলিতে পারিলেও তাহার সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ হয়। প্রথমতঃ এইরূপ একটা আগন্তুক বিসংবাদ উপস্থিত হইবে, কোন্ প্রদেশের রূঢ় শব্দগুলাকে বঙ্গভাষার আদি প্রত্যঙ্গে পরিণত করা যায়। কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত রূঢ় শব্দ প্রয়োগে অন্যান্য প্রান্তবাসীরা অনুমোদন করিবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। পক্ষান্তরে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গপ্রান্তের রূঢ় শব্দ যে কলিকাতা অঞ্চলের লোকদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিবে, ইহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ ঐ প্রদেশের প্রচলিত রূঢ় শব্দের উপর যেরূপ শ্লেষ বা অবহেলা করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় এক্ষণেও সেইরূপ করিতে অনেকেই পশ্চাৎপদ হইবেন না। এইরূপ গোলযোগে যদি কলিকাতাপ্রান্তের প্রচলিত প্রাকৃত শব্দগুলাকে বঙ্গভাষায় পূর্ণ করা যায়, তবে উপকার অপেক্ষা অপকারেরই মাত্রাধিক্য হইবে। পক্ষান্তরে পরস্পর প্রতিহিংসামূলক দলাদলি উপস্থিত হইয়া বিভিন্নপ্রকার প্রাকৃতের পুস্তকাবলীতে বঙ্গ দেশের বিপণী যে সুসজ্জিত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

বোধসৌগম্য সম্বন্ধে বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য প্রান্তের প্রচলিত প্রাকৃত সঙ্গীত বা কবিত্ব প্রভৃতির অর্থ ও মর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া অপেক্ষা সংস্কৃত কথার অর্থ কিংবা মর্ম্মের পরিজ্ঞান কষ্টসাধ্য নহে; পক্ষান্তরে বঙ্গভাষাতে ভারতপ্রচলিত অপর ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতে আবশ্যক বা গুরুতর বিষয়ের প্রচার হইয়াছে বলিয়া আর্য্য ভূমির অন্য ভাষা ব্যবহারকারীদিগেরও দিন দিন ইহার উপর ভালবাসা বাড়িতেছে।

ইহা হইতে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে, বঙ্গভাষার যদি ক্রমনীতিতে অভিধেয় গৌরব বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তবে কালে হিন্দুস্থানী প্রভৃতিরাও আগ্রহপূর্ব্বক ইহা পড়িবে। কিন্তু প্রাকৃত শব্দের বাহুল্যে ইহা গঠিত হইলে তাঁহাদেব বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে। আর ইহাতে সংস্কৃত শব্দ প্রচুরপরিমাণে সংযোজিত হইলে এইরূপ অন্তরায় ঘটিবে না। এই জন্য বঙ্গভাষাকে যে ভারতীয় সার্ব্বজনীন ভাষার পদে উন্নীত করিবার একটা আশা আছে, তাহাও তদীয় কলেবরে সংস্কৃত শব্দাবলীর সমধিক সন্নিবেশে সফল হইতে পারে। আর্য্যজাতির মধ্যে প্রদেশ ভেদে সংস্কৃত শব্দের বৈলক্ষণ্য নাই। কুমারিকার উপান্তবাসীর যে সংস্কৃত, হিমালয়ের উপত্যকা বা অধিত্যকা তাহারই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই ত গেল সংস্কৃত সম্পর্কিত কথা, আবার আবশ্যকমত অন্যান্য ভাষার শব্দসংগ্রহ করিয়াও তাহার অভাব দূর করিতে হইবে। যে স্থলে সংস্কৃত ভাষায়ও ভাবের উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে 'ফারসী' প্রভৃতি ভাষার শব্দকেও বঙ্গভাষার অঙ্গে প্রবেশ লাভ করিতে দিতে হইবে। এইরূপ স্থলে বিজাতি বা স্বজাতির কথা লইয়া ঝগড়া করিলে চলিবে না। ফলতঃ বিজাতীয় সম্পত্তি দ্বারা স্বজাতির উন্নতিবিধানকে কোন প্রকারে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্বজাতি ভাবের মূলতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি বিজাতীয় ভাবকে স্থলবিশেষে তাহার আনুগত্য করিতে আহ্বান করা যায়, তবে তাহাকে বিধিসঙ্গত বলিতে হইবে।

যেরূপ বঙ্গভাষায় আবশ্যকমত অপরাপর

ভাষার শব্দ আনিতে হইবে, তদ্রূপ তাহাতে নূতন ক্রিয়া সন্নিবেশ করাও উচিত। অনেক স্থলেই 'করা' বা 'হওয়ার' শরণ না লইলে বঙ্গভাষার বাক্য সংঘটন দুর্ঘট হইয়া উঠে। পৃথিবীতে যত প্রকারের উন্নত ভাষা আছে, সেগুলির অঙ্গ বিশ্লেষণ করিলে বঙ্গভাষা অপেক্ষা ক্রিয়াবাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়া সঙ্কোচ যে ভাষার উন্নতি ও বলের সঙ্কোচ করিয়া ফেলে, তাহা অনেক ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অনেক বঙ্গসাহিত্যসেবী পদ্যের ক্রিয়াবাহুল্যকে অনুমোদন করিলেও গদ্যে 'করা' ও 'হওয়ার' পুনরাবৃত্তিই ভালবাসেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ভাব ও শব্দের সন্নিবেশে সাহিত্যানুরাগীদিগের হৃদয়ে সুষমার ছবি অঙ্কিত হইয়া যাইত, এক্ষণে আর সেইরূপ দেখা যায় না। 'মাইকেল' প্রভৃতি বঙ্গ কবিরা নূতন ভাব, নূতন শব্দ ও নূতন ক্রিয়ায় পদ্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া গিয়াছেন, ইহা যখন সাহিত্যসেবিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তখন গদ্যে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পক্ষে অনেক সাহিত্যানুরাগীর মনে ভাষার সৌন্দর্য্য-সঙ্কোচ সম্বন্ধে যে একটা ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে অমূলক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ অভিনব ক্রিয়াগুলি শ্রোতৃবর্গের ভাল নাও লাগিতে পারে; কিন্তু কয়েক দিন পরে যে ঐ ভাবের শব্দগুলি অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যদি চিরদিনই ভাষা এক ছাঁচের থাকে, তবে তাহার স্বাস্থ্য বা প্রকৃতিগত কোন বিসংবাদ আছে, ইহা অবশ্য বুঝিয়া লইতে হইবে। কেননা, পরিবর্ত্তনই প্রকৃত স্বাস্থ্য ও অবিকৃত প্রকৃতির লক্ষণ। আমরা দেখিতে পাই, আজ কাল কোন কোন লেখক 'জিজ্ঞাসিলেন' 'আবরিয়া গেল' ইত্যাদি নব ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতেও বিরত হন নাই, এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ না করিলেও অনেকের অনুমোদিত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যদি গদ্যে 'আবরিয়া' ক্রিয়াটা ভাষার সুষমা ভঙ্গ না করে, তবে 'নিবারিয়া' ক্রিয়া কেন তাহা করিবে? যখন 'জিজ্ঞাসিলেন' শ্রোতার কর্ণে আঘাত করে না, তখন 'মীমাংসিলেন' যে তাহা করিবে, এ সম্বন্ধে প্রবল যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, ইংরাজি বাক্য রচনার প্রণালীটা বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে। নব্য শ্রেণীর অনেকেই সংস্কৃত ভাষার রচনা পরিপাটিকে ভালবাসেন না। যখন তাঁহারা ইংরাজি বাক্য রচনাপ্রণালীকে অনাদর করা দূরে থাকুক, বরং অধিক সমাদর করিয়া থাকেন, তখন ইংরাজি ক্রিয়া সন্নিবেশ প্রণালীর অনুপাতে যদি বাঙ্গালা ভাষায় নব ক্রিয়ারাশির সমাবেশ করা যায়, তবে কেন তাঁহাদের অ-মনঃপুত হইবে, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ক্রিয়া সঙ্কোচ করা ভাষার অভ্যুদয়কল্পে প্রতিবন্ধকস্বরূপ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রতিবন্ধকটাকে ধ্বংসের জলন্ত অনলশিখায় দগ্ধ করা কি বঙ্গসাহিত্যানুরাগীর পক্ষে উচিত নহে? হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কি কারাগার-গণ্ডির ভিতরেই ভাষাকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে? অবশ্যই ভাষাকে অভিনব নিয়মে চালিত করিতে গেলে প্রথম অবস্থায় লোকের মধ্যে মতামত লইয়া একটা বিবাদ আসিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া উন্নতিমূলক কার্য্যে পরাঙ্মুখ হওয়া মনস্বিতার পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে এই

ময় জগতে উন্নতিকর এমন কোন বিষয় দেখা যায় না, যাহা অধিকার করিয়া প্রথমে একটা মতামতের গোলযোগ উপস্থিত না হয়। শ্রুতিকটু ও শ্রুতিমধুর লইয়া যেএকটা চীৎকার শুনিতে পাই, তাহার মূলেও প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভাবকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কথাগুলি সাধারণে প্রচলিত আছে, সেই গুলিই আমাদের শুনিতে ভাল লাগে, যেগুলি প্রচলিত নাই, সেইগুলিই শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়। কোন নূতন কথা শুনিলেই প্রথমে আমাদের বাধ বাধ বোধ হয়। আবার অনেক স্থলে যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, অথবা অনেক প্রয়াস করিয়া বুঝি, তাহাকে নীরস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লই। মনে কর, কোন ব্যক্তির অষ্টম পুরুষ হইতে সংস্কৃতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার কর্ণে যদি হঠাৎ "স্বতঃ প্রামাণ্য" "পরতঃ প্রামাণ্য" "অন্বয় ব্যভিচার" ও "ব্যতিরেক ব্যভিচার" ইত্যাদি—দার্শনিক-প্রিয় শব্দাবলী প্রবেশ করে, তবে সে ব্যক্তি ঐগুলিকে "শুষ্কঃ কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে"র মধ্যে পরিগণিত করিয়া বসেন। পরন্তু এই শ্রেণীর মনস্তুষ্টি করিতে যাইয়া ভাষাকে দৃষ্টিপাতবোধ্য করা, আর তাহাকে বালকের পাঠ্যরূপে পরিণত করা একই কথা। কারণ বিষয় গুরুতর ও সূক্ষ্মতর হইলে চক্ষুঃ সংযোগ হইবামাত্র ভাষার নিঃশেষে অর্থপরিজ্ঞান হওয়া সুকঠিন। অনেকে বলিয়া থাকেন, বিষয় যত কেন গৌরবান্বিত বা মহান্ হউক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু ভাষাকে সহজ এবং সুবোধ্য করিতে হইবে। এই কথা শুনিতে সুমিষ্ট হইলেও ইহার সম্ভাব্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য সহজ ভাষায় আন্বিক্ষিকী বিদ্যার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন্ অনৈয়ায়িক কাব্যতীর্থ আজ পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন? স্বামী বিবেকানন্দ সহজ ইংরাজি ভাষায় জ্ঞানযোগ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কয়জন অবৈদান্তিক বা অদার্শনিক পাশ্চাত্য ভাষাবিৎ তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? অতীতের কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সরল বঙ্গভাষায় ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর সুন্দর অনুবাদ থাকিলেও অনৈয়াকিক বঙ্গসাহিত্যসেবীর মধ্যে কে যে একমাত্র স্বপ্রযত্নে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, কঠিন বিষয় সরল ভাষায় লিখিলেও তাহার কাঠিন্য দূর হয় না, এবং তাহা বাজার সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া খেদিমুদি পর্য্যন্ত সকলেরই বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। এক্ষণে আপনাদের আদরের মাতৃভাষাকে কোন্ নিয়মে পরিচালিত করা উচিত, তাহা আপনারা স্বয়ং মীমাংসা করিয়া লউন। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তি ত ইহাই উপদেশ করে, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" এইরূপ নিয়মে বঙ্গভাষাকে পরিচালিত করিলেই উহা সকল শ্রেণীর আদরের জিনিষে পরিণত হইবে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

কবির ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জীবনচরিত।

ঠাকুরদাস।

আমরা ঠাকুরদাস নামধারী তিন জন কবিওয়ালার সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু দুই জনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ইহাঁদের প্রথম

১৫। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গলা অনুমান ১২০৯ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জমীদারী সেরেস্তায় সামান্য চাকুরী করিতেন, তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

ঠাকুরদাস পাঠাভ্যাস করিতে প্রথমে স্বগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় তিন বৎসরকাল থাকিয়া কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং এই সময়ের মধ্যে গৃহে বসিয়া নিজ অধ্যবসায় দ্বারা কিছু ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা করেন। পাঠশালার বিদ্যা শেষের পর ঠাকুর দাস অন্য কোনও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে গমন করেন নাই; পাঠশালার সার্টিফিকেট লইয়াই তিনি পিতার কার্য্যস্থল—সেই জমীদারগৃহে মুহুরিগিরিতে আত্মসমর্পণ করেন। পিতৃ-আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া এই কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলেও ঠাকুরদাসের নিকট কিন্তু গোলামী ভাল লাগিত না; অবসর পাইলেই তিনি সংগীত রচনা করিতেন। অর্থকরী ব্যবসায়ের প্রতি পুত্রের অনাস্থা দেখিয়া, পিতা রামদয়াল চক্রবর্ত্তী সময় সময় পুত্রকে ভৎর্সনা করিতেন। কিন্তু তাহাতেও পুত্রের কাব্যনেশা তিরোহিত হইত না।

এই সময় আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির কবির দল অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঠাকুর দাস গোপনে কলিকাতায় আসিয়া ঐ সকল কবিওয়ালাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহারাও কবির রচনা মাধুর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরদাসের বয়স ২৬ ২৭ বৎসর।

অতঃপর ঠাকুরদাস কবির পালার গান রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত এবং অপরাপর কবিওয়ালাদিগকে দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইল। ঠাকুর দাস নিজে কখন কবির দল গঠন করেন নাই, তিনি বিভিন্ন কবির দলে গান বাঁধিয়া দিয়াই অর্থ লইতেন। আণ্টুনি, রামসুন্দর প্রভৃতির দলে ইনি স্থায়ী বাঁধনদার ছিলেন। ঠাকুরদাস তাঁহাদের নিকট হইতে মাসিক বেতন পাইতেন। আণ্টুনি সাহেব যেবার চুঁচুড়ায় দলের বাঁধনদার গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক অপ্রতিভ হন, এবং যে ঘটনার পর হইতে গোরক্ষনাথকে আণ্টুনির দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে হয়, সেই ঘটনার পর হইতে ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী আণ্টুনি সাহেবের দলে নিয়মিতরূপে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি ক্বচিৎ আসরে দাঁড়াইয়া গাওনা করিতেন, বিশেষ অনুরোধ উপরোধে না পড়িলে তিনি সে কার্য্য করিতেন না। কবি

সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত, এখন কবির গান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

ঠাকুরদাসের একটী প্রেম-সংগীত,—

বল সই কি কথা,
ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।
তবে কার্য্যান্তরে হইলে স্বতন্তর,
তুষ্‌তে নারি প্রাণ তোমার॥
তা বলে ভেবোনা প্রিয়ে, আমায় পর।
আমি নহিতো পরের পাণ
তুমি না পরের প্রাণ,
তোমারি বাঁধা নিরন্তর॥
পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর;
পুরুষ প্রাণ দিলেও, নারী সুযশ করে না।
কও, কে শিখালে হে তোমারে,
এমন ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা॥
বিনা দোষেতে দূষো,
সুখের প্রেমে দুখ দিওনা;
মিছে অযশ করলে ধর্ম্মে সবে না॥

নায়কের প্রেমে নায়িকার সন্দেহ হইয়াছে, কবি কি স্বাভাবিক ভাবে নায়কের মুখ দিয়া সান্ত্বনা বাক্যগুলি বাহির করিয়াছেন। নায়ক বলিতেছেন, তুমি ভাবিয়াছ, আমি তোমায় ভালবাসি না! সে কি হয়, আমি তোমারই। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে স্থানান্তর হইলে কেবল তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারি না, নতুবা নিরন্তর আমি তোমার নিকট বাঁধা। ওরূপ সন্দেহ আর মনে স্থান দিও না;—রমণীর স্বভাবই পর নিন্দা করা! পাঠক দেখিলেন, নায়কের মুখে একটু শ্লেষও আছে, কিন্তু বলিবার ভঙ্গিতে তাহা কেমন সুন্দর হইয়াছে।

কবি বিরহিণীকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিতে বেশ সুদক্ষ ছিলেন। স্ত্রীলোককে যে ধৈর্য্যশীলা ও ক্রোধশূন্যা হইতে হয়, কবি পশ্চাল্লিখিত গানটীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমতি! এই মিনতি রাখগো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ,
সওগো সও অল্পদিন আর দুখের ভার॥
হবি কি পাগলিনী, কমলিনি,
কৃষ্ণ বিরহের দায়?
ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ,
সময়ে পাবে শ্যামরায়।
আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে:—
সাধে কৃষ্ণ সাথে বাদ,
পরিবাদ ঘটালে এই গোকুলে।
দুখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কায নাই,
ঘটাস্‌নে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
জেনো সকলি কপালে হয়,
রাধেগো, দোষ নাই কা'র।
বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি!
ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ,
বিপদের কাণ্ডারি হরি।
ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
হয় দুখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার॥
সহ্য করে' থাকো, অধৈর্য্য হ'য়ো না।
নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ-নিশার অবসান হইবে।

কবির পরমার্থ বিষয়ক গান হইতে একটীমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কবি কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন;—

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়।
কভু কুব্জায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরি।
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়।
সকলে জানে নই রসময়! আমি ইচ্ছাময়।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সইরে আমা হতে হয়॥
কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব,—
করি কখনো ঘটালি, কখনো রাধার দাসত্ব।
কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন,
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করিহে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপীকায়।

কভু ভিক্ষা করিতাম,
মানিনী রাধার মানের দায়॥
কভু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন,—
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে রক্ষা করি গোপীগণ,
কভু পুতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি,
কালীয় দমন।
কভু উদুখলে বাঁধেন যশোদা আমায়॥

প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশের কোনও সন্ধান জানিতে পারি নাই।

১৬। ঠাকুরদাস দত্ত।

আমরা রামবসুর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, রামবসুর সহিত রামমোহন দত্তের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। উভয়ের নামে নামে মিল হওয়ায়, তাঁহারা পরস্পরে 'মিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই রামমোহন দত্তের পুত্রই আমাদের আলোচ্য ঠাকুরদাস দত্ত। ঠাকুরদাস পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা ফোর্ট উইলিয়ামে চাকুরী করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সম্ভবতঃ ১২০৭ সালে হাবড়া জেলার অন্তর্গত ব্যাট্‌রা গ্রামে ঠাকুরদাস জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রামমোহন তাহার শিক্ষার নিমিত্ত একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই গৃহশিক্ষকের নিকট ঠাকুরদাস কিঞ্চিৎ ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। অর্থশালী পিতার একমাত্র বংশধর বলিয়া ঠাকুরদাসের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ঘটে নাই। তত্রাচ তাঁহার ইংরেজি ও বাঙ্গালা এই উভয় হস্তাক্ষরই অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

গৃহে বসিয়া শিক্ষালাভের সময় হইতেই সংগীতের প্রতি ঠাকুরদাসের অতিশয় অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সংগীতের নাম শুনিলেই তিনি গোপনে গান শুনিতে যাইতেন। রামমোহন দত্ত নিজেও সংগীতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবিওয়ালা রামবসুর কবির দল গঠন করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মিতার দলে গাওনাও করিতেন। তত্রাচ পুত্রের এবংবিধ সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না। পড়া শুনা বন্ধ করিয়া গান শুনিতে যাওয়ার জন্য তিনি পুত্রকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করিতেন, কিন্তু পুত্রের সঙ্গীতানুরাগ তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। একদা রামমোহন পুত্রের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাষ্ঠপাদুকা দ্বারা পুত্রকে এমনি প্রহার করেন যে ঠাকুরদাসের মুখের কয়েকটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তিনি পিতৃহস্তে যতই লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণ-পিপাসা ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে রামমোহন হারি মানিয়া, পুত্রকে বিদ্বান্ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ফোর্ট উইলিয়ামে স্বকার্য্য স্থলে এক কেরাণী গিরিতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও ঠাকুরদাসের উন্নতি হইল না,—গানের নাম শুনিলেই তিনি কর্ম্মস্থল হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন। একদা রামমোহন নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর মনের ভাব কি, আমায় খোলসা বল্?' পুত্র অম্লানবদনে উত্তর করিলেন,—'গোলামগিরি আমায় ভাল লাগে না; আমি চাকরি কর্‌তে পার্‌বো না।' অতঃপর রামমোহন পুত্রকে আর কোনরূপ ভর্ৎসনা করিতেন না, কিন্তু তাহাতে পুত্রের অনুপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাজেই তাহার চাকুরি আপন হইতেই ঘুচিয়া গেল।

এই ভাবে ঠাকুরদাসের জীবনের প্রায় বিশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, রামমোহন

পরলোক গমন করেন। এইবার ঠাকুরদাস স্বাধীনভাবে সঙ্গীত আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি জীবনে কখনও কবির দল গঠন বা কবির দলে গাওনা করেন নাই। তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত গান রচনা করিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালাকে দান করিতেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত সেগুলি নিজ নিজ দলে গাওনা করিতেন। ঠাকুরদাসের প্রধান গৌরব পাঁচালীর গানে। তিনি পাঁচালীর এক দল গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই গাওনা করিতেন। এই কারণে তাঁহার পৃথক্ কবির দল করা ঘটে নাই।

ঠাকুরদাস কবির দল না করিলেও যে সকল কবি-গান রচনা করিয়াছেন, তাহা কবিত্ব-সৌরভে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। প্রথমে ঠাকুরদাসের একটী সপ্তমী গান শ্রবণ করুন,—

গিরি কারে আনিলে?
এনে কার তনয়া প্রবোধিলে॥
অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
কুসুম চন্দন পায়ে, কে করেছে পূজা,
শুনহে পাষাণ! হ'য়ে হতজ্ঞান,
সকলি ভুলিলে।
নারায়ণী বাণী দাঁড়ায়ে দু'পাশে,
দশভুজে পাশ শোভা পায়,
ব'লে গেলে হে গিরি, আনিগে গিরিজা,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়;—
রবি শশী আসি উদয় পদে পদে,
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে,
দাসের আশায় আসা হয়,
সার ও পদ পাইলে॥

কবির একটী বিরহ সঙ্গীত,—

সই লো সই লো শৈল বক্ষে রইল বৃথা।
এই যুগ্ম গিরি, ক্রমে হল ভারি,
যার ভার সে তো নাহি হেথা॥
যার করে করে এ দুঃখ শান্তি,
কার করে পড়ে তার এ ভ্রান্তি,
ঐ ভাবে ক্ষয় হইল কান্তি,
কারে বল বলি মনের কথা।
আর কি করিবে এর সুযতন,
বিন্ধ্যগিরির ন্যায় হয়েছে পতন,
সে তো করে গেছে অগস্ত্যের গমন,
ভূধরে রাখিয়ে ধরার মাথা॥

শুনিতে পাওয়া যায়, এই গানটী একদা বিখ্যাত রাজা কান্তিচন্দ্র নিজে নিজে গাহিতে গাহিতে বলেন,—এই গানটীর রচয়িতাকে একবার আমায় কেহ দেখাইতে পার? রাজার এই উক্তিই বোধ হয় এ গান সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত সমালোচনা।

এই সকল গানের অধিকাংশই ঠাকুরদাস পরে স্বপ্রতিষ্ঠিত পাঁচালীর পালায় সন্নিবিষ্ট করেন। এই সময়ে বঙ্গীয় কবিকুঞ্জরচনায় রূপক ও অনুপ্রাসের বড়ই আদর ছিল। ঠাকুরদাসের রচনাতেও উহা বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। একটু নমুনা দিলাম,—

(আজি) মান-রাহু রাই-চাঁদে গ্রাস করেছে।
এ স্থিতির অস্থিতি সখি,
মুক্তির কি আর মুক্তি আছে॥
এ গ্রহণে হয় অনুমান, দণ্ডের নাহি পরিমাণ;
জীবনে দণ্ড হয় বা বিধান,
লক্ষণে জ্ঞান হতেছে।
ইত্যাদি।

ঠাকুরদাস কবি-প্রতিভায় তৎকালে শিক্ষিত সমাজকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। মূলাজোড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঠাকুরদাসের গানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ তাঁহার দলে মধ্যে মধ্যে গাওনাও করিতেন। কবি কাশীপ্রসাদ

তাঁহাকে "Indian Bard" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

কবির দলের লড়াইয়ের অনুরূপ, ঠাকুর দাস পাঁচালীর দলেও লড়াইয়ের সূত্রপাত করেন। নানা স্থানে নানা দলের সহিত তাহার কবি-লহর হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প স্থানেই তিনি প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতেন। ঠাকুরদাস একখানি বিদ্যাসুন্দরের পালাও রচনা করিয়াছিলেন।

হাস্যরসাশ্রিত সংগীতাদি রচনাতেও ঠাকুর দাস অপটু ছিলেন না। শ্রীশ্রীতারকেশ্বর দেবের মোহান্ত মাধব গিরির কারাদণ্ড হইলে, একটী গানের সৃষ্টি হয় ;—

মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে,
টাক ধরে না চুলে,
কাণায় চোখে দেখ্‌তে পায়॥

ঠাকুরদাস ইহার শেষে জুড়িয়া দেন,—

বিলাতী ঘানি, নূতন আমদানী,
শিবের ষাঁড় জুড়েছে তেলে
ভোলে কামিনী,
হয়েছে ল্যাজে-গোবরে বৃষ
কখন কি দায় ঘটায়॥*

অশ্লীলতা-বর্জ্জিত কেমন হাস্য পরিহাস!

১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যু কালে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ এখনও জীবিত থাকিয়া পিতার পাঁচালীর দল চালাইতেছেন।

১৭। ঠাকুরদাস সিংহ।

কবিওয়ালা ঠাকুরদাস সিংহের সম্বন্ধে একবারেই কিছু জানা যায় না। তিনি রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি নিজে গান রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে তাঁহার একটী কবির দল ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত মনীষীগণের রচিত উৎকৃষ্ট গীতি নিচয় স্বদলে গাওনা করিতেন।

ঠাকুরদাস সিংহের দলে গীত দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়াই তৎপ্রসঙ্গ শেষ করিব।

যতনে মম প্রাণ, প্রেয়সি করেছি তোমায়
সমর্পণ।
তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত,
অন্যের নহি কদাচন॥
কেমন পুরুষের কপাল, বুঝিতে নারি,
নিরন্তর তুষি মন, তবু যশ করে না নারী,
তোমার নারীজাতির স্বভাব,
কেবল অ-ভাব করা প্রাণ,
এভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায়।
অন্য কারো নই, শুনলো রসময়ি,
মিছে দোষ দাও কেন আমায়;
অন্যের যদি হ'তাম,
তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি লয়ে মন, যা কর না একি দায়॥
নারীর স্বভাব—দোষে নাগরকে,
নিবৃত্তি না মানে কথায়;
তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী,
রামকে বল্‌লেন, মৃগ দাও আমারে ধরি।
গেলেন কুটীর ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষলেন সীতা পুনরায়॥

কেহ কেহ রাম বসুকে এই গানটীর রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই গানটীর সহিত ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রথম উদ্ধৃত গীতটীর কি চমৎকার সৌসাদৃশ্য!

আমারে সখি ধর ধর!
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার?
পথশ্রান্তে নহিলো কাতর,

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

হৃদে নবঘন দলিতাঞ্জন বরণ,
উদয়ে অবশ শরীর।
অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার,
আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম-প্রেমভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভাব অম্বর॥
হায় সে যে কটাক্ষের, অপাঙ্গ ভঙ্গিম
বয়ান করে তা কি কব?
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে ভাব॥
কুলশীল ভয়, লজ্জা তায় যায়,
না রাখে জীবন-আশ।
তার জলে বা স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা,
সন্দেহ নাহি মরিবার॥

কি চমৎকার ভাব-সৌন্দর্য্য, কি মনোহর কবিত্ব-সৌরভ। এই গুণেই কবিগান আজিও জীবিত আছে; এই গুণে আজিও বাঙ্গালীর নিকট উহা সমাদর প্রাপ্ত হইতেছে।

১৮। গদাধর মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর ন্যায় গদাধরও কখন কবির দল গঠন করেন নাই; ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী প্রভৃতি কবিওয়ালার দলে ইনি বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন অর্থাৎ গান বাঁধিয়া দিতেন। এইরূপে বিভিন্ন দল হইতে কিছু কিছু করিয়া যাহা পাইতেন, সে কালের বাজারে তাহাতেই তাহার নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কবিওয়ালা সমাজে এইরূপ বিস্তর কবি দেখা যায়, যাহারা স্বয়ং কবির দল না বাঁধিয়াও কেবল বিভিন্ন দলে গান রচনা করিয়া দিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। গোরক্ষনাথ, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনে এ রীতিরও ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সাহিত্যসেবীর পক্ষে এভাবে কমলার কৃপাপাত্র হইবার সৌভাগ্য সহসা ঘটিয়া উঠে না।

গদাধর জাতিতে ব্রাহ্মণ; ২৪ পরগণায় জন্মস্থান। ইনি রাম বসুর পরবর্ত্তী, অনুমান ১১৫৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাম বসুর ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে না পারিলেও, গদাধর পরবর্ত্তী কালে একজন প্রসিদ্ধ বাঁধনদার ও গীতিরচয়িতা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি প্রথমতঃ কালীঘাটের এক সখের দলে যোগদান করিয়া সংগীতাদি যোগাইতে থাকেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার উপস্থিত রচনা-নিপুণতা প্রকাশিত হয়; উত্তরকালে আসরে বসিয়া প্রতিপক্ষের ধরতার উত্তরে রচনায় তিনি এমনি সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন যে, তৎকালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনেক বাঁধনদারই অগ্রসর হইতেন না, এবং তৎকালে এমন কবিওয়ালাও ছিলেন না, যিনি গদাধরের বাক্যবাণে অন্ততঃ একবারও ব্যথিত, ক্লিষ্ট বা জর্জ্জরিত হন নাই।

এক্ষণে গদাধরের প্রথম অবস্থার রচিত ও কালীঘাটের সখের দলে গীত একটী 'সপ্তমী' গান শ্রবণ করুন ;—

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই!
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রাণী ধায়,
বলে—কৈ মা উমা কৈ?
(চিতেন)
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে!
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দু'বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে।
কই মেয়ে ব'লে আন্‌তে গিয়েছিলে?
(মহড়া)

তোমার পাষাণ প্রাণ,
আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে প্রমাণ আপনা হ'তে,
গেলে নাকো নিতে,
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা,
মায়া কি পাসরিলে?
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,—
তোর কি মা নাই?
তোর কি মা নাই?
অম্‌নি সরমে মরমে ম'রে যাই॥
তাদের বলি,—আমার পিতে,
এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে॥
আমার মনের ব্যথা,
আছে মনে গাঁথা,
মা, কি বলিবে অন্যে,
পিতৃদত্তা কন্যে;
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী;
সকলি জান তুমি,
একি কবার কথা! ইত্যাদি।

একজন শিক্ষানবিশ কবির প্রথম রচনা ভাব-সৌন্দর্য্যে বিশেষ মনোজ্ঞ হয় না সত্য, কিন্তু গদাধরের কাব্যজীবনের এই প্রথম ফলটি একবারেই অপদার্থ নহে। ইহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে সুতার ও সুরস বিদ্যমান আছে।

নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে গীত গদাধরের একটী বিরহ-সঙ্গীত;—

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যতকাল;
পতি বিনা সকল জেনো,
নারীর পক্ষে কাল।
সে কাল জেনো সুখের—
যে কাল পতি সুখে যায়,
সুখের মূলাধার প্রাণপতি অবলার,
পুরুষে অবলা জুড়ায়।
পতির সুখে সতীর সুখ,
পতি দুখে দুখ নারীর সই!
পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়,
ধৈর্য্য ধর সই, অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়;
আসবে প্রাণকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
সুশীতল করো তাপিত হৃদয়।
কমল ত্যজিয়া মধুকর,
স্বতন্তর কভু নাহি রয়,
কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে;
ঘুচিল দুখের কাল, আইল সুখের কাল,
জুড়ালে শ্রীরামে লয়ে।
নাথ বিরহে সাবিত্রী তো,
বিষাদিত হয়েছিল সই,
আবার পুনরায় পেলে সে তো রসময়ই॥

প্রথম গীতটী হইতে দ্বিতীয়টী ভাব-সম্ভারে কত উচ্চ, তাহা পাঠকগণ আপনারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। নারীর যে পতিই একমাত্র গতি, পতিই নারীর সুখ দুঃখের কেন্দ্রস্থল, স্বামীর সুখেই পত্নীর সুখ, স্বামীর দুঃখেই দুঃখ—ফলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর দ্বিতীয় কোনও সত্ত্বা নাই, তাহা কবি—"পতি বিনা সকল জেনো নারীর পক্ষে কাল" এই একটী মাত্র ছত্রে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। অল্প কথায় গভীর ভাব পরিব্যক্ত করাই কবির ক্ষমতার কথা। সে কালের কবিওয়ালাদের এই একটী বড় শ্লাঘার ও গৌরবের বিষয় ছিল।

গদাধরের গীতগুলি এক দিকে যেমন কবিত্ব-সৌরভে আমোদিত, অপর দিকে তেমনি তাহা বিশুদ্ধ ভাবব্যঞ্জক। তিনি রচনায় অশ্লীল ভাবের সমাবেশ করিতেন না। এই গুণেই তিনি তৎকালীন জনসাধারণের মনে এক বিশুদ্ধ কাব্যরসের প্রবাহ ছুটাইতে পারিয়াছিলেন।

গদাধরের আর একটী গুণ ছিল; তিনি যখন যে দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন,

তখন সেই দলেরই প্রতিপত্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইত। ইহা কবির গুণ, কি কবির কাব্যের গুণ তাহা বুঝিতে আর কষ্ট পাইতে হয় না। তাঁহার সহযোগে এইরূপ দলের প্রাধান্য বর্দ্ধিত হইতে থাকায়, তাঁহাকে বাঁধনদার নিযুক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও কলহের সৃষ্টি হইত বলিয়া শোনা যায়। এরূপ কলহে কবিরও কিছু লাভ হইত, কারণ যিনি তাঁহাকে বাঁধনদার নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাকে অপর কবিওয়ালা অপেক্ষা কিছু অধিক বেতন দিতে স্বীকার করিতে হইত।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কংস বধ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছেন। অনেক দিন তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নাই, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা বহুবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া দূতী পাঠাইয়াও তাঁহার সন্ধান লইতে পারেন নাই। এবার এক সখী যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভে সক্ষম হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—

রাই-শত্রু রেখো না হে শ্যামরায়!
বধ করে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায়॥
বৃন্দেগে কৃষ্ণে কয়,—শুনেছি দয়াময়,
কল্লে তো সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস॥
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে—সেও হে প্রাণেতে বাঁচে;
রাজার নন্দিনী হ'ল বিরহিণী,
বলহে—কত দুঃখ সবে আর॥
ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ,
রাখলে প্রমাদ ঘটায়।
তুমি হয়ে রাধার প্রেমের ঋণী,
তায় কর্‌লে কাঙ্গালিনী,
তোমার ও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ,
বাড়িবে অধিক মান,
মুক্ত হ'বে রাধার প্রেমের দায়॥

পরনির্ভরতা যে প্রত্যেক রমণীর মজ্জাগত অক্ষমতা, তাহা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্বামীর অনাদরে পত্নী, জীবন ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু একবার শেষ দেখা না দেখিয়া মরিতে পারে না। যে তাহাকে বার বার অনাদর অবহেলা করিয়া আসিতেছে, তদ্বিনিময় স্বরূপ তাহারই নিকট পুনঃ পুনঃ আত্মনিবেদন। কবির লিখিত—"ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায়" বর্ত্তমান সময়ে দেশে প্রবাদ বাক্যরূপে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাতেও যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলেন না, গোপবালাগণের অশ্রুধারা মুছাইয়া দিলেন না; তখন সখী আসিয়া পুনরায় কাতর অভিযোগ করিল,—

তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়,
বিক্রীত রাধার পায়,
কৃষ্ণধন—রাধার কেনা ধন,
হয়েছ একবার।
সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার॥
শুনি, ক ও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে কেন কৃষ্ণধন থাকৃতে
রাই কাঙ্গালিনী?
ক'রে রাই পক্ষে পক্ষপাত,
হ'লে হে কুব্জার নাথ,
হরি! মলো দুঃখে রাই,
একবার চক্ষে দেখ্‌লে না;
হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্,
কুব্জার মনের বাসনা॥

কুব্জা করেছে চন্দন দান,
বাড়ালে দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান।
কিন্তু রাধার বই কুব্জার শ্যাম,
কেউ বল্‌বে না॥

কুব্জার শ্যাম তো কেউ বল্‌বেই না; তা ছাড়া তোমার নাম করতে গেলেই আগে লোকে রাধার নাম করবে। শ্রীরাধা কৃষ্ণ—'এই যুগল নামই ভুবনে বিখ্যাত; তা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রীবৃন্দারণ্যে ষোড়শ সহস্র গোপ রমণী আছে, তাদের মধ্যে শ্রীরাধা গোপীপ্রধানা—'ধন্য মান্য রাজ কন্যে।' এঁরা সকলেই তোমার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে,—সবাই তোমার 'দাস্য ক্রিয়া' করেও তোমায় লাভ কর্‌তে পারল না। কিন্তু কুব্জার এমনি ভাগ্যের জোর যে, সে একটু চন্দন দিয়াই তোমাকে তার আপনার করে নিতে পার্‌লে। যাক্ তোমাকে বেশি কিছু বল্‌তে আর ইচ্ছা নাই। আমরা

নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই,
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী;
সাথে বিনোদিনী রাই।
লিখে দাস খত স্বহস্তে,
শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,
দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়,
তা তো মনে হয়?
সে খতে সাক্ষী আছেন ললিতে॥
তোমার সেই দাসখত লওহে শ্রীহরি!
খাতক গেল, মিছে খত রেখে
কি করবেন রাইকিশোরী।

নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,
তোমার দোষ কিছুই নাই,—হরি!
কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ কল্লে ধর্ম্মে সবে না।

এত দুঃখ সন্তাপ, বিরহ-ব্যথা সব এক দীর্ঘ নিশ্বাস ও অভিমানেই পরিসমাপ্ত হইল। নারী আর কি করিতে পারে? দয়িতের চরণে আত্ম-নিবেদন ও সম্বাহন ভিন্ন সাধ্বী সতী আর যে কিছুই করিতে সক্ষম হয় না। কি অভিমান ও অন্তর্নিহিত মর্ম্ম যাতনাতেই সখীর মুখ দিয়ে বাহির হইয়াছিল,—হরি, তোমার দেওয়া খত তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। খাতক গেলে মিছে খত রেখে কি হইবে? তার পর নিজ অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলকে ধিক্কার দিয়া, সখী শেষ সম্বল—ধর্ম্মের প্রতি আত্ম সমর্পণ করিল। এভাব—এই আত্মসমর্পণ এই প্রাচ্যভূমি ব্যতীত অপর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গদাধরের বিরহ ও সখীসংবাদগুলি এক সময় দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট বড়ই আদৃত হইত। এই কারণেই কবিওয়ালারা তাঁহাকে বাঁধনদার নিযুক্ত করা লইয়া এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন।

যে যায় সে আর আসে না,—সে স্থান আর পূরণ হয় না। গদাধর গিয়াছেন, কিন্তু আজও কবিওয়ালাসমাজে তাঁহার সে শূন্য আসন আর কেহ পূরণ করিতে পারে নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গদাধর মুখোপাধ্যায় পঞ্চভূতে মিশিয়া যান।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রার ঐতিহাসিক বিবরণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক মহামতি কর্ণেল টড সাহেব সুপ্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দু নরপতিগণের সমসাময়িক মুদ্রার অনুসন্ধান জন্য বহুস্থানের খননক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত মাণিক্যালু নামক পুরাতন নগরের এক স্থান খনন করিতে করিতে সাহেবের লোকেরা দেখিতে পায়, মাটির ভিতর বহু মন্দির ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে; যেন কোন প্রাচীন নগর কালপ্রভাবে ধ্বংস হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। টড সাহেব বলেন, এই প্রাচীন নগরে হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) শিক্ষা দিবার বৃহতী পাঠশালা ছিল এবং তাহার পার্শ্বের প্রশস্ত অট্টালিকায় মুদ্রা নির্ম্মাণ করিবার কার্য্যালয় ছিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, জেনেরল ভেণ্টুরা, কোর্ট সাহেব এবং মেজর বিউক্লে দেখিয়াছেন, ঐ ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরের গাত্রে বহু প্রকারের মুদ্রার প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। জর্ম্মণ দেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হনিবর্জর, পেশোয়ার ও আফগানিস্থানের কয়েকটী পার্ব্বত্য প্রদেশ খনন করাইতে করাইতে হিন্দু-মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত; আকার চতুষ্কোণ; দেবনাগর অক্ষরে একদিক এবং গ্রীক অক্ষরে অন্যদিক খোদিত ছিল। কাবুল হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরবর্ত্তী মেখ্‌রাম নগরে মুসো মেশন্ নামক ফরাসী পণ্ডিত ও পরিব্রাজকের যত্নে আলেক্‌জন্দর বাদসাহের ভারতাক্রমণ কালীন হিন্দুমুদ্রা দৃষ্ট হইয়াছিল, এই সকল মুদ্রাতেও দেবনাগর অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। মেশন্ সাহেব লিখিয়াছেন, গ্রীকেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার কিছুকাল পরে, পঞ্জাব এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রা ও রণধ্বজার উপরে গ্রীক ভাষার শব্দ (গ্রীক অক্ষরে) ব্যবহার করিতেন। (History of British India. By Hugh Murray, Numismatic remains,) সিদিয়ান, পেল্‌ভী ও রোমান অক্ষরের মুদ্রাও এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। আণ্টনি, সিজার, আগ্রিপা প্রভৃতি রোমক নরপতিবর্গের নামাঙ্কিত এবং মূর্ত্তিসমাযুক্ত সুবর্ণ মুদ্রা, প্রান্ত প্রদেশের কয়েক স্থানে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভারতেতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ হিউ মরে সাহেব অনুমান করেন, বিদেশীয় বণিকেরা প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য ও ব্যবসায় উপলক্ষে গমনাগমন করিবার সময়ে এই সকল মুদ্রা বিনিময়ে প্রচলন করিয়াছিল। সে সময়ে, এই সকল বিদেশীয় মুদ্রা কেবল ধাতুর মূল্য অনুসারেই প্রচলিত ছিল; মুদ্রার উপরে যে মূল্য খোদিত থাকিত, তদনুসারে মূল্য দিবার নিয়ম ছিল না। পেল্‌ভি ভাষা প্রাচীন পার্শীক জাতির ভাষা, এই ভাষায় খোদিত বহু মুদ্রা পাঞ্জাব প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এই সকল রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রায় মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শীকগণ সূর্য্যোপাসক, সুতরাং সূর্য্যের বা অগ্নিশিখার ছবি তাহাদের মুদ্রায় খোদিত থাকা সুসঙ্গত। গ্রীকদের গ্রন্থে থিয়োডোটস্ এবং ইউথীডিমস্ নামক গ্রীসীয় নরপতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ইহাঁরা কয়েকবার ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন এবং ভারতের

কতিপয় স্থানে রাজত্ব করিয়া তাঁহাদের মুদ্রা, রাজকীয় চিহ্ন ও ধর্ম্মমতের প্রচলন করিয়াছিলেন। এদেশে যে সকল সাহেব মুদ্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা কোথাও ইহাঁদের মুদ্রা বা রাজকীয় চিহ্ন প্রাপ্ত হন নাই। মরে সাহেব অনুমান করেন, ইহাঁরা সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন নাই, সিন্ধুনদের অপর পার পর্য্যন্ত আসিয়া থাকিবেন এবং প্রান্ত প্রদেশস্থ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে শাসন বিস্তার করিয়া থাকিবেন। ইহাঁদের বংশোদ্ভূত আপোল্লোডোটশের নামাঙ্কিত মুদ্রা আফ্রিদী দেশে পাওয়া গিয়াছে; থিয়োডোটশের পৌত্র ইউক্রেডাইটীশ পশ্চিম আফগানিস্থানে ও জেলালাবাদে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাঁদের নামের টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে। তদনন্তর আন্টিমেকস্ নামে গ্রীক রাজা অনেক বৎসরকাল ব্যাপিয়া ভারতের প্রান্ত প্রদেশে রাজত্ব করেন, ইহাঁর সমসাময়িক মুদ্রাগুলি যেমন উৎকৃষ্ট নিখাদ ধাতুর সহযোগে নির্ম্মিত, তেমনি অতীব সুন্দরগঠন সম্পন্ন ছিল। "These coins were noted for the purity and beauty of silver as well as for the excellent workmanship—both Indian and Greek."—Murray's History of India, Page 64. ইনি অন্তকালী নামক হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক সম্মুখ সমরে নিহত হন এবং সেই যুদ্ধ অবসানের পর হইতে ভারতের প্রান্তদেশে গ্রীক শাসনের ধ্বংস হয় এবং গ্রীক মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়। গ্রীক দেশের অমর ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন, সুপ্রখ্যাত রোমক সম্রাট্ অগশটশ্ যখন আন্টিয়োক্ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ হইতে পুরু রাজা তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ দূতের সঙ্গে পুরুরাজা যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে লিখিত ছিল—"আমি ছয়শত রাজার উপরিস্থিত নরপতি অর্থাৎ ছয় শত রাজা আমার প্রভুত্ব স্বীকার করে এবং আমার আদেশ মান্য করিয়া চলে। আমি এই দূতের হাতে ঐ ছয়শত রাজার রাজ্যের ছয়শত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা আপনাকে সাদরে উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিলাম এবং তৎসঙ্গে আমার নিজের নাম ও উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি সমাযুক্ত স্বর্ণ মুদ্রাও পাঠাইয়া দিলাম।" ক্লিফ্টন্ সাহেব প্রণীত "The Ancients of India" নামক পুস্তকে লিখিত আছে (Chapter IV, PP. 61-64), উপরি উক্ত ছয় শত রাজার মুদ্রা রৌপ্য নির্ম্মিত ছিল এবং প্রত্যেক রাজার টাকায় দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল। পুরুরাজার হিরণ্ময় মুদ্রায় মহাদেবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত আলেক্জন্দর (সেকেন্দর সাহা) নামক গ্রীক সম্রাটের সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ভারতভূমে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পডিট্কশ্ নামে এক সুবিদ্বান্ পুরুষ, সমুদ্র তীরবর্ত্তী বহুস্থানে পরিব্রজন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি বলেন, ভারতবর্ষ দেশে সমুদ্রতীরে নীলকুণ্ড নামক স্থানের তুল্য বাণিজ্যপ্রধান স্থান আর কোথাও নাই। পডিট্কশের মতে তৎকালে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রধান দেশীয় বণিকেরা এই স্থানে যাতায়াত করিত এবং সকল রাজ্যের মুদ্রা সঙ্গে লইয়া আসিত; সুতরাং এই এক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিলে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় নরপতির টাকা পাওয়া যাইত। পডিট্কশ সাহেব এই নগরে (অথবা সমুদ্র বন্দরে) ন্যূনাধিক দেড়শত প্রকার হিন্দু রাজার মুদ্রা দেখিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কতকগুলি লৌহ, কতকগুলি পিতল (অথবা

কাঁশা) এবং কতকগুলি রৌপ্য নির্ম্মিত ছিল। সুবর্ণ মুদ্রা, বণিক্‌গণ দ্বারা অতি অল্পসংখ্যায় ব্যবহৃত হইত; বড় বড় কোষাগার, মহাজনের কুঠি এবং রাজকীয় কাজে সোণার টাকা ব্যবহারের নিয়ম ছিল। নীলকুণ্ড নগর সম্বন্ধে এখনও বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই, কিন্তু হিপ্পলশ্ নামে আর একজন গ্রীশীয় পণ্ডিতের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে—"The next city was Colchi, a part of the kingdom of Pandion, which extended over all this part of the continent, and included even Nelkunda." অর্থাৎ, "ইহার পরবর্ত্তী (প্রয়োজনীয়) নগরের নাম কোল্‌চি, ইহা পণ্ডিয়ন রাজত্বের অংশ। পণ্ডিয়নগণ এই মহাদেশের এই সমুদয় অংশে রাজত্ব করেন; নীলকুণ্ড ইহারই অন্তর্গত।" আরব্য সাগরের উপকূলে এবং ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের পার্শ্বে কোচিন রাজ্য এখনও তদ্দেশে কোচি বলিয়া খ্যাত, এক সময়ে এখানে পান্ড্য রাজগণ বহু স্থান ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও সত্য, সুতরাং এই কোচিন রাজ্যের কোন প্রাচীন অংশের নাম নীলকুণ্ড ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, উপরি উক্ত মুদ্রা পান্ড্য রাজাদের সমসাময়িক। কথিত আছে, নীলকুণ্ডের রাজারা এখনকার ইংরাজী "নোট" (Currency note) সমতুল্য এক প্রকার "নোট" চালাইয়াছিলেন, তাহা কাগজ, বৃক্ষ-বল্কল, পশু চর্ম্ম অথবা বৃক্ষ-পত্রে নির্ম্মিত হইত না; সুবর্ণের মোটা ও চওড়া এবং চতুষ্কোণ পাতা, নোটরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বা অন্য ব্যাঙ্কের ধাতু-আলয়ে যাঁহারা "চাঁদীর ইট" অথবা "সোণার ইট" দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে নীলকুণ্ডের রাজাদের সোণার নোট বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। এই নোট স্থূলাকৃতি ছিল এবং ইহার উপরে মূল্য ব্যতীত আর কিছু খোদিত থাকিত না। যতটা ধাতুর মূল্য, ঠিক ততটাই ইহার মূল্য ছিল। ষ্ট্রাবো সাহেব তদনন্তর কন্যাকুমারীর উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাঁর মতে অতি প্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন এবং স্বর্ণের শঙ্খকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতেন। পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা ত্রিবাঙ্কুড় গমন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, ত্রিবাঙ্কুড়ের মুদ্রায় এখনও শঙ্খ মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং তথাকার রাজার "রাজকীয় চিহ্নের" (Royal Insignia) নাম শঙ্খমূর্ত্তি। ষ্ট্রাবো সাহেব লিখিয়াছেন, "Comar is a town on the southernmost point of the island. It possesses a species of convent where persons of both sexes, devoting themselves to celibacy, are engaged in the performance of religious rites in honour of a goddess." অর্থাৎ কুমার (কন্যাকুমারিকা) সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আছে, এই আশ্রমে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অবিবাহিত থাকিয়া দেবীর সাধন করিয়া থাকে।" এখনও কুমারিকা অন্তরীপে কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির এবং ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুমারিকা অন্তরীপ এখন স্বতন্ত্র রাজ্য নহে, ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজের শাসনাধীন। সমুদয় মালাবার উপকূল, ত্রিবাঙ্কুড়, কোচিন, প্রাচীন জামোরীণ রাজ্য ও কন্যাকুমারীর রাজকীয় চিহ্ন এখনও শঙ্খমূর্ত্তি এবং রাজার টাকাতেও শঙ্খমূর্ত্তি খোদিত থাকে। নীলকুণ্ডের পরেই যখন কুমারীকন্যা অন্তরীপের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তখন প্রাচীন নীলকুণ্ড, আরব্য সাগর উপকূলস্থিত কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল, সন্দেহ নাই। বার্ব্বারেশীকস্ নামক আর একজন গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন, তিনি ভারতের এক পার্ব্বত্য প্রদেশে জঙ্গলাবৃত রাজ্যে হিন্দুরাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ রাজার টাকায় গর্দ্দভ মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। গ্রীশীয় পণ্ডিত বিবেচনা করেন, ঐ রাজা ধোবা (রজকজাতীয়) ছিল। রাজ্যের অধিবাসী সম্বন্ধে সাহেব লিখিয়াছেন It is a region of terrors and prodigies. A particular class of people with flat noses, and another with horses' heads ; they feed on human flesh, অর্থাৎ, "এই দেশ অত্যন্ত ভয়ানক এবং অত্যদ্ভুত। এখানে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের নাক চ্যাপ্‌টা ; আর এক সম্প্রদায়ের লোকের মাথা ঠিক ঘোড়ার মস্তকের মত ; ইহারা নরমাংস ভক্ষণ করে।" সাহেব, কোন্ দেশের কথা লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে তিনি নিশ্চয় করিয়া লিখিয়াছেন। এই রাজ্যের টাকা সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহা vasa murhina (অর্থাৎ মৃণ্ময় অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত।) আমরা এ পর্য্যন্ত কোথাও মাটির বা পাথরের মুদ্রার কথা শুনি নাই এবং পাঠও করি নাই, সুতরাং বার্ব্বারেশীকশ পণ্ডিতের উক্তির অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই। আমার স্মরণ হইতেছে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে যখন আমি গুজরাট প্রদেশে পুরাতন বরোগাজা (বর্ত্তমান নাম ব্রোচ্) নগরে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন এক হিন্দুর বাটীতে একটা পর্ব্বোপলক্ষে কথকতা শুনিতেছিলাম ; কথক ঠাকুর একখানি অতি পুরাতন পুঁথি পড়িয়া তাহা বুঝাইতেছিলেন। একস্থানে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, গুজরাটী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে তাহার অর্থ এইরূপ হয় ;—

সোণার টাকায় আর পার নাহি পাড়ে।
রূপার টাকার বোঝ্, ঝোড়া ঝোড়া ছাড়ে॥
অকুলানে তামার টাকা দেয় লাখে লাখ।
অবশেষে মাটির মুদ্রা আনে বাঁকে বাঁক্॥

অর্থাৎ, এক সময়ে এক নরপতি এক যজ্ঞ করিয়া প্রথমে সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতেছিলেন ; মুদ্রা সংকুলান না হওয়ায় রৌপ্যের টাকা দান করা হইতে লাগিল। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন তামার পয়সা দিতে আরম্ভ করিল। যখন পয়সায় আর কুলায় না, তখন বাঁশের বাঁকে করিয়া রাশি রাশি মাটির টাকা আনিয়া দান করিতে লাগিল। ব্রোচ্ সহরে আমি আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম মাটির টাকার কথা শুনিয়াছিলাম, ইহা রূপক কি না জানি না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কোথাও মৃণ্ময় মুদ্রার প্রসঙ্গ পড়ি নাই বা শুনি নাই।

পাঠান বীর শেরসাহ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫৪২ অব্দে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন, উক্ত টাকার পরিমাণ সাড়ে এগার মাসা ছিল। মুসলমানদের আমলে বোধ হয় এই প্রথম রৌপ্য মুদ্রা। সম্রাট্ আকবরের শাসন সময়ে রৌপ্য মুদ্রার ওজন ১৭৯৫ ট্রয় গ্রেণ (Troy grains) পর্য্যন্ত হইয়াছিল, ইহার যাবনিক নাম "জিলালী" ; কিন্তু মোগল রাজত্বের যতই প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, রৌপ্য মুদ্রার ওজন ততই হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। আকবরের উত্তরাধিকারীদিগের সময়ে টাকার ওজন ১৭৫ গ্রেণ মাত্র ছিল। এই সময়ে আলাহাবাদ, সুরাট, দিল্লি, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও টান্‌ডা—এই অষ্ট নগরে টাঁকশাল ছিল ; তথায় কেবল টাকা মুদ্রিত হইত। আগ্রা, আহাম্মাবাদ ও কাবুলে হিরণ্ময় মুদ্রা নির্ম্মিত হইত, এতদ্ভিন্ন

আরও ২৮টি নগরে টাঁকশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে ক্রমে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে সুবাদারগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন এবং দেশমধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রায় নিজ নিজ পৃথক্ টাঁকশাল ছিল। ১৬৬৪ অব্দে শিবজী স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামে টাকা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ-আলম (দ্বিতীয়), ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলে উক্ত কোম্পানী ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ আলমের সপ্তদশবার্ষিক রাজত্ব প্রতিপাদক টাকা প্রচলিত করেন এবং অন্যান্য স্থানের সংগৃহীত টাকা গলাইয়া ফেলেন। কোম্পানীর প্রথম মুদ্রিত টাকাই সিক্কা টাকা। ইহার পরিমাণ ও মূল্য মোগলদিগের মুদ্রার সমান। এই সময়ে সুরাটের মুদ্রিত টাকা বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে ব্যবহৃত হইত। ইহার পরিমাণ সতর শত তিরাশি গ্রেণ, কিন্তু বিশুদ্ধ রজত ১৬৯ গ্রেণ মাত্র। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সাহাব সনন্দ অনুসারে রাজা বলবন্ত সিংহ বারাণসীতে টাঁকশাল নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই রামনগরের (কাশীর রাজধানীর) বর্ত্তমান রাজবংশের প্রথম রাজা। ইহাঁর মৃত্যুর চারিবর্ষকাল পরে ১৭৭৪ অব্দে বারাণসীধাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়, কিন্তু টাঁকশাল ১৭৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত তত্রত্য রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত ছিল। ১৮২৯ অব্দে বারাণসীর টাঁকশাল বন্ধ হয়। কাশীর টাকার পরিমাণ ১৭৫ গ্রেণ। এখানে পয়সাও মুদ্রিত হইত। তাহাতে ত্রিশূল অঙ্কিত থাকিত বলিয়া "ত্রিশূলী পয়সা" নামে তাহা আখ্যাত হইত। ১৮০২ অব্দে ফতেগড় নগরে ফতেগড়ী টাকা মুদ্রিত হইত। ইহার পরিমাণ প্রথমে ১৬৫ গ্রেণ ছিল, কিন্তু ১৮১৯ অব্দে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৮০ গ্রেণ করা হয়। বিশুদ্ধ রৌপ্যের ভাগ সমান ছিল। ১৮২৪ অব্দে ফতেগড় টাঁকশাল বন্ধ হয়। ইহার স্থাপনাবধি ৭, ৭৫, ৪২, ১১৪ টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারস্থ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা গড়মণ্ডলী পরগণার সাগর নামক স্থানে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোম্পানী এই টাকা ব্যবহার করিতেন। ১৮২৪ অব্দে আর একটি মুদ্রালয় স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৫ অব্দে তাহার কার্য্য বন্ধ হয়। মহিসুর ও দাক্ষিণাত্যে পর্টুগিজ প্রভৃতি সেকালের আদি ইউরোপীয় জাতিগণ প্যাগোডা নাম্নী মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিল, ইহা ইউরোপে নির্ম্মিত হইত, একটি প্যাগোডার মূল্য প্রায় সাড়ে তিন টাকা। ১৮১৮ অব্দে মাদ্রাজে টাকা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় প্যাগোডার প্রচলন হ্রাস হইয়া যায়। মাদ্রাজী টাকার পরিমাণ ১৮০ গ্রেণ, ইহাতে বিশুদ্ধ রজত ১৬৫ গ্রেণ মাত্র। ১৮০১ হইতে ১৮৩৩ পর্য্যন্ত কলিকাতা, বারাণসী, ফরেক্কাবাদ ও সাগর টাঁকশালে মোট ৫২৫৮ ১৭০৫৮ টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। বারাণসীর মুদ্রালয় ১৮২৯ অব্দে বন্ধ হয়। তাম্রনির্ম্মিত পয়সা ও ডবল পয়সা কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাঁকশালায় প্রস্তুত হইত। কড়িও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাঁকশালার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মুদ্রালয়ের কার্য্য শেষ হইতে প্রায় সপ্তবর্ষ সময় যাপিত হইয়াছিল। বোম্বের টাঁকশালা ১৮৩০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ টাঁকশালে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৯ অব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখে উক্ত

মুদ্রালয় বন্ধ রাখিবার আদেশ হয়। ১৮৩৮ অব্দ হইতে সিক্কা টাকার প্রচলন রহিত হইয়া যায়। এই সময়ে রৌপ্য ধাতুতে সিকি, আধুলি ও ডবল টাকা নির্ম্মিত হইত। ডবল টাকার মূল্য দুই টাকা; এখন এই টাকা আর নাই এবং প্রস্তুতও হয় না। টাকার পরিমাণ ১৮০ গ্রেণ ছিল, ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ রৌপ্য ১৬৫ গ্রেণ থাকিত। সুবর্ণ ধাতুতে ১৮০ গ্রেণের মোহর প্রস্তুত হইত, তাহাতে বিশুদ্ধ সোণা ১৬৫ গ্রেণের অধিক থাকিত না। মোহরের মূল্য ১৬৲ টাকা ছিল। ডবল মোহরের মূল্য ৩০৲ টাকা, আধুলি (সোণার) ১০৲ টাকা এবং সিকি (সোণার) ৫৲ টাকা। ক্রমে ক্রমে সোণার মুদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাম্র পয়সার পরিমাণ একশত গ্রেণ ছিল। তাম্র ধাতুতে ডবল পয়সা এবং পাই প্রস্তুত হইত। দুয়ানী মুদ্রা অনেক দিন পরে অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে দেশীয় রাজগণের মুদ্রালয়ে টাকা ও মোহর প্রস্তুত হইত; তাহাতে সকল স্থানের টাকা ও মোহর এক মূল্যের না থাকা বশতঃ সর্ব্বসাধারণে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিত, এইজন্য ১৮৪৩ অব্দে নূতন আইন মতে কোম্পানীর টাকা সর্ব্বত্র প্রচলন করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৮৪৭ অব্দ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশ বর্ষ কাল মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত দুই কোটি দ্বিষষ্টি লক্ষ টাকার মোহর, একশত নবতি কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রা এবং পঞ্চকোটি সপ্তনবতি লক্ষ টাকার তাম্র মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এক কোটি "সভারণ" (বিলাতী স্বর্ণ মুদ্রা) বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল।

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সমসাময়িক সুবর্ণ মুদ্রা বিদেশে রপ্তানী হইত বলিয়া বোধ হয়। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার "বিলাসিতা" প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন "রোমান ডিনারি বা স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আসিত এবং ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার রোমরাজ্যে প্রচলন ছিল; রোমীয় মহিলাগণ সাতিশয় অলঙ্কার প্রিয়া ছিলেন।" ইত্যাদি। ধাতুতত্ত্ববিদ্ সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেফেয়ার সাহেব বিলাতের উইন্‌চেষ্টার হল সোসাইটি নাম্নী সভায় একদা বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের হিরণ্ময় মুদ্রায় রাজার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত না, কিন্তু রোম রাজ্যের কোন সুবর্ণ মুদ্রাই নরপতির মূর্ত্তিবিহীনাবস্থায় প্রচলিত হইত না। তিনি আরও বলেন, মনুষ্য-সমাজে ব্যাধ, পশুপালক, কৃষক ও শিল্পী এই চারি শ্রেণীর লোক সর্ব্বপ্রথমে বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিল, এই জন্য ব্যাধেরা আদিকালে পশুর লোম, চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতি মুদ্রারূপে বিনিময় কার্য্যে ব্যবহার করিত। চীন সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী টারটরী প্রদেশের স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ জমাট চা-এর চাকৃতি, হাট বাজারে টাকা রূপে একদা ব্যবহার করিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিত। আবিসিনিয়া দেশে পুরাকালে যখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না, তখন তদ্দেশের লোকেরা পার্ব্বত্য মাটিতে প্রস্তুত অথবা সমুদ্র জলে প্রস্তুত লবণ দ্বারা ক্রয় বিক্রয়াদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিত। পুরাতন লাশিডামশ রাজ্যে লৌহের মুদ্রার প্রচলনের কথাও প্লেফেয়ার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে কড়ির ব্যবহার এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বৈদিক যুগে গবাদি পশু সমূহ ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ঐতরেয়ে ব্রাহ্মণের শুনঃশেকের উপাখ্যানে লিখিত আছে, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, আজিগর্ত্তের পুত্রকে এক শত গো দ্বারা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বলি দিবার জন্য প্রাণের মূল্য স্বরূপ আর এক শত

গরু দিয়াতিলেন। "তং হোবাচ ঋষেহং তে শতং দদাম্যহ মেষা মেকেন কেবল।" ইত্যাদি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সপ্তম পঞ্চিকা, ৩৩ দ্রষ্টব্য।) এই শ্লোকান্তর্গত "শতং দদামি" স্থলের ব্যাখ্যায় টীকাকার সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন "গবাং শতং।"

বর্ত্তমান যুগে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ দেশে যে টাকা প্রচলিত দেখা যায়, তাহার পঞ্চ রূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের টাকায় চতুর্থ উইলিয়মের মূর্ত্তি দেখা যায়। তদনন্তর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন মূর্ত্তি আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী স্বয়ং শাসন ভার গ্রহণ করিলে পর যে মুদ্রা প্রচলিত হয়, ইহাতে মহারাণীর মুকুট সমাযুক্ত ছবি ও তাঁহার নাম স্পষ্টাক্ষরে খোদিত ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার ভারত-রাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণের পরে যে টাকা মুদ্রিত হয়, তাহাতে মহারাণীর মুকুটসমাযুক্ত মূর্ত্তি ও "সাম্রাজী ভারতেশ্বরী (এম্প্রেস্ ভিক্টোরিয়া)" এইরূপ খোদা ছিল। পঞ্চমতঃ মহারাণীর মৃত্যুর পরে সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিলে, এডওয়ার্ডের মূর্ত্তি ও নাম সমাযুক্ত মুদ্রার প্রচলন হয়। তাহাই এখন চলিতেছে। সম্রাটের মাথায় মুকুট নাই। বর্ত্তমান সম্রাটের আমলে নিকেল্ ধাতুর "একানি" চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে আর কোন কালে একানী চলে নাই এবং মুদ্রিতও হয় নাই।

প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদের শাসনকালে এই নিয়ম ছিল যে, যে ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায় অথবা তাঁহার রাজোপাধি থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রচলিত টাকা বা মোহর, রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে প্রচলিত থাকিত, কিন্তু ঐ রাজার মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতির পরে অন্য রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পরে নূতন টাকা মুদ্রিত হইয়া গেলে, পুরাতন টাকাগুলি কেবল ধাতুর মূল্যেই বিক্রীত হইত; যথা—রাজা শ্যামচাঁদের আমলের টাকায় যদি মূল্য স্বরূপে "দেড় টাকা অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার শাসন সময়ে উহা প্রায় সার্দ্ধৈক মূদ্রার মূল্যেই চলিত, কিন্তু রামচাঁদের রাজত্ব কালে শ্যামচাঁদের সমসাময়িক মুদ্রার মূল্য কেবল ধাতুটার মূল্যানুসারে বিক্রীত হইত, এবং খাদ ও "বানি" বাদ দিয়া অনেক কম মূল্যে লোকেরা গ্রহণ করিত। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজি আমলে এই প্রথা কখনও রক্ষিত হয় তাই। এখানে চতুর্থ উইলিয়মের টাকা, কুইন ভিক্টোরিয়ার টাকা আর সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের আমলের টাকা একই মূল্যে চলে এবং বিক্রীত হয়। কোম্পানীর আমলের টাকায় ১৮৩০ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী সাল প্রায়ই দেখা যায় না। ১৮৩০ সালের টাকার সংখ্যাও কম হইয়া আসিয়াছে, তাহা কদাপি দেখা যায়। অধিকাংশ পুরাতন টাকায় ১৮৪০ সাল লিখিত আছে। এই "সাল" শব্দে খৃষ্টীয় অব্দ বুঝিতে হইবে। ১৮৪০ হইতে ১৮৫১ অব্দ পর্য্যন্ত টাকার আকার কিছু বাড়িয়াছিল, কিন্তু ১৮৬১ অব্দে পুনরায় পূর্ব্বমত আকারে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন টাকার সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে। পুরাতন টাকাগুলি টাঁকশালায় গলাইয়া নূতন টাকা তৈয়ার করিবার আদেশ জারী হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ রৌপ্যের টাকা আজি কালি প্রায়ই পাওয়া যায় না। জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে একদা আসল খাঁটি রূপার টাকা প্রস্তুত হইত, সেই পুরাতন টাকা হস্তগত হইলে খাঁটি রজতের টাকা দেখিতে

পাওয়া যায়। ইংরাজের আমলের টাকা খাদে পরিপূর্ণ। কোন কোন সময়ে ষোল আনায় পাঁচ আনা খাদ দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ তিন আনা, অথবা তের পয়সার কমে খাদ থাকে না। বলা বাহুল্য, দেশীয় রাজাদের টাকায় যে পরিমাণে আজি কালি খাদ মিশান হয়, ইংরাজী সরকারের টাকায় তাহার অনেক অধিক পরিমাণে খাদ দেওয়া হইয়া থাকে। বহুবর্ষকাল টাকা ব্যবহার করিলে, টাকা ক্ষয় হইয়া যায় সত্য, কিন্তু ক্ষয়ের পরিমাণ সামান্য। একশত বৎসরে প্রতি টাকায় গড়ে এক আনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টাকার ধারে ধারে কাটা কাটা রেখা থাকে বলিয়া ক্ষয়ের পরিমাণ কম হয় এবং অপর লোক কর্ত্তৃক কৃত্রিম মুদ্রা প্রচলনের আশঙ্কাও কম হইয়া থাকে। এখনকার কালের সমুদয় হাল্‌কা টাকা, নাইট্রিক আসিডের সংস্পর্শে দ্রব হইয়া যায়। একটি মাটির বাসনে তীক্ষ্ণ নাইট্রিক আসিড রাখিয়া তাহাতে দুই তিন মিনিট পর্য্যন্ত একটি রৌপ্য মুদ্রা ডুবাইয়া রাখিলে প্রায় আড়াই আনা রূপা কমিয়া যায়। অনন্তর আসিড্‌কে জলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে তামার পাত রাখিলে ঐ পাতে রূপা লাগিয়া যায় এবং তাহা সহজে বাঁধিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে টাকা অত্যন্ত ব্যবহার বশতঃ বহু পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা অন্য কারণে ওজনে খুব কমিয়া গিয়াছে. গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাহা কাটিয়া চিহ্নিত করিয়া দেন এবং টাঁকশালায় গলাইয়া নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের আদেশ দেন। পুরাতন অথচ অত্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত টাকার মূল্য এইরূপ—পনের আনার উর্দ্ধ হইলে পূর্ণ এক টাকা মূল্য দিবার ব্যবস্থা আছে। চৌদ্দ আনা হইতে পনের আনার মধ্যে ওজন হইলে ১৪ আনা; তের আনা হইতে চৌদ্দ আনার মধ্যে হইলে তের আনা এবং বার আনা ও তের আনার মধ্যে হইলে বার আনা দেওয়া হয়। টাকা যদি বার আনার ওজনের কম হয়, তাহা হইলে সে টাকা বাজারে বা ব্যাঙ্কে চলিবার নিয়ম নাই। এইরূপ মুদ্রার সাধারণ মূল্য সাড়ে আট আনা মাত্র। প্রতি বর্ষে বা প্রত্যেক পঞ্চ বৎসরে, টাঁকশালায় কত টাকা মুদ্রিত হয়, তাহার হিসাব রাখিবার জন্য এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব আকাউন্‌টেণ্ট্‌ জেনেরল পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত এফ্‌, বি, হারিশন সাহেব একটি সহজ সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা এই;—মনে কর, একটি মৃণ্ময় কলসের মুখ পর্য্যন্ত টাকা দ্বারা পূর্ণ করা হইল। কলস মধ্যে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা তুমি জান না; উহাতে কত সংখ্যা টাকা আছে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এইরূপে একশত বা এক সহস্র কলস যদি সমান আকৃতির ও সমান ওজনের হয় এবং ইতঃপূর্ব্বে যদি তুমি তাহাতে টাকা রাখিয়া দেখিয়া থাক, প্রতি কলসে অমুক সংখ্যা টাকা থাকিতে পারে, তাহা হইলে ঐ কলসের অভ্যন্তরস্থিত টাকার সংখ্যা জানা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয় না। ওজন করিয়া পরিমাণ করা অপেক্ষা কলসের মাপ দ্বারা সংখ্যার পরীক্ষা করা সহজতর ও নির্ভুলতর হইয়া থাকে। কিন্তু মুদ্রা সমূহের এবম্প্রকারে সংখ্যা নিরূপণ করিবার প্রথা ইউরোপীর আমলে নূতন হইয়াছে তাহা নহে, হিন্দু রাজাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহা অতি পুরাতন নিয়ম। উজ্জয়িনী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা, ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতবৃন্দ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার একটিতে "উজেনীয়" শব্দ খোদিত আছে, ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভের প্রায় দুইশত বৎসর কাল পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার অক্ষরের ভাষা ব্রাহ্মী। উজ্জয়িনীতে কেবল

টাকা মুদ্রিত হইত তাহা নহে, রত্নাদি পরীক্ষার জন্য রীতিমত রাজকীয় কার্য্যালয় (অফিস) ছিল এবং এই বিদ্যায় ছাত্রদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। টাকার ও মোহরের সংখ্যা নিরূপণ জন্য রীতিমত কল নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। (Archaslogical Survey of India. Vol. X. IV. P. 148). ঐ উজ্জয়িনী যে মালবের রাজধানী এবং কালিদাসের মেঘদূতোক্ত উজ্জয়িনী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থে লেখা আছে, অতি পুরাতন যুগ হইতে উজ্জয়িনীর গ্রাম্য নাম উজেনি। যথা—"উজেনি তে পি চু কুমালে। হেমবতথ শিলাত্যেপি"। (Senart's Indian Antiquary. vol. XIX. (1900). Page 85). কান্যকুব্জ নগরের সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের মুদ্রার পার্শ্বতী, মহাদেব, মহাদেবের ত্রিশূল, হৈমবতী বাহন সিংহ প্রভৃতির প্রতিরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, ইহারা শৈব ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে এই বংশোদ্ভূত বসুদেব নামক নরপতি এক প্রকার ত্রিকোণাকার সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে হরপার্শ্বতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা গিয়াছে। এই টাকা রাখিবার জন্য তখনকার রাজারা মাটির নীচে কোষাগার নির্ম্মাণ করিতেন এবং ইহার ওজন ও সংখ্যা নিরূপণ জন্য বড় বড় লৌহ "গাম্‌লা" তৈয়ার করিয়া তাহাতে টাকা রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া লইতেন। পঞ্জাবের মুলতান, করাচি, কুশলগড় প্রভৃতি অঞ্চলে এক সময়ে যৌধেয় নামক জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের রাজার মুদ্রায় ষড়মুখবিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের রাজা কে ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। প্রবাদ আছে, কার্ত্তিকেয় চালুক্য রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন। গুপ্ত রাজাদের সমসাময়িক কোন কোন মুদ্রার ময়ূরের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। ময়ূর, কার্ত্তিকের বাহন; তবে কি গুপ্ত রাজগণ চালুক্য বংশের অধীন ছিলেন? রঘুবংশের ১।৪ শ্লোকে "বংশেস্মিন" শব্দে গুপ্ত বংশকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতে "অস্মিন্" নিকটস্থ বস্তুর প্রতি ব্যবহৃত হয়, দূরের বস্তু হইলে "তদ্‌" হইত। ইহাতে বোধ হয়, চালুক্য বংশ ও গুপ্ত বংশ এক বংশাবতংশ অথবা নিকটবর্ত্তী রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। মহাকবি কালিদাস বোধ হয় নিজে কার্ত্তিকের ভক্ত ছিলেন, রঘুবংশ তাহার প্রমাণ।

খৃষ্টীয় ১৮৩৪ অব্দ হইতে ১৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত বৃটীশ ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কত টাকা, টাঁকশালায় মুদ্রিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।

বৎসর		টাকার সংখ্যা
১৮৩৫ হইতে	১৮৪৪ অব্দ	দুই ক্রোড় দুই লক্ষ
১৮৪৫ হইতে	১৮৫৪ ঐ	দুই ক্রোড় চারি লক্ষ
১৮৫৫ হইতে	১৮৬৪ ঐ	অষ্ট ক্রোড় দুই লক্ষ
১৮৬৫ হইতে	১৮৭৪ ঐ	চারি ক্রোড় অষ্টলক্ষ
১৮৭৫ হইতে	১৮৮৪ ঐ	ছয় কোটি মাত্র
১৮৪৫ হইতে	১৮৯৩ ঐ	অষ্ট কোটি তিন লক্ষ
১৮৯৪	...	এক কোটি দুই লক্ষ
১৮৯৫	...	এক কোটি ২১ লক্ষ
১৮৯৬	...	এক কোটি ৮৬ লক্ষ
১৮৯৭	...	এক কোটি ২৯ লক্ষ
১৮৯৮	...	দুই কোটি ৫১ লক্ষ
১৮৯৯	...	দুই কোটি ৪ লক্ষ
১৯০০	...	দুই কোটি ৫৬ লক্ষ
১৯০১	...	দুই কোটি ৫৩ লক্ষ
১৯০২	...	দুই কোটি ৬১ লক্ষ
১৯০৩	...	দুই কোটি ৮৩ লক্ষ
১৯০৪	...	দুই কোটি ৭ লক্ষ

বৎসর	টাকার সংখ্যা
১৯০৫ হইতে ১৮৯৩ অব্দ	ছয় কোটি ২৮ লক্ষ
১৯০৬ ...	৭ কোটি ১৷৷০ লক্ষ
১৯০৭ ...	অষ্ট কোটি পঞ্চ লক্ষ

গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর গত বর্ষের বজেট্ আলোচনায় বলিয়াছিলেন, সমুদয় ভারতবর্ষে ১৮৯৮ অব্দের পূর্ব্বে কখন একেবারে ১৩০ কোটি মুদ্রার অধিক মজুদ ছিল না, কিন্তু এখন ১৫৭ কোটি পর্য্যন্ত টাকা ব্যবহৃত হইতেছে।

মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তনারম্ভকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপীয় প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ স্থানে মুসলমান ও হিন্দু শাসনকর্ত্তাদের টাঁকশালা ছিল, নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকায় "বঙ্গদেশ" অর্থে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বেহার, ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণা বুঝিতে হইবে।

স্থানের নাম	জিলা।
পাটনা	পাটনা
রাজসাহী	রাজসাহী
ডমরাউন	সাহাবাদ
বক্সার	ঐ
জনকপুর	দ্বারভাঙ্গা
সিলাও	বাঁকিপুর
দ্বারবঙ্গ	দ্বারবঙ্গ
সমস্তিপুর	ঐ
মুঙ্গের	মুঙ্গের
ভাগলপুর	ভাগলপুর
কোরিডি	ডুম্কা
ঘাটশিলা	চৈবাশা
পঞ্চকোট	মানভূম
বরাভূম	ঐ
বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান
মগলমারী	ঐ
গড়মান্দারণ	হুগলী
স্থানের নাম	জিলা।
কাটোয়া	বর্দ্ধমান
ইন্দ্রহাস (বর্ত্তমান নাম ইঁদাশ)	বাঁকুড়া
বনবিষ্ণুপুর	ঐ
মানিয়াড়া	ঐ
বক্তিয়ারপুর	পাটনা
টীকারী	গয়া
পাড়াস্থো	হুগলী
পাণ্ডুয়া	ঐ
মাহানাদ	ঐ
জাহানাবাদ (বর্ত্তমান নাম আরামবাগ)	ঐ
গড়বেতা	মেদিনীপুর
মেদিনীপুর	ঐ
বগ্ড়ী	ঐ
মুর্শীদাবাদ	মুর্শীদাবাদ
বীরভূমি	সিউড়ী
হেতামপুর	ঐ
গড়ভবানীপুর	হাবড়া
ঢাকা	ঢাকা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
হোশ্নাবাদ	চব্বিশ পরগণা
গৌহাটী	গৌহাটী
কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম
মালদহ	মালদহ
রাজমহল	ডুম্কা
পাকুড়	ঐ
ছাপরা	সারণ
সাহাবাদ	আরা
সাসারাম	ঐ
বিহার	পাটনা
কটক	কটক
খুর্দ্দা	পুরী
নবদ্বীপ	কৃষ্ণনগর

আমি আমার বহুবর্ষকালব্যাপী ভ্রমণ কালে নানাস্থানে নানাপ্রকার প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগের মুদ্রা দর্শন করিয়াছি। এই

সকল মুদ্রার আকার এক প্রকার নহে, মূল্য ও ধাতুও এক নহে, সুতরাং ওজনও সমতুল্য নয়। এখনকার কালের ও প্রাচীন কালের প্রায় ৩৫৯ প্রকার মুদ্রা দেখিয়াছি; এখনকার কালের মুদ্রা সমূহ সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন সময়ের মুদ্রা প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য। অর্থাভাবে আমি সকলগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই; যেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার মধ্যেও অনেকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সমসাময়িক সুবর্ণ মুদ্রায় নক্ষত্রের চিহ্ন (অথবা মূর্ত্তি) দেখিয়াছি; মাহানাদ হইতে সংগৃহীত মুদ্রায় শিবমন্দিরের মূর্ত্তি খোদা আছে। পাণ্ডুয়ার মসিদ প্রাঙ্গণ হইতে যে টাকা ও পয়সা পাইয়াছি, তাহাতে ঘণ্টা-চিহ্ন আছে। এই পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত। জনকপুর হইতে পইয়া, লাটসহী ও লহরীয়া নামক তিন প্রকার পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথের (দেওঘরের) মহকুমার অনেক গ্রামে তিল্মুরীয়া, কোম্পানীয়া ও গোরখ্পুরীয়া পয়সা পাইয়াছিলাম। কোম্পানীয়া অর্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পয়সা নহে; ওলন্দাজদিগের পয়সা। গোরখ্পুরীয়া পয়সা, বেহার অঞ্চলে প্রচলিত, এখন কার ঢেবুয়া পয়সা নহে, ইহাতে কাইথী হিন্দি অক্ষরে সন খোদা আছে। অন্যান্য অক্ষর পড়া যায় না। এই পয়সা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন। ঢেপুয়া পয়সা কেবল তাম্রের চাক্তী মাত্র, তাহাতে কিছু খোদা থাকে না। নেপাল হইতে কাঁচ্চা, ঠুব্রী ও লৌইয়া পয়সা আনিয়াছিলাম। লৌইয়া পয়সা লৌহ ধাতুতে নির্ম্মিত। এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদিগের রাজ্যে এখনও নানাপ্রকার মূর্ত্তি সমাযুক্ত পয়সা, টাকা ও মোহর দেখা যায়। এইগুলি আধুনিক।

অসভ্য সাঁওতাল জাতির মধ্যে এক সময়ে এক প্রকার তাম্র পয়সা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দ হইতে ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত সাঁওতালেরা দুম্কা, চৈবাসা, সিংহভূম, মানভূম, রাঁচি, পুরুলিয়া প্রভৃতি বহু স্থানে ইংরাজের বিদ্রোহী হইয়া ঘোরতর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। এই দশ বৎসরকাল ব্যাপী বিদ্রোহে বহু ইংরাজ সৈনিক, দেশীয় সিপাহী, ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এবং নিরীহ গৃহস্থ নিহত ও ধ্বংস হইয়া যায়। রাশি রাশি অর্থ ও সৈনিকজীবন নষ্ট করিয়া এই বিদ্রোহী সাঁওতালদিগকে দমন করিতে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর 'হিম্শিম্' খাইয়াছিলেন। ইহাদের অধিনায়কের নাম ছিল—আমাচি মাঝি। দুম্কা জেলান্তর্গত দেওঘর মহকুমার অধীনে এক জঙ্গলাভ্যন্তরে ইহার আড্ডা ছিল। এই ব্যক্তি বিদ্রোহ সময়ে যে তীর ধনু ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার আকার শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ধনুকটা প্রায় ২৭ হাত লম্বা এবং তীরগুলি ৫ হাতের কম নয়। ধনুকের হাতার উপরে তাহাদের টাকার ছবি খোদা ছিল। আমি বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে আমাচি মাঝির বংশধরের সহিত তাহাদের গ্রামে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং যদিও ঐ বৃহদাকার ধনু দেখিতে পাই নাই, কিন্তু সাঁওতালী পয়সার ছবি দেখিয়াছি। তাহা চতুষ্কোণবিশিষ্ট; উহা ঢালাই করা তামা; উপরে মুর্গীর মূর্ত্তি দেখা যায়। ঐ ধনুকটা অন্য গ্রামে এখনও আছে; সাঁওতালেরা ফুল, চন্দন ও সিন্দুর দিয়া তাহা নিত্য পূজা করে এবং প্রতি বৎসর সাঁওতালেরা অতি দূর স্থান হইতে আসিয়া তাহা (তীর্থক্ষেত্রস্থ মন্দিরবৎ) দর্শন করিয়া যায়। আমাচি মাঝির হাতের ছোট তীর ধনু এবং তাহার তৈল রাখিবার লোহার "বাটী" ও যুদ্ধের লৌহ কুঠার আমি খরিদ

করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহাতে পয়সার মূর্ত্তি নাই। সাঁওতাল বীর ও অধিনায়ক এবং সাঁওতালরাজাধিরাজ আমাচির ঐ সকল দ্রব্য আমার নিকটে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অন্নদা।

(১)

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায়, তিনিও অধ্যক্ষ মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, এবং একজন দীর্ঘশিখাযুক্ত, নামাবলিপরিহিত ভট্টাচার্য্যের বংশধর হইলেও, বিধবা বিবাহটাকে হিন্দুশাস্ত্রের দৃঢ়বদ্ধ সীমার ভিতর আনিবার জন্য, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সহপাঠিগণের সহিত তুমুল বাক্যান্দোলন উপস্থিত করিতেন। এই সকল বাক্যান্দোলন কালে তাঁহার উৎসাহ-অগ্নি এরূপ প্রজ্বলিত হইত যে, তিনি অবলীলাক্রমে বলিতেন, যদি কোন ধর্ম্মোৎসাহী যুবক তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হ'ন, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি আপন পত্নীকে অবিলম্বে বিধবা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিতরূপ কথোপকথন কলিকাতায় "মেস্"এর বাসাতেই সংঘটিত হইত। পল্লিগ্রামের বাটীতে হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সধবা সহধর্ম্মিণী, সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে এমন একটা ঝটিকা উৎপাদন করিতে পারিতেন যে, তাহাতে পত্নীকে বিধবা করিবার উজ্জ্বল আশাটী জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি পত্নীকে কোন ক্রমেই বিধবা করিতে পারেন নাই। বরং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও এবংবিধ নানা উৎকট উপসর্গসমাকুল জীবনটা এমন আশ্চর্য্যভাবে জীবিত ছিল যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশবপুরের স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে পঁয়ত্রিশ টাকা মাসিক দরমাহ পাইতেন, তাহার দ্বারা দুইবার অন্নধ্বংসকারিণী, ইলিস মৎস্যের মুণ্ড ও কাৎলা মৎস্যের পুচ্ছাভিলাষিণী এবং অন্যের অলঙ্কার দর্শনে অসূয়াপরতন্ত্রা সধবা পত্নীকে তিনি কোনমতে স্বামিভক্তি শিক্ষা দিতে সক্ষম হইতেন না। হায়! তিনি কেন অলঙ্কারবিরাগিণী, একান্নরতা, মৎস্যবিরতা বিধবা বনিতা বিবাহ করেন নাই?

ফলতঃ তাঁহার সংসার প্রথমতঃ কষ্টে, তৎপরে অতি কষ্টে চলিয়া, শেষে একবারে অচল হইয়া পড়িল। এই সময়, তাঁহার একটি আত্মীয়, তাঁহাকে সুবুদ্ধি দিবার অভিপ্রায়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার পিতা কিরূপে সংসার চালাইতেন? তিনি ত চাকুরি করিতেন না।"

এই প্রশ্নের পর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েক দিন ক্রমান্বয়ে ভাবিয়াছিলেন, "তাইত, বাবা কি ক'রে সচ্ছলে সংসার চালাইতেন? তিনি ত চাকুরি করিতেন না।" ভাবিয়া, ভাবিয়া, তিনি বিধবা বিবাহের আন্দোলনটি এবং চাকুরিটি জন্মের মত পদ্মার জলে ফেলিয়া দিয়া, গঙ্গা পার হইয়া, বর্দ্ধমান

জেলায় আপন পল্লিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তথায়, এক উত্তমর্ণের নিকট পৈতৃক বাস্তবাটী বন্ধক রাখিয়া, তিন শত রজত মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিয়াল্লিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল; ঐ টাকার কতকাংশ ব্যয় করিয়া তিনি তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইল, পৌষ মাসে কৃষিলব্ধ শস্যরাশি, গৃহের পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের শোভা সংবর্দ্ধন করিল। এই কৃষিলব্ধ দ্রব্য হইতে বৎসরের আহারের জন্য পর্য্যাপ্ত ধান্য এবং গৃহসংস্কার ও গাভীর জন্য পর্য্যাপ্ত বিচালী রাখিয়া, তিনি বাকী সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিদধিক তিন শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা তিনি নিম্নলিখিতরূপে ব্যয় করিলেন।

(১) খিড়কীর পুষ্করিণী সংস্কার	৩০৲
(১) গাভী খরিদ	৩৫৲
(৩) ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০৲
(৪) গৃহসংস্কার জন্য মজুরী	২৫৲
(৫) বস্ত্রাদি	৪০৲
(৬) ৩০০৲ টাকার আট মাসের সুদ	১৮৲
(৭) মসলাদি	৩২৲
(৮) ঋণ পরিশোধ	১০০৲
	৩১০৲

বাগানের উদ্বৃত্ত তরকারি ও রবিশস্য যাহা বৈশাখ মাসে বিক্রীত হইল, তাহার মূল্যে নূতন বৎসরের কৃষিকার্য্যের ব্যয় ও গৃহস্থালীর অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বিঘ্নে সংকুলিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরের শুভ পৌষ মাসে—আহা! যে গৃহিণী এই শুভ মাসটিকে বিদায় দিবার সময় করুণ কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন, "এস পোষ যেও না," তাঁহার নথালঙ্কৃত মুখে, ফুল চন্দন কিনা রসগোল্লা পড়ুক। সেই শুভ পৌষে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গণ, পুনরায় সুবর্ণবর্ণ শস্যসম্ভারে, অত্যন্ত সুশোভিত হইয়া উঠিল। আবার অনাবশ্যক ধান্যাদি বিক্রীত হইল, এবং তিন শত চল্লিশ টাকা সংগৃহীত হইল। এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় করিলেন।

(১) গৃহিণীর জন্য দুই ছড়া মুড়কি মাদুলি ওজন ৩॥০ ভরি ২৩৲ হিসাবে	৮০॥০
(২) ঐ পাটয়ারের খরচা	॥০
(৩) ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০৲
(৪) গৃহিণীর জন্য বালুচরের চেলি	১৯৲
(৫) অন্যান্য বস্ত্রাদি	৩৮৲
(৬) শুইবার ঘরে বিলাতি মাটীর মেঝে	৫৪৲
(৭) ২০০৲ টাকার এক বৎসরের সুদ	১৮৲
(৮) ঋণ পরিশোধ	১০০৲
	৩৪০৲

রবিশস্য, বাগানের তরকারি এবং পুষ্করিণীর মৎস্য বিক্রয় করিয়া, নব বৎসরের প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার উপর, কয়েকটা শ্রাদ্ধের পণ্ডিত বিদায়ে নিমন্ত্রিত হইয়া, চারিটা ঘড়া, দুইটা গাড়ু এবং নগদ প্রায় ৬০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধোপার্জ্জিত শেষোক্ত ষাটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার সিঁড়িটি ইষ্টকনির্ম্মিত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং প্রথমোক্ত তিন শত টাকা হইতে, চণ্ডীমণ্ডপে বিছাইবার জন্য দুইখানি সপ মাদুর ও একখানি সতরঞ্চ খরিদ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বৎসরের কৃষিজাত দ্রব্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি সংকুলান করিয়াছিলেন।

(১) গৃহিণীর জন্য সোণার তাবিজ ৪ তোলা মায় মজুরী ২৩৲ হিসাবে	৯২৲
(২) রূপা বাঁধা হুকা ১টি	১২৲
(৩) ঐ হুকার বৈঠক	২৷৷০
(৪) ভৃত্যের বৎসরের বেতন	৩০৲
(৫) ১০০৲ টাকার এক বৎসরের সুদ	৯৲
(৬) বস্ত্রাদি	৪৫৲
(৭) দ্বিতীয় গাভী খরিদের ঋণ পরিশোধ	৩০৲
(৮) ঋণ পরিশোধ	১০০৲
	৩২০৷৷০

পূর্ব্বে আমরা এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, যে তিনি ঋণমুক্ত হইলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবেন; এবং গৃহিণীও আশা করিয়াছিলেন যে, তদুপলক্ষ্যে ত্রিবেণীর বাজার হইতে, দুইখানি কাল পাথরের "খোরা" এবং দুগ্ধ রাখিবার জন্য একটি বড় রকম "ক্ষীরুরে" বাটী ক্রয় করিবেন। কিন্তু, কার্য্যতঃ ঋণমুক্তির পর এ সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। অনুমান করি, অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। না ঘটিলে, সেই চঞ্চলা গৃহিণী চাবিমুখরিত বস্ত্রাঞ্চল মুখে দিয়া কমললোচনের দুই বিন্দু বারির দ্বারা এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিতেন যে, "বিবাহ বিভ্রাটে"র মিসেস্ কারফর্ম্মা দুই খণ্ড বরফ ঘর্ষণে তেমন অগ্নি উৎপাদনে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ বৎসরে, প্রচুর বৃষ্টিপাত অভাবে বর্দ্ধমান জেলায় 'অজন্মা' হইল। যে সামান্য ধান্য উৎপন্ন হইল, তাহাতে সংসারের খরচ মাত্র অতি কষ্টে চলিল। সে বৎসর আর গৃহিণীর অলঙ্কার হইল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃষিজীবনের পঞ্চম বর্ষে, আবার প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল। তাহার অল্পমাত্র বিক্রয় করিয়া ভৃত্যের বেতন দেওয়া হইল। বাকী সমুদয় দুর্ব্বৎসরের জন্য সঞ্চিত করা হইল। এবারও গৃহিণী নূতন অলঙ্কার পরিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ বৎসরের টাকা নিম্নলিখিতরূপে খরচ হইল।

(১) গৃহিণীর জন্য কণ্ঠমালা একছড়া তিন তোলা ২২৲ হিঃ	৬৬৲
(২) গৃহিণীর জন্য রূপার গোট (ত্রিশ বৎসর বয়সেও গোট পরিবার সাধ! ছি!)	১৮৲
(৩) গৃহিণীর জন্য সোণার নথ	১০৲
(৪) চাকরের বেতন (মাসিক চারি আনা হিসাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল)	৩৩৲
(৫) বস্ত্রাদি	৪০৲
(৬) পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমী খরিদ	১৫০৲
	৩১৭৲

সপ্তম বৎসরে.....

কিন্তু এই সময় আমার এক বন্ধু, আমার হস্ত হইতে লেখনীটি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন "ছি ছি! তুমি করিতেছ কি? একটা কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের আয়-ব্যয়ের তালিকা লিখিয়া, তোমার পাঠকের ধৈর্য্যকে যে একবারে প্রপীড়িত করিয়া তুলিলে।" সমাপ্তির ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধুবরের অনুরোধে আমার গল্পের প্রথম অধ্যায়ের অত্যন্ত অযথা উপসংহার এই খানেই করিতে হইল।

(২)

সালঙ্কৃতা গৃহিণী এবং গৃহ-দুগ্ধ-পুষ্ট পুত্র-কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েক বৎসর পরম সুখে জীবন যাপন করিলেন। সুখনিদ্রা ও সুআহার দাতা সংসারটি তাঁহাকে অত্যন্ত সচ্ছন্দে রাখিয়াছিল। এবং "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" এই কবিবাক্যটা যদি অত্যন্ত সত্য না হইত, তাহা হইলে বোধ করি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও দুঃখ পাইবার কারণ থাকিত না।

গ্রামের হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ জমীদারের অর্থানুকূল্যে তিনি আপন বাটীতে একটি সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করিলেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পাঠাভিলাষী ছাত্রগণ আসিয়া, অনুস্বরযুক্ত শব্দের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নীরব গৃহটি ঝঙ্কারিত করিয়া তুলিল। জমীদার বাবু প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাদ্দিকে যে ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহটি প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ বাস করিতে লাগিল। ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক হইত, জমীদারদিগের এবং গভর্ণমেণ্টের মাসিক বৃত্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংকুলান হইতে লাগিল। অধিকন্তু টোল সংস্থাপনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্যান্য অর্থাগমের পথ বিশেষরূপে সুগম হইল। শ্রাদ্ধাদিতে পণ্ডিত বিদায়ের আয়টা অনেক গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ব্রতনিয়ম ও পূজাপার্ব্বণে, গ্রামের এবং গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিস্মরণ হইতেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চারি পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটি সর্ব্বকনিষ্ঠা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন টোল খুলিয়াছিলেন, তখন সে কন্যার বয়স তিন বৎসর। তখন সে পিতার দিকে আপন ছোট হাত দু'খানি তুলিয়া ধরিলে, গৃহিণী বলিতেন, "দেখ, দেখ, তোমার কাছে হাত তুলে বালা চাচ্ছে।" এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি গৃহিণীর এ সাধ পূর্ণ করিলেন। দুই ভরি টুক্‌টুকে সোণা দিয়া, সেই নধর হাত দু'টিতে দুই গাছি বালা পরাইয়া দিলেন।

অসচ্ছল অবস্থা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সচ্ছল অবস্থায় চারি পুত্রের পর একটি কন্যা হওয়ায়, কন্যাটির বড় বেশী আদর হইল। এবং গৃহিণী ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, সেই আদরিণী কিরূপে গঞ্জনাদায়িনী ননদিনী এবং বউকাঁট্‌কী, চোখখাকী, পোড়ারমুখী শ্বাশুড়ী সমন্বিত শ্বশুরবাটীতে, গৃহানুলেপন করিয়া, যজ্ঞের রন্ধনকার্য্য একাকী সম্পন্ন করিয়া অবস্থিতি করিবে। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ও প্রিয়তমা প্রাজ্ঞীর মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার স্বতঃসিদ্ধ ফল এই হইল যে, কন্যার যাহাতে দ্বিরাগমন না হয়, তিনি তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিলেন। টোলের একটি মাতাপিতৃহীন বালকের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, তাহাকে গৃহাধিষ্ঠাতা জামাতা করিয়া রাখিলেন।

যখন এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইল, তখন কন্যার বয়স সাত বৎসর মাত্র। মেজ দাদার মুণ্ডনের সময়, সাময়িক সানাই-ধ্বনি-বিনিন্দিত ক্রন্দনের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া জনক জননী যে মস্তকটি মুণ্ডিত করিয়াছিলেন, তখন তাহা হইতে কেশোদ্গম হইয়া, কন্যার স্কন্ধমাত্র আবৃত করিয়াছিল। মূষিকবিবরবিক্ষিপ্ত দন্তের স্থানটি নবাগত দন্তের দ্বারা তখনও সম্যক্ অধিকৃত হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদরিণী কন্যার নাম অন্নদা। আর যে ছাত্রের সহিত তাহার

বিবাহ হইয়াছিল, তাহার নাম শ্রীমান্ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

শশিভূষণ সুন্দর, পাঠানুরত এবং জামাতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু তাহার বয়স বার বৎসর মাত্র। গৃহ-জামাতা হইবার সুখটা সেই অল্প বয়সে সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের জামাতা হইয়া, সে যে সুখের প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহা বোধ করি, সে সবটুকু প্রাপ্ত হয় নাই। পুত্রস্থানীয় হইলেও, বুঝি গৃহিণী তাহাকে পুত্রগণের ন্যায় আদর করিতে পারিতেন না। তাহার আহারের ব্যবস্থা বুঝি পুত্রগণের অনুরূপ হইত না। জ্যেষ্ঠ শ্যালকটি মৎস্য মুণ্ডের উপর যেরূপ নির্ব্বিবাদ অধিকার সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা তাহার সকল সময় পছন্দ হইত না। সে বুঝি মনে করিত, জামাতারও কদাচিৎ তাহাতে অধিকার থাকা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। এবং সময় সময় রঘুবংশের টীকার মধ্যে এই "প্রাংশু-লভ্য" মৎস্যমুণ্ডটা এমন আশ্চর্য্যভাবে প্রবেশ লাভ করিত যে, মৎস্যমুণ্ডের অস্থি-যুক্ত টীকাটি কণ্ঠস্থ করা একান্ত দুরূহ হইয়া পড়িত। টীকা ও মৎস্যমুণ্ড 'বাগার্থের' ন্যায় 'সম্পৃক্ত' হইয়া, 'বাগার্থ-প্রতিপত্তির' পক্ষে বিশেষ বাধা উপস্থিত করিত। তাহার 'প্রদীপার্চ্চির' ন্যায় বুদ্ধিটি 'দশান্ত' প্রাপ্ত হইত।

বিবাহের পর, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি শশিভূষণ দুঃখের পারে আসিতে পারিল না। প্রতি দিন নূতন নূতন অবজ্ঞা অনুভব করিতে লাগিল। কেবল শ্বশুর বা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অনাদর পাইলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু শশিভূষণ দেখিল যে, তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া পত্নীও তাহাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ও মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সে বৃথায় পত্নীকে স্বামিভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিল। প্রত্যুষে সে পাপীষ্ঠা রন্ধনগৃহের নিরুপদ্রব কোণটিতে বসিয়া, ভর্ত্তার আহারের বহুপূর্ব্বেই আহার কার্য্য সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে, 'পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র' ইত্যাদি বলিয়া, শশিভূষণ যখন অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত নিজের কবিতাটির ছন্দ-শুদ্ধি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিত, প্রেয়সী অন্নদা তখন নিতান্ত পাপিয়সীর ন্যায়, মাতার অঞ্চলাশ্রয়ে পলায়নের উদ্যোগ করিত। রাত্রে, অনর্গলিত দ্বারগৃহের মধ্যে শয়ন করিয়া, একটি মল-মুখরিত-শ্রীচরণ-ধ্বনি শুনিবার জন্য শশিভূষণ যখন বিশেষরূপে জাগ্রৎ থাকিত, তখন অন্নদা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অভেদ্য দুর্গসম গৃহের অভ্যন্তরে শুইয়া, অত্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত থাকিত।

বয়ঃক্রমে, শশিভূষণ ষোড়ষ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল; এ বয়সে, পিতাও পুত্রকে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে চাণক্যের শাস্ত্রানুযায়ী বাধ্য। এই বয়সে, তাহার আপনার বিবাহিতা স্ত্রী কি না তাহার সহিত মিত্রতা না করিয়া শত্রুতা করিল। এ অবজ্ঞা, তাহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। মেঘ-দূত-পড়া শশিভূষণ, না জানি বিছানায় শুইয়া কত শ্লোকই আবৃত্তি করিত। সে……।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আবার আমার লেখনীর গতিরোধ করিয়া দিলেন; বলিলেন, "তুমি যদি একটা টোলের ছাত্র ও একটা কাঁদুনে মেয়ের কথা দিয়া তোমার গল্পটা পূর্ণ করিয়া ফেল, তাহা হইলে, তোমার আর লিখিবার আবশ্যক নাই।" তবে, হে বালক শশিভূষণ! অয়ি দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা অন্নদা! তোমরা চলিয়া যাও। চারি বৎসর পরে, প্রদীপ্ত যৌবন লইয়া আসিও; আসিয়া আমার এই অন্ধকার আখ্যায়িকা আলো করিও।

(৩)

চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বালিকা অন্নদা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী হইয়াছে। তাহার দন্ত বিকশিত না থাকিলেও, শশিভূষণ তাহার মুখাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে যে, তাহা তাহার নথ-বিদ্ধ মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল;—মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দন্ত বলিলে, তোমরা যেন বুঝিও না, সেই মুক্তা বর্দ্ধমানের মহারাজের কণ্ঠ-হারের মুক্তার ন্যায়। সেরূপ বিশাল মুক্তাদন্ত নিশাকালে উন্মুক্ত করিলে, আমরা বাঙ্গালী, আমরা ত কম্পিত-কলেবর হইবই; বোধ হয়, পূর্ব্ববঙ্গবিজয়ী গুর্খা পল্টনগণও রণবিমুখ হইবে। সে দন্ত মুক্তার ন্যায়; কিন্তু সে মুক্তা আমার বালিকা কন্যার নলকের মুক্তা অপেক্ষা ছোট। আর সেই চুল, একদিন যাহা গ্রীবার সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই, তাহা এক্ষণে কবি ভারতচন্দ্র যাহার সহিত মেদিনীর তুলনা করিয়াছেন তাহার, এবং যুবক শশিভূষণের ধৈর্য্যের সীমা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহা কদ্রুর সহস্র সর্প-পুত্রগণ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত, ইন্দ্রাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। দাঁত ও চুল ছাড়া, যুবতী অন্নদার আর যাহা কিছু বর্ণনীয় ছিল, আমরা তাহার বর্ণনা হইতে বিরত রহিলাম। তোমরা ভাল ভাল উপন্যাস হইতে তাহা দেখিয়া লইও।

পিতৃ-অন্ন-প্রতিপালিত সুলভ স্বামীটিকে অন্নদা যে ভালবাসিত না, এমত নহে। তাহার হৃদয়ে প্রেম ছিল; কিন্তু বিরহে যে আগ্রহের অগ্নি সৃষ্ট হয়, তাহার প্রেমে তাহা ছিল না। বিচ্ছেদব্যথিতারা, প্রণয়াবসরে যে পূজার দ্রব্য সঞ্চিত করিবার সুবিধা পাইত, বেচারা অন্নদার অদৃষ্টে সে সুবিধা ঘটে নাই। দৈনিক ক্ষুদ্র পূজায় সব ব্যয় হইয়া যাইত; একটা মহাপূজায় স্বামীকে সুখী করিতে পারে নাই। শশিভূষণের বন্ধুগণ বৎসরান্তে শরৎকালের মহাপূজার সময় বাটী আসিয়া, সঞ্চিতপ্রেমা শরদেন্দুনিভাননাদিগের নিকট যে মহাপূজা প্রাপ্ত হইত, সে মহাপূজা শশিভূষণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাদের অনিদ্র নিশীথের অসহ্য প্রেম-কাহিনী শশিভূষণ নীরবে সহ্য করিত।

কিন্তু সকলেরই সহ্যের একটা সীমা আছে। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট মৎস্যমুণ্ড এবং পত্নীর নিকট প্রেম না পাইয়া, হতভাগ্য শশিভূষণ একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর একটা তুচ্ছ ঘটনায় শ্বশুর মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া, সে নিভৃতে অন্নদার নিকটও অত্যন্ত তিরস্কৃত হইল। সেই দিন রাত্রের আহারাদির পর শয়নকক্ষ-প্রবেশোন্মুখ শশিভূষণকে দেখিয়া ক্রোধান্বিতা অন্নদা, অশুভক্ষণে, বলিয়া ফেলিল, "আমার বাবাকে যে মন্দ কথা বলিয়াছে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাহি না।" বলিয়া, ভিতর হইতে কক্ষের অর্গল বদ্ধ করিয়া দিল।

মানুষের মনের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। এমত নহে যে, গৃহজামাতা শশিভূষণ পত্নীর নিকট পূর্ব্বে আর কখন রূঢ় কথা শুনে নাই। পূর্ব্বে এমনই রূঢ় কথা সে বহুবার শুনিয়াছিল। শুনিয়া ক্ষুব্ধমাত্র হইয়া সে তাহা সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু আজ—আমরা ত বলিয়াছি মানুষের মনের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না—আজ শশিভূষণ পত্নীর তিরস্কার সহ্য করিতে পারিল না। বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অশ্রুরাশিতে শশিভূষণের চক্ষু দুইটি ভাসিয়া গেল।

অর্গল বদ্ধের সময় অন্নদা চকিত নেত্রে সে অশ্রুপ্লাবন দেখিয়াছিল। কিন্তু অভিমানিনী স্বামীকে গৃহাভ্যন্তরে আসিবার জন্য আহ্বান করে নাই।

শশিভূষণ গৃহদ্বারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করিয়া অশ্রুজলে কপাটগাত্র সিক্ত করিল। বুঝি রুদ্ধকণ্ঠে দুইবার অন্নদাকে ডাকিয়াছিল। কিন্তু অন্নদা সে আহ্বানে উত্তর দেয় নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

তথায় কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুপ্লাবিত এক খণ্ড কাগজের উপর লিখিল,—"অন্নদা, তুমি আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ, তাই তোমায় ছাড়িয়া চলিলাম। ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। ইতি। শশী।"

অর্দ্ধরাত্রে যখন অন্নদার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে অভ্যাসবশতঃ নিদ্রালস বাহুটি স্বামী-অঙ্গ-স্পর্শ লালসায় প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু বিছানায় ত কেহ নাই। স্বামীকে যে সে বিদায় করিয়া দিয়াছে। সে যে আর তাহার মুখ দেখিবে না। মূর্খা! তুমি আপনার মন বুঝিতে পার নাই।

অন্নদা মনে করিল, "বুঝি এখনও কক্ষ-দ্বারে তাহারই অনুগ্রহ-প্রতীক্ষায় শশী দাঁড়াইয়া আছে।" সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, দরজা খুলিয়া, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। কই? কেহ ত নাই!

অন্নদা বিছানায় আসিয়া শুইল। কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রাসুন্দরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। স্বামীর ন্যায়, তাহাকেও কি বাহিরে রাখিয়া, অন্নদা কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়াছিল? তা, নিদ্রা যাক্। এত গাত্র জ্বালা কোথা হইতে আসিল? বিছানাটা যেন সহস্র বিছার ন্যায় অন্নদাকে দংশন করিতে লাগিল। বিছানা ত্যাগ করিয়া, সে বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিল। নীল আকাশে নীরবে তারাসকল জ্বলিতেছিল। আর তারাসকলের মধ্যবর্ত্তী ও কি? বল দেখি অন্নদা, ও কি? শশি?—শশি, শশি, শশি! আকাশের শশি! তুমি কি অন্নদার শশীর চেয়ে সুন্দর?

সে রাত্রি প্রভাত হইল। অন্নদা কক্ষের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিল। দুই একটা কাক এবং মাতাকে ছাড়া সে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না;—তখন অন্য কেহ উঠে নাই। অন্নদার মাতা বলিলেন, "এত সকালে কেন উঠিলে? যাও আবার শোও গে। শশী কি বাহিরে উঠিয়া গিয়াছে?

অন্নদা। সে বাড়িতে ঘুমায় নাই।

মাতা। কেন?

অন্নদা। বাবার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রেছিল ব'লে, আমি রাগ ক'রে, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলাম।

মাতা। বেশ ক'রেছিলি।

মা ত অন্নদাকে গালি দিল না। বলিল "বেশ ক'রেছিলি।" "বেশ ক'রেছিলি"—কথাটা অন্নদার মোটেই ভাল লাগিল না। হায়! তাহাকে কি কেহ নিন্দা করিয়া গালি দিবে না? নিন্দা ও গালি বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহার অঙ্গে বর্ষিত হইলে, বুঝি তাহার অঙ্গ কিছু শীতল হইত।

সূর্য্য উঠিল;—তবে কি শশীকে দেখিবার আশা অন্নদা ত্যাগ করিবে? গৃহের যেখানে যত উন্মুক্ত পথ ছিল, তাহার ভিতর দিয়া, দিকে দিকে অন্নদা অনুসন্ধান-দৃষ্টি পাঠাইয়া দিল। তাহা বহির্বাটীর প্রত্যেক নিভৃত কোণটী অনুসন্ধান করিয়া, নিরাশাবনত হইয়া গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা বন্দনার পর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শশী কোথায় গেল? তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন?" গৃহিণী বলিলেন,—"সে কাল রাত্রে বাহিরে শুইয়াছিল; বোধ হয় বাহিরেই আছে।" "না, তাহাকে ত বাহিরে দেখি নাই।" "তবে বোধ হয় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে।"

গৃহের ভিতর অন্নদা ছিল; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে মাতাপিতার কথা শুনিতেছিল। সহসা তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া গেল; অঞ্চলবস্ত্রে সে জল নিবারিত হইল না। রুদ্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে সে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "না মা, আমি জানালা হইতে দেখিয়াছি সে কোথাও বেড়াইতে যায় নাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, আমি খুঁজিয়া দেখিতেছি, কোথায় গেল।"

এইরূপে শশিভূষণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। প্রথমে একে ওকে সামান্যভাবে জিজ্ঞাসা করা হইল; তাহার পর, সূর্য্যের তাপ যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অনুসন্ধানের তেজও তেমনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু শশিভূষণকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। যাহারা বলিয়াছিল যে, আহারের সময় শশী নিশ্চয়ই প্রত্যাগত হইবে, তাহাদের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হইয়া গেল।

রাত্রি আসিল। সে কি রাত্রি, তা' অন্নদাই জানে। সে রাত্রি নিদ্রা আসে নাই, বিশ্রাম আনে নাই;—আনিয়াছিল উপাধান-সিক্ত-কারিণী অশ্রুধারা। বুকে, যেখানে বড় জ্বালা, অন্নদা সেই স্থানে প্রলেপস্বরূপ, একখণ্ড কাগজ বিছাইয়া রাখিয়াছিল। অভাগিনীর সেই প্রথম ও সেই শেষ প্রেম-পত্র—শশিভূষণের পাঠগৃহে প্রাপ্ত সেই ক্ষুদ্র লিপি।

দুই দিন পরে, ক্রমান্বয় অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারা গেল, তাহা অতি ভয়ানক! অতি লোমহর্ষণ! কয়েকজন আত্মীয়ের পরামর্শে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, থানাগৃহের বাহিরে, কয়েকজন লাল পাগড়ির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া একটি শব পতিত রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতে এই শব উদ্ধৃত করা হইয়াছিল; মৎস্য বা অন্য কোন জীবে ইহার মুখের কিয়দংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, ইহা তাঁহারই জামাতা শ্রীমান্ শশিভূষণের মৃতদেহ।

যথাসময়ে বাটীতে সংবাদ আসিল। অন্নদা মাতার সহিত ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইয়া ক্রন্দন করিল।

(৪)

তখনকার মেয়েরা, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলার ঘন বৃক্ষলতাদিপরিবেষ্টিত, সভ্য জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি পল্লীগ্রামের মেয়েরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পড়িয়া এই তত্ত্বটি অবগত হইতে পারে নাই যে, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। পণ্ডিতগণের যুক্তিপূর্ণ তর্ক অপেক্ষা, স্বপ্নের অসংলগ্ন প্রলাপে তাহারা তখন অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিত। অন্নদা কি এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে স্বপ্নের কথা আর কাহাকেও সে বলে নাই। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখিয়াই সে বলয় বা রঞ্জিতপ্রান্ত বস্ত্র পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ ছিল।

কন্যাকে বৈধব্য-আচারে বিরতা দেখিয়া, কন্যামনবিদিতা মাতা সহজেই মনে করিলেন, বুঝি সে স্বামীর মৃত্যুঘটনাটা সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারে নাই; বুঝি তাহাকে জীবিত মনে করিয়া বৈধব্য আচারে তাহার অকল্যাণ করিতে সে সাহসী হয় নাই। কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে মাতা যাহা ভাবেন, অন্য লোকে তাহা ভাবে না। পল্লীবাসিনী সকলে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অন্নদার বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল।

অন্নদা নিন্দার ভয় রাখিল না; বস্ত্র ও

বলয় সম্বন্ধে বৈধব্য আচার পালনে বিরত রহিল।

চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে আর শশিভূষণের কথা মোটেই মনে করিতেন না। ইহার জন্য তোমরা তাঁহার নিন্দা করিও না। সময় প্রতিদিন যে প্রলেপ অনুলেপন করিতেছিল, তাহাতে চারি বৎসর পরে শোকের ক্ষতের চিহ্নমাত্র না থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু শশিভূষণের কথা না ভাবিলেও তিনি প্রিয়তমা একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা অত্যন্ত ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লুপ্ত বাল্যসংস্কারগুলি আবার আস্তে আস্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। কন্যার দুঃখ দেখিয়া, বিশেষতঃ তাহাকে বৈধব্য-আচারে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, তাহাকে পুনরায় বিবাহিত করিবার ইচ্ছাটি এমন প্রবলভাবে তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল যে, সমাজের অনুশাসন তাহা কোনক্রমে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দুই এক জন আত্মীয় এবং বন্ধুর নিকট গোপনে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার কন্যার পুনঃ বিবাহ দেন; এবং পরাশর সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত; এবং কন্যাও বোধ হয় ঐরূপ বিবাহে অমত করিবে না। তাঁহার প্রমাণ বা যুক্তিগুলি সংস্কার-সমাচ্ছন্ন বন্ধু বা আত্মীয়গণ অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার গোপনীয় কথাগুলি, তালপুকুরের ইষ্টকময় অবতারণীর সান্ধ্য-সম্মিলনীতে, গাত্রমার্জ্জনকারিণী, ছি-ছি-নিনাদিনী, গণ্ডস্থস্তকরতলা অবলাগণ কর্ত্তৃক, ভৈরবনাদে পরদিন যে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত—অত্যন্ত নিশ্চিত।

গ্রামের লোকে, বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্যের নিতান্ত আত্মীয় এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অত্যন্ত গোপনে যে সকল শুভ কথার আলোচনা করিলেন, তাহার প্রভাবে টোলের ছাত্রগণ সহসা অধ্যাপকের মূর্খতা অনুভব করিতে পারিল; গ্রামের মহানুভব জমীদার মহাশয় সহসা অর্থাভাব অনুভব করিলেন। ছাত্রগণ অন্যত্র চলিয়া গেল; জমীদার মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিলেন। শ্রাদ্ধাদিতে পণ্ডিত বিদায়ের নিমন্ত্রণ রহিত হইয়া গেল। অধিক কি, গ্রামে ব্রত-নিয়ম-উপলক্ষে যে ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, তাহাতেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিমন্ত্রিত হইলেন না। গ্রামবাসিনী কুঞ্চিত নাসা ভামিনীগণের শ্লেষ-প্রজ্বলিত চক্ষুগুলি, অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের ন্যায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণীর এবং কন্যার বহির্গমন নিষেধ করিয়া দিল।

কিন্তু এরূপ শাসনে পৃথিবীর কেহ কখন শাসিত হয় নাই, শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শাসিত হইলেন না। তিনি যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার সংকল্প ততই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। বিধবা কন্যাকে অতি সত্বর বিবাহিত করিবার জন্য, তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। যে গৃহিণী একদিন তাঁহাকে কটাক্ষে শাসন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সে দিন ছিল না, তথাপি তিনি স্বামীর পদতলে পড়িয়া বার বার মিনতি করিলেন, তাহাতেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিচলিত হইলেন না।

এ সম্বন্ধে গৃহিণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আরও কিছু বলিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্নদা সেই স্বপ্নের কথা ভাবিয়া, তাহাতে বাধা দিল। বলিল, "মা, তুমি

বাবাকে কিছু বলিও না। ভগবান্‌কে ডাক, যাহা ভাল তাহা তিনিই করিবেন।"

অন্নদা, চারি বৎসরকাল ক্রমাগত ভগবান্‌কে ডাকিয়াছে। গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ডাকিয়াছে। বসিয়া ডাকিয়াছে, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ডাকিয়াছে। উঠিতে বসিতে শুইতে করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, "হে ভগবন্, হে ঈশ্বর, হে দীনবন্ধু, দয়া করিয়া, নরকের তীব্র—অনন্ত অগ্নিতে এ স্বামিঘাতিনীকে দগ্ধ কর, তোমার চক্রে এ পাপিনীকে নিষ্পেষিত কর। যে জিহ্বা স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা, হে মধুসূদন! ছিঁড়িয়া ফেল, খণ্ড খণ্ড কর, নরকের অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ কর। দাও নাথ! পাঠাইয়া দাও, যমদণ্ডধারী দূতগণকে পাঠাইয়া দাও; তাহারা এ পাপ দেহ দণ্ড প্রহারে নিপীড়িত করুক।"

মাতা গৃহান্তরে চলিয়া গেলে আজ আবার অন্নদা ভগবান্‌কে ডাকিল। অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া, অনাবৃত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া ডাকিল। তাহার পর গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হইল।

গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া, অন্নদা বিপদোদ্ধারকামিনী হইয়া যখন বার বার মধুসূদনকে ডাকিতেছিল, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে বসিয়া, কন্যাকে পুঃ বিবাহকামিনী জানিয়া, বিধবা-বিবাহ-কামী, হিন্দু সৎপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। কেহই তাঁহাকে বুঝাইতে পারে নাই যে, তাঁহার কন্যা বাস্তবিক বিবাহকামিনী নহে। কন্যার কাতর ও সজল চক্ষুও তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিতে সক্ষম হয় নাই।

তৎকালে, বিধবা-বিবাহকামী পাত্র পাওয়া একবারে অসম্ভব ছিল। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার কতকগুলি বাল্য বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে হইল। তাঁহারা একটি পাত্রের সন্ধান দিল। তিনি ইংরাজি-পোষাকপরা শিখাশূন্য হিন্দু। তাঁহার এক ভগিনীপতি বিলাত গিয়াছিল, এ জন্য, কোনও হিন্দু পরিবার তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সাহসী হয় নাই। এবং তাঁহার মাসিক আয় দুইশত টাকার কম ছিল, এজন্য কোনও সমাজসংস্কারাভিলাষিণী বিদুষীও তাঁহাকে বিবাহ করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই। উপরোক্ত দুইটি কারণে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও পাত্রটির বিবাহ হয় নাই। তিনি একটি "সব ডেপুটী"; তাঁহার নাম শ্রীমান্ ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ "মিষ্টার ডি, মুখার্জি," এই নামে অভিহিত হইতে ভালবাসিতেন।

কি পদমর্য্যাদায়, কি বিদ্যায়, কি রূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে সৎপাত্র বিবেচনা করিলেন। কিন্তু ইহাঁকে সৎপাত্র বিবেচনা না করিলে, তিনি সে সময়, আর পাত্রান্তর পাইতেন না।

(৫)

হিমালয় অঞ্চলে গিরিগাত্রের এক স্থান ছায়াসমাকুল। বুক, কটুস, কাপাসীয়া প্রভৃতি বৃহৎ পার্ব্বত্য বৃক্ষসকল সুশীতল ছায়া ঢালিয়া সেই স্থানটিকে বড় মনোরম করিয়া রাখিয়াছিল, এবং পল্লবপরিপূর্ণ শাখাবাহুর দ্বারা একটি বৃহৎ গুহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

এই গুহামধ্যে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তোমরা তাঁহার নাম বহুবার শুনিয়াছ। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-যোদ্ধা দন্ডুপন্থ। ইতিহাসে তিনি নানাসাহেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। তোমরা যদি শুনিয়া থাক যে, ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁহার ইহজীবন শেষ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে কথা বিশ্বাস

করিও না। যদি শুনিয়া থাক, দন্ডুপন্থ মূর্খ ছিল, তাহা হইলে তাহাও বিশ্বাস করিও না। তিনি বানপ্রস্থ্য অবলম্বন করিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শেষ জীবনে জ্যোতিষের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতারক ছিলেন না, প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যদি নরহত্যাকারী বল, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রত্যেক বীরপুরুষকে নরহত্যাকারী বলিও। যাঁহার জন্য সহস্র সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারিয়াছিল, যিনি বহু লোকের পূজা পাইয়াছিলেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। আমরা গল্প লিখিতে বসিয়াছি, ইতিহাস লিখিতে বসি নাই; সুতরাং এস্থলে তাঁহার বিচিত্র জীবনকাহিনী বর্ণনীয় নহে।

গুহার বাহিরে এক পুরাতন পিপ্পলি বৃক্ষের ছায়ায় একখণ্ড পরিষ্কৃত শিলাখণ্ডের উপর দন্ডুপন্থ বসিয়াছিলেন। শিষ্যগণ আহারীয় আহরণার্থে সপ্ত ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিল। কেবলমাত্র একজন শিষ্য তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতেছিল। তোমরা যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, দন্ডুপন্থের নিকট আজ যে শিষ্যটি বসিয়াছিল সে অন্য কেহ নহে, সে আমাদের পরিচিত শশিভূষণ।

চারি বৎসর পূর্ব্বে থানাগৃহের সম্মুখে যে শব দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার জামাতার মৃতদেহ, তাহা প্রকৃতপক্ষে অপর কোনও অপরিচিত, অনুদ্দিষ্ট পথিকের মৃতদেহমাত্র। শশিভূষণ যে মৃত হয় নাই, এক স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা, তাহা অন্নদাকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

শশিভূষণ সন্ন্যাসী সাজিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিল। ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা-জানা নবীন সুরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষা অত্যন্ত সহজ হইয়াছিল। ভ্রমণ-ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভলালসায় যখন সে কোনও বৃক্ষতলে উপবেশন করিত, তখন কৌতূহলাক্রান্ত গ্রাম্য স্ত্রীরা ভক্তিগদগদচিত্তে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইত। কেহবা শোভনস্থালীতে, ফলমূল মিষ্টান্নাদি সুশোভিত করিয়া শশিভূষণের আহারার্থ লইয়া আসিত। কেহ বা প্রণামীর স্বরূপ কিছু মুদ্রা আনিয়া দিত। শশিভূষণ শ্বশুরালয়ে যে আদর পায় নাই, শ্বশুরবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, সে আদর বহির্জগতে অত্যন্ত সুলভ;—কেবল মাত্র একখানি গৈরিক বস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে পারিলেই হইল।

এক বৎসরকাল নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে গোরক্ষনাথসন্দর্শনাভিলাষী কতকগুলি সন্ন্যাসীর সহিত শশিভূষণ নেপাল রাজ্য পর্য্যটন করিয়াছিল। অবশেষে দন্ডুপন্থের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তথায় তাঁহার নিকট সে ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় উত্তম রূপ শিক্ষিত হইল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও কতক কতক জ্ঞানলাভ করিল। তথাপি মধুলোলুপ ছিন্নপক্ষ ভ্রমরের ন্যায়, তাহার লাঞ্ছিত মনটি অন্নদার আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। আবার তাহাকে দেখিতে পাইবার জন্য সে বারবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত।

শশিভূষণকে আহ্বান করিয়া দন্ডুপন্থ কহিলেন, "বৎস! তুমি স্বদেশে ফিরিয়া যাও, তোমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ কর, ইহাতে মঙ্গল হইবে।"

শশিভূষণ বলিল, "প্রভো! আমি স্ত্রীকে

ত্যাগ করিয়া আসি নাই, আমি তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছি।"

দন্ডুপন্থ। এক্ষণে তুমি পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমার স্ত্রী ক্রোধবশে যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য সে ক্ষমার যোগ্য। জ্ঞানহীনা অজ্ঞানে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য যদি তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যনামের অযোগ্য।

শশিভূষণ দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিল। পরদিন প্রত্যূষে দন্ডুপন্থ তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ ও পাথেয়স্বরূপ দুই শত আশরফি দিয়া বিদায় দিলেন। শশিভূষণ স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিল। সংসারবিরাগী আবার সংসারের পথে ফিরিল।

প্রেম তুমি অজেয়; তোমার জয় হউক। শত শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া কাতরা অন্নদা, প্রেমের যে কাতর আহ্বান পাঠাইয়াছিল, সে আহ্বান শশিভূষণের সমস্ত হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল; করিয়া, তাহা অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কি মধুর আকর্ষণের বশে শশিভূষণ সংসারের পথে ফিরিয়াছিল? যে শক্তিতে পূর্ণিমার চাঁদ সমুদ্রের বক্ষ বিচলিত করে, চন্দ্রমুখী অন্নদা বুঝি তদপেক্ষা অধিক শক্তিতে শশিভূষণের হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত করিয়াছিল। এ আহ্বান, এ আকর্ষণ উপেক্ষা করা শশিভূষণের সাধ্যাতীত। তবে, যাও শশিভূষণ! তুমি গুরুদেবের আদেশ পাইয়াছ,—আশ্রম মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংসারাশ্রমে ফিরিয়া যাও। তথায় এক প্রেমময়ীর সহায়তায় এক প্রেমের রাজ্য বিস্তার কর। তোমার স্ত্রী যদি তোমায় ভাল না বাসে, তুমি তাহাতে ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি ভালবাসিও, প্রাণ দিয়া ভালবাসিও, তোমার প্রেম দিয়া তাহাকে প্রেমময়ী করিয়া তুলিও।

শশিভূষণ প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে দশক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিত, পরে সমস্ত দিন বিশ্রাম করিত। এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া, সে মোগলসরাই নামক স্থানে আসিয়া বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিল, এবং পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল।

কলিকাতায় দুই দিন অবস্থান করিয়া শশিভূষণ গৈরিকবসন ও দীর্ঘ কেশ ত্যাগ করিল। এবং উপযুক্ত বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া শ্বশুরালয় উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যে পল্লীগ্রামে শশিভূষণের শ্বশুরালয়, তাহার নাম "চিত্রকোন"।—চলিত ভাষায় লোকে তাহাকে "চেৎকোনা" বলিত। চেৎকোনায় যাইতে হইলে "শক্তিগড়" নামক রেলষ্টেসন হইয়া যাইতে হয়। শক্তিগড় হইতে চেৎকোনা প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

শক্তিগড় ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া, শশিভূষণ একটা ছোট রকম বিপদে পড়িয়া গেল। সে দেখিল, ষ্টেশনের এক স্থানে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এবং তাঁহার সহিত, সেই গাড়িতেই আগত কয়েকটি ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যদিও শশিভূষণ শ্বশুরালয়েই যাইতেছিল, তথাপি একটা ঘোর লজ্জা আসিয়া, তাহাকে এমন ঘেরিয়া ফেলিল যে, সে তৎকালে এবং তৎস্থানে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া একটা বিপদ্ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু সে এই বিপদ্ হইতে সহজেই উদ্ধার পাইতে পারিয়াছিল। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত তাহার শ্বশুর মহাশয় বাক্যালাপ করিতেছিলেন,—তাঁহারা কি মায়া জানিতেন, বলিতে পারি না,—কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শত শত লোক তাঁহাদিগকে পরি-

বেষ্টিত করিয়া ফেলিল; এবং তাহার সহিত শশিভূষণের শ্বশুর মহাশয়কেও প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যদি আত্মগোপন করিবার জন্য, শশিভূষণ ব্যস্ত না থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি, সেও রহস্যোদ্ভেদের জন্য লোক সমারোহে যোগদান করিত। কিন্তু, সে তাহা করিল না। সে অত্যন্ত দ্রুতপদে চেৎকোনা অভিমুখে ধাবিত হইল। শুভ নিয়তি যেন তাহার পৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া, তাহাকে লইয়া যাইতেছিল।

(৬)

ক্ষুদ্র পল্লীর হৃদয় যতদূর উদ্বেলিত হইবার তাহা হইয়াছিল। প্রত্যেক বাপীতট অঙ্গনাগণের করকঙ্কণ-সঞ্চালনে, কুঞ্চিত নাসার নথান্দোলনে, উল্‌কি ও অলকা শোভিত ললাটের কুঞ্চনে এবং চুপি চুপির কল কল কল্লোলে বিশেষরূপ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপ তাম্রকূটের ধূমে ঘন মেঘ সৃষ্টি করিয়া, তর্কের অশনি-নিনাদে দিক্ সকল নিনাদিত করিয়াছিল। ময়রা মিন্‌সে সন্দেশের বায়না লইয়াছিল বলিয়া, ময়রাণী কর্ত্তৃক "ড্যাক্‌রা" ও "পোড়ারমুখ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। গোপবধূর শাসনে, গোপদল দ্বিগুণ মূল্যেও দধি সরবরাহ জন্য বায়না লইতে সাহসী হয় নাই। বর বরণাভিলাষিণী ভামিনীগণের স্মিত মুখ সুস্মিত করিয়া যে দীর্ঘ শ্লোকোচ্চারণের সুখ নাপিতপুত্র উপভোগ করিত, এবার সে, সে সুখের আশা, অতি যত্নে প্রশমিত রাখিয়াছিল। জমীদারের শাসনে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর ত্রিসীমানায় গ্রাম্য ধোবাসকল পদার্পণ করিত না। হায়! ভট্টাচার্য্য পরিবারের অসুবিধা ও দুঃখ অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে।

আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ। এ বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগ্রামে না হইয়া, কলিকাতাতেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সুবিধামত বাড়ি না পাওয়ায়, এবং গ্রামে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে না পারায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চেৎকোনাতেই বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, খাদ্যদ্রব্য এবং নাপিত পুরোহিত ইত্যাদি কলিকাতা হইতেই আমদানি করিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, বর এবং বরযাত্রীদিগের পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে শশিভূষণ গোপনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে সন্ধ্যার অন্ধকারে, চিরপরিচিত আপন শয়ন-গৃহের পশ্চাদ্দিকে আসিয়া, উন্মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। তথায় সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছিল, এবং দীপালোকে জ্যোতির্ম্ময়ী অন্নদার মুখ জ্বলিতেছিল। অন্নদা তখন চক্ষু মুদিত করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। সে ডাকার মত ডাকা। তোমরা ত জান, ভগবান্ সে ডাক শুনিয়াছিলেন।

স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ অন্নদাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সে যেন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, গৃহের পশ্চাদ্ভাগের বাতায়ন পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তদবধি সে প্রত্যহ ভগবান্‌কে ডাকিয়া, গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিত। আজ এই মহাদিনে, যে দিনকে সে জীবনের শেষ দিন বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে কায়মনোবাক্যে ভগবান্‌কে ডাকিয়া, উঠিয়া গবাক্ষপথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। দেখিল, সন্ধ্যার আঁধারে মৃৎপ্রাচীরের পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারি বৎসরকাল সে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিল, একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহা চিনিয়া ফেলিল। চিনিয়া বাক্যহীনা ধীরে ধীরে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষু দু'টি পৃথিবীকে আঁধার করিয়া ফেলিল।

বাহির হইতে শশিভূষণ ডাকিল, "অন্নদা"; আবার চারি বৎসর পরে সেই প্রেমপূর্ণ আহ্বান। অন্নদা কতবার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, যেন একবারমাত্র সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া, সে জন্মজন্মান্তর বধির হইয়া থাকে।

অন্নদা মাতাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া বলিল, "মা! সে আসিয়াছে; তুমি ডাকিয়া আন।"

মাতা অন্নদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কন্যা কি উন্মাদিনী হইল?

এই সময়ে, অন্নদার এক ভ্রাতা শশিভূষণকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদা পদপ্রান্তে পড়িয়া, মস্তক দ্বারা শশিভূষণের পদদ্বয় স্পর্শ করিল; অবিরল অশ্রুধারায় তাহা ধৌত করিয়া দিল। মাতা বিস্ময়াবসানে শশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস, বাবা এস।" শ্যালক বলিল, "তুমি আসল শশী, না ভূত শশী।" শশিভূষণ কিছু বলিল না, সে ক্রন্দন করিতেছিল।

বহির্ব্বাটীতে আসিয়া শশিভূষণ দেখিল যে, চণ্ডীমণ্ডপটি বিশেষরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার বিবাহের দিনও এইরূপ আসন বিস্তৃত হইয়াছিল। আরও দেখিল যে, গোয়ালবাটীর একপার্শ্বে দুইজন অপরিচিত লোক বসিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে। শ্যালকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া শশিভূষণ ইহার কারণ কিছু অবগত হইতে পারিল না।

রাত্রি এক প্রহরের সময়, কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোশকট হইতে গৃহদ্বারে অবতরণ করিলেন। শশী উঠিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি, তুমি কে?" শশী বলিল, "আমি শশী, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না।" শশী জানিত না যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং থানাগৃহের সম্মুখে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়, দ্বারদেশে আবার একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানিতেন যে, গ্রামবাসিগণ এ বিবাহে কেহ যোগদান করিবে না, এজন্য তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করেন নাই। এক্ষণে দেখিলেন যে, তাহারা বিনা আহ্বানেই দলে দলে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের হস্তেই বংশযষ্টি। তবে কি তাহারা একটা মারপিট করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে সমবেত হইয়াছে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত কাতর স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ—আমাকে প্রহার করিবার জন্য যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা পূর্ণ কর। কিন্তু এই সমাগত বিদেশী ভদ্রলোকগণকে তোমরা প্রহার করিও না। তোমাদের গ্রামে ইহাঁরা অতিথি, তোমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দাও,—তোমরা কেমন করিয়া লগুড়প্রহারে অতিথিসৎকার করিবে?"

ইহার পর আর কোনও বিশেষ গোলযোগ হয় নাই। কেবল একজন যুবক চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "ওরে! বরের নাম ধনঞ্জয়, 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' কর।" কিন্তু শশিভূষণকে দেখিয়া, এই উৎসাহান্বিত অগ্নিশর্ম্মার শোণিতও শীতল হইয়াছিল।

বর, কন্যালাভ করিতে না পারিয়া এবং বরযাত্রিগণ প্রহারের ভয়ে সেই রাত্রেই আহারাদির পর প্রস্থান করিল।

সারানিশি জাগিয়া শশিভূষণ আপন পলায়ন-কাহিনী অন্নদার নিকট বিবৃত করিল। অন্নদা দন্ধুপন্থের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আলিবর্দ্দি।

সূচনা।

দেড়শত বৎসর চলিয়া গেল। এই দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ইংরেজ রাজত্বে এ বঙ্গে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতির অবশ্যই বহু বিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালার বাঙ্গালী কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সম্মুখে প্রত্যক্ষীভূত। এ ভারতে যখন ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তখন বাঙ্গালী কি ছিল, আর এখনই বা বাঙ্গালী কি হইয়াছে, ইহার আলোচনা সমালোচনা কয়জন করিয়া থাকেন? কিন্তু করা ত কর্ত্তব্য।

ইংরেজ-রাজত্বে বাঙ্গালার অঙ্গসৌষ্ঠবে হয়ত একটা বাহ্যরাগ বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর সারবত্তা সম্বন্ধে এখন কতটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবার কথা নহে? ঠিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর কি অবস্থা ছিল, আর এখনই বা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর কি অবস্থা, তাহার তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসন সমালোচনা করিতে হয়।

যখন আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব, তখন দিল্লীতে মোগল সম্রাটের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত। আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার শেষ নবাব হইলেও, তখন বাঙ্গালীর বীরত্ব-বীর্য্যের শেষ হয় নাই। নবাব আলিবর্দ্দি মুসলমান হইলেও, গুণবান্ হিন্দুর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দুর ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, বল ছিল, বিক্রম ছিল, সাহিত্য ছিল, সমাজ ছিল। তখন যাহা ছিল, এখন তাহার অনেক নাই। নবাব আলিবর্দ্দি হিন্দুকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুর শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিতেন না, হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সময়ে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইত না, কর্ম্ম ভ্রষ্ট হইত না, পরন্তু হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদানে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। হিন্দু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, হিন্দু তাঁহার সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৌরবান্বিত হইতেন, তাঁহার সময়ে বাঙ্গালী জমীদারবর্গ কেবল অর্থসম্পন্ন নহেন, সামর্থ্যে বীরসমাজকে চমকিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সময়ে দেশে এমন অন্ন কষ্ট হাহাকার ছিল না, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য এমন দুর্ম্মূল্যও ছিল না। বর্গী-বিভ্রাটে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বিব্রত হইয়া বহু ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বটে; বর্গী-বিভ্রাটে বাঙ্গালা বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও বাঙ্গালী ধর্ম্মকর্ম্মে বীরত্ব-বীর্য্যে পুরুষত্বের আদর্শ-মহিমা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বাঙ্গালীর সেই গৌরব-পরিচয় সেই বুঝি শেষ। সেই গৌরব-পরিচয়ের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাটুকু বুঝাইবার জন্য আমরা আজ দেড় শত বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সে ইতিহাসে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসন সমালোচনাই আলোচ্য। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রভুহন্তারক ছিলেন, কিন্তু প্রভুহননে তিনি যে পাপ অর্জ্জিত করিয়াছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তিনি প্রজাপুঞ্জের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-সাধন-সঙ্কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাপের পরিণাম যাহাই হউক, প্রকৃতি-রঞ্জনে তাঁহার আদর্শ অনুকরণীয়, সন্দেহ নাই। তিনি মুসলমান ছিলেন বটে, কিন্তু শাসনে হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যসাধনে কলঙ্কিত হন নাই। আমরা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসন-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রকৃত কিরূপ গৌরবান্বিত ছিলেন, ক্রমে ধারাবাহিক রূপে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর চরিত্র আলোচনায় তাহা প্রকাশিত হইবে। সে চরিত্রালোচনায় তাঁহার শাসনের সম্যক্ সমালোচনা চলিবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর তদানীন্তন গৌরব-পরিচয় প্রস্ফুট হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বংশ-পরিচয়।

আরঙ্গীব যখন ভারতের সম্রাট্, দ্বিতীয় জর্জ্জ যখন ইংলণ্ডের রাজা, মুরশিদ কুলিখাঁ যখন বঙ্গের সুবাদার, সুজাখাঁ তখন মুরশিদ কুলিখাঁর অধীন উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা।

মুরশিদ কুলিখাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুজা খাঁ, মুরশিদ কুলিখাঁর কন্যা জেনাৎ-এন-নেসা* বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুজা খাঁ যে সময়ে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, সেই সময়ে একদিন একটী বৃদ্ধ মুসলমান দীনহীন বেশে ও মলিন বদনে সুজা খাঁর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। সুজা খাঁ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আগন্তুক মুসলমানের নাম মির্জ্জা মহম্মদ। মির্জ্জা মহম্মদের স্ত্রী, সুজা খাঁর নিকট সম্পর্কীয়, এক-বংশসম্ভূতা। সুজা খাঁ আফসার বংশীয়। পারস্য রাজ্যের খোরাসান প্রদেশে তুর্কজাতীয় এক সম্প্রদায় লোক বাস করিত। আফসার বংশ এই তুর্ক জাতিভুক্ত।

ক্রমে পরিচয়ে প্রকাশ পাইল, মির্জ্জা মহম্মদ পূর্ব্বে দিল্লীতে আজাম সাহার সরকারে চাকুরী করিতেন। আজাম সাহার মৃত্যু হইলে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন। তাঁহাকে অনেকগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হইত। আজাম সাহার সরকার হইতে চাকুরী যাইবার পর আর কোথাও তাঁহার চাকুরী হয় নাই। চাকুরী অভাবে ঘোরতর দৈন্যদশা উপস্থিত হইয়াছিল। কষ্টের সীমা ছিল না—সংসারে হাহাকার উঠিয়াছিল। হাজি মহম্মদ এবং মির্জ্জা মহম্মদ আলি নামে তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল। পিতার কষ্ট অসহ্য ভাবিয়া কনিষ্ঠ পুত্র মির্জ্জা মহম্মদ আলি, পিতা ও মাতাকে সুজা খাঁর দরবারে প্রেরণ করেন।

মির্জ্জা মহম্মদ আত্মসম্পর্কীয় এবং তিনি কষ্টে পড়িয়াছেন, এইরূপ পরিচয় পাইয়া সুজা খাঁ দয়াপরবশ হইয়া আপনার দরবারে

---

* জেনাৎ-এন-নেসা শব্দের অর্থ "রমণী-কুলের অলঙ্কার।" "বেগম" কথাটী তাতার এবং তুর্কদেশে বায়েম্ বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। বেগ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বেগম হয়। বেগ শব্দের অর্থ রাজপুত্র।

তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। পরে এই মির্জ্জা মহম্মদ সুজা খাঁর সরকারে একটী চাকুরী পাইয়া তাঁহার সবিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই মির্জ্জা মহম্মদই আলিবর্দ্দি খাঁর পিতা। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, মির্জ্জা মহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র;—মির্জ্জা মহম্মদ আলি; হাজি মহম্মদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

মির্জ্জা মহম্মদ যখন সুজা খাঁর চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে মির্জ্জা মহম্মদ আলি দিল্লীতে ছিলেন। সুজার দরবারে পিতা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন শুনিয়া মির্জ্জা মহম্মদ আলি দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরে তিনি দিল্লী হইতে উড়িষ্যায় আসিলেন। অর্থাভাবে তাঁহাকে পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

মির্জ্জা মহম্মদ আলি সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রতিভার তীব্রোজ্জ্বল রশ্মি ফুটিয়া বহির্গত হইত। তিনি সূক্ষ্মদর্শী—কোন্ কার্য্য কি কৌশলে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, ইহা বুঝিবার তাঁহার কেমন একটা নৈসর্গিক শক্তি ছিল। তিনি যেমন সূক্ষ্মদর্শী, তেমনই সাহসী; যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনই বীর্য্যবান্; যেমন রাজকার্য্যকুশল, তেমনই সমরনিপুণ; যেমন সরলচিত্ত, তেমনই কূটনীতিজ্ঞ। তিনি উড়িষ্যায় সুজা খাঁর দরবারে আসিয়া, আপনাকে মির্জ্জা মহম্মদ আলি নামেই পরিচিত করিলেন। দীর্ঘদর্শী সুজা খাঁ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একজন প্রতিভাশালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষ। সুজা খাঁ তাঁহাকে প্রীতিনয়নে দেখিলেন। প্রকৃতই তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যবলে কে এক মহাপুরুষ তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মির্জ্জা মহম্মদ আলি উড়িষ্যায় আসিয়াই সুজা খাঁর দপ্তরে চাকুরী প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে তিনি সর্ব্বোচ্চ পদলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। পিতা পুত্রের প্রতি সুজা খাঁর অনুরাগ-প্রীতি বদ্ধমূল হইয়াছিল। উড়িষ্যার দরবারে যখন মির্জ্জা মহম্মদ আলির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, তখন জ্যেষ্ঠ হাজি আহম্মদ দিল্লী সহরে। মির্জ্জা মহম্মদ আলি উড়িষ্যায় আপনার পদ সুদৃঢ় ভাবিয়া, ভ্রাতা হাজি আহম্মদকে উড়িষ্যায় আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। হাজি আহম্মদ সপরিবারে উড়িষ্যায় আগমন করিলেন।

মির্জ্জা মহম্মদ আলি ও হাজি আহম্মদ উভয়েই শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। উভয়েই আপন আপন অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্নবিপত্তি দূর করিয়া রাজ্যের সর্ব্ববিধ কার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন। তাঁহাদের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতাগুণে রাজস্ববিভাগের সর্ব্বতোভাবে সুব্যবস্থা হইল এবং সর্ব্বপ্রকারে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অধিকন্তু মির্জ্জা মহম্মদ আলি বীর ও সাহসী পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিতা ও ভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহারই প্রতিভার প্রসিদ্ধি বলবত্তর হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠার প্রতিপত্তি আত্মপর সর্ব্বজনের অস্থিমজ্জায় ঈর্ষার হলাহল ছড়াইয়া দিয়াছিল। ক্রমে মির্জ্জা মহম্মদ আলি প্রভু সুজা খাঁর প্রীতি-প্রসাদে অত্যুন্নত উপাধিলাভ করিয়া মহম্মদ আলিবর্দ্দি নামে অভিহিত হইলেন। এইবার ঈর্ষার হলাহল ত্বগিন্দ্রিয়ের কূপে কূপে ফুটিয়া বাহির হইল। বড়র বড়ত্ব কয়জন

দেখিতে পারে? দেখিয়া বা কয়জন সহ্য করিতে পারে? স্বর্গ নরক হয় কেন? নন্দনকানন শ্মশান হয় কেন? দেবতা দানব হয় কেন? মানুষ পশু হয় কেন? পুরাণ ইতিহাস কাব্যতন্ত্র পড়িয়া প্রমাণ খুঁজিতে হইবে না, চক্ষুর সম্মুখে এই মুহূর্ত্তে আপনার সঙ্কীর্ণ সংসার-প্রাঙ্গণে একবার দৃষ্টিপাত কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শক্তির পরিচয়।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার মুরশিদ কুলিখাঁর মৃত্যু হইল। মুরশিদ কুলি খাঁ, আপন জামাতা সুজা খাঁর প্রতি বড় বিরূপ ছিলেন। শ্বশুরের সহিত তাঁহার মনের মিল হইত না বলিয়া সুজা খাঁ শ্বশুরের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিবার ইচ্ছায় উড়িষ্যায় থাকিতেন। পত্নী জিনাৎ-এন-নেসা বেগম কিন্তু পতিকে ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদ সহরে পিতার নিকটেই অবস্থিতি করিতেন। ইতিহাসে জেনাৎ-এন-নেসার বহু গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে পতি পরকীয়া-রত বলিয়া তিনি স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এই জন্যই তিনি পুত্র সরফরাজ খাঁকে লইয়া মুর্শিদাবাদে* বাস করিতেন। বোধ হয় মুরশিদ কুলি খাঁ জামাতা সুজা খাঁর প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দি খাঁকে সুনয়নে দেখিতেন না;—এমন কি তিনি সুজা খাঁকে প্রায়ই বলিতেন;—"হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দি সহজ লোক নহে; ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও।" সুজা খাঁ শ্বশুরের বাক্য গ্রাহ্য করিতেন না। বরং তাঁহাদিগকে আপনার শুভানুধ্যায়ী বলিয়া মনে করিতেন। সুজা খাঁর প্রতি মুরশিদ কুলি খাঁর বিরূপ হইবার বোধ হয় ইহাও অন্যতর কারণ হইতে পারে।

জামাতার প্রতি বিরূপ বলিয়া মুরশিদ কুলি খাঁ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বঙ্গের মসনদে আপনার উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি দিল্লীর দরবারে আপনার প্রতিনিধিদিগকে এই সঙ্কল্প অবগত করেন। যাহাতে দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন, সম্রাটের নিকট হইতে তাহারই সনন্দপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য প্রতিনিধিগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুজা খাঁ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মাহত হন। কি উপায়ে শ্বশুরের সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, কি উপায়েই বা আপনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দির সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইল,—সুজা খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইতে চেষ্টা করিবেন। সিদ্ধান্ত সিদ্ধির উপায়-কল্পে হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দি প্রথমতঃ দিল্লীতে কয়েকজন বুদ্ধিমান্, সূক্ষ্মদর্শী, শক্তিশালী পরিচিত লোক প্রেরণ করিলেন। পরে তাঁহারা দিল্লীর সম্রাট্‌কে, মন্ত্রীকে ও রাজকুমার খাদুরামকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। এই আবেদনপত্র এমনই সুন্দর ও সুসংযতভাবে এবং বিনয়পূর্ণ বাক্‌বিন্যাসে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহা পড়িবামাত্র মুগ্ধ হইতে হয়। সুজা খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হন—এই আবেদনের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এদিকে যাহাতে মুরশিদাবাদের সংবাদ নিত্য

* পূর্ব্বে ঢাকা সহর নবাবদিগের রাজধানী ছিল। নবাবগণ ঢাকায় থাকিতেন। মুরশিদ কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ সহর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময় হইতে মুর্শিদাবাদ সহর বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল।

পাওয়া যায়, আলিবর্দ্দি সুকৌশলে তাহারও সুবন্দোবস্ত করিলেন। মুরশিদাবাদ হইতে কটকে সংবাদ আনিবার জন্য নৌকা রক্ষিত হইল, এবং কটক হইতে কতকগুলি সৈনিক পুরুষকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে পরামর্শ দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই মুরশিদ কুলিখাঁর মৃত্যু হইবে। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা খাঁ কালবিলম্ব না করিয়া আলিবর্দ্দি, হাজি আহম্মদ, অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু ও সৈনিক পুরুষসহ কটক হইতে মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। জল ও স্থলপথে যাত্রা করিয়া ক্রমে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একস্থানে তিনি শুনিলেন;—মুরশিদ কুলিখাঁর মৃত্যু হইয়াছে। গতি দ্রুততর হইল। পথিমধ্যে তিনি এক স্থানে দিল্লী হইতে প্রেরিত অনুকূল সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হইলেন। শুভ সংঘটন বিবেচনা করিয়া সুজা খাঁ এই স্থানের নাম রাখিলেন "মবারেক মন্জিল।" এই স্থান হইতে তিনি দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। তিনি উৎকণ্ঠার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া একেবারে "চেহেল সুতন"* নামক প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

এই প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তিনি দিল্লী হইতে প্রেরিত সনন্দ-পত্রের মর্ম্ম ঘোষণা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। উপস্থিত সকলে তাঁহাকে নজর প্রদান করিল। সুজা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন। এই সময়ে পুত্র সরফরাজ খাঁ প্রায় এক ক্রোশ দূরে গ্রাম্য বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নিশ্চিন্তমনে নিরাপত্তার সুখময় ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি জানিতেন, মাতামহের লোকান্তর হইলে তিনিই বঙ্গের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রতাপান্বিত সুবাদার হইবেন।

সরফরাজ সংবাদ পাইলেন, পিতা সুজা খাঁ বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত। তিনি শুনিলেন, ঘন ঘোর দুন্দুভিনাদে পিতার সিংহাসনাধিষ্ঠান-বার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে। সরফরাজ প্রথমতঃ চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন, পরে কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইল;—"প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।" তখন সরফরাজ খাঁ কয়েক জন কিঙ্কর মাত্র সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি পিতার পদতলে পতিত হইলেন এবং দীনভাবে পিতার পদ চুম্বন করিলেন। পিতা সুজা খাঁ পুত্রকে সস্নেহে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। সকল গোলযোগ চুকিয়া যাইল। আলিবর্দ্দির অপরিমেয় বুদ্ধিপ্রভাবে ও অব্যর্থ কৌশল-সন্ধানে সুজা খাঁ নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শক্তিসঞ্চয়।

শাসনে সুজা খাঁ সুখ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজা, প্রজা, জমীদার, রায়ৎ, ধনী, দরিদ্র সর্ব্বজনকে সমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার নিকট সুবিচার পাইতে লাগিল। মুরশিদ কুলি খাঁ যে সকল জমীদারকে বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁর অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু তিনি জমীদারদিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেন। এমন কি তিনি অনেক জমীদারের নিকট হইতে তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কোন জমীদার কিংবা কোন ধনাঢ্য হিন্দু পাল্কীতে আরোহণ করিয়া কোন স্থানে গমন করিতে পারিতেন না। কেহ পাল্কী করিয়া গমন করিতেছেন, তিনি ইহা শুনিলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে পাল্কী হইতে নামিতে বাধ্য করিতেন। জমীদার বা ধনাঢ্য হিন্দুকে সেই সময়ে ডুলি-সাহায্যে যাইতে হইত। কেহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম করিলেও, সেই ব্যক্তির ভাগ্যে বিষম দণ্ড সংঘটিত হইত। তিনি বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য কোন জাতিকেই রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রদান করিতেন না। কিন্তু যদি কোন বাঙ্গালী-রাজস্ব-সংগ্রাহক তাঁহাকে কোনরূপে বঞ্চনা করিতেন, কিংবা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিতেন, তাহা হইলে নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে সপরিবারে বল পূর্ব্বক মুসলমান করিতেন। তাঁহার সময়ে রাজা উদয়নারায়ণ রাজসাহী জেলার জমীদার ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহুদিন পর্য্যন্ত এই জমিদারী ভোগ করেন। উদয় নারায়ণের বহু গুণের পরিচয় পাইয়া নবাব তাঁহাকে অনেক স্থানে রাজস্ব সংগ্রহের পরিদর্শকস্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; গোলাম মহম্মদ জমাদার নামক জনৈক ব্যক্তি উদয় নারায়ণ সিংহের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। গোলাম মহম্মদ জমাদারের সহিত দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। এক সময়ে তাহার লোকেরা কয়েক মাসের বেতন পায় নাই বলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। গোলাম মহম্মদকে দমন করিবার জন্য নবাব তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকট একটা যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জমাদার নিহত হয় এবং তাহার অনেক লোক নবাব সৈন্য কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা উদয় নারায়ণ এমনই ভয়-বিমূঢ় হইলেন যে, তিনি নবাবের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর নবাব রাজসাহীর জমিদারী রামজীবন ও কেনুকেশুর নামক দুই ব্যক্তিকে অর্পণ করেন। নবাব অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন, তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি স্বয়ং হিসাবপত্রের খাতা পরিদর্শন করিতেন, যদি তিনি দেখিতেন যে কোন জমীদারের রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি সেই জমীদার বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে আপন লোক দ্বারা ধরাইয়া আনিয়া বন্দী করিতেন। যতদিন না হিসাব শোধ হইত, ততদিন সেই জমীদার বা তাঁহার কর্ম্মচারী এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করিতে অনুমতি পাইতেন না। প্রহরীরা কোনরূপে উৎকোচ গ্রহণ করিতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চর নিযুক্ত করিতেন।

কোন জমীদারের রাজস্ব বাকি পড়িলে নবাব তাঁহাকে ধরিয়া আনাইয়া তাঁহার প্রতি যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করিতেন, তাহা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। কখন তিনি জমীদারের পদে রজ্জুবদ্ধ করিয়া দোদুল্যমান অবস্থায় রাখিতেন, কখন বা পদের গ্রন্থিতে যষ্টিদ্বারা প্রচণ্ড প্রহার করিতেন। কখন বা গ্রীষ্মের রৌদ্রে বসাইয়া

---

* ইহা ৪০টি প্রস্তরস্তম্ভের উপরি নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দালান—চারিদিক উন্মুক্ত। অধুনা ইহার চিহ্নমাত্র নাই। যেখানে সিরাজ উদ্দৌলার বাড়ী ছিল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি আছে, এই চেহেল সুতন সেইখানেই ছিল।

রাখিতেন, উলঙ্গ করিতেন এবং শীতে শরীরে শীতল জল প্রক্ষেপ করিতেন।

এই বা কি অত্যাচার। জমীদার রাজস্ব প্রদান করেন নাই, একথা নবাব শুনিলে তখনই তাঁহাকে লোক দ্বারা ধরিয়া আনাইয়া পুতিগন্ধময় পঙ্কিল পুষ্করিণীর মধ্যে মজ্জিত করিতেন। এই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া অনেক সময় লাঞ্ছিত জমীদার শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু-গ্রস্ত হইতেন। নবাব বিদ্রূপ করিয়া এই পুতিগন্ধময় পঙ্কিল পুষ্করিণীর নাম "বৈকুণ্ঠ" রাখিয়াছিলেন। জমীদারের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া এই পুষ্করিণী মধ্যে মজ্জিত করা হইত। কখন কখন নবাবের কর্ম্মচারীরা জমীদারকে "ঢিলা পায়জামা" পরাইয়া দিত এবং সেই ঢিলা পায়জামার মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দিত। ফলতঃ মুরশিদ কুলিখাঁর সময়ে জমীদার-দিগের যে প্রকার দুরবস্থা হইয়াছিল, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই।

রাজস্ব আদায় করিবার জন্য মুরশিদ কুলিখাঁ জমীদারদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেন বটে, কিন্তু তিনি দিল্লীতে নিজ দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতে কোনরূপ ত্রুটি বা বিলম্ব করিতেন না। চৈত্র মাসে জমীদার-দিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় শেষ হইত, বৈশাখ মাসে নবাব আপনার রাজস্ব দিল্লীর সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিতেন। প্রতি বৎসর এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হইত। এই টাকা বাক্স মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, গোযান-সাহায্যে সেই বাক্স বাহিত হইত। রক্ষকস্বরূপ ইহার সঙ্গে ৩০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ শত পদাতিক থাকিত। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর সম্রাট্ এবং মন্ত্রিবর্গকে হস্তী, পার্ব্বত্য অশ্ব, কৃষ্ণসার মৃগ, তরবারি, শ্রীহট্টে নির্ম্মিত মাদুর, স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য, গজদন্তনির্ম্মিত শিল্প দ্রব্য, ঢাকার মসলিন, এবং কাশীমবাজারের রেশম প্রভৃতি দ্রব্যাদি উপঢৌকনরূপে প্রেরিত হইত। এই সময়ে হুগলীর বন্দরে ইউরোপীয় বণিক্‌গণের বিপণিতে ইউরোপে নির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। নবাব এই সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিল্লীতে উপঢৌকনস্বরূপে প্রেরণ করিতেন।

দিল্লীর সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুরশিদ কুলিখাঁ প্রতিনিয়তই বঙ্গের জমীদার-বর্গের প্রতি রোষকষায়িত লোচনে কটাক্ষ-পাত করিতেন। জমীদারবর্গও প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া মুরশিদ কুলিখাঁর তৃপ্তি সাধন করিতেন। ফলতঃ মুরশিদ কুলিখাঁর সময়ে জমীদারদিগের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না। সে সময়ে অনেক জমীদারই বন্দী হইয়াছিলেন।

সুজা খাঁ এই সকল বন্দী জমীদারদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দি এ বিষয়ের সুপরামর্শদাতা ছিলেন। ক্রমশঃ আলিবর্দ্দি সুজা খাঁর নিত্য সহচর ও প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। হাজি মহম্মদ, রায় আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কার্য্য-করী শক্তি সুজা খাঁর শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে লাগিল। রায় আলমচাঁদ সুজা খাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি বহু গুণসম্পন্ন ধীমান্ হিন্দু। জগৎশেঠ তৎকালে বিখ্যাত কুঠীয়াল ছিলেন; ধনৈশ্বর্য্যে তখন তাঁহার তুলনা ছিল না।

বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুজা খাঁ আলিবর্দ্দি ও তাঁহার আত্মীয়বর্গকে উচ্চতম পদে অভিষিক্ত ও উচ্চতম উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। এইবার আলিবর্দ্দি বিহার আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। হাজি আহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাজিস্ মহম্মদ খাঁ নবাবসৈন্যদিগকে বেতন বণ্টন করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহম্মদ খাঁ রঙ্গপুরের এবং কনিষ্ঠ পুত্র জিন উদ্দিন আহম্মদ রাজসাহীর ফৌজ-দারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। হাজি আহ-ম্মদের এই তিন পুত্রের সহিত আলিবর্দ্দি আপন তিন কন্যার বিবাহ দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপকারের পুরস্কার।

উপকারে প্রত্যুপকার, প্রত্যুপকারে পুর-স্কার। আলিবর্দ্দির নিরন্ন নিরাশ্রয় পরিবার সুজা খাঁর আশ্রয়ে অন্নসংস্থানের সদুপায় লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে সমারূঢ় হইলেন। আবার সুজা খাঁ আলিবর্দ্দিরই বুদ্ধি-কৌশলে বঙ্গের সিংহাসন স্বাধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। আলিবর্দ্দি যে প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত প্রতিদান কি, বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হই-বার পর হইতে সুজা খাঁ তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। এক্ষণে প্রতিদানের সুযোগ সংঘটিত হইল। এই সময়ে আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা ফার্হুই উদ্দৌলা পদচ্যুত হইলেন। আজিমাবাদকে বাঙ্গালার অন্তর্গত করিয়া দিল্লীশ্বরের প্রিয় মন্ত্রী খাদুরাম সুজা খাঁকে ইহার ভারার্পণ করিলেন। এতদর্থে দিল্লী হইতে একখানি সনন্দ-পত্র আসিল।

আজিমাবাদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুজা খাঁ ভাবিলেন, কাহাকে আমার সহকারী শাসকস্বরূপে আজিমাবাদে নিযুক্ত করি। অনেকের নাম হইল, অনেকের কথা মনে হইল, কিন্তু কোনটীই তাঁহার মনোমত হইল না। অবশেষে আলিবর্দ্দিই সেই পদের জন্য মনোনীত হইলেন। দরবারে এই প্রস্তাব উত্থিত হইলে সকলেই ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করিলেন। অতঃপর আলি-বর্দ্দি আজিমাবাদে প্রেরিত হইলেন। আজিমাবাদে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আলিবর্দ্দি "বাহাদুর" ও "মহাবৎ জঙ্গ" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর অধিপতি হইলেন, এবং একখানি সম্মানসূচক পাল্কী, একটী পতাকা, ও একটী নাগরা প্রাপ্ত হইলেন। সুজা খাঁ এতদর্থে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র আনয়ন করিলেন। সুজা-মহিষী জেনাৎ-এন-নেসা আলিবর্দ্দির এ পদ-নিয়োগে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি আলিবর্দ্দিকে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে আপনার অন্তঃপুরের দ্বার-দেশে কর্ম্মচারী দ্বারা আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধদেশে বহুমূল্য "খেলাৎ" অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপন পক্ষ হইতে বিহারের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। স্বয়ং সুজা খাঁও আলিবর্দ্দিকে একটী হস্তী, একখানি তরবারি, এবং কতক-গুলি বহুমূল্য জহরৎ দিয়া তাঁহাকে আজিমা-বাদের নায়েবী পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সুজা খাঁ তাঁহার অধীনে কতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আজিমাবাদে প্রেরণ করিলেন।

আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে আলিবর্দ্দির কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আলিবর্দ্দির পুত্র ছিল না। তিনি এই নবজাত শিশুর নাম আপনার নামের সৌসাদৃশ্যে মির্জ্জা মহম্মদ রাখিয়া তাহাকে পোষ্যপুত্র-স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। শিশুর জন্ম শুভসূচক। আলি-বর্দ্দি মনে করিয়াছিলেন, এত মান, এত কৃপা, এত সম্পদ্, এত গৌরব, সকলই নবজাত শিশুর শুভ-জন্ম-ফলে। এই জন্য আলিবর্দ্দি ইহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শাসনে সুনাম।

অতঃপর আলিবর্দ্দি দুই জামাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গসমভিব্যাহারে আজিমাবাদে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া প্রভু সুজা খাঁকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে একবার আগমন করিলেন। প্রভু ভৃত্যের মহা আনন্দ-সম্মিলন হইল। প্রভুর সম্মান-সেবা করিয়া আলিবর্দ্দি পুনরায় আজিমাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। এবার তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান-সম্পদে বিচলিত হন নাই; তিনি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, সূক্ষ্মদর্শী, তলস্পর্শী, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মান সম্ভ্রম অচিরস্থায়ী—দুই দিনের জন্য। এইরূপ ভাবিয়া তিনি প্রথমে প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। অতঃপর আলিবর্দ্দি ধনবল ও সেনাবল সংবর্দ্ধিত করিয়া তাৎকালীন দুর্দ্দান্ত ও অশান্ত জমীদারবর্গকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহাতে সামর্থ্যবান্ শক্তিমান্ সৈন্যের সৃষ্টি হয়, তাহাতে আলিবর্দ্দির সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি যেখানকার যে বলবান্ সৈনিকপুরুষের নাম শুনিতেন, তাহাকে সেইখান হইতে আনাইয়া আপনার সৈন্যদলে নিযুক্ত করিতেন। শক্তি-সংবৃদ্ধির বাসনায় এবং উচ্চতর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সীমায় উপস্থিত হইবার কামনায়, তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন। কেহ দোষ করিলে তিনি তখনই তাহার দণ্ড দিতেন, ও কেহ ভাল কাজ করিলে তখনই তাহার পুরস্কার করিতেন। আবদুল করিম খাঁ নামক একজন বলবান্ ক্ষমতাশালী মোহিলা আফগানকে আলিবর্দ্দি আপনার সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। আবদুল করিম আলিবর্দ্দির নিকট যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইত। কিন্তু আত্মবলের অহংজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া তিনি ক্রমে এরূপ অশান্ত হইয়া উঠিলেন যে, অনেক সময়ে আলিবর্দ্দির আদেশ লঙ্ঘনে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না; অধিকন্তু প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

আলিবর্দ্দি দেখিলেন বিপরীত হইল; সম্মান-পদে করিমের বড়ই স্পর্দ্ধা বাড়িল। স্পর্দ্ধিত করিম-মেষের সংস্পর্শে অন্যান্য সৈন্য-মেষ নষ্ট হইবে। ক্রমে করিমের স্পর্দ্ধা অসহ্য হইল। আলিবর্দ্দি সেই স্পর্দ্ধার মূলোৎপাটন কল্পে অচিরে তাহার সংহার সঙ্কল্প করিলেন। কয়েকটী বলবান্ সৈনিক পুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত হইল;—আগামী কল্য করিম যে সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, আমি সেই সময়ে তাহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিব, সে অবশ্য কড়া করিয়া তাহার উত্তর দিবে; তোমরা সেই সময়ে তরবারি দ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিবে। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইল। পরদিন করিম যথাসময়ে আলিবর্দ্দির নিকট আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তমতে কার্য্য হইয়া গেল। তবে করিমের ন্যায় বলবান্ পুরুষকে পরাস্ত করিতে আলিবর্দ্দির বলবান্ সৈন্যদিগকেও বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারে সহসা কেমন একটা বিস্ময় বিভীষিকার ভীম ছায়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া লোকসমূহকে ভীত চকিত স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। করিমের পরিণাম—দুষ্কৃতিকারিমাত্রেরই পরিণাম ভাবিয়া দুর্দ্দান্ত দুষ্কর্ম্মকারীরা আলিবর্দ্দির শরণাপন্ন হইল। যে সকল জমীদার পূর্ব্বগত নবাব

দিগের শাসন-শৈথিল্যে দুষ্প্রবৃত্তির বল্গা শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার বল্গা আকর্ষণ করিয়া লইলেন। অনেকেই আলিবর্দ্দির বশ্যতা স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আলিবর্দ্দি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মাননা করিয়া আপন দরবারে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের সেই বিবেকসম্মত কীর্ত্তিকুশলতার পুনরভিনয় হইল। আকবর সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিবার মানসে বন্দীকৃত রাজপুতদিগকে আপনার দরবারে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জমীদারদিগকে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করার আলিবর্দ্দির অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

আলিবর্দ্দি দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে আজিমাবাদে আদর্শ রাজসম্মান লাভ করিয়া প্রভু সুজা খাঁর সম্পূর্ণ মুখোজ্জ্বল করিলেন। জনকোলাহলে কণ্ঠে কণ্ঠে আলিবর্দ্দির শাসন-সুখ্যাতি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার শাসন-কৃতিত্বে সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জ পদে পদে ভবিষ্যতের পুলকিত আলোক-কিরণেরই উদ্ভাস উচ্ছ্বাস অবলোকন করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিল।

আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্বে আলিবর্দ্দির গৌরব চরম নহে। বঙ্গের মসনদ তাঁহার সেই গৌরব চরমের গরীয়ান্ লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। সুজা খাঁর সেই আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী আলিবর্দ্দি সেই আশ্রয়দাতার মানসম্ভ্রম-বিধাতা প্রভুর রত্নসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তবে যে উপায়ে সেই সিংহাসন অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কলঙ্ক বলিয়া আমরা মনে করি না। কিঙ্করের স্বাভাবিক অবরুদ্ধ প্রভুত্বে ঠাকুরালীর পথোদ্ঘাটনের কিরূপ সুযোগ সংযোগ হইয়াছিল, তাহা দেখুন;—

আলিবর্দ্দি যে সময়ে আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা, সেই সময়ে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নাদির সাহা দিল্লী সহর ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর দিল্লীর সম্রাট্ হীনশক্তি ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এই শক্তিহীনতায় বাঙ্গালার সিংহাসনে হস্ত প্রসারণ পক্ষে আলিবর্দ্দির শুভ সুযোগ হইয়াছিল। হীনশক্তি বলিয়া দিল্লীর সম্রাট্ বাঙ্গালার বিপ্লববিভ্রাটের নিবারণপক্ষে সাহস পাইতেন না; পরন্তু বাঙ্গালার রাজস্ব-প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারিতেন না। কোন প্রকারে রাজস্বটা করায়ত্ত হইলে দিল্লীর সম্রাট্ নিশ্চিন্ত হইতেন। সম্রাটের এই অবস্থায় আলিবর্দ্দির বাঙ্গালার সিংহাসন লাভপক্ষে কিরূপ সুযোগ হইয়াছিল, পাঠক! ঘটনাতাৎপর্য্যে তাহার উপলব্ধি করিয়া লউন।

নাদির সাহা যখন দিল্লীসহর ধ্বংশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে বঙ্গের নবাব সুজা খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সরফরাজ খাঁকে বলিয়া যান;—"বৎস! আমি চলিলাম, তুমি সুশাসনে প্রজাপালন করিও। দেখিও যেন হাজি আহম্মদ, আলিবর্দ্দি, রায় রায়েন, জগৎ শেঠ ইহাঁদের কাহারও প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করিও না। সকল সময়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে।"

সরফরাজ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পিতার এই উপদেশবাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন, সতত ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি মুসলমানশাস্ত্রসম্মত উপবাসাদি ধর্ম্মকার্য্য প্রতিপালন করিতেন এবং দানধ্যানাদি ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনে বড় দৃষ্টি রাখিতেন না। পরন্তু হাজি লুৎ উল্লা, মর্দ্দন আলি খাঁ, মির মুয়েৎজা এবং কয়েকটী প্রিয়পাত্র সভাসদের উপর শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি হাজি আহম্মদ, আলিবর্দ্দি, রায় রায়েন ও জগৎ শেঠের প্রতি অবজ্ঞা করিতেন না বটে, কিন্তু উক্ত কয়েকটী প্রিয় পাত্রের পরামর্শে অনেক সময়ে তাঁহাদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি হইত। সরফরাজ খাঁর ঐ কয়েকটী প্রিয়পাত্র হাজি আহম্মদের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদেরই বিদ্বেষ-হলাহলের মারাত্মক-মন্থনে সরফরাজ খাঁর সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

আলিবর্দ্দি বুঝিলেন, সুজা খাঁ তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, প্রিয়জনের কুপরামর্শ-দূষিত চিত্তের জন্য সরফরাজ খাঁ তাঁহাকে

সে দৃষ্টিতে দেখেন না। আলিবর্দ্দিকে আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিবার সঙ্কল্পে সরফরাজ খাঁ প্রস্তুত হইয়া আছেন, নানা কারণে আলিবর্দ্দির তাহাই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই জন্য তিনি আত্মরক্ষার্থ বিহারের সীমান্ত প্রদেশে সসৈন্যে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সরফরাজ খাঁর প্রিয় সভাসদ কয়টী সরফরাজ খাঁর সম্মুখে সতত হাজি আহম্মদের একটা ঘনকৃষ্ণ বিকৃতি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিত। ইহা যে বিদ্বেষের বিষময় ফল, তাহা হতভাগ্য সরফরাজ খাঁ বুঝিতে পারিতেন না। তিনি হাজি আহম্মদকে প্রকৃতই মন্দ লোক ভাবিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদ হইতে বিচ্যুত করিলেন, এবং মীর মুয়েৎজাকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। হাজি আহম্মদের জামাতা আতা উল্লা খাঁ রাজসাহির ফৌজদার ছিলেন। সরফরাজ খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আপন জামাতা হাসেন মহম্মদ খাঁকে সেই পদ প্রদান করিলেন।

এইখানেই নিবৃত্তি নহে। মনোয়া খাঁ নামক এক ব্যক্তির পরামর্শে সরফরাজ খাঁ হাজি আহম্মদের দুইটী পুত্রকে বন্দী করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে সমর্থ হইলেন না। একদিন তিনি স্বয়ং হাজি আহম্মদকে এই কথা বলিয়া ফেলিলেন। হাজি আহম্মদের একটী দৌহিত্রীর সহিত আলিবর্দ্দির দৌহিত্র মির্জ্জা মহম্মদের বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল। সরফরাজ খাঁ এই বিবাহের প্রতিবাদী ছিলেন। সুজা খাঁ আলিবর্দ্দিকে যে সকল সৈন্য দিয়াছিলেন, সরফরাজ খাঁ তাহাদিগকে আজিমাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুমতি করেন। কিন্তু তাহারা আলিবর্দ্দির এরূপ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সরফরাজ খাঁর অনুমতি উপেক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিল না। সুজা খাঁ তাহাদিগকে যে বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। এই সব কাণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হাজি আহম্মদ ভ্রাতা আলিবর্দ্দি খাঁকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইল।

আলিবর্দ্দি পূর্ব্বে সবই জানিয়াছিলেন, সবই বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য সতর্কভাবে সসৈন্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা উপকারী প্রভু সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা তাঁহার প্রবৃত্তির অনুমোদিত হইল না। তিনি ভাবিলেন, সকলই সহিব, নির্ব্বিঘ্নে সকল গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিব। আলিবর্দ্দি সহিষ্ণুতার চরমশিক্ষায় অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন হাজি আহম্মদের পত্র পাইলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, আর না, অসহ্য হইল, এত অত্যাচার নির্ব্বিঘ্নে প্রশমিত হইবার নহে। আমার অপরাধ নাই, অকারণ অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রভুপুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আমি বাধ্য হইলাম।

আলিবর্দ্দি যুদ্ধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি দিল্লীর দরবারে ইশা খাঁকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন;—ভাই! আমি যাহাতে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হই, তোমাকে তাহার জন্য সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে সরফরাজ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহারও অনুমতি দেওয়াইতে হইবে। আমি আমার দেয় বাৎসরিক কর এক কোটী টাকার উপর আর এক কোটী টাকা দিব। সরফরাজ খাঁর যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার হস্তগত হইবে, তাহাও তাঁহাকে দিব।" দিল্লীর দরবারে ইশা খাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল।

দিল্লীর দরবারে পত্র পাঠাইয়া আলিবর্দ্দি ঘোষণা করিয়া দিলেন, ভোজপুরের জমীদারেরা বড় অত্যাচারী হইয়াছে। তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। ঐ ঘোষণা বলসঞ্চয়ের ছলনামাত্র। তিনি সরফরাজ খাঁকেও ঐ কথা জানাইলেন। জমীদারশাসনের ছলনায় সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল।

শুভ সংযোগ। সুজা খাঁর মৃত্যুর তের মাস পরে দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দি খাঁ সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল। আর কোন বাধা বিঘ্ন রহিল না। যুদ্ধের আয়োজন হইল। ভাল দৈবজ্ঞ আসিয়া যুদ্ধযাত্রার শুভ দিন দেখিয়া দিলেন। শুভাশুভ যোগাযোগে আলিবর্দ্দির বিশ্বাস ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সাহিত্য-সভা।

১৩১৫ সাল।

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি।

সভাপতি।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্।

সহ-সভাপতিগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম্, এ, ডি, এল্ ইত্যাদি। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম্, এ, ডি, এল্, সি, আই, ই। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্, সি, এস, আই। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর, এম্, বি, এফ, সি, এস্। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বার-এট-ল, এফ, আর্, এস্, এল।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত বিহারি লাল সরকার। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, এম্, বি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বনোয়ারি আনন্দদেব বাহাদুর। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এফ, আর্, জি, এস্। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর। শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল্, এম্, এস্। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল, বি, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর, বি, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন, এল্, এম্, এস্। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অবৈতনিক সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্, এ।

অবৈতনিক সহ-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন, এম্, এ।

সাহিত্য-সংহিতা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র।

শাখা সমিতিসমূহ।

১। প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাস-সমিতি।

সভাপতি।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্, সি, এস্, আই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্। শ্রীযুক্ত জে, এন্, দাস গুপ্ত, বি, এ। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বার্-এট-ল। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্,এ,

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম্, এ।

২। গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি।

সভাপতি।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম্, এ, ডি, এল্, ইত্যাদি।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে টি, এম, এ, ডি, এল। শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, এম, এ, বার্-এট-ল। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বার-এট-ল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য। শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম, বি, এফ, সি, এস। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন, এল্, এম্, এস্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম, এ।

৩। পারিভাষিক সমিতি।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ্, সি, এস্। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ভগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ।

" শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম্, এ।

" পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।

৪। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-সমিতি

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম্, এ, ডি, এল্। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্। শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম্, এ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।

৫। সংস্কৃত ভাষা সমিতি।

সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্, এ, ডি, এল। শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী। শ্রীযুক্ত রামলাল তর্কসিদ্ধান্ত। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম্, এ। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত উমাপতি দত্ত পাঁড়ে শাস্ত্রী বি, এ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম্, এ। শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ। শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।

৬। দর্শন সমিতি।

সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ। শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ। শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।

৭। ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, ইত্যাদি। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত জে, এন্, দাস গুপ্ত বি, এ। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, সি, এস্, আই। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন। শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, এম্, এ, বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ, সি, এস। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্, এ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ।

৮। পত্রিকা-সমিতি।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্, এ। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ, সি, এস। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বার-এট্-ল। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

৯। পুস্তকালয়-সমিতি।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বনোয়ারি আনন্দদেব বাহাদুর। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র।

১০। গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতি।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, ইত্যাদি। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, এম, এ, ডি, এল, সি, আই, ই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বার্-এট-ল। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন, এম, এ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিভূষণ। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ সেন, এল, এম, এস। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, এম, বি। শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু, বি, সি, ই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, এম, এ। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, এম, এ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

আলিবর্দ্দি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধযাত্রা।

মুর্শিদাবাদে যুদ্ধযাত্রা করাই স্থির হইল। যাহাতে কোন পর্য্যটক মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে যাইতে না পারে, তাহার জন্য আলিবর্দ্দি অবরোধের বিবিধ: ব্যবস্থা করিলেন। তিনি কোন্ দিন কি ভাবে যাত্রা আরম্ভ করিবেন, গোপনে সেই সম্বন্ধে জগৎশেঠ ও ফতেচাঁদকে পত্র লিখিলেন। ফতেচাঁদ তাঁহার পরম বন্ধু। একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর দ্বারা এই পত্র প্রেরিত হইল। যে দিন যে সময়ে এই পত্র বিলি করিতে হইবে, পত্রবাহক আলিবর্দ্দির নিকট হইতে তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ পাইল। সকলই প্রস্তুত, কেবল যুদ্ধযাত্রা করিলেই হয়।

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আলিবর্দ্দি ভোজপুরের জমীদারদিগকে শাসন করিবার একটা ছল ধরিয়াছিলেন। ভোজপুরে যুদ্ধযাত্রা করিবার ছলনায় ১১৫২ জিলহিজি বৎসরের শেষে (১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে) আলিবর্দ্দি বহির্গত হইলেন। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া আজিমাবাদ সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বরিষ খাঁর জলাশয়ের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। আলিবর্দ্দি যাইবার সময়ে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা জামাতা জৈন উদ্দিন আহম্মদ খাঁকে প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে সৈয়দ হেদায়ৎ আলি খাঁ আসদ জান* সরেশ এবং কুটুম্ব নামক জেলার কর্ত্তৃত্বভার লইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাত্রার দুই দিন পরে, আলিবর্দ্দি সৈয়দ হেদায়ৎ আলিকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। এই পত্রের মর্ম্ম এই ;—আমি ঈশ্বরের নিকট সতত আপনার মঙ্গল কামনা করিতেছি। এক্ষণে আমি বরাবর মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছি, আপনি যেন জৈন উদ্দিনের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলেন। আবশ্যকমত যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হইবে, তাহাই করিবেন।

অতঃপর আলিবর্দ্দি আপনার অধীন কি হিন্দু কি মুসলমান সকল কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া একত্র করিলেন। সকলে একত্র হইলে তিনি একজন সাধু মুসলমান এবং একজন ব্রাহ্মণকে সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে স্থাপিত করিলেন। মুসলমান হস্তে কোরাণ লইলেন, এবং ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট এবং বাম হস্তে তুলসীপত্র গ্রহণ করিলেন। সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ। আলিবর্দ্দি মুসলমানদিগকে কোরাণ ও হিন্দুদিগকে তুলসীপত্র ও গঙ্গাজলের ঘট স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন ;—দেখ, আমার যে শত্রু তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি, তোমরা আমার বহুকালের সহচর। তোমাদিগকে আমার বিশ্বাস আছে। তোমাদিগের শৌর্য্য-সাহসে আমি জয়লাভের আশা করি। আমার এই অনুরোধ, যদি তোমরা আমার নিকট থাকিতে

* এই সৈয়দ হেদায়ৎ আলি খাঁ আসদ জান মুতাক্ষরীণ-ইতিহাস-লেখক গোলামহোসেনের পিতা।

চাও, যদি তোমরা আমার সুখদুঃখের ভাগী হইতে চাও, তাহা হইলে সকলেই শপথ করিয়া বল, আমি জলে ডুবিয়া মরি, বা আগুনে পুড়িয়া মরি, তোমরা আমায় কেহ পরিত্যাগ করিবে না। আর শপথ কর আমাকে যদি আফ্রাসিয়াব কি রস্তেমের * সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমরা আমার সঙ্গত্যাগ করিবে না। কেবল ইহাই নহে, আরও শপথ করিতে হইবে যে, আমার যাঁহারা মিত্র, তোমরা তাঁহাদিগের মিত্র হইয়া থাকিবে, আর আমার যাঁহারা শত্রু, তোমরা তাঁহাদিগের শত্রুতাচরণ করিবে। তোমাদের ধন মান আমার ধনমানের সঙ্গী হইবে। দেখিও কেহ যেন আমাকে ত্যাগ করিও না।

আলিবর্দ্দির এই সাধনাবাণী বিফল হইল না। যে সকল প্রাচীন কর্ম্মচারী তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্ত, যাঁহারা তাঁহারই নিকট প্রতিপালিত ও শিক্ষিত, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে শপথ করিলেন। মুসলমান কপালে ও চক্ষুতে কোরাণ স্পর্শ করিলেন, হিন্দু ব্রাহ্মণের চরণ ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিলেন এবং গঙ্গোদক পান করিলেন। প্রাচীন কর্ম্মচারীদিগকে শপথ করিতে দেখিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাহার অনুসরণ করিলেন। এইবার আলিবর্দ্দির হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, আমি মুরশিদাবাদে যুদ্ধ যাত্রা করিব, নবীন নবাব সরফরাজ খাঁ আমার ভ্রাতা, আমার পরিবারবর্গ ও আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। সেই অত্যাচারীর বিনাশসাধনার্থ আমি মুরশিদাবাদে যাইতেছি।" এই কথাগুলি শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার কতকগুলি কর্ম্মচারী চমকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই। সকলেই যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন;—সকলেই যে শপথ করিয়াছেন। আর পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই।

রাত্রি অধিক হইল; উপস্থিত সকলে বিদায় হইলেন; আলিবর্দ্দিও বিশ্রাম লইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শুভযোগে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অটুট সঙ্কল্প; সঙ্গে বহু সৈন্য; সকলেই সুশিক্ষিত; যুদ্ধোপকরণের অভাব নাই। যুদ্ধে যে সকল অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহার সকলই প্রস্তুত। আলিবর্দ্দি এইরূপে সসৈন্যে সশস্ত্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিরাম নাই; বিশ্রাম নাই। ক্রমে তিনি সাহাবাদ সহরে উপস্থিত হইলেন। এই সাহাবাদ সহর দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত; শৈলমালা হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, এই দুর্গ দ্বারা সে পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী উপত্যকায়, আলিবর্দ্দির সৈন্যসমূহ লুক্কায়িত রহিল।

এইবার আলিবর্দ্দি একটী কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। সাহাবাদের দুর্গস্থ সৈন্যেরা আলিবর্দ্দিকে সসৈন্যে সহজে যাইতে দিবে কেন? দুর্গস্থ সৈন্যেরা সরফরাজ খাঁর অধীন। আলিবর্দ্দি মুস্তাফা খাঁ নামে একজন আফগান-সৈন্যকে দুর্গে প্রবেশ করিবার একখানি অনুমতি-পত্র দিয়া বলিলেন;—তুমি একশত অশ্বারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে এই অনুমতি-পত্র লইয়া অগ্রসর হও। এবং এই অনুমতি-পত্র দুর্গস্থ লোকদিগকে দেখাও। ইহা দেখিলেই দুর্গস্থ সৈন্যেরা দুর্গের মধ্যে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিবে। মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দির আদেশ পালন করিলেন। এখন কথা হইতেছে, ঐ অনুমতিপত্র

* আফ্রাসিয়াব প্রাচীন পারস্য ইতিহাসোক্ত একজন বিখ্যাত তুর্ক জাতীয় দিগ্বিজয়ী। রস্তেম প্রাচীন পারস্যের পূর্ব্বাংশের একজন প্রসিদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ নৃপতি। কথিত আছে যে, ইহাঁর চক্ষু দুইটী নীলবর্ণ, শ্মশ্রুগুলি রক্তবর্ণ এবং মস্তকের কেশগুলি শণের ন্যায় ছিল।

কাহার? ইতঃপূর্ব্বে সরফরাজ খাঁ অন্য এক সেনাপতিকে ঐ অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ কোন কৌশলে ঐ অনুমতিপত্র হস্তগত করেন।

মুস্তাফা খাঁ অধ্যবসায়ী, সাহসী এবং সচ্চরিত্র আফগান। তিনি আলিবর্দ্দির আদেশ পাইয়া সেই অনুমতিপত্র লইয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গস্থ সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—কে তুমি? কিজন্য কোথা হইতে আসিতেছ, উত্তর দাও, নতুবা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। মুস্তাফা খাঁ একটীও কথা না বলিয়া কেবল একটী সৈন্য দ্বারা ঐ লিখিত অনুমতি-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যেরা এই অনুমতিপত্র পাইয়া বুঝিলেন স্বয়ং নবাব সরফরাজ খাঁ এই লোককে পাঠাইয়াছেন। দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মুস্তাফা ও তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি পাইল। মুস্তাফা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দুন্দুভিনাদ করিলেন, এই সঙ্গে তাঁহার সৈন্যগণও উচ্চ চীৎকারে কোলাহল করিয়া উঠিল। এই দুন্দুভিনাদ ও সৈন্যগণের কোলাহল আলিবর্দ্দির লুক্কায়িত সৈন্যগণকে আহ্বান করিবার সঙ্কেত ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুপ্ত সৈন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সহসা তাহারা আলিবর্দ্দির পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া রণবেশে অগ্রসর হইল এবং ক্রমে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল। দুর্গের সৈন্যগণ এই ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সহসা দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তখন তাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইল। মুস্তাফা জলদগম্ভীর নাদে বলিয়া উঠিলেন;—যদি তোমরা আর এক পদও অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তরবারির আঘাতে তোমাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিব। দুর্গস্থ সৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হইল; তাহারা পুনরায় দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। আলিবর্দ্দির সৈন্যগণ নির্ব্বিবাদে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ অনিবার্য্য।

আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক সাহাবাদ দুর্গ অধিকৃত হইল। এই সময় মুর্শিদাবাদ সহরে বড় বিষম গোল উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে আলিবর্দ্দি মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সাহাবাদের দুর্গ যে দিন আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সেই দিনই আলিবর্দ্দির প্রেরিত লোক মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের নিকট উপস্থিত হইল। জগৎশেঠ দেখিলেন, এ পত্রখানি প্রকৃতই আলিবর্দ্দির লিখিত। তিনি বুঝিলেন, আর চারি পাঁচ দিন পরে আলিবর্দ্দি সৈন্যসমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবেন। জগৎশেঠ আলিবর্দ্দির পত্র পড়িয়া বুঝিলেন যে, আলিবর্দ্দি এক্ষণে তেলিয়াঘরির পথে উপস্থিত হইয়াছেন। সাহাবাদের দুর্গের নিকট যে উপত্যকায় আলিবর্দ্দির সৈন্য লুক্কায়িত ছিল, তাহাই তেলিয়াঘরির পথ বলিয়া অভিহিত হইত। জগৎশেঠ আলিবর্দ্দির পত্র নবাব সরফরাজ খাঁকে দেখাইলেন। আলিবর্দ্দি সরফরাজ খাঁকেও একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই;—আমার ভ্রাতা আপনার দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। আপনি আমার পরিবর্গের সম্মান নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি আর যাহাতে কোন প্রকার লাঞ্ছনা না হয়, তাহার জন্য এবং তাহাদিগের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আমি মুর্শিদাবাদ যাইতেছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি যে আপনার অনুগত এবং অধীন, কেবল তাহাই

দেখাইব। কিন্তু আমি আশা করি, আমার ভ্রাতা হাজি আহম্মদ অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে এবং সপরিবারে এখানে আসিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আপনি অনুমতি দিবেন।

এই পত্র পাঠ করিয়া সরফরাজ খাঁ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কি করিবেন তন্মুহূর্ত্তে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। হাজি আহম্মদের উপর তিনি বড় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে স্থির করিবার জন্য আপনার মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিলেন। সুপরামর্শ করিবার জন্য মন্ত্রিগণের একটী সভা হইল। সেই সভায় হাজি আহম্মদও আহূত হইলেন। সরফরাজ খাঁ হাজি আহম্মদকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। হাজি আহম্মদ ভাবিলেন;—এ কি বিপদ্; নবাব আমার উপর যে প্রকার ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আমি যে নির্ব্বিঘ্নে নিস্তার পাইব এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি এই বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন;—আলিবর্দ্দি রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াছে; আপনি আমাকে তাহার নিকট যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। আমি তথায় যাইয়া তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিব। সভায় গোল উঠিল। কেহ বলিলেন, হাজি মহম্মদকে যাইতে দেওয়া হইবে না। কেহ বলিলেন, যাইতে দেওয়া হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? দেখাই যাক্, হাজি মহম্মদ কি প্রকার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে বাক্‌বিতণ্ডা নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল। আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। এই সময়ে মহম্মদ ঘোষ খাঁ উঠিয়া বলিলেন;—এই বৃদ্ধ লোককে বন্দী করিয়া ফল কি? যদি ইহাঁকে বন্দী করা হয়, তাহা হইলে আলিবর্দ্দি যুদ্ধার্থে কি মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হইবেন না? তাঁহার মতি কি ভাবান্তর প্রাপ্ত হইবে? তবেই কথা হইতেছে হাজি আহম্মদকে ধরিয়া রাখায় ফল হইতেছে না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তিনি যাহা বলিতেছেন, কাজে যদি তাহা করিতে পারেন, তাহা হইলেও মঙ্গল। তিনি যদি তাহা না করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা ত আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। হাজি আহম্মদ তাঁহার ভ্রাতার নিকট গমন করুন বা নাই করুন, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। একা হাজি আহম্মদে কি করিবে? তিনি তাঁহার ভ্রাতার শিবিরে গমন করিলে ভ্রাতার কিছুই বলবৃদ্ধি হইবে না, আর গমন না করিলেও ভ্রাতার শক্তির হ্রাস হইবে না।

মহম্মদ ঘোষ খাঁ যাহা বলিলেন, তাহা সকলেই অনুমোদন করিলেন। হাজি আহম্মদ ভ্রাতার নিকট যাইবার অনুমতি পাইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া আলিবর্দ্দির শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁকে একখানি পত্র লিখিয়া একজন বন্ধুর দ্বারা পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই;—"আলিবর্দ্দি খাঁ আপনার অনুগত ভক্ত ভৃত্য; আপনার প্রতি তাহার কোন প্রকার বিদ্বেষ নাই; আপনি যেন তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন; আপনার সে কিঙ্কর শক্তিশালী বটে, কিন্তু আপনাকে সে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। আপনি আপনার রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার সংকল্প করিবেন না। আলিবর্দ্দি স্বয়ং প্রাসাদে গিয়া আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হইবে এবং আপনার চরণযুগল চুম্বন করিবে। তাহার যাহা কিছু অভিযোগ আছে, তাহা সকলই সে আপনার সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া বলিবে। তাহাতেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, সে আপনার বশীভূত এবং অনুরক্ত। পরন্তু আপনাকে সে কতদূর সম্মান করে, আপনি তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আপনি যদি আমার পরামর্শ না শুনেন, প্রকৃতই যদি আপনার অনুচর সহচরবৃন্দের প্ররোচনায় আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তাহা হইলে বড়ই বিষম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আলিবর্দ্দি নিজের জীবন ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য নৈরাশ্যে এমনই উন্মত্ত হইয়া এমনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, যাহা তাহার পক্ষে ইহকালে ও পরকালে বিষম লজ্জাস্কর ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

হাজি আহম্মদ বিদায় লইলেন। এদিকে নবাব সরফরাজ খাঁর সভাসদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে তর্ক উঠিল;—"এখন কি করা কর্ত্তব্য, আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা হইবে কি না।" বহু তর্ক বিতর্কে সিদ্ধান্ত হইল, যুদ্ধযাত্রাই শ্রেয়ঃকল্প। তখন সরফরাজ খাঁর সৈনিকমণ্ডলীর মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। স্বয়ং সরফরাজ খাঁ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। পরে তিনি সেনাপতি মর্দ্দন আলি খাঁকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই মর্দ্দন আলি খাঁ হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দি খাঁর বড়ই বিরুদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রার ৩।৪ দিন পরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সরফরাজ খাঁ সসৈন্যে কমরা সহরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে যুদ্ধযাত্রা বন্ধ হইল। আলিবর্দ্দির প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহার সংবাদ আনিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে সরফরাজ খাঁ দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে একজনের নাম সুনেত ও অন্য জনের নাম সুজা কুলি খাঁ। সুনেৎ একজন খোজা ও সুজা কুলি খাঁ হুগলির ফৌজদার। এই দুই জন লোক কি সংবাদ লইয়া আসেন, তাহা শুনিবার জন্যই সরফরাজ খাঁ সসৈন্যে কমরা সহরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই দুইজনই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, আলিবর্দ্দি এবং তাহার ভ্রাতা এখনও তাঁহার অনুরক্ত ভৃত্য। আলিবর্দ্দি ঐ দুই ব্যক্তির নিকটে সরফরাজ খাঁকে বলিবার জন্য যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন ঐ দুই ব্যক্তি তাহাও সরফরাজ খাঁকে বলিলেন। আলিবর্দ্দি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই;—প্রভো! যদি কোন মহানুভব সদাশয় ব্যক্তি, কোন লোককে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে সেই লোকের প্রতি সেই মহানুভব সদাশয়ের সতত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবীতে সেই লোকের কিসে সম্মান রক্ষা হয়, তাহারও প্রতি সেই সদাশয় মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমি আপনার ভক্ত ভৃত্য। আমি আমার উন্নতির জন্য আপনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট চিরঋণী। আমি আপনারই কৃপাতে তুচ্ছ ধূলিকণা হইতে সর্ব্বোচ্চ উন্নতি স্তম্ভে উন্নীত হইয়াছি—এ কথা স্মরণ করিয়াও আমি গৌরবান্বিত হই। আপনার নিকট আমার দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা এই, আপনার অনুচর সহচরবৃন্দের মধ্যে কয়েকটী লোক আমাদিগের উন্নতি দেখিয়া হিংসা করিয়া থাকেন, এবং আমাদের বিরুদ্ধে আপনার নিকট অনেক কথা বলিয়া থাকেন। আপনি সেই সমস্ত কথা সহজেই বিশ্বাস করেন। তাহারই ফলে আজ এই বিষম কষ্টকর ব্যাপার উপস্থিত। আপনি ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দিন। মর্দ্দন আলি খাঁ, মির মর্ত্তেজা খাঁ, হাজি লফ আলি খাঁ ও মহম্মদ ঘোষ খাঁ এই কয়জনই আমাদিগের বিদ্বেষী—এই কয় জনকেই আপনি বিদায় করিয়া দিন। ইহারা যদি বিদায় হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা আপনার চরণপ্রান্তে গিয়া ভক্তির উপহার

অর্পণ করিব। আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ এই, যদি আমাদের প্রথম অনুরোধ রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে প্রভো! আপনি রাজ-প্রাসাদে প্রত্যাগমন করুন, আর ঐ বিদ্বেষী কয়েকজনকে আমার সহিত—আপনার অধীন কিঙ্করের সহিত—যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিন। তাহারা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আর আমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিদায় দিবেন। তখন আমি স্বয়ং যাইয়া আপনার পদপ্রান্তে আমার মস্তক লুণ্ঠিত করিব। আমি অকপটচিত্তে এই কথা বলিলাম। আমি যে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া এ কথা বলিয়াছি, সেই কোরাণ আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম।

যে দুইটী লোক আলিবর্দ্দির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আলিবর্দ্দির এই কথা-গুলি সরফরাজ খাঁকে শুনাইয়াছিলেন, তাঁহারা মহম্মদ আলি খাঁ নামক আলিবর্দ্দির এক দূত-কেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই দূত একজন চিকিৎসক। ঐ দুই ব্যক্তি সরফরাজ খাঁকে আলিবর্দ্দির কথাগুলি শুনাইয়া দিলে পর দূত মহম্মদ আলি খাঁ আলিবর্দ্দির প্রেরিত কোরাণখানি সর্ব্বসমক্ষে রক্ষা করিলেন। ফল কিছুই হইল না। আলিবর্দ্দির কথা কেহই মানিলেন না। যে কয়জনের নামে আলি-বর্দ্দি অনুযোগ করিয়াছিলেন, সেই কয়জনই নবাব সরফরাজ খাঁর মন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সরফরাজ খাঁর দরবারে সর্ব্বশক্তিময় অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা আলিবর্দ্দি ও আলিবর্দ্দির ভ্রাতা ও সন্তান সন্ততির পর্য্যন্ত ঘোর বিদ্বেষী। সন্ধির প্রস্তাব ভাসিয়া গেল, তখন সকলেই যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইল। ইতোমধ্যে হাজি আহম্মদ রাজমহলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আলি-বর্দ্দি খাঁ সুসজ্জিত হইয়া সসৈন্যে নবাব সর-ফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি পথে ভ্রাতা হাজি আহম্মদকে আপন হস্তীর উপরে তুলিয়া লইলেন। আলিবর্দ্দিকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, হাজি আহম্মদ নবাব সরফরাজ খাঁকে একথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। যেন সেই কথা রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতা আলিবর্দ্দি খাঁকে বলিলেন, ভাই! হাতীটাকে খানিকটা ফিরাইয়া লইয়া চল। আলিবর্দ্দি তাহাই করিলেন, পরন্তু আবার হাতিটী ফিরাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। হাজি আহম্মদ প্রতিজ্ঞা রক্ষার কি অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, পাঠক! তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন। এ বর্ব্বরতার ভানে কেহ কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? যাহাই হউক, আলিবর্দ্দি যেমন সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, সরফরাজ খাঁও সেইরূপ তাহার বিরুদ্ধে আগমন করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

সরফরাজ খাঁ ক্রমেই অগ্রসর হইয়া ভাগীরথী নদীর উপকূলস্থ ঘেরিয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। যেখানে আলিবর্দ্দি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, মহম্মদ ঘোষ খাঁ সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দি যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইখানে নদীপার হইবার বিশেষ সুবিধা ছিল। আলিবর্দ্দির শিবির হইতে প্রায় ৪।৫ ক্রোশ দূরে সরফরাজ খাঁর শিবির সন্নি-বিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে সরফরাজ খাঁ একখানি পত্র লিখিয়া দূতের দ্বারা আলিবর্দ্দির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দিও তাহার উত্তর দিলেন। এইরূপ লেখালেখি অনেক

হইল। আলিবর্দ্দির প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন, এই মর্ম্মে সরফরাজ খাঁ আলিবর্দ্দির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং আলি-বর্দ্দির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। আলিবর্দ্দিও নিম্নলিখিত প্রকার উত্তর দিলেন;—"আপনার পিতা আমাকে বড় অনুগ্রহ করিতেন, আমি তাহার জন্য কৃতজ্ঞ বটে, কিন্তু যাহারা আমার শত্রু, যাহারা আপনাকে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনাইয়া আপনার মনোমালিন্য উৎপাদন করিয়াছেন, আমা-দিগের মধ্যে ভেদসঞ্চার করিয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিন, তাহাতে যদি সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। তাহাতেও যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ উচ্চ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করুন, আমি আমার বিদ্বেষী শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করি, আপনি ঐ উচ্চ স্থান হইতে আমাদিগের সেই যুদ্ধ অবলোকন করুন। আমি যদি জয়লাভ করি, তাহা হইলে আপনার প্রতি আমার যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব। আর আমি যদি পরাভূত হই, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যাহা করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহাই করিবেন।

ফলকথা, সরফরাজ খাঁর সহিত আলিবর্দ্দির আর সাক্ষাৎ হইল না; উভয়েই উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। আলিবর্দ্দি যাহা বলিয়াছিলেন, সরফরাজ খাঁ তাহা সহিবেন কেন? আর আলিবর্দ্দি যখন বুঝিলেন, সরফরাজ খাঁ তাহার কথা রাখিলেন না, সুতরাং লাঞ্ছনা চরম সীমায় উঠিবে, তখন তিনিই বা অভি-মানে আত্মহারা না হইবেন কেন? এক্ষণে যুদ্ধই অনিবার্য্য হইল। এদিকে জগৎশেঠ গোপনে গোপনে আলিবর্দ্দিকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দির সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ জগৎশেঠের প্রেরিত একখানি পত্র পাইলেন। মুস্তাফা খাঁ সেই পত্র আলিবর্দ্দির নিকট পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই;—যদি যুদ্ধই করিতে হয়, তবে কল্যই যুদ্ধ কর। আর কালবিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আজ যেরূপ অবস্থা আছে, কাল হয়ত সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে।

আলিবর্দ্দি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য বারুদ গোলা প্রভৃতি প্রদান করিতে আদেশ করি-লেন। সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগের অধিপতি হইলেন;—হিন্দু সেনাপতি নন্দলাল। এই নন্দলাল সাহসী, সৎপুরুষ, বীর, যোদ্ধা। আলিবর্দ্দি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনার পতাকা দিয়াছিলেন। তিনি নদীর ধারে সরফরাজ খাঁর সেনাপতি ঘৌষ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হই-লেন। অপর দুই ভাগ লইয়া আলিবর্দ্দি নদী পার হইয়া গেলেন। একভাগ সৈন্যকে তিনি সরফরাজ খাঁর পশ্চাদ্ভাগে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন;—আমি সম্মুখভাগে নদীতটে থাকিয়া সরফরাজ খাঁর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিব, তোমরা যখন দেখিবে, সরফরাজ খাঁ আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর যখন আমার সৈন্যমধ্য হইতে একটী কামানের শব্দ শুনিতে পাইবে, তখনই পশ্চাদ্দিক হইতে সরফরাজ খাঁর শিবির আক্রমণ করিবে। দেখিও, খুব সাব-ধানে লুকাইয়া থাকিবে। এই সৈন্যদল আলিবর্দ্দির আদেশে গভীর রজনীতে যাত্রা করিল। আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ জামাতা এই সৈন্যগণের অধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহার অধীনে আবদুল আলি খাঁ, মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ এবং অন্যান্য আফগান সেনাপতিরা রহিলেন। আলিবর্দ্দি এই সৈন্যদলের কিছু অন্তরে

থাকিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেদিকে ঘৌষ খাঁ সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, নন্দলাল ধীরে ধীরে নীরবে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রত্যুষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আলিবর্দ্দি সরফরাজ খাঁর নিকটে সম্মুখভাগে কামান দাগিলেন। যে সকল সৈন্য অগ্রে গিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্ব নিদেশমত কামানের শব্দ শুনিয়াই সরফরাজ খাঁর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে নন্দলাল ঘৌষ খাঁর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সরফরাজ খাঁ নামাজ পড়িতেছিলেন। তিনি তখনই গাত্রোত্থান করিয়া হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন, এবং আলিবর্দ্দির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দির সৈন্যগণ পশ্চাদ্ভাগ হইতে সরফরাজ খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা লুঠিতে লাগিল, এবং যাহাকেই সম্মুখে পাইল, তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। মির্জ্জা ইরেজ খাঁর পুত্র হত হইলেন। এই সময়ে সরফরাজ খাঁ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সকল সৈন্যের অগ্রে ছিলেন। আলিবর্দ্দির সৈন্যমধ্য হইতে একটা গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তকে লাগিল। সেই গুলির আঘাতেই তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মীর কামাল, মীর গাদাই, মীর আহম্মদ, মীর সিরাজ উদ্দিন, হাজি লুৎফ আলি খাঁ এবং কার্ব্বান আলি খাঁ প্রভৃতি অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা একে একে সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। রায় রায়েন, আলমচাঁদ এবং মির্জ্জা ইরেজ আহত হইয়া সহরের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সেই মহাবীর নন্দলাল ঘৌষ খাঁর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে আপনার অমোঘ বীর্য্যবলে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু হায়! তিনি ঘৌষ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাবীর মহাসংগ্রামে নিপতিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

নন্দলাল হত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। যে হস্তীর উপর সরফরাজ খাঁ নিহত হইয়া পতিত ছিলেন, সেই হস্তী মৃত প্রভুকে লইয়া সহরের দিকে দৌড়িল। ঘৌষ খাঁ মনে করিলেন, প্রভু বুঝি ভয়ে পলাইতেছেন। তিনি প্রভুকে ফিরাইবার জন্য একজন দ্রুতগতি অশ্বারোহীকে পাঠাইলেন। তিনি অশ্বারোহীকে বলিয়া দিলেন;—প্রভুকে বলিও, আমি জয়লাভ করিয়াছি, মহাশত্রু হনন করিয়াছি, আসুন, আমার সহিত যোগ দিন, এখনও যে শত্রুসৈন্য অবশিষ্ট আছে, উভয়ে একত্র হইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করি। কোথায় প্রভু! কে ফিরিবেন! ঘৌষ খাঁ তাহা বুঝেন নাই। আলিবর্দ্দি কিন্তু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিলে কি হইবে, তিনি বুঝিলেন নন্দলাল যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর যে সকল সৈন্য সরফরাজ খাঁর শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা লুণ্ঠন এবং হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, যে যাহার ইচ্ছামত স্থানে গমন করিতেছে। ওদিকে আবার ঘৌষ খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

ঘৌষ খাঁ যে অশ্বারোহী সৈন্যকে পাঠাইয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়া সরফরাজ খাঁর মৃত্যু সংবাদ দিল। ঘৌষ খাঁ এই সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইলেন। নৈরাশ্য-বিস্ময়ের গভীর ছায়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। তিনি দেখিলেন আর উপায় নাই, আর রক্ষা নাই। যে আলিবর্দ্দিকে তিনি চিরকাল ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন, সেই আলিবর্দ্দি আজ বিজয়ী, সেই আলিবর্দ্দি বঙ্গের

সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। ঘোর অন্ধকারে ঘৌষ খাঁর হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন;—না, না, পলাইব না;—রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, ঐ কাফের অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, আর আমি পলাইব? এই কথা বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই আপন পুত্রদ্বয় মহম্মদ কুতব ও মহম্মদ পীরকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! আর কিছুই নাই, যুদ্ধেই মরিতে হইবে। জীবন যাওয়ায় যা, থাকায়ও তা। ঐ আলিবর্দ্দির রক্তে হস্ত ধৌত করিতে হইবে। আইস, পার যদি ঐ আলিবর্দ্দিকে আক্রমণ করি। এই কথা বলিয়া ঘৌষ খাঁ রণক্ষেত্রে সিংহবিক্রমে অগ্রসর হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সরফরাজ খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ঘৌষ খাঁর সৈন্যগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কেবল কয়েকটী মাত্র সৈন্য ঘৌষ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল। ঘৌষ খাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পরাজিত হইয়া বাঁচিব না। কয়েকটী মাত্র সৈন্য এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরের সঙ্গী হইল। ঘৌষ খাঁ প্রায় আলিবর্দ্দির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে তিনি এক গুলিতে আহত হইলেন। তবুও তিনি অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর আঘাত-বেদনা চাপিয়া বলিলেন;—আমার অশ্ব লইয়া আইস। দেখিব আজ আলিবর্দ্দি কি প্রকারে রক্ষা পায়? এই বলিয়া তিনি হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আর দুইটী গুলির দ্বারা আহত হইলেন। এইবার তিনি রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া ইহলোক হইতে গমন করিলেন।

ঘৌষ খাঁর পুত্রদ্বয় যখন দেখিলেন, পিতা সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন, তখন তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তরবারি হস্তে বিদ্যুদ্বেগে শত্রু-সৈন্য-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারাও শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ধরাসনে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাদের সুকুমার সুকোমল দেহ ধূলিময় রক্তের স্রোতে ভাসিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ কুতব বলশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্ত্রত্যাগ করেন নাই। তিনি যোদ্ধার মত যুদ্ধক্ষেত্রেই উপবেশন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পরে এই স্থানেই এই মহাবীরের সমাধি হইয়াছিল। সরফরাজ খাঁর অনুগত অনুচর মীর দিলার আলি খাঁ যখন শুনিলেন যে, সরফরাজ খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, আর বাঁচিয়া ফল কি? তাঁহার নিকট ১৬ জন মাত্র সৈন্য ছিল। তিনি এই ১৬ জন সৈন্য লইয়া বায়ুবেগে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। এইবার বিষম সংগ্রাম বাঁধিল। তিনি বীরত্ব-বার্য্যে সাহস-পরাক্রমে, ১৬ জন মাত্র সৈন্য-সাহায্যে আলিবর্দ্দির সৈনিক মণ্ডলীকে চমকিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বীর আর কতক্ষণ যুঝিবেন? দেখিতে দেখিতে তিনিও আলিবর্দ্দির সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সরফরাজ খাঁর সেনাপতিগণ এবং বন্ধুগণ যে প্রকার ভক্তি ও অনুরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতি বিরল।

মীর সরেফ উদ্দিন সরফরাজ খাঁ এবং তাহার সৈন্যগণের মৃতদেহ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আলিবর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া দুইটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। একটী বাণ আলিবর্দ্দির হস্তস্থিত ধনুকের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, আর একটী দ্বারা তিনি সামান্যরূপে আহত হইলেন। অবশেষে মীর সরিফ উদ্দিন দেখিলেন, অদ্য যুদ্ধে আর ফল নাই। প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। আলিবর্দ্দির জয় হইল। ক্রমশঃ

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তি।*

(FROM HUMANITY TO DIVINITY.)

মহানুভব সভাপতি এবং মহীয়ান্ সভ্যবৃন্দ!

অদ্য একটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। বিষয়টি কঠিন হইতে কঠিনতর এবং জটিল হইতে জটিলতর হইলেও ইহা অতীব প্রয়োজনীয় এবং আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণ যোগ্য। ইহা মানব-বুদ্ধির আবিষ্কৃত রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপার নহে; ইহা ইতিহাস, গণিত, ভূগোল বা রাজবিধির (আইনের) অঙ্গীভূত বিষয় নহে; ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এই দুঃখময় ও মায়াময় জগতে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ও প্রাণবিশিষ্ট মনুষ্যগণ যে অক্ষয় ও অব্যয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে অখণ্ড সুখপ্রাপ্তির জন্য ধ্যান, ধারণা, সাধনা প্রভৃতিতে নিযুক্ত হয়; যে চিরসুখময় হরিপদে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া মুক্তিমার্গের অভিলাষী হয়; অধিক কি, যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মকৃপা বা ঐশী সামর্থ্য-বলে মানুষেরা ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণ-কামনা করে, অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সেই অতীব প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমি বামন হইয়া গগনের শশধরকে স্পর্শ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি তাহা আমি বুঝি, অথবা কদলীপট্টবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভেলায় আরোহণ করিয়া অনন্ত ঊর্ম্মিমালা-উদ্বেলিত মহাসাগর পার হইবার চেষ্টা করিতেছি তাহাও অবগত আছি, কিন্তু তথাপি দুঃসাহস সহকারে এই কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমার হৃদয় কেন যে অনুরাগী হইয়াছে, তাহার একটা কারণ আছে। ভগবৎ কথার এমনই মাহাত্ম্য, এমনই আকর্ষণী-শক্তি, এমনই মনপ্রাণ-বিমোহনকারী সামর্থ্য এবং জাগতিক নর-নারীর পক্ষে এই কল্যাণময়ী কথা ভক্তি মার্গাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য এমনই সুখকর সহায়, যে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা বিষয়িণী কথায় মতভেদ থাকিলেও ইহা বৃথায় কথিত হয় না। জ্ঞানার্ণব স্বরূপ ভুবনবিখ্যাত শ্রীশ্রীমৎ ভগবদ্গীতায় পরমারাধ্য ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" অর্থাৎ ধর্ম্ম-কথা এমনই শুভকারিণী, এমনই শান্তি ও কল্যাণদায়িনী যে, ধর্ম্মের সম্পূর্ণটা সাধিত না হইয়া যদি অল্প সাধিত হয়, তাহা হইলেও মনুষ্যেরা মহৎ ভয়, মহৎ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। অতএব, হে সভ্যবৃন্দ! আসুন, আমরা অদ্য এই সন্ধ্যা-মুহূর্ত্তে—এই শুভ সময়ে—সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া, তাঁহার অপার মহিমাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়িণী কথায় প্রবৃত্ত হই। এই মায়াময় ও দুঃখময় সংসারে যাহা মানবজীবনের মুখ্য ও শেষ লক্ষ্য; যাহা ভবসাগর পারের জন্য আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়; যাহা ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শক; যাহা সুখ ও শান্তির জন্মদাতা, সেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব লইয়া আমি অদ্য এই সভায় উপস্থিত হইয়াছি। ভগবান্ করুন আমি অদ্য যেন কিয়ৎপরিমাণেও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি, কিয়ৎ পরিমাণেও তাঁহার অপৌরুষেয় সামর্থ্য বিবৃত করিতে পারি এবং কিঞ্চিৎ প্রকারেও যেন জীবের প্রতি তাঁহার অপরিমিত করুণার ব্যাখ্যা করিতে পারি। আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব আমার সহায় হউন, আমার কর্ম্ম ফল প্রসন্ন হউক এবং আপনারা আমার প্রতি অনুকম্পাবারি বর্ষণ করুন।

মহোদয়গণ! অদ্য আমার বক্তৃতার বিষয় "ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তি" অথবা মানুষ কিরূপে দেবতা হইতে পারে। হয়ত এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে চমকিত হইয়া কহিতে পারেন, "এ কি কথা! অস্থি মাংস মেদ সমাযুক্ত পঞ্চভৌতিক দেহী মানব কি কখন দেবতা হইতে পারে? দেবতা ও মানুষ যে অনেক ভিন্ন!" মহাশয়গণ! যদি কোন নাস্তিক বা ভ্রষ্টচেতা তামসিক ব্যক্তি কিংবা ধর্ম্মবিরোধী মানুষ এ কথা কয়, তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না, কিন্তু কোন হিন্দু—বিশিষ্ট হিন্দু—যদি ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিব, ধর্ম্মরূপ পাঠশালায় ক, খ, গ, ঘ, এখনও তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। "হেসে খেলে লওরে সোণার যাদু, কোন্ দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে"—এই প্রকৃতির অদ্ভুত বিধর্ম্মীরা যাহাই বলুক, অথবা খৃষ্টানদিগের মধ্যে যে সকল লোক তাহাদের শাস্ত্রকে ভাল করিয়া বুঝে না তাহারা যাহাই বলুক, হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী শাস্ত্রেও ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তির কথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের বাইবেল নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের ৬৬ খানা পুস্তকে অর্থাৎ "জেনেশিস্" নামক আদি পুস্তক হইতে "রে ভে লেশন" নামক শেষ পুস্তক পর্য্যন্ত, প্রত্যেক পুস্তকে—মানুষের দেবতা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। হিন্দুর তো কথাই নাই, কারণ হিন্দুশাস্ত্র যুগ যুগান্তরকাল ব্যাপিয়া এ বিষয়ের সুগভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধ, মহম্মদশিষ্য মুসলমান এবং অগ্নি উপাসক পার্শিকদিগের শাস্ত্রেও ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। মহর্ষি কণাদ তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে লিখিয়াছেন, "সম্ভবত্যেবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন জায়তে" অর্থাৎ সম্ভব বাক্যে বাক্যভেদ অর্থাৎ মতভেদ হয় না। টীকাকার মহাশয় এস্থলের "সম্ভব" শব্দের ব্যাখ্যায় "সত্য" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ "যাহা সত্য বাক্য তাহা সম্ভব, সুতরাং সম্ভব বাক্যে অর্থাৎ সত্যবাক্যে কখন বাদানুবাদ হয় না।" কারণ Truth is Reason and Reason is Truth—অর্থাৎ সত্যই যুক্তি এবং যুক্তিই সত্য। উপনিষদ্ ও গীতা বলেন যাহা সত্য তাহা নিত্য, যাহা অলীক তাহা অনিত্য, সুতরাং যাহা নাই অর্থাৎ অলীক, তাহা কখন হইতে পারে না, কিন্তু যাহা সত্য ও নিত্য, তাহার কখন অভাব হয় না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—(ভগবদ্গীতা, ২।১৬) সুতরাং সম্ভব বা সত্য বাক্য ব্রহ্মবাক্য স্বরূপ গণনীয়, এই জন্য ইহা নিত্য এবং সসার। এই কারণে "মানুষের দেবতা হওয়া" কথাটাও অলীক না হইয়া সত্য এবং বাদানুবাদ বা মতভেদের কুটিল সীমাকে অতিক্রম করিয়া নিরুপদ্রব অভিন্ন মতের গ্রাহ্য। সভ্য মহোদয়গণ! ভক্ত কিরূপে দেবতা হইতে পারে অর্থাৎ মনুষ্য কিরূপে দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়টি আমি তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ শাস্ত্র, দ্বিতীয়তঃ যুক্তি, তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* সাহিত্য-সভার ৯ম বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আমি প্রথমেই শাস্ত্রপ্রমাণকে প্রধান ও আদি প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মবাক্য। ইংরাজিতে পাঠ করা যায় Man speaks to God through prayer, and God speaks to man through scriptures—অর্থাৎ পূজা, ধ্যান, প্রার্থনাদি দ্বারা মনুষ্যেরা ঈশ্বরের সহিত কথা কয় এবং ঈশ্বর, শাস্ত্রসমূহ দ্বারা মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করেন। ইহা অতীব যুক্তিসঙ্গত বাক্য। প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞানী মহর্ষিগণ যাহা লিখেন বা বলেন—অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষগণ যাহা উপদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন, তাহাই শাস্ত্র। মানুষের দেহ মন ও আত্মার কল্যাণের জন্য, সমাজের শাসন জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, অধর্ম্ম দলনের জন্য এবং ইহকালের ও পরকালের সদ্গতির জন্য যে গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহাই শাস্ত্র। "The sacred scriptures were written by holy men who were moved by the Holy spirit of God" অর্থাৎ পবিত্রাদপি পবিত্র ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারই বাক্য যাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রকার এবং তাঁহাদের গ্রন্থই শাস্ত্র; কারণ ইহা ব্রহ্মবাক্য। মহর্ষি মনু মহোদয় বলিয়াছেন—"বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু" এবং তিনি আরও বলেন, "ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ"। বিদ্যাতসম্পন্ন এবং ব্রহ্মবীর্য্যসম্ভূত অগ্নিসমতুল্য দেব ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাই শাস্ত্র।

যথা দিক নির্ণয়ে চুম্বকো মুখ্যসাধকঃ।
তথাহি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সত্যং সত্যং সর্ব্বযুগে॥

খৃষ্ট বলিতেন, Man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. এস্থলে every word of God শব্দে ব্রহ্মবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্র। খৃষ্টানদের মত এই—Scriptures are the words of God অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বাক্য। মুসলমানেরা বলেন, আল্‌মুল্‌ক য়োয়াদীন তয়োয়ামীনী, আল্‌ফক্‌র্ উল্ রব্, আল্ মোসাহফ্ উল্ রব্। অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সমতুল্য এবং সাধু ও সাধুবাক্য, ঈশ্বর ও ঈশ্বরবাক্য সমতুল্য। শাস্ত্র ব্রহ্মবাক্য। সুতরাং শাস্ত্রের প্রমাণ প্রথমেই দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা যেমন আমাদের শাস্ত্র মানি, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে তদ্রূপ মানিয়া থাকেন এবং তদ্রূপ ভক্তি ও বিশ্বাস করেন। হিন্দুশাস্ত্রের কথা পরে বলিব, এক্ষণে খৃষ্টানদের শাস্ত্রসম্বন্ধেই প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক।

বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট খণ্ডে লিখিত আছে, যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, He who hath seen me hath seen my Father (অর্থাৎ) যিনি আমাকে দেখিয়াছেন, তিনি আমার পিতাকে দেখিয়াছেন। এস্থলে ইংরাজি Father শব্দের প্রথম অক্ষর Capital (বড় অক্ষর); "ফাদার" শব্দের প্রথম অক্ষর ছোট থাকিলে ইহার অর্থ হয় ঔরস পিতা অথবা জনক, বড় অক্ষর থাকিলে অর্থ হয় "স্বর্গস্থ পিতা" অর্থাৎ পরমেশ্বর। এস্থলে আমাকে যিনি দেখিয়াছেন তিনি আমার পিতাকে দেখিয়াছেন অর্থে যিশু তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা পরমেশ্বর হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা দেখাইলেন, কিন্তু ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার পিতাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দেখা হয়। ইহাতে যিশু আপনার দেবত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তাহার পরে একস্থলে বলিয়াছেন, I can do nothing myself. All power hath been given to me by my Father in Heaven. Whatever I do, I do through Him (অর্থাৎ) আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না; আমাকে আমার স্বর্গস্থ পিতা সমুদয় ক্ষমতা দান করিয়াছেন, আমি যাহা কিছু করি, সেই স্বর্গস্থ পিতা পরমেশ্বরের শক্তিতে করিয়া থাকি। এস্থলে বুঝা গেল, যিশুখৃষ্ট বলিতেছেন, তিনি সাধন বলেই হউক, অথবা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলেই হউক, অথবা ভগবানের অযাচিত করুণাবলেই হউক, এক্ষণে এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন যে, তিনি দেবতার ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ। আর এক স্থলে যিশু বলিয়াছেন, I and my Father are one. এই উক্তির অন্তর্গত Father শব্দের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর, ইহার অর্থ পরমেশ্বর। এই পঙ্‌ক্তিটির অর্থ এই যে, আমি এবং আমার স্বর্গস্থ পিতা পরমেশ্বর এক। এস্থলে সাযুজ্য মুক্তির কথা উঠিতে পারে। যাঁহারা ঈশ্বর সমীপে তাঁহারা সামীপ্যবাদী, যাঁহারা ঈশ্বর লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে তাঁহারা সালুক্যবাদী, আর যাঁহারা ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গিয়া ভাগ্যবলে জীবন্মুক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সাযুজ্যবাদী। বাইবেলে লিখিত আছে, এক সময়ে একজন শিষ্য যিশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে প্রভো! আপনি "পিতা" "পিতা" বলিয়া থাকেন, সেই পিতা কোথায়? আপনি সত্য, অনন্ত জীবন ও ধর্ম্মপথের কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, এখন জিজ্ঞাসা করি এই সত্য কি? অনন্ত জীবন ও ধর্ম্মপথ কোথায়? যিশু উত্তর করিলেন, হে প্রিয় শিষ্য! এতকাল আমাকে দেখিতেছ, আবার এখনও কহিতেছ পিতা কোথায়? হে শিষ্য! আমিই সত্য, আমিই অনন্ত জীবন এবং আমিই পথ। "I am the Truth, the Life and the Way." যিশুর এই কথায় অনেকের মত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমি কেবল এইটুকু দেখাইতেছি যে, বাইবেলেও মানুষের দেবভাবের কথা আছে। কেবল দেবত্ব নহে, ঈশ্বরত্ব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্তির কথাও আছে। আর একস্থলে যিশু খৃষ্ট য়িহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের আদি পুরুষ ইব্রাহিমের পূর্ব্বেও আমি বর্ত্তমান ছিলাম"। য়িহুদীরা ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, "কি ধৃষ্টতা! কি ধৃষ্টতা! তোমার এই সামান্য বয়স, তাহাতে তুমি গর্ব্বিত হইয়া কহিতেছ যে, আমি আদিপুরুষ ইব্রাহিমের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলাম।" যিশু কহিলেন, Before Abraham was I am (অর্থাৎ) য়িব্রাহিমের পূর্ব্বেও আমি আছি, কারণ আমি নিত্য বর্ত্তমান। আমাতে "আমি ছিলাম" বা "আমি থাকিব" একথা সাজে না, কারণ "আমি (নিত্য) আছি," ইহাই আমার ধর্ম্ম। মুসাকেও ঈশ্বর কহিয়াছিলেন, "আমি আছি, ইহাই আমার নাম"—O Moses! Call them that my name is I am that I am—হে মুসা! আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিও, আমিই সেই যিনি "নিত্য আছি" অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান। যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরের এই উক্তি বা বচন উদ্ধৃত করিয়া য়িহুদীদিগের নিকটে কেবল দেবত্ব নহে, নিজের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাশয়গণ! বাইবেলের নূতন খণ্ড ও পুরাতন খণ্ডান্তর্গত সমুদয় পুস্তক মধ্যে মনুষ্যের দেবত্বপ্রাপ্তির কথা আমি দেখাইয়া দিতে পারি। আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাধু পল যখন একদা লিষ্ট্রা নগরীতে এক চিরখঞ্জ মনুষ্যকে খঞ্জত্ব হইতে মুক্ত করেন এবং অসাধারণ

বাগ্মিতা সহকারে বক্তৃতা করেন, তখন লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, The gods are come down to us in the likeness of men অর্থাৎ দেবতারা মনুষ্যাকারে আমাদের নিকটে আসিয়াছেন। এই কথা Acts নামক পুস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে লিখিত আছে। মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব—এই ধারণা লিষ্ট্রা নগরীর লোকদিগের মনোমধ্যে বদ্ধমূল না থাকিলে তাহারা কখন এরূপ কথা কহিত না।

মিলিটা দ্বীপে সাধু পলকে তথাকার লোকেরা কহিয়াছিল, "তুমি দেবতা" (Acts Ch. 28, Vol. 6) ইহাতে বুঝাইতেছে, মানুষের দেবত্বের ধারণা প্রাচীনকালেও নানাদেশে বর্ত্তমান ছিল। বাইবেলের আর একস্থলে লিখিত আছে, এক সাধুকে এতদ্দেশীয় লোকেরা বলিয়াছিল, "আপনি দেবতা হইয়া গিয়াছেন," এই উক্তিতেও মানবের দেবত্ব প্রাপ্তির পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। এক্সোডস্ অর্থাৎ "যাত্রা" পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে লিখিত আছে, "তুমি তাহাদের নিকটে দেবতা হও"; ঐ পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে লিখিত আছে, ঈশ্বর কহিলেন, "হে মুশা! আমি তোমাকে ফেরোণ বাদসাহের নিকট দেবতা করিয়াছি।" হোসিয়া নামক পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লেখা আছে, "তাঁহার এমন শক্তি হইয়াছিল যে তিনি দেবতার শক্তি রাখিতেন।" ঐ পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে লিখিত আছে, "যিহুদা নামক সন্ন্যাসী বা যোগী, ঈশ্বরের সহিত একত্র থাকিয়া রাজ্য করেন।" অর্থাৎ তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। লুক, জন, রোমিও, ফিলোমেন প্রভৃতি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতেছি—(যথা) "তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হইয়া দেবতাদের সমতুল্য হইলেন; তিনি ঈশ্বরের অপৌরুষেয় সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন; তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য হইলেন, তিনি নিজে দেবতায় পরিণত হইলেন।" ইত্যাদি। যিশুখৃষ্টের কথা বিশেষ করিয়া এস্থলে কহিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সমুদয় নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ এবং বাইবেলের পুরাতন খণ্ডের "আইজায়া" প্রভৃতি পুস্তক যিশুর দেবত্ব প্রাপ্তির অগণ্য বিবরণে পরিপূর্ণ। মহাশয়গণ! আমাদের সংস্কৃত "সাম" শব্দ ও ইংরাজি Psalm শব্দ একই অর্থ বাচক। দায়ুদ (David) রাজার সামগান হইতে কতকগুলি পংক্তি বা প্রার্থনাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—"হে ঈশ্বর! তুমি ও আমি ভিন্ন নই; আমাতে তুমি আছ, তোমাতে আমি আছি; আমাদিগকে তুমি তোমার করুণাবলে অসাধারণ সামর্থ্য দিয়া তেজস্বী করিয়াছ। আমরা অপৌরুষেয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি।" (অর্থাৎ দেবতা হইয়া গিয়াছি)। "হে ঈশ্বর! আমি তোমার অংশ ছিলাম, তোমাতে স্বতন্ত্র ছিলাম, এক্ষণে তোমার কৃপাবলে জেহবুণ্ প্রাপ্ত হইয়াছি।" সভ্যমহোদয়গণ! জেহবুণ্ শব্দ খাষ হিব্রু ভাষার শব্দ, ইহা য়িহুদীদের ভাষা, ইহার অর্থ দেবত্ব; এই শব্দ জেহোভা শব্দ হইতে উৎপন্ন। সাম পুস্তকের ৮৪ গীতে কোরার সন্তানগণ ঈশ্বরকে কহিতেছেন, হে ঈশ্বর! তোমার সামর্থ্য যাহাতে আছে, সেই দেবতা।" ৮৯ গীতে আছে, ঈশ্বর কহিতেছেন, "আমি আমার অনুগৃহীত বা নির্ব্বাচিত লোকদিগকে এক বিশেষ চিহ্ন দিয়াছি" যে চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যগণ জানিতে পারিবে যে, ইহারা আমার এবং আমি ইহাদের। জেরীমায়া গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে লিখিত আছে, "ঈশ্বর আমার অংশ।" ৯০ গীতে মুসা কহিতেছেন, "হে

ঈশ্বর, তুমি আমার বাসস্থান" অর্থাৎ তোমাতে আমি আছি। ১৬ গীতে আছে, দায়ুদ রাজা কহিতেছেন, "হে ঈশ্বর! তুমি আমার পেয়ালা।" ইহা ভক্তের মাধুর্য্য রসের বাণী। নম্বর্স নামক পুস্তকের অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে লেখা আছে, ভগবান্ কহিলেন, "হে এরণ! আমি তোমার অংশ।" একসোডশ পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে মুসা কহিতেছেন, "হে ঈশ্বর! যদি আমি তোমার কৃপা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাতে থাক ও আমার সঙ্গে চল এবং আমাকে অংশীদার কর। অথবা উত্তরাধিকারীরা পিতার যেমন সর্ব্বস্ব পায়, তেমনি আমি যেন তোমার উত্তরাধিকারী হই।" এই সকল শ্লোকে বেশ বুঝা যায়, মানুষের দেবত্ব ভাবের ধারণা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। য়িহুদীদের হিব্রু বা ইব্রিয় ভাষার শাস্ত্রে নরক বা স্বর্গ কিংবা পরমাত্মা এই তিনটি শব্দ নাই। "সিত্তল" শব্দ আছে, ইহার অর্থ ভূগর্ভস্থ গর্ত্ত। সিউকী শব্দ আছে, তাহার অর্থ জীব অথবা জীবাত্মা (পরমাত্মা নহে); পূর্ব্বজন্মের বা পরজন্মের কথা আদৌ নাই; কিন্তু তথাপি তাহারা মানবের দেবত্ব প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গে নশ ধাতুর অনটে যে পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ নাশন, কিংবা পুংলিঙ্গে নশ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে যে শব্দ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ নাশ, য়িহুদীদের হিব্রু ভাষায় সেই নাশ শব্দ নরক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নাশ শব্দ আশ্চর্য্য রূপান্তরে গ্রীক ভাষায় গেনাশিন এবং হিব্রুতে জিনেশা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইহারই অর্থ হিব্রুভাষায় নরক। য়িহুদীদের শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ দেবতা হইয়া গেলে জিনেশায় যায় না। সভ্য মহোদয়গণ! আমি আমার জীবনের বহুকাল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যয় করিয়াছি এবং বাইবেল ও যিশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্ম্মকে বুঝিবার জন্য বহুক্লেশে ও বহু অসুবিধা ভোগ করিয়া মূল হিব্রু ও গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়াছি, তদ্ভিন্ন খৃষ্টানদের থিয়লজীকেল কলেজের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াছিলাম। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলে, মানুষ দেবতা হইতে পারে এবং ঈশ্বরও মানুষকে দেবতা করেন; তবে অবশ্য একথা স্বীকার্য্য সকলে দেবতা হয় না এবং সকলকেই ভগবান্ দেবতা করেন না। যে সকল খৃষ্টান পাদ্রী অথবা পাদ্রিনী কিংবা খৃষ্টান চেলাগণ একথা অস্বীকার করিয়া বলে, যিশু ভিন্ন আর কেহ দেব হয় নাই বা হইতে পারে না, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রকৃত কথা এই, যিশুখৃষ্ট এসিয়া দেশের অর্থাৎ আমাদের প্রাচ্য মহাদেশের লোক; ইউরোপ বা আমেরিকা তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝিবে? বাইবেলকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে বা বুঝাইতে পারে এমন পাদ্রী আমি শতকরা দুইজনকেও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, ইহারা খৃষ্টকে মিলিটারী কাপ্তেনের মত সাজাইয়া সৈনিক গোরার ছাউনীতে বসাইয়া রাখে, সুতরাং এসিয়ার আসল খৃষ্টকে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের খৃষ্টকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টকে যদি কেহ বুঝিয়া থাকে বা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রাচ্য দেশের লোক, প্রতীচ্য দেশের লোক নহে। কলিকাতার কলের জল পান ক'রে, বালাম চা'ল খেয়ে ট্রাম কিংবা ছ্যাকড়া গাড়ীতে চোড়ে আর ইংরাজী স্কুলে পড়ে যে ছেলে মানুষ হয়েছে, সে যদি পাড়াগাঁয়ে যায়, আর আলবার্ট ফ্যাশনের টেরি কেটে, গার্ডচেন্ ঝুলিয়ে, চুরুট টান্‌তে টান্‌তে, ইংরাজী-বাঙ্গালা কথা কইতে কইতে, জুতা পায়ে দিয়া চেয়ারে বসে বলে "ভাত নিয়ে এসো, ভাত খাব," তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ের

লোকেরা হাঁ করে চেয়ে ভাবে, এই একটা অদ্ভুত জীব—কিম্ভূতকিমাকার গজগজাম্বখণ্ডম্ জীব—কোথা হ'তে এলো! তাহারা যেমন ইহাকে স্বতন্ত্র জীব ভাবে, তেমনি পাড়াগেঁয়ের একটা লোক এসে যদি হাবড়ার পুল, রাস্তার ইলেক্‌ট্রিক্ আলো, বহুবাজারের মোড়ের ট্রাম গাড়ী, রাস্তার জলের কল আর রাজেন্দ্র মল্লিকের সুবৃহৎ বাড়ী কিংবা ষ্টার বা মিনার্ভা অথবা কোহিনুর থিয়েটার দেখে হাঁ কোরে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকেও কলিকাতার বাবুরা অসভ্য ও বুনো ভূত বলে তামাসা করে। সেইরূপ আমরা যখন সাহেবদিগের নিকট আমাদের প্রাচ্য হিসাবে যিশুখৃষ্টের কথা কই, সাহেবেরা হাঁ করিয়া থাকে, আর আমাদিগকে বোকা নেটীব বলিয়া উপহাস করে, আবার তাহারা যখন ইউরোপীয় বা আমেরিকান বেশভূষায় আসিয়া দেশের খৃষ্টকে সাজায়, আমরাও তখন হাসি। যাহা হউক, খৃষ্টানধর্ম্ম ও খৃষ্টানশাস্ত্র মনুষ্যের দেবত্বলাভ বিষয়ে বিরোধী নহে। ইংরাজিতে যিশুখৃষ্টের যত প্রকার জীবনচরিত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে (আমার বিবেচনায়) ডিন্ ফেরার সাহেবের Life of Christ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এমন সুন্দর ইংরাজি লিখিতে, এমন ভক্তি মাখা মধুময়ী ভাষায় রচনা করিতে, ইংরাজদের মধ্যে অতি অল্প লোকই দেখা যায়। ইহার কারণ কি জানেন? ফেরার সাহেবের পিতা ভারতবর্ষে পাদ্রী ছিলেন এবং এই দেশেই ফেরারের জন্ম হইয়াছিল; ইউরোপে তিনি শিক্ষিত হইলেও, ভারতের জল বায়ু ও খাদ্য তাঁহার ধাতুতে মিশিয়া গিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "In the Christian scriptures, inclusive of also the thirty nine books of the Old Testament, we have the dualistic and non-dualistic phases, which teach the immanency of God, and include such ideals as God dwells in us and that we are parts of one stupendous whole." যাহা হউক, এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা সংক্ষেপে কহিয়া লইতে আকাঙ্ক্ষা করি। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটি প্রমাণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন, ভুবনবিখ্যাত বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্যের নাম ছিল আনন্দ। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পল্ কেরশ সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে The Gospel of Buddha নামক এক প্রখ্যাত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের একটিমাত্র স্থল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। And then the Lord (Buddha) spoke thus to Ananda, O Ananda! Be it known to Thee that Many Buddhas came and passed away before my birth. It is not for every man to become a Buddha, for Buddha lives in them who lives in him, and when they live in Buddha, Buddha lives in them. Many attained to Buddhahood as I did, and they who live in Buddha or are salvated by their Karma, through Buddha, become Buddhas or attain to Buddhahood. ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, হে শিষ্য আনন্দ! যে কেহ বুদ্ধে থাকে, বুদ্ধ তাহাতে থাকেন। বুদ্ধ যাঁহাকে মুক্তি দেন অর্থাৎ বুদ্ধের কৃপায় কর্ম্মশৃঙ্খলের মায়াময় বন্ধন হইতে যে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বুদ্ধ হয়।

এক্ষণে জৈন শাস্ত্রের কথা কহিব।

জৈনেরা শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী এই দুই সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ বিভক্ত। শ্বেতাম্বরীরা ব্রাহ্মণ, বিগ্রহ প্রভৃতি মানেন; দিগম্বরীরা মূর্ত্তি পূজা করে না। মাড়োয়ারীদের মধ্যে অনেকে দিগম্বরী জৈন, ইহাদের সামাজিক ভাষার নাম মুণ্ডী। এই ভাষায় ইহাদের চিঠিপত্র ও খাতা লিখিত হয়। এই ভাষা হিন্দী, উর্দ্দু, পার্শী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে এক প্রকার অদ্ভুত খিচড়ীবৎ। এই ভাষায় আকার, ইকার, উকার নাই; সুতরাং বাবা, বিবি, বুবু, বাবু, বোবা একই প্রকার লিখিত হইয়া থাকে, পাঠকের বুদ্ধি থাকেতো বুঝিয়া লইবেন, নতুবা বাবু কখন বিবি হন এবং বিবি কখন বাবু হইয়া যান। এইজন্য এই ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন, তথাপি দিগম্বরীদিগের "নিরক্ষু পদম্" নামক গ্রন্থের মুণ্ডী ভাষার অনুবাদ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় একটা শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি। ঐ গ্রন্থে লেখা আছে—"

টাবর্ ঠো চোখা ছে
ওম্‌রে বাড়্‌তি হ্যায়।
সো বরম্ জ্ঞান ভতীয়া
তীর্থঙ্কর দেব হতো ক্যায়।

এই শ্লোকের ওকার, আকার, ইকার প্রভৃতি আমি বসাইয়া দিয়াছি। ইহাতে 'টাবর্' মাড়োয়ারি শব্দ, 'ছে' গুজরাটী শব্দ, 'ওম্‌রে' পার্শী শব্দ, 'বাড়্‌তি' হিন্দী শব্দ, 'হ্যায়' উর্দ্দু শব্দ ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই —তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া সুন্দর শিশু হইয়াছিলেন, তদনন্তর বয়োবৃদ্ধি সহকারে বরম্ জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিয়া এবং তাহাতে আলোকিত হইয়া দেবতা হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রোতৃমহোদয়গণ! বোধ হয় জৈন শাস্ত্রের আর প্রমাণের আবশ্যক করে না। এখন বাকি আছে—মুসলমান শাস্ত্র। আমি দেখাইব, ইসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মানুষের দেবত্ব প্রাপ্তির কথা এবং অধিক কি পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তির কথা সুন্দরভাবে ও সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। মোলানা সেখ সাদি পারস্য ভাষার অমর কবি; এই শ্রদ্ধাস্পদ মহাকবি যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। তিনি গোলেস্তা কাব্যে লিখিয়াছেন,—

পররে তাউশ্ বর্ আওরাক্
মোসাহফ্ দিদম্।
গোফ্‌ৎ মে মন্‌রলৎ অজ্
কদ্‌রে তমম্ বে বেনম্ বেশ্॥
গুফ্‌ৎখামোষ! হরা কস্‌কে
জমালে দারদ্।
হর্‌জাকে পয়নেহদ্ দসৎ
বদারন্দেশ্ পেশ্॥

অর্থাৎ এক সময়ে ভাবুক ও সাধক কবি সেখ সাদি কোরাণ শাস্ত্রের পাতার মধ্যে এক ময়রের পালক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "রে পক্ষিপালক! তুমি এত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইয়া সুপবিত্র কোরাণ শাস্ত্র মধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলে? ইহাত তোমার উপযুক্ত স্থান নহে, এই কোরাণ ব্রহ্মবাক্য।" ইহা শুনিয়া পালক কহিল "হে কবি! এই জগত সৌন্দর্য্যের চির পক্ষপাতী। যে সুন্দর হয়—অর্থাৎ যে চরিত্রে সুন্দর হয়, বিদ্যায় কি রূপে সুন্দর হয়, গুণে বা ধর্ম্মে সুন্দর হয়—তাহাকে মনুষ্যেরা উচ্চ স্থানেই বসাইয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া কবি ভাবিলেন তবে তো দেখিতেছি, এই বিশ্বমণ্ডলে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, এবং সুন্দরতর হইতে সুন্দরতম যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রভু ভগবান্। ভগবানের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য স্মরণ করিতে করিতে মহাকবি সাদী নেমাজ করিতে বসিলেন। নেমাজ সমাপ্ত হইলে লিখিলেন,—

হর্‌চে বুয়দ্ দর্ জাঁহা শনতে পর্‌বর্দ্দী গার্।
জল্ বয়ে শাণা দরো অস্‌ৎ বযে আস্‌কার্॥
চশম্ কুজা বাসদৎ দিদায়ে মানী বেয়ার।
হর্ বরকে দপ্তরেস্‌ৎ মার্ফতে কির্‌দ্‌গার॥

এই মনোহারিণী কবিতার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—"সমস্ত বিশ্বমণ্ডল ভগবানের সৌন্দর্য্য ও অপার বুদ্ধি কৌশলে পরিপূর্ণ। হে মানবগণ! তোমরা চর্ম্ম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আধ্যাত্মিক চক্ষুদ্বারা ভগবান্‌কে দেখ; বৃক্ষের প্রতি পত্রে পত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমাতে (অর্থাৎ মনুষ্যে) তাঁহার শক্তি দেখিতে পাইবে," এই শক্তি দেব-শক্তি। পারস্য ভাষায় সেখ খস্‌রো আর একজন মহাকবি। এমন কবি, এমন ভাবুক, এমন সাধক, এমন ভক্ত, এমন যোগী পৃথিবীর সাহিত্যে অধিক নাই। ইহাঁর একটি অতীব মনোহর এবং অতীব বিখ্যাত গজল হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

মন্‌তম্ সুদম্, মন্ তো সুদী।
মন্ তো সুদম্, তু যাঁ সুদী।
তা কস্‌নে গোয়েদ্ পশ্ অজীম্।
মন্ দিগরম্ তু দিগ্‌রী॥

আহা কি সুন্দর কবিতা! ভক্ত কবির, যোগাভ্যাসী মহাকবির কি মধুর ভাবোচ্ছ্বাস! তিনি বলিলেন, "হে প্রভো দয়াময়! তুমিই আমি, আর আমিই তুমি। তুমি আমি হইয়া গিয়াছ, আর আমি তুমি হইয়া গিয়াছি।" শ্রোতৃমহোদয়গণ! এই ভক্তাধিক ভক্ত খস্‌রো কবি যখন মাধুর্য্য রসে আপ্লুত হইতেন, তখন তাঁহার চিত্ত-চকোর সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের উৎসস্বরূপ দয়াল হরির পদ-প্রেমসুধা পান করিতে করিতে পরমানন্দে গাহিয়া বেড়াইত—

অ্যায় চেহেরে জেবায়্ তো রস্‌কে
বোতানে অজ্‌রী।
হর্ চন্দ ওয়াশ্‌ফ্‌ৎ মি কুনম্
ওয়াজ্ হুশ্‌নে যাঁ বালা তেরী॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহভাগ্যবতী গোপিকা সুন্দরীগণের ন্যায় অথবা প্রেমময়ী সাক্ষাৎ জগদম্বাস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার. সর্ব্ব ঘটে এক মাত্র ভগবৎ দর্শনের ন্যায় সেখ খস্‌রো কেবল ভগবান্‌কেই দেখিতেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে করিতে বলিতেন;—

মন্ দিগরম্ তো দিগ্‌রী।

"তুমি আমি হইয়া গিয়াছ, আর আমি তুমি হইয়া গিয়াছি।" ইহাই পূর্ণ দেবত্ব প্রাপ্তির লক্ষণ, এই ভাবেই মহামতি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "শিবোহং" আমিই শিব এবং এই ভাবেই খৃষ্ট বলিয়াছিলেন I and my father are one এবং এই ভাবেই মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায়স্থ ফকিরেরা বলেন, "আনল্ হক্ অথবা মি আল্ হক্"—আমিই দেবতা—আমিই সেই নিত্য সত্য পুরুষ। এই ভাবেই হুগলী জেলার সেই সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান যাত্রাওয়ালা সেখ বক্কা উল্লা (ওরফে বকো সেখ) বিহ্বল হইয়া পরমানন্দে গাহিত;—

মন কারে ডাক মা শ্যামা বলে।
আমিই কালী, বনমালী,
আগুণে যেমন আলোক জ্বলে॥

অর্থাৎ আগুণ হইতে উত্তাপ ও আলোক যেমন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, আমা হইতে অর্থাৎ সাধক হইতে ভগবান্—এবং ভগবান্ হইতে সাধক বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। মানুষ দেবতা হইয়া গেলে, সে স্বয়ংই কালী হয়, আর কৃষ্ণ হয়। জগৎপূজ্যা মাতা জগদম্বা যেমন এক রূপে স্বামীর বক্ষে পা দিয়া দাঁড়ান, আবার আর এক রূপে স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দক্ষযজ্ঞে প্রাণ দেন, আবার একরূপে হরগৌরী হইয়া হর ও গৌরীর একত্ব প্রতিপাদন করেন অর্থাৎ পুরুষ

ও প্রকৃতি রূপের ভিন্নতা দেখাইয়া আবার একত্ব বুঝাইয়া দেন, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবকে প্রথমে সাধারণ মানুষ বলিয়া বোধ হয়, তদনন্তর মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, তাহার পরে দেবত্ব প্রাপ্তি হইতে দৃষ্ট হয়। মুসলমানদের কোরাণ হইতেও অনেক আয়েৎ উদ্ধৃত করিয়া আমি ইহা দেখাইতে পারি। মহম্মদ নিজেই নুর-এ-খোদা অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্যোতি বলিয়া আখ্যাত, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই অনাদি অনন্ত—"নান্তং না মধ্যং ন পুনস্তবাদিং"—

জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেখ সাদি, মহম্মদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

হবিবে খোদা অস্‌রফে অম্বিয়া।
কে অর্‌শে মজিদস্ বুয়দ্ মুতেকা॥

ইহাই দেবত্বের লক্ষণ ও মুসলমান শাস্ত্র মতে দেবত্বের প্রমাণ। কোরাণ শাস্ত্রেও ইহার অনেক প্রমাণ আছে, নানা কারণে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। মহম্মদ নিজে বলিয়াছেন, "সক্‌লে এন্‌সা ম্যায় খোদা থা মুঝে মালুম ন থা। হক্ সে না হক্ ম্যায় জুদা থা, মুঝে মালুম ন থা।" অর্থাৎ মানব শরীরে আমি ঈশ্বর ছিলাম। আর হিন্দু শাস্ত্রের ত কথাই নাই, হিন্দু শাস্ত্রে এ কথার সুগভীর ভাবে এবং অতীব সুন্দররূপে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু জাতিতে দেবতা শব্দ গার্হস্থ্য শব্দ। বালক বালিকারাও জানে পিতৃদেব, গুরুদেব, ইত্যাদি। আমি হিন্দুশাস্ত্র সাগর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমাণরত্ন সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমি হিন্দুজাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব, সুতরাং শাস্ত্র-প্রমাণ এস্থলে তুলিলাম না। আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম প্রথমে শাস্ত্র, তাহার পরে যুক্তি, তদনন্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শাস্ত্রের কথা বলিয়াছি, এখন যুক্তির কথা বলিব। তাহার পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উল্লেখ করিব। এ বিষয়ে যুক্তি কি বলে দেখা যাউক।

বন্ধুগণ! এই মায়াময়, দুঃখময় অনিত্য সংসারে প্রকৃত ভক্তের হৃদয়টি বিমল প্রেমের অগাধ সরোবর এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই প্রেম-সরোবরে সোণার কমল। ধর্ম্ম শরত ঋতু, ভাব তরঙ্গ, আর আনন্দ সমীরণ। ভক্তের হৃদয়রূপ প্রেম সরোবরে যখন আনন্দরূপ সমীরণের বলে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তখন ভগবান্‌রূপ সোণার কমল দুলিতে থাকেন, ভক্তবৎসল ভগবানের তখন সিংহাসন টলে। ভক্তের ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রেমসরোবরে তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া সোণার কমলকে দোদুল্যমান্ করে; যে তাহা দেখিয়াছে—জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে এই তরঙ্গের তালে তালে যে কখন নাচিতে নাচিতে গাহিতে পারিয়াছে—ধরাধামে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ বা ভাগ্যবতী রমণীর মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। সে ভাবের ভাষা নাই, সে ভাব প্রকাশের যথাযোগ্য শব্দ নাই, সে ভাব প্রকাশ করিতে সাধারণ মনুষ্যের সামর্থ্যও জন্মে না। তাহা কেবল প্রেমিকের প্রেমের ভাষায় অভিব্যক্ত হইতে পারে, কারণ তাহা বাক্‌শক্তিহীন মনুষ্য কর্ত্তৃক সুস্বাদু ফলের মধুরতার ন্যায় উপভোগ্য, কিন্তু অব্যক্ত। ভক্তের প্রেম-সরোবরে প্রবল তরঙ্গ উঠিলেই ভগবানের সুবর্ণ-সিংহাসন টলে এবং সহাস্যে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে আসিয়া বলেন, "বৎস! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তোমার কিসের অভাব? আমার যাহা কিছু তাহা তোমার। মুক্তি তোমার দাসী, সামর্থ্য তোমার দাস, জ্ঞান তোমার মন্ত্রী, বুদ্ধি তোমার সঙ্গিনী, পরমানন্দ তোমার সেবক, শান্তি তোমার পাচিকা এবং আমার অধিকৃত সমস্ত বিশ্ব

তোমার উপভোগ্য সম্পত্তি, তোমার কিসের অভাব, বাছা! আমার যাহা কিছু তাহা তোমার; তুমি আমার, আমি তোমার।" অথবা আর একদিক দিয়া দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ পতি যখন সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গভীর প্রেমে বিহ্বল হন, তখন বলিয়া থাকেন, হে প্রাণপ্রিয়তমে! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়, প্রণের প্রাণ। সহধর্ম্মিণী তখন বলেন, হে নাথ! তুমিই কেবল আমার নহ, আমিও তোমার। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সুখের সুখ। তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। তুমি ও আমি এক এবং অভিন্ন; দুয়ে এক, উভয়ে একাত্মা। হিন্দু বিবাহের মন্ত্রও তাহাই।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি,
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

অর্থাৎ, প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক। আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ এক হই। হিন্দুর বিবাহ একটা সাধনা এবং সাধনা একটা বিবাহ। শ্যামসলিল-প্রবাহিনী পুণ্যতোয়া যমুনা তটে, ভূতলে ত্রিদিবধাম স্বরূপ সুপবিত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামে, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পূর্ণ নীলকান্তমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যখন ভাগ্যবতী গোপিকাগণ হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া ভাবিয়াছিল, যখন ভগবান্‌রূপ অনন্ত মহাসমুদ্রের মহাপ্রাণ সলিলে আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণবারিবিন্দু মিশাইয়া দিয়াছিল, তখন ভক্ত ও ভগবান্ এক হইয়া গিয়াছিলেন। ভক্তের দেহে আর 'আমিত্বভাব' (অহংভাব) ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এখন এমন নির্ব্বোধ লোকও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের এখনও এমন বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোয়ালার সন্তান এবং নীচপ্রকৃতির কামাতুর লম্পট, আর রাইরাণী শ্রীমতী রাধিকা কিংবা 'পরমাত্মা সখি' জীবাত্মস্বরূপিণী গোপিনীগণ ব্যভিচারের পূর্ণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু মণিকার না হইলে মণি চিনিবে কিরূপে? মায়ামুগ্ধ নির্ব্বোধ মানুষ কি সহজে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারে? কৃষ্ণের কৃপা না হইলে কৃষ্ণকে জানা কঠিন হইতেও কঠিনতর।

কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণ অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

আর শ্রীমতী রাধিকা! এই রাধিকা সুন্দরীকেই বা কে চিনিতে পারে? "ক কারো ভগবান্ কৃষ্ণ, ঈকার প্রকৃতি রাধা।" এই রাধা—

প্রেম মাখা অঘন, অঘন প্রেম।
রাধা নহে সুধু রাধা, সুধা ভরা হেম॥

বন্ধুগণ! প্রকৃত ভক্তের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ ঠিক শ্রীমতী রাধিকার প্রেম অথবা গোপীকাদিগের প্রেমের ন্যায়। বামে রাধা না থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন হন না; রাধারূপিণী শক্তি না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের গিরি-ধারণক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, রাধার ঐ মধুর মধুর মধুর নামটি লেখা না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় মনোহারিত্ব থাকিত না। রাধা বিনা যেমন কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বিনা যেমন রাধা, ভক্ত বিনা সেইরূপ ভগবান্ এবং ভগবান্ বিনা সেইরূপ ভক্ত। মাধুর্য্যভাবে ভগবদ্ভক্তির শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে এই মাধুর্য্যভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। মথুরা, দ্বারকা, প্রভাস বা কুরুক্ষেত্র তাঁহার অন্যান্য ভাবের লীলা; মধুর শ্রীবৃন্দাবনধামে, পুণ্য প্রবাহিনী যমুনা তটে, রূপের হাটে, নীলকান্ত মণি যে মধু হইতে মধুময়ী লীলা করিয়া ভক্তকে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন, সেই লীলাই মাধুর্য্য রসের লীলা। ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে ভক্তবৎসল ভগবান্ নিত্য এই লীলা করেন। ভক্ত কহেন,—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি করহে কমলাপতি।
আমার প্রেম হবে যমুনা নদী,
ভক্তি হবে রাধা সতি॥

বৃন্দাবনে এই লীলা নিত্য হইয়া থাকে—

শ্রীরাধানন্দনসূনাবনুদিনকুতুকং
গোপবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ।
সার্দ্ধং গোপাঙ্গনাভির্ব্রজমনু চরিতং
কেশ শেষাত্মগম্যং।
নিত্যং গায়ন্তি যে বৈ শ্রুতিকুশলমিমং
স্তোত্ররাজং মুরারে
স্তেষাং স্যাৎ প্রেমভক্তি
র্দৃঢ়নিবিড়তরা গোকুলেশাঙ্ঘ্রিপদ্মে॥

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কবির ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জীবন চরিত।

১৯। ভোলা ময়রা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের এই যে উন্নতি, ইহার মূল ভিত্তি গঠন করিতে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর, সমস্ত জাতির এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরই সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের দ্বারা এই মহা গৌরবান্বিত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের—তিলি, মালি, ধোপা, বেণে, নাপিত, নমশূদ্র হইতে যেমন মুচি জাতীয় ব্যক্তিও বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন আহরণ করিয়া গিয়াছে, তেমন অন্য সম্প্রদায়ের—মোসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিরাও এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য এবং বঙ্গ-ভাষাকে সালঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সম্প্রতি গ্রাম, পল্লীর আশে পাশে আমরা যতই অন্বেষণ করিতেছি, ততই দেখা যাইতেছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক বর্ণজ্ঞান বিহীন নিরক্ষর কৃষকও অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তিতে মণ্ডিত হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে—যশমানের কুহকে না ভুলিয়া, নিজের প্রাণে, নিজের মনে মুখে মুখে সংগীত বা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছে। ইহারা নগর-কোলাহল হইতে বহুদূরে থাকিয়া নীরবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আত্মত্যাগের জলন্ত নিদর্শন পাইয়া বহুদিন পরে সহরবাসী আমরা বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদের জয় ঘোষণা করিতেছি। এই প্রস্তাবে আমরা যে ব্যক্তির আলোচনা করিব, সেও হিন্দুসম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি প্রভাবে যে সুযশ ও সুনাম অর্জ্জন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে যে সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে, তাহা উচ্চ শ্রেণীর অনেক কবির ভাগ্যেই ঘটে নাই। তাহার নাম ভোলা ময়রা, কেহ কেহ ভোলা গায়ক বলিয়াও তাহাকে অভিহিত করিতেন।

ভোলার জন্মস্থান ও পারিবারিক বিবরণ

সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার স্বরচিত গানে পাওয়া যায় যে,—সে জাতিতে ময়রা বা মোদক এবং কলিকাতার বাগবাজারে তাহার বাস-স্থান ছিল। যথা,—

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
সর্দ্দিগর্ম্মি নাহি মানি (ওগো)।
ফুরাইলে বারো মাস, ষড় ঋতুর হয় নাশ,
কেবল এই কথাটা জানি (ওগো) ॥
শীত এলে লেপ লই, গর্ম্মি এলে ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে,
'কবির নেশায়' দিই ঢালি।
কালো মেঘে বর্ষাকালে, বক উড়ে দলে দলে,
ময়ূরের প্যাখমে বাহার ॥
নহি কবি কালিদাস, (বাগ্বাজারে করি বাস)
পূজা এলে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে, ভক্তির চন্দন সনে,
মন-ফুল রামচরণে করি রাজি ॥
শরতে হেমন্তে, বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি।
ষড়ঋতু বারো মাসে, মাঘের মেঘের শেষে,
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার ॥
তবে যদি কবি পাই, হ'টে কভু নাহি যাই,
হোক্ ব্যাটা যতই মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও,
যাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, ভোলা বাগবাজারে বাস করিত এবং স্বব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া পুরী মিঠাই ভাজিতে ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু বড় (মন্দ) কবির (কবিওয়ালার) সাক্ষাৎ পাইলে, তাহার সহিত 'লড়াই' করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। ভোলা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিল,—শ্রীরাম চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান তাহার জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত কৌলিক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পর, কবিওয়ালাদের মধ্যে যখন তাহার প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে কবির দল লইয়া দেশ বিদেশে গাওনা করিয়া বেড়াইতে বহির্গত হয়। এই সময়ে তাহার পিতা জীবিত ছিল। সে এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র (ভোলার কনিষ্ঠ সহোদর) হৃদয়ই এ সময় বাগবাজারের দোকান চালাইত। শুনিতে পাওয়া যায় পিতা কৃপারামের মৃত্যুর পর হৃদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভোলার সহিত পৃথক্ হইয়া তালতলা বাজারে স্বতন্ত্র এক দোকান করে। ভোলার মিঠায়ের দোকানও এই সময় হইতে প্রায় একরূপ বন্ধ থাকিত।

ভোলা বাগবাজারে বাস করিলেও অনেকে তাহার জন্মস্থান অন্যত্র বলিয়া মনে করেন। কেহ বলেন ;—গুপ্তিপাড়ায় তাহার জন্ম হয় এবং ত্রিবেণীতে বিবাহ করে। "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে "বাঙ্গালীর গান" নামক পুস্তকে প্রকাশ,—কলিকাতার সিমুলিয়া ইহার জন্মস্থান ছিল। অপর কেহ কেহ বলেন যে, বাগবাজারের বসু পাড়ায় ইহার জন্মস্থান ছিল। বাগবাজারে যে ইহার বাস-স্থান ও কর্ম্মস্থান ছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ কবি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গানটী ভিন্ন অপর দুই একটী গানেও ভোলার বাগবাজারে অবস্থানের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।

কিন্তু কথা এই, বাগ্বাজারই তাহার জন্মস্থান, কি উহা তাহার কর্ম্মস্থান মাত্র, এ সন্দেহ নিরসনের তো কোনও উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ভারতীতে এক লেখক হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে অবগত হইয়া লিখেন,—"ভোলা ময়রার জন্মস্থান গুপ্তি-পাড়া, ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম; এই ব্যক্তি কিপুময়রা নামে বিখ্যাত ছিল। মাতার নাম গঙ্গামণি। ভোলার বাস্তবিক বাগ-বাজারে দোকান ছিল; তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও জীবিত। ভোলার কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয়নাথ মোদক তালতলায় দোকান করিত, তাহার বংশ এখনও আছে। ভোলানাথ মোদক বাল্য-কালে পাঠশালায় পড়িয়াছিল; সামান্য হিসাব, তালপাতায় খরিদদারের নাম লিখা এবং বড় বড় বানান শিখিয়াই সে পাঠশালা পরিত্যাগ করে। ভোলা সতত রামায়ণ ও মহাভারত পড়িত ও শুনিত, সংকীর্ত্তনে প্রায়ই যোগ দিত; বড় কৃষ্ণভক্ত পুরুষ ছিল; নিত্য গঙ্গাস্নান করিত এবং চরিত্র ভাল ছিল বলিয়া বিশ্বাস। ভোলা বড় রসিক পুরুষ; কণ্ঠস্বরও মন্দ ছিল না।"

ঈশান বাবু কি সূত্রে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ইহার প্রতিবাদ হইতে আমরা দেখি নাই। সুতরাং আমরা ভোলার গুপ্তি-পাড়া জন্মস্থান প্রভৃতি বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। অন্যান্য বিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাগবাজারে দোকা-নের কথা এবং স্বব্যবসায়নিরত থাকার কথা, তাহা ভোলার নিজের রচনা হইতেই অবগত হওয়া যায়, সুতরাং তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
ময়রাই বারো মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি, (ওগো)
কৃষ্ণপদে বাস ॥

ভোলার স্বরচনাতে পূর্ব্ব বিবরণের প্রতি-পোষক এইরূপ বিস্তর প্রমাণ আছে।

ভোলা একবারে নিরক্ষর কবি ছিল না। পাঠশালায় অল্পদিন সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিলেও, গুরুমহাশয়ের কঠোর হস্তের পাঁচনীর অম্লমধুর রসাস্বাদ উপভোগ করি-বার সৌভাগ্য বেশীদিন তাহার অদৃষ্টে না জুটিলেও, গৃহে বসিয়া সে যে কিছু শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা আমরা তদীয় রচনা হইতে বুঝিতে পারি। পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দি-ভাষায় এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। হোসেন খাঁ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, জগন্নাথ বেণে প্রভৃতির সহিত 'লড়ায়ে' এবং তাহার অপরাপর সংগীত হইতে তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ভারতীতে' প্রকাশিত পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ভোলার, কবিওয়ালারূপে প্রসার প্রতিপত্তি লাভের পূর্ব্বকালের রচিত কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভোলা যে নিরক্ষর—বর্ণজ্ঞান-বিহীন কবি ছিল না, তাহার প্রমাণ উহাতেই পর্য্যাপ্তরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধু ভাষা।
বুরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা ॥
বুড়ো বুড়ি * * * যুবক যুবতী।
পাণ পেলে সকলের বাড়ায় পিরীতি ॥
মোষের মত মুন্সী বাবু মসির ন্যায় কালো।
পাণ খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা খানা ভালো ॥
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যবলে পাণ খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া, বাসীমড়া, যার পাণের কড়ি নাই ॥

শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাই ভোলার সর্ব্ব-প্রথম রচনা, ইহাতেই কবির সুন্দর রসিকতা করিবার ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিতার উল্লিখিত এই 'মুন্সী বাবু' কে? অপর কবিতাটী এইরূপ ;—

বামুন বলে 'আমি বড়', কায়েৎ বলে 'দাস'।
বদ্দি বলে 'ক্ষত্রি আমি' (ঢাকা জেলায় বাস)॥
যুগী বলে 'যোগী আমি' চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে যথা কালীঘাটের নস্য॥
বলে 'উগ্র', নহি শূদ্র, রাখি তলোয়ার।
হোলে রাত্রি, উগ্রক্ষত্রি, ভয়ে পগার পার।
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা ময়রাই বারো মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি (ওগো) কৃষ্ণপদে বাস॥

এই কবিতাটী একটী সামাজিক বিবাদ-বিতণ্ডার পূর্ব্বাভাস সূচনা করিতেছে। বর্ত্তমান কালে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে জাত্যোৎকর্ষের যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নমশূদ্র, যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা যে বর্ত্তমানকালেই উৎপত্তিলাভ করিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ বিবাদ বিসংবাদ গালাগালি চলিত। নতুবা ভোলার এ কবিতাটীর কোন সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় না। তৎকালীন সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে।

ভোলার সামান্য যে কয়েকটী গান উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক বর্ণনায় সে বড় নিপুণ ছিল। পাণের কবিতাটীতে গৃহস্থালীর কেমন ছোট খাটো একটু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও দুর্জ্ঞেয় রচনা অপেক্ষা এইরূপ সরল স্বাভাবিক ও সংসারাশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাই তাহার রচনার প্রধান উপাদান ছিল। এই সকল বিষয় বর্ণনকালে সে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি, কি সমাজবিশেষের প্রতি অপ্রিয় সত্য কথা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—"বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।" শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ভোলার গানের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন, 'Bhola's Exsodus ?'*

আমরা এস্থলে ভোলার স্পষ্টবাদিত্বের ও সৎসাহসিকতার একটু ক্ষুদ্র পরিচয় প্রদান করিতেছি। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সবডিভিসনের অধীন জাড়া গ্রাম নামে একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম আছে। তথায় 'রায়' উপাধিধারী এক প্রাচীন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ জমীদার বংশ বাস করিতেন। জাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী মাণিককুণ্ড গ্রাম বৃহৎ মূলার জন্য প্রসিদ্ধ, এখানকার মূলা ৩।৪ হাত লম্বা এবং ওজনে ১০।১২ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নানাস্থানে এই মূলা রপ্তানি হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। একদা ভোলা এই রায় বাবুদের আবাসে গাওনা করিতে উপস্থিত হয়। সেই সময় তাহার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী জগা বেণেও তথায় গাওনা করিতে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করে। জগা বা জগন্নাথ বড় খোসামোদে লোক ছিল, সে একটী গানে 'জাড়াগ্রামটা যেন গোলক বৃন্দাবন, আর রায় বাবুরা যেন পূর্ণব্রহ্ম "শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপে বর্ণন করে, কিন্তু স্বাধীন-চেতা ভোলার নিকট ইহা বড়ই অসহ্য বোধ হয়। তাই সে প্রচুর পুরস্কারের আশা,—ধন রত্ন লাভের সম্ভাবনা বিস্মৃত হইয়া সেই লোকসমুদ্র মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বাবুদের সাক্ষাতেই গাহিল,—

কেমন ক'রে বল্‌লি জগা!
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!

* ভারতী, ১৩০৪ বৈশাখ।

এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন!!
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
জগা! কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড;
সাম্‌নে আছে মাণিক্‌কুণ্ড,
কর্‌গে মূলা দরশন!
কেমন ক'রে বল্‌লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন!!

'কৃষ্ণচন্দ্র' কি সহজ কথা? কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার-সাগরে যিনি (জগা!) তরাইতে পারে॥
বাবু তো বাবু লালা বাবু,
কোল্‌কাতাতে বাড়ী।
বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না, সে ব্যাটা তো
হাড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুক্‌তের মধু অলি।
মাপ কর গো রায় বাবু,
দুটো সত্যি কথা বলি॥
জগা বেণে খোসামোদে, অধিক বল্‌বো কি?
তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

কেমন চতুরতার সহিত গুহ্য কথা প্রকাশ করিল। 'এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা'র অর্থ—বাবুরা গ্রামের জমীদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষা প্রজা এবং তথায় বিস্তর বাঁশের ঝাড় আছে, শুনিতে পাওয়া যায়, উক্ত বাবুরা অতিশয় কৃপণ ছিলেন, তন্নিমিত্ত ভোলা পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, প্রয়োগ করিয়াছে। ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, গাওনা করিতে দলবল সহ ভোলা বাবুদের আলয়ে উপনীত হইলে, দলের লোকদের আহারের নিমিত্ত যে 'সিধা' দেওয়া হইত, তাহাতে প্রায়ই লবণ থাকিত না,—বাবুরা বিনা লবণেই 'সিধা' পাঠাইতেন। এই ঘটনা হইতেই ভোলা—'বেগুণ পোড়ায় লবণ দেয় না' ইত্যাদি পদ্য গাহিয়াছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন, কবির লড়ায়ে যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে, তাহা কবিওয়ালারা উপস্থিতমত আসরে দাঁড়াইয়া রচনা করিত। বাড়ী হইতে অবসরমত ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করিবার সুযোগ তাহাদের ঘটিয়া উঠিত না। ইহাতে রচনা অপকৃষ্ট হইবারই কথা। কবিওয়ালাদের ব্যবসায়ের এইরূপ রীতি না থাকিলে তাহাদের দ্বারা বঙ্গসাহিত্য অধিকতর উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাহারা 'কবি-লড়াই' সময়ে যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছে, তাহা উপেক্ষার জিনিষ নহে। আমরা উপরে যে গীতটী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও উপস্থিত সময়ে আসরে মুখে মুখে রচিত হয়, কিন্তু তাহা 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? কবিওয়ালাদের ইহাই এক সবিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার বিষয়।

ভোলা যেমন অন্যের অযথা প্রশংসাবাদ করিতে পারিত না, বা তাহার সমক্ষে কেহ তদ্রূপ করিলে নীরবে সহ্য করিত না, তেমনি তাহাকে যদি কেহ খোসামোদ বা প্রশংসা করিত, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকিত না। একদা কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস ও তাহার 'কবির-লড়াই' আরম্ভ হয়। সংগ্রামে যজ্ঞেশ্বরের পরাজয় হইবার উপক্রম হইলে, সে লড়াই বন্ধ করিবার আশায় ভোলার খোসামোদ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং একটী গীতে তাহাকে আলাভোলা সদাশিব মহাদেবের (ভোলানাথের) সহিত তুলনা করে, কিন্তু উচিতবক্তা সুরসিক ভোলা তদ্দণ্ডেই তাহার পাল্‌টা গায়,—

আমি সে ভোলা নই, আমি সে
ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই॥

শুনিতে পাওয়া যায়, ভোলা অন্য কবি-ওয়ালার সহিত লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আসরের মধ্যে একছড়া কলা এবং বস্ত্রখণ্ডে একটী টাকা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। লড়াইয়ে যে জয়লাভ করিত, সে ঐ টাকা এবং যে পরাজিত হইত, তাহার ভাগ্যে ঐ মর্ত্তমান কদলী লাভ হইত। ভোলা নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তবে একদিনও যে পরাজয় স্বীকার করে নাই, তাহা বলা যায় না।

এইবার পাঠক মহোদয়গণকে আমরা ভোলার দলে গীত একটী সখী সংবাদ উপহার দিব।

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এত দিনের পর। (চিতেন)
অন্তর জুড়াও ওগো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতর নিরন্তর,
সেই চিকণ কালো হৃদে উদয় হলো,
এখন সুশীতল করগো অন্তর।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ,
উদয় হলে রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিব্‌লো রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণ-বিরহ-অনল;
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ,
অন্তরের পুরাও সাধ,
অন্তর ক'রো না আর নীলকমল।
এ সময়ে পরশিতে বলো না,
হয় পাছে অমঙ্গল।
এই করুন্, ঘুচুক শ্যাম-বিচ্ছেদ
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখি, কৃষ্ণ সুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার।
রাধে তোমার দুঃখ আর,
নাহি সহে গোপীকার,
করিলেন মাধব আজি বিরহানল
বুঝি সুশীতল॥

এই গানটী অনেকের মতে ভোলা ময়রার রচিত, কিন্তু কোন কোন পুস্তকে গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ভোলার দলে গীত নিম্নলিখিত গীতটী সম্বন্ধেও ঐরূপ নানা মুনির নানা মত দেখা যায়।

একভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই;
পেয়েছ যে নূতন নারী,
এখন মন তারি ঠাঁই। (চিতেন)
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ,
প্রাণ তোমার প্রেমামোদ হবে
সে করিবে ক্রোধ,
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব করে কি—দেশান্তরী
করিবে?
বল বঁধু হে, কার কখন মন রাখিবে?
তোমার এক জ্বালা নয়,
দুদিক্ রাখা বল ইথে আর কিসে
প্রাণ বাঁচিবে?
সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?
সবে তোমার একটী মন,
তায় করেছ প্রেমাধীন দুঠাঁয়ে দুজন;
কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ,
আমায় কতবার আর কাঁদাবে?

কেমন সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা! দুই স্থানে প্রেম করিয়া প্রত্যেক প্রণয়িনীর নিকটই ভালবাসা জানাইলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, কবি সেই স্বাভাবিক অবস্থাই তুলিকা-সম্পাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একবার দুর্গোৎসবের সময় শোভাবাজারের রাজবাটীর পূজা উপলক্ষ্য করিয়া ভোলা গান বাঁধে,—

লাগ্‌লো ধুম গুড়ুম গুড়ুম,
শোভাবাজারের পূজা।
বড় ব্যয় (লোকে কয়)
কর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা॥

এই দুই ছত্রেও কবি একটু শ্লেষ করিতে ছাড়েন নাই। পূজায় 'বড় ব্যয়' হইবে, তাহা কিন্তু কেবল 'লোকেই কয়', তিনি নিজে তাহার কোন পরিচয় পান নাই।

'কবিগুরু' হরুঠাকুরের দলে ভোলা প্রথমতঃ শিক্ষানবিশি করে। পরে নিজে পৃথক্ দল করিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত হরুঠাকুর ভোলাকে নূতন নূতন সুরের নূতন নূতন গান যোগাইতেন; ইহাতে হরুর অপরাপর শিষ্যেরা ভোলার উপর বড়ই চটিয়া যায়। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সাতু রায়, ভোলার দলে অবৈতনিক গীত-রচক ছিলেন এবং গদাধর, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ ইহার দলে স্থায়ী বেতনভোগী বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। এই সকল প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের রচিত সংগীতাবলী গাওনা করিয়াই ভোলা দেশ বিদেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করে। বিরহ, সখী-সংবাদ, মান, মাথুর প্রভৃতি গীতাবলী পূর্ব্বোক্ত বাঁধনদারগণ ইহাকে যোগাইতেন, আর কবি-লড়ায়ের গানগুলির অধিকাংশই ভোলা উপস্থিতমত আসরে রচনা করিয়াছে। 'বিরহ মিলন,' 'বিরহ বিবাদ' প্রভৃতি কয়েকটী কবির পালাও তাহার রচিত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

ভোলা বেশ দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিল; ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়। মৃত্যু সময়ে তাহার কোন সন্তানসন্ততি থাকার কথা শুনা যায় না।

"ভোলা কবিওয়ালা যে একজন সুরসিক পুরুষ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। সঙ্গীত বিদ্যা কখনও ভাল করিয়া ভোলা শিখে নাই বটে, কিন্তু নূতন গানের রাগ রাগিণী একবার শুনিলেই তাহা এমন সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া লইত যে, অভ্যস্ত গায়কেরা চমৎকৃত হইয়া যাইত। কথায় কথায় গান বাঁধা, ছড়া তৈয়ার করা, ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভোলার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পাঁচজন লোক একত্রে পাইলে তাহাদিগকে না হাসাইয়া ভোলা যাইত না; প্রবাদ আছে, 'ভোলার মুখে সদাই হাসি'। বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যের মধ্য কালে ভোলা ময়রা এদেশে একজন গণ্য মান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বারোয়ারি, পূজার বাটী, বিবাহ ইত্যাদি স্থানে ভোলার দল না আসিলে সে স্থানের 'চয়ণ' থাকিত না। পল্লীগ্রামের রাখালের মুখে, বাবুদের কুলবধূর মুখে, পাঠশালার ছেলেদের মুখে এবং বাজারে ও দোকানে এক সময়ে ভোলা ময়রার কবি ও ছড়া শুনা যাইত। ভোলার মৃত্যুর পরে অনেক কবিওয়ালার অভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু বাগবাজারের ভোলা ময়রাকে কেহই জিতিতে পারে নাই। বাঙ্গালা দেশে এখন আর 'কবির লড়াই' অধিক নাই। কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যে ভোলা ময়রার যে একটী সুদৃঢ় আসন আছে, ইহাতে সন্দেহ কি?"

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দ সান্যাল।

কলম্বো দর্শন।

আমরা লেডি গরডন (Lady Gorden) নামক বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, পমবাম হইতে কলম্বো যাত্রা করিলাম। প্রায় ১৮ ঘণ্টা সেই পোতে অবস্থিতি করিয়া আমরা পর দিন প্রাতে কলম্বো উপনীত হইলাম। পোতের কাপ্তেন অতি ভদ্রলোক ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিপিন বিহারীর সহিত তিনি মধ্যে মধ্যে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। আমরা অত্যন্ত শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের কষ্ট দেখিয়া উক্ত কাপ্তেন মহাশয়, একটী উচ্চশ্রেণীর কামরায় আমাদিগকে স্থান দিলেন। আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া তথায় সুখে রহিলাম। তুফানে উদ্বেলিত জলধি আমাদের পোতকে লইয়া কত খেলা খেলিতে লাগিল। জলধির খেলা আমাদের মৃত্যু। পাছে আমাদের আতঙ্ক হয়, এবং আমরা তজ্জন্য অবসন্ন হই, এই বিবেচনা করিয়া বিশ্বমাতা আমাদিগকে কোলে লইলেন। আমরা মায়ের কোল পাইয়া সুখে নিদ্রা গেলাম।

প্রভাতে উঠিয়া, পোত হইতে চারি দিকের দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলাম। এ সকল আমাকে মোহিত করিল। বিখ্যাত আদম পিক্ (Adam's peak) বিশেষরূপে আমার মন মোহিত করিল। সূর্য্য-কিরণে দীপ্ত হওয়াতে, উহা একটী সুবর্ণের মন্দিরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই পর্ব্বতশৃঙ্গটী কয়েকটী জাতির নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধগণ উহাকে সুমনকূট কহে। কথিত আছে যে, বুদ্ধ উক্ত পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর উঠিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার পদচিহ্ন আছে। হিন্দুগণ উহাকে স্বর্গারোহণ অথবা স্বর্গের দ্বার বলিত। পর্ত্তুগীজগণ শৃঙ্গটীকে পিকো ডি আদম (Pico-de-Adam) বলিত। এই নাম হইতেই, উহা আদম পিক (Adam's peak) নামধারী হইয়াছে। একটী প্রবাদ আছে যে, আদম (Adam) উক্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই উহা আদম পিক্ (Adam's peak) নামে অভিহিত। রাজা পরাক্রমবাহু উক্ত শৃঙ্গের উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পোত নোঙ্গর করিলে, আমরা একখানি নৌকাযোগে কূলে উপনীত হইলাম। তথায় একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চত্বর দেখিয়া, তাহার উপর উঠিলাম। উহা আতপ-তাপ ও বৃষ্টি হইতে সুরক্ষিত এবং পথিকদিগের আরাম ও আমোদের জন্য গঠিত ও সজ্জিত। সেখানে স্নান ও জলযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং নানাপ্রকার ফল ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। কলম্বো সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপের কথঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

সিংহলের আদিম ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। মহাবংশে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশবাসিগণ তাহাদের আবাস স্থান করিবার পূর্ব্বে, উহা নাগদিগের অধিকারভুক্ত ছিল এবং উহা নাগদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। পরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে, নাগদ্বীপ বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শাক্যমুনি তিনবার নাগদ্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও তথায় গিয়া দ্বীপটীকে পবিত্র করিয়াছিলেন। ইহার পর নাগদ্বীপ লঙ্কা নামে

অভিহিত হইতে লাগিল এবং তাহা পৃথিবীর মধ্যে দেবানুগৃহীত স্থান বলিয়া গণ্য হইল।

বিজয়ের রাজত্বকাল হইতেই সিংহল দ্বীপের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। তিনি খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দ্বীপটী জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। দুইটী রাজবংশ সিংহল দ্বীপে আধিপত্য করিয়াছিল। একটীর নাম মহাবংশ এবং অপরটীর নাম সুলাবংশ। উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রথমটীর নাম মহাবংশ এবং নিকৃষ্ট বলিয়া দ্বিতীয়টীর নাম সুলাবংশ। বিজয়ের বংশধরগণ মহাবংশভুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা আটশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা মহাসেনে ইহাঁদের রাজত্ব শেষ হয়। ইনি ৩০২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুলাবংশীয় রাজগণ ষোলশত খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পর, সিংহল দ্বীপ ইউরোপীয় জাতিদের অধীনে আইসে। বিজয়, সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। সিংহবাহু, বঙ্গদেশের অন্তর্গত লালা (রারা) নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। বিজয়ের স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলিয়া রাজা সিংহবাহু তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বিজয়কে তাঁহার রাজত্ব হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সিংহবাহুর আদেশ অনুসারে, বিজয় সাত শত লোক সমভিব্যাহারে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। তিনি অর্ণবপোত হইতে সিংহল দ্বীপের শোভাদর্শনে মোহিত হইয়া, তথায় অবতরণ করিলেন। তথায়, একটী যক্ষিণীর সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তাহার পরামর্শ অনুসারে, বিজয় কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর যক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন। ইহার পর, বিজয় যক্ষদিগের অধিপতি কালাসেনার বেশ নিজে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে অন্যান্য যক্ষের বেশে সজ্জিত করিলেন। এই বীরোচিত ব্যাপার দেখিয়া লঙ্কাদ্বীপবাসিগণ ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাস ত্যাগ করিয়া দূর বনে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন বিজয়ের সঙ্গী সব, তাঁহাকে লঙ্কার শাসন ভার লইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বিজয় এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, যেহেতু, কোন উচ্চ বংশে তাহার বিবাহ হওয়া আবশ্যক। বিজয়ের সঙ্গিগণ তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মদুরার রাজা পাণ্ডারাকে এ বিষয় জানাইলেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার নিজ কন্যাকে বিজয়কে সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যের বড় বড় লোককে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা যেন বিজয়ের সঙ্গিগণের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাগণকে বিজয়ের সঙ্গীদিগের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। ক্রমে উদ্বাহ কার্য্য সকল সমাধা হইল। ইহার পর, বিজয় লঙ্কাদিপের রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।

বিজয়, লঙ্কাদ্বীপের অধিপতি হইয়া, তাঁহার পূর্ব্বকার কুপ্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া, ন্যায়ানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে, লঙ্কাদ্বীপ সিংহল নামে বিখ্যাত হইল। তাঁহার পিতা কোন সময় একটী সিংহকে বিনাশ করাতে সিংহবাহু নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বিজয় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা জন্য, লঙ্কা দ্বীপকে সিংহল নামে ঘোষণা করিলেন।

খৃষ্ট জন্মিবার ২০৪ বৎসর পূর্ব্বে, দক্ষিণ ভারত হইতে অনেক হিন্দু সিংহল দ্বীপে আসিয়া আবাস স্থাপন করিলেন। ইহাঁদের যোগ্য-বংশধরগণ রাজার অনুগ্রহে উত্তমোত্তম পদে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে দক্ষিণ ভারত হইতে অনেকে পদ পাইবার আশায় সিংহলে আসিতে লাগিল এবং তাহারা নানা কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়া তথায় অবস্থিতি করিল। এতদ্ব্যতীত, সিংহল দ্বীপের অধিপতি, দক্ষিণ ভারত হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সৈন্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে সিংহল দ্বীপের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং মধ্যে মধ্যে সিংহল রাজার সহিত পাণ্ড্য চালুক্য এবং কালেঙ্গা রাজাদের সমর উপলক্ষেও অনেক ভারতবাসীর সিংহলে আবাস স্থাপিত হইল। ক্রমে সিংহলে দ্রাবিড় বা তামিল ভাষাজ্ঞ হিন্দুদিগের পল্লীগ্রাম সংস্থাপিত হইল, এবং সময়ে, তামিল ভাষা, সিংহল দ্বীপের উত্তর অংশের ভাষা রূপে পরিগণিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সিংহলবাসিগণের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বৌদ্ধগণের তৃতীয় মহা অধিবেশন (3rd Convocation) শেষ হইলে পর, বৌদ্ধধর্ম্মের নেতৃগণ, ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। এই সময় অশোক, অবন্তির রাজা ছিলেন এবং দেবানম গিয়াতিস্বা সিংহলে রাজত্ব করিতেছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মিবার তিন শতাব্দী পূর্ব্বে, মাহিন্দা নামক বিখ্যাত থিরা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য সিংহলে আগমন করিলেন। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে আকর্ষিত হইল এবং অবশেষে তিনি চল্লিশ হাজার সিংহল-বাসী সহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর, এক সহস্র স্ত্রীলোক এই ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। তদনন্তর অনুলা নামক একটী রাজকন্যা, তাঁহার পাঁচ শত সখী সহ পৌরোহিত্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য, থিরার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে মহিলাগণকে উক্ত শ্রেণীভুক্ত করিবার অধিকার পুরুষের না থাকাতে পাটলিপুত্র হইতে এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনিকে আনাইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করা হইল। কিন্তু বুদ্ধ যেভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ, অধিক কাল সে ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দুদের কোন কোন অনুষ্ঠান তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিংহলেও এ পরিবর্ত্তনটী পরিলক্ষিত হয়। মহাবংশে লিখিত আছে যে, একাদশ শত খৃষ্টাব্দের রাজা পরাক্রম বাহু নিম্নলিখিত বাটীসকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য একটী সুবর্ণনির্ম্মিত গৃহ, মন্ত্র পাঠ জন্য একটী বিষ্ণুমন্দির, জটক পাঠ শ্রবণ জন্য একটী গোল গৃহ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত পবিত্র জল ও সূত্র গ্রহণ জন্য একটী অট্টালিকা। বোধ হয়, উভয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, রাজা এই সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সিংহল দ্বীপের অধিকাংশ রাজগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তদশশত খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, পর্ত্তুগিজগণ ইহার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল। ইহারা প্রথমে বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল দ্বীপে আগমন করে, পরে উত্তর সিংহলে আধিপত্য করে। কলম্বো ইহাদের রাজধানী ছিল। পর্ত্তুগিজগণ দেবালয় সকল ধ্বংস করিল, এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও বোধিদ্রুম নষ্ট করিয়া ফেলিল। কিন্তু, ইহাদের আধিপত্য অধিক দিন ছিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে, সিংহল দ্বীপে, ডাচ্ জাতিদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল এবং অবশেষে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, সমগ্র সিংহল দ্বীপ ইংরাজদিগের করায়ত্ব হইল। কি পর্ত্তুগিজ কি ডাচ্ কোন জাতিই সিংহলে স্থায়ী উন্নতি করিতে সক্ষম হয় নাই। ইংরাজগণ কর্ত্তৃকই উহা সংসাধিত হইয়াছিল। এখন আমি কলম্বো সম্বন্ধে কিছু বলিব।

জলধিকূলের চত্বর পরিত্যাগ করিয়া আমরা নগর অভিমুখে গমন করিলাম। হিন্দুদিগের জন্য একটী ছত্র আছে অবগত হইয়া, আমরা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছত্রটী তাম্বিয়া মুদালিয়ার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, উহা তাঁহার নামে অভিহিত। ছত্রটী প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। আমরা আনন্দের সহিত এখানে অবস্থিতি করিলাম। ছত্রের অন্তর্গত একটী দেবালয় আছে। ইহা যাত্রিগণের পক্ষে অতীব প্রীতিকর। তবে, একটী অসুবিধা এই যে, ছত্রের ভিতর কিংবা তাহার নিকট পাইখানা নাই, মলত্যাগ জন্য পথিকদিগকে দূরে যাইতে হয়। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিলে, এ ব্যবস্থাটীকে ভাল বলিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও আহারাদির পর, আমরা নগর দর্শন করিতে গমন করিলাম। গণপতি ও মহাদেবের মন্দির আমাদের নয়নগোচর হইল। মালিককনদ নামক স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী দেবালয় দেখিলাম। এই দেবালয়ের প্রধান পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পুরোহিত মহাশয়, সদাশয় ব্যক্তি। আমাকে, মন্দির এবং তাহার সংসৃষ্ট পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় দেখাইবার জন্য তাঁহার একজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন। মন্দিরের ভিতরে আমি বুদ্ধের দুইটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, একটী শায়িত ভাবে এবং অপরটী ধ্যানস্থ রহিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটীর সম্মুখে নানা প্রকার পুষ্প রহিয়াছে। একটী বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিও দেখিলাম। হিন্দুগণ, বুদ্ধকে নারায়ণের নবম অবতার বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই নিমিত্তই বুদ্ধদের কাছে বিষ্ণুর এত সমাদর। দেবালয় দেখিয়া, আমরা পুস্তকালয় দর্শন করিলাম। ইহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তথায় পালি ভাষায় লিখিত একখানি অভিধান দেখিলাম। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, রাজপুত্র (Prince of Wales) এই পুস্তক খানিতে তাঁহার নামাঙ্কিত করিয়া, উক্ত পুস্তকালয়ে দান করিয়াছিলেন। তাহার পর, আমরা নানাপ্রকার পুঁথি দেখিলাম। এ সকল, পালি, চীন, জাপানি এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত। কতকগুলি, ইংরাজী পুস্তকও দেখিলাম। বিদ্যালয়টী বন্ধ ছিল। বাহির হইতে গৃহটী মাত্র অবলোকন করিলাম।

এই সকল দেখিয়া, পুরোহিত মহাশয়ের আশ্রমে গমন করিলাম। তিনি আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিলাম। পরিচ্ছদ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত। এই পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বস্ত্র টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া অঙ্গ রাখা প্রস্তুত হয়। বুদ্ধের অঙ্গরাখা ত্রিশ টুক্‌রা বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। উহা দ্বারা দীন ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া, বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে তাহা ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই অঙ্গরাখা নির্ম্মাণ প্রণালীতে একটী বিশেষত্ব আছে। অতি প্রত্যূষে বৃক্ষ হইতে তুলা আহরণ করিয়া দিবসের মধ্যেই তাহা পরিস্কৃত ও পিঞ্জিত হইয়া, সূত্র কাটন, বস্ত্র বয়ন এবং রঞ্জন কার্য্য সমাধা হইয়া অঙ্গরাখা প্রস্তুত হয় এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা পুরোহিতকে দেওয়া হয়।

কলম্বো নগর সুদৃশ্য। ইহা পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। জলধির কূলে, কয়েকটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আছে। গবর্ণরের প্রাসাদ, ওরিয়েণ্টাল হোটেল কোম্পানির (Oriental Hotel Company) ত্রিতল অট্টালিকা, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় এবং কয়েকটী সওদাগরি কার্য্যাগার বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। গবর্ণরের বাটীর সান্নিধ্যে একটী উত্তম উদ্যান আছে। ইহার ভিতর একটী জলপ্রপাত

দেখিলাম, তাহা মনুষ্য-কৃত। প্রপাতের জল একটী জলাশয়ে নিপতিত হয়। এই জলাশয়ে কয়েকটী বৃহৎ সুদৃশ্য কমল পুষ্প দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। জলধিকূলে একটী দুর্গ আছে। উহার দক্ষিণে গ্যালি ফেস (Gallee face) নামক একটী সুদৃশ্য ময়দান দেখিলাম। এই ময়দানটী উত্তীর্ণ হইয়া, আমরা ওয়ার্ড ফেস রোড (Ward face road) নামক একটী পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলাম। এই পথটী গ্যালি ফেস হোটেলের (Gallee face Hotel) দিকে গিয়াছে। যাইতে যাইতে এক দিকে জলধির দৃশ্য এবং অপর দিকে সৈন্যাবাস, একটী উৎকৃষ্ট ক্রীড়াভূমি এবং কতকগুলি সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখিলাম। পরে যে অংশে ইউরোপিয়গণ অবস্থিতি করেন, সেই অংশে গমন করিলাম। এখানে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রাসাদ দেখিলাম। তন্মধ্যে চিত্রশালিকা, গবর্ণরের দ্বিতীয় প্রাসাদ, ভিক্টোরিয়া পার্ক (The Victoria park) নামক প্রমোদ উদ্যান এবং গার্ডেন ক্লাব (Garden club) নামক ইংরাজদিগের চিত্তবিনোদ-গৃহ আমাদের নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করিল। কালুপিণ্ডিয়া নামক স্থানে, ইহুদিদের একটী ভজনালয় এবং সুদৃশ্য বিপণি শ্রেণী নয়ন গোচর করিলাম। পরে, আমরা গ্রীন পাথ (Green Path) নামক রাস্তা হইয়া যাইতে যাইতে কয়েকটী উদ্যানসংযুক্ত সুন্দর অট্টালিকা দেখিলাম। এখানে দারুচিনির উদ্যানও দৃষ্টিগোচর হইল।

তদনন্তর স্থানীয় লোকদিগের আবাস স্থান দেখিলাম। এখানে নানাজাতীয় লোক বাস করে। পারসি এবং মুসলমানগণ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত, মলয়ানেরা সৈনিক ও ভৃত্যের কার্য্য করে, কাফ্রিগণ খনন কার্য্যে নিযুক্ত এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক শ্রমজীবী। দক্ষিণ ভারতের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এখানে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ গবর্ণরের সভার সদস্য ও কেহ কেহ প্রধান বিচারালয়ের বিচারক। কেহ কেহ ব্যারিষ্টার ও উকীলের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে, কে, সি, এবং সি, এম, জি, উপাধিধারী মাননীয় পি রমানাথন যেমন বিদ্বান্ তেমনি উচ্চ-পদধারী। তিনি সিংহলের সলিসিটার জেনারেল (Solicitor General of Ceylon) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকায় গমন পূর্ব্বক সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা তথাকার লোকদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন। আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি বৈদিক ধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের সভ্যতার পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার বক্তৃতায়, সে অঞ্চলের লোকদিগের পার্থিব উন্নতির দিকে অযথা আকর্ষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তথাকার উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সকল দেখিয়া তিনি ছাত্রদিগকে সদুপদেশ দানে এবং অধ্যক্ষদিগের সহিত সদালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানেও সমাদৃত হয়েন।

এখানকার প্রকৃত অধিবাসী, সিংহলীরা নানাপ্রকার কারুকার্য্যে ব্যাপৃত এবং বড়লোকের গৃহে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত। তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই শিক্ষিত এবং গবর্ণমেণ্টের ও সওদাগরদের কার্য্যে অধিষ্ঠিত।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

কাল কাট বিকট দশন মহাবলী।
লোচন প্রবল যেন শিখরে আবলি॥
সবে কয় এমন শার্দ্দূল দেখি নাই।
যমের সঙ্গেতে ভেট করায়ে গোঁসাই॥
কোথা হতে এমন শার্দ্দূল এসেছিল।
জাল্লাল শিখর রাজা অতেব পালাল্য॥
বাদ্য বলে শুন ওহে রায় গৌড়েশ্বর।
সাজন করিয়া এলে আমার উপর॥
মনে করি একবার গৌড় দেশ যাই।
জালন্দার গড়েতে আহার নাহি পাই॥
সম্বল বিহীন হলে বিধাতাকে ভার।
ঘরে বসে কৃষ্ণ মোরে দিলেন আহার॥
মাংস খেতে জিহ্বা করিছে সল্‌বল্‌।
মনের সাধে খাব আজি নবলক্ষ দল॥
ভুজঙ্গ সভায় যেন পন্নগারি গাজে।
লম্ফ দিয়া পড়ে বাঘ লস্করের মাঝে॥
কাহারে বধিয়া পাড়ে মারিয়া থাবড়।
হান হান ডাক ছাড়ে গৌড়ের নাবড়॥
শর গুলি গোলা ছাড়ে বাঘটার গায়।
পাথরে সরিষা যেন ঠিক্‌রিয়া যায়॥
আথালি পাথারি বাঘ ধরে ঘোড়া হাতী।
নানা অস্ত্র নিক্ষেপে যতেক সেনাপতি॥
সারি দিল রায় বেঁশ্যা ধানুকী করিকাল।
উঠিল সমর মাঝে বহ্নির উথাল॥
নখরে চিরিয়া পাড়ে ঐরাবতের মুণ্ড।
মড় মড় ঘোড়ার চিবায়ে খায় মুণ্ড॥
শত শত সেনাকে বধিয়া একই বেলা।
বদনে ফেলিয়া দেয় যেন চাঁপা কলা॥
রণে যুঝে মরিল অনেক সেনাপতি।
উদরে পূরিল বাঘ আশি হাজার হাতী॥
কার্য্য বুঝে ভঙ্গ দিল রায় গৌড়েশ্বর।
পালাল বাঘের ভয়ে যতেক লস্কর॥
কর্পূর কহিল লাউসেনের নিয়ড়ে।
এইরূপে বাঘ রাজা জালন্দার গড়ে॥
এপথ ছাড়িয়া অন্য পথে চল ভাই।
গড় খান পার হলে তবে প্রাণ পাই॥
বাঘটার ভয়ে মোর গায় এল জ্বর।
হাসিতে লাগিল শুনে লাউসেন কুমার॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়॥

ইতি গৌড়যাত্রা ও বাঘজন্ম পালা সমাপ্ত।

কামদল বাঘ বধ পালা।

দেহারা বিশ্রাম স্থান গোকুল নগর।
শঙ্খাসুর ঠাকুর বন্দিব যোড়কর॥
দয়া কর ধর্ম্মরাজ লয়েছি শরণ।
তোমা বিনা কেবা করে লজ্জা নিবারণ॥
তাল মান রাগ সব ভেদ নাহি হয়।
কত রাগ কে কার রমণী বটে কয়॥
নরাধম কি জানিব তোমার বর্ণনা।
ব্রহ্মা আদি দেব করে উদ্দেশে বর্ণনা॥
আসরে নামিয়া প্রাণ করে দুর দুর।
লজ্জা নিবারণ কর প্রভু শঙ্খাসুর॥
বাঘের জন্মের কথা কহিল কর্পূর।
জালন্দার গড়ে বাঘ প্রবল অসুর॥

লাউসেন বীর কয় কর্পূরের কাছে।
বাঘটাকে দেখিব আমার সাধ আছে॥
ধর্ম্মরাজ প্রভু যদি মোরে অনুকূল।
তোমার সাক্ষাতে আজি বধিব শার্দ্দূল॥
অবিরত যেতে চাই গৌড় ভুবন।
কণ্টক রাখিয়া পথে নাহি প্রয়োজন॥
খড়্গ ধরে বাঘটাকে অবশ্য বধিব।
বাঘের লেজ কাণ লয়ে রাজাকে ভেটিব॥
সঙ্গে থাক তুমি ভাই না হও কাতর।
কর্পূর বলেন মোর গায় এল জ্বর॥
দল বলে না পেরেছে গৌড়ের নাবড়।
বামে রেখে চল ভাই জালন্দার গড়॥
কদাচ নারিবে তুমি বাঘ কামদলে।
চাঁপাকলা বলিয়া গিলিয়া পাছে ফেলে॥
বাঘের নিকট দিয়া যদি যাবে ভাই।
আমি গৌড় না যাইব ফিরে ঘরে যাই॥
ঘরে গিয়া সমাচার বলিব সবাকে।
বাঘ কামদলে ধরে খেয়েছে দাদাকে॥
বুঝিলাম তুমি দাদা বড়ই নিঠুর।
ছল ছল করে আঁখি কাঁদেন কর্পূর॥
লাউসেন হাতে ধরে কর্পূরে বুঝান।
তুমি মোর ছোট ভাই প্রাণের সমান॥
দৈবের বলেতে প্রতিপন্ন তুমি ভাই।
তোমারে রাখিয়া গৌড় কিরূপেতে যাই॥
প্রবোধ জন্মাল সেন পীরিত বচনে।
বনফুল তুলে দেন কর্পূরের কাণে॥
কর্পূর বলেন যাবে শার্দ্দূলে বধিতে।
সত্য করে বল দাদা আমার সাক্ষাতে॥
বাঘ বধ কোরো তুমি গড়ের ভিতর।
আমাকে তুলিয়া রেখো গাছের উপর॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য লাউসেন বলে।
সুরভির মাংস কেটে ফেলাই অনলে॥
দ্বিজবরে বধ করি পরস্ত্রী গমন।
চারিযুগ মোরে যেন ছাড়েন নিরঞ্জন॥
সত্য করি কহেন ময়নার অধিকারী।
কহিলাম যদি স্যাত এ কর্ম্ম না করি॥
গাছের উপরে তোরে রাখিয়ে যতনে।
তবে সেথা যাব আমি বাঘ অন্বেষণে॥
গুড় লাড়ু চিড়া মুড়ি প্রচুর করিয়া।
কর্পূরে দিলেন সেন আঁচল ভরিয়া॥
চলিলেন দুই ভাই জালন্দার পথে।
চিড়া মুড়ি কর্পূর চলিলা খেতে খেতে॥
জালন্দার পথে যান ভাই দুইজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন প্রবেশে কানন॥
আগে আগে লাউসেন করিল পয়ান।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ফলা হাতে খড়্গখান॥
তরাসে কর্পূর পাত্র কথা নাহি কয়।
বন মাঝে দেখিছে সকল বাঘময়॥
ধেয়ে যেতে বন মাঝে উছট বাজে পায়।
বড় ভয় কর্পূরের বাঘে পাছে খায়॥
চরণের তালি পেয়ে পালায় সরট।
শুষ্ক পত্র কাননে করিল মচ্ মচ্॥
তা দেখিয়া কর্পূরের প্রাণ নাই ধড়ে!
বাপ বাপ শব্দে সে আছাড় খেয়ে পড়ে॥
প্রাণ গেল ওরে দাদা লাউসেন কুমার।
বাঘ মাথা নাড়ে ওই ঝোপের ভিতর॥
অচেতন ভূতলে বদনে নাই বাণী।
ঝোড় খুজে দেখেন ময়নার গুণমণি॥
লাউসেন বলে ভাই না ভাব তরাস।
সাঙ্গড়ার ঝোড়েতে নড়িল কাঁকলাস॥
খল খল হাসে সেন কাননের মাঝে।
কর্পূরের বদন মলিন হল লাজে॥
কোলে করে তুলিলেন ময়নার রায়।
পাথরে আছাড় খেয়া ছড় গেছে গায়॥
বসনে মুছেন রাজা লোচনের জল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি মঙ্গল॥
ভাই সঙ্গে চলিলেন ময়নার ঠাকুর।
পাছু পাছু যান ধেয়ে অনুজ কর্পূর॥
ঐ দেখ জালন্দার দেখা যায় গড়।
বলিতে কহিতে প্রায় হইল নীয়ড়॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কর্পূর করে নিবেদন।
বাঘটাকে দেখে পাছে হারাই জীবন॥

প্রাণ কেঁদে উঠে বুক করে দুর দুর।
আর চলে যেতে নারি বলেন কর্পূর॥
গড়ের নিকট হলে বাঘে পাছে ধরে।
তুলে রাখ মোরে দাদা গাছের উপরে॥
দশরথ মহারাজ সত্যের কারণ।
রাম হেন পুত্র দেখ পাঠাইল বন॥
হরিশ্চন্দ্র নৃপতি আপনি সত্য করি।
ব্রাহ্মণকে রাজ্য দিয়া হল দেশান্তরি॥
কৃষ্ণ সনে সত্য করি ময়ূরধ্বজ রায়।
মাথার উপর রাজা করাত বসায়॥
প্রতিজ্ঞা করিল হংসধ্বজ নৃপবর।
পুত্রকে ফেলিল তপ্ত তৈলের উপর॥
গাছে তুলে রেখে প্রাণ বাঁচাও আমার।
সত্য রক্ষা হলে দাদা সত্যে হয় পার॥
থাক ভাই কর্পূর কদম্ব গাছে বসে।
বাঘ বধে পুনর্ব্বার তুলে নিব এসে॥
কর্পূর বলেন দাদা অবধান কর।
ডাল পালা ভেঙ্গে দিবে গাত্রের উপর॥
গাছের সহিত মোরে বাঁধহ বসনে।
ভূমে পাছে পড়ি দাদা ভয় লাগে মনে॥
রাখ ভাই ভাল করে পাতা ঢাকা দিয়া।
বাঘ যেন জানে নাহি কর্পূর বলিয়া॥
তলা হোতে যদিস্যাৎ গাছ পানে চায়।
পাখীবাসা বলে বাঘ ফিরে যেন যায়॥
হাসিতে লাগিল সেন কর্পূর বচনে।
যত বল তোমার বুঝিলাম এত দিনে॥
বাঁধিল বসনে তারে কদম্ব ডালেতে।
নবীন পল্লব ভেঙ্গে দিল চারিভিতে॥
শ্যামলতা উপরেতে করিয়া ছাউনি।
ধীরে ধীরে কহেন ময়নার গুণমণি॥
আঁচলে করিয়া লহ চিড়া গুড় লাড়ু।
জল খাবে সম্মুখে রহিল এই গাড়ু॥
হেতের বাঁধিয়া যাই বাঘের উপর।
যদি দেখা পাই বাঘ গড়ের ভিতর॥
আজি বাঘটাকে আমি বধিব নিশ্চয়।
কর্পূর বলেন মোর মনে নাহি লয়॥
বসন্তের অনল শীতল যদি লাগে।
শশকের তর্জ্জনেতে সিংহ যদি ভাগে॥
গাছে উঠে সলিল পাথর ভাসে জলে।
তথাপি নারিবে বাঘ কামদলে বলে॥
না পারিল দলবলে গৌড়ের ভূপতি।
রণে ভঙ্গ দিয়ে গেছে মান্ধাতার নাতি।
লাউসেন বলে মোর তাকে নাহি ভয়।
আমার সারথি প্রভু দেব জ্যোতির্ম্ময়॥
কর্পূরে রাখিয়া তুলে গাছের উপর।
লাফ দিয়ে নামিল ময়নার বীরবর॥
ছত্রিশ হেতোর বেঁধে চড়া দিয়া বাঁশে।
চলে লাউসেন বীর বাঘের তল্লাসে॥
জালন্দার গড় খান দেখিতে বিস্তার।
কানন জন্মেছে যত আছিল বাজার॥
বন খুজে চলে সেন হয়ে সচিন্তিত।
কতক্ষণে দেখা হবে বাঘের সহিত॥
কিয়া ঝোপ শরবন পুকুরের পাড়।
ঝাউবন খুজিল যতেক বাঁশ ঝাড়॥
আম্রের বাগান দেখে বেড়ের ভিতর।
নারিকেল গুবাক বন খুজিল বিস্তর॥
কদলী তুলসী চাঁপা পুষ্পের বাগান।
সাত গড় রাজার ক্রমশঃ খুজে যান॥
রাজ পাট সিংহাসন দলীজ দুয়ারা।
খুজিল মহল সব দেউল দেহারা॥
সরোবর সমীপেতে পাইয়া বিরল।
বেণা বনে নিদ্রা যায় বাঘ কামদল॥
তৃতীয় প্রহর বেলা বিষ্ণু পদতলে।
ব্যাকুল হইল খুঁজে বাঘ কামদলে॥
বাঘ নাহি পেয়ে রাজা হইল ফাঁপর।
দেখিল দক্ষিণ দিকে দিব্য সরোবর॥
মন্দগতি মারুতে অম্বুজ জলে হেলে।
অলিকুল ভ্রমণ করিছে তার কূলে॥
স্নান করিবারে রাজা হইল চঞ্চল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
শাপ বাঁধা চারি ঘাট রায়াটি পাথরে।
বকুল কদম্ব তরু ঘাটের উপরে॥

দাণ্ডাইল তরুতলে রঞ্জার নন্দন।
পদ্মফুল দেখি রাজা ভাবে মনে মন॥
বড় দুঃখ পেলাম বেড়াইয়া বনময়।
জীবন বিহনে আর জীবন না রয়॥
হইল অনেক বেলা খুজিয়ে শার্দ্দূল।
স্নান করি ধর্ম্ম পুজি দিয়া পদ্মফুল॥
পূজা করি ধর্ম্মরাজে এক মন হয়ে।
পাইব বাঘের দেখা এখানে বসিয়ে॥
এত বলে ঘাটে রেখে যতেক হেতার।
পদ্মফুল তুলিল সেবিতে পদ তাঁর॥
সরোবরে স্নান করি লাউসেন রায়।
পূর্ব্বমুখে বসিলেন ধর্ম্মের সেবায়॥
পদ্মফুলে পূজেন দুর্ল্লভ সদাগর।
তুষ্ট হইল বৈকুণ্ঠে ঠাকুর মায়াধর॥
লাউসেন ধর্ম্মপূজা সমাপ্ত করিতে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে বাঘ বেণাবন হতে॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠে মৃগাদন।
চৌদিক চাহিয়া বাঘ ত্যজে বেণাবন॥
গা তুলিয়া বাঘ তবে মনে মনে কয়।
আজি কেন পাই বড় মানুষের ভয়॥
চেয়ে দেখে বাঘ বেলা হয়েছে উচাট।
তাড়াতাড়ি চলে সেই সরোবর ঘাট॥
বদনে দশন যেন পৌষের সে মূলা।
শাঁখারির করাত সমান নখগুলা॥
হাড়ে মাসে জড়িত তেজেতে হয় বাড়া।
জিহ্বাটা লোটায় যেন রাউতের খাঁড়া॥
টল টল গমনে অবনীখান নড়ে।
গুঁড়া হয় পাথর যেখানে পাঁজ পড়ে॥
পশ্চিম ঘাটেতে গিয়া বাঘ জল খায়।
পূর্ব্ব ঘাটে চেয়ে দেখে লাউসেন রায়॥
জল খায় শার্দ্দূল পর্ব্বত অনুপম।
কুম্ভকর্ণ বীরকে দেখিল যেন রাম॥
পর্ব্বতের সম বাঘ দেখিয়া তখন।
মনে মনে যুক্তি করে ময়নার রাজন্॥
এই গড়ে রাজা বাঘ বাহুকীর বরে।
শুনেছিলাম লোক মুখে দেখিনু নজরে॥
পরাভব হয়ে গেছে রায় গৌড়েশ্বর।
হেত্যার বাঁধিব এই বাঘের উপর॥
এত বলি কোমর বাঁধে লাউসেন বীর।
ঘাট হোতে উঠে বাঘ পান করে নীর॥
জল খেয়ে পশ্চিম পাড়েতে বাঘ উঠে।
লাউসেন বীরকে দেখিল পূর্ব্ব ঘাটে॥
দেখি লাউসেনে বাঘ ভাবিতে লাগিল।
ইন্দ্রপারা আমার উপর সেজে আইল॥
অনেক কাল রাজা হয়ে ছিনু এই দেশে।
করেছি জীবের হিংসা মনের হরিষে॥
আমার উপর এই বীর বলবান্।
হানা দিলে কদাচিৎ বাঁচে মোর প্রাণ॥
সেনকে দেখিয়া বাঘ হইয়া কাতর।
ভয়ে ভয়ে পাশে গিয়া কানন ভিতর॥
ডম্বুর গাছের তলে শুয়ে ঘুম যায়।
সাজন করিয়া আসে লাউসেন রায়॥
শীঘ্রগতি সাজে বীর বাঘের উপর।
ধড়া চল্লা পরে বাঁধে ছত্রিশ হেত্যার॥
ফলাখান বাম করে খড়্গ ডানি হাতে।
পাঁজ দেখে বাঘের চলিল বনপথে॥
কানন পাড়িয়া চলে ভয় নাহি করে।
ডাক দিয়া বাড়ি মারে ঝাড়ের উপরে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে যেন হইল ব্যাকুল।
দেখা দিয়ে কোন্ পথে পালাল শার্দ্দূল॥
যেকালে করিল হরি মৃত্তিকা ভক্ষণ।
বদনে যশোদা দেখে এ চৌদ্দ ভুবন॥
মনস্তাপ করেন ময়নার অধিকারী।
কোন্ দেব ছলিল শার্দ্দূল রূপ ধরি॥
ভাবিত হইয়া সেন বন বেড়ি চলে।
দেখিল শার্দ্দূল শুয়ে ডম্বুর বৃক্ষ তলে॥
অচেতনে শুয়ে বাঘ ঘুমের আবেশে।
ঝড় ঝাড় করে ডাল নাসার নিশ্বাসে॥
নাসার নিশ্বাসে বনে গাছে ঝড় বয়।
বাঘ দেখে লাউসেনে লাগিল বিস্ময়॥
ধুলায় পড়িয়া বাঘ যেন গিরিবর।
গোঁফ দুটা দেখিতে যেন পগারের শর॥

তীক্ষ্ণ খড়্গ সম নখ বদন বিশাল।
লেঙ্গুড় পড়িয়া যেন বড় গাছির আল॥
ধরণী লোটায় বাঘ অচেতন ঘুমে।
সেন বলে বাঘটাকে চিয়াব কেমনে॥
হেত্যার ধরিতে নাই নিদ্রাগত জনে।
নরকে নিবাস হয় লিখন পুরাণে॥
শার্দ্দূলে চিয়ান সেন প্রবন্ধ করিয়া।
ডাকাডাকি করেন বদনে জল দিয়া॥
উঠ বাঘ কামদল লাউসেন ডাকে।
তুমি ক্ষেত্রি বাঘ হও দেখিব তোমাকে॥
হাতে ধরে টানেন ময়নার অধিকারী।
নেঙ্গুড় ধরিয়ে করে চাকের ভাঁউরী॥
তথাপি বাঘের নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হয়।
কি বুদ্ধি করিব তবে লাউসেন কয়॥
চাপড় মারিতে হল বাঘের উপর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান মল্লভূমে ঘর॥
বাঘ কামদল যদি নিদ্রাতে কাতর।
কিরূপ করিব ভাবে লাউসেন কুমার॥
এত পরিবাদ করি তথাপি না উঠে।
বাঘকে চিয়াব এক চাপড়ের চোটে॥
রবি শশী হুতাশন সাক্ষী থাক সবে।
চাপড় মারিব আমি দোষ নাহি লবে॥
মারিল চাপড় তেড়ে ময়নার রাজন্।
ধড়ফড় করে বাঘ উঠিল তখন॥
থাবড় মারিতে চায় ফলঙ্গ সারিয়া।
রাখিল ঐরূপে সেন বুকে ফলা দিয়া॥
লাউসেনকে চায় বাঘ করিতে সংহার।
ধরে লাউসেন ফলা বুকে দিয়ে তার॥
ফলা রাখে সম্মুখে তার ময়নার ভূপ।
ফলার উপরে বাঘ দেখে অপরূপ॥
চেয়ে দেখে বাঘ ফলা অপূর্ব্বনির্ম্মাণ।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন॥
ক্রোধ সম্বরিল দেখে লিখন ফলায়।
এক দৃষ্টে দেখে তিন রাম অবতার॥
তার পর দেখে যশোদার কোলে হরি।
কালিন্দীর কূলে ধেনু চরান মুরারি॥
নটবর বেশেতে ঠাকুর যদুমণি।
বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া ষোল শ গোপিনী॥
দৃষ্ট করে দেখে কুরু পাণ্ডবের রণ।
ফলায় লিখন আছে পারিজাত হরণ॥
দশ অবতার লেখা ফলাতে আছিল।
ফলাখানা দেখে বাঘ কাঁদিতে লাগিল॥
বাঘ বলে নহে মনুষ্য মনে লয়।
দানব গন্ধর্ব্ব কিবা দেবতা তনয়॥
এতেক ভাবিয়া বীর বাঘ বলে ডেকে।
ক্রোধ সম্বরিনু তোমার ফলাখান দেখে॥
কার পুত্র কি নাম নিবাস কোন্ দেশ।
প্রতারণা ছেড়ে মোরে কহ সবিশেষ॥
বাঘের বচনে বীর পরিচয় দেন।
কর্ণসেন তাত, পিতামহ কণক সেন॥
মাতা রঞ্জাবতী বাড়ী ময়না ভুবণ।
লাউসেন নাম ধরি শুন মৃগাদন॥
সহোদর মাত্রেক কর্পূর ছোট ভাই।
রাজসম্ভাষণেতে গৌড় দেশে যাই॥
তোমার কাহিনী শুনে কর্পূরের মুখে।
অতএব সেজে এলাম দেখিতে তোমাকে॥
পরিচয় দিলেন ময়নার অধিকারী।
ভাবিতে লাগিল বাঘ হেঁট মাথা করি॥
এত দিনে ভবানী বিমুখ হল মোরে।
কদাচিৎ প্রাণ পাই সেনের সমরে॥
পুনরপি কয় বাঘ সাহসে করি ভর।
ওহে লাউসেন তুমি ফিরে যাও ঘর॥
মরিবার তরে কেন এসেছ এখানে।
শালে ভর দিল রঞ্জা তোমার কারণে॥
যাও যাও তুমি সেন হাপুতির পো।
তোমাকে খাইতে বড় লাগে মায়া মো॥
কত কত ভূপাল মরেছে মোর হাতে।
সাধ পারা হল তোর যমঘর যেতে॥
গৌড়েশ্বর হেরে গেছে লয়ে দলবল।
রণেতে পণ্ডিত আমি বাঘ কামদল॥
বাঘ হয়ে লাউসেনে দেয় গালাগালি।
সেন বলে তোমার ঘুচাব ঠাকুরালি॥

খড়্গ ধরে আজি আমি কাটিব তোমাকে।
তোর লেজ কাণ লয়ে ভেটিব রাজাকে ॥
এ পথে মানুষ নাহি চলে তোর ভয়ে।
আজি আমি তোমাকে পাঠাব যমালয়ে ॥
রণ ধর শার্দ্দূল হইয়া সাবধান।
এত ব'লে লাউসেন আছাড়ে ফলাখান ॥
বীরদাপ ছাড়েন ময়নার তপোধন।
বাঘের লোচন হল অরুণ বরণ ॥
বাঁজাল মারিয়া ডাকে বিপরীত ডাক।
লোচন ফিরায় যেন কুমারের চাক ॥
গগনে লঙ্গুড় তুলে ফিরায় সঘনে।
সংহার করিতে মন করে লাউসেনে ॥
মাটিগুলা নখে করে আঁচড় পাঁচড়।
দন্ত কড়মড়ি ইক্ষু শালের গড়।
আগায় পিছায় জানে রণের সন্ধান।
দুই বীর হল যেন আগুন সমান ॥
কেশরীর প্রায় উঠে ঝাঁজাল মারিয়া।
লাউসেনের গায় বাঘ পড়ে ঝাঁপ দিয়া ॥
রুষিয়া কামড় মারে ফলার উপর।
লাফ দিয়া উঠিল ময়নার বীরবর ॥
বড় ডাট ফলা বিশ্বকর্ম্মার গঠন।
বাঘের কামড়ে তায় না ফুটে দশন ॥
হানাহানি সমরে লড়িছে কামদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

ললিত ছন্দে গীত।

বাঘের সম্মুখে লড়ে ময়নার রাজন্।
সিংহের হাকালে, শার্দ্দূল কামদলে,
হানিতে করে বীর মন ॥
পর্ব্বত আকার, দেখিতে ভয়ঙ্কর,
লেজটা তুলে গগনে।
লোহিত নয়নে, বিটকাল বয়ানে,
বাঘটা রুষিল রণে ॥
ধরণী উপরে, আঁচড়ে নখরে,
দন্ত করে কড়মড়।
ঘন দেয় তাড়া, জিহ্বা যেন খাড়া,
নিশ্বাস ফেলে যেন ঝড় ॥
আগায় পিছায়, ক্ষণে ক্ষণে তাড়ায়,
সংহার করিতে চায়।
থাবড় মারিয়া, পড়িল ঝাঁপিয়া,
লাউসেন রাউতের গায় ॥
অমনি ফলায়, ঝিঁকিয়া ফেলায়,
বাঘটা পড়িল দূরে।
পুনরপি ক্রোধে, ঘোরতর শব্দে,
ঝাঁপিল লাউসেন বীরে ॥
প্রলয় সমর, কেহ না কাহার,
দুই বীর যোদ্ধাপতি।
বিপরীত ডাকে, দেবগণ চমকে,
পদভরে কাঁপিছে ক্ষিতি ॥
শব্দের সঙ্গে, সমরের রঙ্গে,
লড়িছে রঞ্জার বালা।
পড়িল হুড়াহুড়ি, সমরে তাড়াতাড়ি,
আকাশে উঠিল ধুলা ॥
ধরিয়া ফলা অসি, লাউসেন তপস্বী,
কাটিলেন বাঘের শির।
ভবানী স্মরিয়া, ভূতলে লোটায়া,
পড়িল শার্দ্দূল বীর ॥
হানিয়া একচোটে, লম্ফ দিয়া উঠে,
লাউসেন বীর বলবান্।
ধর্ম্মের চরণে, ভাবিয়া একমনে,
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ॥
সেনের সংগ্রাম তেজে, জালন্দা কানন মাঝে,
কাটা গেল বাঘ কামদল।
কর্পূরে ডাকিতে যাব, মৃত বাঘ দেখাইব,
লাউসেন হইল চঞ্চল ॥
প্রলয় শার্দ্দূল মল, পথের কণ্টক গেল,
রাম রাম বলয়ে রাজন্।
নৃপ সম্ভাষণ আশে, লেজ কাণ লয়ে শেষে,
যাব রাজ্য গৌড় ভুবন ॥
এত যুক্তি করে মনে, কর্পূরের সন্নিধানে,
চলিল ময়নার গুণমণি।
জীবন পাইতে ফের, কামদল শার্দ্দূলের,
কাটামুণ্ড স্মরয়ে ভবানী ॥

মনে মনে ভগবতী, দক্ষের দুহিতা সতী,
জয় দুর্গা দনুজ দলনী।
কিবা জানি স্তুতি ভক্তি, তুমি দেবতার শক্তি,
বেদমাতা ত্রিগুণধারিণী ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মাণীর মা, রক্ষিণী বাসুলী উমা,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
আকাশ পাতাল পৃথ্বী, ত্রিভুবনে যত মূর্ত্তি,
সকলই তোমার অনুচর ॥
আগমে লিখন দড়, তোমার মহিমা বড়,
শুনেছি ভারত উপাখ্যানে।
পড়িয়া ধরণীতলে, কাটা মুণ্ড ডেকে বলে,
উর চণ্ডী সেবক স্মরণে ॥
আমি বন পশু জনা, নাহি জানি পূজার্চ্চনা,
কৃপা করি দিলে দণ্ড ছাতা।
লাউসেন মহাবীর, কাটিল আমার শির,
প্রাণ রক্ষা কর শৈলসুতা ॥
বাঘের করুণা বাণী, কৈলাসেতে নারায়ণী,
যোগবলে জানিলা তখন।
জালন্দা নগরে যান, বাঘে দিতে প্রাণ দান,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন ॥
স্তব করে কাটা মুণ্ড লোটায়ে ধরণী।
কৈলাসেতে তখন জানিল নারায়ণী ॥
সেবক স্মরণে চণ্ডী হইলেন চঞ্চল।
ভক্ত বড় আমার শার্দ্দূল কামদল ॥
দয়া বড় উপজিল বাঘে বর দিতে।
অবিলম্বে মহামায়া চাপিলেন রথে ॥
জয় ঘণ্টা নিনাদে রথের চারিপানে।
সুবর্ণ কলস ধ্বজা উড়িল গগনে ॥
বেগে চলে বিমান পবনে করি ভর।
এক দণ্ডে পান চণ্ডী জালন্দা নগর ॥
উপনীত ঈশ্বরী শার্দ্দূলে বর দিতে।
কাটামুণ্ড দেখে চণ্ডী লাগিল কাঁদিতে ॥
আহা মরি বাছার ভূমেতে পড়ি মাথা।
দু'হাতে তুলিল মুণ্ড নগেন্দ্রের সুতা ॥
কন্দ তুল্য মুণ্ড লয়ে বসালেন গায়।
কাটামুণ্ড যোড়া লাগে দেবীর কৃপায় ॥
জীবন্যাস মন্ত্র পড়ে গায় দিল জল।
অঙ্গ ঝাড়া দিয়ে উঠে বাঘ কামদল ॥
প্রাণ পেয়ে বাঘ উঠে অভয়ার বরে।
দাণ্ডাইতে পৃথিবী কাঁপিল পদভরে ॥
সম্মুখেতে দেখে বাঘ ব্রহ্মার জননী।
ধরণী লোটায়ে ধরে চরণ দুখানি ॥
ভবানীকে দেখে বাঘ ভূতলে অস্থির।
পাদপদ্ম দেখিয়া লোচনে বহে নীর ॥
ভক্তাধীন ভবানী ভৈরবী ভবজায়া।
দানবদলনী দেবী দাসে কর দয়া ॥
শাকম্ভরী শৈলসুতা সংসারের সার।
জাহ্নবী রূপেতে যদুনাথে কৈলে পার ॥
তুমি অনুকূল যারে তার কিবা শঙ্কা।
তোমা পূজে রঘুনাথ জয় কৈল লঙ্কা ॥
অভয়া বলেন বাঘ চিনিলে আমারে।
বর মেগে লহ বাছা দিয়ে যাব তোরে ॥
যে বর মাগিবে বাছা দিব সেই বর।
এত শুনি বাঘ বলে হয়ে যোড় কর ॥
প্রসন্ন হইয়া বর যদি দিবে মোরে।
কাটামুণ্ড লাগে যেন স্কন্ধের উপরে ॥
না হয় মরণ যেন লহনার ঘায়।
ভবানী বলেন বর দিলাম তোমায় ॥
কাঁদিতে লাগিল চণ্ডী বাঘে বর দিয়া।
কেন না রহিলে বাছা অমর হইয়া ॥
কোন ছার বর নিলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মার উপরে পারি অধিকার দিতে ॥
বুদ্ধি লোপ যখন বিধাতা হয় বাম।
তুমি হলে রাবণ লাউসেন হল রাম ॥
কৈলাসে গেলেন চণ্ডী সজল নয়নে।
চারিদিকে চায় বাঘ খুঁজে লাউসেনে ॥
গোটা দুই বিটকেল শব্দ ছাড়ে বাঘ।
স্বর্গে কাঁপে দেবতা পাতালে কাঁপে নাগ ॥
লাউসেন যান হেথা কর্পূরে ডাকিতে।
লেঙ্গুড় ঘুরায়ে বাঘ আগুলিল পথে ॥
দাণ্ডাল রাবণ যেন শ্রীরামের রণে।
বাঘ দেখে বিস্ময় লাগিল লাউসেনে ॥

কামদল বাঘ যদি আগুলে শরণি।
মনে যুক্তি করেন ময়নার গুণমণি॥
এই মল বাঘটা কেমনে বেঁচে এল।
বুঝি বা কাননে অন্য বাঘিনী পারা ছিল॥
বাঘ বলে লাউসেন ভাবনা কর কি।
সেই কামদল আমি পরিচয় দি॥
পলাইতে পথ নাহি পালিয়ে যাবে কোথা
ক্ষীর পিঠা বলিয়া চিবিয়ে খাব মাথা॥
চাঁপাকলা বলে তোর ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ে।
দক্ষিণ সমুদ্রে আজি জল খাব গিয়ে॥
এত বলে বাঘটা হাসিছে খল্‌খল্।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
বাঘের বচনে ভাবে ময়নার ভূপ।
রাবণ জন্মেছে পারা হয়ে বাঘরূপ॥
তখন রাখিলাম নাহি কর্পূরের কথা।
আমার উপরে বড় পড়িল বিতথা॥
যদি ফিরে যাই পাছে হাসেন কর্পূর।
লড়িব বাঘের সঙ্গে যা করেন ঠাকুর॥
লাউসেন বলেন বাঘ কর অবধান।
গৌড়পুরী যাব তোর লয়ে লেজ কাণ॥
বাঘবধে পাব রাজ্য ময়না জায়গীর।
দরবারে লিখন হব লাউসেন বীর॥
সেনের বচনেতে বাড়িয়ে গেল রাগ।
লাফ দিয়া আকাশে উঠিতে চায় বাঘ॥
শাল গাছ ধরিয়া কামড় মারে তায়।
ধনুকে পাটন যুড়ে লাউসেন রায়॥
শিঞ্জিনে টঙ্কার দিতে ত্রিভুবন কাঁপে।
আঁঠু গেড়ে লাউসেন পাটন জুড়ে চাপে॥
গগনে বসিয়ে যত দেবগণ কয়।
এই বার শার্দ্দূল যাবেক যমালয়।
ছাড়ে বীর পাটন বাঘের বরাবর।
বাম হাতে বাঘটা লাফিয়ে ধরে শর॥
দাঁতে ছিঁড়ে পাটন করিল খান ছড়ি।
লাউসেন বীরকে চলিল তাড়াতাড়ি॥
গিলিতে বদন মিলে পাতাল দুয়ার।
ফলা খাঁড়া লাউসেন ধরিল পুনর্ব্বার॥
রাম রাবণেতে যেন বাধিল সমর।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে বাঘ সেনের উপর॥
আথালি পাথালি ছোট লাউসেন ঝাড়ে।
ভবানীর বরে মুণ্ড ভূমে নাহি পড়ে॥
অঙ্ক হয়ে লাউসেন ভাবে মনে মনে।
কাটা যায় মুণ্ড পুনঃ যোড় লাগে কেনে॥
একুশ বার লাউসেন বাঘের মাথা কাটে।
শূন্যে পড়ে ঐরূপে স্কন্ধে গিয়া উঠে॥
হানিতে কাটিতে সেন হইল দুর্ব্বলা
বিপর্য্যয় ডাক ছাড়ে বাঘ কামদল॥
ফল সারিয়া বাঘ গিলিবারে চায়।
ফলার উপরে লাউসেন শার্দ্দূল পড়ে তায়
উপরে চাপিল বাঘ লাউসেন হেটে।
ফলার ভিতরে রাজা পড়িল শঙ্কটে॥
কাতর হইয়া সেন পড়িল ভূতলে।
পুত্র বলে তখন ধরণী নিল কোলে॥
বসিয়া রহিল বাঘ ফলার উপর।
লাউসেন বলে রক্ষা কর মায়াধর॥
কাতর হইয়া ডাকি শুন নিরঞ্জন।
বাঘের চাপনে প্রভু বেরয় জীবন॥
বড় সাধ ছিল যাব নৃপ সম্ভাষণে।
বিদেশে হারানু প্রাণ শার্দ্দূলের রণে॥
কর্পূরে রাখিয়া এনু গাছে বসাইয়া।
প্রাণ ত্যজিবেন ভাই আমা না দেখিয়া॥
মনে অর্ঘ্য মনে পুষ্প মনে উপহার।
মানসিক পূজা করে রঞ্জার কুমার॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

১৯০৭ সালের বঙ্গদেশীয় সাহিত্য সমালোচনা।*

কোন কাজের লাভ লোকসান বুঝিতে হইলে, জাব্দা হইতে খতিয়ান ও খতিয়ান হইতে রেওয়া করিতে হয়। ছোট বড় সকল কাজেরই এই ব্যবস্থা। যে অতি ছোট, সে খাতাপত্রের ধার না রাখিলেও, মনে মনে মুখে মুখে লাভ লোকসান বুঝিবার জন্য রেওয়া করিয়া থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালার বা বাঙ্গালীর লাভ কি লোকসান হইতেছে, তাহারও একটা রেওয়া করিলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এ ব্যাপার বড় সহজ নহে। অন্ততঃ একটা বৎসরের সব খুঁটি নাটি ধরিয়া একটা রেওয়া খাড়া করা সহজ কার্য্য নহে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় কত গ্রন্থের, কত মাসিকপত্রের, কত সংবাদপত্রের, কত পাক্ষিকপত্রের প্রচার ও প্রকাশ হইল, তাহার নিখুঁত হিসাব নিকাশ করা সহজ নহে। আজকাল মুদ্রাযন্ত্র ঘরে ঘরে। মুদ্রাযন্ত্রের অনুপাতে লেখক গ্রন্থকার এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার হিসাব আয়ত্ব করা আমার পক্ষে নিশ্চিতই দুরূহ।

আমার মনে হয়, পাঠক অপেক্ষা এখন লেখকের সংখ্যা বেশী। এরূপ অবস্থায় সহজেই সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে যে, বাঙ্গালা সাহিত্য প্রকৃতই পুষ্টিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের ফাঁকা দৃষ্টিতে এরূপ কেবল আমারই কেন, এই সভাস্থ অনেকেরই এই ধারণা দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, একটু পরিশ্রম করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ধারণাটা যে অনেকটা ভ্রান্ত, এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবার সম্ভাবনা। এক বৎসরে কত গ্রন্থ, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচার ও প্রকাশ হইয়াছে, যদি খুঁটাইয়া তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের ধারণা নিশ্চিতই অন্য রকম হইয়া যায়।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য নহে। যে গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য, অদ্য আমি সংক্ষেপে তাহাদের যতটুকু সম্ভব আলোচনা ও সমালোচনা করিতেছি। এ সভায় সে সকল গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনা সম্ভব নহে, পরন্তু তাহার সময়ও নাই। অদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ ও বাঙ্গালা মাসিকপত্রের আলোচনা ও সমালোচনা করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রাদির আলোচনা বা সমালোচনা পরিহার করিলাম। বাঙ্গালা গ্রন্থের ও মাসিকপত্রের আলোচনা ও সমালোচনায় যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকটা গতি নির্ণয় হইবে, তৎপক্ষে বোধ হয়, সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

* সাহিত্য সভায় শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

গত বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যে যে একটা নূতনভাবের প্রবাহ বহিয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এই জন্য গত বৎসরের সাহিত্য সমালোচনায় একটা অসাধারণত্বের বিকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এক এক সময়ে এক এক ভাবের অবতারণায় নবযুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এবারও একটা নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনবত্বে ইহা অতুলনীয়। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের বোধ করি অনেকেরই স্মরণ আছে যে, এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে "ভারত উদ্ধারের" যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। তখনকার প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থেই ঐ ভারত উদ্ধারের উদ্ভাবনা দেখিতে পাইতাম। দৃশ্যকাব্যে শ্রব্যকাব্যে গদ্যে পদ্যে ঐ কেবলই সেই ভারত উদ্ধার। কোথাও "কত কাল পরে বল ভারত রে", কোথাও "নগেন্দ্রকন্দরে বসি", কোথাও "হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল," কোথাও "হা হতোস্মি ভারতমাতা কি হ'ল কি হ'ল", কোথাও "ভারতের দুঃখ দেখি বুক ফেটে গেল" ইত্যাকারের কবিতা উৎকুণবংশবৎ প্রসূত হইয়াছিল। এমন কি অনেক গ্রন্থেই অপ্রাসঙ্গিক ভাবেও ভারত উদ্ধারের কবিতা গান ছড়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু রচিত হরিশ্চন্দ্র নাটকে "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন" গানটী অনধিকারে জুড়িয়া বসিয়াছিল। অঘটন-ঘটন-পটু কবি মনোমোহন পাঠকবৃন্দের মনোমোহনের জন্য এখনকার ছক হরিশ্চন্দ্রের কাব্যে ছাঁকিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বদেশভক্তি, স্বজাতি-প্রীতি প্রার্থনীয় হইলেও, কাব্যে এরূপ অপ্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতই প্রার্থনীয় নহে। যেটা দেশের ধর্ম্ম, জাতির কর্ত্তব্য, সেটা যুগের হুজুগ হইয়া দাঁড়াইলে হাস্যাস্পদ হয় না কি?

এইত গেল ভারত উদ্ধারের যুগ। তাহারই পর বৎসর কতক পৌরাণিক নাট্যকাব্যের যুগ আসিয়াছিল, তাহাও আপনারা জানেন। সে যুগে অনেক নাট্যকাব্যে পুরাণ কথিত বিষয়তথ্য অতিক্রম করিয়া অনেক গ্রন্থকার সাধারণের মন মুগ্ধ করিবার সংকল্পে কল্পনায় বিকৃত চরিত্রের অবতারণা করিলেন। লোক হাসাইবার জন্য কোন নাট্যকার দেবতাকে মর্কট বানাইলেন, ঠাকুরকে কুকুর করিয়া তুলিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি রাজকৃষ্ণের প্রহ্লাদচরিত্র নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাণের ষণ্ডামর্ক তেজস্বী ঋষিকল্প, পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ, সৌম্য শান্ত ধীর স্থির গুরুগম্ভীর, কিন্তু কবি রাজকৃষ্ণের রচিত প্রহ্লাদচরিত্র নাটকে সেই ষণ্ডামর্ক দুইটী সরেস সং হইয়া দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত মূর্খ হইল—গুরুগম্ভীর অধ্যাপক ভাঁড় হইয়া দাঁড়াইল। লোকে চাহে সং, লোকে চাহে তামাসা, লোকে চাহে হাস্যকৌতুক, তাহার জন্য কবি রাজকৃষ্ণ শিক্ষিত শিক্ষক ষণ্ডামর্কের চরিত্র বিকৃত করিয়া পবিত্র পৌরাণিক নাটকে কলঙ্ক বিলেপন করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগের পর এখন আর এক নবযুগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। আজ এ ব্রতের পূত মন্ত্রোচ্চারণে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের গিরিনদীতটবন পলকে পলকে সে মধুর নিনাদে প্রতিধ্বনিত। ভারতবাসী বহুদিন যাহা দেখে নাই, যাহা কখনও দেখিবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই, আজ সম্মুখে সাক্ষাতে তাহারই শাশ্বত সুন্দর শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, স্বদেশী ধর্ম্মে, স্বদেশী কর্ম্মে, স্বদেশী

দ্বেষে নহে। দুঃখের বিষয়, এ নবযুগের যুগে এরূপ সুন্দর শুভানুষ্ঠান বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রকটিত হইয়া হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি রূপকে স্বদেশীর ঠাটে চড়িয়া কোন কোন পবিত্র পুরাতন পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিকৃত হইয়াছে। ভূষণ দাসের যাত্রার দলে পৌরাণিক প্রসঙ্গ শুম্ভ নিশুম্ভের পালায় বরিশাল কন্‌ফারেন্সের ছক উঠিয়াছে। বরিশাল কন্‌ফারেন্সে যখন উদ্যতশৃঙ্গ মহিষের ন্যায় পুলিশ উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে বাঁধিতে যায়, তখন সেখানকার বালকেরা ছুটাছুটি গিয়া প্রত্যেকেই বলে, "আমায় বাঁধো, আমায় বাঁধো।" ভূষণ দাসের যাত্রায় যখন দৈত্যেরা স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রকে বাঁধিতে যায়, তখন দেববালকদিগের প্রত্যেকে বলে, "আমায় বাঁধো, আমায় বাঁধো।" যাঁহারা শুম্ভ নিশুম্ভের পৌরাণিক প্রসঙ্গ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিতই এ ঘটনাটা মিথ্যা বলিয়া বুঝিবেন। যাঁহারা না পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ ব্যাপারটাকে সত্য বলিয়া বুঝিবেন। সাহিত্য যদি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের ইতিহাস হয়, তাহা হইলে যাঁহারা শুম্ভ নিশুম্ভের মূল প্রসঙ্গ না পড়িবেন, তাঁহারা ত ভূষণ দাসের যাত্রায় অভিনীত নাটকের প্রসঙ্গটাকেই সত্য বলিয়া স্থির করিয়া লইবেন। ফলে মিথ্যারই প্রশ্রয় হইবে। শুদ্ধ পবিত্র সাহিত্যে এরূপ মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি? ১৯০৭ সালের প্রকাশিত কোন কোন নাটকে যে এরূপ মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, আমি পরে তাহা দেখাইব। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকে রূপকে বিকৃত করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে রূপকে যা তা করিয়া খাড়া করিতে পার। সত্য বটে, সাহিত্যই স্বদেশী-ব্রত-প্রচারের অচ্যুত সহায়। অধিকাংশ গ্রন্থে ও মাসিকপত্রে স্বদেশী সেবার আলোচনা ও সমালোচনা চলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার অনেক গ্রন্থকার কেবল ব্যবসাদারী ফন্দীতে গদ্যে পদ্যে স্বদেশী সেবার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন প্রসিদ্ধনামা নাট্যকার কেবল নাট্যদর্শীদের মন মজাইবার জন্য ঐতিহাসিক নাট্যচরিত্রে কল্পনায় মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়াছেন। তবে সাহিত্য যে স্বদেশীসেবার ব্রতসাধনার সহায়, আলোচ্য বর্ষের সাহিত্য সমালোচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের সাহিত্যে ইহাই বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব।

এখন আলোচ্য বর্ষের সাহিত্যের আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থাদি ও মাসিক পত্রের একত্র করিলে এই বৎসরে সংখ্যায় ২৯৯৫ খানি দাঁড়ায়। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ৩৪৪০ খানি দাঁড়াইয়াছিল। তবেই বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর গ্রন্থাদির সংখ্যা কম। সংখ্যায় কমিয়াছে, সারত্বে কিরূপ তাহা বুঝিতে হইলে গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে হয়। পরে অবশ্য সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে, সংখ্যায় তারতম্য হউক, সারত্বে তত তারতম্য হয় নাই। চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, আলোচ্য বর্ষে তাহাই হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে নাটক উপন্যাসেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তা পূর্ব্ব বৎসরেই কি, আর আলোচ্য বর্ষেই কি। বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের অভাব পূর্ব্বেও যেরূপ দেখিয়াছি, এবারও সেইরূপ দেখিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে স্কুল পাঠ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মেরই কথা থাকে না। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন ধর্ম্মেরই বিশিষ্টতা দেখিতে পাই না। এ ভাব পূর্ব্ব বৎসরেও যেমন, এ বৎসরেও তেমনই। এক সময়ে এ বঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মভাবের যেরূপ প্রাদুর্ভাব থাকিত, তাহাতে আমার মনে হয়, বঙ্গীয়

সাহিত্যের প্রচার একরূপ সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক ছিল। এখন কিন্তু তাহা নহে। সত্য সত্যই ধর্ম্মবিশিষ্টতা বর্জ্জনে এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্য, সাহিত্যের হিসাবে পুষ্টি সম্পন্ন হইলেও ধর্ম্মের হিসাবে বহু বর্জ্জনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রন্থই বেশী, ২৯৯৫এর মধ্যে ২০৯১ খানি পুস্তক এবং ৯০৪ খানি মাসিক পত্রাদি। আবার পুস্তকের মধ্যে ১৭৩৪ খানি প্রথম সংস্করণ এবং ৩৫৭ খানি দ্বিতীয় বা তদধিক সংস্করণ।

দৃশ্যকাব্য।

এবার দৃশ্যকাব্যের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বড় কম নহে। বাঙ্গালায় দৃশ্যকাব্য ক্রমে পুষ্ট হইতে যে পুষ্টতর হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য যে ক্রমে বিদেশীয় দৃশ্যকাব্যের গৌরবসমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাব্যাংশে ও নাট্যাংশে অধুনা বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য সৌন্দর্য্যের মহিমা বিকাশে সাহিত্যের উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়াছে। এখন আমরা গর্ব্ব করিতে পারি যে, আমাদের দৃশ্যকাব্য আছে। তবে আলোচ্য বর্ষে যে সকল দৃশ্যকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সারত্বের গৌরব করিতে পারি, এরূপ দৃশ্যকাব্য কই? সংখ্যার অনুপাতে যদি সারত্বের বিকাশ হইত, তাহা হইলে আমাদের দৃশ্যকাব্য দিগ্বিজয়ত্বের গৌরবে গগনভেদী দুন্দুভিনাদ করিতে পারিত। কিন্তু সংখ্যায় যেমন, সারত্বে তেমন নহে। তা এইরূপই স্বভাবজ। সকল দেশেই দৃশ্যকাব্যাদির সংখ্যা যতটা সাহিত্যের বিপুল বপু বিস্তারের পরিচয় দেয়, সারত্বে সৌন্দর্য্যে ততটা পরিচয় দিতে পারে না। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালায় যে কয়খানি দৃশ্যকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচখানি ঐতিহাসিক এবং একখানি সামাজিক নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ পাঁচখানি ঐতিহাসিক নাটক এই;—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবিবি ও নন্দকুমার; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিরকাশিম ও শিবাজী। শ্রীযুত মনোমোহন গোস্বামী বি, এ প্রণীত সমাজ গ্রন্থখানি সামাজিক নাটক। যে কয়খানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি নাটকের উদ্দেশ্য একটু বিশিষ্ট। ভারতে প্রাচীন ইতিহাস কিরূপ ছিল, তাহা দেখানই এই কয়খানি নাটকের উদ্দেশ্য। আর এই কয়খানি গ্রন্থে মোগল বা ইংরেজের ন্যায় বিদেশী রাজাদিগের প্রতি বিরূপত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অধুনা দৃশ্যকাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট আছে। আর তিনি প্রকৃত প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য। ভাষায় ভাবে, চরিত্র চিত্রণে স্বভাব বর্ণনে নাট্যাঙ্গ রচনায় তিনি পূর্ণ কৃতিত্বেরই পরিচয় দিতেছেন। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবিবি ও নন্দকুমার চরিত নাটকে তাহারই পরিচয় পাই। পলাশীক্ষেত্রে মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকায় যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, ক্ষীরোদবাবু পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। এ দৃশ্যকাব্যে মির্জাফরের জামাতা মিরকাশিম প্রধান নায়ক। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিরকাশিম নাটকের প্রধান নায়ক মিরকাশিম। গিরিশ বাবু মিরকাশিম নাটক রচনা করিবার পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি নাটকে সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিমের চরিত্র-চিত্র প্রস্ফুট হইয়াছে। ইংরেজের লিখিত ইতিহাসে সিরাজ ও মিরকাশিমের যে পরিচয় পাই, এই দুইখানি নাটকে সে চরিত্রের বৈপরীত্যই প্রকটিত। পলাশীর প্রায়শ্চিত্তেও এই পরিচয়। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার তাঁহার ইংরেজের জয় নামক গ্রন্থে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের যে আভাষ দিয়াছিলেন, গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু সেই আভাষে নির্ভর করিয়া একটী পূর্ণ চরিত্রের পূর্ণোদ্ভাস বিকসিত করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাশিম" নামক গ্রন্থে সিরাজাদ্দৌলা ও মীরকাশিমের যে পরিচয় দিয়াছেন, ইংরাজের ইতিহাসে সে পরিচয় পাই না। ফল কথা, গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু এ সম্বন্ধে বিহারী বাবু ও অক্ষয় বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারী বাবু ও অক্ষয় বাবু সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম চরিত্রের নবোদ্ঘাটনে বঙ্গবাসিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার ভাজন। ক্ষীরোদ বাবু ও গিরিশ বাবু সেই দুই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনে বঙ্গবাসীদিগকে নিশ্চিতই যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ঋণী করিয়া রাখিলেন। একদিন এ বঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা, যে সিরাজের নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন, আজ তাঁহারা ইহাঁর চরিত্রবৈপরীত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়াছেন। অক্ষয় বাবু ও বিহারী বাবু বাঙ্গালা ইতিহাসের একটা যুগ উল্টাইয়া দিয়াছেন। আর সে যুগপরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রসারে গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু আজ অপরিপন্থী পরম সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তবে মিরকাশিম-চরিত্র সম্বন্ধে আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে। ক্ষীরোদ বাবুই কি, আর গিরিশ বাবুই কি, নাটকে মিরকাশিমকে স্বদেশীর অবতার করিয়া তুলিয়াছেন। যে মিরকাশিম কতকগুলি নিরীহ সম্ভ্রান্ত স্বদেশীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে পারেন, খাঁটী স্বদেশীর দাবীতে তিনি যে স্বদেশীর অবতার হইতে পারেন, সহসা এ ধারণার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালার মসনদই মিরকাশিমের চরম লক্ষ্য। যাহাতে চরম লক্ষ্য, তাহাকেই আয়ত্ব করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজের সহিত তাঁহার সমর সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়াছিল। অবশ্য ইংরেজের নানা অত্যাচারে এ বঙ্গের অধিবাসীরা প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে মিরকাশিমের মর্ম্মদাহ যে না হইয়াছিল, এমন নহে। ইহাই অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদ বাবু ও গিরিশ বাবু দৃশ্যকাব্যে মিরকাশিম-চরিত্রে স্বদেশী অবতারের চিত্র আঁকিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগের যুগে এ ভাবটা নাট্যাভিনয়দর্শীদিগের একটা প্রাণোন্মাদনা আনিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু মিরকাশিম-চরিত্রে স্বদেশীর অবতারত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ফলে কিন্তু কল্পনায় অনেক স্থলেই স্বদেশী মহিমার বিকাশ করিতে গিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়াছেন।

ক্ষীরোদ বাবুর রচিত "নন্দকুমার চরিত" আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। ইহাতেও স্বদেশীর কথা আছে, তবে তত প্রত্যক্ষভাবে নহে। ইংরেজের ইতিহাসে আমরা নন্দকুমারের যে চরিত্র দেখিতে পাই, এ নাটকে সে চরিত্র নাই। মহারাজ নন্দকুমার জাল করিয়াছিলেন এই অপরাধ দেখাইয়া গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইংরেজী ইতিহাস পাঠকমাত্রেই ইহা জানেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নন্দকুমারের কোন দোষ ছিল না। ক্ষীরোদ বাবুর এই নাটক প্রকাশিত

হইবার পূর্ব্বে কোন কোন বাঙ্গালী ও ইংরেজ গ্রন্থকার নন্দকুমারকে নির্দ্দোষপ্রমাণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের উপর এবং কতকগুলি কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ক্ষীরোদ বাবু এই নাটক লিখিয়াছেন। নাটকের হিসাবে ইহা সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবারই যোগ্য, তবে দুই একটী চরিত্রে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। নন্দকুমারের গুরু স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রদর্শী বাপুদেব শাস্ত্রী আপনার কন্যাকে অনূঢ়া যুবতী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রদর্শী বাপুদেব-চরিত্রের অসঙ্গতি নহে কি? যে সময় নন্দকুমারের আবির্ভাব, সে সময়ে একজন শাস্ত্রাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণের কন্যা একজন মুসলমান বালকের সঙ্গে যেরূপ স্নেহাধিক্যের মাখামাখি ভাব করিয়াছিল, সে সময়ে সেটা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না কি? মুসলমান ও হিন্দুতে সদ্ভাব সংবৃদ্ধি হউক, ইহা প্রার্থনীয় হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর কন্যা স্নেহাধিক্যবশতঃ মুসলমানবালকের সহিত মাখামাখি করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত আচার ব্যবহার রক্ষা করেন না, ইহা কি বিসদৃশ নহে? আমাদের মনে হয়, অধুনা স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব প্রণয় রক্ষা করিবার যে প্রয়াস হইতেছে, ক্ষীরোদ বাবু সেইটাকে গাঢ় করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে ঐরূপ আচারনিষ্ঠতার বর্জ্জন করিয়াছেন। এই স্বদেশী আন্দোলন সময়ে হয়ত ঐরূপ হিন্দু-মুসলমানে মাখামাখি ভাবটা নাট্যাভিনয়দর্শিবৃন্দের ভাবোন্মাদক হইবে, ক্ষীরোদ বাবু এইরূপ বুঝিয়াছেন।

ক্ষীরোদ বাবুর রচিত চাঁদবিবি মনোরম দৃশ্যকাব্য। কলিকাতার কোহিনুর থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়াছিল। ঐতিহাসিক ঘটনার অবলম্বনে এই নাটক রচিত। যে সময় আকবর দিল্লীর সম্রাট্, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর এবং আহম্মদ নগরের মধ্যে কলহ বাঁধিয়াছিল; আবার সেই সময়ে মোগল সম্রাট্ আহম্মদ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাই নাটকের মূল ভিত্তি। ইহাতে ক্ষীরোদ বাবু কল্পনায় অনেক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সংযোজিত করিয়াছেন। সে চরিত্র সৃজনে অপ্রাসঙ্গিকতা বা বিশৃঙ্খলতা নাই। চাঁদবিবির চরিত্রচিত্রণ বিস্ময়কর। এই নাটকের শেষাঙ্কে নাট্যকলার সৌন্দর্য্য কিছু মলিন হইয়াছে। শেষাঙ্কে নাট্য-সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা নাই, কেবল কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা আছে মাত্র। শেষাংশের এই দোষটুকু ছাড়িয়া দিলে চাঁদবিবি নাটক যে দৃশ্যকাব্যের একটা উচ্চস্তর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত শিবাজী নাটক নাট্যকাব্যের গৌরববিকাশক না হইলেও ইহাতে শিবাজী-চরিত্রের পরিচয় প্রস্ফুটিত বটে। তবে গিরিশ বাবু শিবাজীকে যেরূপ উচ্চাঙ্গের বীর বলিয়া খাড়া করিতে গিয়াছেন, ঘটনাপারম্পর্য্যে তাহা বিকশিত হয় নাই। পরন্তু শিবাজী নাটকে শিবাজীর যে সকল কার্য্যকলাপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার চাতুর্য্যেরই বিকাশ মাত্র দেখিতে পাই। বীরত্বের বিকাশ কই? বীরত্বের বিকাশমাত্র দেখিলাম কেবল শিবাজীর মুখে ভাষাভাবহুল বক্তৃতার ঘন ঘটায়। তবে শিবাজী-জননী জিজি বাই-এর চরিত্রে স্বাভাবিকত্বের বিকাশ গিরিশ বাবুর নাট্য-রচনা-কৌশলের কতকটা গৌরব রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী বি, এ প্রণীত সমাজ বর্ত্তমান কালের উপযোগী। আজিকালি কন্যাদায়ে বাঙ্গালী গৃহস্থকুল কিরূপ বিপন্ন, আলোচ্য নাটকে তাহাই

প্রদর্শিত হইয়াছে। একজন ভদ্রলোক এক জমীদারের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। পরে অবসাদে নৈরাশ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। জমীদারের ইহাতেও ক্ষান্তি ছিল না। তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির বিধবা বনিতা এবং তাহার একটী অবিবাহিতা কন্যার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পুত্র বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তিনি পত্নীসহ পরিত্যক্ত হইলেন। সমাজ নাটকের ইহাই মূল গল্পবিবরণ। এ সময় এরূপ নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে গিরিশ বাবুর কৃত বলিদান নাটক মনের মধ্যে যে ভাব উদ্রেক করিতে পারে, আলোচ্য নাটকখানি ঠিক সে ভাবটী জাগাইয়া তুলিতে পারে না। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার স্বদেশীর ছক মিশাইয়াছেন। জমীদারের পুত্রচরিত্রে সেই স্বদেশী ভাব বিকশিত। সে ভাবে অবশ্য অপ্রাসঙ্গিকতার বিকটত্ববর্জ্জিত। যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, কন্যাপণের কুপ্রথা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ নাটকের প্রয়োজন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নটকবি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু শ্লেষের কষাঘাতে এ কুপ্রথার অপনোদন সঙ্কল্পে বিবাহ বিভ্রাট প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তেমন প্রহসন আর হয় নাই। আমাদের মনে হয়, এই বিবাহ বিভ্রাট প্রহসনে যত কাজ হইবার সম্ভাবনা, বলিদান ও সমাজ প্রভৃতি নাটকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইতে পারে। সাধারণ পাঠক বা প্রহসনের অভিনয়দর্শী প্রহসনের রঙ্গরসে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রহসনের রঙ্গটুকু লইয়া কেবল দন্তবিকাশ করেন, প্রহসনের কষাঘাত তাঁহাদের মর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। যাঁহারা বুঝেন, প্রহসনের কষাঘাতে তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা পান। তাঁহারা প্রহসনের কষাঘাত খাইয়া কন্যাপণের অপকারিতা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সমাজ বা বলিদান নাটকে গুরুগাম্ভীর্য্য সম্পাতে যে করুণ-রস উছলিয়া উঠে, তাহা প্রত্যেক পাঠক বা প্রত্যেক অভিনয়দর্শীর মরমের অস্থি-রসে মিশিয়া যায়। সে করুণ রসের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। মরমে যতই বাজে, কন্যাপণের অপকারিতা হৃদয়ের স্তরে স্তরে ততই জাগিয়া উঠে। করুণায় ব্যথা জাগায়, ব্যথায় প্রাণ কাঁদে; প্রাণ কাঁদিলে স্বতই একটা সমবেদনা ফুটিয়া উঠে। সেই সমবেদনাই স্থায়ী কার্য্যকরী। তখন আঁখির অশ্রুধারে গিরিগজবৎ সমাজের কুপ্রথা কোথায় ভাসিয়া যায়। গিরিশ বাবুর বলিদান নাটকে এ ভাবের যত প্রাদুর্ভাব, মনোমোহন বাবুর সমাজ নাটকে তত প্রাদুর্ভাব নাই। তাহা না হইবারও কথা আছে। গিরিশ বাবু কেবল একটা দিক দেখাইয়াছেন, মনোমোহন বাবু তিনটা দিক দেখাইতে গিয়াছেন। তিনি কন্যাপণে স্বদেশী ও বাল্যবিবাহ কথাটা জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র নাটক তিন ভাবে জড়াইয়া মূল কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। মনোমোহন বাবুর বিশ্বাস, বাল্যবিবাহ উঠিলে হয়ত কন্যাপণ কুপ্রথা উঠিয়া যাইতে পারে। তাই কি? বাল্যবিবাহ যুগযুগান্তর ধরিয়া আছে। এমন নিদারুণ কন্যাপণ-কুপ্রথা ছিল কি? বাল্যবিবাহ উঠিলে ব্যভিচার প্রসারের সম্ভাবনা। কন্যাপণের পাপ পদে আছে, ব্যভিচারপ্রসারের পাপে পরিত্রাণ নাই। ব্যভিচারপ্রসারে কুলধ্বংশ হইয়া থাকে। কুলধ্বংশ সমাজের কি সর্ব্বনাশ, স্বয়ং ভগবান্ গীতায় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাউক এসব কথা। যে করুণ দৃশ্যে

সামাজিক ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, দৃশ্যকাব্য হউক, আর শ্রব্যকাব্য হউক, সে দৃশ্যের অবতারণা এখনকার দিনে যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফল কথা, কুশিক্ষাই কন্যাপণ-কুপ্রথার মূল।

দেখা গেল, গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু ঐতিহাসিক নাটকে ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মনোমোহন বাবু সমাজের একটা বিষম অপকারিতা দেখাইয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুইটিই জানিবার জিনিস, দুইটীই দেখিবার জিনিস। উচ্চাঙ্গ দৃশ্যকাব্যের সহায়ে যদি দেশের লোক এই দুইটী ভাল করিয়া জানিতে ও দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিতই বাঙ্গালা সাহিত্যের সাফল্য-দুন্দুভিনাদে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া তুলিতে পারি। দৃশ্যকাব্যে আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব যে প্রবেশ করিয়াছে, দুই একখানি নাটকে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। দেশ গুলজার এবং বিধাতৃবিধান নাটক দুই খানি এই প্রমাণ। এখন যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহাই এই দুইখানি নাটকের ভিত্তি। এই দুইখানি নাটকে বিদেশী বর্জ্জন ও জাতীয়তার উন্মেষণ প্রস্ফুটভাবে প্রকটিত। কেবল এই দুইখানি নাটকে নহে, বাঙ্গালার অনেক গ্রন্থে ও মাসিকপত্রে এই ত্রিভাবের ত্রিসঙ্গম দেখিতে পাই। রাজনীতিক্ষেত্রের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ঐ ত্রিভাবের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ। এ ত্রিভাবের এমন ত্রিসঙ্গম পূর্ব্বে আর হয় নাই; সুতরাং সাহিত্যে পূর্ব্বে আর ইহার পরিচয় পাই নাই। এ ত্রিভাবের যে ত্রিস্রোত চলিয়াছে, তুঙ্গশৃঙ্গ ভীম হিমগিরির আবরণে বুঝি আর তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

উপন্যাস।

নাটকের কথা গেল; এইবার উপন্যাসের কথা। পিপীলিকাদলবৎ অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশই উল্লেখের অযোগ্য। যে কয়খানি যোগ্য, তাহারই উল্লেখ করিতেছি এবং তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই কয়খানি;—ধ্রুবতারা, নববোধন, বাঙ্গালীর বল, কুমুদানন্দ, কালাপাহাড়, ভবানীর মঠ, প্রেততর্পণ, রক্ষীকঙ্কণ (১ম ভাগ), কামিনী ও কাঞ্চন এবং ভক্তের ভগবান্।

ধ্রুবতারা উপন্যাসখানি সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ইহার রচয়িতা। যতীন্দ্র বাবু একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি শক্তিশালী লেখক। ইতিপূর্ব্বে ইনি উড়িষ্যা-চিত্র নামক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। ইহাঁর উড়িষ্যাচিত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইনি উপন্যাস লিখিলে উপন্যাস রচনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন। ধ্রুবতারা উপন্যাসে সে মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইয়াছে। যেমন সুন্দর চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ, তেমনই সুন্দর স্বভাববর্ণন। যখনই একটী স্বভাববর্ণন পড়ি, যখনই একটী চরিত্র চিত্রাঙ্কণ দেখি, তখনই মনে হয়, র‍্যাফেলের ন্যায় সুচিত্রকর যেন একখানি সুচিত্র চক্ষুর উপর আঁকিয়া তুলেন। উপন্যাসে এমনটী খুব কমই দেখা যায়। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের, ব্রাহ্মসমাজের এবং বিলাতফেরত এদেশী যুবকসম্প্রদায়ের চরিত্র-চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুসমাজের পবিত্রতা, সরলতা, শান্তিময়তা, স্নিগ্ধতা এবং উদার সমবেদনার কথা এমনই সহজ সরল ভাষায় লিখিত, এবং স্বভাবতঃ সুন্দর বর্ণনায় বর্ণিত যে, পড়িতে

পড়িতে এক লহমার জন্য পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্যদিকে কতকগুলি ব্রাহ্ম এবং একটী এদেশী ব্যারিষ্টারের চরিত্র এরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে মনে হয় যেন যতীন্দ্র বাবু ফটোগ্রাফের ক্যামেরা রাখিয়া সুন্দর স্বভাবজ ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। এ চরিত্রে হিন্দু চরিত্রের বৈপরীত্যই প্রতিফলিত। এ চরিত্রে কেবল স্বার্থপরতা, কেবল অনান্তরিকতা এবং মৌখিক নীতিজ্ঞাপকতা। ধ্রুবতারা পড়িয়া উঠিলে একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে হয়, হায়! আজ সেই প্রাচীন হিন্দুসমাজের সে সৌন্দর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে! মনে হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে হিন্দু সমাজের সুখশান্তি অপসারিত হইয়াছে। যে যে পদার্থে উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে পারে, ধ্রুবতারায় একটী ভিন্ন আর সবই আছে। এই উপন্যাসে খাঁটি রসিকতার রসবিকাশ নাই। কেবল এ উপন্যাস বলিয়া কেন, আধুনিক অনেক উপন্যাসেই ইহার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সে হাস্যরসময়ী রসিকতা এখনকার কয়খানা উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়? প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার স্বভাববর্ণনে ও চরিত্রচিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের সামীপ্যলাভ করিয়াছে ইহা বলিতে পারা যায়; কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসে সে তরতর রসিকতার রসতরঙ্গ নাই। শ্লেষরসরচনাপটু শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "ভারত উদ্ধার" কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যিনি নিজে না হাসিয়া অপরকে হাসাইতে পারেন, তিনিই রসিক। ইন্দ্রনাথ আপনি হাসেন না, কিন্তু অপরকে হাসান। ইন্দ্রনাথই সুরসিক। এমন সুরসিক লেখক বাঙ্গালায় বড় দেখা যায় না।" গিরিশ বাবু ও ক্ষীরোদ বাবুর নাট্যরচনার অনেক স্থলে খাঁটি রসরচনার পরিচয় পাওয়া যায়। গাম্ভীর্য্যে রসিকতার রসবিকাশে গিরিশ বাবু সুনিপুণ। তাঁহার সিরাজদ্দৌলার করিম চাচা ও জনার বিদূষক ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। ফল কথা, যে রসিকতার রসবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়াছেন, আজিকালিকার অধিকাংশ উপন্যাসে সে রসিকতার রস দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন উপন্যাস-লেখক কেবল রসবিকাশের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সেটা অনেক স্থলেই নিষ্ফল হয়। ছয়টা রসের পাঁচটা রসই চেষ্টা করিলে জমাট বাঁধান যায়, কিন্তু স্বাভাবিক শক্তি ভিন্ন হাস্যরসের জমাট বাঁধান দুরূহ। হাস্যরসের যদি জমাট না বাঁধে, তাহা হইলে তাহা বড়ই হাস্যাস্পদ হয়। উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে অধুনা রসিকতার রসবিকাশের শক্তি অনেকেরই নাই। যতীন্দ্র বাবুরও নাই।

ধ্রুবতারার পর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নববোধন উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। নারায়ণ বাবুর নামের হাঁক ডাক নাই, কোন রকম জাঁক জমক নাই। তিনি নীরবে সাহিত্যসেবা করেন। সাহিত্যসেবায় তাঁহার গৌরব কি অগৌরব হইতেছে, তাহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া সাহিত্যসেবা কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি সাহিত্য-রচনায় মনোযোগী। এই নববোধন গ্রন্থে গ্রন্থকার সাহিত্যশিল্পে বাঙ্গালী সতীর সতীত্ব ও বাঙ্গালী বীরের বীরত্ব যথানুপাতসম্পাত ছায়ালোকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এ গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালী সতীর সতীত্ব-মহিমা, আর বাঙ্গালী বীরের বীরত্বগরিমার স্মৃতি স্বতই জাগিয়া উঠে। ভাষার গুণে চরিত্র-চিত্ররাগ এমনই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পুস্তক পাঠান্তে বহুদিন সে রাগের উদ্ভাস বুকের ভিতর যেন তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটাছুটি করে।

বাঙ্গালীর বল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত। সতীশ বাবু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। পূর্ব্বে ইনি বীরপূজা নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থে যদি তাঁহার নাম না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত। ধ্রুবতারায় যে গুণের অভাব জন্য দুঃখ করিলাম, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে সেরূপ দুঃখ করিবার কোন কারণ থাকে না। বাঙ্গালীর বল উপন্যাসে গ্রন্থকারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে যুবক যুবতীর অবাধ প্রেমের হুড়োহুড়ি বীর পূজায় যেমন, বাঙ্গালীর বল উপন্যাসেও সেই রূপ। বাঙ্গালীর ঘরে ব্রাহ্মণের অনূঢ়া যুবতী কন্যা বেদিনী সাজিয়াছে। এ দৃশ্য আর কাহারও চক্ষে কেমন লাগে বলিতে পারি না," কিন্তু হিন্দুর চক্ষে বিসদৃশ নিশ্চিতই। এ বাঙ্গালায় কিরূপ বাঙ্গালী বীর ছিল, সতীশ বাবু তাহা দেখাইবার ও বুঝাইবার উদ্দেশে এ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এ অধঃপতিত দুর্ব্বল বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালী বীরের আদর্শ নিশ্চিতই উপেক্ষণীয় নহে।

কুমুদানন্দ, কালাপাহাড়, ভবানীর মঠ এবং প্রেততর্পণ ঐরূপই ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ঐরূপ উদ্দেশেই লিখিত। বাঙ্গালীর হৃদয়ে যাহাতে দেশহিতৈষণা জাগিয়া উঠে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী যাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের মত দুর্ব্বল এবং রমণীস্বভাবসুলভ ছিল না, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যাহাতে জাতীয়ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহারই পরিচয় দেওয়া এই সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই সকল গ্রন্থের ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ। মোগল, পাঠান কিংবা মারহাট্টাদিগের বঙ্গাক্রমণ বিষয় এই সব গ্রন্থে বর্ণিত। এই সব গ্রন্থে হিন্দু রাজত্বের কথা আছে, তাহা কোনটা বাস্তবিক, কোনটা বা কাল্পনিক। গ্রন্থকারেরা গ্রন্থের সুযোগে দেখাইতে চাহেন, তিনশত কি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশের লোকেরা কিরূপ সাহসী ও বী ছিলেন। স্বদেশী প্রচার, হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন, বিদেশী বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা এই সব গ্রন্থে সমাবিষ্ট। কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই কোন সন্ন্যাসী, কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই কোন ফকীর, হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার জন্য উন্মুক্ত কণ্ঠে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছেন। সর্ব্বত্রই উপদেশ উন্মাদিনী ভাষা।

কালাপাহাড় উপন্যাস শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত। যাহাতে হিন্দু মুসলমান এক হয়, যাহাতে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হয়, শালিম সা নামক একজন মুসলমান ফকীর এবং দয়ানন্দ স্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী কালাপাহাড়কে তাহারই জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কালাপাহাড় তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ভবানীর মঠ গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থের নায়িকাই ভবানী। ভবানী মুসলমানবিদ্বেষিণী, তাহার পিতা মোগলদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ভবানী তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ভবানী একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্যা। এই সন্ন্যাসী ভবানীকে বার বার বলিয়াছিলেন, "ভবানি! মুসলমানকে ঘৃণা করিও না। মুসলমান এবং হিন্দু এক শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা পরস্পর ভাই। আমাদিগকে মুসলমানের ঘৃণা করা অন্যায় এবং মুসলমানদিগকে ঘৃণা করা আমাদের অকর্ত্তব্য। অপেক্ষা কর, এমন দিন আসিবে, যখন জগতের হিন্দু মুসলমান এক হইবে।" এই গ্রন্থে আবার একজন মুসলমান মৌলবী বলিতেছেন, যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম

বুঝেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মকে ঘৃণা করেন না।

প্রেততর্পণ গ্রন্থখানি একটু বিচিত্র রকমের। উক্ত সুরেন্দ্র বাবুই ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থে একটী মৃত পুরুষ এবং একটী মৃত স্ত্রীলোকের লীলাখেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎপীড়িত প্রজারা মোগল ফৌজদারকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ স্থাপন করিয়াছেন। কালাপাহাড়, ভবানীর মঠ এবং প্রেততর্পণ গ্রন্থ ভগবদ্গীতার ভাবপ্রবাহে পরিপ্লুত।

রক্ষীকঙ্কণ নামক উপন্যাসখানি রাজনৈতিক। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাগ ইহার প্রণেতা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই এই উপন্যাসের ভিত্তি। গল্পের ভাবটা এইরূপ ;—একজন বিলাতী কাপড়ের ব্যবসাদার নিজ কন্যা এবং অধীন একজন যুবকের প্রতি অত্যাচার করেন। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা স্বদেশীর পক্ষপাতী। তাহার এই ব্যবহারে তাহার প্রতিবাসীরা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে সে সমাজচ্যুত হয়। তাহার কন্যার বিবাহ হওয়া দায় হইয়া উঠিল, বালিকার বিমাতা কন্যাকে হত্যা করিবার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ফলে ঐ বিদেশীয় বস্ত্রের ব্যবসাদার জেলে যায়।

আলোচ্য বর্ষে রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত কামিনী-কাঞ্চন ও ভক্তের ভগবান্ নামে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ এবং তাঁহার জীবন-ঘটনাই এই দুই গ্রন্থের ভিত্তি। এই দুইখানি গ্রন্থ সুপাঠ্য বটে, তবে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে যে উচ্চদরের উপন্যাস লেখক বলিয়া উপাধি দিয়াছেন, তাহার যোগ্য হয় নাই।

ইতিহাস।

এইবার ইতিহাসের কথা। আলোচ্য বর্ষে মৌলিকতার দাবী করিতে পারে, এমন ইতিহাস একখানিও নাই। তবে একখানি ইতিহাসের এবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। তাহাতে অবশ্য মৌলিকতার মর্য্যাদা আছে। সেখানি শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার রচিত ইংরেজের জয়। এই ইংরেজের জয় গ্রন্থ অদ্যকার সভার সদস্যদিগের নিকট নিশ্চিতই সুপরিচিত। সুতরাং তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিলে ক্ষতি হইবে না। অন্ধকূপহত্যার বিবরণ যে হলওয়ে সাহেবের কল্পনাপ্রসূত, অন্ধকূপের যে অস্তিত্ব ছিল না, বিহারী বাবু এই ইংরেজের জয়ে নানা ঐতিহাসিক প্রমাণে তাহা প্রমাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁহার সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ইহার সমর্থন করেন। অন্ধকূপের ব্যাপার নবাব সিরাজদ্দৌলার অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছিল টরেন্সপ্রমুখ দুই একজন ইতিহাস-লেখক এই কথাই বলিয়াছিলেন। যে গৃহে অন্ধকূপের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে কথিত আছে, সেই গৃহে অন্ধকূপহত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র তাহার প্রমাণ করিয়াছিলেন। বিহারী বাবু বলেন, উক্ত ঘরের মাপ ভুল হইয়া থাকিতে পারে, ফলে কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, বিহারী বাবু তাহা নানা ইতিহাসের প্রমাণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইতে পারে, কিন্তু বিহারী বাবুর গবেষণাশক্তির কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরেজের সহিত নবাব সিরাজের যে সকল

চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, ইংরেজের জয় গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই সকল চিঠি পত্র পড়িলে লোকের মনে ঠিক তাহার বিপরীত ধারণা হয়। এসব চিঠিপত্র বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থে নাই। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য রহস্য উদ্ঘাটিত, পরন্তু ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদেয় সামগ্রী।

ইংরেজের জয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ভিন্ন এবার আর কয়খানি যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মৌলিকতার মর্য্যাদা নাই। কোনখানির বিষয় ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, আবার কোনখানি বা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ। ভরতপুরের যুদ্ধ, বঙ্গে বর্গী, স্বাধীনতার ইতিহাস, শিখ ইতিহাস ও সিপাহীবিদ্রোহ এই কয়খানি গ্রন্থ আলোচ্য বর্ষে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। ভরতপুর যুদ্ধ এবং বঙ্গে বর্গী শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার রচিত। ইংরেজের সঙ্গে ভরতপুরের জাঠদিগের সহিত দুই বার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে ইংরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, এই যুদ্ধে ভরতপুর রাজ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ভরতপুরবাসীদিগের হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভরতপুরবাসীদিগের মধ্যে বহু পুণ্যাত্মা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ভরতপুরবাসীরা ইংরেজ সৈন্যকে এরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল যে, ভরতপুরের দুর্গপ্রাচীর পার্শ্বস্থ পরিখা ইংরেজের মণ্ডিত খণ্ডিত দেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ২০ বৎসর পরে আবার ভরতপুরবাসীদের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ভরতপুরবাসীরা পরাজিত হইয়াছিল। এ পরাভবের মূল ভরতপুরবাসীদিগের আত্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। বিহারী বাবু লিখিয়াছেন, এদেশী লোকে বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতে ইংরেজ রাজত্ব সৃষ্টি। এই ঐতিহাসিক সাহিত্য ভারতবাসীর অবস্থাবিবর্ত্তনের এক সাক্ষী হইয়া রহিল। ভরতপুর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা বলিবার আছে। তাৎকালিক কলিকাতা রিয়েটের বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কালীচরণ ঘোষ অপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সমগ্র ইংরেজ সৈন্যকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি জেনারেল কালু ঘোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বর্গীর হাঙ্গামার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু এই বর্গীর হাঙ্গামায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গদেশ কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন গ্রন্থে প্রকাশিত ছিল না। বিহারী বাবুর বঙ্গে বর্গী গ্রন্থে সে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী বীর জমীদারেরা বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ কল্পে আলিবর্দ্দির সহায় স্বরূপ হইয়া কিরূপ বীরত্ববীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বঙ্গে বর্গী গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালায় বীর ছিল, হায়! সেই বুঝি শেষ। বর্গীর হাঙ্গামা গ্রন্থে তাহাদের কীর্ত্তিভাতি উদ্ভাসিত। সে ভাতি এখন আর বাঙ্গালায় নাই। কেবল গ্রন্থগত হইয়াই রহিয়াছে। বিহারী বাবুর সুন্দর ভাষায় বর্ণিত সে বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়া প্রাণ পুলকে মাতিয়া উঠে, কিন্তু যখন দেখি বাঙ্গালায় আর সে বীর নাই, তখন নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে হৃদয় ভরিয়া যায়। আলিবর্দ্দি বর্গির হাঙ্গামায় বিব্রত ছিলেন, সেই সুযোগে ইংরেজ কলিকাতায় বল সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় আলিবর্দ্দির অমঙ্গল, কিন্তু তাহাতেই ভারতে ইংরেজের ভবিষ্য মঙ্গলের পূর্ণ সূচনা। বিহারী বাবু বিশদ ভাবে ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বাধীনতার ইতিহাস শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী রচিত। ইহাতে ফরাসী বিপ্লব, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্, ইটালি, স্পেন, বেলজিয়ম এবং অপর কয়েকটী রাজ্যের বিপ্লব বিশদরূপে বিবৃত। এই সকল রাজ্য কখন কিরূপে কি ভাবে স্বাধীনতালাভ করিয়াছিল, দুর্গাদাস বাবু তাহা সরল সহজ অথচ আবেগময়ী ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐ সকল দেশের আদর্শে যাহাতে এ দেশের লোকের মনে দেশ-হিতৈষণা জাগিয়া উঠিতে পারে, এই স্বাধীনতার ইতিহাসের রচনার উদ্দেশ্য তাহাই।

শিখ ইতিহাস জে ডি কনিংহাম সাহেবের রচিত History of the Sikhs গ্রন্থের অনুবাদ। এ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী দ্বারা সম্পাদিত। লাহিড়ী মহাশয় এই গ্রন্থে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। কনিংহাম সাহেবের গ্রন্থে সে বিবরণ নাই। কনিংহাম সাহেব শিখ ইতিহাসে খাঁটী সত্য কথা লিখিয়াছেন। অর্থাৎ এই শিখ যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজের বড় গৌরব প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক ম্যালিসনের কথার প্রমাণে লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কনিংহাম সাহেব ভূপাল রাজ্য হইতে কর্ম্মচ্যুত হন।

ইতিহাসের রচনায় এ দেশের লোকের প্রবৃত্তি হইয়াছে, আর ইতিহাসের পঠনায় এ দেশের লোকের মতিগতি ফিরিয়াছে, ইহার প্রমাণস্বরূপ ঐতিহাসিক চিত্রের কথা তুলিতে পারা যায়। ইহা একখানি মাসিক পত্র। যাহাতে এ দেশের লোকে ঐতিহাসিক বিবরণের আলোচনা করিতে পারে, তাহারই উদ্দেশে ইহার প্রচার। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইহা হস্তান্তরিত হয়। শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় এই ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই মাসিক পত্রে নানা ঐতিহাসিক চরিত্রের আলোচনা দেখিয়া আশা ভরসা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা কয়েক মাস পরেই অন্তর্হিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ইহা আবার পুনঃ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখন আর ইহা দেখিতে পাই না।

ইতিহাস রচনায় বিদেশীয়দিগের যে গৌরব, এ দেশে ইতিহাস রচনা এখনও সে গৌরবে পৌঁছিতে পারে নাই। বকল, মিল, থরনটন, ম্যালিসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা আমাদের দেশের কথা যত লিখিয়াছেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও লিখিতে পারি নাই। আমাদের ইতিহাস ছিল না, অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক সেই সুযোগে আমাদের দেশের অনেক ঘটনা অসত্যের গাঢ় কালিতে ছাপিয়া প্রচার করিয়াছেন। বড় সৌভাগ্যের কথা, এখন আমাদের দেশের কোন কোন লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহারা কোন কোন ঘটনার অসত্য আবরণ সরাইয়া সত্যের বিশ্বোজ্জ্বল আলোকে দেশের লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমরা বহু ইংরাজ ঐতিহাসিকের যে গবেষণা, যে অনুসন্ধিৎসা দেখিতে পাই, আমাদের বাঙ্গালা দেশে এখন তাহার অনেক অভাব আছে। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা যে পথ খুলিয়া দিয়াছেন, সেই পথের মাঝে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই, ভবিষ্যের সেই ঘনান্ধকার বিলীন হইয়াছে, যেন প্রভাতগগনের বালার্করাগ ফুটিয়া উঠিতেছে। ভরসা হয়, আমাদের বাঙ্গালী লেখকগণ কি গবেষণায়, কি অনুসন্ধিৎসায়, কি দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণে, কি প্রকৃত ঘটনাবর্ণনে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণকে পরাস্ত করিবে।

জীবনচরিত।

এইবার জীবনচরিতের কথা। এখন যে ভাবে ও প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে সে ভাবে, সে প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হইত না। কালিদাস ভবভূতির জীবনচরিত নাই। আমাদের কীর্ত্তিমান্ লোকেরা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন, জীবনী রাখিতেন না। তাঁহাদের জীবন গিয়াছে, জীবনী নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহাদের কীর্ত্তির আলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কীর্ত্তির পথে অগ্রসর হউক, জীবনঘটনা অনন্তে বিলীন হইলে ক্ষতি নাই। এখন যে সব জীবনচরিত লিখিত হয়, তাহা বৈদেশিক জীবনচরিতের অনুকরণ। পূর্ব্বে লোকে লোকললামভূত লোকাদর্শ ভগবচ্চরিত্রেরই চর্চ্চা করিত। তদ্ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না; পরন্তু তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তিও হইত না।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নামক একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী ইহার রচয়িতা। ইহা চৈতন্যের বিস্তৃত জীবনচরিত। গদ্যে লিখিত। গোস্বামী মহাশয় একজন ভক্ত বৈষ্ণব; বৈষ্ণবের ভাবেই ইহা রচিত। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দেশমান্য ধার্ম্মিকের জীবনচরিত লেখায় অনেক লেখকেরই প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে হয় যে, এদেশের লোক সাধু জীবনী পাঠে ক্রমে আগ্রহান্বিত হইতেছে। তবে আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর কেবলই উল্লেখযোগ্য সাধুজীবনী। গৌরাঙ্গের জীবনে কেবলই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে। বৈষয়িক দেশমান্য লোকের জীবনচরিত এ বৎসর বেশী নাই। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার কৃত মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবনচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ সংবর্দ্ধন করিয়াছে। তবে এ গ্রন্থখানি যতটা বড় হওয়া উচিত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, ততটা বড় হয় নাই। তাঁহার রচিত বিদ্যাসাগর পড়িয়া ঐরূপ ধারণাই হইয়াছিল। ফলে এ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও বিহারী বাবুর স্বাভাবিক সুন্দর ভাষায় ও গভীর দার্শনিক ভাবে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। সেই পুণ্যশীলা দয়াময়ী মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিত্র পাঠে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় জীবনী লিখিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও বাঙ্গালা জীবনচরিত পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত জীবনচরিতের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বিলাতের মরলে সাহেব যেরূপ দার্শনিকভাবে গ্লাডষ্টোনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় সেইরূপ জীবনচরিতের অভাব। চরিত্রের উচ্চাদর্শ, সাধারণের চক্ষের সম্মুখে খাড়া করিয়া তুলা জীবনচরিত রচনার উদ্দেশ্য। উচ্চাদর্শের উচ্চ লক্ষ্য। দার্শনিক দৃষ্টি না হইলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। উচ্চাদর্শের বিশ্লেষণে দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন। সেরূপ দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনচরিত-লেখক এখন বাঙ্গালায় বিরল। তবে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রভৃতি জীবনচরিতের যে আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

কবিতা পুস্তক।

এইবার কবিতা পুস্তকের কথা। আজি কালির বাজারে কবিতা পড়া নিশ্চিতই নিতান্ত কর্ম্মভোগ। কেননা, বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিরামই কবিতা প্রসব করিতেছে। কিন্তু এ সব গ্রন্থের কয়খানি পাঠ্য? এবার যে সকল কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

অনুকরণ। এখন বঙ্গ কবিবহুল। অনেকই রবিকবির শিষ্য। তবে গুরুর কবিতা বুঝিতে পারি তো শিষ্যের কবিতা বুঝিতে পারি না। অধিকাংশ কবিতাই যেন কেবল হেঁয়ালিময়। আলোচ্য বর্ষে যে সকল কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল একখানির নাম করিতে পারি। এই একখানিই উল্লেখের যোগ্য। এখানি গীতি কাব্য, নাম হোমশিখা, রচয়িতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত লেখক ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। এ গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যে রবি বাবুর অনুকরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহার সকল কবিতাই কবির নিজস্ব। প্রত্যেক কবিতার ভাষায় ও ভাবে সত্য সত্যই যেন বাণীর বীণার ঝঙ্কার উঠে। অধিকাংশ গীতিকবিতা স্বদেশী সম্বন্ধে। প্রত্যেক গীতিকাব্যে ভারতের পতিত অবস্থার জন্য তপ্ত শ্বাস ছুটিয়াছে। প্রত্যেক গীতিকাব্যে ভারতবাসীকে জাগাইবার প্রয়াস রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান এক হউক, বিদেশী বর্জ্জিত হউক, স্বদেশের লুপ্তপ্রায় শিল্পবাণিজ্যের উদ্ধার হউক, ইহাই অধিকাংশ গীতিকবিতার মর্ম্মবাণী।

বিদেশীয় ভাষার গ্রন্থাদির অনুবাদে নিশ্চিতই বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধন হয়। বৎসর বৎসর অনেক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে; এ বৎসরও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত জুলিয়াস সিজার। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু ইংরেজী ফরাসী সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অনূদিত নাটকের কোন কোন স্থলে ছন্দোবদ্ধ কিছু শ্রুতিকটু হইলেও মোটের উপর প্রশংসনীয়। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা জানেন না, তাঁহারা জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অনুবাদ পড়িলে নিশ্চিতই মূল গ্রন্থের ভাব সংগ্রহ করিতে পারেন। জুলিয়াস সিজারের অনুবাদ পাঠে তৃপ্তিলাভ করা যায়। এ অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় ভাবের সম্পদ্ সংবর্দ্ধনের জন্য গৌরবান্বিত হইতে পারে। মরলের লা মুর মেডিসিনের ভাব লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ "যেইসা কা তেইসা" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা সুপাঠ্য।

ধর্ম্মগ্রন্থ।

এইবার ধর্ম্ম গ্রন্থ। ধর্ম্মগ্রন্থ তেমন কিছুই নাই। ঐ ত দুঃখ। বাঙ্গালা সাহিত্যের নাম হইলে ঐ জন্যই আপশোষের তপ্তশ্বাস বহে। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে কেবল পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম এ রচিত "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিবার যোগ্য। এই গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয় সাংখ্য, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে পাশ্চাত্যভাবে উপনিষদের উপদেশ আলোচিত হইয়াছে।

বিবিধ।

যে সকল গ্রন্থের আলোচনা হইল, তাহা ব্যতীত আর কয়েকখানি গ্রন্থ আলোচনা করিবার উপযুক্ত। "বর্ত্তমান রণনীতি" নামক একখানি গ্রন্থে বর্ত্তমান অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধকৌশল প্রভৃতির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এভাবের পুস্তক আর হয় নাই। কি ভাবে গোপনে যুদ্ধ করিলে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, গ্রন্থকার তাহার একটা বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু রচিত ফলশ্রুতি গ্রন্থ আলোচ্য বর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গরাগ

সংবর্দ্ধন করিয়াছে। এই ফলশ্রুতি গ্রন্থে যে সব কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের সাহিত্য-সংহিতায় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী লেখকেরা পাশ্চাত্য ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন, পূর্ণ বাবুর ইহা অভিপ্রেত নহে। পাশ্চাত্যভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে, পূর্ণ বাবু ফলশ্রুতি গ্রন্থে তাহারই বিচার করিয়াছেন। বিচারে পূর্ণ বাবু জয়ী হইয়াছেন। এই বিচারের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি। যে পাশ্চাত্যজাতির আকৃতি প্রকৃতি, রীতি নীতি, শিক্ষা দীক্ষা, আচার সংস্কার, আমাদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের আদর্শ আমাদের সাহিত্যে অনুসৃত হইলে আমাদিগের আত্ম-স্ব ডুবিয়া যায়, পরন্তু সাহিত্যের সে আদর্শের প্রচারে সমাজে বিকৃতি সংঘটনই হইয়া থাকে। অধুনা অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্রে ইহার প্রমাণ জাজ্বল্যমান। পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাদুর্ভাবে অধুনা অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্র মলিন হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ অবস্থায় এই কথাটাই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সে প্রথমরচিত কয়েকখানি উপন্যাসে যে পাশ্চাত্য আচারের প্রাখর্য্য দেখিতে পাই, তাঁহার শেষরচিত উপন্যাসে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাখর্য্যে নষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা তিনি শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অধুনা কোন কোন ইংরেজিশিক্ষিত সুলেখক ইহা বুঝিতেছেন। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবাসী নামক মাসিক পত্রিকার কোন লেখক লিখিয়াছেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা যেন অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্প অনুকরণ না করে। কেননা, পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের আদর্শ ক্রমে গুণচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। এদেশের লোকেরা যেন এদেশীয় স্বভাবজ আদর্শে চিত্রশিল্পের অনুসরণ করেন। তবে পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের যে প্রণালীটি ভাল, তাহা লইলে ক্ষতি নাই। ঐ লেখকেরই মত এই, কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ করিয়াছিল বলিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের সাহিত্যে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিজস্ব বলিবার কিছুই থাকে না।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক রচিত ফুল্লরা, বেহুলা ও সতী নামক তিন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছে। বাঙ্গালা কাব্যের বিরাট বিশাল চিত্রপটে, মণিমাণিক্যখচিত রত্ন-সিংহাসনে যে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাষী সতী-চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার তুলনা কোথায়? পাশ্চাত্য কোন কাব্যে সে গরীয়ান্ মহীয়ান্ সতী-চরিত্র-চিত্র দেখিতে পাও কি? এ ভারতভূমি আদর্শ সতীর লীলাক্ষেত্র। ভারতবাসীই বুঝে আদর্শ সতীর মহিমা। তাই ভারতীয় কাব্যেই দেখি আদর্শ সতীর চরিত্র-চিত্র। সে চিত্র, কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি সৌম্য, কি সুন্দর। পাশ্চাত্য জাতি তাহার মহিমা কি বুঝিবে? ফুল্লরা স্বভাবজ সুন্দর বনজ কুসুম। সে যে চিরবনবাসী চিরদুঃখী ব্যাধপতির জীবনসঙ্গিনী। ক্ষুধায় অন্ন পায় নাই, তৃষ্ণায় জল পায় নাই, কিন্তু একদিনও এই সর্ব্বংসহা সতীর চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখি নাই। কবিকঙ্কণের এ কুসুমসৌন্দর্য্যের মহিমাবিকাশ, একদিন দেখিয়াছিলাম স্বর্গীয় ঠাকুরদাসের মালঞ্চে, আর আজি দেখিলাম দীনেশচন্দ্রের গদ্য কাব্যে। বেহুলা সর্পদষ্ট মৃত পতি নখিন্দরের দলিত গলিত পূতিময় শবদেহ বুকে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছিল, আর

পতিব্রত্যের পুণ্য পূত মোহন তানে স্বর্গের দেবতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ঐ গলিত দলিত শবদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিল। শুধু কি তাই? বেহুলার অতুলনীয় পাতিব্রত্যে বিমুগ্ধ অমরবৃন্দের শুভ সঞ্জীবন বরে নখিন্দরের আর ছয়টী সর্পদষ্ট মৃত ভ্রাতা জীবনলাভ করিয়াছিল। শ্মশান-সন্ন্যাসী শিবের সর্ব্বস্ব সতী, পতির একটীমাত্র নিন্দাবাদ শুনিয়া সমাধিতে দেহত্যাগ করিয়াছিল। ভারত ব্যতীত আর কোন দেশে,কোন রাজ্যে, কেহ কি এমন দেখিয়াছে? ফুল্লরা বেহুলা সতী—সতীত্ব-কুসুমস্তবকে গোলাপ-চম্পক-চামেলী। ফুল্লরা বেহুলা সতী—শারদীয় চন্দ্রমাচুম্বিত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী। ফুল্লরা বেহুলা সতী—সৌরকরবিম্বিত বিশ্বোজ্জ্বল মণিমরকতমাণিক্য। ফুল্লরা বেহুলা সতী—স্বচ্ছ গগনের স্মিত শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক। অধুনা এদেশের অনেক ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তি সে মহিমা বুঝেন না; অনেকেই তাহা জানেন না। শুনিয়াছি, এখনকার কোন প্রসিদ্ধ কবি স্পষ্টতই বলিয়াছিলেন, ফুল্লরা কি, বেহুলা কি, তাত জানি না। ফুল্লরা, বেহুলা, সতী, ভারতের সতী-শিরোমণি। বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি তাহা জানেন না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের কথা কি আছে? এই কবি একজন প্রসিদ্ধ লেখককে বলিয়াছিলেন যে, আমি রামায়ণ পড়ি নাই। শুধু এ প্রসিদ্ধ কবি কেন, আধুনিক শিক্ষিত অধিকাংশেরই এই অবস্থা। ইহাঁদেরই জন্য দীনেশ বাবু ফুল্লরা, বেহুলা ও সতী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সাধু গদ্যে সহজ সরল বাঙ্গালা ভাষায় এই কয়খানি গ্রন্থ লিখিত। ফুল্লরার চরিত্র-কাহিনী আপনারা কবিকঙ্কণে পড়িয়াছেন। বেহুলার কাহিনী ক্ষেমানন্দ ও কেতকী দাস রচিত মনসার ভাসান গ্রন্থে বিবৃত। আর পশুপতি-পত্নী সতীকাহিনী আপনারা আর কিছুতে দেখিয়া না থাকুন, অন্ততঃ ভারতচন্দ্রে দেখিয়াছেন। তিনটীই আদর্শ সতী। এই তিন সতীর মহিমা-গীতি বিবৃত করিয়া বলিবার আমাদের স্থানও নাই, সময়ও নাই। বেহুলার গল্প সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কবি কি কি ভাবে লিখিয়াছেন, দীনেশ বাবু সূচনায় তাহার একটী পরিস্ফুট পরিচয় দিয়াছেন। এই সূচনাটীই বঙ্গ সাহিত্যে একটী গৌরবান্বিত সামগ্রী হইয়াছে। এই তিন সতীর চরিত্র বিবৃতি পাঠে পাঠকমাত্রেই বিমোহিত হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে; পরন্তু আধুনিক যে সকল ইংরেজিশিক্ষিত লোক এই সতীত্রয়ের চরিত্র-কথা আদৌ জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা এই তিনখানি গ্রন্থ পড়িয়া অপূর্ব্ব সতীত্ব-মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবেন; আর শাশ্বত সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে স্বচক্ষে প্রতিফলিত দেখিয়া সবিস্ময়ে সহস্রবার মস্তক অবনত করিবেন। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গালা কাব্যে এই তিনটী সতী-কাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় মধ্যে ভক্তি-ভাবের যে গদগদ গোদাবরী-প্রবাহ বহিয়া যায়, দীনেশ বাবুর এ তিনখানি গ্রন্থ পড়িলে তাহা হয় না। মনে হয়, প্রাচীন কবিরা বাঙ্গালা কবিতায় ভক্তের ভাবে কাব্যে যে রস সঞ্চার করিয়াছেন, সে রসসঞ্চার দীনেশ বাবুর এ তিন গ্রন্থে নাই। দীনেশ বাবু সুলেখক বটে, তাঁহার ভাষায় অধিকার আছে, তাঁহার ভাবসম্পদ্ আছে, কিন্তু সেই ভক্ত ভাবুক পূর্ব্ব কবিদিগের ন্যায় তিনি ভক্ত নহেন। সতীমহিমাবিকাশিনী যে অলৌকিক ঘটনায় বাঙ্গালা কবিরা ভক্তিরসের প্রবাহ ছুটাইয়াছেন, স্থানে স্থানে দীনেশ বাবু সে ঘটনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

স্থানাভাব; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল একটী ঘটনা উল্লেখ করিলাম। নেতা ধোপানী ক্ষারে কাপড় কাচিয়াছিল, আর বেহুলা কেবল গঙ্গাজলে কাপড় কাচিয়া দেবতাগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ইহাই সতীর গৌরব বিকাশী অলৌকিক ঘটনা নহে কি?

সাময়িক পত্র।

এইবার সংক্ষেপে সাময়িক পত্রিকার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আলোচ্য বর্ষে অন্যূন নয় শত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এক হাজার তিরনব্বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর অবশ্য কমিয়াছে। কেন কমিল, তাহার ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। তবে মনে হয়, এবার অধিকাংশ সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক চর্চ্চাটা কিছু বেশী বেশী হইয়াছে। রাজনীতিচর্চ্চায় অনেক সাময়িক পত্রের আদরও বাড়িয়াছে। অনেকেরই রাজনীতি চর্চ্চার ঝোঁক নাই। রাজনীতির চর্চ্চা না থাকিলে সাময়িক পত্রের আদর হইবে না, ইহা ভাবিয়াই বোধ করি অনেকেই আপনাদের প্রকাশিত সাময়িক পত্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনেক সাময়িক পত্রই প্রকাশিত হইতেছে, আবার জলবুদ্বুদবৎ ডুবিয়া যাইতেছে। সুপরিচালিত মাসিক পত্রের মধ্যে প্রবাসী, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি কয়েকখানির নাম করিতে পারা যায়। ৩৭ খানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ৪৫ খানি পুরাতন বিদায় হইয়াছে। যে সকল মাসিক পত্র নূতন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানিতে চিকিৎসাতত্ত্ব, একখানিতে আইন, ৩২ খানিতে বিবিধ বিষয়, একখানিতে কেবল কবিতা, এবং দুইখানিতে কেবল ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে। প্রবাসী, বঙ্গদর্শন এবং নব্যভারতে রাজনীতির আলোচনাটাই বেশী দেখিতে পাই। এই কয়খানি মাসিক পত্রের লেখকের মধ্যে অনেকেই চিন্তাশীল। মাসিক পত্রের আলোচনায় দেখা যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ দিন কতক বীণার ঝঙ্কার ছাড়িয়া রাজনীতির আন্দোলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। রবি বাবুর লেখায় যথেষ্ট ভাব থাকে, কিন্তু ভাষাটা কেমন যেন বাঁকা বাঁকা হইয়া যাইতেছে। প্রবাসী ও নব্যভারত আধুনিক চরমপন্থী রাজনীতিক দলের পক্ষপাতী। প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মাসিক পত্রে রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, রাজভক্ত হওয়া প্রজার যেমন কর্ত্তব্য, তেমনই সুশাসনে প্রজাপালন করাও রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা সুশাসনে প্রজার পালন না করে, তাহার রাজ্যত্যাগ করাই উচিত। আজকাল যে ভাবে রাজনীতির আলোচনা হইতেছে, রবীন্দ্র বাবুর মতে সে ভাবে রাজনীতির আন্দোলন হইলে ফল হইবে না। ফল কথা, ১৮০৭ সালে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন ভাবের প্রবাহ বহিয়াছে।

উপসংহার।

১৮০৭ সালের সাহিত্যের আলোচনা করিয়া কি বুঝিলাম? বুঝিলাম কয়েক বৎসর ধরিয়া যে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন হইতেছে, তাহারই ভাবানুভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ণমাত্রায় অনুস্যূত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এদেশের লোক যে কৃষির উৎকর্ষসাধনে, বাণিজ্যের প্রসার কল্পে, শিল্প উদ্ধারের অনুশীলনে এবং জাতীয় শিল্প সংবর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, ১৮০৭ সালের সাহিত্য জলন্ত দীপক রাগে তাহারই সাক্ষ্য দিবে। তবে যেরূপ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে দেশ, সমাজ ও জাতীয়ত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রকটিত হইতে পারে, সেরূপ সাহিত্যের অভাব এখনও আছে। যে দিন বুঝিব মাসিক পত্রেরই কি, আর গ্রন্থাদিরই কি—সংখ্যার হ্রাস হয় হউক—অসারত্ব কমিয়াছে, সারত্ব বাড়িয়াছে, সেই দিন বুঝিব সাহিত্যের গতি সত্য সত্যই চরমোৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ১৮০৭ সালের সাহিত্যে জাতীয়ত্বের বিকাশ-পরিচয় পাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মসাধনার তেমন পরিচয় নাই। দেশই বল, জাতিই বল, সমাজই বল, স্বদেশই বল, যা কিছু বল, সকলেরই উৎকর্ষসাধনের মূল ধর্ম্মসাধনা। ১৮০৭ সালের সাহিত্যে দেখিলাম, কৃষি আছে, শিল্প আছে, স্বদেশী আছে, স্বরাজ আছে, জাতীয় শিক্ষা আছে, সবই আছে, নাই কেবল যে ধর্ম্মসাধনায় ভারতে জগদারাধ্যা জগদ্ধাত্রীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, সেই ধর্ম্মসাধনা। যদি তাই না থাকে, তবে সবই যে রসাতলে যাইবে, তাহা হইলে যে উচ্চ সৌধচূড় মহাসাগরের অতলতলে ডুবিবে। দেশ বল, জাতি বল, সমাজ বল, সাহিত্য বল, স্বরাজ বল, স্বদেশীশিল্পই বল, ইহসংসারের যাহা কিছু বল, ধর্ম্মের পাষাণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কক্ষভ্রষ্ট কেন্দ্রচ্যুত গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কে কোথায় গিয়া পড়িবে। ধর্ম্মের জয় হউক, সাহিত্যের জয় হইবে। ধর্ম্মের বলে বাঙ্গালা সাহিত্য দিগ্বিজয়ী হইবে। নহিলে জানিও, বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্তিত্ব অচিরে বিলুপ্ত হইবে।

ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব হইতে মাধুর্য্য ভাব শ্রেষ্ঠতম, এই রস সকল রসের শেষ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রসের উদ্ভাবক এবং গোপীসনে ইহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসের পূর্ণ রসিক। গোপীরা ভগবানে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, আকাশে, ভূতলে, নদীর জলে, বৃক্ষপত্রে, গৃহে, বাহিরে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, চলিতে, বসিতে, কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না; কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। শ্যামসলিলা যমুনার জলে গিয়া জল দেখিতে পাইতেন না, সেই নবনীরদ শ্যামল শ্যামচাঁদকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইতেন; আকাশের দিকে চাহিলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি দৃষ্টিপথে পতিত হইত না, কেননা মেঘের কোলে সেই "মেঘের বরণ" শ্যামমেঘকে দেখিতেন। দর্পণে গোপীকারা নিজ নিজ মুখমণ্ডলের ছায়া দেখিতে পাইতেন না, তন্মধ্যে সর্ব্বলোকের আলোক স্বরূপ—সকল জ্যোতির জ্যোতিস্বরূপ—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

এমন যে হরি কেবল তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোপিকাগণ যেন এক হইয়া গিয়াছিলেন, যেন গোপীগত প্রাণ কৃষ্ণ আর কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিনী। এই ভাব মধুর ভাব, এই রস মাধুর্য্য রস; পতি ও পত্নী যেমন এক, এই মাধুর্য্য রসে ভক্তাধিক ভক্তগণ পরমেশ্বরকে আপনার করিয়া লন এবং পরমেশ্বরও ভক্তের নিজস্ব হইয়া যান। এই মাধুর্য্য রসের পরাকাষ্ঠা কেবল ভারতবর্ষে, কেবল হিন্দুধর্ম্মে, কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই আছে, অন্যত্র নাই। য়িহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ইহাঁরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবের সীমা পর্য্যন্ত

পৌঁছিয়াছিলেন, মাধুর্য্যরসের সীমায় পৌঁছিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীভগবান্, পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে, পুণ্যবান্ হিন্দু জাতিতে, শ্রীকৃষ্ণরূপে মাধুর্য্যলীলা দেখাইয়া হিন্দুধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম এবং ভারতবর্ষকে সর্ব্বস্থানাপেক্ষা পবিত্রতম প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষীরা এখন বুঝুন, ভারতাকাশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় না হইলে ভারত এখনও ধর্ম্মগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে যদি রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব মহাদেব—এই তিন চরিত্রকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না; হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র "গজভুক্ত কপিত্থ"বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই মধুর কৃষ্ণরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব একাধারে সম্মিলিত হইয়া আদর্শ মানব ও আদর্শ দেবতার পূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছে। Humanity and divinity were perfected in that Great one—the one glorious Unit-অর্থাৎ প্রকৃত কথা এই, মানুষ যখন চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিগতকল্মষ হয় এবং আমিত্ব বা অহংবুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল একমাত্র ভগবৎসত্তায় প্রাণ ধারণ করে, তখন সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার শয়ন, জাগরণ, উপবাপন, কথোপকথন, বিচরণ, সামর্থ্য প্রভৃতি দেবোচিত হয়। মৃন্ময় পাত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয় না, কলুষিত চিত্তে ভগবৎ ঐশ্বর্য্য প্রতিভাত হইতে পারে না, কিন্তু স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল চিত্তে ব্রহ্মজ্যোতি পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভক্তের বিমল হৃদয়ে যখন ভগবৎ জ্যোতি প্রতিভাত হয়, তখন ভক্ত মধ্যে আর "আমিত্ব" থাকে না, ভক্ত মধ্যে যখন "অহং বুদ্ধি" থাকে না, ভক্ত তখন আপনার যথাসর্ব্বস্ব সেই বিশ্বাধিপতির মহদাশ্রয়ে সমর্পণ করিয়া, ভক্তবৎসল ভগবানে আপনার সত্তা মিলাইয়া দেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি দেবত্ব নহে? ইহাই তো দেবত্ব। দেবতা ও মানুষে এই প্রভেদ।

কবিকুঞ্জের কোকিলরাজ শ্রীশ্রীমৎ কালিদাস বলিয়াছেন—"ছায়া ন মূচ্ছতি মলোপহত প্রসাদে শুদ্ধেতু দর্পণতলে সুলভাবকাশা"—অর্থাৎ দর্পণের স্বচ্ছতা যখন মলিন বস্তুর সম্পর্কে মালিন্যে আচ্ছাদিত হয়, তখন তাহাতে প্রতিবিম্ব পাত হয় না; কিন্তু সেই দর্পণই যখন নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তখন তাহাতে অনায়াসে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। মানুষের হৃদয়-দর্পণও যখন পৃথিবীর মলিনতায় আবৃত রহে, তখন হৃদয়ারাধ্য ও হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরও উহাতে অনুভূত হন না, কিন্তু সেই হৃদয়ই যখন সাধনের প্রসাদাৎ শুদ্ধস্বচ্ছ নির্ম্মল ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বর সততই উহাতে প্রতিবিম্বিত রহিয়া মানুষকে দেবত্বের সীমায় পৌঁছাইয়া দেন। পবিত্র হইতে পবিত্রতর এবং পবিত্রতর হইতে পবিত্রতম শ্রীমদ্ভাগবতে পরম পূজ্য মহর্ষি লিখিয়াছেন—

নহি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনো দীপ্তিজঃ প্রতাপঃ।

অর্থাৎ যেমন চন্দ্রের রশ্মিপুঞ্জে হুতাশনের দীপ্তিজনিত প্রতাপ প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ভগবজ্জ্যোতি পূর্ণভাবে ভক্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইলে ভক্তদেহের "আমিত্ব" আর থাকে না। ভক্ত তখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অসাধারণ সামর্থ্যশালী হইয়া উঠেন; ভক্ত তখন অপৌরুষেয় সামর্থ্য প্রাপ্ত হন, ভক্ত তখন "Above man" হইয়া উঠেন, তিনি Superhuman হইয়া উঠেন, কারণ তখন তিনি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে আসিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদের মহর্ষি কহিতেছেন—

সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ তে ব্রহ্ম

লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরে ব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ইহার স্থূল অর্থ এই, শুদ্ধসত্ত্বা দ্বারা মানব জীবন্মুক্ত হয়, চিত্তশুদ্ধির তেজে মনুষ্য উপাধি আদি হইতে রহিত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মসাধনায় ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। সন্ন্যাস যোগে ব্রহ্ম মিলিয়া যায়। এখন বুঝা গেল, মানুষ দেবতা হইতে পারে। সাধনা, ধ্যান, ধারণা, চিত্তশুদ্ধি, যোগ প্রভৃতিতে ভক্ত বা সাধক যখন গোপিকাসুন্দরীর ন্যায় ভগবানে তন্ময় হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং সেই ভাবের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিতে তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালাভিজ্ঞ হয়েন, তখন তিনি রাজার রাজা হইয়া বসেন। এই অবস্থার নাম দেবত্ব। আপনারা অবশ্যই আতস নামক আশ্চর্য্য প্রস্তর দেখিয়া থাকিবেন। সূর্য্যকিরণ যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, মানুষের মনোবৃত্তিসমূহও নিরন্তর চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, এই জন্যই ভগবৎ গীতায় ভগবান্‌কে অর্জ্জুন কহিয়াছেন, মন সততই প্রমাথী। আতস প্রস্তর সূর্য্যকিরণে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, ঐ পাথরের গুণে সূর্য্যরশ্মিসমূহ একত্র হইয়া যায়—Concentrated in one focus এবং তখন ঐ একত্রিত রশ্মির এমন ক্ষমতা জন্মে যে ঐ পাথরের কাছে কাগজ বা তুলা লইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। প্রমাথী মনের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বৃত্তিসমূহ যদি আমরা সাধন বলে চিত্তমধ্যে একত্র করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঐ একত্রিত মনোবৃত্তির কেন্দ্র মধ্যে এমন এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জন্মে, এমন এক অপূর্ব্ব Heavenly light ঐশী আলোক আসিয়া উপস্থিত হয় যে, মানুষ তখন মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে পৌঁছিয়া যায়। কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ "যোগ" নহে, ইহারা পারিভাষিক মাত্র, তবে ইহারা প্রধান সহায় বটে, কিন্তু প্রেমযোগ বা ভক্তিযোগই প্রকৃত "যোগ"।

ভক্তি থাকিলে আমি চণ্ডালেরও হই।
ভক্তি বিনা আমি ব্রাহ্মণেরও নই।

ইহা ভগবানের বাক্য। ধ্যান, ধারণা, তপ, জপ, পূজা, সাধনা, যোগ প্রভৃতি যাহাই বলুন, পরিণামে বিশুদ্ধা ভক্তি বা মাধুর্য্য রসের প্রেম আসিয়া যখন ভক্তাধিক ভক্ত সাধক ভক্তবৎসল ভগবানে তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন তিনি দেবতা হইয়া যান, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ এবং দুর্ব্বলকে মহাবীররূপে পরিণত করিতে পারেন। তখন তিনি অপৌরুষের সামর্থ্যশালী হন, কারণ তখন তিনি দেবতা। তিনি তখন অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারেন। তখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার সংসর্গ, তাঁহার সেবা এবং তাঁহার কৃপায় মানুষেরা ধন্য হয়। গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভজে ও ভগবানে তন্ময় হয়, সে ব্যক্তি ভগবচ্ছক্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই শক্তি ও এই গুণ প্রাপ্তির নাম দেবত্ব। মনুষ্য "সিদ্ধি" প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহার নব জীবন ও নবভাব হয়, সেই "সিদ্ধ" পুরুষ তখন আর মানুষ নহেন, মহাপুরুষ; তিনি তখন "মানুষ" নহেন, পরন্তু দেবতা। এই দেবশক্তিতে মহাপুরুষেরা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা দেখাইয়া বিশ্বমণ্ডলকে বিস্মিত ও বিমোহিত করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি

তাঁহার যোগদর্শন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ"; অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যায়। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই মানুষ যোগী হয় এবং জ্ঞানযোগের পরে প্রেমযোগী বা ভক্তিযোগী হইলেই মানুষ দেবতা হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যবশতঃ ভগবানের অযাচিত কৃপাতেও মানুষ দেবত্বে পৌঁছিতে পারে; সকল শাস্ত্রে ইহার বহুদৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

বন্ধুগণ! আমি এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা কহিতে আকাঙ্খা করি। চক্ষু দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয়, কর্ণ দ্বারা যাহা শ্রুত বা হস্ত দ্বারা যাহা স্পৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির যাহা গ্রাহ্য তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত; প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে ভিন্ন। আজি কালিকার দিনে শাস্ত্রপ্রমাণ অনেকে মান্য করে না, আবার যুক্তিকেও যে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া থাকে বা মানিয়া চলে তাহাও নহে, কারণ একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্য বলে যদি ক কে খ বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডিত্যশালী আর এক ব্যক্তি আরও অধিকতর প্রবলা যুক্তি দ্বারা খকে গ বলিয়া অথবা ককে ছ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারেন, সুতরাং যুক্তি বা তর্ক সকল সময়ে সকলের মনোমত হয় না; এই জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর," কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধেও যে ব্যক্তি সন্দিহান থাকে, তাহার সঙ্গে কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন না করাই ভাল। চক্ষু থাকিতে যদি কেহ বলে, "আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না," অথবা বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালায় উপবেশন করিয়াও যদি কেহ বলে, "আকাশে সূর্য্য নাই, পৃথিবীতে রৌদ্র বা আলোক নাই, আমি ইহাদের কিছুই দর্শন করিতেছি না," তাহা হইলে এমন লোককে শাস্ত্রমতে "অনধিকারী" বলিয়া পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ধার্ম্মিক পুরুষদিগের স্বহস্তে লিখিত পুস্তকে, সাধুচরিত্র ব্যক্তিদিগের সম্পাদিত সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রে, সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত পুরুষ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রে অথবা ঋষিকল্প মহাপুরুষদিগের মুখে আপনারা কি শতাধিক বার পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই যে "অমুক মানুষ দেবতুল্য হইয়া গিয়াছেন"? কেবল তাহাই নহে "অমুক মানুষ দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়া, অপৌরুষেয় সামর্থ্যশালী হইয়া অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন"? আমি বিবেচনা করি, আপনাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্বচক্ষে এবম্প্রকার দেবপুরুষ বা দেবী রমণীকে দর্শন এবং তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়া, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, পুণ্যময় দেবচরিত্র এবং তাঁহাদের জীবনে, কথোপকথনে, স্বভাব ও ব্যবহারে, গমন ও উপবেশনে, সংসর্গ ও সাধুতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে "দেবতা" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্ররাশি মধ্যে দেব-মানবের অথবা দেবী-রমণীর অত্যাশ্চর্য্য সামর্থ্য ও গুণের কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। সে সকল শাস্ত্রীয় কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে প্রত্যক্ষেরই কথা কহিতেছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণও রাশি রাশি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, আপনারাও বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণকে অকারণে প্রতারিত করিবার জন্য তিনি একটা জলন্ত

মিথ্যাকথার প্রচার করিতে পারেন, একথা আমার হৃদয় কখন বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত নয়। সেই মহাত্মার চরিত্রে এরূপ নীচতা অর্পণ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যখন সিমলা পাহাড়ে গমনপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করেন, তখন সিমলা শৈল হইতে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদ পত্রে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তখন ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ডবলিউ, সি, বোনার্জ্জি, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশমান্য পুরুষগণ ইণ্ডিয়ান মিররে লিখিতেন। কেশব বাবুর সুদীর্ঘ পত্রদ্বয়ের অতি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এখানে আমি এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্ন হিন্দু সাধুকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয়ও হইয়াছে। অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালী এবং নানাজাতীয় সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর এবং ধার্ম্মিক লোকের মুখে ইহাঁর অসাধারণ সামর্থ্যের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সে সকল শোনা কথার উল্লেখ না করিয়া আমি যাহা স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই এস্থলে বর্ণনা করিলাম। এদেশের একটা পাহাড়ী লোক বিগত বিংশতিবর্ষকাল হইতে এমন বধির ছিল যে, দুইটা যুদ্ধের বড় বড় তোপ এক সঙ্গে আওয়াজ করিলেও ইহার কাণে শব্দ যাইত না, দেবতুল্য এই সাধু ইহার কাণে একটা মাত্র ফুৎকার দিয়া ইহার বিংশতিবর্ষকালব্যাপী বধিরতাকে এরূপে তিরোহিত করিয়া দিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি এখন তোমার আমার ন্যায় শুনিতে পায়। এই দেবতা, অনেক হাজার ফিট উচ্চ একটা পর্ব্বতশিখর হইতে একদিন অপরাহ্ণে আমাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে, অকস্মাৎ লম্ফ দিয়া নীচে পতিত হইলেন। দেখা গেল ইহার অণুপ্রমাণও কষ্ট বোধ হয় নাই। ইনি পর্ব্বতের এক দিকে বসিয়া অপর দিক্ দেখিতে পান; আমার বিশ্বাস ইনি দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া দেবতা হইয়াছেন। ইহাঁর শুভ আশীর্ব্বাদে বহুসংখ্যক লোকের কল্যাণ হইয়াছে। ইনি মানুষ নহেন, দেবতা।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিংহল দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাগমন কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "দাক্ষিণাবর্ত্তের এক মহাবিখ্যাত সাধুকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিয়াছিলাম। ইনি দেহে, মনে, চরিত্রে ও অলৌকিক সামর্থ্যে দেবতা; ইনি যদি দেবতা না হ'ন, তাহা হইলে দেবতা আবার কি তাহা জানি না। ইনি বাস্তবিক ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের পূর্ণ অভিজ্ঞতায় দেবতা। যে কোন ভাষায় ইহাঁর সহিত কথা কহুন, ইনি মাতৃভাষার ন্যায় সেই ভাষার উত্তর দেন। ইহাঁর আশীর্ব্বাদে শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হয়, ইহাঁর অভিশাপে চিরতরুণ দ্রুমরাজিও শুষ্ক হইয়া যায়। আমি ইহাঁর কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে সম্পূর্ণ ভক্তিসহকারে ধন্যবাদ দিলাম। ইনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তবে রাজপুরুষদিগের অনুরোধে অতি সামান্য মাত্র ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে নিম্নদেশ আবৃত করিয়া রাখেন। শীত, গ্রীষ্ম, হিম, রৌদ্র এ সকল ইহাঁর আজ্ঞাবহ; ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় প্রখর রৌদ্রে সমস্ত দিন বসিয়া থাকেন; ভয়ানক শীতের সময় সমস্ত রাত্রি মাঠে যাপন করেন। ইনি অগ্নিতে বসেন, জলে ডুবিয়া সমস্ত দিন থাকিতে পারেন এবং বহুদূরস্থিত দেশের সংবাদ তারের খবরের ন্যায় আনিয়া

দেন। ইনি আমার ভূত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহার সমুদয় সত্য। তোমরা আমার যে সকল গোপন কথা জান না, ইনি তাহাও আমাকে কহিয়া দিয়াছেন।" ইত্যাদি।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সময়ে "সোমপ্রকাশ" সম্পাদন করিতেন, সেই সময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের উপরিস্থিত মানকর নামক সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ গ্রাম হইতে তথাকার সুশিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী এবং পরমধার্ম্মিক জমিদার শ্রীযুক্ত হিতলাল মিশ্র মহাশয় ঐ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিতেছেন ;—"আমি ব্রাহ্মণসন্তান ; সুতরাং শিকার আমার বৃত্তি বা ব্যবসায় নহে। বিশেষতঃ অকারণে পশুবধ করা আমি অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু কি করিব, মাননীয় কমিশনর সাহেব আমার বন্ধু ও উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার বনে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। শীঘ্র শীঘ্র বন মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব এই ভাবিয়া আমরা পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগে এক মহা তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবশালী বাঙ্গালী সাধুর নির্জ্জন ক্ষুদ্র আশ্রম দৃষ্ট হইল। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র এবং অনেকগুলা বড় বড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত সর্প, তন্মধ্যে একটা সর্প অজগরজাতীয়। শুনিয়াছিলাম, ইনি সর্প পুষিয়া থাকেন। বাঘ দেখিয়া কমিশনর সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বাঘ ; ঐ দেখ বাঘ!" আমি সাহেব বাহাদুরকে "ভয় নাই" বলিয়া কিছুক্ষণ পরে সঙ্গে লইয়া সাধুজীর সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ; সাহেবও সেলাম করিলেন। দুই চারি মিনিট পরে মহাপুরুষ বলিলেন, "সাহেব, তুমি ফিরিয়া যাও, শিকারস্থলে যাইও না, তোমার সহধর্ম্মিণী সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্তা হইয়াছেন ; তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জীবনের আশা কম।" কমিশনর সাহেব ইহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি গত কল্য কুঠি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমার স্ত্রী অত্যন্ত সুস্থ, তাঁহার এরূপ পীড়ার সম্ভবতা দেখি না।" আমি যখন ভারতবর্ষীয় সাধুগণের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা সাহেবকে বুঝাইতেছিলাম, সাধু তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওহে সাহেব! যে ভদ্রলোকের বাটী হইতে তুমি আসিয়াছ অর্থাৎ যে ভদ্র লোক এই মুহূর্ত্তে তোমার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহার ঘরে তোমার নামে পীড়ার সংবাদ সংযুক্ত টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আমি সাহেবকে অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। যখন আমরা কিয়দ্দূর চলিয়া আসিয়াছি, তখন ব্যাঘ্রদ্বয় বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, আমরা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলে দেখিলাম, সাধুমহোদয় কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া অঙ্গুলিসঞ্চালনপূর্ব্বক আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমরা পুনরায় কুটীরে আগমন করায় সাধু কহিলেন, সাহেবের বিবি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই কথা শুনিয়া কমিশনর সাহেব বাহাদুর তাঁহার নোট বুকে পেন্সিলের দ্বারা ঐ সময়টা উল্লেখ করিয়া বিবরণটা লিখিয়া রাখিলেন এবং ইতঃপূর্ব্বে ঘড়িও দেখিয়াছিলেন। আমরা মানকরে পৌঁছিবামাত্র আমার দেওয়ানজী বলিল, সাহেবের নামে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, টেলিগ্রাফ দ্বারাই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পীড়ার সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর সংবাদ ছিল না। সাহেব বাহাদুর

রেলগাড়ীতে চড়িয়া বর্দ্ধমান রওয়ানা হইলেন, তথায় গিয়া অবগত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধুর কথিত মুহূর্ত্তে ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমি পুনরায় সাধুর নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে আমার জীবনের এমন অনেক গুপ্ত কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, যাহা আমার সহধর্ম্মিণীও অবগতা ছিলেন না। এই সাধু জিতনিদ্র ; দিবা কিংবা রাত্রে তিনি নিদ্রিত হন না। সপ্তাহের মধ্যে শনিবার ভিন্ন তিনি অপর কোন দিনে জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না. সম্পূর্ণ নিরাহার থাকেন। একদিন ঠিক একই সময়ে বর্দ্ধমান নগরে, মানকর গ্রামে এবং ইহাঁর কুটীরে ইনি দৃষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ সে দিবস কুটীরের বাহিরেও আসেন নাই। আমি স্বচক্ষে দিনের বেলায় মধ্যাহ্নকালে ইহাঁকে রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াছি। পাঠকগণের অবিশ্বাস হইতে পারে ভাবিয়া তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিলাম না। ইত্যাদি ইত্যাদি। সভ্যমহোদয়গণ! এইরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার এখন প্রয়োজন নাই। আপনাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয় অবগত আছেন, আমার জীবনে বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া আমি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বহুল দেশ প্রদেশ, এমন কি দূরবর্ত্তী বিদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তর, সমুদ্রতট, নদীতট, নির্জ্জন স্থান, লোকালয়, নগর, গ্রাম, মন্দির, মসিদ, তপোবন প্রভৃতি বহু স্থানে আমি অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন—অপৌরুষেয় সামর্থ্যশালী—মহাপুরুষগণকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে অনেকে হয়ত আমায় উপন্যাসকে স্মরণ করিয়া ফেলিবেন। অনেক সময়ে আমি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবম্প্রকার দেবতাদিগের বিবরণ বিশিষ্ট প্রমাণ সহ প্রকাশ করিয়াছি। আমার প্রবন্ধাবলী গ্রন্থের ১ম, ২য় ও তৃতীয় খণ্ডেও এই প্রকার অনেক সাধুর বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সমাচার পত্রে আরও কয়েকটি সাধুর বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। অমৃতবাজারের সুপ্রসিদ্ধ শিশির বাবুর সম্পাদিত Hindu Spiritual magazine নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকপত্রে ভারতবর্ষীয় তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধুগণের বিবরণও লিখিতেছি ; ইহাতে ইহা প্রতিপাদন করিতেছি যে, মানুষ বাস্তবিক দেবতা হইতে পারেন, ভগবান্ দয়া করিয়া মানুষকে সেই উপায় দিয়া রাখিয়াছেন। মানুষেরা নিজের দোষে সেই অমূল্য হীরককে বুঝিতে না পারিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কপর্দ্দকমূল্যের সামান্য কাচের আদর করিয়া থাকে।

মহানুভব সভাপতি ও মহানুভব সভ্য বৃন্দ! হিন্দুদীদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, এক সাধ্বী অথবা সন্ন্যাসিনী এক সময়ে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে মৃত এক রাজার আত্মাকে আনাইয়া তাঁহার জীবিত পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতে বলিয়াছিলেন। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে লেখা আছে, ঐ রাজার আত্মা আসিয়া কথা কহিয়াছিল। এই হিন্দী সন্ন্যাসিনীর সামর্থ্য কি দেবশক্তি নহে? বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে, ইনক নামক তাপসবর সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিশুখৃষ্টের অন্তর্দ্ধান, সেন্ট্পলের আকাশে প্রবেশ, এবং ঋষিগণের অপৌরুষেয় সামর্থ্য কি দেবশক্তি নহে? ধ্রুবের সশরীরে স্বর্গ গমন কি দেবশক্তি নহে? সকল দেশের শাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে অসংখ্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা কি দেবত্ব নহে? ইহাই তো

দেবত্ব। এখন দেখুন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে কি প্রকার অলৌকিক সামর্থ্য দেন, কিন্তু মায়ামুগ্ধ মানুষ কি এই সামর্থ্যরত্ন অর্জ্জনে প্রকৃতপক্ষে আয়াস স্বীকার করে? তাহা যদি করিত, তাহা হইলে সংসার এতদিন স্বর্গভূমি হইয়া যাইত। আমগাছে যতগুলি মুকুল হয়, ততগুলি আম হয় না সত্য, কিন্তু তবুও যতগুলিকে রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা না করি কেন? ভগবান্ দয়া করিয়া যে উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা হেলায় হারাই কেন? এক সময়ে পুণ্যভূমি ভারত এই দেবশক্তিতে অতুল ছিল বলিয়া ভারতের এত মাহাত্ম্য, এত শ্রেষ্ঠত্ব, এত গরিমা ও এত মহিমা।

মহানুভব সভাপতি এবং মহানুভব সভ্য বৃন্দ! আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতের অধঃপতনের একমাত্র মূলীভূত কারণ—ধর্ম্মহীনতা। আমার সমস্ত জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রমণ, চিন্তা, পাঠ, সাধুসঙ্গ, আলোচনা ও বিচারে যদি আমি কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা এই—ধর্ম্ম বিনা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি হইতে পারে না, হইতে পারে না, হইতে পারে না। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া যাহা কিছু করা যাইবে, তাহা কখন সুসিদ্ধ হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য! ধর্ম্ম ভিন্ন দেশের, জাতির ও সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। আমরা ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধঃপতিত হইয়াছি, সুতরাং আবার সেই ধর্ম্মকেই ধরিয়া—দেবভাবকে ধরিয়া—পুনরুত্থিত হইতে হইবে। কবি বলেন—

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হ'লে কে কোথায় মরে॥

আমরা ধর্ম্ম ছাড়িয়াছি বলিয়া অধঃপতিত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং ধর্ম্মকেই আবার ধরিয়া উঠিতে হইবে। যে অসাধারণ তপঃপ্রভাবে একদা ভারতের আর্য্যজাতি জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আর কোথায়? হায়! একসময়ে ভারতের হিন্দুজাতির গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, দেবতা ও দেবী বিরাজ করিতেন। এই হিন্দুজাতি জ্ঞান, ধন, মান, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য, চরিত্র, স্বাধীনতা, প্রভুত্ব প্রভৃতি বরণীয় গুণে মানবসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিলেন, কেবল ভগবৎপরায়ণতা বিহনে, তামসিক প্রবৃত্তির অনুসরণে, ভগবান্‌কে ভুলিয়া হেয় হইতে হেয়তর হইয়া গিয়াছে। ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয়ে সুন্দর সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে যখন সরোজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিকীর্ণপূর্ব্বক দিক্‌দিগন্ত মাতোয়ারা করিয়া দেয়, তখন যেমন অলিরাজ কিংবা ভৃঙ্গদল অনিমন্ত্রিত হইলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মধুপান জন্য আগমন করে, সেইরূপ মানবের হৃদয়-সরোবরে ভক্তিকুসুম পূর্ণভাবে প্রস্ফুট হইলেই লক্ষ্মীশ্রী, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সামর্থ্য প্রভৃতি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ ভগবদ্ভক্তি হইলেই ভগবান্ প্রসন্ন হন এবং যেখানে ভগবানের স্থিতি বা দয়া সেইখানেই মানুষগণ সর্ব্বপ্রকার গুণে ও সামর্থ্যে পরিপূর্ণ হয়।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীবিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥

আসুন আমরা ভক্তিডোরে ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে বাঁধি এবং আবার তাঁহারই ধ্যানে, তাঁহারই সত্তায় এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদ ও কৃপায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি। এবম্প্রকার ভক্তি, এবম্প্রকার ঈশ্বরপরায়ণতা ও এবম্প্রকার ধর্ম্মানুশীলন ভিন্ন বঙ্গের—ভারতের—পৃথিবীর ব্যক্তিগত বা জাতিগত কল্যাণ নাই, ইহা নিশ্চয় ও সত্য; ইহা ধ্রুব সত্য, ধ্রুব সত্য, ধ্রুব সত্য।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কবির ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

২০। মহেশ কাণা।

কবিওয়ালাদের মধ্যে মহেশ নামধেয় দুইজন কবিওয়ালা ছিলেন। একজন জাতিতে কায়স্থ—উপাধি ঘোষ। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, তজ্জন্য মহেশ কাণা নামে সাধারণ্যে পরিচিত হন। অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাধি চক্রবর্ত্তী ছিল। তিনি সাধারণতঃ মহেশ ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। প্রথমতঃ মহেশ কাণা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা-মাহাত্ম্যে কত অপরূপ ঘটনা যে সংঘটিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার কৃপা হইলে মূক ব্যক্তিও অত্যাশ্চর্য্য বাক্‌জাল বিস্তার করিতে পারে, পঙ্গু অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণে সক্ষম হয়। মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুতর জন্মান্ধ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, এবং স্বীয় অপরাজিত কবিত্ব-প্রভায় জগদ্বাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপের জগদ্বিখ্যাত মহাকবি মিল্টনের নাম শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি অন্ধ হইয়াও কি অপূর্ব্ব কবিত্ব-প্রভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কসেট অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পলিটিক্যাল ইকনমী আজিও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অন্ধ প্লোস্ফট ঐতিহাসিকাগ্রণ্যরূপে আজিও শিক্ষিতসমাজের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপ বহুতর নামোল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে, জন্মান্ধ হইয়াও লোকে নানারূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মহেশ কাণা জন্মান্ধ হইয়াও বিস্তর কবি-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কারণ কি?

অনুমান ১২১০ সালে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশত মহকুমার অধীন ও তন্নিকটবর্ত্তী মহেশপুর নামক গ্রামে কবিওয়ালা মহেশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। বলিয়াছি ত তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। অপিচ তাঁহার পিতার অবস্থাও তাদৃশ সচ্ছল ছিল না যে, অন্ধ পুত্রকে গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দান করিতে পারেন। মহেশের পিতা সামান্য অবস্থার একজন গৃহস্থ,—যৎসামান্য জোত জমার আয় ও চাকুরী বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই সময়ে মহেশপুরে এক ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের সংস্কৃত টোল ছিল। তাহাতে অনেকগুলি ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। মহেশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রত্যহ এই টোলে যাইয়া ছাত্রগণের বিদ্যাধ্যয়ন শ্রবণ করিতেন। এই ভাবে তাহাদের মুখ-নিঃসৃত উচ্চ আবৃত্তি শ্রবণ করিতে করিতে- মহেশ কাণা অচিরকাল মধ্যে অমরকোষ ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ এবং রামায়ণ, মহাভারত এবং কতিপয় পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। প্রায়ই দেখা যায়, ভগবানের কৃপায় বিকলাঙ্গগণ এইরূপ কোন না কোন একটী বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। মহেশ কাণা তদ্রূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেশ কাণা যে ভাবে টোলের

ছাত্রগণের আবৃত্তি শ্রবণ করিতে করিতে পুরাণাদি ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর, তথাপি তাহা অসত্য নহে। বঙ্গীয় প্রাচীন কবিকুলের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ণজ্ঞানবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যরাজি প্রকৃত শিক্ষিতের আদরের বস্তু, তাঁহারা নিতান্ত অশিক্ষিত হইয়াও মুখে মুখে অতি সুন্দর সংগীত রচনা করিতে পারিতেন।

এই ভাবে মহেশ কাণার ব্যাকরণ ও পুরাণাদি আয়ত্ব করার সংবাদ প্রকাশ হইলে, টোলের অধ্যাপক ও গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহায্যে মহেশ কাণা নানা পুরাণ ও শাস্ত্রাদির অর্থ অবগত হন।

এই সময় হইতেই তাঁহার কল্পনাশক্তির উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়। টোলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার সময় হইতেই তিনি নানাবিধ সংগীত রচনা করিয়া গ্রামবাসিগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার যশঃসৌরভ কবিওয়ালা-সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানা স্থান হইতে কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারগণ তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহেশের অমানিশার অবসান হইল;—কলিকাতার ভদ্র ও ধনাঢ্য সমাজে তিনি পরিচিত হইলেন।

তৎকালে কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অনেকেই সংগীতানুরাগী ছিলেন। অনেকের ভবনেই বহুতর সংগীততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। বঙ্গীয় সংগীত ও কাব্যশাস্ত্রের এরূপ অতুলনীয় গৌরবের মূল কারণই—বঙ্গীয় জমীদারবৃন্দ। তাঁহাদের আশ্রয়-মূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছিল বলিয়াই আজ আমরা প্রাচীন কবিকুলের অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্ব সুধার রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি। অনেকানেক মহানুভবের মধ্যে ছাতু বাবু ও লাটু বাবুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাঁহাদের সহিতই মহেশ কাণার সংস্রব ছিল। লাটু বাবু ও ছাতু বাবু স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের পুত্র। ইহাঁদের আসল নাম,—আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব। আশুবাবু ওরফে ছাতু বাবু জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন গণ্য মান্য 'সমজদার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শুনা যায়, ১০৮ জন ওস্তাদ, কবিওয়ালা ও পাঁচালীকার তাঁহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। তন্মধ্যে বিখ্যাত কবিওয়ালা ছাতু রায়, মহেশ কাণা, দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ কালোয়াৎ আনাইয়া সংগীত চর্চ্চা করিতেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল।

ছাতু বাবু সবিশেষ গুণজ্ঞ এবং স্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজেও অনেকগুলি সংগীত রচনা করিয়াছেন। কতিপয় সংগীত এমনি করুণরসাত্মক ও মর্ম্মস্পর্শী যে শুনিতে শুনিতে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে;—

তার কথা কার কাছে কই?
এমন দুঃখের দুঃখী মিলে কই?
প্রকাশিলে পরে, পাছে শুনে পরে,
সদা ভাবি অই। ইত্যাদি

গান বড়ই মর্ম্মভেদী।

যাহা হোক্ মহেশ কাণা কলিকাতায় আসিয়া ছাতু বাবুরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কোনও দলে মাসিক বেতনে বাঁধনদারের কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। অধিকাংশ

সময় আশ্রয়দাতার আলয়েই অবস্থান করিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারকে সংগীত যোগাইতেন। ছাতু বাবু কবিকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি সময় সময় বিভিন্ন কবিওয়ালার সহিত মহেশের লড়াই বাধাইয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবসহ তাঁহার কবিত্ব-সুধাপানে তন্ময় হইতেন।

রাম বসুর প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত সংগীতটী রাম বসুর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,—

বালিকা ছিলাম, ভাল ছিলাম তো
ছিল না সুখ-অভিলাষ।
পতি চিনিতাম না, সে রস জানিতাম না
হৃদ্-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ॥ ইত্যাদি

এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, ইহা রাম বসুর রচিত নহে, ইহা কবি মহেশ কাণার খেউড়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার শেষাংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ৩য় বর্ষের 'সমীরণ' পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ৺ রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় এই সংগীতটী মহেশ কাণার রচিত বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু 'বঙ্গবাসীর' প্রকাশিত পুরাতন 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া অপর একজন লেখক রাম বসুর রচিত বলিয়া প্রচার করেন। উভয় লেখকই প্রবন্ধে কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন নাই। এই দুই প্রকার বিভিন্ন মত হইতে আমি শেষোক্ত মতটীই তৎকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু 'নব্যভারতে' আমার প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, রমেশ বাবু আমায় একখানি পত্রে লেখেন,—"আমি মদীয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ ঐ গানটী মহেশ কাণার বলিয়া অবগত হই। এ কারণ প্রবন্ধে কোন রূপ যুক্তির অবতারণা করি নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব, কবি মহেশ কাণার সমবয়স্ক না হউন, সমসাময়িক এবং আমাদের গ্রামের অতি নিকট গ্রামে কবির বাড়ী। মহেশ কাণার সহিত প্রাতঃস্মরণীয় রামদুলাল সরকারের পুত্র ছাতু বাবুর সৌহৃদ্য ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার বাড়ীতে মহেশ কাণার যাতায়াত ছিল। পিতৃদেবের পিতৃস্বসা-পুত্র (পিস্‌তুতো ভাই) উক্ত বাবুর দেওয়ান ছিলেন, একারণ তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। সম্ভবতঃ, পিতৃদেব কবির মুখে ঐ গান শুনিয়া থাকিবেন এবং তজ্জন্য ঐ গান হয়ত তাঁহারই রচিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। 'গুপ্ত-রত্নোদ্ধার' গ্রন্থে উক্ত গানটী রাম বসুর রচিত বলিয়া এবং 'কবি-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে মহেশ কাণার রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দুই গ্রন্থের দুই প্রকার মত দেখিয়া, এক্ষণে রমেশ বাবুর উক্তি মানিয়া লইতে আমি ইচ্ছুক। পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে কেহ অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানাইলে উপকৃত হইব। রমেশ বাবু শেষে লিখিয়াছেন,—"পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া যে এখনও আমি ঐ গানটী মহেশ কাণার বলিয়া বুঝিব, এমন কথা কখনই নয়। কেননা আপনারা যাহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা কেবল পিতৃভক্তির নজীরে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রমেশ বাবুর এ বিষয়ে কিছুমাত্র গোঁড়ামি নাই। প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে এবং তাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত না টিকিলেও তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন না। সত্য প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বড়ই দুঃখের বিষয়, মহেশ কাণার গান যাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা বেশী নহে। আবার যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সব সম্পূর্ণ নহে। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের সুলভ প্রচলন না থাকায়, এই সকল গান লোকের মুখে মুখেই থাকিয়া যাইত। এক্ষণে তৎসমুদয়ের চর্চ্চা না থাকায় এবং ঐ

সকল লোকের অভাব বশতঃ তাহা একরূপ চির-বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

মহেশের বাৎসল্য-রসে বিমণ্ডিত একটী গীতের কিয়দংশ শ্রবণ করুন ;—

পুত্র প্রসবিয়ে যশোদার চিত্ত অলস, অবশ,
তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, তথ্য না জানেন নিষ্যস।
কোন সখি প্রভাত সময়—
বলে, উঠ মা নন্দরাণী, পোহায়েছে রজনী
কোলে তোমার কাল চাঁদের উদয়।
হর পূজি বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে,
সে ছেলে এখন উচ্চস্বরে করিছে রোদন।
নন্দরাণী এ আনন্দে, কেন হ'লে অচেতন,
একবার কর শুভ দরশন॥

যেটুক্ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই পাঠক কবির গুণপণা দেখিতে পাইবেন।

মহেশ কাণার খেউড় গান গুলির অধিকাংশই অতিরিক্ত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাঁহার যে কয়টী খেউড় পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা সাধু সমাজের মনঃপুত হইবে না বোধে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

গুণিসমাজে মহেশ কাণার কিরূপ আদর ছিল, তাহার একটী উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। রমেশ বাবু লিখিয়াছিলেন,—"কোন সময় ছাতু বাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহের সহিত সংগীত-সংগ্রাম (কবি) হইতেছিল। সেই আসরে এক পক্ষে মহেশচন্দ্র বাঁধনদার ছিলেন। সংগীত-সংগ্রামের সুসময় উপস্থিত হইলে, মহেশচন্দ্রের অনুপস্থিতি জানিতে পারিয়া ছাতু বাবু তাঁহাকে আনাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহাতেও কবি মহেশচন্দ্র আসিতেছেন না কেন, জানিবার জন্য ছাতু বাবু স্বয়ং স্বদলবলে মহেশচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মহেশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—'যাইব কি করিয়া বাবু! পেটের পীড়ার জন্য সদাই অস্থির! অন্যত্র শৌচ করিতে বড় অসুবিধা বোধ করি, এ কারণ—।' তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ছাতু বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তার জন্য ভাবনা কি, ঘোষজা? আসরে যদি পেটের পীড়া উপস্থিত হয়, আমি তখন স্বয়ং চাদর পাতিয়া ধরিব।' পূর্ব্বে রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গুণী বা ওস্তাদদিগের এমনি আদর ছিল।"

মহেশ কাণা, মধুসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালার সম-সাময়িক ছিলেন। অনুমান ১২৬৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার অমর-আত্মা অমর ধামে প্রস্থান করে।*

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* মহেশ কাণার জীবনী সকলন ব্যপদেশে আমি সুবিখ্যাত লেখক অধুনা পরলোকগত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সবিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবি-সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।—লেখক।

কলম্বো দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

দেশী পল্লীর প্রশস্ত পথের দুই দিক্ বিপণি-শ্রেণীতে শোভিত। উহাতে নয়নাকর্ষক বিবিধ দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। বিপণিশ্রেণীর সম্মুখে বারাণ্ডা থাকায়, তাহা ক্রেতৃগণের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইয়াছে। মিউনিসিপাল বাজার একটী উত্তম অট্টালিকায় স্থাপিত। মিউনিসিপাল কর্য্যালয়টী, বাজারটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বাজারে ফল এবং তরকারী যথেষ্ট দেখিলাম। কয়েকটী নূতন ফল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। রুটীফল (Bread fruit) দেখিতে কাঁঠালের ন্যায়, কিন্তু তাহার আস্বাদন বিভিন্ন। কুকারী বোধ হয় কাঁকড়ীর অপভ্রংশ। দেখিতে খরমুজার মত, কিন্তু শসার ন্যায় তাহার আস্বাদন। নগরে জল দিবার ব্যবস্থা উত্তম এবং রজনীতে উহা গ্যাসের আলোকে আলোকিত।

সিংহলের দুইটী বৃক্ষ বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। একটীর নাম পালমায়রাতাল (Palmyra-palm) এবং অপরটী নারিকেল। উক্ত তাল বৃক্ষ হইতে সিংহলবাসীদের সকল অভাব দূর হয়। উহার ফল সুখাদ্য এবং তাহা হইতে তৈল নির্গত হয়। বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে চিনি এবং সুরা প্রস্তুত হয়। তাহার ডাল খুঁটীরূপে ব্যবহৃত হয়, বৃক্ষের পাতা অনেক কাজে আসে। তাহা দ্বারা কুটীরের ছাদ ও দেওয়াল প্রস্তুত হয়। ঝুড়ি এবং চেটাই, পাখা এবং মস্তকের পরিচ্ছদও তাহা হইতে প্রস্তুত করা যায়। এতদ্ভিন্ন উক্ত পাতা হইতে কাগজ হয় এবং বৌদ্ধদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল উহাতে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণও এই বৃক্ষটী পবিত্র জ্ঞান করে। তাহারা ইহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া অভিহিত করে। নারিকেল গাছও গৃহস্থের পক্ষে সামান্য উপকারী নহে। দক্ষিণ সিংহলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা এ অঞ্চলে পাঁচ প্রকারের। তন্মধ্যে লাল নারিকেল (Pink cocoanut) বিশেষরূপ বিখ্যাত। উহা রাজ-নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। দেবালয়ের নিকট এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে রোপিত হয়। ফলের ভিতর প্রচুর জল থাকে। উহা এত স্বাদু যে, পুরোহিতগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা পান করিতে দিয়া থাকেন। নারিকেল বৃক্ষ এবং নারিকেল ফলও উল্লিখিত তাল বৃক্ষের ন্যায় নানা প্রকারে মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হয়। আমাদের দেশের লোক বোধ হয় অবগত নহেন যে, উহার কুঁড়ি হইতে চিনি এবং প্রস্ফুটিত ফুলের নির্য্যাস হইতে তাড়ী (মাদক দ্রব্য) প্রস্তুত হয়। সিংহলবাসীরা তাহা প্রস্তুত করে।

সিংহল দ্বীপ দীর্ঘিকা ও জলাশয়ের জন্য বিখ্যাত। ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য রাজগণ উহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কার অভাবে তাহা ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এই সকল জলাশয়ের মধ্যে, অবারাজপুরা এবং দাম্বল নামক দুইটী স্থানের মধ্যস্থিত জলাশয়টী, যাহা কালাবেড়া নামে বিখ্যাত, সিংহলের আদিমনিবাসীদের দ্বারা খনন করান হইয়াছিল। উহার পরিধি বিংশতি ক্রোশ। সিংহল, কৃষিকার্য্যবহুল দ্বীপ। এই সকল জলাশয় হইতে পয়ঃপ্রণালী যোগে, ক্ষেত্র সকল জলসিঞ্চিত হওয়াতে, কৃষকগণকে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতে হয় না।

সকল লোকের অভাব বশতঃ তাহা একরূপ চির-বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

মহেশের বাৎসল্য-রসে বিমণ্ডিত একটী গীতের কিয়দংশ শ্রবণ করুন ;—

পুত্র প্রসবিয়ে যশোদার চিত্ত অলস, অবশ,
তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া, তথ্য না জানেন
নিষ্যস।
কোন সখি প্রভাত সময়—
বলে, উঠ মা নন্দরাণী, পোহায়েছে রজনী
কোলে তোমার কাল চাঁদের উদয়।
হর পূজি বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে,
সে ছেলে এখন উচ্চস্বরে করিছে রোদন।
নন্দরাণী এ আনন্দে, কেন হ'লে অচেতন,
একবার কর শুভ দরশন॥

যেটুক্ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই পাঠক কবির গুণপণা দেখিতে পাইবেন।

মহেশ কাণার খেউড় গান গুলির অধিকাংশই অতিরিক্ত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাঁহার যে কয়টী খেউড় পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা সাধু সমাজের মনঃপুত হইবে না বোধে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।

গুণিসমাজে মহেশ কাণার কিরূপ আদর ছিল, তাহার একটী উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। রমেশ বাবু লিখিয়াছিলেন,—"কোন সময় ছাতু বাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহের সহিত সংগীত-সংগ্রাম (কবি) হইতেছিল। সেই আসরে এক পক্ষে মহেশচন্দ্র বাঁধনদার ছিলেন। সংগীত-সংগ্রামের সুসময় উপস্থিত হইলে, মহেশচন্দ্রের অনুপস্থিতি জানিতে পারিয়া ছাতু বাবু তাঁহাকে আনাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহাতেও কবি মহেশচন্দ্র আসিতেছেন না কেন, জানিবার জন্য ছাতু বাবু স্বয়ং স্বদলবলে মহেশচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মহেশচন্দ্র উত্তর করিলেন,—'যাইব কি করিয়া বাবু! পেটের পীড়ার জন্য সদাই অস্থির! অন্যত্র শৌচ করিতে বড় অসুবিধা বোধ করি, এ কারণ—।' তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ছাতু বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তার জন্য ভাবনা কি, ঘোষজা? আসরে যদি পেটের পীড়া উপস্থিত হয়, আমি তখন স্বয়ং চাদর পাতিয়া ধরিব।' পূর্ব্বে রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গুণী বা ওস্তাদদিগের এমনি আদর ছিল।"

মহেশ কাণা, মধুসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালার সম-সাময়িক ছিলেন। অনুমান ১২৬৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার অমর-আত্মা অমর ধামে প্রস্থান করে।*

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* মহেশ কাণার জীবনী সঙ্কলন ব্যপদেশে আমি সুবিখ্যাত লেখক অধুনা পরলোকগত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সবিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবি-সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।—লেখক।

কলম্বো দর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

দেশী পল্লীর প্রশস্ত পথের দুই দিক্ বিপণি-শ্রেণীতে শোভিত। উহাতে নয়নাকর্ষক বিবিধ দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। বিপণিশ্রেণীর সম্মুখে বারাণ্ডা থাকায়, তাহা ক্রেতৃগণের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইয়াছে। মিউনিসিপাল বাজার একটী উত্তম অট্টালিকায় স্থাপিত। মিউনিসিপাল কর্য্যালয়টী, বাজারটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বাজারে ফল এবং তরকারী যথেষ্ট দেখিলাম। কয়েকটী নূতন ফল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। রুটীফল (Bread fruit) দেখিতে কাঁঠালের ন্যায়, কিন্তু তাহার আস্বাদন বিভিন্ন। কুকারী বোধ হয় কাঁকড়ীর অপভ্রংশ। দেখিতে খরমুজার মত, কিন্তু শসার ন্যায় তাহার আস্বাদন। নগরে জল দিবার ব্যবস্থা উত্তম এবং রজনীতে উহা গ্যাসের আলোকে আলোকিত।

সিংহলের দুইটী বৃক্ষ বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। একটীর নাম পালমায়রাতাল (Palmyra-palm) এবং অপরটী নারিকেল। উক্ত তাল বৃক্ষ হইতে সিংহলবাসীদের সকল অভাব দূর হয়। উহার ফল সুখাদ্য এবং তাহা হইতে তৈল নির্গত হয়। বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে চিনি এবং সুরা প্রস্তুত হয়। তাহার ডাল খুঁটীরূপে ব্যবহৃত হয়, বৃক্ষের পাতা অনেক কাজে আসে। তাহা দ্বারা কুটীরের ছাদ ও দেওয়াল প্রস্তুত হয়। ঝুড়ি এবং চেটাই, পাখা এবং মস্তকের পরিচ্ছদও তাহা হইতে প্রস্তুত করা যায়। এতদ্ভিন্ন উক্ত পাতা হইতে কাগজ হয় এবং বৌদ্ধদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল উহাতে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণও এই বৃক্ষটী পবিত্র জ্ঞান করে। তাহারা ইহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া অভিহিত করে। নারিকেল গাছও গৃহস্থের পক্ষে সামান্য উপকারী নহে। দক্ষিণ সিংহলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা এ অঞ্চলে পাঁচ প্রকারের। তন্মধ্যে লাল নারিকেল (Pink cocoanut) বিশেষরূপ বিখ্যাত। উহা রাজ-নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। দেবালয়ের নিকট এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে রোপিত হয়। ফলের ভিতর প্রচুর জল থাকে। উহা এত স্বাদু যে, পুরোহিতগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা পান করিতে দিয়া থাকেন। নারিকেল বৃক্ষ এবং নারিকেল ফলও উল্লিখিত তাল বৃক্ষের ন্যায় নানা প্রকারে মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হয়। আমাদের দেশের লোক বোধ হয় অবগত নহেন যে, উহার কুঁড়ি হইতে চিনি এবং প্রস্ফুটিত ফুলের নির্য্যাস হইতে তাড়ী (মাদক দ্রব্য) প্রস্তুত হয়। সিংহলবাসীরা তাহা প্রস্তুত করে।

সিংহল দ্বীপ দীর্ঘিকা ও জলাশয়ের জন্য বিখ্যাত। ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য রাজগণ উহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কার অভাবে তাহা ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এই সকল জলাশয়ের মধ্যে, অবারাজপুরা এবং দাম্বল নামক দুইটী স্থানের মধ্যস্থিত জলাশয়টী, যাহা কালাবেড়া নামে বিখ্যাত, সিংহলের আদিমনিবাসীদের দ্বারা খনন করান হইয়াছিল। উহার পরিধি বিংশতি ক্রোশ। সিংহল, কৃষিকার্য্যবহুল দ্বীপ। এই সকল জলাশয় হইতে পয়ঃপ্রণালী যোগে, ক্ষেত্র সকল জলসিঞ্চিত হওয়াতে, কৃষকগণকে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতে হয় না।

পাহাড়গুলি এবং বনের নিকটস্থ স্থান সকল ব্যতীত, সিংহল দ্বীপ স্বাস্থ্যকর। ইহাতে ঝটিকাদির প্রবলতা নাই। দ্বীপটী নাতি-শীত নাতি-গ্রীষ্ম।

সিংহলদ্বীপবাসীদের পরিচ্ছদ ও খাদ্য সামান্য প্রকারের। দু টুক্‌রা বস্ত্রের দ্বারা তাহারা তাহাদের দেহ আচ্ছাদন করে। এক টুকরা দ্বারা, কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত হয় এবং আর টুক্‌রা দ্বারা কোমর হইতে গলা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। তবে, সভ্য জাতিদের অনুকরণে এখন তাহারা অঙ্গরাখা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই এক প্রকার পরিচ্ছদ। উভয়েই মস্তকে লম্বা চুল রাখে। পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কেশ সংস্কার করে এবং মস্তকের সম্মুখে, কচ্ছপের ত্বক্‌নির্ম্মিত একটী গোলাকৃতি বৃহৎ চিরুণী সংস্থাপিত করে। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার দ্বারা তাহাদের মস্তকের শোভা সম্পাদন করে। তণ্ডুল তাহাদের প্রধান খাদ্য। উহা রন্ধন করিয়া তাহারা পিষ্টকে পরিণত করে। এই সকল পিষ্টক বাজারে বিক্রীত হয়। নারিকেলের শাঁসও তাহারা যথেষ্ট ব্যবহার করে। তাহারা মৃত্তিকায় প্রস্তুত রন্ধন পাত্র ব্যবহার করে, এবং কদলী পত্রে তাহারা ভোজন করে।

সিংহলে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা রহিত হইয়াছে। সিংহলবাসীদের শিক্ষার জন্য, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং কি পুরুষ কি স্ত্রী ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্দ ফল এখানে দেখা দিয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, কোন সিংহল দেশীয় সংবাদপত্রে তৎসম্বন্ধে এবপ্রকার লিখিত হইয়াছিল :—বর্ত্তমান সময়ে যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে ইংরাজী প্রভৃতি শিখানো হইতেছে। উহার প্রভাবে তাহাদের চাল চলন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা দালানে রক্ষিতা প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছে। তাহারা গৃহকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, রাজকন্যার মত সজ্জিতা হইয়া তাহাদের প্রমোদ-গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রন্ধন করিতে জানে না এবং রন্ধনকার্য্যকে হেয় বিবেচনা করে। তাহারা অঙ্গরাখা প্রভৃতি স্বয়ং সাধন না করিয়া, কারিকর দ্বারা, অধিক অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া লয়। এই সকল কার্য্য সিংহলবাসীদিগকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে।

রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কাই কি সিংহল দ্বীপ, মধ্যে মধ্যে একথার আলোচনা হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রস্তাব শেষ করিব। কলম্বো হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে একটী স্থান আছে, তাহার নাম নিকুম্ভিলা। রামায়ণে বর্ণিত আছে, এখানে ইন্দ্রজিৎ একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাবণের অশোক বন, যেখানে সীতাদেবী অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এখনও বিদ্যমান। জাফ্‌না নামক স্থানের একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সে বনে সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি একটী দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিতা আছে, তাঁহার নিয়মমত পূজা হইয়া থাকে। পোট ডি গালির (Poat-de-Galle) নিকট জল মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, ইহা রাবণকোটা নামে প্রসিদ্ধ। মহাবংশে, রামরাবণের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধ, সিংহলে রাবণের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, উল্লিখিত ছত্রে অবস্থিতি কালে, আমি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী সংক্রান্ত কয়েকটী তীর্থ-স্থান দেখিবার জন্য তাহারা সিংহল দ্বীপে আগমন করিয়াছে।

কোন অনিবার্য্য কারণে আমি কলম্বতে অধিক দিন থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বরে আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির (British Indian Steam Navigation Company'র) আমরা (Amra) নামক বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করিয়া, পরদিন প্রাতে তুতিকারন্ নামক স্থানে উপনীত হইলাম। বাষ্পীয়পোতে বিশ ঘণ্টা ছিলাম। অর্ণবতরীতে নিম্ন-শ্রেণীর পথিকদিগের যে কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সমগ্ররূপে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার কথা।

যে বিদ্যার সেবন করিয়া মানবমাত্রেরই এই মরজগতে অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে, যাহা অকিঞ্চনকেও পৃথিবীশ্বর হইতে সমধিক শৌর্য্য বীর্য্যে ভূষিত করে, যাহা দ্বারা ক্লৈব্যোপহত ব্যক্তির মনও শত সিংহের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে, যাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণ নির্ব্বাণ ও শান্তিলাভের একমাত্র অব্যভিচারী কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন; সেই অমল অমূল্য হিতপ্রসূনবর্ষিণী ব্রহ্মবিদ্যা কি একমাত্র গিরিকন্দরবাসী বীতরাগ যতিরই উপভোগ্য? ইহাতে কি প্রবৃত্তিপথের পথিক গৃহমেধীর অধিকার নাই, তাঁহাদিগকে কি কেবল সংসার-অটবীর শ্বাপদ জন্তুর ভীম গর্জ্জন শুনিয়া ও তদাক্রমণভীতি হৃদয়ে লইয়া অশান্তিতেই জীবন সংগ্রামের অবসান করিতে হইবে? তাঁহাদের জন্য কি বিধাতা একমাত্র ক্ষণ-বিধ্বংসী মিথুনজ সুখই নিয়মিত করিয়াছেন? ব্রহ্মবিদ্যার অনাময় অদুঃখসম্ভিন্ন নিত্য সুখে কি তাঁহারা আজীবন বঞ্চিত থাকিবেন? বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের ব্রহ্মবিদ্ মনীষীদিগের জীবনচরিত সংকলন করিলেই এই নৈরাশ্যপূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। উপনিষদে যেরূপ বীতরাগ চতুর্থাশ্রমী যাজ্ঞবল্ক্য ও উপরামের অন্তিম সীমায় উপনীতা সন্ন্যাসিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ মানুষিক ভোগ বিলাসের উন্নতি যেখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই রাজসিংহাসনের মুখ্য অধিকারী জনক প্রভৃতি ব্রহ্মদর্শী রাজন্যের পুণ্যময়ী আখ্যায়িকাও পড়িয়া থাকি। এমন কি তাঁহাদিগকে ঋষিবৃন্দ আপনাদের মহামান্য আচার্য্য পদে ব্রতী করিয়াছেন। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপ সন্ন্যাসীদিগের হৃদয়ে অজস্র শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ শত শত গৃহস্থকেও অভয় পাদ বরণ করিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের ধ্বনিতে যেমন নির্জ্জন অরণ্য পবিত্র ও প্রতিধ্বনিত হইত, তেমনই তাহা গৃহপ্রাঙ্গণে বা প্রাসাদ-কক্ষে শ্রোতৃবর্গকে স্বর্গীয় ভাবে বিভোর করিত। উপনিষদের ন্যায় মনু, স্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ উভয়কেই ব্রহ্মবিদ্যায় অলঙ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি

এই সকল গ্রন্থ ব্রহ্মদর্শী ক্ষত্রিয়কেই রাজপদে অভিষিক্ত হইতে আদেশ দিয়াছে।

এই ত গেল শাস্ত্রের কথা। যুক্তির অনুসরণ করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, সাম্যভাবে সুদীক্ষিত না হইলে, মানব কোন ক্রমেই নিরপেক্ষ হইয়া জন-সাধারণের হিত-সাধন-ব্রতকে স্বার্থামিষের প্রলোভন হইতে সুরক্ষিত রাখিতে পারেন না। সুনীতি ও সভ্যতার অভিমানে অনেকে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া চলুন না কেন; সমতা-মন্দাকিনীর অমল বারি আকণ্ঠ পান করিয়া নিষ্পাপ না হইলে কিছুতেই তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সাধারণের কার্য্য করিতে যাইয়া আপনার কার্য্য ভুলিতে সক্ষম হইবেন না। সাধারণ কার্য্য ও স্বকীয় কার্য্যের সাঙ্কর্য্য যে সুফল ফলিতে দেয় না, তাহার শত শত উদাহরণ লোক চক্ষুর সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছে। যদি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার নব নব স্রোতঃ সহস্রধারে বিভক্ত হইয়া বহিতে থাকে, অথবা উহা যথেচ্ছভোগের বিভিন্ন পুলিন শ্রেণীতে নিজের শোভা বর্দ্ধন করে; তথাপি পৃথিবীর হাহাকার ঘুচিবে না। পক্ষান্তরে একদিকে একশ্রেণীর লোক অর্থ ব্যয় করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এবং অপর দিকে অন্যশ্রেণীর কোটি কোটি নরনারী উদর পূরণ করিবার যোগ্য ভক্ষ্যও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। উহা দ্বারা এই বিষম হৃদয়ভেদী দৃশ্য কখন বসুন্ধরা হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। আর এই সাম্যভাবের মূলে এক মাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই দেখিতে পাই; এতদ্ব্যতীত অন্য সমুদয়ই এই কার্য্যে অনুপযোগী বা অন্যথাসিদ্ধ।

অনেকেরই এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা কেবল মুক্তিই দিতে পারে, তাহার সাহায্যে লৌকিক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তি অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ ধারণাকারীরা যে সুখের আশায় ব্রহ্মবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও ক্ষণপ্রভার মত দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়া যায়, আর তৎকালেই দুঃখ আসিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করে। এই ত গেল দুঃখের কথা। আবার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, এইরূপ বিষম পরিণাম ভোগ করিয়াও তাঁহারা ভৌতিক উপকরণের নিকট সুখের মোহিনী আশা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। যদিও এই আশাকে বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলেও দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া বিচারশীল তত্ত্বদর্শীর হৃদয়ে কোন প্রকারেই স্থান পাইতে পারে না। তাই ভারতের পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিতে না পারিলেও তাহার ফলোপধায়িত্বের মাত্রা কতটুকু, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন;—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং না লেপ সুখমস্তি।"

"যেরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম মায়িক উপকরণ হইতে প্রকৃত সুখের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য লব্ধ হইবার নহে"—এইরূপ যে একটা ধারণা অনেকের আছে, তাহাকেও অপ্রমাপ্রসূত বা ভোগোন্মাদের চিহ্ন না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না; কারণ ব্রহ্মবিদ্যার নিকট এই উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, "এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যে যদিচ্ছতি তস্য তৎ।" এই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মাকে অবগত হইয়া যে যাহাই ইচ্ছা করে, সে তাহাই পাইয়া থাকে। এইরূপ হইবারই কথা, কেননা ব্রহ্মবিদ্যা আত্মাকেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ঘোষণা করে বলিয়া তাহার সেবনকারী যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতেই

অদম্য উত্তম ও অবশ্যই ইহা আমি করিতে পারিব, এইরূপ আত্ম-বিশ্বাসের বলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। আর সিদ্ধিলাভের মূলে যে আত্মপ্রত্যয় নিহিত আছে, ইহাতে কোন বিচারশীলই সন্দেহ আনিবেন না। সুতরাং এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, যাহারা বিপদের ক্রীতদাস ক্ষণভঙ্গুর সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পুতুলকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা "আমিই অজর অমর নিখিল শক্তির নিলয় চিদাত্মা পরব্রহ্ম" এইরূপ ধারণাশীল আত্মদর্শীর কি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে আত্ম-প্রত্যয়টা কম? যখন যুক্তির দ্বারা দেহাত্মবাদী হইতে ব্রহ্মাত্মবাদীর আত্মপ্রত্যয় ও নির্ভীকতা প্রভৃতি কার্য্যসিদ্ধির উপকরণীভূত গুণগুলি অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন একটা ভিত্তিশূন্য ও পরম্পরা প্রবর্ত্তিত খামখেয়ালী মত লইয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপর অবজ্ঞা করা কোন প্রকারে বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও আলোচিত বিষয়টীকে সপ্রমাণ করিয়া দেয়। প্রতীচ্য শিক্ষান্ধ ব্যক্তি ব্যতিরেকে এমন লোক বিরল বলিয়াই বোধ হয়, যিনি ভূতপূর্ব্ব ভারতকে তাৎকালিক পৃথিবীর শৌর্য্য বীর্য্য ও গৌরবের আদর্শ না বলিয়া থাকিতে পারেন। আর প্রাচীন আর্য্যভূমিতে যে ব্রহ্মবিদ্যা উন্নতির অন্তিম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, ইহা সর্ব্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ই বল, আর সুনীতিকে জীবনে পরিণত করাই বল, বর্ত্তমান পৃথিবী কোন প্রকারে এই বিষয়ে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে যে সভ্যতার একটা হাওয়া উঠিয়া পৃথিবী ব্যাপ্ত করিতে চলিয়াছে, যাহার প্রলোভনে পড়িয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি, ধর্ম্ম ও কল্যাণপ্রসূ কুল-পরম্পরা প্রবর্ত্তিত আচার ব্যবহারের প্রতি দৈনন্দিন বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, উহা স্বার্থ বা পার্থিব সুখের উষ্ণ বাষ্প সম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়; কেননা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ হাওয়াটার প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ করিলে উহাকেই মূল বস্তুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা ঐহিক বা পারত্রিক যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই সমুদায় গুলির মূলে উহা নাও থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগের ক্রিয়মাণ অধিকাংশ কার্য্যের ভিত্তি যে উহার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বা নীতির বহিরাবরণগুলা নিজের আগন্তুক সৌন্দর্য্যচ্ছটায় অনেক একদেশদর্শীর মন ভুলাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যে মনস্বী মনীষীর নিকট তদীয় অন্তস্তত্ত্বের গুণগরিমা অবিদিত রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে পারি কৈ? এমন কি অনেক সাম্যভাবের পক্ষপাতী উদারপ্রকৃতি প্রতীচ্য দূরদর্শীও এ নীতি এবং সভ্যতার মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। কিন্তু একমাত্র ইহাতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, দেখিতে পাই, এই মহামনা ব্যক্তিরা প্রকাশ্যভাবে উহার তীব্র প্রতিবাদও করিতেছেন।

যখন প্রাচীন ভারত ব্রহ্মবিদ্যার সেবন করিয়া তৎকালে জগৎ সমক্ষে সকল বিষয়েই আপনার গৌরব ঢালিয়া দিয়াছিল, তখন বর্ত্তমান ভারত যে, উহাতে দীক্ষিত হইয়া অবনতির পঙ্কে ডুবিবে, এইরূপ ধারণাকে মাদক দ্রব্যের আশ্রয় না লইয়া কে প্রশংসা করিতে পারে? বিশেষতঃ ইদানীন্তন ভারত যেরূপ নির্বীর্য্য ও অনাত্মবুদ্ধির ক্রীড়া কন্দুক হইয়া নির্জীব হইতে চলিয়াছে, এইরূপ বিষম সমস্যাতে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মবিদ্যার এই অভয়বাণী না শুনাইলে কিছুতেই তাহার ভয় ভাঙ্গিবে না ও জীবনীশক্তি আসিবে না। এই ক্ষেত্রে

ব্রহ্মবিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবে নীতির শাবর মন্ত্রই প্রয়োগ কর, আর জড়-বিজ্ঞানের বিশল্যকরণীই বাটিয়া খাওয়াও, কিছুতেই আশানুরূপ সুফল ফলিবে বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু নীতি ও বিজ্ঞান ব্রহ্ম-বিদ্যার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া পরস্পর একযোগে যদি ভারতবাসীর উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে, তবে অব-শ্যই সোনায় সোহাগা মিলনের ফল ফলিবে, তবে নিশ্চয়ই আর্য্যভূমি নবভাবে পূর্ব্ব গৌরব উদ্‌গীর্ণ করিয়া পৃথিবীকে বিস্ময়-নীরে ভাসাইবে। জাতিগত বিশেষত্বের দিক্ দিয়া দেখিলেও ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে ব্রহ্মবিদ্যার সেবন করাই আর্য্যজাতির বিশেষত্ব; সুতরাং বল পূর্ব্বক ইহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিলে সে যে অনার্য্যে পরিণত হইয়া আপনাকেই আপনি হারাইয়া ফেলিবে, এইরূপ আশঙ্কা স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। পাঠক, ইহা-দ্বারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, যাঁহারা আর্য্যজাতিকে ধর্ম্মে উদাসীন রাখিয়া, প্রতীচ্য নীতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিচারশক্তি কত গভীর, কত সূক্ষ্ম।

জড়বিজ্ঞান জড় বস্তুর উপর অবশ্য নিজের প্রভুত্ব দেখাইতে বা তৎসম্বন্ধে অভাবের পূরণ করিতে পারে, কিন্তু মানসিক উন্নতিকল্পে উহা সর্ব্বথা অনুপযোগী না হইলেও মনো-বিজ্ঞানের সারাংশস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আনুগত্য অবশ্যই তাহাকে করিতে হয়; কিন্তু ইহা ঐ সম্বন্ধে তাহার সাহায্য ব্যতীতও নিজের ফলোপধায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে পারে। তাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, জড়বিজ্ঞানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না জানিয়াও অকিঞ্চন ব্রতের যতিগণ ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনায় যেরূপ মান-সিক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা তৎ-পরিচয় শূন্য বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কিছুতেই লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যেরূপ জড়বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকেও মানসিক উন্নতি হয়, সেইরূপ বৈষয়িক অভ্যুদয় যখন একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপকরণেই সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন উহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যার শরণ লইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ভোগবিলাসের উপ-করণগুলি স্বচ্ছল হইয়া উঠিলেও পরস্পর অহিনকুল-নীতির বিজিগীষা আছে বলিয়া মানবসমাজ উহাদ্বারা প্রাপ্য সুখে তুল্যাধি-কারী হইতে পারে না। মনে কর, ফরাসী জাতি নূতন ব্যোমযান আবিষ্কার করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের আকাশবিহার ও রণ-ক্ষেত্রে বিজয়লাভের সুখ হইবার কথা; কিন্তু তাহা দ্বারা যে অপর জাতির অমরাবতী তুল্য নগর ও নন্দনবনের ন্যায় বিলাসোদ্যান অবিলম্বেই ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, ব্যোমযান আবিষ্কার করিয়াই জগতের সমক্ষে তাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বর্ত্তমান সভ্যজাতির কার্য্যারম্ভের মূল উদ্দেশ্যটা কিরূপ। মনে করুন, ইঁহারা যদি প্রাচ্য আর্য্য ঋষিদিগের অধ্যাত্মবাদে সুদী-ক্ষিত হইয়া আপন মনে যে অনার্য্যভাবের মালিন্য ভরিয়া রহিয়াছে এগুলিকে সর্ব্বাত্ম-ভাবের অমল সলিলে ধুইয়া ফেলিতে পারি-তেন, তবে কি ইহাঁদের সভ্যতালোকে পৃথিবী আলোকিত হইয়া উঠিত না? ইহা কি সত্য নহে যে, তাঁহাদের এই সভ্যতাই অন্যজাতির অধঃপতনের মূল কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

আলিবর্দ্দি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়ে ব্যবস্থা।

আলিবর্দ্দি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভ্রাতা হাজি মহম্মদকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করি-লেন, এবং বলিয়া দিলেন,—সহরবাসীদিগকে যেরূপে হউক, শান্ত করিবেন। রাজ্যের সকল কার্য্যালয়ে এবং সরফরাজ খাঁর প্রাসাদে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন। সকল-কেই বলিয়া দিবেন, কেহ যেন কোন প্রকার গোলযোগ না করেন। কোন দিন কোনরূপ অশান্তি যেন না হয়। হাজি আহম্মদ দ্রুত-বেগে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি মুরশিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন;—আলিবর্দ্দি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, তিনি বঙ্গের সুবাদার হইলেন।

যুদ্ধের দুই দিন পরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আলিবর্দ্দি খাঁ ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ সহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এ যাত্রায় সমারোহ এবং আড়ম্বরের ত্রুটী ছিল না। তিনি মুরশিদাবাদে গিয়া এক-বারে বঙ্গের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন না। যে প্রাসাদে জাফর খাঁর কন্যা—সর-ফরাজ খাঁর মাতা নেপিসা বেগম অবস্থিতি করিতেছিলেন, আলিবর্দ্দি সর্ব্বাগ্রে সেইখানে গমন করিলেন। তিনি প্রাসাদের সিংহদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে গদগদস্বরে বেগমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি বেগমকে বলিয়া পাঠাইলেন;—অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; আমি আপনার অকর্ম্মণ্য অকৃতজ্ঞ ভৃত্য। আমার এ অকৃত-জ্ঞতা ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকিবে। কিন্তু যতদিন আমার এ কলঙ্কিত দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হইব না এবং আমি চিরকাল আপনার বশে থাকিব। আপনার এই ভৃত্যের এই দুষ্কার্য্য এবং এই নীচতা ক্রমে আপনার অনুগ্রহময় হৃদয়-দর্পণ হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং আপনি কিছুদিন পরে আমার কৃত সকল অপরাধ ভুলিয়া যাইবেন, আমার এইরূপ আশা আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি চিরকাল আপনার অনুরক্ত ভক্ত হইয়া থাকিব।

আলিবর্দ্দি অতি কাতরকণ্ঠে এই কয়টী কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি উহার একটীমাত্র উত্তর পাইলেন না। অবশেষে যে প্রাসাদ সুজা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে প্রাসাদ সেহেল সুটুন নামে নামে অভিহিত হইত, যাহাতে ৪০টী বিরাট স্তম্ভ ভীম মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত, যেখানে সকল ক্রিয়াকলাপ সমারোহে সমাহিত হইত, আলিবর্দ্দি সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। এই প্রাসাদের প্রকাণ্ড দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল; পবনহিল্লোলে তালে তালে আলিবর্দ্দির শাসন-কর্ত্তৃত্ব বিঘোষিত হইতে লাগিল। নবাবের কর্ম্মচারিমণ্ডলী, সৈন্যসমূহ ও মুরশিদাবাদের প্রধান প্রধান অধিবাসীরা তাঁহার সম্মুখে নজর ধরিলেন। ইহাঁরা অবশ্য বাহিরে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু ভিতরে ঘৃণার হলাহল উথলিয়া উঠিতে-ছিল। যে প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিতে পারে, সে অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন, তাহাকে লোকে যে

ঘৃণার চক্ষুতে দেখিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতই আলিবর্দ্দির সন্দর্শনে উপস্থিত সকলের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

আলিবর্দ্দি প্রভুহত্যা করিয়া যে পাপের সঞ্চয় করিয়াছিলেন, প্রকৃতিপালনে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। গ্রহবৈগুণ্যে আলিবর্দ্দি প্রভু হত্যায় হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতিপালনে প্রকৃতই তিনি বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। আলিবর্দ্দির সিংহাসনারোহণে যাহারা ঘৃণা-ক্রোধে আলিবর্দ্দির মুখদর্শনেও কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন, পরে তাহারা তাঁহার বহুগুণে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না, পরন্তু অনেক সময় তিনি ধর্ম্মভাবেরই পরিচয় দিতেন। তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আত্মীয় ও অনাত্মীয় জন তাঁহার নিকট সমান সম্মান আসন প্রাপ্ত হইতেন। সবল ও দুর্ব্বল সকলে সহজেই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিত। অত্যাচারিত ও আর্ত্ত ব্যক্তি তাঁহার সমবেদনা আকর্ষণে সক্ষম হইত। ভক্ত ও অনুরক্ত অনুচরবর্গের প্রতি তিনি সতত সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি একরূপ সর্ব্বংসহ ছিলেন। কেহ অপরাধ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কখনও ক্ষমা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রথমে যাঁহারা তাঁহার প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জীবিত অবস্থায় এবং তাহার মরণান্তে সেরূপ অনুরাগ আর কোন অনুচর কোন প্রভুর প্রতি প্রদর্শন করিতে পারেন না। আলিবর্দ্দির প্রীতি, লোকপ্রীতির উদাহরণস্বরূপ হইয়াছিল।

আলিবর্দ্দি যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁর হত্যাসাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু নবাব সরফরাজ খাঁ রাজ্যশাসনের উপযুক্ত কোন প্রকার শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; বরং তিনি যে ভাবে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে ভাব আর কিছু দিন থাকিলে তাঁহার শাসন কাল সংক্ষেপেই পর্য্যবসিত হইত। তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রাজ্যে অনেক মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, অনেক গোলযোগ আসিয়া পড়িয়াছিল। অনেক বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল গোলযোগে, এই সকল বিশৃঙ্খলায়, রাজ্য এবং প্রজামণ্ডলী ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে সেই দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরা বাঙ্গালার শস্যশ্যামলা ভূমির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে চারিদিকে, তাহাদের আক্রমণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গের সৌভাগ্য, বঙ্গীয় প্রজার সৌভাগ্য যে, এই সময়ে আলিবর্দ্দি বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলিবর্দ্দি আপন বুদ্ধিপ্রভাবে, সুতীক্ষ্ণ রাজনীতি কৌশলে এবং অপরিমিত বলবীর্য্য বিক্রমে বর্গীদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সরফরাজ খাঁ এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ কোন ক্রমেই সেই দুর্দ্দমনীয় বর্গীদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না।

এইবার আলিবর্দ্দি খাঁর শাসননীতির সূত্রপাত হইল। এইবার আমরা দেখাইব, আলিবর্দ্দির স্বভাব কত কোমল, তাঁহার চরিত্র কিরূপ নির্ম্মল, এবং তাঁহার রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি কত প্রখরা। যুদ্ধ বিজয়ের সাফল্যে তাঁহার খ্যাতিশক্তি কিরূপ প্রকটিত হইত, অতঃপর আমরা তাহাও দেখাইব, আর দেখাইব কর্ম্মফল কিরূপ অনিবার্য্য। আলিবর্দ্দি প্রভুহত্যা করিয়াছিলেন, প্রভুর শোণিতে তাঁহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাই তিনি প্রজাবৎসল প্রকৃতিপালক হইয়াও নিষ্কণ্টকে নিশ্চিন্তমনে রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনকালে কেবল বর্গীর হাঙ্গামা কেন, বহু বিপ্লবে তাঁহার রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা হউক, প্রজারঞ্জনে তিনি অতুলনীয়, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন মুসলমান নবাব প্রজারঞ্জনে তাঁহার তুলনীয় হইতে পারেন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যবিভাগ।

আলিবর্দ্দি যে সময়ে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন, সে সময়ে রাজকোষে কোটী কোটি অর্থ সঞ্চিত ছিল। আলিবর্দ্দি সেই সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেরূপ অর্থ ব্যয় করিলে, যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিলে, রাজ্যের পূর্ণশান্তি স্থাপিত হয়, আলিবর্দ্দি তাহা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী করেন নাই। এই সময়ে আলিবর্দ্দি সুজা-উল-মুলুক এবং হেসাম উদ্দৌলা উপাধি লাভ করিলেন। প্রথম উপাধিটীর অর্থ 'রাজ্যের বীর' এবং দ্বিতীয়টীর অর্থ 'সাম্রাজ্যের তরবারি।' আলিবর্দ্দি স্বয়ং সপ্তসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসনে সুব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। যিনি যেখানকার শাসনকর্ত্তৃত্বের উপযুক্ত, তিনি সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। যিনি যে উপাধি পাইবার যোগ্য, তিনি সেই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। আলিবর্দ্দির জামাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনউদ্দিন মহম্মদ খাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হইলেন। মনে আছে, আলিবর্দ্দি খাঁ আজিমাবাদ হইতে মুরশিদাবাদ যাত্রাকালে এই জৈন উদ্দিন আহম্মদ খাঁকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। জৈন উদ্দিন সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি হইলেন, আলিবর্দ্দি তাঁহাকে যথোপযুক্ত উপাধি-অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। জৈনউদ্দিন শাসনসম্ভ্রমের নিদর্শনস্বরূপ খুল্লতাতের নিকট হইতে পাল্কী, নাগরা এবং পতাকা প্রাপ্ত হইলেন। জৈনউদ্দিন হইলেন;—সাম্রাজ্যের গৌরব, এবং যুদ্ধদুর্ম্মদ। আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা নেভাজিস মহম্মদ খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে ঢাকা জাহাঙ্গীর নগরে এবং শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনিও আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক উপাধিভূষণে ভূষিত হইলেন। ইনি হইলেন;—রাজ্যের বীর এবং সমরে অসমসাহসী। মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বহু ধনলাভ করিলেন। ইনিও ভ্রাতাদিগের ন্যায় উপাধিলাভ করিলেন। নবাব সুজা খাঁ এবং সরফরাজ খাঁর সময়ে এই সৈয়দ আহম্মদ খাঁ রঙ্গপুরের ফৌজদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ ইহাঁর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন, "এখন মুরশিদ কুলি খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা। মুরশিদ কুলি খাঁ শাসন-কর্ত্তৃত্ব-পদ হইতে অপসৃত হইলে তোমাকেই ঐ পদ প্রদান করিব। মুরশিদ কুলি খাঁ সুজা খাঁর জামাতা, ইনি সরফরাজ খাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ বুদ্ধিমান্ বলিয়া, কবি বলিয়া, বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এইবার পাঠক বঙ্গের সেই হতভাগ্য শেষ নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কিছু পরিচয় লইবেন কি? আলিবর্দ্দির রাজ্যাভিষেক-উৎসবে বালক সিরাজদ্দৌল্লা সম্মান ও উপহার লাভ করিতে বঞ্চিত হন নাই। সিরাজদ্দৌল্লা কনিষ্ঠ জামাতা জৈন উদ্দিন আহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলিবর্দ্দি ইহাঁকে পোষ্যপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম ছিল—মির্জ্জা মহম্মদ। আলিবর্দ্দি রাজ্যাভিষেকের উৎসবে ইহাঁর নাম রাখিলেন সিরাজদ্দৌল্লা সা কুলী খাঁ বাহাদুর। আলিবর্দ্দি সিরাজদ্দৌলাকে আপনার নিকটে রাখিলেন। সিরাজদ্দৌল্লাও আলিবর্দ্দির নিকট হইতে ঢাকা জাহাঙ্গীর নগরে নৌ-সেনাপতির কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। সিরাজদ্দৌলার অর্থ;—"সাহসী প্রভু এবং সম্রাটের সৈনিক।" ঢাকার জাহাঙ্গীর নগরে নৌ-সেনাপতির অধীন অনেক বড় বড় জাহাজ থাকিত। এই সকল জাহাজ দিল্লিতে প্রেরিত হইত, ইয়ুরোপের যে সকল জাহাজ "গ্যালি" নামে অভিহিত, ঢাকার নৌ-সেনাপতির কতকগুলি জাহাজ ঠিক সেই "গ্যালির" মত। ৮০টী

গ্রামের আয়ে নৌবিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান হইত। সে বড় কম নহে। পূর্ব্বে এই আশিটী গ্রামের বাৎসরিক আয় আশী হাজার টাকা ছিল, ক্রমে ইহা তিনলক্ষ টাকা হয়। তবেই বুঝা গেল, সিরাজদ্দৌল্লার সম্মান বড় কম নহে।

আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নবাজিস মুহম্মদ খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। আলিবর্দ্দির আদেশে তিনি সিরাজদ্দৌল্লার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম হইল—বাদসা কুলী খাঁ; ইনি একরাম উদ্দৌলা উপাধি পাইলেন। সিরাজদ্দৌল্লা এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি-পদে গৌরবান্বিত হইলেন। বাল্যকাল হইতে উভয়েই উচ্চ সম্মান উপভোগ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দির ভ্রাতা হাজি আহম্মদের কনিষ্ঠ জামাতা আতাউল্লা খাঁ ভাগলপুরের ফৌজদার হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি আকবর নগর রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। এইরূপে আলিবর্দ্দি আপন আত্মীয়বর্গকে যথাযোগ্য পদে নিয়োগ করিয়া যথাযোগ্য উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কেহ সেনাপতি হইলেন, কেহ নায়েব হইলেন, কেহ মন্ত্রী হইলেন। সুজা খাঁর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রায় রায়েন আলম চাঁদের এজেণ্ট চৈন রায় "রায় রায়ান" উপাধি পাইয়া আলিবর্দ্দির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। রাজা জানকীরাম আলিবর্দ্দির সামরিক মন্ত্রী হইলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন; কেবল মুতাক্ষরীণ গ্রন্থলেখক গোলাম হোসেনের কোন আত্মীয় উপযুক্ত পদ না পাইয়া অভিমানে আলিবর্দ্দির কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ যে সময়ে বাঙ্গালার নবাব হন, সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্‌কে দেয় বাঙ্গালার অনেক খাজানা পড়িয়াছিল। তিনি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কোটি টাকা খাজানা এবং উপহার স্বরূপ অনেক টাকা পাঠাইয়া দিলেন। সরফরাজ খাঁর যে সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ তিনি সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, দিল্লী দরবারের সদস্য মুরীদ খাঁ বাঙ্গালার বাকি খাজানা এবং সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। আলিবর্দ্দি খাঁ মুরীদ খাঁকে অতি সসম্ভ্রমে পত্র লিখিলেন,—"আপনাকে আর কষ্ট করিয়া মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত আসিতে হইবে না। আপনি আজিমাবাদে বিশ্রাম করুন, আমি স্বয়ং অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছি। আলিবর্দ্দির পত্র পাইয়া মুরীদ খাঁ আর অগ্রসর হইলেন না। আকবর নগর রাজমহলে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে আলিবর্দ্দি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তিনি মুরীদ খাঁকে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা, সত্তর লক্ষ টাকার অলঙ্কার, স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসপত্র, কতকগুলি বহুমূল্য গৃহ-দ্রব্য, কতকগুলি বহুমূল্য প্রস্তর এবং কতকগুলি হস্তী ও অশ্ব প্রদান করিলেন। এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়া আলিবর্দ্দি মুরীদ খাঁর নিকট হইতে রীতিমত প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্র গ্রহণ করিলেন। মুরীদ খাঁও আলিবর্দ্দির নিকট হইতে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। মুরীদ খাঁকে সদালাপে ও সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া আলিবর্দ্দি মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুরশিদাবাদে আসিয়া আলিবর্দ্দি সর্ব্বপ্রথমে সৈন্য সংস্কারে মনোযোগী হইলেন। বল সঞ্চয় ও বলবর্দ্ধনই তাঁহার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহম্মদ খাঁর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরশিদ কুলি খাঁকে অপসৃত করিয়া তোমাকেই উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিব। এখন আলিবর্দ্দির প্রাণে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। তাহারই জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

ভামিনী।

১

প্রভা,—প্রভাময়ী ছয় বৎসরের মেয়ে। তাহার পিতা শচীনাথ বসু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্ম শচী বাবু স্বজাতি সদ্বংশ মধ্যে বিবাহ করিলেও, অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় পত্নীকে গঙ্গা-স্নান করিতে না দিয়া, বিশেষরূপ সজ্জিত হইয়া, গঙ্গাজল-স্নিগ্ধ বায়ু-সেবনার্থ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ করিতে দিতেন, এবং স্বয়ং তাহার সহচারী হইতেন। তিনি বাঙ্গালাভাষায় একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন এবং উপাসনাকালে কুল-পুরোহিতকে আহ্বান করিতেন না। এই সকল কারণে, হিন্দু সমাজ, তাঁহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল।

প্রতিবেশী হিন্দুগণ কেহই তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতেন না। কেবল একটী হিন্দু-বালক শচী বাবুর বাটীতে প্রত্যহ আসিত, এবং শচী বাবুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিত। কখন বা প্রভাকে লইয়া খেলা করিত। বালকের নাম শরৎ।

প্রভা মাতাপিতার মুখে, এরূপ ভাবের কোনও কথা শুনিয়াছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু খেলা করিতে করিতে সে একদিন হঠাৎ শরৎকে বলিয়া বসিল, "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বে; নয়?" শরৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, হ'বে।" প্রভা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি হ'বে?" শরৎ আবার হাসিল, আবার বলিল, "হাঁ, হাঁ, হ'বে।" প্রভার মা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও হাসিলেন; হাসিয়া প্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার বাবা বলেন যে, তোমার কুড়ি বৎসর বয়সে তোমার বিয়ে দিবেন, আর তুমি ছয় বৎসর বয়সেই স্বয়ংবরা হইলে।"

শরৎ ছোক্‌রাটি কে? সে কলেজের একজন ছাত্র,—এই বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার বয়স উনিশ বৎসর। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন,—বেশ 'পসার' ছিল।

মাতার ইচ্ছা ছিল যে বি, এ, পাশের পরই শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র বাবাজীবনের বিবাহটি দিয়া একটি টুক্‌টুকে বউ ঘরে লইয়া আসেন। তা, তোমরা যাহাই ব'ল না কেন, শরতের মাতার এই ইচ্ছাটি বড় সঙ্গত ইচ্ছা। বাড়িতে আর একটিও ছেলে মেয়ে ছিল না। এমন অবস্থায়, তত বড় বাড়িতে কি একটি বউমা না লইয়া বাস করা যায়? কিন্তু মাতার শুভ ইচ্ছাটি পূর্ণ হইল না।

সত্য বটে ঘোষজা মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ভাল নয়, এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, যখন ছয় বৎসর পরে পুত্রের ডাক্তারি পড়া শেষ হইবে এবং যখন তাহার

বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে, তখন তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে। কিন্তু উকিল-গৃহিণী, উকিল মহাশয় অপেক্ষা তর্কশাস্ত্রে কম পারদর্শী ছিলেন না; তিনি অতি সহজে স্বামীর আপত্তিগুলি খণ্ডিত করিয়া দিলেন। বুঝাইয়া দিলেন যে, বাল্যবিবাহই ভাল; দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তিবিশিষ্ট কতকগুলি যুবককে যদি সময়মত বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে, স্ত্রী-সমাজ মধ্যে প্রলোভন বিস্তার করিয়া, তাহারা হয়ত সমাজের কত অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। ঘোষজা মহাশয় নিজেই বাল্যবিবাহ করিয়াছিলেন। এবং বাল্যবিবাহ করিয়াও স্বাস্থ্য বা বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে নাই, বরং শ্বশুর মহাশয়ের অর্থসাহায্য পাওয়ায় তাঁহার বিদ্যা উপার্জ্জনের সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আপত্তি উত্থাপন কালে, এ সকল কথা, তাঁহার মনে ছিল না। এক্ষণে গৃহিণী তাহা স্মরণ করাইয়া, তর্কে বিশেষরূপ জয়লাভ করিলেন।

হায়! তর্কযুদ্ধে স্বামীকে পরাজিত করিয়াও গৃহিণীর আশালতাটি ফলবতী হইল না। জানি না বাবাজীবন আমাদের কিরূপ ছেলে! বাবাজীবন কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইল না। মাতার অশ্রুজল, পিতার আদেশ, সমস্তই বৃথা হইল। তোমরা যেন মনে করিও না যে, ব্রাহ্মদের সেই ছয়বৎসরের সেই মেয়েটীর সেই কথাগুলো, হতভাগাটা হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিতেছিল। ছয় বৎসরের মেয়ে খেলা করিতে করিতে যে কথা বলিয়াছে, তাহা কি কেহ মনে রাখে?

ছয়টি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শরৎ এম্, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ছয় বৎসরের প্রভা এখন বার বৎসরের হইয়াছে। কিন্তু বালিকা এখনও বালিকা। তাহার বাল্যচাঞ্চল্যগুলি এখনও সে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হইত না। তাহার শরৎ দাদা তাহাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে, এখনও সে অন্তরালে লুকাইয়া 'কু—উ' বলিত। ফিরিবার সময়, তাহার উত্তরীয়খানি লুকাইয়া, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিত। শরতও ছাড়িত না, ছোট ছোট বিদ্রূপগুলির দ্বারা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিত।

একদিন শরৎ তাহাদের বাড়িতে দুইবার আসিয়াছিল। তাহাকে দ্বিতীয়বার আসিতে দেখিয়া প্রভা বলিল, "আবার কেন আসিলে?" শরৎ বলিল, "এবার তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।" ছাব্বিশ বৎসরের শরতের একথাটা বলা ভাল হয় নাই। শুনিয়া, লজ্জায় প্রভার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়াছিল, তথাপি দুষ্ট মেয়ে উত্তর দিতে বিরত হয় নাই। সে বলিল, "মা বলিয়াছেন, আমি স্বয়ংবরা হইব।" শরৎ বলিল, "কতবার স্বয়ংবরা হইবে? একবারত স্বয়ংবরা হইয়াছিলে।" প্রভা, প্রভাতের পদ্মের মত কমনীয় চক্ষু দুটিতে এক প্রকার বর্ণনাতীত রশ্মি পুরিয়া শরতের মুখের দিকে চাহিল এবং তাহার সুন্দর গণ্ডে, অতি সুন্দর অঙ্গুলি সকল ন্যস্ত করিয়া বলিল, "ওমা, অবাক্ সৃষ্টি! তুমি তত দিনের কথা এখনও মনে করিয়া রাখিয়াছ?"

প্রভারা বালীগঞ্জে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিত। শরতের পিতা ভবানীপুরে খালের ধারে এক বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া, শরৎ প্রভার নিকট বিদায় লইয়া, এবং অতি কষ্টে সংগুপ্ত উত্তরীয় এবং ছত্রের সন্ধান পাইয়া, বাটী ফিরিল।

তথায় একটি বসিবার ঘরে কয়েকটি ভদ্রলোক সমবেত হইয়া, শরতের পিতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। এইরূপ বাক্যালাপ হইত, তাহাতে সকলেই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাকিত না। আজ শরৎ সেই বাক্যালাপে দুইজন শ্রোতা দেখিল;—তাঁহারা নীরব গাম্ভীর্য্যে আপনাদের অসাধারণত্ব রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা কে?

তাঁহাদের একজন প্রৌঢ় আর একজন বালিকা। প্রৌঢ় খরপুরের বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত। বালিকা ভামিনী তাঁহার কন্যা, আমাদের এই ক্ষুদ্র কাহিনীর নায়িকা। শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্তের বাম হস্তের ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছন্ন কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি বেষ্টন করিয়া যে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহাতে একখণ্ড উজ্জ্বল হীরক জ্বলিতেছিল। এবং সেই বহুমূল্য হীরককে এবং কক্ষস্থিত দীপসকলকে নিষ্প্রভ করিয়া, এবং পিতার হীরকভূষিত হাতটি ধরিয়া, বালিকা ভামিনী চিত্রকরের আদর্শচিত্রের ন্যায় বিচিত্র রূপ লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। মাতৃহীনা ভামিনী পিতা ব্যতীত সংসারে আর কাহাকেও জানিত না। পিতা যেখানে যাইতেন, সেও সেই স্থানে, ছায়াটির মত অনুগমন করিত। আজ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত, জলপথে, কলিকাতায় উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে আসিয়াছিলেন;—ভামিনীও তাঁহার সহিত আসিয়াছিল।

রমানাথ দত্তের ভবানীপুর আগমনের দুইটি কারণ ছিল। আমরা তাহা পরে পরে নিম্নে লিখিতেছি।

খরপুর বংশের বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, জমীদার বাবু জমীদারিটি ঋণভারে ভারাক্রান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরু ঋণভার ক্রমে গুরুতর হইয়াছিল। জমীদারীটি আসন্ন মগ্ন হইয়া, জমীদার বাবুর হীরকখচিত কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি ধরিয়া কোন ক্রমে ভাসিতেছিল। ঋণদাতা, শরতের পিতা উমেশচন্দ্র ঘোষ। তিনি, সমুদয় সম্পত্তি, এবং বাগান, পুষ্করিণী, দেবালয় প্রভৃতি সমন্বিত সুবৃহৎ বাস্তবাটী বন্ধক রাখিয়া ছয় লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন। কুশীদ স্ফীত হইয়া এক্ষণে তাহা প্রায় সপ্তলক্ষে পরিণত হইয়াছিল। এই ঋণ পরিশোধের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া, শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষের নিকট সমাগত হইয়া, সমুদয় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

সম্পত্তিটি কিছু কম আট লক্ষ টাকা মূল্যে উমেশচন্দ্র ঘোষ খরিদ করিলেন। কম মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, ঘোষজা মহাশয়কে রমানাথ দত্ত একটি অনুরোধ করিলেন। কন্যার হাত ধরিয়া বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, আমার এই কন্যাটিও লও। তোমার পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিয়া, খরপুর জমীদারীর ঐশ্বর্য্য-প্রতিপালিতাকে সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দিও।" রমানাথ দত্তের কাতরতা দেখিয়া, ঘোষজা মহাশয়ের ওকালতির প্রতিভা এমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল যে, তিনি উচ্চশিক্ষিত, বিবাহপরাঙ্মুখ পুত্রের মতামত গ্রহণ না করিয়াই, অতি সুন্দরী ভামিনীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া পড়িলেন।

জমীদারিও বিক্রীত হইল, কন্যার বিবাহও স্থির হইয়া গেল;—যে দুই উদ্দেশ্যে রমানাথ দত্ত ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। ইদানীং তিনি কন্যা সম্বন্ধে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভামিনীকে তিনি, মিনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিনি যখন ছয় মাসের শিশু, তখন সে মাতৃহীনা হইয়াছিল, তখন তাঁহার আত্মীয় এবং দেওয়ানজীর চারি বৎসরের পুত্র গোবর্দ্ধন তাহাকে আদর করিয়া ডাকিত "ভা।" বালক গোবর্দ্ধন বোধ হয় "ভাই" সম্বোধন করিতে চেষ্টা করিত,—কিন্তু 'ভাই' শব্দটি

অস্পষ্ট হইয়া "ভা" হইত। তদবধি মিনির নাম হইয়াছিল, "ভামিনী"। তদবধি রমানাথ দত্ত মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের সহিত ভাবিনীর বিবাহ দিয়া, গৃহজামাতা করিয়া রাখিবেন। কিন্তু তের বৎসর পরে, তাঁহার অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি এবং গোবর্দ্ধনের পিতা উভয়েই এই বিবাহটা সুবিধাজনক মনে করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুপাত্রের সহিত সহজেই ভামিনীর বিবাহ স্থির হওয়ায় তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। হায়! অন্ধ মূর্খ মানুষ! তুমি আহ্লাদ করিও না। তুমি রমানাথ দত্ত! তুমি যদি জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করিয়া, ভামিনীর ভবিষ্যৎ জীবন-লীলা দেখিতে সক্ষম হইতে, তাহা হইলে বরং ঐ আদরিণী স্নেহপুত্তলি কন্যার স্বহস্তপ্রতিপালিত দেহটি পদদলিত করিতে, তথাপি শরতের সহিত বিবাহ স্থির হওয়ায় আহ্লাদিত হইতে না।

খরপুরের জমীদারী ইত্যাদি ক্রয়ের দলিলাদি যেদিন রেজিষ্টারি হইল, সেই দিন রাত্রে, উমেশচন্দ্র ঘোষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। শরতের উদ্যোগে, কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করিল। কিন্তু মৃত্যু যাহাকে আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে কে বাঁচাইবে? মৃত্যুকালে ক্রন্দনমান পুত্রকে ঘোষজা মহাশয় নিকটে আহ্বান করিলেন। শরৎ নিকটে আসিলে, তিনি তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, "আর ঔষধ খাইব না। গেলাস নয়, তোমার অঞ্জলি পুরিয়া আমার মুখে জল দাও। আমি পুত্রবান্, তুমি কাছে রহিয়াছ, তোমার হাতের জল পান করিয়াছি, তাহার দ্বারা সিক্ত কণ্ঠে ইষ্টদেবের নাম উচ্চারণ করিয়াছি। আমার বড় সুখের মরণ। আমার কাজ ফুরাইয়াছে। তুমি সৎপথে থাকিও। আর রমানাথ দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিও। এখন সে অর্থহীনা গৃহহীনা; তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া একটি সদ্বংশকে রক্ষা করিও।" শরৎ মস্তক অবনত করিয়া ক্রন্দন করিল। গণ্ড প্রবাহিত অশ্রুধারায় শয্যাপ্রান্ত সিক্ত হইল।

৩

তিনটি অতি দীর্ঘ মাস ধরিয়া, শরৎ প্রভাকে দেখা দেয় নাই। প্রভা কাহার সহিত দুষ্টুমি করিবে; অন্তরালে লুকাইয়া কাহাকে "কু-উ" দিবে?"

সে তাহার বাবাকে ও মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি পাইয়া, তাহার শরৎ দাদাকে এক পত্র লিখিল;—"শরৎ দাদা, তুমি আমার প্রণাম জানিও। তুমি আর আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আস না কেন? একবার আসিও, আমি কেমন জুতা বুনিতে শিখিয়াছি, তাহা তোমাকে দেখাইব। ইতি প্রভা।" তিন দিন পরে, প্রভা শরতের নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইল;—"প্রভাময়ি! তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লইও। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আমি নানারূপ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। নানা স্থানে যাইতে হইয়াছিল। তাই তোমাদের বাড়ীতে যাইতে পারি নাই। আগামী রবিবারে যাইব। তোমার মাকে আর বাবাকে আমার প্রণাম জানাইও, আর বলিও যে গত মাসে, ডাক্তারি করিয়া, আমি প্রায় আটশত টাকা পাইয়াছি। ইতি। তোমার শরৎ দাদা।"

প্রভা ত জানিত না যে শরৎ পিতৃহীন হইয়াছে। তাহা হইলে, তাহার এই কষ্টের সময় সে তাহাকে আসিতে বলিত না; আপনি তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া, কত

কৌশলে, তাহাকে প্রফুল্ল করিত। পিতৃহীন হওয়া বড় কষ্ট; সে কথা ভাবিতেও প্রভার চোখ দু'টি জলভারে ভাসিয়া যাইত। আজ শরতের জন্য প্রভা সেই কষ্ট, সেই বেদনা অনুভব করিল। সারাদিন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া রহিল। প্রভার মা প্রভাকে আর কখনও এরূপ বিমর্ষ হইতে দেখেন নাই।

রবিবার দিন শরৎ তিন মাস পরে আবার প্রভাদের বাড়িতে দেখা দিল। প্রভার মা তাহাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। শরৎ আসন গ্রহণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভা কই?" অন্তরালে থাকিয়া প্রভা শুনিল, "প্রভা কই?" তিনটি মাসে শরতের কণ্ঠস্বরের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! বিষাদ তাহাতে আপনার গুরুভার চালাইয়া দিয়া তাহা গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে! মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রভা এক নূতন আনন্দ অনুভব করিল। ময়ূরগণ মেঘ গর্জ্জন শুনিলে যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে, প্রভার মন-ময়ূর বুঝি তেমনই পক্ষবিস্তার করিয়া নৃত্য করিল।

একটা নূতন কিছু করিবে মনে করিয়া, প্রভা সহসা উপস্থিত হইয়া, গলায় অঞ্চল দিয়া, শরতের পদপ্রান্তে প্রণত হইল। শরৎ দাদার প্রতি এই অভিনব ভক্তি দেখিয়া প্রভার মা হাসিয়া উঠিলেন। শরৎ বলিল, "এ ভদ্রতা কবে শিখিলি, প্রভা?" প্রভার মুখ ফুটিল, সে বলিল, "আমি ত বরাবরই ভদ্র।" শরৎ বলিল, "তা বেশ, বেশ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার যেন অবিলম্বে একটি সুন্দর বরের সহিত বিবাহ হয়।" প্রভার মুখ ফুটিয়াছিল, এখন তাহা ছুটিল, সে বলিল, "আমি কুড়ি বৎসর বয়সে স্বয়ংবরা হইব।"

শরৎ প্রভাদের বাড়ীতে সে দিন অনেক ক্ষণ বসিয়াছিল। বসিয়া, বসিয়া অনেক কথা বলিয়াছিল। প্রভা শুনিল যে, শরৎ এক্ষণে কেবল মাত্র প্রতিপত্তিসম্পন্ন চিকিৎসক নহে, সে খরপুরের জমীদার; এবং তিন মাস পরে খরপুরের পূর্ব্ব জমীদার রমানাথ দত্তের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। প্রভা বলিল, "ওগো শরৎ দাদা! তোমার সে কনেটির নাম কি?"

শরৎ। ভামিনী।

প্রভা। ভামিনী? তোমার ভামিনী কেমন দেখিতে শরৎ দাদা?

শরৎ। খুব সুন্দর, তোমার চেয়েও সুন্দর;—তেমন সুন্দরী তোমরা কখন দেখ নাই, আমিও দেখি নাই।

প্রভা। সে কত বড়?

শরৎ। তাহার বয়স এখন চোদ্দ বৎসর।

প্রভা। তোমার বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করিবে ত?

শরত। নিশ্চয় করিব।—কিন্তু—না, না, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। তোমরা ব্রাহ্ম, তোমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে শুনিলে, হিন্দুসমাজ মধ্যে একটা মহা কলরব উপস্থিত হইবে। তা, তুমি বিয়ের পরে একদিন যাইয়া, আমার বৌকে দেখিয়া, তাহার সহিত আলাপ করিয়া আসিও, কেমন? আমার বৌকে তুমি কি দিবে প্রভা?

প্রভা। আমার শরৎ দাদাকে দিতেছি, আবার কি দিব?

শরৎ সহসা চকিত নেত্রে প্রভার দিকে চাহিল। প্রভার শেষ কথাটা শুনিয়া, তাহার মনে সহসা একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা কি বার বৎসরের মেয়ের কথা! হাঁ, হাঁ, তাহা বার বৎসরের মেয়ের কথাই বটে। —সে কোমল মুখ, সে হাস্য-প্রফুল্ল চক্ষু, সে

বিলাসশূন্য অধর দেখিয়া, শরতের মন হইতে বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্য-তুল্য সন্দেহটুকু চলিয়া গেল।

৪

রমানাথ দত্তের এক ভৃত্য আসিয়া শরৎকে সংবাদ দিল যে, তাহার প্রভু পীড়িত অবস্থায় জলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এক্ষণে বাবুঘাটে তাঁহার বজ্‌রা বাধা আছে। তিনি শরতের সহিত সাক্ষাতের জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।

শরৎ তৎক্ষণাৎ গাড়ি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিল। এবং বাবুঘাটে উপস্থিত হইয়া, বজ্‌রার একটি কামরার মধ্যে, রমানাথ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন; শরৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে জানিয়া ভামিনী কক্ষান্তরে উঠিয়া গেল।

রমানাথ দত্ত বলিলেন, "আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। আর এক-মাসও ইহলোকে থাকিবার ভরসা আমার নাই। এক্ষণে তোমার নিকট আমার দুইটি ভিক্ষা আছে। জীবনের শেষ কয়টি দিন খরপুরের বাটীতে থাকিবার জন্য আমি তোমার অনুমতি চাহিতেছি। আর আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তুমি যদি ভামিনীর পাণিগ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার মরণ, সুখের মরণ হইবে। তুমি কি মরণোন্মুখের শেষ দুইটি অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

শরৎ কি করিবে? সে খরপুরের বাটীতে রমানাথ দত্তের অবস্থিতির জন্য সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিল এবং মাতার অনুমতি পাইয়া, একটি শুভ দিনে ভামিনীকে বিবাহ করিল। বিবাহের দিন শরতের মাতার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, পিতার মৃতাশৌচ বৎসরে যে বিবাহ হয়, তাহা মঙ্গলজনক নহে। ইংরাজিশিক্ষাপ্রাপ্ত শরৎ কি একথা বিশ্বাস করিয়াছিল?

ভামিনীকে পাইয়া শরৎ সুখের সাগরে ভাসিল। ভামিনী কিন্তু বিবাহের কয়েকদিন পরেই পিতাকে হারাইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতেছিল। শরতের সমস্ত আদর অবিরল অশ্রুধারায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ভামিনী যখন বিরলে কাঁদিতে চাহিত, শরৎ তখন তাহার পার্শ্বে বসিয়া, অত্যন্ত আগ্রহময় প্রেমের কাহিনী গাহিত। শরৎ ভামিনীকে ভবানীপুরের বাটীতে লইয়া আসিবার জন্য প্রস্তাব করিলে, ভামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল, "না, না এখন আমি খরপুর ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিব না।" শরৎ বিধবা কাতরা মাতাকে একাকিনী ভবানীপুরের বাটীতে রাখিয়া কয়েক মাস খরপুরেই বাস করিল।

তথায় আমাদের পূর্ব্বকথিত দেওয়ানজীর পুত্র শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন মিত্রের সহিত শরতের পরিচয় ঘটিল। সে তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন শ্মশ্রুভূষিত বালক। সে তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, মাতার আদরসিক্ত অঞ্চলতলে দেহ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া কন্যাভারাক্রান্ত জনকগণের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। সে তখন গ্রাম্যবালকগণকে সিগারেট খাইবার তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিতেছিল। গোবর্দ্ধন ভামিনীর বাল্যকালের খেলার সাথী—তাহার চিরপরিচিত—তাই সে সহজেই ভামিনীগত প্রাণ শরতেরও বন্ধু হইতে পারিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের রচিত কবিতা, গোবর্দ্ধন যখন মুখভঙ্গী ও হস্তচালনা সহকারে আবৃত্তি করিত, শরৎ তখন ভামিনীর নিকটে বসিয়া তাহার প্রফুল্লনলিনীর মত মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। ভামিনীর সুধামাখা মুখখানিই যে গোবর্দ্ধনের

রচনাটি সুধামাখা করিয়া তুলিত, তাহা গোবর্দ্ধন কখনই বুঝিতে পারিত না। সে মনে করিত, তাহার মনোহর রচনা-কৌশল শরতের ন্যায় একজন শিক্ষিত বড়লোককে যে মুগ্ধ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

কখনও গোবর্দ্ধনের কবিতা শুনিয়া কখনও ভামিনীর সৌন্দর্য্যময় মুখের দিকে চাহিয়া, কদাচিৎ বা জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া, শরতের অলস দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে ছয়টি দীর্ঘমাস চলিয়া গেল।

একদিন গোবর্দ্ধন সংবাদপত্র পড়িয়া, ভামিনী ও শরৎকে সংবাদ দিল যে, কলিকাতার একটি রঙ্গালয়ে একটি অভিনব প্রহসন অভিনীত হইতেছে; এবং প্রস্তাব করিল যে ইহা দেখিবার জন্য তাহাদের সকলেরই ভবানীপুর যাত্রা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শরৎ গোবর্দ্ধন ও ভামিনীকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ভবানীপুর যাত্রা করিল।

শরৎ যখন খরপুরে বাস করিতেছিল, প্রভা তখন প্রত্যহ তাহাদের ভবানীপুরের বাটীতে বেড়াইতে আসিত। প্রভা কি মন্ত্রৌষধি জানিত ভগবান্ জানেন; কিন্তু সে আসিয়া দু'টা কথা কহিলেই শরতের মা, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত কাতরতা ভুলিয়া যাইতেন। প্রভা যখন তাঁহার নিকটে থাকিত, তখন পরিচারিকাগণ পতিবিয়োগ-বিধুরার সম্মুখে আহার সামগ্রী রাখিয়া যাইত; প্রভার কথা শুনিতে শুনিতে তিনি শোকতাপ ভুলিয়া তাহা আহার করিতেন। কখনও তাহার রক্তবর্ণ করতল পাতিয়া, আহার সামগ্রীর মধ্যে কোনও দ্রব্য প্রার্থনা করিয়া, প্রভা নিজে আহার করিত। প্রভা, শরতের পুস্তকাগারে প্রবেশলাভ করিয়া, পুস্তকগুলি অতিযত্নে, কখন বা বিমল বস্ত্রাঞ্চলটি মলিন করিয়া পরিষ্কৃত করিত। চিকিৎসা-ঘটিত যন্ত্র ও অস্ত্রগুলি প্রভার যত্নে, শরতের অনুপস্থিত অবস্থাতেও কিছুমাত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, পরিচারিকাগণ মনে করিত, "এ কেমন মেয়ে?"

৫

আরও পাঁচটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে শরতের একটী পুত্র হইয়াছে। শরৎ চেষ্টা করিয়া, গোবর্দ্ধনের একটি ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু যাহাদের নিকট গোবর্দ্ধন চাকুরি করিত তাহারা বড় বদ্ লোক, তাহারা গোবর্দ্ধনের নিষ্কলঙ্ক নামে মিথ্যা তহবিল তস্রুপাতের অপবাদ দিয়াছিল। তাই গোবর্দ্ধন রাগ করিয়া, চাকুরি ছাড়িয়া শরতের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শরতের মা শরতের যে পুত্রটীকে কোলে করিয়া স্বামীর শোক ভুলিয়াছিলেন, সে এখন দুই বৎসরের শিশু। তাহার অর্দ্ধস্ফুট কথাগুলির সুগভীর অর্থ সকল তাহার "ঠাকু" ছাড়া আর কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিত না। সে যদি বলিত, 'মা না না,' তিনি বলিতেন, ওর মার কাছে যাবে না, তাই 'মা না না' বলিতেছে। সে যদি বলিত "দ দ দা," তিনি বলিতেন, ও শুইবে তাই বিছানা পাতিয়া দিতে বলিতেছে। এ হেন সুবক্তা শিশুর নাম কেন যে "বোকা" হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশেষ অনুসন্ধানেও অবগত হইতে পারি নাই।

বোকাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, ভামিনী নিশ্চিন্ত ছিল। রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া, এবং তজ্জন্য দিবাভাগে নিদ্রিত থাকিয়া, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিয়া ভামিনীর দিনগুলি বড় সুখে অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু বোধ হয় আমাদের "বড় সুখে" এই কথাটা বলা ঠিক হয়

নাই। বাগানের প্রস্তর মঞ্চের উপর ভামিনীর নিকটে বসিয়া আশ্রয়দাতার দোষ সংশোধনে অভিলাষী হইয়া গোবর্দ্ধন ভামিনীর কানে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল তাহার তীব্র জালা সে দিন রাত অনুভব করিতেছিল। গোবর্দ্ধন বলিয়াছিল যে, সে তাহার কোনও বন্ধুর নিকট শরতের প্রভাঘটিত কলঙ্কের কথা শুনিয়া আসিয়াছে। শুনিয়া ভামিনী রোষরক্ত লোচনে, স্বামীর নিকট যাইয়া, তাহাকে প্রভার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল। শরতও হাসিয়া বলিয়াছিল, "না না, আর আমি প্রভার সহিত কথা কহিব না; ভামিনি! তুমি রাগ করিও না।" ইহাতেও কিন্তু ভামিনীর বিষজ্বালা নিবারিত হয় নাই। হিংসা-হলাহলে সে বরবরণীয়া কমনীয়দেহা কামিনীর দেহাভ্যন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

একদিন রাত্রে প্রভাদের বড় বিপদ্ ঘটিয়াছিল। তাহার এক ভ্রাতা বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনের দুঃখে আত্মনাশের অভিপ্রায়ে আপিং খাইয়াছিল। রাত্র দশ ঘটিকার সময় প্রভার মা কাতরস্বরে প্রভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভা, মা আমার, তুমি তোমার শরৎ দাদাকে ডাকিয়া আন; দেখিও কেহ যেন জানিতে না পারে, অত্যন্ত গোপনে ডাকিয়া লইয়া আসিতে হইবে।" কর্ত্তব্য-জ্ঞানময়ী-প্রভা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তুত হইল এবং একটি পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া, ভাড়াটিয়া গাড়ি চড়িয়া ভবানীপুর অভিমুখে যাত্রা করিল। প্রভা অন্দর মহলে প্রবেশ না করিয়া, পাঠগৃহে তাহার শরৎ দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এবং অনুচ্চ ভাষায় তাহাকে সমস্ত বিষয় অবগত করিল। শুনিয়া, শরৎ অবিলম্বে কয়েকটি ঔষধ ও যন্ত্র একটি চর্ম্ম-পেটিকার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, প্রভায়ই গাড়িতে চড়িয়া প্রভার সহিত তাহাদের বাটীতে চলিয়া গেল।

শরতের পাঠগৃহের পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত কক্ষে, শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন মিত্র আহারান্তে, তাম্বুল-তামাকু সেবনপরায়ণ হইয়া, নিমীলিত নেত্রে খট্টাঙ্গগত ছিলেন। ভাবিতেছিলেন যে, রঙ্গালয়ের প্রধান নটী "আমি তোমারই আমি তোমারই, আমি তোমারই হে রসময়" বলিয়া যে সুমধুর গানটি গাহিয়াছিল, ভামিনী যদি তাহা গাহিতে পারিত, তাহা হইলে, তাহা গাহিবার জন্য তিনি তাহাকে অনুরোধ করিতেন। ভামিনী তাঁহার অনুরোধক্রমে বাগানের মঞ্চে বসিয়া একদিন রাত্রে যখন গান গাহিয়াছিল, তখন চন্দ্রালোকে—আ মরি! মরি! তাহার মুখশ্রী কি অপূর্ব্বই হইয়াছিল! তাঁহার মূর্খ, অসভ্য, বর্ব্বর পিতা এহেন রত্নকে পুত্রবধূরূপে কেন গৃহে আনয়ন করে নাই?

গোব্‌রা বাবু যখন নিমীলিত নেত্রে জাগ্রৎ থাকিয়া, এহেন সুখস্বপ্ন অবলোকন করিতেছিলেন, তখন পাশের ঘরে, প্রভার হাতের চুড়ি—টুন্, টুন্, টুন্—বড় মধুর বাজিয়া-গোবর্দ্ধনের শিক্ষিত কর্ণ, শব্দের মধুরতা হইতে অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, যাহার হস্ত সঞ্চালনে এ মধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইয়াছিল, সে যুবতী ও সুন্দরী, তথাপি ভামিনী নহে। তত রাত্রে, শরতের পাঠগৃহে ভামিনী ব্যতীত অন্য কোন্ যুবতীর শুভ সমাগম হইল, তাহা জানিবার জন্য গোবর্দ্ধন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল,—পড়িবারই কথা! সে তাহার দৃষ্টিটি সূচ্যগ্রের ন্যায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করিয়া, দ্বারের সূক্ষ্ম-ছিদ্রপথে তাহা প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং একটি নিগূঢ় তথ্য অবগত হইয়া, তাহা ভামিনীকে অবগত করিবার জন্য, গোপনে সে তাহার অনুসন্ধান করিল। ভামিনী দ্বারান্তর দিয়া

গোবরের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল;—হিংসা! তুমি হিংসা! তুমি রাক্ষসী হিংসা! তুমি সব পার। গোবরে নলিনীর বিকাশ অসম্ভব হইলেও, ভামিনীর বিকাশ তুমি আজ সম্ভবপর করিলে!

গোবর্দ্ধনের শয়নকক্ষে থাকিয়া, দ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে, ভামিনী দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। হিংসানরকাগ্নির ধূম লাগিয়া সে দৃষ্টি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রভা যখন তাহাদের বিপদের কথা বলিতেছিল, ভামিনীর চক্ষে তখন তাহা প্রেমসম্ভাষণ বলিয়া অনুমিত হইতেছিল। শরৎ যখন চর্ম্মপেটিকায় চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও যন্ত্রাদি রাখিতেছিল, ভামিনী তখন মনে করিয়াছিল বুঝি প্রেম-উপহার-জন্য অলঙ্কার দ্বারা পেটিকা পূর্ণ হইল। অত্যন্ত ক্রোধে ভামিনীর সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

ক্রোধ অপেক্ষা আর একটা দুষ্ট রিপু আসিয়া, গোবর্দ্ধনকেও বড় প্রকম্পিত করিয়াছিল। সে মুগ্ধ হইয়া ভামিনীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল, "দেখ।" ভামিনী দেখিল, একটা ভাড়াটিয়া গাড়িতে চড়িয়া, তাহার স্বামী অভিসারিকা প্রভাকে লইয়া প্রস্থান করিল। দেখিয়া, সে গোবর্দ্ধনের কলঙ্কিত স্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে ভুলিয়া গেল। তাহার কমনীয় গণ্ড রোষ-রক্তে আরক্ত করিয়া, বিশাল বিলোল চক্ষু দু'টিতে প্রতিহিংসার তীব্র আগুন পূরিয়া লাবণ্যাধার অলঙ্কারখচিত বাহুটি গোবর্দ্ধনের স্কন্ধের উপর প্রসারিত করিয়া, সে কাতর-স্বরে গোবর্দ্ধনের সহানুভূতি প্রার্থনা করিল। গোবর্দ্ধন—অশিক্ষিত পাপিষ্ঠ গোবর্দ্ধন—নিভৃতে, আপন শয্যাগৃহে যৌবনালোকে জাজ্বল্যমানা, মনোমোহিনীগণের অগ্রগণ্যা সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়াছিল;—সে জানিত বিবাহকালে অর্থহীনা না হইলে ভামিনী তাহারই হইত;—ইহা জানিয়া, দেখিয়াছিল। সে তাহার প্রকম্পিত হৃদয়ের সমস্ত পাপ, ক্রোধোন্মত্তার চরণতলে ঢালিয়া দিল।

যে হিংসার আগুনে হৃদয়স্থিত স্বামি-দেবতার মূর্ত্তিটি অঙ্গারময় করিয়াছিল, তাহারই প্রভায়, ভামিনীর চক্ষে, গোবর্দ্ধনের পাপ-মূর্ত্তি আলোকিত হইয়া উঠিল। সে তাহার মুখের দিকে, বিস্মিতার ন্যায় চাহিয়া রহিল। গোবর্দ্ধন সাহস পাইয়া বলিল, "ভা……।"

* * * *

লেখনি! অবশ হইও না। ভয়ানক পাপের অতি ভয়ানক পরিণাম কীর্ত্তন কর।

৬

রোগীকে মৃত্যুর আসন্নগ্রাস হইতে ফিরাইয়া, এবং একটি উদ্বেগপূর্ণ ও অনিদ্র নিশীথের পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া, নিশাশেষে শরচ্চন্দ্র আপন শয়ন-গৃহে ফিরিয়া আসিল। আপনার ক্লান্ত দেহটি একটি শান্তিময়ীর প্রেমপূর্ণ ক্রোড়ে সমর্পণ করিবার লালসায়, প্রিয়তমা ভামিনীর উদ্দেশে সে গৃহ মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল এবং তথায় তাহার সুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, নিকটবর্ত্তী এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা সব কোথায়?" দাসী ভামিনীর সন্ধানে ফিরিল। কিন্তু সে কোথায় তাহার সন্ধান পাইবে? সে হতভাগিনী তখন পশ্চিমাভিমুখ বাষ্পীয় শকটের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে শয়ন করিয়া, প্রভাতের সুশীতল সমীরণ ও সুমধুর সুষুপ্তি কর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছিল। আর গোবর্দ্ধন তাহার ললিত ললামভূত এবং ততোধিক কলঙ্কিত দেহের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার বহুমূল্য অলঙ্কারপরিপূর্ণ বাক্সটি রক্ষা করিতেছিল।

শরৎ শান্তির আশায় ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিয়াছিল; হায়! কোথায় শান্তি? তাহার শান্তিকল্পলতিকা, প্রাণাধিকা ভামিনী

কোথায়? প্রথমে দাসীরা, তৎপরে শরতের মাতাঠাকুরাণী বধূমাতার উদ্দেশে বৃহৎ বাড়ীর প্রত্যেক কক্ষটি, পুষ্পবাটিকার প্রত্যেক বৃক্ষতলটি অনুসন্ধান করিলেন। হায়! কোথায় ভামিনী? জ্ঞানগরিমাময় সুন্দর ললাট-পটে দুশ্চিন্তার কৃষ্ণতরঙ্গ অঙ্কিত করিয়া, শতদল চক্ষু দু'টি, প্রভাতশিশির-সিঞ্চিত শতদলের শোভায় শোভিত করিয়া, শত-অনুসন্ধানে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, শরৎ গৃহে প্রত্যাগত হইল। কোথায় ভামিনী? হায়! পাপিষ্ঠা, এই গৃহ,—গৃহ-দেবতা, দেবতার অধিক স্নেহময় এই স্বামি-দেবতাকে ছাড়িয়া তুই কোথায় গেলি? কেন গেলি? শরতের শিশুপুত্র 'বোকা' অন্যদিন কখনও তাহার মাতার অনুসন্ধান করে নাই; ঠাকুরমার স্নেহাচ্ছাদিত নিরাবিল কোলটিতে বসিয়া, পদ্মকোরকের মত ক্ষুদ্র হাতটি নাড়িয়া কখন বালিসের উপর উপবিষ্ট পারাবতটিকে, কখন আকাশের চাঁদকে ডাকিত। আজ তাহার ঠাকুরমার মুখটি বিষাদমলিন দেখিয়া এবং সারাদিন পিতার আদরলাভে বঞ্চিত থাকিয়া, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। সে ঊর্দ্ধ মুখে ডাকিল, 'মা, মা।' ঠাকুরমার অঞ্চল টানিয়া ডাকিল "মা, মা।" বক্ষ ও গণ্ড চক্ষের জলে প্লাবিত করিয়া ডাকিল, "মা, মা।" পাষাণি! পাষাণি! এ সোণার চাঁদকে পরিত্যাগ করিয়া তুই কোথায় গেলি?

ভামিনীর সহিত ভামিনীর অলঙ্কারের বাক্স ও গোবর্দ্ধনের অন্তর্ধান সপ্রমাণিত হওয়ায়, শরতের বুদ্ধিমতী মাতা, ভামিনীর পলায়নের নির্লজ্জ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না। লোকলজ্জায় তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ম্রিয়মাণ রহিলেন। বোকাকে ক্রোড়ে করিয়াও তিনি শান্তি অনুভব করিতে পারিলেন না। শরতের বুকে যে শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অসহ্য যন্ত্রণা অহরহ চিকিৎসা চর্চ্চার দ্বারা নিবারিত হইল না। তাহার সুনিপুণ পারদর্শিতায়, ক্লান্তিহীন শুশ্রূষায় কলিকাতার সহস্র সহস্র রোগী নিরাময় হইত, তাহার জয়গানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, কিন্তু তাহার আপন হৃদয়ের ব্যথা কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। হায়! কি দোষে ভামিনী তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার প্রেমবন্ধনটি কোথায় শিথিল ছিল, প্রেমার্চ্চনায় কোথায় কি ত্রুটী ঘটিয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রভা, পরদুঃখকাতরা প্রভা নিত্য শরৎদের বাটীতে বেড়াইতে আসিত। কিন্তু তাহার শরৎ দাদার সহিত তাহার বড় একটা সাক্ষাৎ ঘটিত না;—শরৎ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় অনুপস্থিত থাকিত। প্রভা বোকাকে লইয়া বাগানে বেড়াইত। পাখিটির দিকে, ফুলটির দিকে, জলপ্রবাহিত ক্ষুদ্র তরণীটীর দিকে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অভাবটি পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। একদিন বোকা প্রভাকে দূরে দেখিয়া তাহার ঠাকুরমার কোল হইতে, "মা, মা" বলিয়া, প্রভার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল। আসিয়া তাহার কোলে উঠিয়া তাহার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; বুঝি সেই মুখে আর একটি পরিচিত মুখের অনুসন্ধান করিতেছিল। প্রভার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছিল; সে বাটীতে ফিরিয়া তাহার মাতাকে বলিল, "মা, বোকা আজ আমাকে 'মা' বলিয়াছে।" আর একদিন হঠাৎ তাহার শরৎ দাদার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রভা তাহাকে বলিয়াছিল, "শরৎ দাদা, মা তোমাকে আমাদের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছেন।" শরৎ বলিল, "কেন প্রভা? তোমাদের বাড়িতে কি কাহারও অসুখ হইয়াছে?"

প্রভা। না কাহারও অসুখ হয় নাই; এমনই যাইতে বলিয়াছেন।

শরৎ। তুমি ত জান প্রভা, আমার অবসর নাই।

প্রভা। শরৎ দাদা, তুমি অত বেশী পরিশ্রম করিও না; অসুখ হইবে।

শরৎ। অসুখের আর বাকি কি?

শেষ কথাটি শরৎ অত্যন্ত কাতরতার সহিত উচ্চারণ করিয়াছিল। শুনিয়া প্রভার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; সে আর কথা কহিতে সমর্থ হয় নাই। যে জলভারে তাহার চক্ষুদুটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নির্জ্জনে আসিয়া তাহা বর্ষণ করিল।

৭

অনুমান-অতীত অতীতের ঘন তমঃ-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট পৃষ্ঠা পাঠের জন্য যদি তোমাদের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে একবার 'যাযমৌ' নামক স্থানের, বহু-ইষ্টকখণ্ড মিশ্রিত অতি বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ পরিদর্শন করিও। কথিত আছে, এই স্তূপটি পুরাণোক্ত মহারাজ যযাতির রাজভবনের ভগ্নাবশেষ। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর নামক যে পুরাতন নগরটি বহুবাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হইয়াছে, তাহার দুইক্রোশ পূর্ব্বে 'যাযমৌ'এর স্তূপ গঙ্গাতীরে, অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত; তাহার উত্তর পাদমূল গঙ্গাজলে বিধৌত। এই বৃহৎ স্তূপের উপর মুসলমান বাদসাহদিগের মধ্যে কি জানি কে দুই তিনটি ক্ষুদ্র গৃহ ও একটি মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মসজিদটি ভগ্নাবস্থায় এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহগুলি এখনও মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত নহে।

এই গৃহ সকলের মধ্যে একটি গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া ভামিনী, নিম্নভূমিব্যাপী কার্পাস ক্ষেত্র সকল অবলোকন করিতেছিল। গোবর্দ্ধন তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "ছাদে দাঁড়াইয়া, হাওয়া খাইলে চলিবে না, মহারাজিন্ চলিয়া গিয়াছে, রশুই করিতে হইবে।"

ভামিনী। আমি তোমাকে আগেইত বলিয়াছি যে আমি রান্না জানি না।

গোবর্দ্ধন। তবে কি আমরা উপবাস করিব?

ভামিনী। তা আমি কি জানি?

গোবর্দ্ধন। উপবাস করিতে হয় তুমি করিও। আমি কানপুর যাইতেছি; তথায় আশাকুঠিতে আহার করিব।

ভামিনী। বেশ। তোমার পকেটে যে সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহা আমাকে দাও, আমি পড়িব।

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল। ভামিনী ছাদে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। একটি বৎসর সে স্বদেশের কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই। গোবর্দ্ধন যদি কখনও কানপুর হইতে সংবাদ পত্র ক্রয় করিয়া আনিত, ভামিনী আগ্রহের সহিত তাহার প্রত্যেক পংক্তিটি পাঠ করিত। আজ সংবাদ পত্রের কয়েকটি পংক্তি সে বার বার আবৃত্তি করিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"নববর্ষ উপলক্ষে, এবার যাঁহারা রাজ-সম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভবানীপুরের সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ অপেক্ষা, আর কাহাকেও আমাদের যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যথার্থই গুণের সম্মান করিয়াছেন।"

এ সংবাদটি ভামিনী বার বার পাঠ করিল, কিন্তু আহ্লাদ করিতে পারিল না। শরতের সম্মানে আহ্লাদিত হইবার অধিকার

তাহার আর ছিল না। যাহার নির্ম্মল বংশে সে অপমান আনিয়াছিল, যাহার অপরিমেয় অযাচিত প্রেম সে অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহার সম্মানে ভামিনীর আহ্লাদিত হইবার অধিকার ছিল না। তবে ভামিনী তুমি ক্রন্দন কর! কিন্তু না; ভামিনী তাহাও পারিল না। সে পাপের কালী অশ্রুসিঞ্চনে ধৌত করিবার অবসর ভগবান্ তাহাকে দেন নাই।

রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া, ভামিনী ছাদ হইতে গৃহমধ্যে নামিয়া আসিল। সে মলিন গৃহ। রমানাথ দত্তের কন্যা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, এইরূপ কদর্য্য গৃহে সে কখন অবস্থিতি করিবে। সেই কদর্য্য মলিন গৃহ সেই দিন পরিষ্কৃত হয় নাই, তাহাতে ক্ষুদ্র সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। ভামিনী দাসীর সন্ধান করিল। সে নিম্নতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। ভামিনী তাহাকে আদর করিয়া ডাকিল, "মাহারি!" সে বলিল, "কেন মা!"

ভামিনী। কেন কাঁদিতেছ?

দাসী। বাবু আমার গায়ে হাত দিয়াছিল এবং মন্দ কথা বলিয়াছিল।

ভামিনী। কখন?

দাসী। এক ঘণ্টা আগে, যখন বাহিরে যাইতেছিল।

ভামিনী। তবে তুইও চলিয়া যা'। মহারাজিন্ চলিয়া গিয়াছে। তুইও যা'।

দাসী। মহারাজিন্ চলিয়া যায় নাই; বাবু তাহাকে কানপুরে, গুরুপ্রসাদের শিবালয়ে কুঠারি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে। তোমার বাক্স হইতে অলঙ্কার লইয়া তাহাকে দিয়াছে।

এ শুভ সংবাদ শ্রবণের পর, রাত্রে ভামিনীর আহারের আবশ্যক হয় নাই। বিধাতার একটা বিধান আছে বলিয়া, সে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল; নতুবা ভামিনী সে রাত্রি প্রভাতের কামনা করে নাই।

বেলা এক প্রহরের সময় গোবর্দ্ধন গৃহে প্রত্যাগত হইল। নিশীথের আনন্দ তখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই, তাহার চরণ ধরিয়া বড়ই টানাটানি করিতেছিল। গোবর্দ্ধন তাহার পদদ্বয় কোন ক্রমে স্থির রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সে আনন্দের সৌরভে বিভোর হইয়া, মক্ষিকাসকল তাহার অধরোষ্ঠে বার বার চুম্বন করিতেছিল, দেখিয়া, বিদ্যুৎ প্রজ্বলিত তাম্রতারের ন্যায়, ভামিনীর শরীরের প্রত্যেক শিরাটি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তাহার বরদেহ উন্নত করিয়া, বিদ্যুৎ তরঙ্গতুল্য বাহুটি প্রসারিত করিয়া বলিল, "যাও, এখনই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও।" গোবর্দ্ধন সে গৃহে থাকিবার জন্য আসে নাই। গৃহে ফিরিবার তাহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভামিনী যে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে, ইহা তাহার সহ্য হইল না। সে অকথ্য ভাষায় ভামিনীকে গালি দিল। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। তাহারই পিতার অন্নে যাহার দেহ পুষ্ট হইয়াছিল, যাহার পাপ হৃদয়ে বহন করিয়া সে কলঙ্কিণী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, যে তাহারই অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থে পাপের নূতন পথ পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার এই মহা স্পর্দ্ধা ভামিনী সহ্য করিতে পারিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গোবর্দ্ধনের অর্দ্ধশায়িত দেহে পদাঘাত করিল। সুরাপানে বিকৃত-মস্তক গোবর্দ্ধন জ্ঞানশূন্য হইয়া, সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ড সহসা গ্রহণ করিয়া, ভামিনীর মস্তকে গুরুতর প্রহার করিল। অসহায়া ভামিনী প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিল। নির্দ্দয়, পাপিষ্ঠ, মনুষ্যনামের অযোগ্য গোবর্দ্ধন সে চীৎকার নীরব করিবার অভিপ্রায়ে ভামিনীর রক্তস্নাত

মুখে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা বার বার প্রহার করিল। ভামিনীর রক্তাক্ত দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল; বেদনার অব্যক্ত ধ্বনি নীরব হইল।

ভীত গোবর্দ্ধন চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথায় নাই; মাহারী জল আনয়ন জন্য গঙ্গাতীরে গিয়াছিল। রক্তবিন্দুময় বসন খানি পরিবর্ত্তন করিয়া, এবং অলঙ্কারের বাক্সটি লইয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কোথায় গেল কে জানে?

৮

ভামিনী কিন্তু মরে নাই। বারংবার মৃত্যু যন্ত্রণা উপভোগ করাইবার জন্য, বিধাতা তাহার জীবনটি রক্ষা করিলেন। মাহারী জল লইয়া, গৃহে ফিরিয়া দেখিল একটি কক্ষমধ্যে রক্তাক্ত দেহে ভামিনী অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া কাতরোক্তি করিতেছে। সে ভামিনীর মুখে জল দিল এবং জল ঢালিয়া ক্ষত স্থান সকল ধৌত করিয়া দিল। দেখিল, সম্মুখের তিনটি দাঁত ভগ্ন হইয়াছে এবং মস্তকে এবং মুখের দুই তিন স্থানে ক্ষত হইয়াছে; ক্ষত সাংঘাতিক। সে ভামিনীর এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু ভামিনী তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। মাহারী বহির্গমনের পূর্ব্বে গোবর্দ্ধনের গৃহ প্রত্যাগমন দেখিয়া যায় নাই।

দাসী তপ্ত দুগ্ধ লইয়া আসিলে, ভামিনী তাহা কষ্টে পান করিল। এবং কিছু বল পাইয়া, বিছানায় উঠিয়া শুইল। বিছানায় শুইয়া, গণ্ডের ক্ষত সকল, লবণাক্ত অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া, রক্তমিশ্রিত অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিয়া সে রোদন করিল। কর ভামিনি! ক্রন্দন কর। ক্রন্দন ছাড়া তোমার আর অন্য গতি নাই। গোবর্দ্ধন-শূকর তোমাকে কি দিয়াছিল যে তুমি তাহার জন্য, রাজার ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বগুণময় সর্ব্বসুখদাতা স্বামী, তাঁহার অতুল প্রেম, এবং আপনার সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে? হায়! কি স্নেহের কামনায়, তুমি পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া "বোকা'কে ত্যাগ করিলে? তুমি পাপিষ্ঠা। অক্ষয়, অব্যয় স্বর্গ ত্যাগ করিয়া, কেন এ নরকের পথে ভ্রমণ করিতে আসিলে? দেবভোগ্যা হইয়া কেন নরকের কীট কর্ত্তৃক সেবিতা হইলে?

কয়েক দিন কষ্ট উপভোগ করিয়া ভামিনী শয্যাত্যাগ করিল। কিন্তু রন্ধন অভাবে, সামান্য মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ ছাড়া সে অন্য কিছু আহার করিতে পারিল না। মাহারী তাহাকে রন্ধন কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিল। বলা বাহুল্য, সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কিন্তু অভাব বড় চমৎকার জিনিষ; তাহার মত শিক্ষা দিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সে রমানাথ দত্তের কন্যাকেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, 'রাঁধুনি' করিয়া তুলিল। ভামিনী আপনার জন্য ও একমাত্র মাহারীর জন্য সামান্য আহারদ্রব্য আপনই রন্ধন করিতে শিখিল।

ভামিনী রন্ধন শিখিল, কিন্তু কি রন্ধন করিবে? খাদ্যদ্রব্য ক্রয় জন্য অর্থ এবং অর্থ-সংগ্রহ জন্য অলঙ্কার যে বাক্সে থাকিত, গোবর্দ্ধন পলায়নের সময় তাহা লইয়া গিয়াছিল। কয়েক মাসের বাটীভাড়া বাকি পড়িয়াছিল, তাহার পরিশোধ জন্য অর্থের একান্ত আবশ্যক হইল। ভামিনী তাহার বাম হাতে একগাছি মাত্র চুড়ি রাখিয়া, বাকী সমুদয় চুড়ি মাহারীকে খুলিয়া দিল। মাহারী কানপুরের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া ভামিনীকে চারি শত টাকা আনিয়া দিল। এই চুড়ি ছাড়া ভামিনীর অঙ্গে তৎকালে আর কোনও অলঙ্কার ছিল না। ইহার পর অর্থসংগ্রহের তাহার আর কোনও উপায় ছিল না।

বাটী ভাড়া পরিশোধ করিয়া এবং এক

মাসের উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েক খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিয়া, অবশিষ্ট তিন শত টাকা, ভামিনী একটি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। এক দিন গভীর রাত্রে কে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিল। ভামিনী অত্যন্ত ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মাহারী"। মাহারী পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে রজ্জু-বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "চোর আমাকে বন্ধন করিয়াছে; নড়িবার সাধ্য নাই।" চোর, তিন শত টাকা, ভামিনীর বাম হাতের সেই অবশিষ্ট এক গাছি মাত্র চুড়ি লইয়া, এবং ভামিনীর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য, তাহার হস্তস্থিত ছোরার দ্বারা ভামিনীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি সমূলে ছিন্ন করিয়া, পলায়ন করিল। মূর্চ্ছিতা ভামিনী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। দন্তহীনা, অঙ্গুলিহীনা, সহায়হীনা, ধর্ম্মহীনা পাপিষ্ঠা পড়িয়া রহিল। ছিন্ন অঙ্গুলি-প্রবাহিত রক্তে তাহার বসন সিক্ত হইল।

প্রভাতে জ্ঞানলাভ করিয়া, ভামিনী বহু কষ্টে মাহারীকে বন্ধন মুক্ত করিল।

ঋণকৃত অর্থে সংগৃহীত এবং সঞ্চিত খাদ্যে, আবার কয়েকটি মাস অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। কিন্তু কয়েক মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়ায় এবং বাড়ীওয়ালা মুসলমানের অতি জঘন্য প্রস্তাব ভামিনী অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করায়, বাড়ীওয়ালা তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। এইরূপে ভামিনীর পাপ জীবনের দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইল। এইরূপে, রমানাথ দত্তের কন্যা, রায় শরচ্চন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের বনিতা গৃহহীনা হইয়া, সামান্যা কাঙ্গালিনীর ন্যায় সংসারের পথে দাঁড়াইল। আর নয়, ভগবন্, আর নয়; পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা কর। হে কলঙ্কভঞ্জন! এ নিরাশ্রয়া কলঙ্কিণীকে আশ্রয় দাও।

৯

কানপুর নগরে কালেক্টার গঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়া, অনেকগুলি বাটী ভস্মসাৎ হইয়াছিল, এবং কয়েকটি লোকের প্রাণনষ্ট হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া, শরচ্চন্দ্রের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সন্দেহের নিরাকরণ জন্য শরৎ কানপুরে আসিয়াছিল। শরৎ তথায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল।

তথায় ভামিনী সম্বন্ধে শরৎ অনেক কথা জানিতে পারিল। যাদু মৌএর বাটী হইতে বিতাড়িত হইয়া, ম্যাসাকার ঘাটের নিকট একটি বৃক্ষতলে, সে দুই দিন অনাহারে পড়িয়াছিল। তদ্দেশীয় একটি দরিদ্র বৃদ্ধা করুণাপরবশ হইয়া, তাহাকে আপন কুটীরে লইয়া, আশ্রয় দিয়াছিল। তথায় সে কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল; তাহার আশ্রয়দাত্রী তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিল। কিন্তু সে মরিল না; কেবল মাত্র তাহার একটি চক্ষু বিকৃত ও দৃষ্টিহীন হইল। এবং বসন্ত তাহার আক্রমণের চিহ্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া দিল। আরোগ্য লাভ করিয়া, সে কালেক্টারগঞ্জে একটি বাঙ্গালীর বাড়ীতে আশ্রয় পাইল; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে অগ্নিদাহে সে বাটী ভস্মসাৎ হইয়া গেল। ভস্মস্তূপের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। তাহা সনাক্ত করিয়া গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে, উহা ভবানীপুর নিবাসী ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষের পত্নী ভামিনীর মৃতদেহ।

শুনিয়া, অশ্রুধারায় শরতের চক্ষু ভাসিয়া গেল। সেই ভামিনীর এই পরিণাম। হায় বিধাতঃ! যে ভামিনীর এ দুর্দ্দশা করিয়াছে,

তোমার চক্র কেন তাহাকে এতদিন নিষ্পেষিত করে নাই?

শরৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ভবানীপুর ফিরিল। তথায় একটি নূতন বিপদ্ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; শরতের মাতা ঠাকুরাণী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখময় জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল। শরতের শত শুশ্রূষা, বোকার করুণ ক্রন্দন তাঁহাকে মরণের পথ হইতে কিছুতে ফিরাইতে পারিল না।

মাতার মৃত্যুর পর, শরৎ বোকাকে লইয়া দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিল। এই পরিভ্রমণ তাহার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হইয়াছিল। এক বৎসরকাল নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নানা দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া তাহার মানসিক গ্লানি বিদূরিত হইয়াছিল। কতকটা প্রফুল্লতা এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া, এক বৎসর পরে, সে আবার ভবানীপুরে প্রত্যাগত হইল। রোগী এবং রোগিগণের অভিভাবক কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সে আবার চিকিৎসা কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। প্রভা আসিয়া বোকাকে কোলে লইল।

একদিন—সে দিন শরতের জন্মদিন—প্রভা সন্ধ্যাকালে বোকাকে লইয়া, বাটীর পাশের বাগানে পরিভ্রমণ করিতেছিল। এমন সময়ে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক কোথা হইতে তথায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল। প্রভা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, সে মাতাপিতৃহীনা এক দরিদ্রা কায়স্থ কন্যা; স্বামী নিরুদ্দেশ, তাই দাসীবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে; আজ দাসীকার্য্যের প্রার্থনায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। প্রভা বলিল, "এ গৃহ আমার নহে, আমি আগন্তুক মাত্র। যিনি এ গৃহের কর্ত্তা, চিকিৎসাকার্য্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। তিনি প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে তোমার কথা বলিও; আবশ্যক হইলে তোমাকে তিনি নিযুক্ত করিবেন।"

তোমরা এই বিকৃতনয়না, দন্তহীনা, বিবর্ণা দীনাকে ভাল করিয়া দেখ। দেখিয়া, আর কখন রূপের অহঙ্কার করিও না। ভগবানের ভাণ্ডারে যাহা কিছু কমনীয় ছিল, তাহার বোধ হয় সবটুকু ব্যয় করিয়া, তিনি ভামিনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন তাহা কোথায়? তোমরা কি এ দরিদ্রাকে চিনিতে পারিলে? কেমন করিয়া পারিবে? চিনিবার মত ত তাহার কিছু নাই। লোলজিহ্বা অগ্নি, তাহার কর্ণে এবং তাহার মস্তকের কতকটা কেশশূন্য স্থানে তাহার লেহনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, বসন্ত আপন অঙ্গানুলেন জন্য তাহার দেহের সমস্ত লাবণ্যটুকু চাঁচিয়া তুলিয়া লইয়াছিল, এবং আপনার চিত্রাদর্শের জন্য একটি নয়ন গ্রহণ করিয়াছিল? গোবর্দ্ধন-বানর সে দন্তমুক্তার আদর বুঝে নাই। চোর বুঝি, তাহার কনকদেহ সত্যই কনকনির্ম্মিত কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য একটী অঙ্গুলি কাটিয়া দেখিয়াছিল। হায়! রূপসী ভামিনী এক্ষণে রূপহীনা; রমানাথ দত্তের কন্যা অন্নহীনা! রূপহীনা, অন্নহীনা ভামিনী আপনারই গৃহদ্বারে দাসীপদপ্রার্থিনী।

ভামিনী পশ্চাৎ ফিরিয়া বোকাকে দেখিতেছিল। একটি চক্ষুতে যতটুকু জ্যোতিঃ ছিল, তাহার সবটুকু ব্যয় করিয়া সে পুত্রকে দেখিতেছিল। দেখিবার জন্যই একটী দগ্ধ কলেবর লইয়া, পদদ্বয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, অনাহার ও অনিদ্রাকে সঙ্গে লইয়া অপরিচিত পথে একটী বৎসরকাল বিচরণ করিয়া সে ভবানীপুর আসিয়াছিল। আসিয়া উন্মত্তার ন্যায় বাটীর চারিদিকে বার বার পরিভ্রমণ করিয়াছিল। তাহার পর, প্রভার সহিত আজ তাহাকে বাগানে দেখিয়া, জ্ঞানশূন্য

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। শারীরিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত থাকিয়া, প্রকাশিত হইবার সুদূর আশঙ্কা সে হৃদয়ে পোষণ করে নাই। বস্তুতঃ সুচতুরা প্রভাও তাহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই।

বাগানের অন্য প্রান্তদ্বারে শরতের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎ অবতরণ করিয়া প্রভাকে দেখিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। প্রভা বলিল, "আজ তোমার জন্মদিন।"

শরৎ। আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে কি দিবে প্রভা?

প্রভা। ইচ্ছা ত সব দিই, তুমি লও কই।

শরৎ। কি দিবে, দাও; লই কিনা দেখ।

প্রভা। লইবে?

শরৎ। লইব, দাও।

প্রভা বলিল, "বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তুমি এ দাসীকে বিবাহ করিবে, আজ শুভদিনে তাহাকে গ্রহণ কর।" বলিয়া শরতের চরণতলে মস্তক রক্ষা করিয়া, অশ্রু-ধারা ঢালিয়া প্রভা তাহা ধৌত করিয়া দিল। শরৎ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া, প্রভার হাত ধরিয়া তুলিল। বলিল, "শোন প্রভা, তুমি অপাত্রে প্রেম দিয়াছ।"

প্রভা। তুমি কিন্তু বলিয়াছ, গ্রহণ করিবে।

শরৎ। গ্রহণ করিব বলিয়াছি, গ্রহণ করিব; কিন্তু প্রভা, তোমাকে সুখী করিতে পারিব না।

যে দরিদ্রা নারী দাসী কার্য্যের জন্য প্রার্থিতা হইয়া প্রভার নিকট আসিয়াছিল, শরৎকে দেখিয়া প্রভা তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে একটা অস্ফুট শব্দে চমকিত হইয়া, প্রভা ও শরৎ উভয়েই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইয়াছিল।

১০

কুড়ি বৎসরের প্রভাকে শরৎ হিন্দুমতে বিবাহ করিল। কিন্তু ভবানীপুরের জন সাধারণ সে হিন্দুমতটা সবিশেষ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল না। না হউক, শরচ্চন্দ্রের জাতিনাশের আশঙ্কা ছিল না। সে প্রভাকে লইয়া আবার নূতন সংসার পাতিল।

ভামিনী কয়েক দিনের শুশ্রূষায় সুস্থ হইয়া দাসী কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মাতার স্নেহ লুক্কায়িত রাখিয়া দাসীর যত্নে বোকার রক্ষণাবেক্ষণ করিল। আপনার গৃহে দাসী হইয়া, সপত্নীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিল। যাহাকে স্বামীর উপপত্নী ভাবিয়া, সে বর্ণনাতীত পাপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকেই স্বামীর পত্নী ও গৃহকর্ত্রী দেখিয়া গৃহে অবস্থিতি করিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবার জন্য স্বামীর প্রতি কঠিন আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিল, আজ বিধাতার বিধানে অহোরহ তাহার সহিত স্বামীর প্রেমালাপ দেখিল। যথায় রত্নপ্রভায় আলোকিত হইয়া দেবীর ন্যায় ভামিনী পূজিতা হইয়াছিল, আজ সেই গৃহে কুক্কুরীর ন্যায় বিচরণ করিল।

অনলস প্রভা অদম্য উৎসাহে গৃহস্থলী আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার মৃদু শাসনে সমস্ত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইল। তাহার দৃষ্টিপাতে গৃহসামগ্রী সকল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরতের বস্ত্র ও পুস্তকাদি এ নবীনাকে পাইয়া নবীন শ্রী ধারণ করিল। বাগানের বৃক্ষসকল তাহার আদরে পুষ্পিত হইয়া উঠিল। আবর্জ্জনারা খট্টাঙ্গতল ও গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া, পুষ্পিত বৃক্ষের পাদবন্দনায় নিযুক্ত রহিল।

প্রভার প্রফুল্লতা সমস্ত সংসারটিকে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা মাতৃহীন বোকার চিরমলিন মুখখানিকে উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইল না। পাঁচ বৎসরের বালক বুঝি মাতার কলঙ্কের কথা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া বুঝি কলঙ্কের কালীতে আপনার মুখখানি মলিন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভার সমস্ত যত্ন, সমস্ত আদর বৃথা হইল; সে কোনও ক্রমে বোকাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না। অবশেষে, তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, বোকার কোন আভ্যন্তরিক রোগ জন্মিয়াছে। প্রভা যখন তাহার সন্দেহের কথা শরৎকে বলিতেছিল, ভামিনী তখন কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতেছিল। শরৎ কক্ষের বাহিরে তাহাকে দেখিয়া আদেশ করিল, "ঝি, বোকাকে এখনই আমার কাছে লইয়া আইস।"

বোকাকে কোলে লইয়া, ভামিনী, অল্প সময় মধ্যে, কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইল। শরৎ, প্রভার বাম হস্তখানি আপন ক্রোড়ের উপর লইয়া, তাহার অঙ্গুলিগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। বোকা, প্রভার ক্রোড়ের নিকট দাঁড়াইল। শরৎ প্রভার হস্ত ত্যাগ করিয়া, বোকার ললাট স্পর্শ করিল; এবং তাহার পর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য, বোকার যে এখন জ্বর রহিয়াছে।" প্রভা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল এবং কিছু বিরক্তির সহিত ভামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঝি, বোকার জ্বর হইল কেন? রৌদ্রে লইয়া যাও নাই ত? আর জ্বর হইয়াছে, তাহা আমাকে বল নাই কেন?" বলিয়া, প্রভা বোকাকে বুকে তুলিয়া লইল এবং আপন অঞ্চল দ্বারা তাহার জানুর অনাবৃত অংশ টুকু আবৃত করিল। শরৎ বলিল, "না উহাকে কোলে লইলে চলিবে না, বিছানায় শয়ন করাইতে হইবে; আমি উহার বুক পরীক্ষা করিব।

পার্শ্বের শয্যা-গৃহে লইয়া, প্রভা বোকাকে শয়ন করাইল। শরৎ, যন্ত্র দ্বারা বক্ষঃ পরীক্ষা করিল। আবার পরীক্ষা করিল। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিল। তাহার ললাটতলে মুক্তাসদৃশ অসংখ্য স্বেদবিন্দু শোভিত হইল। প্রভা ভীতনেত্রে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। আর ভামিনী?—সেও শয্যাগৃহদ্বারে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া, শরৎ বলিল, "ঝি, বেহারাকে আস্তাবলে খবর দিতে বল, আমি এখনই বাহিরে যাইব, শীঘ্র গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আনে।"

প্রভা। বাহিরে যাইবে কেন?

শরৎ। অন্য ডাক্তার—ওব্‌রায়ণকে আনিতে হইবে; আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রভা। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? রোগ কি শক্ত?

শরৎ কাঁদিয়া ফেলিল; প্রভার কথার উত্তর দিতে পারিল না। প্রভাও কাঁদিল; ভামিনী প্রত্যাগত হইয়া উভয়ের ক্রন্দন দেখিল। খাটের উপর শুইয়া বোকা বলিল, "বাবা, আমার কি অসুখ হইয়াছে?" প্রভা অতিকষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া বলিল, "ভয় কি বাবা? অসুখ শীঘ্র সারিয়া যাইবে?"

কলিকাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আসিয়া বোকার চিকিৎসা করিল। কিন্তু সে সারিবার রোগ নহে। বোকা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত রহিল।

ওরে ভামিনি! ওরে পাপিষ্ঠা! কর, সেবা কর! বুক দিয়া, প্রাণ দিয়া, মৃত্যুর মুখ হইতে বোকাকে আগুলিয়া রাখ্। বোকার

শয্যার পার্শ্বে ভামিনী দিবস যামিনী বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের বদ্ধ স্নেহরূপী বাঁধ ভাঙ্গিয়া, শতধারায় উছলিয়া পড়িল। আহার ত্যাগ করিয়া, নিদ্রাত্যাগ করিয়া সে বোকার শুশ্রূষা করিল। কেহ যদি বলিত যে, নর-রক্তের ঔষধে বোকা নিরাময় হইবে, তাহা হইলে ভামিনী প্রত্যহ তাহার শরীরের এক একটী শিরা কাটিয়া পুত্রকে তাহা পান করাইতে পারিত। তাহার শুশ্রূষা দেখিয়া, পুরবাসিনী সকলে অত্যন্ত চমৎকৃতা হইলেন।

একদিন প্রভা পথ্য প্রস্তুত জন্য গৃহান্তরে গিয়াছিল। ভামিনী একাকী বোকার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াছিল; তাহার দেব শিশুর ন্যায় সুন্দর মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া ছিল; তাহার অতি শীর্ণ হাতটি ধরিয়া, আপনার মহাপাপের প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতেছিল; বোকা অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "ঝি, তুমি আমার—এ মা নয়—আপনার মাকে দেখিয়াছ?" এমন সময়, শরৎ তথায় আসিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "আজ তুমি কেমন আছ, বোকা? ঝিকে কি বলিতেছিলে?" বোকা তাহার বিশাল এবং জলপূর্ণ চক্ষু দু'টীর দ্বারা তাহার পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "মার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। হ্যাঁ বাবা, আমি যখন মরে যা'ব, তখন মাকে দেখ্‌তে পাব ত? তখন মা আমায় আদর ক'র্‌বে?" অশ্রুপ্রবাহে শরতের চক্ষু দু'টী অন্ধ হইয়া গেল। ভামিনীর পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। শুনিলে, ভামিনি! তোমারই আদর পাইবার জন্য মৃত্যু-কালেও বোকা লালায়িত;—তুমি পাষাণী এ আদর হইতে কেন তাহাকে বঞ্চিত করিলে?

১১

যখন প্রভা শরতের অশ্রুজল, আপনার অশ্রুধারা দ্বারা বিধৌত করিয়া দিতেছিল, ভামিনী তখন বোকার জীবনহীন দেহ কোলে লইয়া স্থির নেত্রে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এই দুটী পল্লব অধর যখন মাতৃস্তনপানলালসায় বিশুষ্ক হইয়াছিল, তখন তুই কোথায় ছিলি? এই চিরনিমীলিত চক্ষু দু'টী অশ্রু পরিপূর্ণ করিয়া যখন সে তোর জন্য চারি দিকে অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তখন তুই পাপিয়সী কোথায় ছিলি? এই নিঃস্পন্দ ক্ষুদ্র বুকটি যখন তোর আদর-প্রতীক্ষায় স্পন্দিত হইত, তখন তুই পুত্র-ঘাতিনি কোথায় ছিলি?

দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য, দুইজন গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভামিনীকে বলিল, "মৃতদেহ কোল হইতে নামাইয়া দাও।" ভামিনী উত্তর করিল, না। সে তেমনি নিশ্চল হইয়া, সেই চিরনিদ্রিত নিধির, সেই প্রাণহীন প্রাণাধিক প্রাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহারা পুনরপি বলিল, "মৃতদেহ দাও।" ভামিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "না, না, লইয়া যাইও না, আরও একটু দেখিতে দাও।" আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, তাহারা বলে ভামিনীর ক্রোড় হইতে মৃতদেহ উঠাইয়া লইল। ভামিনী, অর্দ্ধোলঙ্গা স্খলিতকুন্তলা ভামিনী, উন্মত্তার ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সত্বর পদে গৃহ অতিক্রম করিয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। সেই পথের ধূলা অঞ্চলে মাখিয়া, ক্রন্দনের চীৎকারে পুরবাসিগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভামিনীও ছুটিল। তাহার পর অন্য দাসী গণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া রাস্তায় ধূলার উপর ছিন্নমুণ্ড ছাগশিশুর ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইল! দাসীগণ অতি কষ্টে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিল।

পুত্রশোকের নিদারুণ যন্ত্রণা কিছু প্রশমিত

হইলে, শরৎ নূতন ঝিয়ের কথা ভাবিল। এ দাসী কে? কি অক্লান্ত পরিশ্রমে, সে নিশিদিন বোকার সেবা করিয়াছিল? কি স্নেহাদরে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল? বাঙ্গালাদেশে দাসীশ্রেণী লোকের মধ্যে, এরূপ মমতা একান্ত বিরল না হইলেও, এ নূতন ঝি যাহা করিয়াছে, তাহা অন্য কোনও দাসীতে করিতে পারে না। প্রভাকে সম্বোধন করিয়া শরৎ বলিল, "প্রভা, এ দাসীর ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না; তথাপি সে যাহাতে জীবনে আর কখন অভাব ভোগ না করে, তাহা আমি করিব।"

প্রভা। সে দুই তিন দিন জ্বরে শয্যাগত। কিছুই আহার করিতেছে না। উমেশ ডাক্তার দেখিয়া ঔষধ দিয়াছিল, কিন্তু সে ঔষধ খায় নাই।

শরৎ। চল প্রভা, আমি নিজে তাহাকে দেখিব; ঔষধ খাওয়াইব।

সেই বৃহৎ অট্টালিকার যে অংশে দাসীরা বাস করিত, বহু বৎসর শরৎ সে অংশে পদার্পণ করে নাই। আজ তাহাকে সে অঞ্চলে অবলোকন করিয়া, দাসীরা আশ্চর্য্য ও বিব্রত হইল। প্রভা অগ্রগামিনী হইয়া, ভামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল। ভামিনী বিছানার উপর ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়াছিল। শরৎ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিবামাত্র, সে একবার মাত্র চীৎকার করিয়া রোদন করিল। পরক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইয়া বিছানায় পড়িল। মূর্চ্ছিতাকে পরীক্ষা করিয়া শরৎ প্রভাকে বলিল, "ইহার রোগ অত্যন্ত কঠিন, বোধ হয় এই রাত্রি শেষেই ইহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে।" প্রভা বলিল, "তথাপি তুমি ঔষধ দাও, আমি এখানে থাকিয়া, ইহার ঔষধ সেবন ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিব।"

তাহাই হইল। প্রভা রাত্রি জাগিয়া ভামিনীর শুশ্রূষা করিল। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত শরতের ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হইল না। রাত্রিশেষে পাপ ও দুঃখময় জীবনলীলার অভিনয় শেষ হইয়া গেল। মরণের ঘনকৃষ্ণ যবনিকা সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

সমাপ্ত

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আর কোন্ বিবেকী পুরুষ মানিয়া লইতে পারেন যে, বর্ত্তমান সভ্যজাতিরা অন্যান্য জাতির যে ভূমিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া সভ্যতার অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছেন, এগুলি তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি? ফলতঃ এইরূপ সভ্যতার আত্মম্ভরিতা নাম না দিলে কোন প্রকারে বিবেকের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না। পৃথিবীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতে যদি অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে বিরত হইয়া স্বার্থমূলিকা নীতিকেই হৃদয়ে রাখা যায়, তবে যে অবিলম্বেই উহা হইতে সুন্দ উপসুন্দ নীতির প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই মহামায়ার রাজ্যে যাহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব-শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের আত্মজ্ঞান কেবল নিজের উন্নত দেহে বা প্রণয়িণীর

কোমল অঙ্গে আবদ্ধ থাকিলে এইরূপ বিষম পরিণাম ঘটিবারই কথা। পক্ষান্তরে মানবের আত্মবুদ্ধি যত প্রসারিত হইতে থাকিবে, ততই উদারভাব আসিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতার সঙ্কোচ হইয়া উঠিবে। কেননা সর্ব্বভূতে আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারা কাহাকেও পর ভাবিতে পারিবে না।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রভাবে যদি ময়-দানবের নভঃস্থ অট্টালিকাও সত্যে পরিণত হয়, এবং উহাতে কেবল রূপ-যৌবন-সম্পন্না শ্বেত-সুন্দর ও শ্বেত-সুন্দরীরাই বিহার করিতে থাকে, অধিকন্তু দুষ্ট কৃষ্ণাঙ্গগুলা উহার চতুঃসীমায় যাইতেও না পায়, তথাপি অধ্যাত্মবাদের জীবনপ্রদ সুশীতল অনিল প্রবাহিত না হইলে কিছুতেই অনার্য্যভাবের উত্তাপ শান্ত হইবার নহে। দেখিতে পাই যতই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার নব নব আবিষ্কার হইতেছে, ততই মানুষ মারিবার অভিনব কৌশল আবির্ভূত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে তীরধনুর আশ্রয় লইয়া বহু আয়াসে শত্রুর প্রাণ সংহার করা যাইত, এক্ষণে তাড়িত যন্ত্র ও ডিনামাইট্ প্রভৃতির সাহায্যে অনায়াসে উহা সম্পন্ন হইতে পারে। যদি বুঝিতাম যে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন হইতে বিরত হইয়া আসিতেছে, তবে তাহার মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারা যাইত না। কিন্তু এইরূপ বিসদৃশ পরিণাম দেখিয়াও উহার প্রশংসা করা কোন প্রকারেই বিবেকের অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যখন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি কেবল হিতকর কার্য্যেরই সাহায্য করিতেছে না, উহা দ্বারা লোকের সর্ব্বনাশ বা শোণিত শোষণও হইতেছে; তখন তৎসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা কি প্রকারে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? তবে এ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, সাধু-প্রকৃতির লোকেরা কাহারও অনিষ্ট সাধনের জন্য উহার প্রয়োগ করেন না, উহা দ্বারা সমাজের হিতসাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান পৃথিবীতে সাধু প্রকৃতির লোক অতি অল্পসংখ্যক। আর যাঁহারা প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে অপর লোকের বা অপর জাতির বিলোপ-সাধন ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অথবা অপ্রতিবিধেয় বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াও আপনাদিগকে সাধু-প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদের কথা লইয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। ফলতঃ অনাদিকাল হইতে মানব-হৃদয়ে যে পাশবভাবের দুর্দ্দান্ত দৈত্য প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহাকে ব্রহ্মবিদ্যার জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই পৃথিবীতে শান্তির বিকাশ হইবে না—কিছুতেই মানব-সমাজ হইতে স্বার্থের ভীম গর্জ্জন থামিবে না।

ব্রহ্মবিদ্যার আনুগত্য স্বীকার না করিলে জড়বিজ্ঞান ও স্বার্থ-মূলিকা নীতি যে মনুষ্য-হৃদয়ের পাপগুলাকে দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে সাম্যভাবের অধিকারী ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণের হিতসাধনোপযোগী করিতে পারে না, ইহা নিরূপণ করা গেল; এক্ষণে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই যে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

দেখিতে পাই ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরেকে, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐগুলি সাম্প্রদায়িক বিবাদের ঝঞ্ঝাবাতে অপরাপর ধর্ম্মের বৃক্ষগুলিকে উন্মূলিত করিতে না পারিলেও শাখা প্রশাখা বা ফল ফুল প্রভৃতির ক্ষতি করিতেছে এবং এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম

সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যোন্য সমবেদনা ও তজ্জনিত শান্তিতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে যাহা ঐ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে একত্বদামে বাঁধিতে বা সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার মধ্যেও তাহাদিগকে এক প্রধান লক্ষ্যের দিকে চালাইতে পারে, তাহাই পৃথিবী হইতে অহি-নকুল-নীতির বিসংবাদ দূর করিয়া সাম্যভাবের সুধা বর্ষণে তাহার কলঙ্ক কালিমা ঘুচাইবে। কিন্তু এই প্রকার গুণ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারই লক্ষিত হইয়া থাকে; কারণ উহা জীবমাত্রের প্রকৃত স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে, এবং যে বিধর্ম্মীদিগকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলা নরকের যাত্রী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহাদিগকেও এই ব্রহ্মবিদ্যা নিখিল পাপ হইতে বিনির্মুক্ত, পবিত্রতার নিলয় সদাশিব বলিয়া আহ্বান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যা সকলকেই সদাশিব বলিতেছে, তদ্রূপ যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে ত্রুটি করিতেছে না। অন্যান্য ধর্ম্মগুলি কেবল অন্ধবিশ্বাসী বা গো-বৃষভ নীতি-প্রবর্ত্তিত লোকদিগেরই মন ভুলাইতে পারে, কিন্তু যুক্তির পক্ষপাতীদিগের হৃদয় অধিকার করিবার ত কোন কথাই নাই, তাঁহাদের নাম শুনিবামাত্র সঙ্কোচনীতির গুপ্ত প্রকোষ্ঠে যাইয়া অগত্যা সেবকমণ্ডলীর কাণে কাণে বলিতে থাকে যে, "ঐ নাস্তিক বেটারা কি আমায় স্পর্শ করিতে অধিকারী?" আর ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ যে কল্পনাপ্রসূত ও নির্যুক্তিক, তাহা আমরা "পুরুষবিশেষ ঈশ্বর রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যুক্তি যে ব্রহ্মবিদ্যার আদর সম্পূর্ণরূপে করিয়া থাকে, ইহা বুঝিতে বর্ত্তমান যুগের বিদ্বৎসমাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞান উপদেশ করিতেছে, "জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এক মূল মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রণালীতে খেলা হইতেছে। বস্তুগত শক্তিকে কার্য্যকারিত্বের দিক্ দিয়া পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও জলতরঙ্গনীতির অনুপাতে উহার মূল প্রকৃতি একই বটে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে মূলশক্তি আখ্যা দিলেন, উহা জড় চৈতন্য উভয়াত্মক বেদের সগুণ ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত লোকের মধ্যে যখন বিজ্ঞান-ভক্তি অত্যন্ত প্রবল দেখিতেছি, তখন তদনুমোদিত ঈশ্বরই তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন; অন্ধবিশ্বাস বা কল্পনার ঈশ্বরকে তাঁহারা যে আপন মনের উপর প্রভুত্ব করিতে দিবেন, ইহা সন্দেহাকুলই বটে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত লোকেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকল বিষয়েই শিক্ষিত লোকের অনুকরণ করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে বিজ্ঞানানুমোদিত ব্রহ্মবিদ্যার সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে বর্ত্তমান যুগের উপাস্য দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে যে পৃথিবীর সকল জঞ্জাল ঘুচিয়া যাইবে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রাচীনকালের সেই ঋষিসঙ্ঘ-সেবিতা ব্রহ্মবিদ্যাই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ও হিত-প্রসূনবর্ষী ধর্ম্ম। আর ব্রহ্মবিদ্যাতে যে মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে, ইহা মনু ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যামিত্যাদি"—ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করও 'অপ শূদ্রাধিকরণে' বলিয়া গিয়াছেন যে, "জন্মান্তরীন সুকৃতির ফলে শূদ্র প্রভৃতিরাও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী।" মহাভারতের বিদুর এবং সঞ্জয়ের আখ্যায়িকাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী "বেদভাষ্য ভূমিকা" ও "সত্যার্থ প্রকাশে" "যথেমাং কল্যাণীং

বাচমাবদানি জনেভ্যঃ শূদ্রায় চারণায় বা" এই বেদমন্ত্রকে প্রমাণ রাখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য মাত্রই বেদের অধিকারী। যদ্যপি প্রাচীন সংস্কার বিশিষ্ট লোকেরা বেদের সার্ব্বজনীন অধিকার সম্বন্ধে একমত হইবেন না, তথাপি পুরাণ প্রভৃতির সাহায্যে যে শূদ্র জাতিরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইত গেল স্মার্ত্ত মতের কথা। আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের লোকেরা ত জাতি লইয়া কোন বিবাদই তুলিবেন না; কারণ তাঁহাদের ভাগবতে লিখিত আছে যে, "মন্যে দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং" অর্থাৎ হরিভক্তিশূন্য দ্বিগুণ যজন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ দেখিতে পাই, বৈষ্ণব মতের অনেক আচার্য্যও নিম্নজাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এমন কি যে বৈষ্ণব হইতে এই মত চলিয়াছে সেই বৈষ্ণবের আদি আচার্য্য "ষট্‌কোপ" সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "বিক্রীয় শূর্পং বিচচার যোগী" অর্থাৎ যোগিবর ষট্‌কোপ প্রভু কুলা বিক্রী করিতে করিতে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্য চৈতন্যও যবন হরিদাসকে নিজের দলভুক্ত করিয়াছিলেন। কবির, দাদু, গরীবদাস ও স্বামী নারায়ণ প্রভৃতি বৈষ্ণব মত প্রবর্ত্তকেরাও উচ্চকুল পবিত্র করেন নাই। এক্ষণেও বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গপন্থীদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণেও কায়স্থ বা বৈদ্য জাতির গুরুর কাছে প্রকাশ্যভাবে মন্ত্র গ্রহণ ও অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আবার ভেক ধারণ করিলে 'বাগ্দী' পর্য্যন্তও তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পাইয়া থাকে, "জাত কুল ন পুছে কোই যো হরিকো ভজে, সো হরিকা হোই।"

বেদান্ত-সূত্রে সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে মুখ্য অধিকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়নে দ্বিজাতিমাত্রই যে অধিকারী, তাহা অপশূদ্রাধিকরণে ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত সূত্রগুলির প্রতি মনঃসংযোগ করিলেও আমাদের সুযোগ্য পাঠক ইহার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন:—

আশ্রমাধিকরণ—

—"সর্ব্বথাপি তত্রবোভয়লিঙ্গাৎ।"

৩য় অঃ, ৪র্থ পাঃ, ৩৪ সূত্র।

সকল বেদ ও স্মৃতির পর্য্যালোচনা করিলে একমাত্র সন্ন্যাসীই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া সিদ্ধ হয়, যেহেতু এই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে।

একমাত্র সন্ন্যাসীই যে, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, এই সম্বন্ধে অপর কারণ দেখান যাইতেছে—"অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি" ৩য় অঃ, ৪র্থ পাঃ, ৩৫ সূত্র। "যন্ন সন্তং নচাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতং। ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চন স দ্বিজঃ॥" "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।" প্রভৃতি স্মৃতিগুলি মান অপমান প্রভৃতির পরিহারকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সাধন বলিয়াছে, আর তাহা একমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভবপর; কিন্তু স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে আসক্ত গৃহস্থের পক্ষে নহে। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যায় সন্ন্যাসীই অধিকারী।

তদ্দৃষ্ট্যধিকরণ—

এইরূপে সন্ন্যাসীর ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার দেখাইয়া এই খানে যিনি, সম্পূর্ণ গৃহস্থও নহেন এবং সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীও নহেন, এরূপ ব্যক্তির অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় এবং ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণাদি করিতেছেন বলিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় হওয়ায়, তাঁহার যে ঐ

বিষয়ে অধিকার আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে:—

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ —" ৩য় অ, ৪র্থ পাঃ, ৩৬ সূত্র।

পত্নী বিয়োগ হইলে পর যাহাদের বৈরাগ্য হইয়া থাকে, সেই গৃহস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিদিগেরও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। কেননা জগতে এরূপ অনেক ব্যক্তি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে সাধন অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য্য ও শম দম প্রভৃতি অতীব আবশ্যক, সিদ্ধ অবস্থাতে অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর তত্ত্বজ্ঞানীর কোন বিধি নিষেধ নাই। তাঁহাকে পাপ বা পুণ্য কখন স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য পুরাকালের ক্ষত্রিয়েরা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য ও শমাদি সাধনে রত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতেন, পরে রাজ্য পরিচালন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর সকলকেই যে নির্জ্জন গিরিগুহায় যাইয়া জীবনপাত করিতে হইবে, এরূপ কোন বিশেষ বিধি নাই; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী যদি সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তবে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই যুগে ব্রহ্মদর্শী গৃহস্থের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই সাধারণ হিতের পথ পরিষ্কৃত ও সাম্যবাদ বিস্তৃত হইতে থাকিবে। কেননা তাঁহাদেরই উপর সমস্ত বৈষয়িক কার্য্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। যখন এইরূপ, তখন ব্রহ্মবিদ্যার বিমল নীরে নিঃশেষরূপে হৃদয়ের মালিন্য ধুইয়া ফেলিলেই, তাঁহাদের নিকট নিঃস্বার্থ ও সাম্যভাব-প্রণোদিত সাধারণ হিতকর কার্য্য সমূহের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহার ফলে জাতি ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলেই স্ব স্ব ন্যায্য অধিকার এবং ভোগ্য প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে অধীনতা ও ভোগবৈষম্যের কোলাহল আর স্থান পাইবে না। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এইরূপ অবস্থা আসিলেই মর্ত্ত্যভূমিতে দৈত্যযুগের অবসান ও দৈবযুগের প্রারম্ভ হইবে। "ওঁ তৎসৎ।"

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

আলিবর্দ্দি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার যুদ্ধ।

আলিবর্দ্দি খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরসিদ কুলি খাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এ কথা প্রচার হইয়া পড়িল। মুরশিদ কুলি খাঁ এই সংবাদ পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি করি; আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিব কি? না। সে তেজস্বী, সে বুদ্ধিমান্, সে ঐশ্বর্য্যশালী, সে বলসম্পন্ন; আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ হইব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মুরশিদ কুলি খাঁ সিদ্ধান্ত করিলেন, আলিবর্দ্দির যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, তাহার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মুরশিদ কুলী খাঁর জামাতা

মির্জ্জা বাথর খাঁ শ্বশুরের এই সংকল্প সাধনে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। মুরশিদ কুলী খাঁর সহধর্ম্মিণীও জামাতার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মুরশিদ কুলী খাঁ আগাম মহম্মদ তকি নামক এক ব্যক্তিকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া এবং আলিবর্দ্দির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়া আলিবর্দ্দির নিকট দূতস্বরূপে পাঠাইয়াছিলেন। দূত আলিবর্দ্দিকে যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন, তাহাতে ফল সন্তোষজনক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। সন্ধি প্রস্তাবের প্রারম্ভে সন্ধির সূচনা ভগ্ন হইয়া যাইল। কেন এমন হইল? মুরশিদ কুলি খাঁর সহধর্ম্মিণী এবং জামাতা কিছুতেই আলিবর্দ্দির সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাদের ধারণা এই যে, যিনি সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সন্ধি করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। সে হত্যার প্রতিশোধ লইতে হইবে। মুরশিদ কুলি খাঁ সহধর্ম্মিণী ও জামাতার সুদৃঢ় সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না।

আলিবর্দ্দি সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনার কোন ক্ষতি করিতে বাসনা করি না, তবে আপনার কটকেও থাকা হইবে না। আপনি আপনার পরিবার এবং সম্পত্তিসহ কটক পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের যে কোন স্থানে বাস করিতে পারেন।" এইরূপ সংবাদে বিপদ্ ঘনীভূত হইবারই কথা। মুরশিদ কুলী খাঁ জানিতেন, আলিবর্দ্দি খাঁ বুদ্ধিমান্ এবং বলসম্পন্ন। ইহা বুঝিতেন বলিয়াই তিনি আর কোন গোলযোগ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার জামাতা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে সর্ব্বস্ব যায় তাহাও স্বীকার, তবুও আলিবর্দ্দির সহিত কোন প্রকার সন্ধি করা হইবে না। মুরশিদ কুলি খাঁর সহধর্ম্মিণী তেজস্বিনী রমণী; তিনি তাঁহার জামাতাকে বলিলেন, "এই লও আমার ধন সম্পত্তি, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে হয় সেও ভাল, তবুও আমি সেই ভ্রাতৃঘাতক আলিবর্দ্দির আধিপত্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। আমি প্রতিহিংসা চাই।" মুরশিদ কুলি খাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, তাঁহার মতি ফিরিল, তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; এবং আলিবর্দ্দিকে বলিয়া পাঠাইলেন যুদ্ধই অনিবার্য্য। অসি-সাহায্যে সকল গোলযোগের মীমাংসা হইবে। আর নিস্তার নাই। আলিবর্দ্দি এইবার নিশ্চিত বুঝিলেন যে, যুদ্ধই করিতে হইবে। তিনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ও হাজি আহম্মদের উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া দশ বার সহস্র সৈন্য সহ শুভদিনে শুভক্ষণে উড়িষ্যাযাত্রা করিলেন।

এদিকে মুরশিদ কুলি খাঁও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, তবে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে স্বীয় সহচর ও অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন;—"এই তোমাদিগের মধ্যস্থলে আমি আমার তরবারি রক্ষা করিলাম। আমি আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য, এক্ষণে তোমাদের মত জানিতে চাই। যদি তোমরা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও। আর যদি তোমাদের সে অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল, আমি আমার আত্মরক্ষার্থ যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা এখনই স্থির করিয়া লইব।" তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র চারিদিকে কি একটা অস্ফুট কোলাহল উত্থিত হইল। সহসা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী আবেদ আলি খাঁ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমরা আপনার অনুরক্ত; আমরা সেই প্রভুঘাতক

আলিবর্দ্দিকে ঘৃণা করি।" অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। আবেদ আলি খাঁ সভার মধ্যস্থ তরবারিখানি উত্তোলিত করিয়া বলিলেন;—"হে উড়িষ্যাধিপতি, আপনি জানিবেন যে, আমরা সকলে আপনারই।" আবেদ আলি খাঁর উত্তেজনাপূর্ণ আশ্বাসবাণীতে মুরশিদ কুলি খাঁ হৃদয়ে পরম শান্তি লাভ করিলেন।

অতঃপর মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহার জামাতার সহিত সসৈন্যে উড়িষ্যার সীমান্তপ্রদেশে যাত্রা করিলেন। তিনি বালেশ্বর বন্দর অতিক্রম করিয়া ইহার পাদতল-প্রবাহিত নদী উত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, এবং তথায় আপন শিবির স্থাপন করিলেন। যেস্থানে তিনি শিবির স্থাপন করিলেন, তাহার চারিদিকই প্রায় ক্ষুদ্র নদী দ্বারা পরিবৃত; নদীতট বন্ধুর ও উচ্চ। চারিদিকেই ঘনগভীর বিটপরাজি। স্বাভাবিক প্রাকার-শক্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া মুরশিদ কুলি খাঁ চারিদিকে পরিখা খাদিত করাইলেন। এই পরিখার তীরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় তিনশত কামান সজ্জিত হইল। প্রকৃতই তখন মুরশিদ কুলি খাঁর শিবির ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। কাহার সাধ্য সে শিবির স্থানচ্যুত করে?

এখানে এইরূপ, আবার ওখানে আলিবর্দ্দি খাঁ মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে মুরশিদ কুলী খাঁর যে শিবির সন্নিবেশের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন; দেখিয়া অসমসাহসী বীর আলিবর্দ্দিও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, শত্রুসৈন্য যেরূপ উত্তেজিত, শত্রুশিবির যেরূপ সুরক্ষিত, তাহাতে শত্রুকে আক্রমণ করা সহজ ও সম্ভবপর নহে। তবে শত্রুকে কোন রূপে তাহার সুদৃঢ় শিবির হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারিলে কতকটা সুযোগ ও সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আলিবর্দ্দির এখন বড় সঙ্কট-অবস্থা। বঙ্গসীমান্তপ্রদেশের জমীদারগণ তাঁহাকে সাহায্য পাঠাইতে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। দুই চারিজন জমীদার সাহায্য পাঠাইলেন বটে, কিন্তু উড়িষ্যার জমীদারগণ পথে তাহাতে বাধা দিতে লাগিলেন।

উড়িষ্যার এই সকল জমীদার আলিবর্দ্দিকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিলেন, এবং তাঁহার শিবিরকে শত্রুশিবির বলিয়া মনে করিলেন। নারায়ণগড়ের শাসনকর্ত্তা কিছু সাহায্য পাঠাইলেন বটে, কিন্তু তাহাও পূর্ব্বোক্তরূপে পথে বাধা প্রাপ্ত হইল। যাহাদিগের উপর রসদ যোগাইবার ভার ছিল, তাহারাও রসদ যোগাইবার সুবিধা করিতে পারিল না। কাজেই রসদ দুষ্প্রাপ্য হইল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন, আমি স্থির হইয়া থাকি, আর অগ্রসর হইব না, শত্রু অনাহারেই মরিবে। কিন্তু তাঁহার জামাতা আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। শত্রু বিপদ্‌গ্রস্ত এ সংবাদ পাইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ নানা আপত্তি করিলেন, কিন্তু মির্জ্জা বাথর খাঁর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার কোন আপত্তিই তিষ্ঠিতে পারিল না। কাজেই মুরশিদ কুলি খাঁ সেই সুদৃঢ় স্থান পরিত্যাগ করিয়া শত্রু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শত্রুর ভ্রমে তাঁহার সুযোগ ঘটিল।

যেদিকে নদীতটে সারি সারি কামান সুরক্ষিত হইয়াছিল, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি

ইহা দেখিয়া যুদ্ধার্থ তাঁহার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দির সৈন্যগণ দ্রুতপদে গমন করিয়া মির্জ্জা বাথরের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। বন্দুকে বন্দুকে যুদ্ধ চলিল, উভয় পক্ষের বহু সেনানী হতাহত হইল। মুরশিদ কুলি খাঁ আপনার স্থানে সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঘোর সংশয়! কে জয়-লাভ করে, কে পরাজিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইয়া উঠিল।

এদিকে আবার প্রতারণার লীলাখেলা চলিল। মুরশিদ কুলিখাঁর অন্যতম সেনানী আবেদ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার সাংঘাতিক কৃপাণ উত্তোলিত করিলেন। আবেদ খাঁ একজন আফগান। প্রভু মুরশিদকুলি খাঁর কৃপায় তিনি কটকে একজন প্রসিদ্ধ লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপায় তিনি সম্পদ্ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাসঙ্কট সময়ে তিনি যে বিশ্বাসঘাত-কতা করিয়াছিলেন, তাহা অতি বড় হীন হেয় নরাধমেরই যোগ্য। তিনি গোপনে আলিবর্দ্দির আফগান-সেনাপতি মুস্তাফার সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। মুস্তাফা খাঁ তাঁহার স্বদেশীয় এবং শোণিত-সম্পর্কীয়। আবেদ আপন সৈন্য লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার ভাণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন;—যেন এ যুদ্ধে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই; তিনি যেন একজন দর্শকমাত্র। পূর্ব্বে ষড়-যন্ত্রে মুস্তাফা খাঁর সহিত একটা সঙ্কেত স্থির হইয়া গিয়াছিল। আবেদ খাঁ এখন সেই সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া আপন সৈন্যসহ স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন; কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না।

এখন কেবল বারের সৈয়দ সৈন্য তাঁহার ভরসাস্থল। দিল্লীর উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় বার সহর এবং জেলা অবস্থিত। সৈয়দগণ এই স্থানের অধিবাসী। ইহারা বুদ্ধিমান্ না হইলেও সাহসী বটে। এই সৈয়দ-সৈন্য মুরশিদ কুলি খাঁর বড়ই অনুরক্ত ছিল। ইহারা বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইয়া আলি-বর্দ্দির সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। ইহাদের দুর্নিবার আক্রমণে আলিবর্দ্দির সৈন্য-গণ প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পড়িল। সত্য সত্যই অনেকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এইবার আলিবর্দ্দির বড় দুঃসময়। বুঝি বা তাঁহার ধন-মান-গৌরব-সম্পদ্ সকলই অতলতলে ডুবিল। আলিবর্দ্দির সহধর্ম্মিণী সকল যুদ্ধেই আলিবর্দ্দির সঙ্গিনী স্বরূপে থাকিতেন। এ যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি শত্রুসৈন্যের বিষম বিক্রমে বিচ্ছিন্ন স্বীয় সৈন্যগণের দুর্দ্দশা বুঝিয়া একটী হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন, এবং রণক্ষেত্র হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করি-লেন। আলিবর্দ্দি খাঁও হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু দৈব যাঁহার সহায়, তাঁহার দুঃসময় কতক্ষণ থাকিতে পারে? দৈব যাঁহার উপর প্রসন্ন, তিনি মুহূর্ত্তে দিগ্বিজয়ী। আলিবর্দ্দির অদৃষ্টে রাজ্যসুখভোগ আছে, কে তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে?

দেখিতে দেখিতে আলিবর্দ্দির বিক্রান্ত সেনানী মুজাবখর দক্ষিণ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া বামপার্শ্বস্থ শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। বখর খাঁ যেন তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিবার জন্য সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করি-লেন। তাঁহার সেই সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া শত্রুসৈন্য বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পরন্তু অনেকে আতঙ্কে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অনেকেই রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু বখর খাঁ যেদিকে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন,

সেদিকে মুরশিদ কুলি খাঁর অনেক সাহসী সৈন্যও ছিল। বখর খাঁর সৈন্যগণ তাহা-দিগকে আক্রমণ করিতে যাইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আলিবর্দ্দির অন্যতম সেনাপতি মির্জাফর খাঁ দেখিলেন, ব্যাপার বড়ই বিষম। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যেদিকে সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে মুস্তাফা খাঁ, দিলার খাঁ, এবং আসলত খাঁ উপস্থিত ছিলেন। মির্জা-ফর খাঁ ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বিক্রমে মুরশিদ কুলি খাঁর সৈয়দ সৈন্যের অধিপতি মীর মহাবৎ আলি এবং মীর আকবর আলি উভয়েই আহত হইলেন। মির্জাফরের সহিত যুদ্ধে উভয়েই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে মির্জা বখর গলদেশে, মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিল। মির্জা বখর আর অধিকক্ষণ আত্মসমর্থনে সমর্থ হইলেন না। তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। এতাদৃশ বীর, এতাদৃশ সাহসী সেনাপতিকে অপসৃত হইতে দেখিয়া সৈন্য-গণের মধ্যে অনেকেই ভীত হইয়া পলায়নপর হইল; অনেকেই অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। আলিবর্দ্দির জয় হইল।

মুরশিদ কুলি খাঁ ভাবিলেন যে, এখন পলায়ন করিয়া একটী নিরাপদ স্থানে অব-স্থিতি করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার জামাতা যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। তিনি সেই আহত জামাতাকে একখানি পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া বালেশ্বর বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তিনি তিন সহস্র সৈন্যের সহিত আশ্রয় লইলেন। তিনি সকলকে এমনই ভাব দেখাইলেন যেন এই স্থানে গড়বন্দী করিয়া অবস্থিতি করিবেন। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি সহরের বহি-র্ভাগে গমন করিলেন এবং তথায় সহরের সীমান্তে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিলেন। সৈন্যগণ বুঝিল, বুঝি বা সহরে গড়বন্দী হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুরশিদ কুলি খাঁ নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সময়ে নদীকূলের নিকট একখানি জাহাজ ছিল। এই জাহাজখানি তাঁহার কোন বাল্যবন্ধুর। এই বাল্যবন্ধু সুরাট বন্দরের অধিবাসী। এই বাল্যবন্ধু বিলক্ষণ ধনাঢ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভারতের নানা স্থানে তাঁহার জাহাজ গমনাগমন করিত। মুরশিদ কুলি খাঁ সৈন্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, আমি একবার ঐ জাহাজের মধ্যে বেড়াইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার জামাতা ও কয়েকটী বিশ্বস্ত ভৃত্যকে লইয়া ঐ জাহাজে গমন করিলেন; কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না; জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ছয়দিন পরে মুরশিদ কুলি খাঁ মান্দ্রাজের মসলীপত্তন সহরে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন। মুরশিদ কুলি অন্তর্হিত হই-লেন। সুতরাং আর কাহার ভরসায় তাঁহার সৈন্যগণ আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিবে? আলিবর্দ্দি খাঁর জয়পতাকাই উড্ডীয়মান হইল।

মুরশিদকুলি খাঁ মসলিপত্তনে গিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তাঁহার বিষম ভাবনা হইল;—কোথায় আমার পরিবার, কোথায় আমার ধনসম্পত্তি। ভাবনায় মুরশিদকুলি খাঁর মস্তক বিঘূর্ণিত হইল—কিরূপে সকলের উদ্ধার সাধন হয়, ইহাই তাঁহার নিত্য আলোচ্য হইল। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একবার জামাতাকে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। দেখি জামাতা যদি কোন

উপায়ে বা কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন। আপাততঃ জামাতা গঞ্জামে গমন করুন। এই গঞ্জাম সহর উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে। এখান হইতে তিনি সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া হয়ত আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি এবং ধনসম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মুরশিদকুলি খাঁ তাঁহার জামাতাকে গঞ্জামে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই ভগবান্ মুরশিদকুলি খাঁর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন। ৺ জগন্নাথক্ষেত্রের রাজা মুরশিদকুলি খাঁর পরমবন্ধু ছিলেন। তিনি মুরশিদকুলি খাঁর অবস্থার কথা অবগত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ এবং ধনসম্পত্তি অনয়ন করিবার জন্য লোক এবং যানাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথক্ষেত্রের রাজা সা মুরাদ নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বন্ধু মুরশিদকুলি খাঁর পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি লইয়া আসিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সা মুরাদ নির্ব্বিঘ্নে সকলকে লইয়া ইছাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ইছাপুর তৎকালে সিকাকোল এবং গঞ্জাম জেলার সহর ছিল। অনাবর উদ্দিন খাঁ এই গঞ্জামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি মুরশিদকুলি খাঁর সুপরিচিত। এই অনাবর উদ্দিন খাঁ মুরশিদকুলি খাঁর পরিবারবর্গকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা বখর খাঁ গঞ্জামে আসিলেন। তিনি স্বীয় শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে এবং অন্যান্য সকলকে মুরশিদ কুলি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং তথায় গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুরশিদাবাদে আলিবর্দ্দি।

আলিবর্দ্দির ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। তিনি যুদ্ধে একবার নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়াছিলেন, আবার আপনার সৌভাগ্য-বলে সেই অন্ধকার হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় অলোক দর্শন করিলেন। তিনি জয়ী হইলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি কটকে গমন করিলেন এবং সমগ্র উড়িষ্যা রাজ্যকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তথায় একমাসকাল অবস্থিতি করিলেন। সুজা খাঁর সময়ে আলিবর্দ্দি উড়িষ্যায় বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এইজন্য উড়িষ্যায় শান্তিস্থাপন করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। উড়িষ্যার জমীদারবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সুপরিচিত ছিলেন। অনেকেরই অবস্থাভিজ্ঞতা তাঁহার নখদর্পণে নিহিত ছিল। তিনি সেই সকল জমীদারকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। যিনি যেরূপ লোক, তাঁহার প্রতি সেইপ্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সকলেরই সন্তোষ সাধন করিলেন। পরে সমাগত জমীদারগণ সানন্দ চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কটকের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাকে তাঁহার পদোচিত খেলাৎ প্রদান করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ যাহাদিগকে আপন সৈন্যের কর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উপর আলিবর্দ্দির বড় বিশ্বাস ছিল না। সেইজন্য তিনি আপনার সুদক্ষ সৈনিক গুজর খাঁকে সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গুজর খাঁর উপর এই আদেশ রহিল, "উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার

ইচ্ছানুসারে আরও যত অধিক সৈন্যের নিয়োজন করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা তুমি করিবে।" উড়িষ্যারাজ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ সসৈন্যে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইবার আলিবর্দ্দি খাঁর প্রকৃত শাসন আরম্ভ হইল। কি ভাবে শাসন করিলে প্রজার মন সন্তুষ্ট হয়, অতঃপর আলিবর্দ্দি তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের রাজস্ব সুশাসনের মূল সদুপায়, ইহা তিনি বুঝিতেন, সেইজন্য তিনি সর্ব্বদাই রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিলেন। সৈন্যবলে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া থাকে, ইহা তিনি জানিতেন, সেইজন্য তিনি সতত সৈন্য রক্ষা ও সৈন্যশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিলেন। রাজ্যের কৃষককুল শাসনমঙ্গলের মূলাধার, ইহা তিনি বুঝিতেন, তাই তিনি কৃষককুলকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নানা সদুপায় অবলম্বন করিলেন। ফল কথা, কি প্রজা, কি অমাত্য-মন্ত্রী, কি সেনাপতি সহচর—সকলকেই তিনি সদ্ব্যবহারে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও আপনার পোষ্যপুত্র শিশু মির্জ্জা মহম্মদের প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান, প্রধান অমাত্য, দেশের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বৃন্দ, আপনার প্রধান প্রধান আত্মীয়স্বজন, মিত্রগণ যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহার দরবারে সমুপস্থিত থাকেন, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আলিবর্দ্দি খাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

আলিবর্দ্দির আদেশে জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াইজ মহম্মদ খাঁ;—সরফরাজ খাঁর মাতা নেফিসা বেগমকে আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। নেফিসা বেগম আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ জামাতাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন এবং জ্যেষ্ঠ জামাতাও তাঁহাকে জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন। নেফিসা বেগমের হস্তে অন্তঃপুরের সমস্ত গৃহস্থালীর ভার অর্পিত হইল। তবে নেফিসা বেগম কখনও নওয়াইজ খাঁর সম্মুখে বহির্গত হইতেন না। সুতরাং নওয়াইজ খাঁ কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। সরফরাজ খাঁর মাতা নেফিসা বেগম নওয়াইজ খাঁর অন্তঃপুরে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। তিনি যখন যাহাকে যে আদেশ করিতেন, তাহাকে তদ্দণ্ডেই সেই আদেশ পালন করিতে হইত। হিসাবপত্র দেখাইতে হইলে নেফিসা বেগম পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া দেখাইতেন।

নেফিসা বেগম পিতা জাফর খাঁর নিজ সম্পত্তি বা খাস তালুক আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। সমুদায় জমী এবং বাড়ী সকলই তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। সরফরাজ খাঁ নিজের অর্থে জাফর খাঁর এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তিনি কখনও কোন প্রকারে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। নেফিসা বেগম এই সম্পত্তি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেন। আলিবর্দ্দি খাঁ ও নওয়াইজ খাঁ নেফিসা বেগমকে এরূপ সম্মান করিতেন যে, তাঁহার নিকট যাইতে হইলে উভয়েই দূর হইতে অভিবাদন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইতেন, এবং তাঁহার আজ্ঞা না পাইলে আসন গ্রহণ করিতেন না। যে দিন সরফরাজ খাঁ যুদ্ধে হত হন, সেই দিন তাঁহার উপপত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিল। নেফিসা বেগম তাহাকে পোষ্যপুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নওয়াইজ খাঁ এই পুত্রটীকে স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় যত্নের সহিত লালন পালন করিতেন। যাহাতে তাহার প্রতিপালন পক্ষে কোনপ্রকার ত্রুটী না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সরফরাজ খাঁর বিবাহিতা পত্নী

ছিল না। তাঁহার অনেকগুলি উপপত্নী ছিল। ইহাদের কাহারও কাহারও পুত্র কন্যা হইয়াছিল। সরফরাজ খাঁ সকলকে জাহাঙ্গীর নগর ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের এরূপ বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াও অপরের সাহায্য করিতে পারিত। নওয়াইজ খাঁ সরফরাজ খাঁর সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তিরই রক্ষক হইলেন। তিনি সকলেরই যথাযোগ্য বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যিনি তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি ত বৃত্তি পাইতেনই, অধিকন্তু যাঁহারা তাঁহার অধীনে কোন কর্ম্ম করিতেন না, তাঁহারাও বৃত্তি পাইতেন। যিনি যাহাতে সুখসচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, নওয়াইজ খাঁ তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে কোন প্রকার ত্রুটী করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে নওয়াইজ খাঁ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি দরিদ্র, বিধবা স্ত্রীলোক এবং কর্ম্মে অক্ষম লোকদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য মাসিক ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। ইহা তাঁহার গোপন দান। এতদ্ব্যতীত অনেকেই প্রকাশ্যভাবে বৃত্তি পাইত। যে টাকা তিনি দান করিতেন, প্রত্যেক মাসে সেই টাকা থলি পূর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইত। সেই টাকা তিনি বিশ্বাসী খোজা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দ্বারা বিতরণ করিতেন।

নওয়াইজ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট, এবং হালামাবাদের ফৌজদারীর ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঢাকায় থাকিতেন। হোসেন কুলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নায়েব ছিলেন। হোসেন কুলি খাঁর দেওয়ান বহুগুণসম্পন্ন রায় গোকুল চাঁদ শ্রীহট্ট এবং হালামাবাদের কার্য্য পরিচালন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। আলিবর্দ্দির শ্যালক কাসিম আলি খাঁ রঙ্গপুরের ফৌজদারের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় আলিবর্দ্দির শাসনে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সময় সৈয়ফ উদ্দিন আলি খাঁ পূর্ণিয়ার ফৌজদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সৈয়ফ উদ্দিন আলি খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে, আলিবর্দ্দি তাঁহার শত্রু। এইরূপ মনে করিয়াই তিনি আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আলিবর্দ্দি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শত্রু নহেন, পরন্তু তিনি তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতঃপর তিনি আলিবর্দ্দির সহিত আর কোনরূপ শত্রুতা করেন নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আজিমাবাদে জৈন উদ্দিন।

পাঠক! মনে রাখিবেন আলিবর্দ্দি খাঁ, ভ্রাতুষ্পুত্র জৈন উদ্দিনকে আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার অর্পণ করিয়া সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই পরিচ্ছেদে কয়েকটী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আলিবর্দ্দির সময়ে বাঙ্গালী শাসনে যে কীর্ত্তি দেখাইয়াছেন, সেই কীর্ত্তি বাঙ্গালীর সেই শেষ। জৈন উদ্দিন কোন কোন বাঙ্গালীকে যেরূপ উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর গৌরব-পরিচায়ক। জৈন উদ্দিন যুবক, কিন্তু বহুগুণযুক্ত। তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, যে সম্মান লাভ

করিয়াছিলেন, আপন গুণে সেই পদের সেই সম্মানের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গুণীর গুণ বুঝিতেন, গুণের আদর করিতে জানিতেন। তাই আপনার শাসনকালে প্রকৃত গুণবান্ লোককে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেনের পিতা সৈয়দ হেদায়েৎ আলি খাঁ বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি নানাস্থানে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। জৈন উদ্দিন তাঁহার গুণকাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই জন্য জৈন উদ্দিন তাঁহাকে আপন রাজ্যে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৈয়দ হেদায়েৎ আলি খাঁর উপর কর্ম্মচারীদিগের বেতন বিতরণ করিবার ভার ছিল। জৈন উদ্দিনের বিশ্বাস ছিল যে, সৈয়দ হেদায়েৎ আলি খাঁর সাহায্যে তিনি সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিতে ও রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। সৈয়দ হেদায়েৎ আলি খাঁকে জৈন উদ্দিন এই সকল কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছিলেন। জৈন উদ্দিন অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেন নাই। জৈন উদ্দিনের একজন উপযুক্ত মন্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি উপযুক্ত মন্ত্রীও পাইয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী কার্য্যপটু বিশ্বস্ত কায়স্থকুলোদ্ভব রায় চিন্তামোহন দাস জৈন উদ্দিনের অন্যতম মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রায় চিন্তামোহন দাসের প্রতি রাজ্যের রাজস্ব পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। চিন্তামোহন দাস বয়সে যুবক, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, সকল কার্য্যে দূরদর্শী, যথাসময়ে সকল কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম, ধীর, শিষ্ট ও নম্র ছিলেন। তাঁহার গুণে সকলেই মোহিত হইত। কাহাকে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সে নির্দ্দেশে দৃঢ় চিন্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু নির্দ্দেশ শিষ্টাচারসম্পন্ন। অনেক শক্তিশালী জমীদার জৈন উদ্দিনের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা সম্মানের সহিত জৈন উদ্দিনের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আলিবর্দ্দির সহিত অনেক জমীদার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দিকে এই সকল জমীদার ভালবাসিতেন। ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহারা নিজের ইচ্ছায় আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দির জন্য তাঁহারা প্রাণকেও উপেক্ষা করিতেন। মঘ জেলার ব্রাহ্মণ জমীদার রাজা সুন্দর সিংহ এবং ত্রিহুতের দুইটী জমীদার আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ত্রিহুতের জমীদারদ্বয় বেটী বংশোদ্ভব। কিন্তু পরে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহাঁরা যুদ্ধে বীরত্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়া আলিবর্দ্দির সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি ইহাঁদিগকে নানাবিধ রত্ন অশ্ব এবং হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। ইহারা ফিরিয়া আসিয়া জৈন উদ্দিনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি যেরূপ ইহাঁদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, জৈন উদ্দিন তাহার প্রতিদান করিতে কখনও বিরত হইতেন না। পিতৃব্য আলিবর্দ্দি যেরূপ শিষ্টাচারী ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র জৈন উদ্দিনও সেইরূপ ছিলেন। যিনি যেরূপ কার্য্য করিতেন, জৈন উদ্দিন তাহাকে তদনুরূপ পুরস্কার করিতে সততই সমুৎসুক হইতেন। জৈন উদ্দিন অকৃতজ্ঞ ছিলেন না।

ক্রমশঃ

কপাল।

নব বিবাহিতা রাণী কত দিন পরে,
শুভ লগ্নে যাবে বুঝি শ্বশুরের ঘরে।
খেলার সাথীরা আসি বসিয়াছে ঘিরি;
কারো কারো চক্ষু বহি অশ্রু পড়ে ধীরি।
কেহ দেয় টানা চখে কাজলের রেখা,
কেহ সাধে মুখে আঁকে অলকা তিলকা।
ছল ছল আঁখি লয়ে কোন সখি উঠে—
বেলপাতা খুঁজে, বাঁধে আঁচলের খুঁটে।
আলোচাল, দধি, আর লয়ে দূর্ব্বাদল,—
আশীষ করিল আসি পড়সী সকল।
বাম হস্তে দিল মাতা পরায়ে মাদুলী;—
ভরা আছে ব্রাহ্মণের লক্ষ পদধূলি।
ঠাকুর-তুল্‌সী ভরা চরণের ফুল—
গলায় পদক দিল সুবর্ণ অতুল।
বেহারা সোয়ারি আনে রাণীদের বাড়ী;
বাবা আসি আশীর্ব্বাদ করে তাড়াতাড়ি।
শূন্য কল্‌সী দেখি পাশে পড়ি অকারণ;—
মনে মনে ভাবে মাতা কত অলক্ষণ।
হাঁচিল খোকাটী পিছে সে সময় ঠিক;
টিক্‌টিকী ডাকে দ্বারে টিক্ টিক্ টিক্।
ঘরকন্না করে রাণী শ্বশুরের ঘরে;—
তার সে যশের কথা মুখে নাহি ধরে।
শাশুড়ী তাহার ঠিক জননীর প্রায়;
শ্বশুর না খেলে রাণী কভু নাহি খায়;
ভাসুর, দেবর, আদি যত ঘরে আছে—
দিন টুকু কেটে যায় সকলের পাছে।
রাণীর গুণের কথা নাহি হয় শেষ,—
স্বামী নাকি দেছে কত শুভ উপদেশ।

* * * *

বর্ষ দুই চলে গেছে মাথার উপর;
মেয়ে এলো মার কাছে এত দিন পর।
শাঁখা সাড়ী হাতে নাই সিঁথীটুকু সাদা;
যশ তার উড়ে গেছে, খালি আছে কাঁদা।
আপন বলিতে কেহ নাহি হবে আর,
লঘু পাপে গুরু দণ্ড এই বিধাতার।
সঙ্গিনীরা আড়ে আড়ে করে লুকোচুরি,—
সে যেন করেছে কিছু ডাকাতি কি চুরি।
যত ঘৃণা, অপমান, যত অবিচার,—
ক্ষুদ্র এ বালিকা বুঝি সবারি আধার।
রাণী করে একাদশী, ব্রত উপবাস;
বিষাদ সম্ভার দিয়া যায় বর্ষ মাস।
কোথাও হইলে ভোজ রাণী গিয়া রাঁধে;
কোথা যদি কাঁদে কেহ রাণী আগে কাঁদে।
না খেয়ে মুখের গ্রাস কাঙ্গালে খাওয়ায়;
রাণীর জীবন বুঝি পরের সেবায়।
কই কারো মুখে নাই বিন্দু অশ্রুকণা;
একি কথা ঘরে ঘরে, একি জল্‌পনা।
পড়সীর মুখে শুন সকাল বিকাল—
দুর্ভাগা এ ছুঁড়িটার কি পোড়া কপাল!

* * * * *

কপাল সঙ্গের সাথী সকলেরই ফলে,
তোমরা ত দয়া মায়া দেছ রসাতলে।
হে বিধরা, দয়াময়ী এই জেন সার—
কপালে ফলিবে সোনা মরণের পার।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মুদ্রিত লোচনে ভাবে ধর্ম্মের চরণ।
সেবকের প্রাণ রাখ প্রভু নিরঞ্জন॥
এ ভব সংসার মাঝে তুমি মোর গতি।
বারেক করুণা কর পাণ্ডবসারথি॥
পুরাণে শুনেছি আমি গজেন্দ্রমোক্ষণ।
সুধন্বারে তৈলকুণ্ডে করিলে তারণ॥
বিরিঞ্চি নারদ ভব না পাইল সীমা।
আমি নরাধম তব কি জানি মহিমা॥
করিল অনেক স্তব ময়নার রাজন।
বৈকুণ্ঠনগরে ধর্ম্ম জানিল তখন॥
হনুমানে ডাকিয়া কহেন জ্যোতির্ম্ময়।
বাঘ যুদ্ধে লাউসেন হল পরাজয়॥
ত্বরা করি যাহ সেনে হবে পক্ষাবল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
লাউসেনে উদ্ধারিতে প্রভু দিল ভার।
আজ্ঞা পেয়ে চলে তখন পবনকুমার॥
স্বর্গ ত্যজি হনুমান চলে যেন ঝড়।
তিন লম্ফে উপনীত জালন্দার গড়॥
ফলার ভিতর জাঁকা লাউসেন রায়।
শ্বেত মাছি রূপে হনু প্রবেশে ফলায়॥
লেরে—ভয় না করিহ সেন হোয়ো সাবধান।
পরিচয় দিলাম আমি বীর হনুমান॥
লাউসেন বলে দাদা ঠেকিছি সঙ্কটে।
কাটিতে বাঘের মাথা স্কন্ধে কেন উঠে॥
হনুমান বলে ভাই অবধান কর।
বাঘ কামদলে আছে অভয়ার বর॥
অস্ত্র নাহি মার ভাই বাঘের উপরে।
কাটা মুণ্ড যোড় লাগে পার্ব্বতীর বরে॥
হেত্যার বাঁধিয়া যদি ধর্ম্ম আইসেন।
হানা দিয়া বাঘকে বধিতে নারিবেন॥
মল্ল যুদ্ধ করিয়া শার্দ্দূলে কর বধ।
তবে সে ঘুচাও ভাই লোকের আপদ॥
বাঘ বধ কর সেন ময়নার রায়।
বাইশ বাঘের বল দিলাম তোমায়॥
ফলার ভিতর কথা কয় দুইজনে।
উপরে বসিয়ে বাঘ কাণ পেতে শুনে॥
বাঘ বলে কেমন দুজনে কয় কথা।
ঘাড় ভেঙ্গে খাব বলে ঘন নাড়ে মাথা॥
আমার সারথি বটে সর্ব্বমঙ্গলা।
ধর্ম্মের সেবকে বাসি যেন চাঁপাকলা॥
এত বলে কামড়াতে যায় ফলার উপর।
এতক্ষণে ঝিঁকিয়া উঠে লাউসেন কুমার॥
ফলা খাঁড়া ভুঁয়ে ফেলি রাখিল তখন।
মল্ল যুদ্ধ লাউসেন করে আরম্ভন॥
বাঘের ঝাঁপনে ক্ষিতি কাঁপে দুর দুর।
কৃষ্ণকে গিলিতে যেন যায় বকাসুর॥
ডাক ছাড়ে মুখ মেলে যেমন পাতাল।
শূন্যে ফিরে লাউসেন সিংহের ছাওয়াল॥
গোটা দুই তিন তখন বীরদাপ ছাড়ে।
লাফ দিয়ে ধরে সেন বাঘের নেঙ্গুড়ে॥
লেজে ধরে পাক মারে গগন মণ্ডলে।
পাথরে আছাড়ে পাড়ে বাঘ কামদলে॥
হাড়গোড় চূর্ণ হল বেরুল জীবন।
রথে চড়ি স্বর্গে গেল ইন্দ্রের নন্দন॥
ঘুচিল সবার শঙ্কা জালন্দার বনে।
শ্রীরাম জিনিল যেন লঙ্কার রাবণে॥
শার্দ্দূলের সমরে সেনের হ'ল জয়।
স্বর্গ চলে গেল তখন পবনতনয়॥
ভায়ের তল্লাসে সেন করিল গমন।
কদম্ব তলায় বীর দিল দরশন॥
ডাকিয়া কর্পূর বলে কদম্ব তলাতে।
কর্পূর বলেন ওই বাঘ এল খেতে॥
সেন বলে এস ভাই কর্পূর পাতর।
বাঘ নহি আমি বটি লাউসেন কুমার॥

সমরে বধেছি বাঘ এস দেখাইব।
লেজ কাণ লয়ে চল গৌড় যাইব॥
ডাকাডাকি করে যত লাউসেন বালা।
তরাসে কর্পূর পাত্র নাড়ে নাই পালা॥
মনস্তাপ করে সেন ভাবিতে লাগিল।
গাছের উপরে বুঝি ভাই পারা মল॥
এত বলি গাছে উঠে লাউসেন রায়।
পালা ঘুচাইয়া দেখে চোক মিলা চায়॥
সেন বলে ভাল বুঝি এমন ভরসা।
পরিণামে কি জানি কি হবে তব দশা॥
লাজ পেয়ে কর্পূরের সজল নয়ন।
হাসিতে হাসিতে সেন ঘুচান বন্ধন॥
গাছে হোতে করে ধরি নামান ভূতলে।
কেঁদে কেঁদে তখন কর্পূর কিছু বলে॥
সঙ্গে করে আনিলে দুঃখের নাহি ওর।
গাছের উপরে বসে প্রাণ গেল মোর॥
সেনে অনুযোগ করে কর্পূর পাতর।
গৌড় যাওয়া দণ্ডবৎ ফিরে যাই ঘর॥
পরাণ কাঁদিয়া উঠে না দেখিয়া মায়।
এত বলি ময়নার পরাণ বায়ে যায়॥
ফিরাইল হাতে ধরে সেন গুণমণি।
তারা দীঘির ঘাটে আজি পোহাব রজনী॥
তুমি গৌড় না গেলে যাইব কেমনে।
এত বলি উপনীত বাঘটা যেখানে॥
দক্ষিণ পবনে বাঘের নড়ে কাণ।
কর্পূর বলেন দাদা কর অবধান॥
মরে নাই বাঘটা জীয়ন্তই আছে।
আমি বাঘ বধিব দাণ্ডায়ে দেখ কাছে॥
মরা বাঘ ভূমে পড়ে কিল মারে তাই।
সেন বলে সাবাস সাবাস মোর ভাই॥
গোটা দুই কিল মেরে সিংহনাদ করে।
আমি বই কেবা পারে বাঘ মারিবারে॥
লাউসেন বলে ভাই সিদ্ধ কথা বটে।
বীরপণা মিছা সব তোমার নিকটে॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নূতন সঙ্গীত॥

কোলাকুলি দুই ভাই আনন্দিত মনে।
বনফুল দু ভাই পরিল তুলে কাণে॥
নৃপ সম্ভাষিতে নিল বাঘের লেজ কাণ।
রাজপথে দুই ভাই করিল পয়াণ॥
জালন্দার গড় পাছু বার ক্রোশ থুয়া।
তারা দীঘির ঘাটে সেন উত্তরিল গিয়া॥
শীতল পবন পেয়ে কদম্ব তলায়।
শ্রান্ত হয়ে বসিলেন ময়নার রায়॥
লাউসেন বলেন কর্পূর শুনহ বচন।
জল খাওয়াইয়া মোর বাঁচাও জীবন॥
তৃষ্ণায় পরাণ মোর হয়েছে বিকল।
ঝারি লয়ে আন গিয়া তারা দীঘির জল॥
কর্পূর বলেন আমি স্বরূপত কই।
শুন দাদা আমি কারো জল-বওয়া নই॥
গাঢ় কর্ম্মে আমাকে পাঠাইয়া দেহ ভাই।
তোমার সঙ্গেতে এসে বড় দুঃখ পাই॥
কর্পূরের বোল শুনে লাউসেন বলে।
এ কর্ম্ম করিতে হয় ছোট ভাই হলে॥
যে কালেতে বনবাসে গেল রঘুমণি।
ফল জল যোগাইল লক্ষ্মণ আপনি॥
প্রাণ যায় রাখ ভাই আন গিয়া বারি।
কর্পূর পাতর তখন হাতে নিল ঝারি॥
জল আনিবারে কর্পূর করিল গমন।
ফলা শিখান দিয়া সেন করিল শয়ন॥
ঐ রূপে ঘুমাল ময়নার তপোধন।
বদনে লাগিল বিয়তির বিরোচন॥
দুই সর্প এসে ফণা ধরিল মাথায়।
অচেতনে নিদ্রা যান লাউসেন রায়॥
কর্পূর গেছেন হোথা আনিবারে নীর।
পদ্ম কাঁটি দেখে তাঁর প্রাণ নয় স্থির॥
দেখিয়া পদ্মের টাঁটি মনে মনে কয়।
তারাদীঘির জলে সব সাপ গুলা ময়॥
জলের ভিতরে ভাসে মৎস্য গাং দাড়া।
তা দেখিয়া কর্পূরের ভয় হল বাড়া॥
ফণা তুলে সাপ গুলি জলে ভাসে গা।
এই গুলা ভাসে সব সাপেদের ছা॥

কাল ফণী ছিল যেন কালিন্দীর নীরে।
সেইরূপ কর্পূর পাতর মনে করে॥
ভাবনা করিছে যদি জল লয়ে যাই।
বিষ জল খেয়ে পাছে মরে মোর ভাই॥
জল নাহি নিল তখন হলাহল বলে।
ঐরূপে ধাইল গারায় ঝারি ফেলে॥
দেখে গিয়া শুয়ে যথা লাউসেন কুমার।
দণ্ড ধরা দুই সর্প মাথার উপর॥
কর্পূর পাতর বলে সর্ব্বনাশ হল।
সাপের দংশনে দাদা লাউসেন মল॥
শব্দ শুনে দুই সর্প পালাল তখন।
কর্পূর পাতর করে ঝাড়িবার পত্তন॥
ধরণী কপালে বেঁধে অঙ্গে তুলে কর।
লাউসেনের গায় হতে ওরে বিষ মর॥
কেলে বলে কেউটা ওরে কেন নাহি যাবি।
গরুড় হুঙ্কারে বিষ ঠায় জল হবি॥
মনসার বরে বিষ হয়ে যাবে পানি।
চমকিয়া উঠিল ময়নার গুণমণি॥
লাউসেন বলে কোথা জল আন খাই।
কর্পূর বলেন তুমি মরে ছিলে ভাই॥
তারাদীঘির জলে সব সাপ গুলা ভাসে।
ঝারি পারায় ফেলে এলাম সাপের তরাসে॥
তোমারে দংশিয়া ছিল দুটা কাল সাপ।
ঝেড়ে বাঁচাইলাম আমি বুঝহ প্রতাপ॥
সেন বলে ভাই তুমি রোজা ধন্বন্তরি।
কত গুণ আছে তোমার বর্ণিতে না পারি,
হেসে হেসে বলেন ময়নার সদাগর।
দেখিব কেমন সর্প জলের উপর॥
তবে সে তোমার আমি রোজাপণা জানি।
কর্পূর বলেন চল দেখাইব ফণী॥
শানবাঁধা ঘাটে গিয়া দুই সহোদর।
কর্পূর দেখায়ে দিল জলের উপর॥

দেখ দাদা লাউসেন সাপের পরিপাটী।
সেন বলে সাপ নয় পদ্ম ফুলের টাঁটি॥
কর্পূরের মুখ চেয়ে হাসে খল খল।
দীঘিতে নামিল পান করিবারে জল॥
জল খেতে নামিল ময়নার গুণমণি।
চরণেতে ধরিল দারুণ কুম্ভীরিণী॥
তাল বৃক্ষ সমান দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দন্ত গুলা দেখি যেন তীক্ষ্ণ খড়্গধার॥
মুনিমুখে শুনেছিলাম গজেন্দ্রমোক্ষণ।
সেন বলে সেই মত রাখ নারায়ণ॥
কুম্ভীরিণী পায় ধরে বুকে নাহি ডর।
লাফ দিয়া উঠে সেন পাড়ের উপর॥
খড়্গ ধরে হানিল ময়নার গুণমণি।
স্বর্গে চলে যায় তখন ইন্দ্রের নাচনী॥
বিমানে চাপিয়া উঠে গগন মণ্ডলে।
লাউসেন রাজাকে তখন ডেকে বলে॥
ধর্ম্মের সেবক তুমি বীর অবতার।
তোমা হতে হল রাজা আমার উদ্ধার॥
উর্ব্বশী নাচনী ছিলাম ইন্দ্রের নগরে।
মন্দাকিনীর জলে গেলাম স্নান করিবারে॥
অঙ্গিরা তপস্যা করেন ঘাটেতে বসিয়া।
ভয় দেখাইনু তাঁরে জলেতে ডুবিয়া॥
দোষ দেখে মহামুনি শাপ দিল মোরে।
কুম্ভীরিণী হও গিয়া তারা দীঘির নীরে॥
ভবানীর খড়্গ হানি রঞ্জার নন্দন।
তবে সে হইবে তোর শাপ বিমোচন॥
এত বলি দেবকন্যা গেল স্বর্গপুর।
শুনে হরষিত হল লাউসেন কর্পূর॥
গৌড় যেতে কোমর বাঁধে লাউসেন রায়।
শার্দ্দুল কুম্ভীর বধ পালা হল সায়॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান সখা মায়াধর।
রাত্রিযোগে বারুই বধূর শুনিব উত্তর॥

ইতি বাঘ বধ ও কুম্ভীরিণী বধ পালা সমাপ্ত।

জামতি পালা।

কুম্ভীরিণী বধিলেন লাউসেন রায়।
কোমর বেঁধে দু ভাই গৌড় দেশ যায়॥
সেন বলে ভেটিব গৌড়ের মহীনাথ।
ফলায় বাঁধিয়া নিল কুম্ভীরিণীর দাঁত॥
সাজন করিয়া কয় ময়নার ঠাকুর।
কোন্ পথে যাব ভাই বল হে কর্পূর॥
আগেতে কেমন গ্রাম হইল নজর।
কর্পূর বলেন ওই বারুইদিগের ঘর॥
ঐ গ্রাম জামতি নগর লোকে বলে।
এমন ব্যক্তি নাহি যে গ্রাম দিয়া চলে॥
বার শ বারুই ঐ গ্রামেতে বসত্।
মেয়ে গুলা উহাদের বড়ই অসৎ॥
কুমারের যদি তারা পথে দেখা পায়।
পাগল করিয়া তবে সঙ্গে লয়ে যায়॥
সতত অঙ্গের বেশ খোঁপায় নানাফুল।
বউড়ি ঝিউড়ি দাদা সবাই সমতুল॥
অধর্ম্মে সতত মন কেহ নয় সতী।
যৌবনের ভরে কেহ নাহি মানে পতি॥
বড়ই গুণিনী শিবা বারুয়ের বেটি।
ঔষধের গুঁড়ায় গ্রামের নাচে মাটী॥
কুঞ্জলতা নাম রামা বারুইএর বৌ।
মৃদুমন্দ হাসিতে ভ্রমরা খুজে মৌ॥
পরের পুরুষ দেখে ক্ষমা নাহি তার।
বাঁধিবেক তোমাকে যেমন চাঁপাহার॥
নিতে আসিবেক এখন তারা দীঘির জল।
নিবেদন করি দাদা বামের পথে চল॥
অম্বুজে দেখিয়া পাছে নাচয়ে খঞ্জন।
পথ ভেঙ্গে চল হে ময়নার তপোধন॥
লাউসেন বলে ভাই হইল বাসনা।
দেখিব বারুইদিগের কেমন অঙ্গনা॥
চল চল ভাই কর্পূর ঐ পথে চল।
কর্পূর বলেন এই লেঠা বেড়ে গেল॥
কদম্বের তলাতে করহে বিলম্বন।
এইখানে বসিয়া দাদা দেখিবে কেমন॥
এত যুক্তি কদম্বের তলায় দাণ্ডাইয়া।
কুম্ভ লয়ে জলকে এল বারুইদের মেয়া॥
মরালগামিনী সব পরমা সুন্দরী।
কারো কাঁথে স্বর্ণকুম্ভ কারো হাতে ঝারি॥
রস পরিহাস কথা মধুর বচন।
গোকুলেতে যেমন চলেছে গোপীগণ॥
বসন্তে পরাণ কাঁদে কোকিলের স্বরে।
ধৈরজ না হয় মন যৌবনের ভরে॥
নাসায় বেসর দোলে পিঠে সোণায় ঝাঁপা,
মালতী মাথায় নাগর ভুলান খোঁপা॥
অলঙ্কার কিরণে পতঙ্গ নাহি চলে।
শোক শিশুর টিকা সবার সিন্দুরের কোলে,
নীল পীত বসন অঙ্গেতে শোভে চুয়া।
চাঁদমুখী সকল বদনে পান গুয়া॥
তারাদীঘির জল নিতে কলসী লইয়া।
শাণ বাঁধা ঘাটে সব উত্তরিল গিয়া॥
কদম্ব তলায় রাজা কর্পূরের সাথে।
গোপীগণ যেমন দেখিল যদুনাথে॥
রূপ দেখে সখী সব কাতর পরাণ।
রামচন্দ্র বাঁড়ুর্য্যে ধর্ম্মের গীত গান॥

ত্রিপদী ছন্দেন গীয়তে—

কদম্ব তলাতে, কর্পূরের সাথে,
দাণ্ডাইয়া ময়নার ভূপ।
যতেক সুন্দরী, কুম্ভ কাঁখে করি,
অবাক্ হয়ে দেখে রূপ॥
রূপের লাবণ্য, দেখে ধন্য ধন্য
করে বারুয়ের সুতা।
বিরলে বসিয়া, কত সুধা দিয়া,
নির্ম্মাণ করেছে ধাতা॥
যত রামাগণ, মুগ্ধ হল মন,
কর্পূর লাউসেনে দেখি।
হেন মনে হয়, ত্যজি লজ্জা ভয়,
পরাণে করিয়া রাখি॥

দুই সহোদর, রাজার কুমার,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন।
হইল অন্তর, বাণে জর জর,
ধৈরজ না ধরে প্রাণ॥
কুন্তল চাঁচর, দন্ত কুন্দ কোর,
ওষ্ঠ পক্ক বিম্বফল।
দেখ দেখ সই, ভাসি দন্ত ওই,
আছে দেবতার বল॥
জিনি খগরায়, উন্নত নাসায়,
তিলক রচিত শোভা।
কি দিব উপাম, মুকুতার দাম,
বদন মৃগাঙ্ক আভা॥
আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী,
হাসিতে বিজরী খেলে।
ভুরু কামধনু, স্বর্ণ জিনি তনু,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে॥
এই গুণনিধি, এক রাত্রি যদি,
বঞ্চে এ অবলা সনে।
যুক্তি কর সবে, তবে প্রাণ রবে,
জর্জ্জর মদন বাণে॥
আমরা অবলা, বিরহের জ্বালা,
কে এত সহিতে পারে।
যদি সঙ্গ পাই, বার হয়ে যাই,
অনল মেটিয়া ঘরে॥
স্থির নহে মন, নবীন যৌবন,
স্বামী মন নাহি তোষে।
যতেক অসতী, নিন্দা করে পতি,
মদন তরঙ্গ রসে॥
ধর্ম্মের চরণে, রামচন্দ্র ভণে,
চামটে যাহার বাটী।
কর অবধান, গৌরীর সন্তান,
গয়ঘড় বন্দীঘাটী॥
তরুমূলে লাউসেন কর্পূরে দেখিয়া।
পরাণ ধরিতে নারে বারুইদের মেইয়া॥
বিরহিণী সবে প্রাণ ধরিতে না পারে।
এত দিন এমন বর ছিল কার তরে॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া যেন ভুলিল গোপিনী।
নিজ পতি নিন্দা করে যত নিতম্বিনী॥
লীলাবতী বলে সই কইতে লাজ বাসি।
সম্বন্ধ করে বিভা দিলেক আঁটকুড়ি মাসী॥
দুঃখে কাল গেল দিদি পতি মোর খোঁড়া।
কাজ কর্ম্মে দেখা নাহি গরব তার বাড়া॥
চলে যেতে যেমন ভানিয়া যায় ধান।
ভাবিতে গণিতে মোর না রহে পরাণ॥
জয়াবতী বলে সই বড় দুখ আছে।
ছেলে বরে পড়ে দিদি প্রাণ নাহি বাঁচে॥
মালতী বলেন সই ভাল পতি তোর।
গেঁড়া পতির গুণ কইতে প্রাণ কাঁদে মোর
সব কাজে ডেড়ি সই স্বামী যার গেঁড়া।
কোলে শুয়ে থাকে যেন পাউড় কুমড়া॥
সুধামুখী বলে সই করি নিবেদন।
বাঁজুরা বরে পড়ে না বাঁচে জীবন॥
সাধ করে যদি তেল দিতে যাই পায়।
বাতকর্ম্মের বাসে হায় নাক জ্বলে যায়॥
সুভদ্রা বলেন সই বড় দুঃখ বটে।
আবুয়া বরে পড়ে দিদি মোর প্রাণ ফাটে॥
কালে ভব্যে আসিয়া যখন করে লেটা।
কোমল শরীরে যেন বাজে কিয়া কাঁটা॥
মল্লিকা বলেন সই মোর পতি ক্ষেপা।
অল্প কালে বিভা দিয়া বাদলা দিলেন বাপ।
নূতন যৌবন মোর স্বামী নয় রত।
অন্য ভ্রমরে মধু যেচে দিব কত॥
ললিতা বলেন সই শুন মোর ভাষ।
এই নাগর লইয়া পূরিব আমি আশ॥
বিরহের জ্বালায় পরাণ কেঁদে উঠে।
মধু হল বিস্তর ভ্রমরা নাহি আঁটে॥
জনম দুখিনী মোরে করিলেন হরি।
কালা মোর স্বামী সতত পুড়ে মরি॥
সম্বন্ধ করিয়া মামা সাধিলেন বাদ।
ছেলের মুখ দেখিতে আমার হইল সাধ॥
বিরলে পাইয়া যদি ঠারে ঠোরে কই।
কপাল খাইয়া ভেড়া বুঝে নাহি সই॥

বিমলা বলেন সই তোর পতি ভাল।
অন্ধক স্বামীতে পড়ে মোর প্রাণ গেল॥
বিধাতা করিল সই আমাকে বঞ্চিত।
মন দিয়া শুন মোর স্বামীর চরিত॥
রন্ধন করিতে ভাল জানি ঝালে ঝোলে।
হাতে ধরে বসাই ওদন দিয়া কোলে॥
কোলেতে অন্নের থালা ব্যঞ্জন হাতাড়ে।
জলের ঝারি বলে ধয়ে বিড়ালের ঘাড়ে॥
শিবানী বলেন সই কর অবধান।
বুড়াতে পড়িয়া গো আমার গেল প্রাণ॥
পুইখাড়া রাঁধিলে করয়ে গণ্ডগোল।
প্রত্যহ এখন আমি কোথা পাব ঝোল॥
বসিলে উঠিতে নারে সদাই দুর্ব্বল।
জ্বর হলে কোথা হোতে ধরেছে কাঁয়ল॥
ঘরে বসে করে যখন বকিতে পত্তন।
কাপড় ছাড়িয়ে তখন পালাতে করি মন॥
এক দণ্ড ছাড়ে নাই রোগের চুপড়ি।
এ সম্বন্ধ করেছিল খুড়ী আঁটকুড়ি॥
শর্ব্বাণী বলেন সই ওই মনস্তাপ।
গোদা বরে বিবাহ দিলেক মোর বাপ॥
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হল শেষ।
গোদের সেবা করিতে অনেক পাই ক্লেশ॥
কুজ্ঝটিকা মেঘের বাতাস যদি পায়।
কুয়াজ্বরে ঘুরে গোদ গোসার মাথা খায়॥
ভাদ্রমাসে পাঁকুইএর সানতায় গলে।
হ্যাকার উঠয়ে দেখে ভোজনের কালে॥
পুড়ার সমান গোদ ওলের পারা বেঁজা।
রুদ্রাণী বলেন সই পতি মোর কুব্জা॥
পিঠে কুব্জ দারুণ গলায় গলগণ্ড।
সুখের দশা আমার নাহিক এক দণ্ড॥
এইরূপে যত নারী নিন্দা করে পতি।
মনে মনে কুঞ্জলতা করিছে যুকতি॥
ভাবনা করিছে শিবা বারুয়ের ঝি।
ভুলাইতে নাগর উপায় করি কি।
বিদেশী কুমার সঙ্গে কথা নাহি হল।
শাস্ত্রমত এক বুড়ী বুঝাতে লাগিল॥
স্বামীর সেবাতে স্বর্গ স্বামী কল্পতরু।
স্বামীর সমান আর কেবা আছে গুরু॥
খোঁড়া কুব্জা অন্ধক নিন্দিত যদি হয়।
কন্দর্প সমান অঙ্গ তার সম নয়॥
কথা গুলা শুনিয়া জ্বলিয়া গেল গা।
জল লইয়া মাগী বাড়ীতে চলে যা॥
বুড়ীর মুখেতে তবে শুনিয়া কাহিনী।
গমন করিল তখন যত নিতম্বিনী॥
কুঞ্জলতা বলে মোর প্রাণ কেমন করে।
বার হয়ে যাব নিয়া বিদেশী কুমারে॥
সুবেশ করিতে রামা প্রবেশিল ঘর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন মায়াধর॥
মহল প্রবেশে রামা হইতে সুবেশা।
অনিরুদ্ধে দেখিয়া ক্ষেপিল যেন ঊষা॥
সেনের দেখিয়া রূপ ভুলাবার তরে।
বসিলেন কুঞ্জলতা বেশ করিবারে॥
ঔষধের পেঁড়া এনে রাখিল সম্মুখে।
বাম হাতে দর্পণ মাজিয়া রূপ দেখে॥
সুবর্ণ চিরুণি রামা ধরিয়ে তখন।
আঁচরিল কুন্তল জিনিয়া নবঘন॥
মালতী মল্লিকাদামে বাঁধিল কবরী।
লোটনের আগেতে সোণার ঝাঁপাঝুরি॥
সিন্দুর পরিল প্রভাতের দিনমণি।
বিধুমুখে মৃদুহাসি কনকবরণী॥
চন্দনের বিন্দু দিল অলকার কাছে।
নবঘন দেখিয়া ময়ূর যেন নাচে॥
হরিসুত ফাঁদি দিল নাসার উপর।
নয়নে কাজল দিল জিনি জলধর॥
দশন মুকুতাফল বিজলীর পাতি।
শ্রবণে পরিল সোণা গলে গজমতি॥
কুচগিরি কাঁচুলিতে করি আচ্ছাদন।
যেখানে যে সাজিল পরিল আভরণ॥
ঘাগরা পরিয়া দিল নেতের উড়ানী।
চরণে নূপুর পরে কটিতে কিঙ্কিণী॥
শঙ্খের আগেতে দিল সুবর্ণ কঙ্কণ।
সুগন্ধি চন্দন চুয়া অঙ্গে বিলেপন॥

ছাওয়াল ঘুমিয়া আছে পালঙ্ক উপরে।
মনে করে এইবার ভেটিব নাগরে॥
যাত্রা করে কুঞ্জলতা বাড়াইল পা।
ছাওয়াল উঠিয়া বলে কোথা যাও মা॥
দুগ্ধ খাব বলে গিয়া ধরিল আঁচল।
সুধার উপর যেন ঢালিল গরল॥
বলিতে লাগিল রামা গণিয়া প্রমাদ।
পাপ ছেলে হইতে বেরুতে হল বাধ॥
গাল টিপে দিয়ে তারে বলে কুঞ্জলতা।
ঘরে বসে থাক্ গিয়া বাপের খেয়ে মাথা॥
দুগ্ধপোষ্য ছাওয়াল প্রবোধ নাহি মানে।
গমন করিল রামা সচিন্তিত মনে॥
পশ্চাতে গড়ায়ে শিশু কেঁদে কেঁদে যায়।
বিরহের জ্বালায় ফিরিয়া নাহি চায়॥
রাজপথে চলেছে ময়নার গুণমণি।
কাতর হইয়ে রামা আগুলে সরণি॥
কটাক্ষেতে মদন চঞ্চল অতিশয়।
ঈষৎ হাসিয়া রামা মাগে পরিচয়॥
কপট ত্যজিয়ে মোরে কহ নিজ নাম।
নিবাস বটয়ে কোথা যাবে কোন গ্রাম॥
পরিচয় দিয়া মোরে বাঁচাও পরাণ।
এত শুনে লাউসেন কর্পূর পানে চান॥
কর্পূর বলেন দাদা এখন কেন চাও।
ভারি ভূরি গেল পরিচয় দিয়ে যাও॥
লাউসেন বলে রামা কর অবগতি।
কর্ণসেন পিতা মোর মাতা রঞ্জাবতী॥
নাম মোর লাউসেন ময়নার ঠাকুর।
দুই সহোদর মোরা অনুজ কর্পূর॥
মহামদ পাত্র মামা, মেসো গৌড়েশ্বর।
রাজ সম্ভাষণে যাব গৌড় নগর॥
এত যদি কহিল ময়নার গুণমণি।
পরিচয় শুনে কিছু কহে নিতম্বিনী॥
মোরে সঙ্গে করহ ময়নার অধিকারী।
চামর ঢুলাব আমি হয়ে সহচরী॥
মনে করি দুজনে বিদেশে করি ঘর।
তুমি হোলে প্রাণনাথ কর্পূর দেওর॥
ঘর হল আমার বিষের সমতুল।
অন্ধক না জানে রাজা পরশের মূল॥
বসন্তের বায়ে মীনকেতু করে জোর।
ভুজলতায় বাঁধিয়া পরাণ রাখ মোর॥
এত যদি কুঞ্জলতা কহিল বচন।
কর্ণে হাত দিয়া সেন স্মরে নারায়ণ॥
ইষ্টদেব আমার শ্রীধর্ম্ম অধিকারী।
এ কর্ম্ম আমার নয় শুন গো সুন্দরী॥
কাতর পরাণ হল সেনের বচনে।
ধাইল মাতঙ্গ যেন মাহুত বিহনে॥
গড় করে পড়িল সেনের ধরে পা।
লাউসেন বলে তুমি রঞ্জাবতী মা॥
এত শুনি হল রামা আগুন সমান।
কোপেতে কাঁপয়ে ওষ্ঠ লোহিত নয়ান॥
বলে রামা এইবার ঠেকিলি মোর ঠাঁই।
দেখিব কেমন রাখে শ্রীধর্ম্ম গোঁসাই॥
কাছে ছিল বালক ধরিল তার শিরে।
ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে দিল কুয়ার ভিতরে॥
বিপাকে পড়িয়া গেল লাউসেন রায়।
কর্পূর পাতর পিয়া বনেতে লুকায়॥
ডাকাডাকি করে রামা করে হাহাকার।
ছেলে মেরে যায় মোর বিদেশী কুমার॥
কুমারে ধরিয়ে টানে বারুয়ের বেটী।
সহরের লোক শুনে এল ছুটাছুটি॥
মায়া কান্না কেঁদে দেয় রাজার দোহাই।
দশমুখে লোক জন ছুটে ধাওয়া ধাই॥
কেহ বলে কি হলরে ভাল করে বল।
সরাণের ধারে কেন শুনি কোলাহল॥
কোথা হতে এল ডাকু যায় ছেলে মেরে।
লাউসেনে ধরিলেক বলিয়া ফাঁসুরে॥
সমাচার পেয়ে তখন ধাইল কোটাল।
পাপীজনে যেমন ঘেরিল যমকাল॥
আভরণ কেহ লয় কেহ ফলা খাঁড়া।
অক্রুরমণি বাঁধে সেনে করে পিছু মোড়া॥
সঙ্কটে পড়িয়া সেন গণিল প্রমাদ।
বেঁধে ধরে লয়ে যায় দিয়া চোর বাদ॥

চরণে ডাঁড়ুকা দিল হাতকড়ি করে।
বন্দী করে রাখিলেক লয়ে কারাগারে॥
বুকে তুলে দিলেক পাথর জগদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥

অষ্টাক্ষরী ছন্দ :—

বন্দী হয়ে কারাগারে,
সেন ভাবে মায়াধরে,
বিপাকে পরাণ যায়,
রক্ষা কর ধর্ম্মরায়।
মানসিক করে পূজা,
কাঁদে ময়নার রাজা।
সকলই করিতে পার,
নানা যন্ত্রে তুমি ফির,
তুমি আগমের সার,
নিরঞ্জন নিরাকার,
তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ,
অনন্ত তোমার নাম,
কে জানে তোমার মায়া,
নিজগুণে কর দয়া।
সারথি হইয়া রথে,
রাখিলে পাণ্ডব সুতে,
প্রতিজ্ঞা হনুর সনে,
সমুদ্র বাঁধিব বাণে,
মরুৎ নন্দন ডরে,
রাখিলে অর্জ্জুন বীরে।
হিরণ্য কশিপু কক্ষা,
প্রহ্লাদে করিলে রক্ষা,
ক্ষীরোদ সমুদ্র মাঝে,
উদ্ধারিলে গজরাজে।
কারাগারে যায় প্রাণ,
প্রভু কর পরিত্রাণ,
মায়ের না শুনে বাণী,
বিদেশে হারালাম প্রাণী।
গৌড় যেতে ছিল সাধ,
দৈবেতে সাধিল বাদ।
এই রাজ্য ঢক্ক পুরী,
চুরি ডাকা নাহি করি,
অবিচারে দেয় ক্লেশ,
পুণ্যের নাহিক লেশ।
কারাগারে বন্দী রাখে,
পাথর দিয়াছে বুকে।
স্তব করে লাউসেন,
স্বর্গে ধর্ম্ম জানিলেন,
শুন বাছা হনুমান,
সেনে দেহ প্রাণদান।
বিশ মনা বীর নন্দী,
প্রবন্ধে করিল বন্দী।
উদ্ধারহ গিয়া সেনে,
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে॥
সেনের বন্ধন মুক্ত করিবার তরে।
ভার দিল ধর্ম্মরাজ হনুমান বীরে॥
গোলক ত্যজিয়া চলে পবনকুমার।
অবিলম্বে পেল গিয়া জামতিনগর॥
কারাগারের কপাট ভাঙ্গিয়া পদাঘাতে।
উপনীত হনুমান সেনের সাক্ষাতে॥
বাম হাতে বুকের পাথর ঝিঁকে ফেলে।
বন্ধন ঘুচায়ে সেনে করিলেন কোলে॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

আলিবর্দ্দি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আবার উড়িষ্যা।

রাজসিংহাসনের পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ। কাহারও কাহারও রাজ-সিংহাসনের পথ সুষুমাময় সৌরভময় গোলাপস্তবকে বিভূষিত হইতে পারে, কিন্তু অনেকেরই ভাগ্যে তাহা ঘটে না। আলিবর্দ্দি সুশাসনে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, প্রকৃতিরঞ্জনে তিনি অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু বহুবিধ বিপ্লববিভ্রাটে তিনি নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। বিপ্লব চারি দিকে। আবার উড়িষ্যায় বিপ্লব। পাঠক! মনে আছে, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরশিদ কুলি খাঁকে পরাজয় করিয়া তিনি দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে সেখানকার শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ অপরিণামদর্শী যুবা; আলিবর্দ্দি খাঁ রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থার জন্য একটী মন্ত্রি-সভার হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি সেইজন্য কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেন না। যাহাতে রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এমন কি আত্মরক্ষা সমর্থযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ের বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইতেন না। তিনি সৈন্যগণের বেতন হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার শুভানুধ্যায়ী, যাহারা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাঁহারা তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য অভিলাষী, তিনি তাহাদিগের বেতন পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতার কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেন না, সুতরাং অনেকেই তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নূতন লোকও তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইয়া অধিক দিন কার্য্য করিতেন না। একে একে পুরাতন বিশ্বস্ত লোকেরা সৈয়দ আহম্মদের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল। রাজনীতির ইহা এক মহাভ্রম; এই ভ্রমের উপর আর এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার কতকগুলি কর্ম্মচারী এবং সেনাপতি উড়িষ্যার রাজধানী কটকেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহারা পূর্ব্ব প্রভুর অধীনে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। বাহিরে ইহাঁরা সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু মনে মনে

তাঁহারা পূর্ব্ব প্রভুর অনুরক্ত ছিলেন। অবোধ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কিছুতেই ইহাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই, পরন্তু তাঁহাদের অবাধ অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁরা মুরশিদকুলী খাঁর জামাতা মির্জ্জা বথর খাঁকে অন্তরের সহিত সম্মান করিতেন।

এই সময়ে কটকে এক ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ফকীর বাল্যকালে সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া কটকে আগমন করেন। কটকে সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন হয়। এই পুনর্ম্মিলনে তাঁহাদের সেই পূর্ব্বকার প্রীতি উন্মেষিত হইয়া উঠে। ফলে ফকীর সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সুদৃঢ় সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নয়নে নয়নে প্রীতি, মনে মনে প্রীতি—উভয়ে প্রীতির সজীব প্রতিমূর্ত্তি;—সখ্যের সুন্দর প্রতিকৃতি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ফকীর হৃদয়বান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন না। এদিকে সৈয়দ আহম্মদ নব রাজশক্তির প্রভাবে নিত্য উদ্দাম উদ্ভ্রান্ত। তিনি শাসনকর্ত্তৃত্বের মোহময়ী শক্তিমদিরায় সতত উন্মত্ত। যৌবনে তাহার শত শত বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রীতি-সখ্যে এই ভাক্ত অধার্ম্মিক ফকীরের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

ফকীরের মরীচিকাময়ী মায়ায় সৈয়দ আহম্মদ মজিলেন। ফকীর কি কুহকে কি মন্ত্র সৈয়দ আহম্মদের কর্ণে ঢালিয়া দিল, কে বলিতে পারে? ফকির বলিলেন, অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তি অনেক অর্থ গোপনে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, সৈয়দ খাঁ তাহা বিশ্বাস করিলেন। তিনি তখনই সেই লোককে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং গুপ্ত অর্থ বাহির করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি অসম্মত হইলে তাহার উপর অমানুষিক যন্ত্রণাময় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। ফকীর বলিলেন, অমুক স্ত্রীলোক সাকারা সুন্দরী, অমনই সৈয়দ আহম্মদ যেরূপেই হউক সেই সুন্দরী স্ত্রীলোককে আপন প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। ফকির যাহা বলিতেন, সৈয়দ আহম্মদ ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাই পালন করিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব কৌশলে ফকীর সুন্দরী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিয়া দিতেন, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে অত্যাচার যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে উড়িষ্যা রাজ্য পরিপূর্ণ হইল। অত্যাচারিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের এবং লাঞ্ছিত প্রপীড়িত রমণীদিগের আকুল ক্রন্দনে স্বর্গের সিংহাসন টলিল।

ক্রমে এরূপও হইল পূর্ব্বে মুরশিদকুলী খাঁর অধীনে যাঁহারা রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য পরিচালন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই নব-শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারে আপনাদিগের দেয় সমস্ত টাকা জমা দিতে পারেন নাই। কিন্তু সরকার অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। যাহা দিতে পারেন নাই, তাহা আর দিতে হয় নাই। নবীন শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহম্মদ ইহাদিগকে সেই অবশিষ্ট টাকা রাজসরকারে জমা দিবার জন্য ঘোরতর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।

অত্যাচার চরমে উঠিল। সহিষ্ণুতার সীমা আছে। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ খাঁর অত্যাচারে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদিগের সহিষ্ণুতার সীমা বদ্ধ রহিল না। ফলে সৈয়দ আহম্মদকে রাজ্যচ্যুত সঙ্কল্পে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈয়দ আহম্মদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় নগরবাসীরা এক সঙ্গে মিশিয়া এক প্রাণে গোপনে সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সর্ব্বনাশ করিবার

কল্পনা করিতে লাগিল। সকলের মনঃকরণ এবং সকলের বাহু মিশিয়া যেন এক হইল। ষড়যন্ত্রে সাফল্য সুদূরপরাহত হইল না। কেননা সৈয়দ আহম্মদ খাঁর অধিকাংশ পুরাতন কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলে ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগ দিল। সকলেই প্রকৃতপক্ষে মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা মির্জ্জা বথর আলির পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সকলেই সৈয়দ আহম্মদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মির্জ্জা বথরকে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সৈন্য কমিয়া গিয়াছিল, এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তাঁহার রাজ্য সুদৃঢ়, সুরক্ষিত। এইরূপ ভাবিয়াই তিনি নিশ্চিন্তমনে নির্ভাবনায় সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। চারিদিকে যে ষড়যন্ত্রের চক্র চলিতেছে, তাহা তিনি মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মির্জা বথর আলিকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইয়া উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার যে ষড়যন্ত্র হইতেছে, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

মানুষ নিত্য কত সঙ্কল্পলীলায় কত স্বর্গসুখানুভব করিয়া থাকে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে কল্পনার সুখ সকল সময়ে বাস্তবে পরিণত হয় না। ভগবৎ কৃপায় কাহারও কল্পনা কর্ম্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, মির্জ্জা বাথরের সৌভাগ্যে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। মির্জ্জা বথর নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উড়িষ্যার রাজ্যসুখ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রাজ্যসুখের যেন সজীব ধ্যানমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে সততই জাগরূক ছিল। তিনি শ্বশুর মুরশিদ কুলিখাঁর অবসন্ন হৃদয়কে উৎসাহের সুরাসার ভৈষজ্যে উত্তেজিত করিবার জন্য সতত প্রয়াস পাইতেন। যাহাতে মুরশিদ কুলি খাঁ আবার বলসঞ্চয় করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তন্নিমিত্ত তিনি মুরশিদ কুলি খাঁকে প্রস্তুত হইবার জন্য পরামর্শ দিতেন। কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁ জামাতার কথায় একটু মাত্র বিচলিত হইতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সময় ভাল নহে, তাঁহার এমন শক্তি নাই, এমন বুদ্ধিবৃত্তি নাই যে তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত সহায়সম্পন্ন আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই জন্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। জামাতার কোন পরামর্শ তিনি কর্ণপাত করিলেন না।

জামাতা বাথর খাঁ বুঝিলেন, আর শ্বশুরের ভরসা নাই। কিন্তু তিনি উড়িষ্যার রাজ্য সুখলাভের আশাও পরিত্যাগ করিলেন না। আশা অনেকেই করে, কিন্তু আশার ন্যায় কাজ করিতে কয়জন পারে? বথর খাঁ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশার মত কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার চেষ্টায়, আপনার অধ্যবসায়ে, আপনার বুদ্ধিবলে এবং আপনার ভগবৎ নির্ভরে দাক্ষিণাত্যে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার সীমান্তে অনেক শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহারা তৎকালে স্বাধীন রাজার ন্যায় অনেকটা স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সৈন্য ছিল, তাঁহাদের অর্থ ছিল, তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র ছিল, তাঁহাদের দুর্গ-পরিখা ছিল। এই সব জমিদারের অনেকের নিকটই বাথর খাঁ পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক সময় দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া এই সকল জমিদারদিগের নিকট আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

জমীদারগণ প্রকৃতই বাখর খাঁকে বড়ই ভালবাসিতেন। কটকে যে সৈয়দ আহম্মদের বিপক্ষে ঘোর ষড়যন্ত্র হইতেছে, বাখর খাঁ জমিদারদিগের নিকট থাকিয়া তাহা অবগত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কৃতসঙ্কল্প, এ সংবাদ পাইয়া তিনি উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে তিনি তদানীন্তন উড়িষ্যাবাসী সওদাগর, ধনাঢ্য পোদ্দার, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে লাগিলেন, কটকে কখন্ কি হইতেছে, তাহার নিত্য সংবাদ পাইবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। উড়িষ্যার প্রান্তসীমায় বাখর খাঁ অবস্থিতি করিতেছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা এ সংবাদ পাইয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে গোপনে বাখর খাঁকে পত্র লিখিলেন। বাখর খাঁও গোপনে পত্র লিখিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বিশেষ সাবধান হইবার পরামর্শ দিলেন। একদিন তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে স্পষ্টই বলিলেন;—আপনারা আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। সৈয়দ আহম্মদ খাঁর সেনাপতি গুজর খাঁর অধীন সৈন্য-সংখ্যা এখন বড় কম, সুতরাং এক্ষণে শক্তিহীন। আপনারা সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করুন। ফলে তাহাই হইল। একদিন সকলে সমবেত হইয়া কটকের রাজপথে মহা জনতা করিয়া বসিল, চারিদিকেই জনতা হইল, চারিদিকেই সমবেত লোকবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে সৈয়দ আহম্মদ খাঁর অত্যাচারকাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। জনতার আকাশবিদারী চীৎকারে সমস্ত কটক সহর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ সে চীৎকারে চমকাইয়া উঠিলেন। তিনি সহসা যেন সুপ্তোত্থিত হইয়া গুজর খাঁকে জনতার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। যাহাতে উন্মত্ত প্রজাবৃন্দ শান্ত হয়, গুজর খাঁকে তাহারই পরামর্শ প্রদান করা হইল। ফলে কিছুই হইল না, গুজর খাঁ সেই উন্মত্ত জনকোলাহল কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। গিরিগহ্বরে যখন ধাতব দ্রব্যসমূহ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা গিরিহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, সে উচ্ছ্বাসের গতিরোধ কে করিতে পারে? সৈয়দ খাঁর অত্যাচারে প্রজাবৃন্দের হৃদয় মধ্যে যে ভাবসমূহ উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহা জলন্তপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়াছে। গুজর খাঁর সাধ্য কি তাহার গতিরোধ করে?

এই সময়ে বাখর খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহা মুরাদ এই উন্মত্ত জনবৃন্দের অগ্রণী ছিলেন। এই সাহা মুরাদ মুরশিদ কুলি খাঁর পরাভবের বিপন্ন অবস্থায় তাঁহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি সামান্য কার্য্য হইতে আপনার অটুট অধ্যবসায়ে রাজসরকারে উন্নত পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি সাহসী ও শক্তিশালী, উন্মত্ত জনবৃন্দ ইহাঁরই কটাক্ষ-ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছিল। কি ঘোর উন্মাদ উত্তপ্ত জনতা! এ জনতার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারে? গুজর খাঁ আপন লোকজন সহ রাজপ্রাসাদে যাইতেছিলেন। উন্মত্ত জনবৃন্দ তাঁহাকে দেখিয়া তখনই আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে সকলে গুজর খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

আর রক্ষা নাই। জনতার অগ্রণী সাহা মুরাদ যুক্তি দিলেন, যে সকল লোক রাজপ্রাসাদের দ্বার রক্ষা করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে ভয়-মৈত্রী-প্রদর্শনে দ্বারের চাবি চাহিয়া লওয়া হউক। দ্বাররক্ষকদিগের নিকট চাবির কথা বলা হইল, দ্বাররক্ষকগণ বিপদ্ দুরতিক্রম বুঝিয়া দ্বারের চাবি ফেলিয়া দিল।

দ্বার উন্মুক্ত হইল, জনতাস্রোত অবাধগতিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল। এই সময়ে বাখর খাঁ সর্ব্বাগ্রে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বাখর খাঁ উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। মুরশিদাবাদে নবাব আলিবর্দ্দির নিকট এই দুঃসংবাদ উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহম্মদ বন্দী হইয়াছে। বাখর খাঁ উড়িষ্যারাজ্য করায়ত্ত করিয়াছে, এ সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দি খাঁ মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন বাখর খাঁ কাহার সাহসে, কাহার তেজে, কাহার পরামর্শে, কাহার প্রণোদনে উড়িষ্যা রাজ্য অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছেন? তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিজাম উলমুলুক এই মহাবিপ্লবের মূলাধার। এখন কি করা কর্ত্তব্য, আলিবর্দ্দি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এতৎ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিবার মানসে তিনি একটি সভা করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ এই সভায় উপস্থিত হইলেন। এ সভায় তাঁহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবও আহূত হইলেন। সৈয়দ আহম্মদের জননীর সহিত পরামর্শ করা আলিবর্দ্দি খাঁ যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকেও পরামর্শ-সভায় উপস্থিত থাকিতে হইল। সৈয়দ আহম্মদের জননী—আলীবর্দ্দির ভ্রাতৃজায়া, করুণকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন;—আর উড়িষ্যা রাজ্যে কাজ নাই। বাখর খাঁই উড়িষ্যার সিংহাসন লউক, দেবর! আমার দুঃখিনীর ধন সৈয়দ আহম্মদকে আনিয়া দাও। আমি যে আমার তিন পুত্রের মধ্যে তাহাকেই অধিক ভালবাসি। যাহাতে তাহার মুক্তি হয়, তাহার উপায় কর। তাহার মুক্তির জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহাও কর। যুদ্ধে কাজ নাই, রাজ্যে কাজ নাই। আমি সর্ব্বস্ব ধন সৈয়দ আহম্মদকে চাই।

ভ্রাতৃজায়ার করুণ ক্রন্দনে আলিবর্দ্দির প্রাণে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি যদি বাখর খাঁর পদানত হই, তাহা হইলে আমার মান কোথায় থাকিবে? তাহা হইলে আমার শাসনশক্তির ভ্রূকুটী-বিভঙ্গ কোথায় রহিবে? এই সকল ভাবিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ ভ্রাতৃজায়ার প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিলেন না। তিনি সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে বিদায় দিলেন। মুস্তাফার সহিত পরামর্শ হইল। মুস্তাফা খাঁ বলিলেন;—"তাহাও কি হয়? বাখরের কৃপাপ্রার্থী হইব, না তাহা হইবে না। সৈন্য আছে—তরবারি আছে, অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। আলিবর্দ্দি মুস্তাফা খাঁকে শত শত ধন্যবাদ করিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু আলিবর্দ্দির মনে ঘোর সন্দেহ; দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিজাম উলমুলুক বাখর খাঁর পৃষ্ঠপোষক। প্রকৃত যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধার করা সহজসাধ্য হইবে না। আলিবর্দ্দি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। কিন্তু তিনি চিত্ত দৃঢ় করিলেন। বাখর খাঁর সহিত যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি আপনার প্রাচীন সেনাপতিদিগকে উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহের আদেশ করিলেন। যে সকল সৈন্য উপস্থিত আছে, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিবার আদেশ দিয়া আলিবর্দ্দি স্বয়ং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। নিম্নলিখিত সেনাপতির উপর সৈন্যসংগ্রহের ভার পড়িল। মুস্তাফা খাঁ;—পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী;

সামসের খাঁ তিন সহস্র অশ্বারোহী; সর্দ্দার খাঁ দুই সহস্র অশ্বারোহী; উমার খাঁ তিন সহস্র, আতাউল্লা খাঁ দুই সহস্র; হায়দার কুলি, ফকির উল্লা বেগ খাঁ এবং মির্জাফর খাঁ প্রত্যেককে এক এক হাজার; মিরসফ-উদ্দিন এবং সর্ফ মহম্মদ মাজুম;—প্রত্যেকে পাঁচ শত; আমানত খাঁ পনর শত; মির কাশিম খাঁ দুই শত; বাহাদুর আলি খাঁ পাঁচ শত। ফতে রাও, চিহিদুন এবং অন্যান্য হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের উপর পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগ্রহের আদেশ হইল। ফতে রাও সৈন্যদিগের বেতন-বিতরণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

যুদ্ধের সকল আয়োজনই হইল। আলিবর্দ্দি যুদ্ধযাত্রার জন্য উদ্যোগী হইলেন। যাত্রাকালের পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহম্মদ ও তদীয় পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে আলিবর্দ্দির বীর-হৃদয় বিচলিত হইল। তাঁহার চক্ষুর কোণে জল আসিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী বলিয়া দিলেন;—"যদি যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে যেন প্রিয়তম পুত্র সৈয়দ আহম্মদকে তোমার সঙ্গে দেখিতে পাই। যদি তাহা না হয়, তবে ও মুখ আর দেখাইও না। আলিবর্দ্দি নির্ব্বাক্, তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অতঃপর জ্যেষ্ঠ জামাতা বোজিস খাঁর উপর পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক সৈন্যের আধিপত্য অর্পণ করিলেন। আলিবর্দ্দি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিয়া দিলেন;—দেখিও বৎস! আমি চলিলাম; তুমি সাবধানে রাজ্যরক্ষা করিও।

শুভ দিনক্ষণে আলিবর্দ্দির বিশ্বাস ছিল; তিনি যখন যেখানে যাত্রা করিতেন, তখন দিন না দেখিয়া যাইতেন না। তিনি শুভ দিন শুভ ক্ষণ দেখিয়া উড়িষ্যার যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আলিবর্দ্দি এখন বিংশতি সহস্র অশ্বারোহীর অধিপতি; সঙ্গে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু কামান। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইবার তিনি গদগদ কণ্ঠে উচ্চনাদে বলিলেন, যিনি আমার বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। তিনি যদি সেনাপতি হন, তাহা হইলে তিনিও লক্ষ টাকা পাইবেন, অধিকন্তু তাঁহার অধীন প্রত্যেক সেনা দুই মাসের বেতন পাইবে।

আলিবর্দ্দি যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছেন, বফর খাঁ এ সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আলিবর্দ্দি প্রবলপরাক্রান্ত ও বহু সৈন্যসমন্বিত। প্রথমে তিনি নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া গেলেন, কেমন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সহসা যেন বিদ্যুৎস্পর্শে উত্তেজিত হইলেন। বাখর খাঁ এইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। এখন কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইলে ভুবন ভরিয়া কলঙ্ক রটিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আলিবর্দ্দির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কটক সহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সহরের কিঞ্চিৎ দূরে মহানদের তীরে তিনি শিবির সন্নিবেশ করিলেন। শিবির সম্মুখে গড়বন্দী হইল। স্তরে স্তরে কামানশ্রেণী সজ্জিত হইল। পশ্চাতে মহানদ, সম্মুখে গড়। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তিনি বন্দী সৈয়দ আহম্মদকে সবিশেষ সাবধানে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কোথায়? তিনি শ্বেতবস্ত্রে আবৃত একখানি চতুশ্চক্র গাড়ীর মধ্যে অবরুদ্ধ। দুইজন মোগল তাঁহার রক্ষার্থ নিয়োজিত। এই দুই জন মোগল প্রহরীর উপর এই আদেশ ছিল;—যখন তোমরা দেখিবে যে শত্রুসৈন্য নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তোমরা

ক্ষুরধার বল্লম আঘাতে সৈয়দ আহম্মদ খাঁর প্রাণবধ করিবে। পাঁচশত সৈনা এই বন্দীর গাড়ী বেষ্টন করিয়াছিল। ইহাদের উপর এই আদেশ ছিল যে, তোমরা যখন দেখিবে শত্রুসৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন তোমরা প্রত্যেকে গাড়ীর উপর বর্ষা নিক্ষেপ করিবে। যাহাতে বন্দীর বিনাশ সাধন হয়, তাহাই করিবে, নহিলে তোমরা যে যেরূপে পারিবে, আত্মরক্ষা করিবে।

সুচতুর আলিবর্দ্দি সকল সংবাদ পাইলেন। তিনি কতকগুলি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সৈন্যকে বলিয়া দিলেন, যখনই তোমরা শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খল ভাব দেখিবে, তখনই তোমরা বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া শত্রু-শিবিরে পতিত হইবে। এবং কোন্ স্থানে শ্বেতবস্ত্রাবৃত যান আছে, তাহার সন্ধান লইবে। এইরূপ করিলে সহজে বন্দীর উদ্ধার সাধন হইবে। এই কথা বলিয়া আলিবর্দ্দি মধ্যরজনীতে সৈন্যসহ যাত্রা করিয়া প্রাতঃকালে শত্রু শিবিরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিবর্দ্দির বহুসংখ্যক সৈন্য এবং এইরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিয়া বাখর খাঁর সৈন্যমণ্ডলী চকিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইল। আলিবর্দ্দি খাঁর সৈন্যসমূহ হইতে গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। বাখর খাঁর সৈন্যগণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভয়ে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সকলে আত্মরক্ষার্থ প্রয়াস পাইতে লাগিল। শত্রুসৈন্যের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আলিবর্দ্দির সৈন্যগণ সাহস পাইল। তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া গড়ের অন্তর্ভূত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল; শত্রুসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মুস্তাফা খাঁ ও মির্জাফর খাঁ বন্দী সৈয়দ আহম্মদ খাঁর অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কিঞ্চিৎদূরে সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত শকট দেখিতে পাইলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে সেই শকটের নিকট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দেখিতে দেখিতে আলিবর্দ্দি খাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তীরবেগে ছুটিয়া যাইয়া বাখর খাঁর শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একটী যুবা তাহাদিগকে সেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত শকট প্রদর্শন করিল।

ক্রমশঃ

সমুদ্র-মগ্নাবশিষ্ট দ্বারকাপুরী সন্দর্শনে।

১

দ্বারাবতি! কেন সতি! এ গতি তোমার?
হয়েছে কালিমাময় সৌন্দর্য্য-আধার!
তব অঙ্গ সুকোমল, ছুটি' যার পরিমল
করিত প্লাবিত অহো! এ বিশ্বসংসার?
কেন আজি দেখি শুভে! এ দশা তোমার?

২

যেই পাদ-মূলে তব রাজেন্দ্র-নিচয়
খণ্ড ভারতের, আহা! দিয়ে পরিচয়
দিত অর্ঘ্য করি স্তুতি, গদ গদ ভাবে অতি,
মহা-ভারতের স্রষ্টা জানিয়া তোমায়!
তুমি কি সে দ্বারাবতি? হতেছে বিস্ময়!

৩

প্রবল অধর্ম্মে নর যবে এ ধরায়
হ'য়েছিল উচ্ছৃঙ্খল, পাপের সহায়;
কত শত মরকতে, বৈদূর্য্যের গাঁথা ভিতে
লম্বিত, নীলাম্বু বক্ষে, বসি' অলিন্দায়,
বিচলিত হয়ে দেবি! সে মর্ম্ম-ব্যথায়।

৪

শান্তিময় ধর্ম্ম-রাজ্য সৃজ করুণায়!
ছিল যে মগধ, চেদি তব অন্তরায়,
শুনিলে যাদের নাম, শিহরে আজিও প্রাণ,
চিরধ্বংস তাহাদের করিয়া হেলায়,
সুধার নিলয়ে থাকি' ঢাল সে সুধায়!!

৫

কেন এবে সেই দেবী বিকলাঙ্গী হায়,
বিকলাঙ্গী সে আবার সাগরে মিশায়!
অন্তর্জ্জলি মত এবে, সিন্ধুবুকে দেখি সবে;
দর দর অশ্রু-জলে হৃদি ভেসে যায়—
প্রভাসের সে ঐশ্বর্য্য যত মনে হয়!!

৬

আছ পড়ে' একা নীরে মৃতকল্প-কায়,
যাদব ছাপ্পান্ন-কোটী না দেখি হেথায়!
প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি যাতে, থাকিত কহ্লার ফুটে,
কুমার—কুমুদ-দল, কেহ নাহি রয়,
শ্বেত, নীল পদ্ম দুটী—রাম, কৃষ্ণ হায়!!!

৭

শুনি' সুধামাখা এই রাম, কৃষ্ণ নাম,
বিস্ফারিত কলেবর বিমোহিতপ্রাণ,
বসিল উঠিয়া ধীরে, দ্বারাবতী সিন্ধুতীরে,
অধর কাঁপায়ে গায় বিষাদের গান,—
"কে তুমি? কেমনে এলে এ বিজন স্থান?

৮

"আজিরে শুনিয়ে তোর এ করুণ-তান,
যুগপৎ শোকানন্দে ভাসিল পরাণ;
এই যে বিজন-ভূমি বনাকীর্ণ দেখ তুমি,
শ্বাপদ, ভুজঙ্গ কত করে অবস্থান;
ছিল এ ধরণী-তলে নগরী প্রধান।

৯

"মহা কোলাহল পূর্ণ থাকিত নগরী,—
যাদব—নগরোৎসবে, দিবস শর্ব্বরী;
যবে রথ, অশ্ব, গজে নারায়ণী-সেনা সাজে,
কটকের মহারব গগন বিদারি,
করিত সংক্ষুব্ধ পুরী;—এবে বনস্থলী!

১০

"পাঞ্চজন্য শঙ্খ হেথা বাজিত সতত,
সে নিনাদে ভয়ে ভীত হইত জগত?
দ্বারকায় প্রজাগণ, অনুজীবী, বন্ধুজন,
শঙ্খের ভীষণ-শব্দে থাকিত জাগ্রত!!
মূর্চ্ছিত হইত শত্রু পড়ি' ইতস্ততঃ!!!

১১

"যুগান্তের বজ্র-সম টঙ্কারে যাহার
ভয়াকুল হ'ত নর সমগ্র ধরার,
সেই শার্ঙ্গ-ধনু মরি! করে লয়ে নর-হরি,
নাশিতেন যবে অরি এই দ্বারকার,
বিধূনিত হ'ত কিবা পুরী অনিবার!

১২

"দুর্গম এ দুর্গ ছিল দ্বাদশ-যোজন—
মানব কল্পনাতীত—কৃষ্ণের সৃজন?
দুর্ভেদ্য বিজ্ঞান-বলে, শিল্পের কৌশল খেলে,
আশ্চর্য্য—সমুদ্রতলে দুর্গের স্থাপন,
করিত এ দুর্গরক্ষা চক্র সুদর্শন!!

১৩

"যে চক্রের মহাতেজে মরে শিশুপাল,
নিবে যায় দ্রোণীর সে ব্রহ্মাস্ত্র করাল;
শোভিয়ে কৃষ্ণের করে, ছিন্ন করে ভৌমীশিরে,
বাণের সহস্র বাহু, অতি যে প্রবল;
এ দুর্গের সেই অস্ত্র ছিল মহাবল!!

১৪

"ধরিত যে বক্ষে সদা শ্রীনাথের পদ,
লক্ষ্মীর সেবিত ওরে সেই রাঙা পদ;
ব্রহ্মাদি দেবতা যত, মহাযোগী শত শত,
না পাইয়া ধ্যানে যারে গণিত বিপদ্!
এই সে "আনর্ত্ত" নামে পূত জনপদ।

১৫

"সুবর্ণের গৃহ কত ছিল রে হেথায়,
শোভিত শিখর যার হ'য়ে রত্নময়!
রজতের অন্ন-শালা, পীত-লৌহে অশ্ব-শালা,
হেম-কুম্ভ যাহাদের শিরে সদা রয়;
সুসমৃদ্ধ সেই পুরী,—এই বনময়!

১৬

"মহাপথ, উপপথ, সুচারু-অঙ্গন,
বিচিত্র উদ্যান আর কত উপবন;
স্বচ্ছ-সরোবর শত, স্বরগের পারিজাত,
গরুড়-অঙ্কিত আহা! উড়িয়া কেতন,
করিত রে কত এর শোভা উৎপাদন?

১৭

"আরো শোভা ধরিত এ যবে নারায়ণ,
ষোড়শ সহস্রাধিক মহিষীর মন,
হরিবারে আহা মরি! নিজরূপ তত ধরি',
ভ্রমিতেন প্রতি গৃহে গৃহীর মতন,
কি অপূর্ব্ব শোভা এ যে ধরিত তখন!!!

১৮

শুনিলাম বটে দেবি! এ সকল কথা,
পার কি বলিতে তুমি বসিতেন যেথা,
মাধব যাদব ল'য়ে, মহা-সভা বিরচিয়ে,
করিতে গো আলোচনা জগতের কথা?
জিজ্ঞাসা করে গো "পূর্ণ" পেয়ে মনে ব্যথা!

১৯

"জগতের ভাগ্য-চক্র যাহার ইঙ্গিতে,
হইত রে সুচালিত; ব্যাসের সঙ্গীতে
রাজ-নীতি গাথা যার, র'য়েছে রে সুপ্রচার,
সাম্রাজ্য-নীতির কেন্দ্র—কলির সন্ধিতে—
মিশে গেছে অই দেখ্ বসুধা-অঙ্গেতে!

২০

"যাও বৎস! যাও তথা; ভক্তির সহিতে,
প্রণাম সহস্রবার কর সেই ভিতে;
শক্তিতে মিলায়ে শক্তি, প্রতিভায় করি' ভক্তি,
দুষ্টের দমন আর শিষ্টকে পালিতে,
গঠিত ও মহাসভা জগতের হিতে!!"

২১

চলিলাম দ্রুত-পদে দেবীর আদেশে,
মনের আবেগে একা সভার উদ্দেশে;
উপজিলে সভাস্থল— সুবিশাল সমতল,
আসিল নয়নে জল শোকের উচ্ছ্বাসে!
ভক্তি-ভরে লুটিলাম মহাতীর্থে শেষে!!

২২

বসিলাম অবসাদে, বিষাদে কাতর,
ভিত্তি পার্শ্বে দূর্ব্বাদলে নেত্র-তৃপ্তিকর;
হেরিলাম ভিত্তিস্তর— ত্যাগশীলা মনোহর,
অপঙ্কপাতিতা-মৃতে গাঁথা দৃঢ়তর!—
নিষ্কামের উপাদান মরি! কি সুন্দর!!

২৩

স্তম্ভিত, রোমাঞ্চ হ'ল মম কলেবর,
দেখি স্বর্ণে লেখা এক উহার উপর;—
"আবশ্যক যদি হয়, গড়িতে মহিমাময়,
রাজনীতি সভা কভু জগতে ভিতর,
দিও সেই ভিতে এর ধূলি বা প্রস্তর।

২৪

লিখিও চূড়াতে তার "শ্রীকৃষ্ণ—দ্বাপর;"
আত্মত্যাগ মন্ত্র অহো! জপি নিরন্তর,
রাখিবে সোপানে তার, ভীমার্জ্জুন বলাধার,
জ্যোতিষ্মান্ ব্যাসদেব গৃহ-অভ্যন্তর!!
দেখিবে আসিবে ফিরে কলিতে দ্বাপর!!"

২৫

শ্রান্ত-ক্লান্ত অতিশয়, অলস তন্দ্রায়,
ঢলিয়া পড়িনু সেথা ভূমির শয্যায়।
স্বপন-আবেশে কিবা, নব-ঘন-সম আভ',
পীতাম্বরে কি যে শোভা গলায় মালায়,
চিত্ত-বিমোহন অতি আবার বাঁকায়!—

২৬

হেরি' এ অতুল রূপ উথলে হৃদয়!—
উথলি পড়ে যে রূপ হেলান চূড়ায়!
গণ্ডেতে কুঙ্কুম-লেখা, নাসিকায় তিল-রেখা,
হাসি-মাখা এ মু'খানি কিরণ ছড়ায়,
ধরিয়া মোহন বাঁশি ওই কি বাজায়?—

২৭

"কৃষ্ণা ভাদ্র-অষ্টমীর তমসা নিশীথে
কৃষ্ণ-মেঘ যবে ধীরে, সৌদামিনী ল'য়ে শিরে,
ভাসায় সলিলে তার এই ধরাতল,
লভি জন্ম—বসুধায় করিতে শীতল!
জ্বলেছিল যে অনল, কারাগারে অবিরল,
দহিতে গো পিতা-মাতা, করি সুশীতল
খুলিয়া তাঁদের সেই বন্ধন—শৃঙ্খল!
লোক-হিত তদবধি, ব্রত মোর নিরবধি,
"কালীয়" দমনে যাই মাঠে গোচারণে;
মধু-পূর্ণ করি' হ্রদ রক্ষি জীবগণে!
খেলাই প্রেমের খেলা, কৈশোরের প্রেম-লীলা

বৃন্দাবনে রাখালের গোপিকার সনে,
জগৎ বাঁধিতে প্রেম-অক্ষয় বন্ধনে!
তাই কেঁদেছিল প্রাণ, করিতে রে পরিত্রাণ,
জরাসন্ধ-কারাগারে বন্দী-রাজগণ;
হাহাকার করি' যাঁরা ডাকে অনুক্ষণ—
"কোথা হে দয়াল হরি! দ্বারকায় পরিহরি,
এস হেথা আমাদের উদ্ধার কারণ,
তুমি যে অনাথ-নাথ বিপদ্-তারণ!"
শুনি এই উতরোল, সমাজে ধরমে গোল,
সুযোগ্য পাণ্ডবে কোল দিলাম তখন;—
"যাদবে পাণ্ডব-শক্তি"—অপূর্ব্ব সৃজন!
স্মরিলাম ব্যাসদেব, তিনি যে গো গুরুদেব,
শক্তির ধরম-রাজ্য করিতে স্থাপন;
প্রতিভার প্রতিরূপে প্রতিভা-মিলন!
জরাসন্ধ, শিশুপাল, মহাবল মহীপাল,
রাজসূয় মহাযজ্ঞে দিয়ে বলিদান
ধর্ম্মে সিংহাসন আমি করি সম্প্রদান।
মহাখল দুর্য্যোধন, টলাইল সিংহাসন,
কুরুক্ষেত্র-মহারণে সংহারি' সকল
প্রাণের সে ধর্ম্মাসন করি যে অটল!
অশ্বমেধ যজ্ঞ পরে করাইয়া যুধিষ্ঠিরে,
মহাভারতের সৃষ্টি——মম প্রয়োজন—
ধর্ম্মরাজ্যে,——গীতা গানে করেছি সাধন!
গীতার যে কর্ম্ম-যোগ, দিও তাতে মনোযোগ,
হইবে সে মহাযোগ পরম সহায়,
পড়িলে এ ধর্ম্ম-রাজ্য পতন-দশায়।
হ'ল যবে গৃহবাদ, না করিয়া প্রতিবাদ,
ধর্ম্মরাজ্য হিতে আমি উচ্ছেদি যাদবে;
যেওনা ভারতবাসি! কভু সে আহবে!—
ছিন্ন ভিন্ন এবে তোরা, দৈন্যের রজনী ঘোর,
ঘিরেছে আমার এই সাধের ভারতে!—
বিচ্ছেদে হ'য়েছে দেশ—"নরক" মরতে!

২৮

উঠিল বংশীর রব খেলিয়া খেলিয়া,
গগনে কৌমুদী গায়ে মিলিয়া মিলিয়া!
নারিল চুম্বিতে পুনঃ নীরেন্দ্র-লহরী,
লহরে লহরে নাচি' গেল দূরে চলি?
মিশিয়া পবন-অঙ্গে ব্যাপিল সংসার,
পশিল শ্রবণে মম করিয়া ঝঙ্কার,—
"ভারত! একতা বিনা এ দশা তোমার!
কর্ম্ম-যোগে মনোযোগ দাও পুনর্ব্বার!"

২৯

ভাঙ্গিলে স্বপন-ঘোর, নয়ন মেলিয়া,
দেখিলাম একা আমি, চতুর্দ্দিকে অরণ্যানী,
নাহি সেই বংশী-ধারী মুরলী ধরিয়া;
সন্তপ্ত—হৃদয়ে শূন্যে বিহ্বলে চাহিয়া,
কহিলাম দ্বারকায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

৩০

"পৃথিবী পবিত্রা হয় ধরিয়া যাহায়,
যাহার মাহাত্ম্যে ধরা শ্রীগোবিন্দে পায়,
সেই মহা ভাগ্যবতী, হারাইয়া আত্মপতি,
আজি এই দ্বারাবতী রহে এ দশায়!
নিয়তি-কালের গতি—এই মত হয়!!"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দুগ্ধ।

প্রস্তাবনা।

(১)

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে স্তন্যপায়ি (Mammalia) জীব মাত্রের শৈশবকালে এবং মানবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় এমন কি খাদ্য আছে, যাহাতে একাধারে সমস্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় পদার্থ বিদ্যমান? তদুত্তরে বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে, তাহা "দুগ্ধ"। ফলতঃ একমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, একথা অলীক বা অত্যুক্তি নহে। কি বাল্যে, কি বার্দ্ধক্যে, কি সুস্থাবস্থায়, কি রুগ্নাবস্থায়, দুগ্ধের ন্যায় পরম হিতকারী ও জীবনীয় পদার্থ আর নাই। মাতৃস্তন্য ত্যাগের পর মানবের পক্ষে যে সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ ব্যবহার্য্য, তন্মধ্যে গোদুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই যথা সম্ভব বিস্তৃতভাবে এবং অপরাপর প্রাণিজাত দুগ্ধের বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে, সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

স্তন্য পানের উদ্দেশ্য ও সন্তানের সংখ্যানুসারে স্তন্যপায়ি জীবের স্তনসংখ্যা ও সংস্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ বিষয়ে ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল ও বৈচিত্র্য নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। কোনও কোনও জীবের সন্তানের সংখ্যাধিক্যের সহিত মাতৃস্তনের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ "গিনিপিগ্" নামক ক্ষুদ্রপ্রাণী এবং "ছাগীর" বিষয় বলা যাইতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটী একবারে ৮।১০টী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার দুইটী মাত্র স্তন। ছাগীও একবারে এক বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাহারও দুইটী স্তন। এ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা করা হইল না।

জীবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আরণ্য ও গৃহপালিত পশুর মধ্যে দৈহিক গঠন ও স্তনাদির সংস্থান বিষয়ে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে; এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

Copyu—(কোপিয়ু) নামক এক প্রকার জলচর ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ি জীব আছে; সন্তরণ কালে সে তাহার শাবককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে, তৎকালে মাতার স্তন দুইটী তাহার স্কন্ধদেশের পার্শ্ব দিয়া ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়, ইহাতেই শাবক অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতে পারে। উপরোক্ত কারণেই এই প্রাণীর স্তন দুইটী অতিশয় দীর্ঘাকৃতি। এই প্রকারে দেখা যায় যে, জীবজগতে ভগবানের কি বিচিত্র কৌশল প্রকটিত হইয়াছে।

(২)

দুগ্ধের সংজ্ঞা, স্বরূপ, * ব্যুৎপত্ত্যর্থ ও পর্য্যায় শব্দ।

স্তন্যপায়ী, স্ত্রীজাতীয় জীবমাত্রেরই সন্তান প্রসবান্তে তাহাদের স্তনাগ্রস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র পথে আকর্ষিত হইয়া যে শুভ্র, তরল, স্নিগ্ধ, মসৃণ ও সুস্বাদু পীযূষধারা নির্গত হয় তাহাকেই "দুগ্ধ" বলা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে;—

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা J. Oliver প্রণীত Milk, Cheese and Butter নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

"রসপ্রসাদো মধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে॥"
রসপ্রসাদঃ—রসস্য সার ইতি।

অর্থাৎ স্তন্যপায়ী স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর আহার্য্য দ্রব্যাদি পক্বাশয়গত হইয়া জীর্ণ হইলে, তাহাতে যে রস জন্মে, ঐ রসের সারভাগ সমগ্র শরীর হইতে স্তনে যাইয়া "স্তন্য" (স্তনদুগ্ধ) নামে কথিত হইয়া থাকে। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে যে :—

"স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং চতু রাত্রাদনন্তরং।
প্রবর্ত্তয়ন্তি বিবৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ॥"

অর্থাৎ প্রসবান্তে তিন বা চারি রাত্রির পর হইতে স্ত্রীদিগের হৃদয়স্থ ধমনীসমূহ প্রসারিত হইলে, স্তন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রসবান্তে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতীয় স্তন্যপায়ি জীবগণের স্তন হইতে যে এক প্রকার হরিদ্রাভ, পূযবৎ পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় Colstrum (কলষ্ট্রম) বলে। ইহার রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলা যাইবে।

(ক) রাজ নিঘণ্টুতে দুগ্ধের শ্বেতত্বের কারণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে ;—

"ক্ষীরং স্নিগ্ধং তথা রক্তং পিত্তেন পক্বতাং গতং
রক্তং শ্বেতত্বমায়াতি তথা ক্ষীরং সিতং ভবেৎ॥"

তাৎপর্য্যার্থ :—দুগ্ধ স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত অথবা নবনীতযুক্ত) পিত্ত দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত শ্বেত বর্ণ ধারণ করে, তাহাতেই দুগ্ধ শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে (কারণ রক্ত পরিণত হইলেই রস এবং রসই দুগ্ধে পরিণত হয়)। এই দুগ্ধ মাতৃহৃদয়ের অতুলনীয় স্নেহরাশি বিগলিত হইয়াই যেন স্তনমুখে প্রবাহিত হয়। সন্তানের আকর্ষণ ব্যতীতও কেবল মাত্র তাহার দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ অথবা গ্রহণ জনিত হর্ষ ও স্নেহবশতঃ আপনা আপনই ক্ষরিত হইতে থাকে ; অতএব স্নেহ ও হর্ষই দুগ্ধক্ষরণের অন্যতম কারণ। মাতৃজঠরে সন্তানের অবস্থানের কাল হইতেই মাতার স্তনমণ্ডলে ভাবি সন্তানের আহার্য্য পীযূষরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে ; ভগবানের লীলা ও করুণার অন্ত নাই।

জগতে যত কিছু পবিত্র ও নির্ম্মল পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই আমরা দুগ্ধের সহিত তুলিত করিয়া থাকি। শুভ্র আস্তরণযুক্ত শয্যা "দুগ্ধফেননিভ" বলিয়াই বর্ণিত হয়। মহাকবি ভবভূতি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "উত্তর রামচরিত" নাটকে সকরুণ দৃষ্টির সহিত দুগ্ধকুল্যার (কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ) তুলনা করিয়াছেন, যথা—"স্নপয়সি পয়সীব দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ"।

আকর্ষণার্থ "দুহ্" ধাতু "ক্ত" প্রত্যয় যোগে দুগ্ধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে (বৈদিককালে) কন্যা সন্তানের উপরেই গোদোহনের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহাতেই কন্যাকে "দুহিতা" বলা হইত। "দুহ" ধাতু "তৃচ্" প্রত্যয় যোগে "দুহিতৃ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কন্যা স্নেহময়ী এবং কোমলহৃদয়া, তাহাতেই বৈদিক ঋষিগণ গোবৎসের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, তাঁহাদের কন্যাসন্তানের উপর গোদোহনের ভার অর্পিত করিয়াছিলেন; ইহাতে গোজাতির প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম যত্ন ও স্নেহাধিক্য এবং তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশিত হইতেছে।*

(১) ক্ষীর, (২) পয়, (৩) স্তন্য, (৪) বালজীবন, (৫) পীযূষ, (৬) অমৃত, (৭) উধস্য,—এইগুলি দুগ্ধের পর্য্যায় শব্দ। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "দুধ" বলা যায়।

* নিরুক্তকার যাস্কমুনি দুহিতা শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা ;—"দুহিতা" দুহিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্ব্বা। টীকা—দুহিতা সাহি য ত্রৈব দীয়তে তত্রৈব দুহিতা ভবতি, দূরে স্থিতা সতী সা পিতু হিতা বাঢ়া ভবতি ইতি দুহিতেত্যচ্যতে। দোগ্ধের্ব্বা সাহি নিত্যমেব পিতুঃ সকাস্যাৎ দ্রব্যং দোগ্ধি প্রার্থনা পরকৎ।

(৩)

দুগ্ধের রাসায়নিক গঠন, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিজ দুগ্ধের রাসায়নিক উপাদানের তুলনা এবং গো দুগ্ধের শ্রেষ্ঠতা।*

দুগ্ধের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :—

"The chemical constitution of fatty globules (cream) in watery alkaline solution of Casein, and a variety of sugar, peculior to milk, called Lactose is *Milk*. The fat is "*Butter*, "Lactose" constitute the carbonaceous portion of milk, good for food. The "Casein" which forms the principal constetuent of "Cheese" and a certain proportion of "albumin" which is present, forms the Nitrogenous, while the complex saline substances and water are the mineral constetuents. These various substances are present in definite proportion which made milk a typical and perfect food, suitable to the wants of the young of the various animals, for which it is provided by nature."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেজিনের (Casein অর্থাৎ ছানা), Alkaline (ক্ষার যুক্ত) জলবৎ দ্রব পদার্থে চর্ব্বীযুক্ত (সর) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ এবং Lactose (লেক্‌টোজ্) নামক বিবিধ প্রকার শর্করার (যাহা দুগ্ধেরই বিশেষত্ব), রাসায়নিক গঠনকে 'দুগ্ধ' বলা যায়। চর্ব্বী (Fat) হইতে নবনীত (মাখন) উৎপন্ন হয়। Lactose (লেক্‌টোজ্) নামক পদার্থ দুগ্ধের কার্ব্বোনিসস্ (আঙ্গারিক) অংশ ; ইহা খাদ্যের জন্য প্রশস্ত ; Casein (কেজিন্) এবং দুগ্ধস্থিত অল্পাংশ Albumin (এল্‌বুমিন্) অর্থাৎ ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুভ্রবর্ণ পিচ্ছিল পদার্থ—ইহাকে শ্বেতসার বলা যায়। তাহার (দুগ্ধের) Nitrogenous (নাইট্রোজিনস্) অংশ ; জল এবং নানা প্রকার লবণাক্ত পদার্থ (Saline substances) দুগ্ধের খনিজ অংশ। পূর্ব্বোক্ত বিবিধ পদার্থ নিচয় ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত মত দুগ্ধে এরূপ ভাবে মিশ্রিত আছে যে, তাহাতেই ইহা (দুগ্ধ) নানাপ্রকার স্তন্যপায়ি জীব শিশুর পক্ষে (যাহার জন্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) সম্পূর্ণ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

দুগ্ধস্থিত Phosphate of Lime (ফস্‌ফেট্ অব লাইম্) হইতে অস্থির (হাড়ের) পোষণ হয় ; Soda (সোডা) প্রভৃতি লবণাক্ত ক্ষার পদার্থ হইতে রক্তের তরলত্ব হয় এবং Grastic Juice (গ্রেষ্টিক্ জুস্ অর্থাৎ পরিপাকজনক রস) জন্মে ; Casein (ছানা) মাংসবৃদ্ধিকারক ; নবনীত মেদবৃদ্ধিকর ; অপিচ নবনীত হইতে দুগ্ধের উপাদেয়তা, শর্করা হইতে মিষ্টত্ব, ছানা হইতে গাঢ়তা, জল হইতে তৃপ্তিদায়কত্ব এবং লবণাক্ত দ্রব্যাদি হইতে স্বাদবিশেষ সঞ্জাত হয়।

যে সকল প্রাণিজ দুগ্ধ মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইংরেজী গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য ; J. Oliver প্রণীত Milk, Cheese and Butter নামক গ্রন্থ দেখুন।

	গোদুগ্ধ		ছাগদুগ্ধ	মেষদুগ্ধ	অশ্বদুগ্ধ	গর্দ্দভদুগ্ধ	নারীদুগ্ধ	মন্তব্য।
	W. Blyth	Cameron	Vœlcker	Vœlcker	Cameron	Chuallin	Greber	
Water জল	৮৬·৮৭	৮৭·০০	Poormilk ৮৪·৪৮ / Rich ৮২·০২	৮৩·৭০ / *৮২·২৭	৯০·৩১০ / ৮৮·৮০	৯১·৬৫	৮৮·০২ / ৮৮·০০	ডাক্তার Vœlcker বলেন মেষ দুগ্ধের নবনীতের অংশ অত্যন্ত অধিক, ইহা শতকরা দুই ভাগ হইতে ১২ ৩। ৪ পর্য্যন্ত হইতে পারে।
Casein ছানা Albumen	৪·৭৫	৪·১০	৩·৯৪ / ৪·৬৭	৫·১৬ / ৭·১০	১·৯৫৩ / ২·৬১	১·৮২	১·৬০ / ২·৯৭	
Sugar শর্করা	৪·০০	৪·২৮	৪·৬৮ / ৫·২৮	৫·৭৩ / ৪·২০	৬·২৮৫ / ৫·৫০	৬·০৮	৭·০৩ / ৫·৮৭	
Fat নবনীত চর্ব্বী	৩·৫০	৪·০০	৬·১১ / ৭·০২	৬·৪৫ / ৫·৩০	১·০৫৫ / ২·৫০	১·০২	২·৯০ / ২·৯০	
Ash ধাতব পদার্থ	০·৭০	০·৬২	০·৭৯ / ১·০১	০·৯৬ / ·০০	০·৩৬৯ / ০·৫০	০·৩৪	০·৩১ / ০·১৬	
Peptone পেপ্‌টোন্	০·১৭			০·১৩	০·০৯		০·১০	

* প্রত্যেক দ্বিতীয় লাইনের অঙ্কগুলি Winter Blytherএর মতানুযায়ী।

নিম্নলিখিত পদার্থগুলিও অল্পমাত্রায় দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে, যথা—

1. Carbonic Acid Gas কার্ব্বনিক্ এসিড গ্যাস।
2. Sulphuretted Hydrogen সল্‌ফিউরেটেড হাইড্রজেন্।
3. Hydrogen হাইড্রজেন।
4. Nitrogen নাইট্রজেন্।
5. Oxygen অক্সিজেন্।
6. Galactin গেলেক্‌টিন্।
7. Lactochrome লেক্টোক্রোম্।

মন্তব্য—এই সমস্ত পদার্থের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া দুরূহ, তজ্জন্য তাহা দেওয়া হইল না।

দুগ্ধের জান্তব অংশকে (Animal matterকে) Peptone (পেপ্‌টোন্) বলা যায়। Dr. W. Blyth (ডাক্তার ডব্লিউ ব্লিথ) বলেন যে, কেজিন্ ও আলবিউমিন্ ব্যতীত নিম্নোক্ত জান্তব পদার্থসমূহও দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে, যথা—

1. Leucin লিউসিন্।
2. Peptone পেপ্‌টোন্।
3. Kreatine ক্রিয়েটিন্।
4. Tyrosin টাইরোসিন্।

মন্তব্য—এগুলিরও বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সে চেষ্টা করা হইল না।

দুগ্ধে পশ্চাল্লিখিত অনুপাত মত লবণাক্ত ও ধাতব পদার্থ বিদ্যমান আছে, যথা—

পদার্থের নাম…শতাংশ হিসাবে অনুপাত	
1. Phospheric Acid ফস্‌ফেরিক্ এসিড	২৮·৩১
2. Clorine ক্লোরিন্	১৬·৩৪
3. Lime চূণ	২৭·০০
4. Potash পটাস্	১৭·৩৪
5. Magnasia মেগ্‌নেসিয়া	৪·০৭
6. Soda সোডা	১০·০০

রাসায়নিক বিশ্লেষণলব্ধ দুগ্ধের উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত মতান্তরে কথিত হইয়াছে, তাহাও নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

	নারীদুগ্ধ	গোদুগ্ধ	গর্দ্দভদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
Proteid (Casein & Lacto albumen) ছানা ইত্যাদি	·৬ / ১·৪ } ২·০	৩·২৫ / ·৭৫ } ৪·০	১·০ / ·৮ } ১·৮	৩·০ / ·৭ } ৩·৭
Fat চর্ব্বী (নবনীত)	৩·৫	৩·৫	১·০	৪·২
Sugar শর্করা	৭·০	৪·০	৫·৫	১·০
Mineral matter ধাতব পদার্থ	·২	·৭	·৪	·৫

মহিষ দুগ্ধে জলীয় ভাগ শতকরা ৮১ হইতে ৮৬ অংশ, চর্ব্বীর ভাগ ৪·৬ হইতে ৬·২ পর্য্যন্ত, ছানা ও এল্‌বিউমিন্ ৩·৬ হইতে ৪ পর্য্যন্ত, শর্করা ৫ অংশ, ধাতব ও খনিজ পদার্থ ·৮ অংশ, নাইট্রোজেন্ ·৬ অংশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। Centigrade (সেন্টিগ্রেড্) স্কেলের তাপমানে ২৫° ডিগ্রী উত্তাপে মহিষ দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ১·০৩০ হইয়া থাকে।

গো-দুগ্ধের উল্লিখিত উপাদানসমূহের অনুপাত সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বদা এক প্রকার থাকে না; ভিন্ন ভিন্ন গাভীতে এবং একই গাভীতে বিভিন্ন অবস্থায় ও কাল এবং দেশ ভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আহার বিহার, প্রতিপালন, সন্তান (বৎস) কর্ত্তৃক স্তন্য পানের স্থায়িত্ব কাল, প্রকৃতি, বয়স, স্বাস্থ্য ও দোহনের পৌনঃপুন্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে দুগ্ধের গুণ ও উপাদানাদির ইতর বিশেষ হয়। প্রাগুক্ত কারণাধীনে দুগ্ধের উপাদানের অনুপাত স্বভাবতঃ নিম্নলিখিত মত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথা—

	শতাংশ হিসাবে অনুপাত		
1. Water জল	৯০·০০	হইতে	৮৩·৬৫
2. Fat চর্ব্বী	২·৮০	„	৪·৫০
3. Casein, Albumen ছানা	৩·৩০	„	৫·৫৫
4. Sugar শর্করা	৩·০০	„	৫·৫০
5. Ash ধাতব পদার্থ	·৭০	„	·৮০

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি ও অবগতির জন্য গো-দুগ্ধ

ও তজ্জাত পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical Analysis) লব্ধ উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—

	Water জল	Fat চর্ব্বী	Casein ছানা	Albumin	Sugar শর্করা	Ash ক্ষার
White Milk (খাঁটি দুধ)	৮৭·৬০	৩·৯৮	৩·১২	·৪০	৪·৩০	·৭০
Cream সর (মালাই)	৭৭·৩০ *২৮·৬৭৫	১৫·৪৫ ৬৩·০১১	৩·১০ ৩·৫৩	·২০ ·৫২১	৩·১৫ ১·৭২৩	·৭০ ·৪১
Skimmed Milk (সরতোলা দুধ)	৯০·৩৪ ৯০·১১	১·০০ ·৪৩	২·৮৭ ২·৮৮	·৪৫ ·৪৯	৪·৬৩ ৫·৩৪	·৭১ ·৭২
Butter নবনীত (মাখন)	১৪·৮৯ ১৪·১৪	৮২·০২ ৮৩·১১	১·৯৭ (·৮৬)	·২৮	০·২৮ ০·৭০	০·৫৬ ১·১৯
Butter Milk (মাখনতোলা দুধ)	৯১·০০	০·৪০	৩·৫০	০·২০	৩·৮০	০·৭০
Curd (দধি ছানা)	৫৯·৩০	৬·৪৩	২৪·২২	৩·৫৩	৫·০১	১·৫১
Whey (দইছাঁকা জল)	৯৪·০০	০·৩৫	০·৪০	০·৪০	৪·৫৫	০·৬০

দধির জলকে Whey (হোয়ে) বলা হয়, ইহা হইতেই Milk-Sugar (মিল্ক-সুগার) Lactose (অর্থাৎ দুগ্ধ শর্করা) উৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহা দানা বাঁধা ও দৃঢ় হয় এবং জলীয় বাষ্পযোগে সহসা দ্রবীভূত হয় না; ইহা ইক্ষুজাত শর্করাপেক্ষা কম মিষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণ মন্তব্য;—স্থূলতঃ দেখা যায় যে নারীদুগ্ধে শতকরা ৩½ হইতে ৪ (চারি) অংশ Nitroginous (নাইট্রোজেনস্) পদার্থ,—অর্থাৎ Protied (প্রোটিড) [যথা,—Casein (ছানা), Albumin &c., (আল্‌বুমীন্) প্রভৃতি] এবং ৩ (তিন) ভাগ Fat (চর্ব্বী), ৪ (চারি) ভাগ Sugar (শর্করা), ইহাকে Carbohydrates (কার্ব্বোহাইড্রেটস্) বলা যায়। এগুলি Organic (অর্গেনিক); এক ভাগের ¼ চারি অংশ Mineral Matters (ধাতব পদার্থ, খনিজ) অর্থাৎ Inorganic Substance (ইন্‌অরগেনিক্) [যথা—Sodium (সোডিয়ম্), Lime (চুণ), Potash (পটাস্)] এবং ১০ ভাগ জল বর্ত্তমান আছে।

* প্রত্যেক দ্বিতীয় লাইনের অঙ্কগুলি Winter Blytherএর মতানুযায়ী।

এখন গোদুগ্ধের সহিত এই দুগ্ধের (নারীদুগ্ধের) তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্তটীতে (গোদুগ্ধে) জলীয় অংশ কম এবং Casein (ছানা) প্রভৃতি সার পদার্থ, Fat (চর্ব্বী), Soda (সোডা), Potash (পটাস্) প্রভৃতি লবণাক্ত ক্ষার পদার্থ এবং Nitrogenous (নাইট্রোজেনস্) পদার্থ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান; কিন্তু ইহাতে নারীদুগ্ধাপেক্ষা শর্করার অংশ ন্যূন এবং গোদুগ্ধ ঈষৎ Acid (অম্ল) যুক্ত ও নারীদুগ্ধ Alkaline (ক্ষার) যুক্ত; এই নিমিত্ত গোদুগ্ধে অল্প পরিমাণ পরিষ্কৃত জল, কিছু চুণের জল এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া লইলে ইহা প্রায় নারীদুগ্ধের তুল্য হয়। এই সমস্ত পদার্থ কি পরিমাণে মিশ্রিত করিলে গোদুগ্ধ একবারে নারীদুগ্ধের সমতুল্য হয় তাহা বলা দুষ্কর; বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবধারণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ নারীদুগ্ধের অভাবে (মাতৃস্তন্যের অভাবে) গর্দ্দভীদুগ্ধ এবং জল ইত্যাদি মিশ্রিত গোদুগ্ধই প্রশস্ত এবং হিতজনক; কিন্তু গর্দ্দভীদুগ্ধে সারভাগ ও পুষ্টিকর পদার্থ কম, অতএব আমাদের বিবেচনায় গোদুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

(৪)

দুগ্ধের সাধারণ গুণ

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত)

দুগ্ধ সাধারণতঃ বলকারক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পবিত্র, সুস্বাদু, মসৃণ, স্নিগ্ধ (নবনীত যুক্ত), শীতল ও সারক; ইহা জীবনীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে,—

"দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরং।
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্ব শরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্।
বয়ঃস্থাপকমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।
বিরেকবাস্তিবস্তীনাং তুল্যমোজো বিবর্দ্ধনম্।"

অর্থাৎ—দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত, বসাদি যুক্ত) বায়ুপিত্ত নাশক, সারক (Purgative), সদ্য শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, সকল প্রাণীর সাত্ম্য (দেহানুকূল এবং হিত জনক) জীবন রক্ষক, পুষ্টিকর, বলকারক, অত্যন্ত বাজীকরণ (রতি শক্তি বর্দ্ধক) বয়ঃ স্থাপক, পরমায়ু বৃদ্ধিকারক, সন্ধি কারক (ভগ্ন সংযোজক), রসায়ন (জরাব্যাধি বিনাশক) এবং বিরেচন, বমন ও বস্তি ক্রিয়ার (পিচকারী দেওয়ার) উপযোগী, ইহা ওজো ধাতুর বর্দ্ধক।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে (বাগ্‌ভটে) কথিত হইয়াছে:—

"স্বাদু পাকরসং স্নিগ্ধমোজস্যং ধাতুবর্দ্ধনং।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং শ্লেষ্মকং গুরুশীতলম্॥"
প্রায় পয় ... ... অত্র গব্যন্তু
জীবনীয়ং রসায়নম্"————————"

অর্থাৎ—প্রায় সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধই স্বাদু পাকরস (জীর্ণ হইয়া রসে পরিণত হয়), স্নিগ্ধ, ওজোবর্দ্ধক ধাতু পুষ্টিকর, বাতপিত্ত নাশক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক), শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, গুরু এবং শীত বীর্য্য;—তন্মধ্যে গো দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা জীবনীয় (আয়ুবর্দ্ধক) এবং রসায়ন (জরা ব্যাধি বিনাশক)।

* সাত্ম্যং:—অর্থাৎ হিতকারী, সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—
"যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিসেবিতঃ।
ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"
অর্থাৎ—যে ব্যক্তি যে রস সেবন করিলে, অথবা যে প্রকার ব্যায়াম অথবা অন্য কোনও কার্য্য করিলে তাহার পক্ষে সুখজনক হয়, তাহা তাহার পক্ষে সাত্ম্য বলা যায়; আত্মনো হিতমিতি "আত্মম্" তেন সহ বর্ত্তমানঃ সাত্ম্যমিতি।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্।"

অর্থাৎ দুগ্ধ জীবনীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা রসায়ন।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে :—

"দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্বাদু রসায়নসমাশ্রয়ং।
সৌম্যং প্রস্রবণং স্তন্যং বারি সাত্ম্যঞ্চ জীবিতম্।
তথাঽনেকৌষধিরসং স্নিগ্ধং শীতং সূক্ষ্মং সরং মৃদু।

তাৎপর্য্যার্থ—দুগ্ধ (ক্ষীর, স্তন্য, পয়ঃ) স্বাদু রসায়ন সৌম্য (পবিত্র) প্রস্রবণ (মূত্র-কারক) প্রাণদায়ক সাত্ম্য—অনেকৌষধিরস (অনেক ভুক্ত পদার্থের সার ভাগ), স্নিগ্ধ, শীতল সূক্ষ্ম (মসৃণ) সারক ও মৃদু।

অত্রি সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"স্রোতো বিশুদ্ধিকরণং বলকৃদ্দোষনাশনং।
পয়স্যদোষনাশনং বৃষ্যঞ্চাগ্নিপ্রবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ—দুগ্ধ স্রোতো (দ্বার, ইন্দ্রিয় সমূহের রন্ধ্র পথ) সমূহের বিশুদ্ধি কারক, বলকারক, দোষনাশন (ত্রিদোষ নাশক), বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"গব্যমাজং তথা চৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চযৎ।
অশ্বাযাশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণুনাঞ্চ যৎপয়ঃ॥
তত্তনোকৌষধিরস প্রসাদং প্রাণদং গুরু
মধুরং পিচ্ছিলং শীতং স্নিগ্ধ শ্লক্ষ্ণংসরং মৃদু।
সর্ব্ব প্রাণভৃতাং তস্মাৎ ক্ষীরমিহোচ্যতে,
অত্রসর্ব্বমেব ক্ষীরং প্রাণীনামপ্রতিষিদ্ধং
জাতি সাত্ম্যাৎ।"

তাৎপর্য্যার্থ :—নানা প্রকার দুগ্ধ আছে; তন্মধ্যে গব্য, ছাগী, মেষী, উষ্ট্রী, মহিষী, অশ্বিনী নারী ও হস্তিনী দুগ্ধ ঐ সকল প্রাণীর ভুক্ত নানাপ্রকার ওষধির (তৃণাদির) রসের সার ভাগ। উহাদের দুগ্ধ প্রাণদ, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), সর (সারক) ও মৃদু; এই সমস্ত কারণে উক্ত সকল প্রকার প্রাণীর জাতিসাত্ম্য (হিতজনক ও দেহানুকুল) বলিয়া এই সকল দুগ্ধ বর্ণিত হইতেছে।

(৫)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত গোদুগ্ধের গুণ।

চরক সংহিতায় গোদুগ্ধের গুণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে; যথা—

"স্বাদু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণ পিচ্ছিলং।
গুরু মন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ।
তদেবং গুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ॥"

অর্থাৎ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, শ্লক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম) পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ, (অতীক্ষ্ণ) নির্ম্মল—গব্যদুগ্ধ এই দশ গুণ বিশিষ্ট; ওজঃ পদার্থও এই দশটী গুণান্বিত অতএব গুণ-তুল্যতা হেতু গোদুগ্ধ ওজো ধাতু বর্দ্ধক। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাত পিত্তাস্রনাশনম্।
দোষধাতু মলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু
জরাসমস্তরোগানাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা।

তাৎপর্য্যার্থ :—গোদুগ্ধ বিশেষ (১) মধুর রস ও (২) মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যজনক (দুগ্ধ বর্দ্ধক), স্নিগ্ধ, বাতপিত্ত নাশক রক্তপিত্ত রোগ নিবারক, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদজনক, গুরুপাক এবং ইহা নিত্য সেবনে সমস্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

কাব্য-শালায়

কয়েকটী তুল্য-চিত্র।

দুষ্মন্ত ও উদয়ন।

ইহাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সময়ে ভারতের অদ্বিতীয় রাজা ছিলেন। দুষ্মন্ত হস্তিনাপুরের এবং উদয়ন কৌশাম্বীর রাজা। একজন ধীরোদাত্ত, আর একজন ধীর-ললিত। দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রিয়, উদয়নের সে অভ্যাস নাই। শকুন্তলাকে হারাইয়া দুষ্মন্ত বসন্ত-উৎসব বারণ করিয়াছেন,—বনের তরু-লতা পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ শিরে ধারণ করিয়াছে। আর উদয়নের রাজবাটীতেই দোল-যাত্রা, স্ত্রী-পুরুষ সকলে একত্রে মিলিয়া হুলিগান করিতেছে। তাঁহার দরবারে বহু মিত্র রাজা উপস্থিত হইয়াছেন। সাধ্বী রাণী বাসবদত্তা, তাঁহাকে সমক্ষে রাখিয়া মদন-বিগ্রহ-পূজা করিতেছেন। কিন্তু, তাহাতে উদয়নের মন একান্ত উদাস। তিনি যেন তখনও নানা অনুগৃহীতার কথাই ভাবিতেছেন। তাঁহার হৃদয় প্রেমে জলন্ত নহে। দুষ্মন্তের প্রেম কিন্তু অনন্ত। সেই অনন্ত প্রেম-ভাণ্ডারের অধিপতি হইয়া তিনি বসুমত্যাদি বহু নায়িকাকে প্রেম বিতরণ করিতেছেন। উদয়নের প্রেম যেন সসীম। তিনি একজনকে ভালবাসিয়া অন্যজনকে ভালবাসিতে গেলেই ধরা পড়েন। বাসবদত্তাকে তিনি ভয়ই করিয়া থাকেন। দুষ্মন্ত বিক্রমশালী, তাঁহার রাজ্য শান্তিময়। তিনি রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া দেব ও ঋষিগণকে অভয়দান করিয়াছেন। দক্ষিণ কোশলের সহিত উদয়নের যুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে যুদ্ধে তাঁহার সেনাপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাই বলিয়া, বীরের উদার হৃদয় উদয়নের নাই, এমন নহে। লোকমুখে কোশলেশ্বরের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তিনি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতেছেন। দুষ্মন্তের সেনাপতি, দুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গেই মৃগয়া করিতেছেন। দুষ্মন্তের 'পিশুন' এবং উদয়নের 'যৌগন্ধরায়ণ' ইহাঁরা উভয়েই বিচক্ষণ মন্ত্রী,—উভয়েই রাজকার্য্য-পরিচালনে সুদক্ষ। কিন্তু, অমাত্য পিশুন মৃত বণিকের উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচনে দুষ্মন্তের মতের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছেন, এবং এরূপে দুষ্মন্তের বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তা প্রকটনের অবসর প্রদান করিয়া, দুষ্মন্তেরই মহিমা জ্ঞাপন করিতেছেন। আর যৌগন্ধরায়ণ উদয়নের বিবেচনার উপর একান্ত নির্ভর করিতে অসমর্থ হইয়া, সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছেন। এমন কি, রাজার অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ভীত হইতেছেন। দুষ্মন্ত, পিশুনের সমক্ষে রাজা বলিয়া, আর উদয়ন, যৌগন্ধরায়ণের হস্তে একটী পুতুল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। শকুন্তলা-বিরহ-সন্তপ্ত দুষ্মন্ত, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আর উদয়নের চক্রবর্ত্তিত্ব যৌগন্ধরায়ণের হস্তেই নিহিত; তাহাতে উদয়নের বিশেষ সুখ্যাতির কারণ নাই,—যৌগন্ধরায়ণ তাঁহারই মন্ত্রী, এই মাত্র। দুষ্মন্তের রাজকার্য্য, যখন যে রাজপুরুষ দ্বারাই সম্পন্ন হউক না কেন, যেন দুষ্মন্তের কৃতিত্বেই সফল হইল বলিয়া জ্ঞান হয়। দুষ্মন্তের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যে যাহা করুক, তাহাতে দুষ্মন্তেরই যশঃ। তিনি স্বয়ংই বলিতেছেন যে, ইন্দ্র তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি

দানব-দলনে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং দুষ্মন্তের অসুর-বিজয়ও সুররাজেরই গুণগ্রাহিত্বের ফল। দুষ্মন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হন, (সপ্তমাঙ্কে) তাঁহার স্বর্গ বর্ণনা কি অপূর্ব্ব চিত্রই না হইয়াছে। দুষ্মন্ত মৃগয়া দ্বারা এবং উদয়ন ঐন্দ্রজাল দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতেছেন। দুষ্মন্ত সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছেন, উদয়ন তাহা হইতে যাইতেছেন মাত্র। দুষ্ট দমনে দুষ্মন্ত সদা জাগরূক, তাঁহার রাজ্যে কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিতে পারে না। উদয়ন নবীনা দাসীর মুখ দেখিয়াই কামাহত হইলেন। আর দুষ্মন্ত ঋষি-কন্যা-লিপ্সু। দুষ্মন্তের পারিজাত-চয়ন সুদূর মুনিকাননে, আর উদয়নের কৃতি স্বগৃহ মধ্যে পরিনিষ্ঠিত। দুষ্মন্ত, মুনির বিনানুমতিতেই মুনিকন্যাকে বিবাহ করিলেন। আর, উদয়ন মন্ত্রি-কর্ত্তৃক অন্তঃপুরে রক্ষিতা কন্যার প্রতি গুপ্ত রাগ দেখাইতে গিয়া রাজ্ঞীর নিকটে বহুবার ধরা পড়িলেন। মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা দুষ্মন্তের না আছে, এমন নহে। তিনি শকুন্তলার লাবণ্যে বিলক্ষণ লুব্ধ হইয়াছেন। তাই বলিয়া, তিনি মদনের নিকটে দাসত্ব-খত দেন নাই। শকুন্তলার রূপে মোহিত হইয়া, শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া, এমন কি তীব্র-ভাবে তিরস্কৃত হইয়াও, নিজ জ্ঞান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। আর, উদয়নের সূক্ষ্ম-বিচার-শক্তি যে আছে, তাহার দৃষ্টান্তই বিরল। দুষ্মন্তের প্রণয় প্রগাঢ়, অথচ তিনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ। শকুন্তলা-সমাগম লাভ করিয়াও তিনি রাজকার্য্য বিস্মৃত হন নাই। তখনও আশ্রম-পীড়া না হয়, সেনাপতির প্রতি ইহাই আদেশ হইল। দুষ্মন্ত দৈবাৎ শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর উদয়ন পতিপ্রাণা বাসবদত্তাকে কেন যে অনাদর করিতেছেন, তাহার কোনও সদ্যুক্তি লক্ষিত হয় না। বাসবদত্তার নিকট সাগরিকা-প্রীতি গোপন করিতে উদয়ন বারংবার সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই বিফল হইয়াছেন। মন্ত্রীর উপরে রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া, তিনি স্বয়ং অন্তঃপুর-বেষ্টিত থাকিতে যেন ভালবাসেন। আর বহুকালপরে শকুন্তলা-সঙ্গমেও, দুষ্মন্তের প্রেম উদ্দামতা পরিত্যাগ করিয়া কেমন মৃদুতা ও রমণীয়তা লাভ করিল। আপাততঃ, দুষ্মন্তকে সুশিক্ষিত কোন মহারাজ রসিক নাগর বলিয়া, এবং উদয়নকে অশিক্ষিত কোন গ্রাম্য জমিদার বাবু বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

বাসব-দত্তা ও শকুন্তলা।

বাসবদত্তা-চরিত্রের তুলনা হয় না। তিনি সাক্ষাৎ পতিব্রতা-ধর্ম্ম। তিনি মর্য্যাদা-পালিকা, প্রশস্তমনাঃ, স্নেহময়ী ও স্বামিভক্তি পরায়ণা। স্বামী ব্যসনী, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তথাপি স্বামিভক্তি হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এখনও এমন অনেক ভারত-রমণী আছেন, যাঁহারা মদ্যপায়ী পতির মুখ-লগ্ন বাম অশ্রুধারায় প্রক্ষালন করিয়া আপনাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে পতিব্রতার অবিরল গলদশ্রু স্বামীর সুরা-পিপাসারও নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে। উদয়ন-প্রেমের ব্যভিচার বাসবদত্তা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তিনি অম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছেন। ক্রোধের অত্যন্ত উদ্দীপনা-সময়েও তিনি শিরঃপীড়াচ্ছলে পতিসন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন। আত্ম-সংযম প্রভাবে তিনি উদয়নের প্রতি কখনও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। এরূপ দেবী-চরিত্রের বিষয় ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। আবার অকস্মাৎ পতি-সন্নিধান

ত্যাগে পতির অপমান করা হইল, মনে করিয়া, অবিলম্বে পতিসেবার্থ পুনরায় আসিয়া তিনি কি কাণ্ডটাই না দেখিলেন,—তাহা রত্নাবলীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

শকুন্তলা-চিত্র ভিন্ন-প্রকৃতিক। কণ্বমুনির আশ্রমে অনেক পুষ্পিতা লতা আছে। সেই লতাগুলির মধ্যে শকুন্তলাকেও একটী উদ্যান-লতা বলিয়া জ্ঞান হয়। আশ্রমবাসী মৃগ ও আশ্রমজাত লতাকে শকুন্তলা ঠিক ভাই ভগিনীর মত স্নেহ করিতেছে।

বাসবদত্তা পাটরাণী হইয়াছেন, শকুন্তলাও হইবে। বাসবদত্তা পক্কবুদ্ধি মহিষী, শকুন্তলা সরলা বালিকা বধূ, সে সহচরীদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারে। বাসবদত্তা গৃহিণী, শকুন্তলা বালিকা। তাই পতির শত অপরাধেও বাসবদত্তা ক্রুদ্ধা হন নাই। শকুন্তলা কিন্তু প্রত্যাখ্যান সময়ে স্বামীকে 'অনার্য্য' সম্বোধন না করিয়া ছাড়ে নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন 'শকুন্তলার ত রক্ত-মাংসেরই শরীর, এস্থলে না হয়, কবি মানব-প্রকৃতি বিবৃত করিলেন।' আমরা কিন্তু এ দলের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। কারণ, 'রামাদিবদ্ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' মনুষ্যের শ্রীরামচন্দ্রের মতই হওয়া উচিত, রাবণের মত হওয়া উচিত নহে, ইহা বলাই কাব্যের উদ্দেশ্য। বাসবদত্তা কিন্তু তাঁহার প্রতি-স্পর্দ্ধিনী রত্নাবলীকে পর্য্যন্ত একটী কটু কথা বলেন নাই। পরিচারিকাগণ তাঁহাকে 'পরিজনবৎসলা' উপাধিই দিয়াছে। বাস্তবিক, পতিগৃহ গমন সময়ে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, বাসবদত্তার চরিত্র সে সমুদয় গুণেরই একখানি প্রতিবিম্ব। সময়ে, শকুন্তলাও এ সকল গুণের অধিকারিণী হইবে, সন্দেহ নাই। স্বামীর প্রতি উভয়েরই গাঢ় অনুরাগ আছে। কিন্তু তাহা বাসবদত্তার পক্ষে ভক্তি, শকুন্তলার পক্ষে প্রণয় মাত্র। ধৈর্য্যগুণে বাসবদত্তা শকুন্তলাকে সুদূর অতিক্রম করিয়াছে। স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখিয়াও বাসবদত্তা অক্ষুব্ধ। আর যখন শকুন্তলার স্বামিগৃহেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল, তখন শকুন্তলা পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতেই ইচ্ছুক। যদি বাসবদত্তা শকুন্তলা অপেক্ষা পুরাতন হইতেন এবং কণ্ব মুনিকে শকুন্তলার প্রতি এক কথায় উপদেশ দিতে হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন 'বৎসে, তুমি সীতা-সাবিত্রীর মত হও, তুমি বাসবদত্তার মত হও।"

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা।

ইহারা এক বৃন্তে দুইটী ফুল। থোপায় আরও একটী ফুল ছিল; সেটী শকুন্তলা। সময়ে তাহা দুষ্মন্ত তুলিয়া লইয়াছেন। এখন সেই ফুলের থোপনায় প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ামাত্র শোভা পাইতেছে। তার মধ্যে একটী স্ফুট ও অপরটী অর্দ্ধস্ফুট। লোকে বলে, যশস্বী ভারতীয় শিল্পী রবিবর্ম্মা অনসূয়াকে প্রিয়ংবদা অপেক্ষা বয়স্থা করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রিয়ংবদার কথাবার্ত্তাই তাহার সাক্ষী। প্রিয়ংবদার কথায় বোধ হয়, প্রিয়ংবদাই অনসূয়া অপেক্ষা বড়। যেন, শকুন্তলার মত তাহারও বিবাহের বয়স উপস্থিত। এ বাল্য-বিবাহ নহে, গান্ধর্ব্বাদি প্রৌঢ় বিবাহ। প্রিয়ংবদা রতি-রহস্য যেন বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। সে অনসূয়া অপেক্ষা বড় হইলেও শকুন্তলা অপেক্ষা ছোট। সে শকুন্তলার কামাবেশকে একটু কটাক্ষ-ভাবে দেখিতেছে। শকুন্তলার দাম্পত্য-সৌভাগ্যে তাহার যেন একটু অসূয়াই লক্ষিত হয়। তাই, কবি তাহার নাম অনসূয়া রাখেন নাই। মধ্যে মধ্যে ২।১টী রসের কথাও প্রিয়ংবদার ওষ্ঠপুট ভেদ করিয়া থাকে। শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে

দানব-দলনে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং দুষ্মন্তের অসুর-বিজয়ও সুররাজেরই গুণগ্রাহিত্বের ফল। দুষ্মন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হন, (সপ্তমাঙ্কে) তাঁহার স্বর্গ বর্ণনা কি অপূর্ব্ব চিত্রই না হইয়াছে। দুষ্মন্ত মৃগয়া দ্বারা এবং উদয়ন ঐন্দ্রজাল দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতেছেন। দুষ্মন্ত সার্ব্বভৌম রাজা হইয়াছেন, উদয়ন তাহা হইতে যাইতেছেন মাত্র। দুষ্ট দমনে দুষ্মন্ত সদা জাগরূক, তাঁহার রাজ্যে কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিতে পারে না। উদয়ন নবীনা দাসীর মুখ দেখিয়াই কামাহত হইলেন। আর দুষ্মন্ত ঋষি-কন্যা-লিপ্সু। দুষ্মন্তের পারিজাত-চয়ন সুদূর মুনিকাননে, আর উদয়নের কৃতি স্বগৃহ মধ্যে পরিনিষ্ঠিত। দুষ্মন্ত, মুনির বিনানুমতিতেই মুনিকন্যাকে বিবাহ করিলেন। আর, উদয়ন মন্ত্রি-কর্ত্তৃক অন্তঃপুরে রক্ষিতা কন্যার প্রতি গুপ্ত রাগ দেখাইতে গিয়া রাজ্ঞীর নিকটে বহুবার ধরা পড়িলেন। মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা দুষ্মন্তের না আছে, এমন নহে। তিনি শকুন্তলার লাবণ্যে বিলক্ষণ লুব্ধ হইয়াছেন। তাই বলিয়া, তিনি মদনের নিকটে দাসত্ব-খত দেন নাই। শকুন্তলার রূপে মোহিত হইয়া, শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া, এমন কি তীব্র-ভাবে তিরস্কৃত হইয়াও, নিজ জ্ঞান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। আর, উদয়নের সূক্ষ্ম-বিচার-শক্তি যে আছে, তাহার দৃষ্টান্তই বিরল। দুষ্মন্তের প্রণয় প্রগাঢ়, অথচ তিনি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ। শকুন্তলা-সমাগম লাভ করিয়াও তিনি রাজকার্য্য বিস্মৃত হন নাই। তখনও আশ্রম-পীড়া না হয়, সেনাপতির প্রতি ইহাই আদেশ হইল। দুষ্মন্ত দৈবাৎ শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর উদয়ন পতিপ্রাণা বাসবদত্তাকে কেন যে অনাদর করিতেছেন, তাহার কোনও সদ্যুক্তি লক্ষিত হয় না। বাসবদত্তার নিকটে সাগরিকা-প্রীতি গোপন করিতে উদয়ন বারংবার সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই বিফল হইয়াছেন। মন্ত্রীর উপরে রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া, তিনি স্বয়ং অন্তঃপুর-বেষ্টিত থাকিতে যেন ভালবাসেন। আর বহুকালপরে শকুন্তলা-সঙ্গমেও, দুষ্মন্তের প্রেম উদ্দামতা পরিত্যাগ করিয়া কেমন মৃদুতা ও রমণীয়তা লাভ করিল। আপাততঃ, দুষ্মন্তকে সুশিক্ষিত কোন মহারাজ রসিক নাগর বলিয়া, এবং উদয়নকে অশিক্ষিত কোন গ্রাম্য জমিদার বাবু বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

বাসব-দত্তা ও শকুন্তলা।

বাসবদত্তা-চরিত্রের তুলনা হয় না। তিনি সাক্ষাৎ পতিব্রতা-ধর্ম্ম। তিনি মর্য্যাদা-পালিকা, প্রশস্তমনাঃ, স্নেহময়ী ও স্বামিভক্তি পরায়ণা। স্বামী ব্যসনী, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তথাপি স্বামিভক্তি হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এখনও এমন অনেক ভারত-রমণী আছেন, যাঁহারা মদ্যপায়ী পতির মুখ-লগ্ন বাম অশ্রুধারায় প্রক্ষালন করিয়া আপনাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে পতিব্রতার অবিরল গলদশ্রু স্বামীর সুরা-পিপাসারও নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে। উদয়ন-প্রেমের ব্যভিচার বাসবদত্তা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তিনি অম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছেন। ক্রোধের অত্যন্ত উদ্দীপনা-সময়েও তিনি শিরঃপীড়াচ্ছলে পতিসন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন। আত্ম-সংযম প্রভাবে তিনি উদয়নের প্রতি কখনও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। এরূপ দেবী-চরিত্রের বিষয় ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। আবার অকস্মাৎ পতি-সন্নিধান

ত্যাগে পতির অপমান করা হইল, মনে করিয়া, অবিলম্বে পতিসেবার্থ পুনরায় আসিয়া তিনি কি কাণ্ডটাই না দেখিলেন,—তাহা রত্নাবলীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

শকুন্তলা-চিত্র ভিন্ন-প্রকৃতিক। কণ্বমুনির আশ্রমে অনেক পুষ্পিতা লতা আছে। সেই লতাগুলির মধ্যে শকুন্তলাকেও একটী উদ্যান-লতা বলিয়া জ্ঞান হয়। আশ্রমবাসী মৃগ ও আশ্রমজাত লতাকে শকুন্তলা ঠিক ভাই ভগিনীর মত স্নেহ করিতেছে।

বাসবদত্তা পাটরাণী হইয়াছেন, শকুন্তলাও হইবে। বাসবদত্তা পক্কবুদ্ধি মহিষী, শকুন্তলা সরলা বালিকা বধূ, সে সহচরীদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারে। বাসবদত্তা গৃহিণী, শকুন্তলা বালিকা। তাই পতির শত অপরাধেও বাসবদত্তা ক্রুদ্ধা হন নাই। শকুন্তলা কিন্তু প্রত্যাখ্যান সময়ে স্বামীকে 'অনার্য্য' সম্বোধন না করিয়া ছাড়ে নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন 'শকুন্তলার ত রক্ত-মাংসেরই শরীর, এস্থলে না হয়, কবি মানব-প্রকৃতি বিবৃত করিলেন।' আমরা কিন্তু এ দলের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। কারণ, 'রামাদিবদ্ বর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' মনুষ্যের শ্রীরামচন্দ্রের মতই হওয়া উচিত, রাবণের মত হওয়া উচিত নহে, ইহা বলাই কাব্যের উদ্দেশ্য। বাসবদত্তা কিন্তু তাঁহার প্রতি-স্পর্দ্ধিনী রত্নাবলীকে পর্য্যন্ত একটী কটু কথা বলেন নাই। পরিচারিকাগণ তাঁহাকে 'পরিজনবৎসলা' উপাধিই দিয়াছে। বাস্তবিক, পতিগৃহ গমন সময়ে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, বাসবদত্তার চরিত্র সে সমুদয় গুণেরই একখানি প্রতিবিম্ব। সময়ে, শকুন্তলাও এ সকল গুণের অধিকারিণী হইবে, সন্দেহ নাই। স্বামীর প্রতি উভয়েরই গাঢ় অনুরাগ আছে। কিন্তু তাহা বাসবদত্তার পক্ষে ভক্তি, শকুন্তলার পক্ষে প্রণয় মাত্র। ধৈর্য্যগুণে বাসবদত্তা শকুন্তলাকে সুদূর অতিক্রম করিয়াছে। স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখিয়াও বাসবদত্তা অক্ষুব্ধ। আর যখন শকুন্তলার স্বামি-গৃহেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল, তখন শকুন্তলা পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইতেই ইচ্ছুক। যদি বাসবদত্তা শকুন্তলা অপেক্ষা পুরাতন হইতেন এবং কণ্ব মুনিকে শকুন্তলার প্রতি এক কথায় উপদেশ দিতে হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন 'বৎসে, তুমি সীতা-সাবিত্রীর মত হও, তুমি বাসবদত্তার মত হও।"

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা।

ইহারা এক বৃন্তে দুইটী ফুল। খোপায় আরও একটী ফুল ছিল; সেটী শকুন্তলা। সময়ে তাহা দুষ্মন্ত তুলিয়া লইয়াছেন। এখন সেই ফুলের থোপনায় প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ামাত্র শোভা পাইতেছে। তার মধ্যে একটী স্ফুট ও অপরটী অর্দ্ধস্ফুট। লোকে বলে, যশস্বী ভারতীয় শিল্পী রবিবর্ম্মা অনসূয়াকে প্রিয়ংবদা অপেক্ষা বয়স্থা করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রিয়ংবদার কথাবার্ত্তাই তাহার সাক্ষী। প্রিয়ংবদার কথায় বোধ হয়, প্রিয়ংবদাই অনসূয়া অপেক্ষা বড়। যেন, শকুন্তলার মত তাহারও বিবাহের বয়স উপস্থিত। এ বাল্য-বিবাহ নহে, গান্ধর্ব্বাদি প্রৌঢ় বিবাহ। প্রিয়ংবদা রতি-রহস্য যেন বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। সে অনসূয়া অপেক্ষা বড় হইলেও শকুন্তলা অপেক্ষা ছোট। সে শকুন্তলার কামাবেশকে একটু কটাক্ষ-ভাবে দেখিতেছে। শকুন্তলার দাম্পত্য-সৌভাগ্যে তাহার যেন একটু অসূয়াই লক্ষিত হয়। তাই, কবি তাহার নাম অনসূয়া রাখেন নাই। মধ্যে মধ্যে ২।১টী রসের কথাও প্রিয়ংবদার ওষ্ঠপুট ভেদ করিয়া থাকে। শকুন্তলা ও প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে

লইয়া রসিকতা করে, আর অনসূয়ার হৃদয় হইতে তাহার কোন প্রতিধ্বনিই উত্থিত হয় না। সে যেন 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদম্' করা হয়। শকুন্তলার লজ্জাশীলতায়, সে তাহার চিত্ত-চোরের সহিত আতিথ্য-আলাপও করিতে পারিতেছে না,—তাঁহার দিকে তাকাইতেও সে বক্র-নয়নে চাহিতেছে। কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গীতেই মনের ভাব ব্যক্ত হইতেছে। প্রিয়ংবদাও দুষ্মন্তের সহিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। ইহাও বয়সের দোষ বা মধুরিমা বটে। বালিকা অনসূয়াই রাজার সহিত প্রথমতঃ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সে-ই কথা চালাইতেছে। তাহাতে মাঝে মাঝে প্রিয়ংবদা যোগ দিতেছে মাত্র। দুষ্মন্তের নিকটে, শকুন্তলার জন্ম-রহস্য অনসূয়াই ভঞ্জন করিতেছে। তখন প্রিয়ংবদা নীরব—লজ্জায় তাহার জিভেই যেন কামড় পড়িল। কিন্তু যখন কোন রসিকতার কথা পড়ে, তখন সে আড়ালে থাকিতে পারে না; বরং তখন অনসূয়াই কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া থাকে। উভয়েই শকুন্তলার প্রাণের সখী, উভয়েই শকুন্তলার সুখে সুখী, এবং উভয়েই শকুন্তলার দুঃখে দুঃখী। শকুন্তলার হস্তিনাপুর গমন সময়ে, উভয়েই উপহার সংগ্রহে ব্যস্ত। কণ্বমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা শুনিয়া কি বলেন, সে আশঙ্কায় উভয়েই অভিভূত হইয়াছে। উভয় সখীই দুর্ব্বাসার কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইল। অনসূয়া অধীর হইল। আর প্রিয়ংবদা একটু উলুথনের সহিত বলিল "শকুন্তলা গৃহে আছে বটে; কিন্তু তার মন ত আর গৃহে নাই!" এরূপ জানিয়া শুনিয়াও প্রিয়ংবদা স্বয়ং অতিথি-সৎকার করিতে না আসিয়া বিপদ্‌কে প্রশ্রয় দিয়াছে। পরে কিন্তু দুর্ব্বাসার অভিশাপ মৃদু করিবার জন্য উভয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। দুর্ব্বাসার শাপ শ্রবণ করিয়া উহারা মর্ম্মাহত হইল। এরূপ নিদারুণ অমঙ্গলের কথা তাহারা আর মুখে আনিতেই সাহস পাইল না। কেবল, শকুন্তলার অঞ্চলে অঙ্গুরীয়টীকে বাঁধিয়া, শকুন্তলাকে সাবধান করিয়া বলিল, "সখি, রাজার স্মৃতিভ্রম হইলে, তাঁহাকে এই স্মৃতি-চিহ্নটী দেখাইও।" সখীদের এতটুকু মাত্র অশুভ শঙ্কার কথা শুনিয়াই শকুন্তলার হৃদয় কম্পিত হইল। তাহারা পুনরায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিল। প্রিয়ংবদা নামেও প্রিয়ংবদা, কার্য্যেও প্রিয়ংবদা। প্রিয়ংবদা বড়ই মধুভাষিণী, সে বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সে লক্ষণ দ্বারাই অর্থ বুঝিতে পারে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরস্পরের রূপে মুগ্ধ, ইহা প্রিয়ংবদাই প্রথমে লক্ষ্য করিয়াছে। সে নায়ক নায়িকার মিলনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিল। রাজার সঙ্গে দুইটা কৌতুক পরিহাসও করিল। সে বড়ই চতুর। সে রাজাকে দেখিয়া অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিল "সখি, ইনি কে হন?" অনসূয়া কিন্তু অমনি সুমিষ্ট ভাষায় এ প্রশ্নটি রাজাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল। উভয়েই স্নেহানল-দীপ্তা, মৃদু-ভাষিণী। অনসূয়া বালিকা, তাহার বিচার করিবার শক্তি নাই, কেবল কোমল হৃদয়খানি আছে। প্রিয়ংবদা বুদ্ধিমতী, তাহার বিপদ্ প্রতীকারের চেষ্টাও আছে।

শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া ইহারা সকলেই এক প্রাণ ও গুরুভক্তি-পরায়ণ। বোধ হয়, দয়ার সাগর কণ্বমুনি উহাদিগকে নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। কিন্তু, উহারা যেন তিনটী সহোদরা ভগিনী, যেন আদর্শ পরিবারস্থ তিনটী যাতা (যা)। মিলিত পরিবারে অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এই আগন্তুক লক্ষ্মীরা পরস্পর ঈর্ষা করিতেছে বলিয়া ভ্রাতৃ-

বৎসল সহোদরগণের মধ্যেও বিরোধ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আহা, এই আগন্তুক ভ্রাতৃবধূগণ যদি অনসূয়া, প্রিয়ংবদার মত সহৃদয় হইত, তবে পরিবার কি সুখেরই না হইত। এরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা আজকাল নিতান্ত বিরল।

রত্নাবলী ও সুসঙ্গতা।

কবি লঙ্কাদ্বীপ হইতে একটী ফুল আনিয়া কি শুভক্ষণে, বুন্দেলখন্দীয় একটী ফুলের সহিত তুলক গাঁথিয়াছেন। কুসুম দুটী দেখিতে দেখিতেই এক দেহ এক প্রাণ হইয়া উঠিল। আহা, দুজনের কি ভাব! কি সখ্য! সুসঙ্গতার কোন অবস্থান্তর ঘটে নাই। বহুকাল যাবৎ সুসঙ্গতা রাজবাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এক্ষণেও সে তাহাই আছে। কিন্তু, রত্নাবলীর জীবনে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

রত্নাবলী সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর কন্যা। লগ্নাচার্য্য গণিয়া বলিয়াছেন, যিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইবেন। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের সহিত রত্নাবলীর বিবাহ স্থির হইল। কন্যাযাত্রী সহ সিংহল হইতে কন্যা কৌশাম্বী অভিমুখে যাত্রা করিল। অকস্মাৎ জাহাজ জলমগ্ন হইল। অনাথা রত্নাবলীকে সাগরবক্ষে ভাসিতে দেখিয়া জনৈক বণিক্-হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। সওদাগর রত্নাবলীকে আনিয়া রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। সাগরে প্রাপ্তা বলিয়া, অদ্যাবধি রত্নাবলী সাগরিকা নামে পরিচিতা হইল।

বিধির বিড়ম্বনায় রাজকন্যা রত্নাবলী আজ যে রাজার মহিষী হইবে স্থির হইয়াছিল, ঠিক্ সেই রাজার অন্তঃপুরচারিণী হইয়াছে। অদৃষ্ট-চক্রের কি ঘোর বিপর্য্যয়। কোথায় রাজরাণী, আর কোথায় পরিচারিকা। এই মহা বিপদ্‌পাতে কে যেন তাহার হৃদয়ে বল সঞ্চার পূর্ব্বক কাণে কাণে বলিয়া দিল যে, বিধির বিকট বিলাস জীবের ভাগ্যে অহরহই ঘটিতেছে। ইহা অনিবার্য্য। তাই বিধির একান্ত বশংবদ হইয়া, সাগরিকা বিহ্বলার মত কালপাত করিতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সুন্দর একখানি হৃদয় লাবণ্যে জড়াইয়া বিষাদ-কালিমার আভাস দিয়া রাখিয়াছে। রত্নাবলী বস্তুতঃ একটী রত্নাবলী, উহাতে নীচতার লেশমাত্র নাই। কাজেই তাহার দুঃখে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, কেবল সখী সুসঙ্গতা কেন? রত্নাবলীর মধুর ব্যবহারে যে কোন ব্যক্তিকে মোহিত হইতে হয়। তাহাতে, অন্বর্থনাম্নী সুসঙ্গতা মন্ত্রমুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যখন বাসবদত্তা জানিতে পারিলেন যে, একই চিত্র-ফলকে রত্নাবলী ও উদয়নমূর্ত্তি পাশাপাশি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে যাহাতে রত্নাবলীর কান্তি রাজার নয়ন-গোচর না হয়, তিনি সে ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে, রত্নাবলীকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিবার ভার বিশ্বস্তা সুসঙ্গতার উপরেই পড়িল। রাণী সুসঙ্গতাকে পারিতোষিক-স্বরূপ নিজ পরিচ্ছদ উপহার দিলেন। সুসঙ্গতা মনে করিল, রত্নাবলীকে সাহায্য করিবার পন্থা সুগম হইল। সে ভাবিল, এই রাণীবেশেই রত্নাবলীকে সুসজ্জিত করিয়া উদয়নের সহিত মিলিত করা সুকর হইবে। এ কার্য্যটা যে রাণীর প্রতি সুসঙ্গতার বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, তাহাও সুসঙ্গতা ভুলিয়া গেল। আবার, যখন এই রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সাগরিকা ও সুসঙ্গতা উভয়ের মুখই মলিন হইল বটে, কিন্তু, সুসঙ্গতা হৃদয়ের লজ্জা তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ

পরিচারিকার কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত করিল। উচ্চ-বংশ ও নীচবংশের এই টুকুই প্রভেদ। সে যাহা হউক, সুসঙ্গতার মত সখী না পাইলে, উদয়নের অন্তঃপুরে দাসী-পণা করা রত্নাবলীর পক্ষে সুদুঃসহ হইত। কত কাল পর্য্যন্ত উদয়নকে না দেখিয়া থাকিতে হইত, তাহা কে বলিতে পারে? অমৃতরশ্মির আশায় আশায় বা চকোর কতকাল জীবন ধারণ করিতে পারে? ঔষধের নাম জপ করিলেই ত আর রোগ-শান্তি হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন, এম্, এ।

বিকালে পল্লী।

বেলা ডোবে, বিকাল হ'ল,
কমল মুদে আঁখি;
দীর্ঘতানে—— বাধ্ লাগাছে,
ডাক্‌ছে ঘুঘু পাখি।
দিনমণি কিরণমালা
ঢালি পাতার গায়,—
শ্রান্ত দেহে মেঘের কোলে
রঙিন মুখে চায়।
সূর্য্যমুখী রবির পানে
বিষাদ মাখা মুখে,—
চেয়ে আছে নিরাশ প্রাণে
নীরব মন দুখে।
ছেলেগুলি— বিকাল দেখি
খেলা ধূলায় ধায়,
কুলবধূ— কল্‌সী লয়ে
জল আনিতে যায়।
কত যুবা— দীঘির পাড়ে
ছিপ্‌টী হাতে রেখে—
কনে বোয়ের— কলসী কাঁখে—
চলনটুকু দেখে।
কচিৎ বা কোন পাড়ায়
বাবাজী এসে বলে,—
"হরে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও মা
দিন ত গেল চলে।"
কোন বাড়ী বিকাল বেলা
বড় লোকের মেয়ে—
সিঁথা কাটে, আতর মাখে,—
মুকুর পানে চেয়ে।
কোন ঘরে গৃহস্থ বউ
আনত করি মাথা,—
ছেলে পাশে, আপন মনে,
সেলাই করে কাঁথা।
গিন্নী-গুলি— পাড়ায় বসে,
যেমন খেটা সাজে,—
কুচ্ছ গেয়ে পরের কথা
কাটায় বাজে কাজে।
পথে চলে আভীর বালা
গুছায়ে আঁক বাড়ি,—
কাঁখে করে— সাঁজের আগে—
যোগান দুধের হাঁড়ি।
ছেলে কোলে, কৃষাণ-বধূ
বিকাল গেল বলি—
তাড়াতাড়ি সকাল করে
ঝাঁটায় অলি গলি।
মেয়ে ছেলে পুতুল লয়ে
বিয়ের কাজে রত,
রাঁধা বাড়া, চড়ুই ভাতি,
আমোদ করে কত।
চুপি চুপি— আকাশ হতে—
আঁধার এল উলি;
গাভী সাথে রাখাল আসে
উড়িয়ে মাঠে ধূলি।
দীঘির ঘাটে— কাপড় কাচি
নূতন বধূগণে,—
গা ঢেলে দে আঁধার ঘোরে
চলে বুড়ীর সনে।
সন্ধ্যা এল, ঘরের বধূ,
কপালে পরে টিপ্,—
আলো দেয় তুলসী মূলে,—
হাতে সাঁজের দীপ।
সিঁদুর গোলা মেঘের মাঝে—
সূর্য্য বসে পাটে;
পাড়া গাঁয়ের বিকাল বেলা
এমনি ভাবে কাটে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোলে করে বসিলেন বীর হনুমান।
আশীর্ব্বাদ পদ্মহাত মাথায় বুলান॥
চিন্তা নাহি লাউসেন ভয় কর দূর।
আমারে পাঠায়ে দিল শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে এলাম ধাওয়াধাই।
আচম্বিতে এখানেতে বসি কেন ভাই॥
হাসিতে লাগিল তখন ধর্ম্মের তপস্বী।
এ কথা কহিতে দাদা বড় লাজ বাসি॥
জামতী নগর এই বারুয়ের পাড়া।
কুলবধূ হয়ে সব বেশ্যা হোতে বাড়া॥
আমার কারণে বড় হয়ে অনুরাগী।
ছেলে মেরে কুয়ায় ফেলায় এক মাগী॥
চোর বলে আমাকে সকল লোক ধরে।
বিপাকে পড়িয়া বন্দী হলাম কারাগারে॥
হনুমান বলে ভাই স্থির কর মন।
একবার ভূপতিকে কহিব স্বপন॥
দণ্ড চারি থাক তুমি কারাগারে বসি।
মানসিংহ রাজাকে স্বপন কহে আসি॥
এত বলি হনুমান করিল গমন।
রাজার মহলে বীর দিল দরশন॥
নিদ্রাগত নরপতি পালঙ্ক উপরে।
স্বপন কহেন হনু বসিয়া শিয়রে॥
চিয় চিয় নরপতি কর অবধান।
কারাগারে ধর্ম্মের সেবক দুঃখ পান॥
গৌড়পুরী যান সেন নৃপ সম্ভাষণে।
সাধুজনে বন্দী কর নারীর বচনে॥
লাউসেনের দোষ নাহি বুঝেছি নিশ্চয়।
বীর হনুমান আমি দিলাম পরিচয়॥
বন্দী কর লাউসেনে এত বড় তুজুক।
পদাঘাতে বেটার ভাঙ্গিয়া দিব বুক॥
আপনার যদি চাস্ জীবনের আশ।
প্রাতঃকালেতে কালি করিবি খালাস॥
দড় দড় বলে যাই যদি অন্য ভাব।
জামতি নগর লয়ে সমুদ্রে ফেলাব॥
রামের দোহাই যদি এ কর্ম্ম না করি।
এত বলে হনুমান গেল স্বর্গপুরী॥
রাম রাম বলিয়া গা তোলে নৃপমণি।
সবিতা প্রকাশ হল পোহাল রজনী॥
স্বপন দেখিয়া যদি গা তোলে রাজন।
দরবারে বসিলা লয়ে পাত্র মিত্রগণ॥
পঞ্চপাত্র লয়ে রাজা বসিলা দেয়ানে।
বেষ্টিত করিয়া বসে যত প্রজাগণে॥
রাজা বলে মন দিয়া শুন সর্ব্বজন।
নিশিযোগে আজি বড় দেখেছি স্বপন॥
যে সব কহিল তার কি কব কাহিনী।
সকল কথায় বলে করিয়া তর্জ্জনী॥
ধর্ম্মের সেবকে দেহ করিয়া ছাড়ান।
পরিচয় বলে আমি বীর হনুমান॥
লাউসেন নাম যার আন ত্বরাপর।
এত শুনি কোটাল চরণে করে ভর॥
সেনকে আনিতে আজ্ঞা দিল মহীপাল।
কারাগারে সমাচার কহিল কোটাল॥
দূতমুখে লাউসেন সমাচার পেয়ে।
দরবারে রাজার কাছে উত্তরিল গিয়ে॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নূতন সঙ্গীত॥
লাউসেন উপনীত দরবার ভিতর।
আসনে বসান রাজা করে সমাদর।
রাজা বলে সেন তুমি দেবতার অঙ্গ।
পরস্পর শুনেছিলাম তোমার প্রসঙ্গ॥
তুমি লাউসেন রাজা ধর্ম্ম অবতার।
তোমার সাক্ষাতে নাহি অধর্ম্ম বিচার॥
যোড় করে সেনকে জিজ্ঞাসে মহীপাল।
কহ সেন কিরূপেতে মরিল ছাওয়াল॥

এতশুনি কহেন দুর্ল্লভ সদাগর।
ইষ্টদেব আমার ঠাকুর মায়াধর॥
বাঁচাব ছাওয়ালে আমি সভার ভিতরে।
ছাওয়াল কি বলে রাজা জিজ্ঞাসিবে তারে
শিশুকে বাঁচাব আমি দিয়া পুষ্প জল।
তার মুখে মহারাজ শুনিবে সকল॥
মৃত শিশু বাঁচাইতে সেন করে পণ।
অসম্ভব শুনিল সকল প্রজাগণ॥
ছাড়িয়া মথুরাপুরী অবন্তী নগরে।
রামকৃষ্ণ যেকালে গেলেন পড়িবারে॥
গুরুদেব সদনে করিয়া অঙ্গীকার।
বাঁচাইয়া দিল হরি গুরুর কুমার॥
সেইমত লাউসেন প্রতিজ্ঞা করিয়া।
শিশুকে বাঁচাতে যান সভাজন লয়্যা॥
মরা ছিল বালক পাবেক প্রাণদান।
দেখিতে সকল লোক করিল পয়ান॥
হাতীর উপরে রাজা চাপিল তখন।
ধাওয়াধাই আগে পিছে চলে লোকজন॥
কুয়াতে পড়িয়া শিশু আছিল যেখানে।
লাউসেন উপনীত তাহার সদনে॥
লোক দিয়া নরপতি শিশুকে তোলায়।
স্নান দান করিলেন লাউসেন রায়॥
একমনে ভাবিয়া ঠাকুর মায়াধর।
পুষ্প জল দিল সেন শিশুর উপর॥
সেন দিল পুষ্প জল বালকের শিরে।
পঞ্চভূত আত্মা ক্রমে বসিল শরীরে॥
ধর্ম্মের কৃপাতে শিশু পাইল জীবন।
ধন্য ধন্য লাউসেন বলে সর্ব্বজন॥
পাঁচ বৎসরের শিশু ছয় নাহি পুরে।
কোলে করি নরপতি জিজ্ঞাসেন তারে॥
খেতে দিব গুড় লাড়ু কাণে দিব সোণা।
কহ বাছা তোমাকে মারিল কোন্‌জনা॥
ধর্ম্মমত শিশুকে জিজ্ঞাসে নরপতি।
বালকের বদনে বসিল সরস্বতী॥
যোড়হাতে নৃপতিকে বলিছে ছাওয়াল।
বিচারিণী মাতা মোর শুন মহীপাল॥
নানা বেশ করিলেন ভোলাবার তরে।
লাউসেনে বুঝালেন অশেষ প্রকারে॥
কদাচ না ভুলিলেন লাউসেন রায়।
আমাকে মারিয়া মাতা ফেলেন কুয়ায়॥
দরবারে বসিয়া শিশু ডাক দিয়া কয়।
জামতি নগরেতে সেনের হল জয়॥
কথা শুনে সর্ব্বলোক গণে অসম্ভব।
লাউসেনের চরণ ধরিয়ে করে স্তব॥
রাজা বলে লাউসেন ক্ষম অপরাধ।
না বুঝিয়া করিলাম এত বিসম্বাদ॥
নাসা কেটে মাগিকে করিয়া দিব দূর।
অপরাধ ক্ষমা কর ময়নার ঠাকুর॥
ভূপতিরে বুঝান ময়নার যুবরাজ।
অসতীর কথায় সতীর হয় লাজ॥
স্বামী হয় নরপতি অবলার মন।
নাসিকা কাটিলে হবে কোন প্রয়োজন॥
লাউসেনের কথায় সকল লোক বলে।
কোন দেব আসিয়া জন্মেছে মহীতলে॥
এজন মনুষ্য নয় বুঝি অনুমানে।
সর্ব্বলোক প্রশংসা করিল লাউসেনে॥
ঢাল খাড়া আভরণ কোটাল যোগায়।
বিদায় হইয়া চলে লাউসেন রায়॥
গ্রামের বাহির হোয়ে পশ্চাৎ সরণে।
কর্পূর পাতর বলে পড়ে গেল মনে॥
চারি দিকে খুজেন কিরূপে দেখা পাই।
কোথা গেল প্রাণের কর্পূর ছোট ভাই॥
অনুমানে বুঝি মোরে বিড়ম্বিল বিধি।
বিদেশেতে হারালাম ভাই গুণনিধি॥
সরাণে দাণ্ডায়ে ডাকে লাউসেন বীর।
কিয়া বন হোতে কর্পূর হইল বাহির॥
সেনের চরণে আসি করে দণ্ডবৎ।
লাউসেন বলে ভাই কহ হবিগত॥
কালি কোথা ছিলে ভাই বল বিবরিয়া।
প্রাণ মোর স্থির নয় তোমা না দেখিয়া॥
কর্পূর বলেন আমি এলাম ধাওয়াধাই।
তোমার কারণে দাদা বড় দুঃখ পাই॥

বারুই মাগী যখন তোমায় কোমর ধরে।
এক দৌড়ে গিয়াছিলাম গৌড় নগরে॥
গৌড়েশ্বরে কহিয়া সকল সমাচার।
তবে সে করিলাম ভাই তোমার উদ্ধার॥
এত শুনি লাউসেন হাসে খল খল।
কোথা ছিলে কালি ভাই সত্য করে বল॥
প্রলাপ চাতুরী কথা নাহি লাগে মনে।
কর্পূর বলেন ছিলাম এই কিয়া বনে॥
অশ্রুমুখ হল শুনি ভাইয়ের বচন।
কোলাকুলি দুই ভাই প্রেম আলিঙ্গন॥
আর ভয় না করিহ লাউসেন কয়।
আমার ভরসা মাত্র ধর্ম্ম পদদ্বয়॥
যেরূপেতে জয় হল জামতি নগর।
একে একে সকল কহিল অবান্তর॥
নানা দ্রব্য দিল সেন কর্পূরে খাইতে।
যাত্রা করে দুই ভাই চলে রাজপথে॥
কত দূর গৌড় জিজ্ঞাসে সদাগর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন মায়াধর॥
রাজপথে চলিলেন দুই সহোদর।
লাউসেন বলে শুন কর্পূর পাথর॥
দেবতার বরে জান ভবিষ্যৎ কথা।
তে কারণে তোমাকে জিজ্ঞাসি বারতা॥
মন দিয়া শুন ভাই প্রাণের কর্পূর।
বিবরিয়া বল মোরে গৌড় কত দূর॥
কর্পূর বলেন শুন সেন গুণমণি।
আগে আছে গোলাহাটে সুরিক্ষা নটিনী॥
সুরিক্ষা নিকটে ছাড়ান যবে পাবে।
গৌড় কত দূর তবে মোরে জিজ্ঞাসিবে॥
সুরিক্ষা নটিকে আছে অভয়ার দয়া।
পুরুষ চলিতে নারে গোলাহাট দিয়া॥
গৌড়েশ্বর খাজনা সাধিতে নারে তার।
গোলাহাটে রাজা সেই শুন সমাচার॥
রূপ দেখে তুমি হবে সুরিক্ষার প্রাণ।
আমাকে মারিবে মাত্র ভানাইয়া ধান॥
এক মুখে কি বলিব সুরিক্ষার কথা।
গোলাহাট দিয়ে ভাই না চলে দেবতা॥
অনুকূল সুরিক্ষাকে দেবী দশভুজা।
পরাজয় মেনেছেন গৌড়েশ্বর রাজা॥
ছকুড়ি নাগর তার বন্দী কারাগারে।
নাগরালী নাহি সবে শ্রম করে মরে॥
ঔষধে পাগল হয়ে শ্রম করে থাকে।
সন্ধ্যা কালে চরণে ডাঁড়ুকা দিয়া রাখে॥
সেন বলে কোন্ জাতি কি নাম তাদের।
নাম কহ শুনিব ছকুড়ি নাগরের॥
কর্পূর বলেন দাদা কর অবগতি।
ছত্রিশ বর্ণের রাজা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি॥
নাগরের নাম শুন সেন তপোধন।
কামদেব, কানুরাম, কমললোচন॥
হিরাধর, হরানন্দ, হরিদাস, হর।
পশুপতি, পার্ব্বতী, পরাণ, পুরন্দর॥
বনমালী, বলভদ্র, বলরাম দাস।
বসুদেব, বিরিঞ্চি, কেশব, শ্রীনিবাস॥
মহেশ্বর, মহাদেব, মনোহর, মাধব।
যদুনাথ, জনার্দ্দন, জয়রাম, যাদব॥
গোপেশ্বর, গোপীনাথ, গোকুল, গৌরী।
গোপাল, গোবিন্দ, গোরা, গোবর্দ্ধন, গিরি,
সনাতন, সর্ব্বেশ্বর, সুবল সুন্দর।
চক্রপাণি, চাঁদচন্দ্র, চন্দ্রশেখর॥
ক্ষেমানন্দ, খগেশ্বর, আর খেলারাম।
রসময়, রমানাথ, রসিক, সুদাম॥
নরোত্তম, লক্ষ্মীনাথ, লক্ষ্মণ, নয়ন।
ভগীরথ, ভুবন, ভরত, ভগবান॥
দয়ারাম, দামোদর, দাশু, মথুরেশ।
গোঁসাই দাস, গদাধর, গজেন্দ্র, গণেশ॥
কৃপারাম, কৃষ্ণদাস, কুশল অভয়।
ধর্ম্মদাস, ধনীরাম, ধরু, ধনঞ্জয়॥
নরসিংহ, নারায়ণ, নবনী, নথাই।
যশোধর, জয়কৃষ্ণ, যোগেন্দ্র, জগাই॥
বৃন্দাবন, বসন্ত, বিক্রম, কেশীধর।
বামদেব, বিশ্বনাথ, বাসু, বিশ্বেশ্বর॥
মণিরাম, মুরারি দাস, মুকুন্দ, মদন।
জানকী, জীবন, যাদু, যশোদানন্দন॥

এই সব নাগর থাকে সুরিক্ষার ঘরে।
রূপ দেখে ধৈরজ ধরিতে কেহ নারে॥
ছকুড়ি নাগর মধ্যে ছুটি নাহি আঁটে।
পূর্ণাহুতি দিবে যদি যাই গোলাহাটে॥
রাজভেটে কার্য্য নাই শুন নৃপমণি।
ভুলাইয়া রাখে পাছে সুরিক্ষা নটিনী॥
ছকুড়ি নাগর তারা যে কর্ম্মেতে থাকে।
অবধান কর দাদা বলিব তোমাকে॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥

ত্রিপদী ছন্দ।

সুরিক্ষার ইতিহাস, শুনিলে লাগয়ে ত্রাস,
কর্পূর বলিছে লাউসেনে॥
প্রাণ মোর নয় ধৈর্য্য, রাজভেটে নাহি কার্য্য,
ফিরে চল ময়না ভুবনে॥
নটিনী বড়ই দুষ্ট, ধর্ম্ম পথে নাহি দৃষ্ট,
ছকুড়ি নাগর বন্দী করে।
মনে বড় ভয় পাই, গোলাহাট দিয়ে ভাই,
দেবতা চলিতে নারে ডরে॥
যে কর্ম্মে নাগর থাকে,বলি আমি একে একে,
অবধানে শুন তপোধন।
ত্যজি যত দান পুণ্য, সুরিক্ষা নটির জন্য,
ব্রাহ্মণেতে করয়ে রন্ধন॥
পাক করে দ্বিজবর, নদীয়া নগরে ঘর,
ডুবায়েছে সুরিক্ষা পাপিনী।
নাম তার জনার্দ্দন, রতিরসে মুগ্ধমন,
যেন ছিল অজামিল মুনি॥
কি কহিব সুরিক্ষার, রাজনীতি কারবার,
লেখে পড়ে কায়স্থ নাগর।
বৈদ্য নাগর ঘরে, সুরিক্ষা নটীর তরে,
ঔষধ যোগায় নিরন্তর॥
ছুতারে মহল গড়ে, ভট্টেতে কবিতা পড়ে,
নানা বাদ্য বাজায় বাইতি।
কর্জ্জ সাধে রজপুতে, তেল যোগায় কলুসুতে,
গৃহকর্ম্ম করে নীচজাতি॥
শত গোপে চসে চাষ, তাঁতি নাগর বুনে বাস,
আগুরি টহল যোগায় ঘরে।
অগুরু কস্তরী চুয়া, তাম্বুলী কাটে গুয়া,
তৈল মাখায় নাপিত নাগরে॥
শাঁখারি পরায় শাঁখা, পোদ্দারে চিনয়ে টাকা,
বারুই নাগরে যোগায় পান।
কামারে পরায় খাড়ু, ময়রা যোগায় লাড়ু,
তেলী নাগর ভেনে যোগায় ধান॥
সেকরা গড়য়ে সোণা, সজ যোগায় গন্ধবেন্তা,
মালী নাগর দেয় ফুলমালা।
কৈবর্ত্ত নাগর যত, মীন যোগায় অবিরত,
দধি দুগ্ধ যোগায় গোয়ালা॥
অতি সুকোমল দেহ, চামর ঢুলায় কেহ,
রজক নাগরে বস্ত্র কাচে।
ঔষধে পাগল হয়ে, সুরিক্ষার কাছে গিয়ে,
গ্রহবিপ্র পাঁজি শুনায় কাছে॥
সুরিক্ষা নটীর তরে, হাঁড়ি জোগায় কুম্ভকারে
ভারে করে বয়ে আনে জল।
এইরূপে যত জাতি, ডোমেরা যোগায় পাখি,
চণ্ডালে যোগায় পানিফল॥
কি আর বলিব আমি, ধর্ম্মের সেবক তুমি,
বড় নাম সেন যুবরাজ॥
গোলাহাট দিয়া যাই, যদি দেখে ভুল ভাই,
" ভুবন ভরিয়া হবে লাজ।
এত শুনি লাউসেন, কর্পূরে প্রবোধ দেন,
মোর সখা রাজরাজেশ্বর।
সুরিক্ষা দলন করি, যাইব গৌড়পুরী,
সঙ্গে থাক না হয়ো কাতর॥
শুন ভাই মন দিয়া, গেছিলেন মহামায়া,
মোর মন বুঝিবার তরে।
তোমারে বিশেষ বলি, সরণে যখন খেলি,
গেলা চণ্ডী আখড়ার ঘরে॥
হরিসুত ধরি চাপে, ভুবনমোহিনী রূপে,
ভুলাতে নারিল নারায়ণী।
যদি মন দড় হয়, যমকে নাহিক ভয়,
কোন্ ছার সুরিক্ষা নটিনী॥

ঢাল খাঁড়া করি হাতে, কর্পূরে লইয়া সাথে,
গোলাহাটে দিল দরশন।
ধর্ম্ম পদারবিন্দে, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
ফলা খাঁড়া হাতে সাজে সঙ্গেতে কর্পূর।
গোলাহাটে উপনীত ময়নার ঠাকুর॥
বিচিত্র বসন ভূষা নানা আভরণ।
দুভায়ে চলেন যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
গগন মণ্ডলে যখন দুই প্রহর বেলা।
সহরেতে প্রবেশিলা লাউসেন বালা॥
গোলাহাট গ্রাম খান বিস্তার দেখিতে।
শাঁখারি বাজার সেন দেখে বাম ভিতে॥
বাজার ভিতর দিয়া পাশ্চাই শরণি।
দক্ষিণে বেশ্যা পাড়া দুসারি দোকানি॥
সহর দেখিয়া যান ভাই দুই জনা।
স্নানেতে চলেছে যত নগরের অঙ্গনা॥
সুনাগরী নিতম্বিনী দুসারি দাণ্ডায়ে।
গোপিনী ভুলিল যেন কৃষ্ণকে দেখিয়ে॥
কোন্ দেশ হতে এল দুই সহোদর।
অনুমানে বুঝি বটে রাজার কুমার॥
জন্মিয়া যে এমন সুন্দর নাহি দেখি।
মনে করি ধনকে পরাণে করে রাখি॥
কেহ বলে এমন বাসনা মোর করে।
সঙ্গে পেলে অনল মেটিয়া যাই ঘরে॥
দেখ সই কিবা দিব রূপের উপাম।
সুরথ অর্জ্জুন কিবা কৃষ্ণ বলরাম॥
রূপ দেখে এমনি রমণী সব রয়।
মন হল চাতক, লাউসেন হল পয়॥
ঐ রূপে চলেছেন সেন গুণমণি।
দোকানেতে মালা বেচে উর্ব্বশী মালিনী॥
নানা ফুলে মালা গাঁথে দোকানেতে বসি।
দশনে ভ্রমর খেলে মৃদুমন্দ হাসি॥
বচন বলিতে সোণা দোলে দুই কাণে।
মন্ত্র পড়ে মালা গাঁথে দেখে লাউসেনে॥
গাঁথিল ফুলের মালা অতি মনোহর।
মালা দেখে ভুলিলেন লাউসেন কোঙার॥
মালিনীর মালায় সেনের হল মন।
দোকানেতে দাণ্ডাইল ভাই দুই জন॥
কত নিবে মালাকে বলেন সদাগর।
এত শুনি মালিনীর হরিষ অন্তর॥
এস ধন পরাণ কড়িতে কাজ কি।
পীরিতের মরা হলে সকল মালা দি॥
রবির কিরণেতে মলিন চাঁদ মুখ।
অতি সুকোমল তনু দেখে লাগে দুখ॥
মালা পর বসে কর তাম্বুল ভক্ষণ।
শ্রম দূর হোক করি চামর ব্যজন॥
লাউসেন বলে রামা কর অবধান।
ধর্ম্মের সেবক আমি নাহি খাই পান॥
পরধন বিনি মূলে মোর নিবার নয়।
কড়ি লও মালা দাও তবে ভাল হয়॥
মালিনী বলেন ভাল দাও তবে কড়ি।
পরিচয় বল দেখি কোন্ দেশে বাড়ী॥
সত্য কথা বল মোরে ছাড় প্রবঞ্চনা।
সেন বলে মোর বাড়ী চমরা ময়না॥
পিতা মোর কর্ণসেন শুন গো মালিনী।
রঞ্জা বিন্তাধরী মোর বটেন জননী॥
দুই সহোদর মোরা অনুজ কর্পূর।
নাম ধরি লাউসেন ময়নার ঠাকুর॥
মহামদ পাত্র মামা, মেসো গৌড়েশ্বর।
মেসোকে ভেটিতে যাই গৌড় সহর॥
মালিনী হাসেন শুনে সেনের ভারতি।
আর কি বলিব সেন তুমি হলে নাতি॥
সে কালের কথা সেন পাসরিতে নারি।
রঞ্জাবতী মাতা তোমার আমার ঝিয়ারী॥
কর্ণসেন গৌড়পুরী যেতেন এ পথে।
অবশ্য উত্তরিয়া যেতেন আমার বাড়ীতে॥
বাস কর দুই ভাই আমার ভবনে।
আজি থাক কালি যাবে প্রত্যূষ বিহানে।
দয়া নাহি ছাড় তোমার আই আমি বটি।
কর্পূর বলেন মাগীর দেখনা ভাবুটী॥
মায়ামৃগ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন রাম।
সেইমত লাউসেন দেখে পুষ্পদাম॥

মালিনী বলেন সেন কর অবধান।
মোর ঘরে দুই ভায়ে কর স্নান দান॥
চেয়ে দেখ আকাশে বিস্তর হল বেলা।
ধর্ম্ম পূজা কর সেন দিয়া পুষ্পমালা॥
আজি থাক কালি যেও গৌড় সহর।
এত শুনি সায় দিল লাউসেন কোঙার॥
বলিতে লাগিল সেন কর্পূরকে ডাকি।
চল আজি মালিনীর ঘরে গিয়া থাকি॥
কর্পূর বলেন যত নিষেধ বচন।
সেন নাহি শুনে কথা দৈবের কারণ॥
মালা নিল লাউসেন সেবিতে কর তারে।
উত্তরিলা দুই ভাই মালিনীর ঘরে॥
ব্যস্ত হল মালিনী দেখিয়া মহীপাল।
বসিতে আসন দিল শোক শিশুর ছাল॥
ফলা খাঁড়া রাখিলেন লাউসেন রাজা।
স্নান দান করিয়া করিলা ধর্ম্ম পূজা॥
জলপান মুখশুদ্ধি করে তার পর।
দুই ভাই বসিলেন আসন উপর॥
সেন সঙ্গে উপহাস করিছে মালিনী।
ভাজন বুড়ি লয়ে কিছু শুনিব কাহিনী॥
ধর্ম্মপদ অরবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্য সঙ্গীত॥
মালিনীর বাড়ীতে ময়নার মহীপতি।
ভাজন বুড়ি লয়ে কিছু কর অবগতি॥
পিঠেতে দারুণ কুজ হাতে ধরে নড়ি।
মালিনীর ঘরকে চলেছে ভাজন বুড়ী॥
বুড়ীর বয়সে নাহি গাছ আর পাথর।
ঘরে ঘরে বেড়ায় বুড়ী ভুলাতে নাগর॥
চলে যেতে বুড়ীর কাঁপিয়া যায় উরু।
ঔষধ শিখাতে সেই সুরিক্ষার গুরু॥
মালিনীর ঘরে বুড়ী চলে ধীরে ধীরে।
আশা বাড়ি হাতে সে দাণ্ডাল দুয়ারে॥
সই বলে মালিনীকে জিজ্ঞাসে বারতা।
ঘরের ভিতরে এত কার সনে কথা॥
তখন মালিনী বলে এস বস সই।
দুখ সুখের কথা এই নাতির সনে কই॥
দুই নাতি এসেছেন আমার নিকটে।
ভাজন বুড়ী বলে তবে রসের কথা বটে॥
এত বলে মালিনী করিছে প্রতারণা।
এক নাতি কালা মোর আর নাতি কাণা
দেখি দেখি বলে বুড়ী দাণ্ডাল দুয়ারে।
ভুবনমোহন রূপ মালিনীর ঘরে॥
বুড়ী বলে কেন সই করিলে চাতুরী।
রূপ দেখে পরাণ ধরিতে নাহি পারি॥
কাণে কাণে বলে বুড়ী ডাকিয়া বিরলে।
তনু হল জর জর বিরহ অনলে॥
একটী নাগর যদি মোরে দেও সই।
আর কি বলিব তব দাসী হয়ে রই॥
মালিনী হাসেন শুনে বুড়ীর বচন।
যুবা কালে তুমি মেনে আছিলে কেমন॥
তোমার বয়স হল বিশাসায় বই।
নাগর ভুলাতে তুমি এসেছ লো সই॥
কেমনে থাকিবে পর পুরুষের সনে।
তোমার কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগে মনে॥
মালিনীর বচনে বুড়ীর হল গোসা।
নাগর ভুলাব আমি হইয়া সুবেশা॥
মনে যুক্তি করে বুড়ী করিল গমন।
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন॥
মনে করে নাগর কিরূপে ভুলান যায়।
ঘরের ভিতরে বুড়ী চারি পানে চায়॥
মনস্তাপ করে বুড়ী রসের আবেশে।
আভরণ কিছু নাহি বেশ করি কিসে॥
মাটিয়া পাথর এক আছিল চরকা।
কাঁখে করে খুদীর বাড়ীতে দিল দেখা॥
পাথর বেচিতে হল তিন পণ কড়ি।
চরকাটা বেচিয়ে তাথে হল আড়াই বুড়ী॥
চৌদ্দ বুড়ী দশ কড়া কড়ি হল তাতে।
উপনীত হল বুড়ী মালির বাড়ীতে॥
বুড়ী বলে মালী সয়া কি করহে ঘরে।
কড়ি লয়ে অলঙ্কার গড় মোর তরে॥
অষ্ট আভরণ তুমি গড়ে দাও সোলে।
রাঙ্‌তা বসাবে তাতে নাগর যেন ভুলে॥

এত শুনি মালাকার হল আনন্দিত।
আভরণ বুড়ীর তরে গড়িল ত্বরিত॥
মালী ঘরে সোলার দাঁত আভরণ লয়ে।
পুনর্ব্বার নিজ ঘরে উত্তরিল গিয়ে॥
বেশ করে বুড়ী নাগর ভুলাবার তরে।
ছেঁড়া তালাই পেতে বুড়ী বসিল দুয়ারে॥
বার করে চিরুণি আনিয়া ভাঙ্গা পেড়ি।
আঁচড়ে মাথার কেশ যেন শণ মুড়ি॥
বুড়া মাথা পাকা চুল টানাটানি তায়।
সব চুল গেল বুড়ী করে হায় হায়॥
বেশ হতে মাথার কুণ্ডল শোভা করে।
আর আমি কেমন করে ভুলাব নাগরে॥
বুদ্ধির সাগর বুড়ী মনে মনে গণি।
ছেঁড়া চুল মাথায় দিয়া বেড়ায় কালাকানি
বাঁধিল বিনোদ খোঁপা দিয়া মালের দড়ি।
তায় গেঁথে দেয় মালা কাপাস ফুলের বেড়ী॥
পাটিকাল গুঁড়িয়া সিন্দূর পরে ভালে।
নাকচুনাটি বুড়া মেয়ের নাকে বড় খোলে॥
চাক বৌলি সোলার সোণা করে দল দল।
আঁঙ্গারি ঘসিয়া চোখে পরিল কাজল॥
পরিল সোলার যত অষ্ট আভরণ।
রসের কাঁঠি গলায় দিয়া করিল ভাবন॥
বসন পরিল তার কি কহিব কথা।
মুখশুদ্ধি করে গুয়া সিসিরে পাতা॥
যাত্রা করে যায় বুড়ী দ্বারে দিয়া খিল।
মাথার উপরে তখন উড়ে ডোম চিল॥
লাউসেনের কাছে বুড়ী উত্তরিল গিয়া।
নাকে হাত দেয় মালিনী বুড়ীকে দেখিয়া॥
না দেখে নয়নে বুড়ী নাহি শুনে কাণে।
আঁটু ধরে কথা কয় লাউসেনের সনে॥
লাউসেন বলে ভাই এ কি অবতার।
কর্পূর বলেন এই দেশের ব্যাপার॥
মিনতি করিয়া তখন ভাজন বুড়ী কয়।
প্রাণরক্ষা কর মোর দিয়া পরিচয়॥
হাসিতে হাসিতে সেন পরিচয় দেন।
কর্ণসেন তাত পিতামহ কণক সেন॥
মাতা রঞ্জাবতী বাড়ী ময়না ভুবন।
লাউসেন নাম ধরি শুন নিবেদন॥
সহোদর মাত্র কর্পূর ছোট ভাই।
রাজ সম্ভাষণে মোরা গৌড় দেশ যাই॥
পরিচয় শুনে বুড়ী হাসে খল খল।
সম্বন্ধ বুঝিতে তবে নাতি হলি বল॥
নাতি হলে তুমি সেন বুনিপোর পো।
আয় নাতি দুজনে সুন্দর হল যো॥
থাক সেন মোর ঘরে হইয়া নাগর।
পরম সুখেতে দিব শক্ত করি ঘর॥
পরিহাস করে সেন বুড়ীর নিকটে।
নাগরালী করিতে কর্পূর ভাল বটে॥
কর্পূর বলে দাদা আমি কোন্ গুণে।
শিখালে কি হবে ভাই বুড়ী নাগর চিনে॥
হরষিত হল বুড়ী সেনের কথা শুনি।
কর্পূরের হাত ধরে করে টানাটানি॥
টানাটানি করে বুড়ী প্রেতিনীর প্রায়।
কর্পূর কাঁদেন সেন হেসে পাক যায়॥
দূর মাগী বলে ঠেলে ফেলিল কর্পূর।
আছাড় খেয়ে পড়ে বুড়ীর ভাবনা গেল দূর
তা দেখিয়া খল খল হাসেন মালিনী।
হাতে ধরে তুলেন ময়নার গুণমণি॥
সোলার আভরণ যত সকল ভেঙ্গে গেল।
মাথায় হাত দিয়া বুড়ী কাঁদিতে লাগিল॥
ধূলা পেয়ে অঙ্গের মলিন হল ছটা।
কোমর ভাঙ্গিয়া দিলে আঁটকুড়ির বেটা॥
চরকা বেচা গেল মোর মাটিয়া পাথর।
বুড়া কালে আর আমি কিসে করিব ঘর॥
বলিতে লাগিল বুড়ী সূর্য্য সাক্ষী করি।
সুরিক্ষা নটীর কাছে করিব গোহারি॥
ছ কুড়ি নাগর যার বন্দিশালে আছে।
কহিব রূপের কথা সুরিক্ষার কাছে॥
দিবসে হইবে কালি সুরিক্ষা দলন।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন নিরঞ্জন॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়॥

সুরিক্ষা দলন পালা।

ত্রিপদী ছন্দ।

না পেয়ে নাগর সঙ্গ, কোপেতে কাঁপয়ে অঙ্গ,
মনে দুঃখ পাইয়া অপার।
সুরিক্ষা নটীর বাড়ী, চলিলা ভাজন বুড়ি,
সেনের কহিতে সমাচার॥
তাধেনি তাধেনি ঘেনি, বাজয়ে ররাব বেণী,
সপ্তস্বরা পিণাক মাদলে।
আনন্দে মগন চিত, কেহ নাচে গায় গীত,
হেন বেলা বুড়ী কিছু বলে॥
এক নিবেদন করি, শুনগো সুরিক্ষা নারী,
সদয় হল চণ্ডিকা মহেশ।
যদি মনে সাধ থাকে, বলিতে এলাম তোকে,
নাগর ভুলাতে কর বেশ॥
বটে নৃপতির সুত, তোমার মনের মত,
রূপে গুণে কি দিব তুলনা।
নাম লাউসেন রায়, নৃপ সম্ভাষিতে যায়,
বাড়ী বটে চমরা ময়না॥
নাহি দেখি কোন কালে, তোমার ভাগ্যের ফলে
উত্তরিল গোলাহাটে আসি।
শুনি আনন্দিত মনে, ভুলাইতে লাউসেনে,
বেশ করে সুরিক্ষা রূপসী॥
তরুণ যৌবন বটে, কোমর লুকায় মুঠে,
অঙ্গ জিনি চম্পকের দল।
সহচরী সঙ্গে করি, সুবর্ণ চিরুণি ধরি,
আঁচরিল চাঁচর কুন্তল॥
বিচিত্র করিয়া বেণী, রেশম থোপনা টানি,
লোটনের আগে ঝাঁপা ঝুরি,
বাঁধিয়া বিনোদ ঠামে, নব মল্লিকার দামে,
বেষ্টিত করিয়া তদুপরি॥
কপালে সিন্দুর ফোঁটা, অরুণ রবির ছটা,
অঞ্জন পরিল বিলোচনে।
কামধনু জিনি ভুরু, বদন মৃগাঙ্ক চারু,
অলিকুল গুঞ্জরে দশনে॥
নাসাতে বেসর সাজে, বাজুবন্ত তাড় ভুজে,
কর্ণেতে বউলি কাটা কড়ি।
পরে যত অলঙ্কার, গজমতি হেমহার,
শঙ্খের আগেতে স্বর্ণচুড়ী॥
কণক নূপুর পায়, চলিতে পঞ্চম গায়,
পদাঙ্গুলে পরিল পাসুলি।
কটিবেড়া ঘাগরাতে, নেতের উড়ুনি মাথে,
কুচগিরি ঢাকিল কাঁচুলী॥
অষ্ট আভরণ পরি, নাগর ভুলাতে নারী,
যুক্তি করে লয়ে দাসীগণ।
ধর্ম্মপদ অরবিন্দে, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
লাউসেনে ভুলাতে নারীর হল মন।
দাসীগণ সঙ্গে যুক্তি করেন তখন॥
সাত জনা দাসী সঙ্গে যেন শশীকলা।
মালতী নামেতে দাসী বড়ই চপলা॥
হাতে ধরে সুরিক্ষা নটিনী কিছু কয়।
হঠাৎ করে আমাকে যে যাওয়া উচিত নয়
আর কি বলিব তুমি গুণের সাগর।
তোমা হতে পেলাম আমি ছ কুড়ি নাগর॥
হেন ব্যক্তি নাহি গোলা হাট দিয়া চলে।
মুনি জন ভুলে তোমার পান পড়া খেলে॥
প্রিয় দাসী তুমি মোর প্রাণের সমান।
পসরা লইয়া যাও বেচিবারে পান॥
দাসী বলে ঠাকুরাণী বসে থাক ঘরে।
গত মাত্র এনে দিব লাউসেন কর্পূরে॥

ক্রমশঃ

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

॥ ধুয়া ॥ প্রসন্ন ভব মে গণপতি এইবার॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কেবল ভরসা রাঙ্গা চরণ তোমার॥
করিয়ে প্রণতি স্তুতি, বন্দ দেব গণপতি,
হৈমবতী তনয় ঠাকুর।
জ্ঞানদাতা কল্পতরু, জাপক যোগীর গুরু,
বিঘ্নরাজ বিঘ্ন কর দূর॥
খর্ব্ব তনু স্থূলতর, চতুর্ভুজ লম্বোদর,
করিবর বদন সুন্দর।
এক দন্তে অতি শোভা, গণ্ডস্থলে মধুলোভা,
মত্ত হয়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, নিরন্তর জপকর্ম্ম,
মহাযোগী আরোহণ মূষা।
অরিক্তে অঙ্গশোভা, সিন্দূর মণ্ডিত আভা,
প্রভাতে প্রকাশ যেন পূষা॥
তুমি সংসারের সার, তোমা বিনা কেবা আর,
তুমি যত দেবের প্রধান।
দেবগণ পূজা ভাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
বেদাগমে আছয়ে প্রমাণ॥
বুঝিতে না পারি ক্রম, আমার মনের ভ্রম,
কার মন্ত্র জপ কর তুমি।
স্বয়ং ব্রহ্মময় হয়ে, ভক্তে পথ দেখাইয়ে,
জপ কর এই বুঝি আমি॥
প্রভু তব যে মহিমা, চারি বেদে নাহি সীমা,
অন্যে কে জানিতে পারে অন্ত।
তোমার চরণ সেবি, ব্যাস বাল্মীকি কবি,
প্রকাশিলা পুরাণ যাবন্ত॥
তুমি কৃপা কর যারে, অসাধ্য সাধন করে,
ধীর কিংবা মূকমুখ বিশেষ।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর, বামনেতে সুধাকর,
ধরে যদি কর কৃপালেশ॥
বয়ার ঠাকুর তুমি, এই ভরসায় আমি,
তব পদে সমর্পিয়া মন।
মনেতে করেছি যুক্তি, মহামায়া আদ্যাশক্তি,
তাঁর গুণ করিব বর্ণন॥
ব্যাসের রচিত মত, গ্রন্থ মহাভাগবত,
ভাষা মতে প্রকাশিব গান।
সিদ্ধিদাতা নাম ধর, গ্রন্থ সমাপন কর,
অকিঞ্চনে হয়ে দয়াবান॥
মহোদধি তরিবারে, জ্ঞানহীন কোন নরে,
জলে যেন সন্তরিতে চায়।
তেমতি আমার মন, এই গান সমাপন,
যদি হয় তোমার কৃপায়॥
অসম সাহস ভরে, দেবী গুণ বর্ণিবারে,
তব পদ করি অবলম্ব।
অসাধ্য সাধন আশা, মহাভাগবত ভাষা,
করিলাম কবিতা আরম্ভ॥
সমাপন হওয়া তার, কেবল তোমার ভার,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী গীত।
শ্রীদুর্গা নামের ফলে, গণপতি পদতলে,
দ্বিজ রামনিধি বিরচিত॥ ১॥
॥ ধুয়া ॥ সারদে সদয়া ভব ময়ি পামরে।
অপার মহিমা পরে ব্রহ্মময়ি বিষ্ণুদারে,
জাড্য হরে তব পদ পূজে ব্রহ্মা আদি অমরে॥
বন্দ বীণাপাণি, বাঙ্ময় বিনোদিনী,
বিশ্বের জননী দেবী।
তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ,
ব্যাস আদি হইলা কবি॥
বাণী বাক্‌দাত্রী, রাগিণীর কর্ত্রী,
পুস্তক লেখনী ধরি।
ব্রহ্মময়ী নিত্যা, ত্রিলোক বন্দিতা,
সকল বিভব করি॥
শ্বেতপদ্মে স্থিতি, পর শুভ্র ধুতি,
সকলের কণ্ঠে বাস।
নৃত্য গীতে রতা, সুধাময় কথা,
মুখে মৃদু মন্দ হাস॥

মণিময় হার, নানা অলঙ্কার,
কুচভরে নত অঙ্গী।
ছয় রাগ জানি, ছত্রিশ রাগিণী,
নিরন্তর তব সঙ্গী॥
রূপে ষোলকলা, কুটিল কুন্তলা,
শিরোপরে চূড়াধরা।
বরণ চন্দ্রিমা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
মাধবের মনোহরা॥
আমি অতি দীন, মন্দ বুদ্ধিহীন,
করি অসম্ভব আশ।
ব্যাসের সম্মত, মহা ভাগবত,
ভাষাতে করি প্রকাশ॥
আমি মূঢ়মতি, নাহি জানি স্তুতি,
ভকতির নাহি লেশ।
নিজ গুণে দয়া, কর মহামায়া,
গ্রন্থ হয় যেন শেষ॥
নয়নের কোণে, হের হীন জনে,
তবে সে কবিতা হবে।
করিলে ঔদাস্য, লোকে হবে হাস্য,
নামেতে কলঙ্ক রবে॥
তিনলোক মাঝে, সবে তোমা পুজে,
রূপ ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী।
চাহ অকিঞ্চনে, রামনিধি ভণে,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ২॥

॥ ধুয়া॥ প্রসীদ পরমেশানি দুর্গে আমারে।
আমি পাপী অতি দীন, ভজন সাধন হীন,
গেল দিন কৃপাকর কৃপাময়ী কৃপানাথদারে॥

করি নতি ভক্তি, বন্দ আদ্যাশক্তি,
সতী উমা শিবজায়া।
দক্ষযজ্ঞ পরে, হেমন্তের ঘরে,
জনমিলা মহামায়া॥
চরণ কমল, অতি নিরমল,
শিবের সঞ্চিত নিধি।
পদের মহিমা, কেবা দিবে সীমা,
ধেয়ানে না পান বিধি॥
নিন্দি চাম্পাকলি, চরণ অঙ্গুলি,
রতন পাসুলি তায়।
নখচন্দ্র করে, অন্ধকার হরে,
নূপুরে পঞ্চম গায়॥
যিনি রম্ভাতরু, কিবা জঙ্ঘা উরু,
পরিধান চিত্রবস্ত্র।
জিনি পঞ্চানন, মধ্যদেশ ক্ষীণ,
কিঙ্কিণি বাজিছে তত্র॥
নাভি সরোবর, গভীর সুন্দর,
কি শোভা ত্রিবলী বর।
কুচ যুগ দন্ত, জিনি করিকুম্ভ,
শিরোরুহ করী কর॥
বাহু সুশোভন, মণি আভরণ,
কেয়ূর কঙ্কণ তায়।
মাণিক অঙ্গুরি, করাঙ্গুলে পরি,
তাহে অতি শোভা পায়॥
ত্রৈলোক্যে অসম, রূপ নিরুপম,
তপ্ত হেম অঙ্গ আভা।
কর পদতল, নিন্দি রক্তোৎপল,
অলি ধায় মধুলোভা॥
কোটি শশিকর, বদন সুন্দর,
শ্রবণ যুগ সুচারু।
আকর্ণ লোচন, শোভিত অঞ্জন,
কামের কামান ভুরু॥
পক্ক বিম্ববর, গঞ্জি ওষ্ঠাধর,
দন্তশ্রেণী মুক্তা ভাতি।
গলে মণিহার, বহু অলঙ্কার,
মণি মুক্তা নানাজাতি॥
কর্ণে কর্ণপূর, তম করে দূর,
কত মণি তাহে জ্বলে।
কপাল ফলকে, সিন্দুর ঝলকে,
নাসায় মাণিক দোলে॥
কুটিল কুন্তল, পড়ে পদতল,
মণিময় ঝাপা তায়।
কপাল লোচন, অতি সুশোভন,
ভালে সিঁতি শোভা পায়॥

অঙ্গের ওজসে, দিক পরকাশে,
শরদিন্দু লাজে মরে।
সে রূপ লাবণ্য, কিবা কব অন্য,
মহেশের মন হরে॥
অপার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
বিধি অগোচর মায়া।
সৃষ্টা হরি ভব, সদা করে স্তব,
ইচ্ছি তব পদছায়া॥
মহিষাসুর দুষ্ট, তারে কৈলা নষ্ট,
অনায়াসে করি রণ।
শুম্ভ নিশুম্ভাদি, দুর্গাসুরে বধি,
নিস্তারিলা ত্রিভুবন॥
বিরিঞ্চাদি হরি, সদা ধ্যান করি,
তব তত্ত্ব নাহি পান।
কেবা জানে সীমা, তোমার মহিমা,
শিব পঞ্চমুখে গান॥
আমি দীন হীন, চিন্তি রাত্রি দিন,
মনেতে করেছি আশ।
তোমার মহিমা, কিঞ্চিত বর্ণিমা,
ভাষাতে করি প্রকাশ॥
কিন্তু ভয় মনে, তোমার বর্ণনে,
শক্তি কি আমার হবে।
কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ কর কাম,
তবে ত মহিমা রবে॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া, অসাধ্য দেখিয়া,
হয়েছি অতি সশঙ্ক।
না হইলে সাঙ্গ, লোকে হবে ব্যঙ্গ,
নামেতে রবে কলঙ্ক॥
দীনে করি দয়া, দেহ পদছায়া,
দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
তব পদ আশে, রামনিধি ভাষে,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৩॥

॥ ধুয়া॥ দয়ার গৌরাঙ্গ দেখ হরিনাম যাচিছে॥
হরি সঙ্কীর্ত্তনে ভাল রূপেতে করেছে,
আলো হরিবল বলে গোরা নাচিছে॥

বন্দিলাম জোড়পাণি, সন্ন্যাসীর চূড়ামণি,
মহাপ্রভু চৈতন্য গোঁসাঞি।
যারে পান তারে কোল, দিয়া কন হরিবোল,
দয়ার ঠাকুর হেন নাই॥
কলিতে কলুষ হেরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগন্নাথ মিশ্রে ধন্য কৈলা।
তোমার জনক তিনি, ধন্যা শচী ঠাকুরাণী,
যাঁহার গর্ভেতে জন্ম লইলা॥
তব মাতা শচী যিনি, মৃতবৎসা ছিলা তিনি,
পরম্পরা শুনিবারে পাই।
তে কারণে গুণধাম, প্রথম তোমার নাম,
শচীদেবী রাখিল নিমাই॥
কাঞ্চন বরণ কায়, গৌরচন্দ্র নাম তায়,
অবতার হইলা প্রভু ধন্য।
তব পিতা বন্ধু সহ, বিবেচনা করি তেঁহ,
এক নাম রাখিল চৈতন্য॥
তোমাকে তনয় পেয়ে, ছয়মাসে অন্ন দিয়ে,
কালে কৈলা চূড়োপনয়ন।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, লক্ষ্মী স্বরূপিণী তিনি,
তাঁরে পত্নী করিলা গ্রহণ॥
অধ্যাপকে পূজ্যতম, বাসুদেব সার্ব্বভৌম,
পঠিবারে গেলা তাঁর ঠাঞি।
শাস্ত্র সব ছিল জানা, পুঁথি খোলা প্রতারণা,
অবিদিত কিছু ছিল নাই॥
যে দিন যে পড়া লৈতা, পুন পাঠ না চাহিতা,
হাসিত পড়ুয়া যত আর।
চতুর্ভুজ রূপ হয়ে, পড়ুয়ারে দেখা দিয়ে,
তাহাকে করিলা চমৎকার॥
ভট্টাচার্য্য গেলা স্নানে, তোমাকে লইয়া সনে,
বুঝিবারে তোমার আমূল।
ভট্টাচার্য্য গঙ্গাজলে, তুমি কোষা দিতে গেলে,
পদে পদে হৈল পদ্মফুল॥
শিশুকালে এই রঙ্গে, নিত্যানন্দে লয়ে সঙ্গে,
কত লীলা করিলা প্রকাশ।
পারিষদ গদাধর, রামবাসু পুরন্দর,
মুকুন্দাদি বনমালী দাস॥

জগাই মাধাই যারা, দস্যুবৃত্তি করে তারা,
পোষণ করিত পুত্র দারা।
তব দরশন পেয়ে, দুষ্টবুদ্ধি দূরে গিয়ে,
পরম ভকত হৈল তারা॥
ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ, বেড়াইয়া নানা দেশ,
পাপী যত মুক্তির কাঙ্গাল।
হরিনাম দিয়া তারে, উদ্ধারিলা সবাকারে
ভবার্ণবে বান্ধিলা জাঙ্গাল॥
পুন গৃহে আসি ফিরি, পিতৃ মাতৃ সেবা করি
ভক্তিমতে শাস্ত্র অনুসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, পতিব্রতা সঙ্গী তিনি,
প্রেমভাবে তুষ্ট কৈলা তাঁরে॥
কেশব ভারতি যিনি, কি মন্ত্রণা দিলা তিনি,
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী ফেলাইয়া।
ভারতির যুক্তি পেয়ে, মা বাপে নির্দ্দয় হয়ে,
নিশি শেষে গেলা পলাইয়া॥
সংসারে নিবর্ত্ত গুরু, কেশব ভারতি গুরু,
করিলা এমন প্রকরণ।
কাটোয়া গঙ্গার কূল, সেখানে মুড়ায়ে চুল,
কৈলা প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ॥
আনন্দে হইয়া ভোর, কটিতে কৌপীন ডোর,
হৈলা দণ্ড কমণ্ডলুধারী।
পীযূষ সমান ভাষ, বদনে ঈষৎ হাস,
ঘন ঘন মুখে হরি হরি॥
মনে অতি হৃষ্ট হয়ে, পারিষদগণে লয়ে,
বহু তীর্থ করি পর্য্যটন।
যে ছিল পাষণ্ড হয়ে, হরিনাম মন্ত্র দিয়ে,
নিস্তার করিলা পাপিগণ॥
ভ্রমিয়া সকল দেশে, গেলা প্রভু অবশেষে,
ক্ষেত্রে দেব জগন্নাথ পুরে।
স্বয়ং ষড়্‌ভুজ হয়ে, নৃপতিরে দেখা দিয়ে,
লীন হৈলা বিষ্ণুর শরীরে॥
পাতকী নিস্তার তরে, জনমিলা এ সংসারে,
পুন লীলা কৈলা সংবরণ।
দ্বিজ রামনিধি বাণী, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী,
কৃপা করি শুন সর্ব্বজন॥ ৪॥

বন্দিলাম মহাকালী আর মহাকাল।
বন্দহ যোগিনী কোটি ভৈরব বেতাল॥
দেবীর নায়িকা সর্ব্বে মোর দণ্ডবত।
মহাকাল দানা বন্দ পিশাচ প্রমথ॥
বিন্ধ্যবাসিনীর পদ বন্দ বিন্ধ্যাচলে।
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা বন্দ এককালে॥
মহিষমর্দ্দিনী পদে বহু দণ্ডবত।
কামাখ্যাদি পীঠ বন্দ এক পঞ্চাশত॥
দেবদেবী স্থান বহু অশেষ মূরতি।
সকলেরে আমার প্রণাম লুটি ক্ষিতি॥
বিধি বিষ্ণু প্রজাপতিগণে নমস্কার।
দশদিকপাল বন্দ দশ অবতার॥
পাতালে বাসুকি বন্দিলাম নাগরাজ।
পন্নগীচরণ বন্দ নাগের সমাজ॥
গঙ্গার চরণে মোর অশেষ প্রণাম।
দরশনে পরশনে হয় মোক্ষধাম॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি প্রণাম সবারে।
সাড়ে তিন কোটি তীর্থ বন্দ একেবারে॥
প্রসূতী দক্ষের দারা চরণে প্রণতি।
যেই গর্ভে জন্মেছিলা আদ্যাশক্তি সতী॥
হিমন্ত মেনকা বন্দ উমা কন্যা যাঁর।
বাল্মীকি বেদব্যাস পদে নমস্কার॥
রবি শশী আদি গ্রহ বন্দ একমনে।
বন্দিলাম ক্ষেত্রপাল বন্দ দেবগণে॥
চারিবেদ চারি যুগ বন্দ মূর্ত্তিমান।
আগম জ্যোতিষ বন্দ ভারত পুরাণ॥
বেদান্ত বেদাঙ্গ তর্ক কাব্য অলঙ্কার।
তন্ত্রমন্ত্র স্মৃতি শাস্ত্রে প্রণাম আমার॥
ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক অধঃ পাতাল প্রভৃতি।
চতুর্দ্দশ লোক বন্দ লোটাইয়া ক্ষিতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বন্দিলাম জোড় করে।
নিরন্তর ভাসিছে কারণবারি 'পরে॥
সুমেরু প্রভৃতি বন্দ তাবত অচল।
সপ্ত সিন্ধু নদ নদী বন্দহ সকল॥
ডাকিনী যোগিনী ষড়্‌ঋতুকে প্রণতি।
দিবা নিশি সন্ধ্যা বন্দ মাস পক্ষ তিথি॥

জনক জননী বন্দ মহাগুরুতম।
যাঁদের প্রসাদে হৈল দুর্লভ জনম॥
বন্দিলাম মন্ত্রগুরু দেবের চরণ।
ব্রহ্ম মন্ত্র কাণে দিলা মুক্তির কারণ॥
ঋষি মুনি বন্দিলাম বেদপরায়ণ।
দ্বিজগণে বন্দিয়ে ভূদেব নারায়ণ॥
সন্ধ্যা ও সাবিত্রী বন্দ ব্রহ্মণ্যের সার।
বন্দনার বাকি যত সর্ব্বে নমস্কার॥
সভাস্থ সকল লোক হইবা সদয়।
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী গান সুধাময়॥
দ্বিজ রামনিধি বলে শুন কৃপা করি।
বন্দনা হইল সাঙ্গ সবে বল হরি॥ ৫॥
নৈমিষারণ্যেতে যত ঋষি মুনিগণে।
সূতেরে কহিলা সর্ব্বে মধুর বচনে॥
বেদব্যাস শিষ্য তুমি বিজ্ঞ বেদচয়।
এমত পুরাণ কহ স্বর্গ সুখ হয়॥
দেবীর মাহাত্ম্য যাহে আছয়ে বিস্তার।
যাহার শ্রবণে হয় লোকের নিস্তার॥
যাহা শুনি হয় দৃঢ় ভক্তির উদয়।
জ্ঞানহীন নরে শুনে দিব্যজ্ঞান হয়॥
এতেক কহিলা যদি যত ঋষিগণ।
সূত শুনি কৈলা তবে শুন দিয়া মন॥
পূর্ব্বেতে নারদে কয়েছিলা পশুপতি।
মহাভাগবত কথা গোপনীয় অতি॥
জৈমিনি ভকতে তাহা কৈলা দ্বৈপায়ন।
পুন আমি কহি তাহা শুন দিয়া মন॥
মহাভাগবত যত্নে গোপন বিহিত।
শিব আজ্ঞা প্রকাশ না হয় কদাচিত॥
পাঠে কিংবা শ্রবণে যতেক পুণ্য হয়।
শতবর্ষে কহিতে শিবের শক্তি নয়॥
আমি কি কহিব সংখ্যা ফল জন্মে কত।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ঋষি যত॥
মহাহর্ষ হয়ে সূতে কৈলা পুনর্ব্বার।
শ্রেষ্ঠ এ পুরাণ পৃথ্বে কিরূপে প্রচার॥
কৃপা করি কহ আগে তার বিবরণ।
কহিতে লাগিল সূত শুন ঋষিগণ॥
ধর্ম্মবিদ্ বেদব্যাস বেদজ্ঞ প্রধান।
সর্ব্ব শাস্ত্র বেদবক্তা মহা জ্ঞানবান॥
আঠার পুরাণ ব্যাস প্রকাশ করিলা।
মনের সন্তোষ নৈল ভাবিতে লাগিলা॥
দেবীর পরমতত্ত্ব মাহাত্ম্য বিস্তার।
এ মহাপুরাণ নাই ভূতলে প্রচার॥
যাঁর তত্ত্ব জানিতে নারেন পঞ্চানন।
তাঁর গুণ কিরূপেতে করিব বর্ণন॥
পরাৎপরা ভগবতী নাই যাঁর পর।
তাঁহার পরমতত্ত্ব জানা সুদুষ্কর॥
চিন্তিত হইয়া দুর্গাভক্তিপরায়ণ।
হিমালয়ে গিয়া দিলা তপস্যায় মন॥
দুর্গার তপস্যা কৈলা ঘোরতর অতি।
তুষ্টা হৈলা ভকতবৎসলা ভগবতী॥
তপে তুষ্টা হৈলা যবে বিশ্বের জননী।
অদর্শনে আকাশে কহিলা এই বাণী॥
তুষ্টা হইলাম ব্যাস তপে ক্ষান্ত হও।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ব্রহ্মলোকে যাও॥
বেদগণ ব্রহ্মলোকে আছেন সকল।
বেদ হৈতে মোর তত্ত্ব জানিবা পুষ্কল॥
স্তুতি যবে আমাকে করিবা বেদগণ।
সেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে দিব দরশন॥
দর্শনে পরমতত্ত্ব হবেক প্রকাশ।
পূরাইব তোমার মনের অভিলাষ।
শুনিয়া আকাশবাণী হয়ে হর্ষযুত।
ব্রহ্মলোকে চলি গেলা সত্যবতীসুত॥
ব্রহ্মলোকে বসিয়া আছেন বেদগণে।
বেদব্যাস প্রণমিলা সবার চরণে॥
সবিনয়ে বেদে জিজ্ঞাসিলা দ্বৈপায়ন।
পূর্ণব্রহ্ম সকলে কি কর নিরূপণ॥
এত শুনি ক্রমেতে কহিলা বেদগণে।
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রামনিধি ভণে॥ ৬॥
ব্যাসের বচন শুনি, ঋগ্‌বেদ কন বাণী,
যাহা জিজ্ঞাসিলা মহামতি।
প্রাণীমাত্র অন্তর্ব্বর্ত্তী, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী,
পরংব্রহ্ম স্বয়ং ভগবতী॥

যজুর্ব্বেদ কৈলা শুনি, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি,
সর্ব্বযজ্ঞে ঈশ্বরের পূজ্যা।
নিশ্চয় জানিবা অতি, পূর্ণব্রহ্ম ভগবতী,
মহামায়া মহেশের ভার্য্যা॥
সামবেদ তার পরে, কৈলা ব্যাস মুনিবরে,
ব্রহ্ম নিরূপণ শুন কহি।
বিশ্বময়ী বিশ্বাধার, যোগী চিন্তা করে যাঁর,
একা ব্রহ্ম দুর্গা জগন্ময়ী।
পরেতে অথর্ব্ব কন, অনুগ্রহ যত জন,
সর্ব্বদা করেন ভক্ত প্রতি।
তাঁরা পরংব্রহ্ম করি, মানেন যে সুরেশ্বরী,
ব্রহ্ম সেই দুর্গা ভগবতী॥
সূত মহামতি কন, এই মতে বেদগণ,
কহিলেন ব্রহ্ম নিরূপণ।
তদন্ত শুনিয়া মর্ম্ম, দুর্গাই পরম ব্রহ্ম,
নিশ্চয় বুঝিলা দ্বৈপায়ন॥
চারি বেদ কৈলা পুন, বেদব্যাস শুন শুন,
পরংব্রহ্ম কহি যে দুর্গারে।
এখনি প্রত্যক্ষ পাবে, সংশয় ভঞ্জন হবে,
দরশন করাব তোমারে॥
এত বলি বেদগণ, হয়ে অতি শুদ্ধ মন,
ব্রহ্ম দরশন আশে সব।
নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, দুর্গা ব্রহ্মময়ী জানি,
উদ্দেশেতে আরম্ভিলা স্তব॥
হে দুর্গে প্রসন্না ভব, কৃপাময়ী নাম তব,
তব গুণে ব্রহ্মা হরিহর।
তুমি মাগো পরাৎপরা, তব স্বেচ্ছামতে তাঁরা,
তিনে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর॥
তব ইচ্ছা বিনা আর, কিবা শক্তি আছে কার,
কেবা কি করিতে হবে ক্ষম।
তিন লোকে কেবা শক্ত, তব তত্ত্ব করে ব্যক্ত,
তব গুণবর্ণনা দুর্গম॥
তব আরাধনা করি, সুদুর্জয় দৈত্য হরি,
সমরেতে বধিলা সকলে।
পালন করেন আর, ত্রিভুবনে সবাকার,
কেবল তোমার কৃপাবলে॥
তব পাদপদ্ম হর, ত্রিলোক সংহারকর,
বুকে ধরি হয়ে সাবধান।
দুর্গে তব পদবলে, সমুদ্র মন্থন কালে,
কালকূট বিষ কৈলা পান॥
প্রবেশিয়া ত্রিজগতে, মায়া কর কত মতে,
তব তত্ত্ব পরম নিগূঢ়।
তোমার চরিত্র কথা, আমরা কি কব মাতা,
যদি বা জানেন চন্দ্রচূড়॥
পরম পুরুষ আর, শরীর আছয়ে যার,
নিজগুণে ত্রিভুবন মাঝ।
সেহ কায় অদ্যাবধি, পরিস্পন্দ জ্ঞান আদি,
শক্তিরূপে করহ বিরাজ॥
শরীর ধরেন যাঁরা, তোমার মায়াতে তাঁরা,
মোহিত আছেন অবিরাম।
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে, তোমাকে কহিয়া ফিরে,
হে অম্বিকে তোমাকে প্রণাম॥
প্রকৃতি পুরুষ নহ, ধ্বংস নাই হীনদেহ,
পরাৎপরা ব্রহ্মতেজোময়ী।
মায়া করি ইচ্ছা কৈলা, প্রকৃতি পুরুষ হৈলা,
কেবা হেন আছে তোমা বয়ি॥
ইচ্ছাময়ী কৃপাদৃষ্টি, জগৎ করিতে সৃষ্টি,
আগে ব্রহ্মা কৈলা শক্তিমন্ত।
সৃষ্টি সব করিবারে, নিযুক্ত করিলে তাঁরে,
তব মায়া বলেতে যাবন্ত॥
সেই মত জলোদ্ভব, শীলা আর বিষ্ণু সব,
তাহাও সকলি জলময়।
জ্ঞানবান যাঁরা যাঁরা, শীলা আর বিষ্ণু তাঁরা,
জল তত্ত্ব করেন নিশ্চয়॥
তুমি ব্রহ্ম পরাৎপরা, তোমা হৈতে যাঁরা যাঁরা,
পুরুষ হইলা সমুদ্ভব।
সেই মত যত তাঁরা, সবে হয়ে শক্তিপরা,
পরস্প্রায় ব্রহ্ম হৈলা সব॥
দেহধারী যে যে জন, ষট্‌চক্র মধ্যে নন,
ষটচক্র পরে ব্রহ্মাদয়।
তাঁদিগের প্রধানত্ব, প্রাপ্ত হৈল ঈশ্বরত্ব,
যত বল তোমার আশ্রয়॥

তোমা হৈতে শিব যিনি, সর্ব্বেশ্বর হৈলা তিনি,
তোমার মহিমা কিবা কব।
স্বর্গ ও পাতাল ভূমি, ত্রিলোকবন্দিতা তুমি,
হে মা দুর্গে সুপ্রসন্না ভব॥
বেদগণ স্তুতিবাণী, ব্রহ্মময়ী মনে জানি,
শূন্যে এলা দিতে দরশন।
পাপ দূরে যায় শুনি, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী,
দ্বিজ রামনিধি বিরচন॥ ৭॥

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বলি যেই জন ডাকে।
শূল লয়ে শূলপাণি রাখেন তাহাকে॥
লক্ষ্মী তারে কোলে লন নিজ পুত্র সম।
আশিষ করেন ব্রহ্মা স্বস্তি কন যম॥
অরোগী শরীর হয় পুত্র আদি ধন।
অন্তে তারে অবশ্য সদয় নারায়ণ॥
শ্রীদুর্গা নামের ফল কি জানিবে নর।
কিঞ্চিৎ মহিমা বুঝি জানেন শঙ্কর॥
এইরূপে স্তব যদি কৈলা বেদগণ।
জগদম্বা সনাতনী দিলা দরশন॥
সর্ব্ব জীবে স্থিতা নিজ রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
দেখি ব্যাসদেব হৈলা সানন্দ হৃদয়॥
ব্যাসের সংশয় যত করিবারে ছেদ।
সতন্তরাকৃতি মাতা হৈলা মূর্ত্তিভেদ॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ কোটি চন্দ্র আভা।
সহস্রেক বাহু তাহে নানা অস্ত্র শোভা॥
কেশরিবাহনা ক্ষণে শবে আরোহিণী।
চতুর্ভুজা কভু আভা নীল কাদম্বিনী॥
দ্বিভুজা নিমিষে ক্ষণে দশভুজা মূর্ত্তি।
অষ্টাদশভুজা কভু শত বাহুবর্ত্তি॥
ক্ষণেকে অনন্ত বাহু সংখ্যাক্ষম কেবা।
অকস্মাৎ বিষ্ণুরূপা বামে লক্ষ্মী শোভা॥
দেখিতে দেখিতে রূপ অতি অনুপম।
বামে সীতা রামরূপা দূর্ব্বাদল শ্যাম।
কৃষ্ণরূপা দ্বিভুজ মুরলীধর ক্ষণে।
রাধাসহ যেমত বিরাজ বৃন্দাবনে॥
কদাচিৎ ব্রহ্মরূপা সাবিত্রী সংহতি।
অকস্মাৎ শিব হৈলা বামেতে পার্ব্বতী॥
সর্ব্বময়ী দেবী ধরি রূপ অগণন।
ব্যাসের সন্দেহ মাতা করিলা ভঞ্জন॥
নানামূর্ত্তি দেখি পরাশরের সন্ততি।
জানিলা পরমব্রহ্ম দুর্গা ভগবতী॥
স্ববাঞ্ছিত শঙ্করীর রূপ দরশনে।
আপনাকে জীবন্মুক্ত মানিলা আপনে॥
ব্যাসদেব বাঞ্ছা মাতা পূর্ণ করিবারে।
নিজ পদে লগ্ন পদ্ম দেখাইলা তাঁরে॥
দেবীপদ তলেতে দেখিলা মুনিবর।
সহস্র দলেতে লেখা পরম অক্ষর॥
গ্রন্থ মহাভাগবত নামেতে পুরাণ।
দেখি মহা হৃষ্ট হৈলা ব্যাস ভগবান॥
দুর্গারে প্রণাম করি ক্ষিতি লোটাইয়া।
নিজাশ্রমে গেলা পুন কৃতকৃত্য হইয়া॥
কমল সহস্রদলে দেখিলা যে মত।
সেই মত প্রকাশিলা মহাভাগবত॥
স্নেহেতে কহিলা ব্যাস শুনিয়াছি যথা।
আমি কহিলাম তাহা অপ্রকাশ্য কথা॥
সহস্রেক অশ্বমেধে যত পুণ্য হয়।
শত বাজপেয় যজ্ঞে কত ফল পায়॥
মহাভাগবত শুনে যেই পুণ্য হয়।
ষোড়শ কলার কলা এত যজ্ঞে নয়॥
এই হেতু বেদব্যাস হয়ে শুদ্ধমত।
পুরাণ প্রকাশ কৈলা মহাভাগবত॥
ইহার শ্রবণে হয় অতি পুণ্যতম।
যাহার শ্রবণে নৈল সেই মহাধম॥
মহাভাগবত হৈল প্রকাশ ভূতলে।
পাতকী নিস্তার হেতু রামনিধি বলে॥ ৮॥

বহু পুরাণানি, ব্যাস মুখে শুনি,
জৈমিনি ভকতি ভাবে।
পড়ি ক্ষিতি পরি, দণ্ডবত করি,
পুন কৈলা ব্যাসদেবে॥
বেদে বিজ্ঞতম, কেবা তোমা সম,
মুনিশ্রেষ্ঠ গুণধাম!
তোমা বিনা আর, বক্তা পাওয়া ভার,
তোমাকে বহু প্রণাম॥

তব মুখে শুনি, পুণ্যতম বাণী
অন্তরে সন্তোষ পাই॥
শুনি ব্রহ্মতত্ত্ব, হৈলাম কৃতার্থ,
ইহাতে সংশয় নাই॥
বাসনা আমার, কিছু শুনি আর,
কৃপা করি কহ মুনি॥
আদি সৃষ্টিকর্ত্রী, চতুর্ব্বর্গদাত্রী,
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
ত্রিভুবনেশ্বরী, নিত্যানন্দকরী,
বিরাজ করেন সুখে।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ, যাঁর পদ ভব,
শব রূপে লৈলা বুকে॥
যাঁহার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
সংক্ষেপে কহিলা তাই॥
তৃপ্তি নৈল মনে, কহি তে কারণে,
বিস্তারে শুনিতে চাই॥
বহু শত জন্ম, ভুঞ্জি নানা কর্ম্ম,
দুর্লভ মানবকায়।
দেবীর মাহাত্ম্য, যে না শুনে তত্ত্ব,
বিফলে জনম যায়॥
জৈমিনি বচন, শুনি দ্বৈপায়ন,
প্রশংসিয়া বারে বারে।
দেখিয়া ভকতি, তুষ্ট হয়ে অতি,
কহিতে লাগিলা তাঁরে॥
সাধু সাধু অতি, তোমার ভকতি,
জ্ঞানবান্ বাছা ধন।
জিজ্ঞাসিলা যাহা, কহি সব তাহা,
তবে শুন দিয়া মন॥
শ্রবণে যাহার, পুনর্জন্ম আর,
না হয় মানব যত।
মহাপাতকাদি, পাপী হয় যদি,
ভক্তিহীন ধর্ম্মহত॥
ব্রহ্মহত্যা আদি, পাপ নানা বিধি,
যাহার শ্রবণে যান।
তাহা শুনিবারে, তব ইচ্ছা করে,
তুমি বট ভাগ্যবান॥
সর্ব্ব পাপে পাপী, হয়েও যদ্যপি,
দুর্গার চরিত্র যার।
শ্রবণ নহিল, তাবত রহিল,
ঘোর যম ভয় তার॥
অতি পাপী জনে, যদ্যপিহ শুনে,
দুর্গাতত্ত্ব মোক্ষধাম।
যমদূত চণ্ড, তারে দেখি দণ্ড,
ফেলিয়া করে প্রণাম॥
দেবী দুর্গাতত্ত্ব, অতুল মাহাত্ম্য,
কহিতে শকতি কার।
পঞ্চমুখে ব্যক্ত, করিতে অশক্ত,
শিব অন্য কেবা আর॥
বারাণসী পুরে, জীব যেই মরে,
মহামোক্ষ দিতে তারে।
প্রাণ বারি হয়, এমত সময়,
স্বয়ং গিয়া ত্বরা পরে॥
মন্ত্র দিতে দান, যাহাতে নির্ব্বাণ,
গুরুদেব পঞ্চানন।
হইয়া সদয়, মন্ত্র ব্রহ্মময়,
কর্ণের কুহরে কন॥
একা দুর্গা কর্ত্রী, মন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী,
বেদের সম্মত বাণী।
মন্ত্রময়ী তিনি, নির্ব্বাণদায়িনী,
মাহাত্ম্য শুন জৈমিনি॥
কাশীক্ষেত্রে যদি, কীট পতঙ্গাদি,
কেহ মরে কোন খানে।
তারক ব্রহ্মধাম, মন্ত্র দুর্গানাম,
শিব দেন তার কাণে॥

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রেত্যভাব।

আর্য্য-দার্শনিকদিগের মধ্যে চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদিগকে বাদ দিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেই একবাক্যে প্রেত্যভাব বা পরলোক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বর ও বেদ মানেন নাই, কিন্তু প্রেত্যভাব আছে, এই বিষয়ে তদীয় স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তই লক্ষিত হইয়া থাকে। আবার খৃষ্টান ও ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীরা পূর্ব্বজন্ম না মানিয়াও একটা অভিনব প্রেত্যভাব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এত বড় গুরুতর বিষয়টাকে রাম শ্যামের কথার উপর নির্ভর করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। যাহাদের এই বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহাদের শ্যেনকর্ণ-নীতির অনুসরণ করিলে চলিবে না, তাহাদিগকে অবশ্যই আর্য্য-দর্শনশাস্ত্রের মন্থন করিতে হইবে। আর এই মন্থনে মন্দার গিরির পদ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকেই দেওয়া উচিত; নতুবা ইহা হওয়াই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন প্রকারে মন্থন-ক্রিয়াটা সম্পন্নও হইয়া যায়, তথাপি সুধারসের পরিবর্ত্তে যে হলাহল উঠিবে না, এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করাও সহজ ব্যাপার নহে। ইদানীন্তনকালে অনেকেই পরকীয় ভাবের মাধুর্য্য ভালবাসেন, স্বকীয় ভাবটা যেন তাঁহাদের নিকট নীরস বলিয়া বোধ হয়; তাই তাঁহারা গোতমের ন্যায় দর্শন ও কপিলের সাঙ্খ্য দর্শনকেও স্বপ্নদর্শনের তুল্য মনে করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতির ত কোন কথাই নাই। আর এই ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যে এই শ্রেণীর কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা অতীব সত্য; তথাপি কোন ব্যাধি সুবিখ্যাত ভিষক্‌বর্গের দ্বারা উপশম প্রাপ্ত না হইয়াও সামান্য ব্যক্তির সামান্য সামান্য বটিকা সেবনে সুস্থ হয়, এইরূপ সাময়িক ঘটনা দেখিয়া (অমূলক হউক বা সমূলক হউক) আপাততঃ একটা আশার সঞ্চার হইতে পারে, তাই ইহার অবতারণা। ফলাফল ভগবানই জানেন।

প্রেত্যভাবের অস্তিত্ব অধিকার করিয়া একটা বিবাদ যে আজই চলিতেছে এরূপ নহে, কঠোপনিষদের যুগেও এই প্রকার বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

নচিকেতার উক্তি—

কোন কোন ব্যক্তি বলে যে, মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকে, আবার অন্য শ্রেণীর লোকেরা বলে যে, মৃত্যুর পরে সে থাকে না অর্থাৎ মৃত্যুই মানবাস্তিত্বের অন্তিম সীমা।

এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব আমি আপনার উপদেশে জানিতে ইচ্ছা করি। ইহা আমার তৃতীয় বর।

নচিকেতার এই প্রার্থনায় অসম্মত হইয়া যমরাজ বলিতেছেন—

"দেবৈ র্যত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ
মামোপরোৎসীরতিমাসৃজৈনম্॥"

হে নচিকেতঃ, এই বিষয়ে পুরাকালের দেবতারাও সন্দেহাকুল ছিলেন, ইহা দুর্ব্বোধ্য, কেননা এই ধর্ম্ম সূক্ষ্ম। তুমি এই বর উপেক্ষা করিয়া অন্য বর চাহিয়া লও, ইহার জন্য আমায় অনুরোধ করিও না।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রেত্য ভাবের তথ্য বুঝিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে যাহারা অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে বীতশ্রদ্ধ বা বিরত হইয়া সুবর্ণ মুদ্রার সৌদামিনী প্রভায় মুগ্ধ ও অস্থিচর্ম্মময় কলেবরের বিসলতাবৎ সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সমক্ষে পরলোক তত্ত্ব যে তমসাচ্ছন্ন, ইহাও উপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে—

"ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"

এই ত গেল কঠোপনিষদের কথা, আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরলোক সম্বন্ধে বিসংবাদ শান্তি করা হইয়াছে।

"তস্যবা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকঞ্চ। সান্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সান্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ উভে স্থানে পশ্যতি ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ॥"

এই জীবের দুইটি মাত্র স্থান আছে, একটি এই দৃশ্যমান শরীর, আর একটি পরলোক অর্থাৎ ভাবী শরীর। এই উভয় লোকের সন্ধিকে তৃতীয় ও স্বপ্ন স্থান বলা হইয়া থাকে (এই তৃতীয় স্থানটার অর্থ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল বা সমসাময়িক কাল)। আর এই সন্ধিস্থানে উপনীত হইয়া জীব ইহলোক ও পরলোক উভয় দেখিতে পায়।

সন্ধিস্থানে যাইয়া জীব পরলোক প্রত্যক্ষ করে, ইহা উপনিষদের প্রসাদে বুঝা গেল; পরন্তু এই ঘটনা একমাত্র মুমূর্ষু অবস্থাতে ঘটিতে পারে বলিয়া অমুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের পক্ষে পরলোকতত্ত্ব সন্দিগ্ধই রহিয়া গেল। কিংবদন্তীর কথায় এই যুগের শিক্ষিত লোকের যে সন্তোষ বিধান করা যাইতে পারে, তাহারও আশা নাই; সুতরাং মুমূর্ষু অবস্থা হইতে পুনর্জীবিত ব্যক্তির 'আমি যমদূত ও যমের ধর্ম্মাধিকরণ দেখিয়াছি'—ইত্যাদি গাথার উল্লেখ করাতে কার্য্য সিদ্ধি সুদূরপরাহত বলিয়াই বোধ হয়। পরলোকগত জীবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের কিংবদন্তী সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং অনুধাবনপূর্ব্বক উপলব্ধি না করিলে এই বিষয়ে সন্দেহ দূর হইবার নহে। থিয়সফিষ্ট ও প্রেততত্ত্ববাদীরা ত এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের নিকট কতই অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, 'ইহা আপ্ত বাক্যই বটে' এইরূপ স্বীকার করিয়া না লইলে তাঁহারা সন্দেহোন্মূলক প্রমাণপ্রয়োগপূর্ব্বক জিজ্ঞাসুর সন্তোষ জন্মাইতে পারেন না। ফলতঃ ভূত বা প্রেতের অস্তিত্বটা যদি সপ্রমাণ হইয়া যায়, তবে পরলোক সম্বন্ধে কোন বিসংবাদই থাকে না। পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা প্রতীচ্য জড়বাদের ভিত্তিটাও অংশতঃ ভাঙ্গিয়া যায়।

এই পরলোকটার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পাতঞ্জল ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রে অনেক কথা লিখিত আছে। অধিকন্তু যুক্ত ও যুঞ্জান

যোগীর দর্শন বর্ত্তমান যুগে বিরল। হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের পাদদেশে সিদ্ধগণ বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি আশাপ্রদ বাক্য পুস্তক বা সাময়িকপত্রের গৌরব ও গ্রাহক বাড়াইতে পারিলেও বিচারশীল সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। আর প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা না রাখিয়া যাঁহারা হুজুকে অঙ্গ ঢালিয়া দেন, তাঁহাদের কথা লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইদানীন্তন কালে এইরূপ মহাপুরুষেরও অভাব নাই, যাঁহারা যোগিদর্শনের কথা পাড়িয়া নিজের পশার জমাইয়া না লয়েন। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া উড্ডীয়মান কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। অনেক মহাত্মাই পরলোক সম্পর্কিত বা অন্য কোন গূঢ় তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরভাবে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তর দিয়া থাকেন যে, বাপু, এই সকল বিষয় যোগগম্য, যদি তোমার জানিতে একান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে যোগপথ অবলম্বন কর। এই পথে অগ্রসর হইলে স্বয়ং বুঝিয়া সকল সন্দেহ দূর করিতে পারিবে। কথাটা আশাপ্রদ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক, কিন্তু জিজ্ঞাসুর মনে এই ভাবের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে যে, মহাত্মা যাহা বলিতেছেন, তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি? আর তাহার এই সন্দেহটা তখনই দূর হইতে পারে, যখন সে মহাত্মার সিদ্ধির কোন অব্যভিচারী গুণ দেখিতে পায়। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষতঃ ঐরূপ কোন গুণ দেখিতে না পাইলে নির্দ্দিষ্ট বিষয়সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ বিচারশীল ব্যক্তি অনির্দ্দিষ্ট যোগসুখের প্রত্যাশায় অকিঞ্চন ব্রতে ব্রতী হইতে পারে? তবে সং সাজিয়া অল্পদর্শীদিগের মন ভুলান বা নিজের জঠরানল শান্তির উপায় করিয়া লওয়া সহজ। ইহা সত্য যে, অনেকেই অনবধানোত্থ বা প্রমাদমূলক দৃষ্টিবৈকল্যে পতিত হইয়া গুরুজীকে সিদ্ধির গুণে সমলঙ্কৃত দেখিতে পান, কিন্তু এই শ্রেণীর অধিকাংশ সরস্বতীর সাপত্ন হইলেও বাক্‌চাতুর্য্যে গুরুজীর যশঃ-সৌরভ দিক্ দিগন্তে বিকীর্ণ করিয়া স্বকীয় দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাকে উন্নত করিয়া তুলেন। আবার এই উপলক্ষে গুরুদেবের কোষপেটিকা অখণ্ডমণ্ডলাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিলে কোন অন্তরঙ্গ চেলা তাহা লইয়া অদৃশ্য হইতেও অন্যায় মনে করেন না; কারণ গুরুর সম্পত্তি চেলার অপ্রাপ্য নহে। যাহা হউক, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" প্রভৃতি শাস্ত্র যখন শ্রদ্ধাকে অর্থাৎ গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ বলিয়াছে, তখন তাহাকে কোন প্রকারে অবজ্ঞার জিনিষ মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু গুরুদেবের কিছু যোগমাহাত্ম্য না দেখিয়া একমাত্র ভাবভঙ্গী ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াই ভুলিয়া যাওয়া বা ইনি কপিল মুনির অবতারই বটেন, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া শ্রদ্ধার পরিচায়ক হইতে পারে কি না, তাহাই বিবেচ্য। আর যাহাদের মনে এত বড় একটা গুরুতর বিষয় লইয়াও কোন প্রকার তর্কের উদয় হয় না, এইরূপ লোক পুরাকালের ঋষিসমাজে অস্বচ্ছল না থাকিলেও পৃথিবীর বর্ত্তমান অভিজ্ঞ সমাজে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিষদিক যুগে গুরুকরণ প্রথাটা যেরূপ পবিত্র ও অকৃত্রিম ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দিন দিন ইহা বিকৃত হইতে চলিয়াছে।

পরলোক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ চর্চ্চা করা গেল, এক্ষণে পরলোকের যাত্রী কে তদ্বিষয়ে চর্চ্চা করা যাইতেছে। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন

যে, মৃত্যুর পরে লিঙ্গ শরীর সংশ্লিষ্ট হইলে জীবচৈতন্য লোকান্তরে যায়। পরন্তু এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিকদিগের সন্তোষজনক হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বেদান্তদর্শন বলিতেছেন—

তদন্তর প্রতিপত্ত্যধিকরণ।

"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং।"

৩অ ১পা ১সূ।

লোকান্তরপ্রাপ্তিকালে লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীব সূক্ষ্মরূপে পরিণত সমিৎ পুরোডাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধূমাদি-মার্গে গমন করেন; যেহেতু "বেত্থ যথা পঞ্চম্যা মাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" প্রশ্নশ্রুতি ও "ইতিতু পঞ্চম্যা মাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" উত্তর শ্রুতি পাওয়া যায়। প্রথম শ্রুতির অর্থ—স্ত্রীরূপ পঞ্চম অগ্নিতে সমিৎ প্রভৃতি হবনদ্রব্যের আহুতি দিলে যেরূপে ঐ দ্রব্যগুলি গর্ভস্থ পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, তাহা কি তুমি জান? দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ—ইহলোকে যজমান যে দ্রব্যগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দেন, ঐগুলি সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া মরণান্তে লিঙ্গশরীরাশ্রিত যজমানের সহিত আতিবাহিক দেবতাগণের দ্বারা দ্যুলোকরূপী অগ্নিতে আহুত হয়, পরে সকলে মিলিয়া দেবশরীরে পরিণতি লাভ করে। আর ঐ দেবশরীরটা কিছুকাল স্বর্গের সুখ উপভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষয় হেতু নবনীতের ন্যায় দ্রবীভূত হয় এবং ঐ দ্রবীভূত শরীরটাকে আতিবাহিক দেবতারা মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়ায় উহা জলরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। আবার ঐ জলকে ঐ দেবতারা পৃথিবীরূপী অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রীহি যবাদিরূপে পরিণত করিয়া তুলে। পরে ভক্ষ্যরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে উহার আহুতি হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ঐ ভক্ষ্য বস্তু বীর্য্যরূপ ধারণ করিয়া স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুত হওয়ায় গর্ভস্থ শরীরাকারে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীরূপ পঞ্চাগ্নি ক্রমে গর্ভোৎপত্তি বলিয়া কথিত আছে।

হবন দ্রব্যগুলা যে সূক্ষ্মরূপে জীবের সহিত পরলোকে চলিয়া যায়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইতেছে—

"প্রাণগতেশ্চ॥" ৩অ ১পা ৩সূ।

"তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনুক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" শ্রুতিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ধূমযান মার্গে স্বর্গ গমন শ্রুত হওয়ায় জীবের সহিত হোম দ্রব্যের পরলোকযাত্রা দৃষ্টান্তশূন্য নহে, সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

এই পরলোক যাত্রাটাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম উৎক্রান্তি, ২য় মরণ। ১মটা আবার দ্বিবিধ। সগুণ ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বা অন্যান্য দেবতোপাসকদিগের পক্ষে ধূমযান মার্গে স্বর্গলোক প্রাপ্তি। এই মার্গের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তটা বিস্তৃত ও অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ। মরণ অবস্থাটা পাপীদিগের পক্ষে একই প্রকার হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্যুর পরে যমলোকে নীত হইয়া নরকযাতনা ভোগ করে। পক্ষান্তরে যাঁহারা নির্গুণ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না ব্রহ্মলোকের না যমলোকের জঞ্জালে পড়িতে হয়। তাঁহাদের লিঙ্গশরীরটা স্থূল শরীরের পতন কালেই স্বকারণে লীন হইয়া যায়। আর্য্য শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

বেদান্ত সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় পাদে মরণ অবস্থা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

বাক্‌সম্পত্ত্যধিকরণ।

"বাঙ্মনসি শব্দাচ্চ।" ১।

মরণ সময়ে বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত মিলিত হয়, কেননা মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্যরোধ হইবার পরেও মানসিক কার্য্য লক্ষিত হয়; এবং শ্রুতিতেও ইহার বিধান আছে। ঐ শ্রুতি এই—

"অস্য প্রযতো জীবস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণোঽধ্যক্ষে অধ্যক্ষস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।"

এই জীব যখন স্থূল শরীর হইতে প্রয়াণ করে, তখন বাক্য (ইন্দ্রিয়সমূহ) যাইয়া মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবে এবং জীব পঞ্চভূতে মিলিত হয়। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ঐ পঞ্চভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সূত্রের বাক্‌শব্দটা যে, নিখিল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ স্বরূপ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে—

"অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু।" ২।

বাক্‌শব্দ ইন্দ্রিয়সমূহের উপলক্ষণ স্বরূপ হওয়াতে ঐ মনোমেলনটা নিখিল ইন্দ্রিয়ের বুঝিতে হইবে।

"তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ।" ৩।

ঐ মন প্রাণের সহিত মিলিত হয়, যেহেতু "মনঃ প্রাণে" এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়।

"সোঽধ্যক্ষে তদপগমাদিভ্যঃ।" ৪।

প্রাণ জীবের সহিত মিলিত হয়, কেননা উক্ত শ্রুতিতে জীবের সহিত তদীয় পরলোক যাত্রা উল্লিখিত হইয়াছে।

"ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ।" ৫॥

উক্ত শ্রুতিতে "অধ্যক্ষস্তেজসি" এইরূপ কথিত আছে বলিয়া ঐ জীব পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হয়।

শ্রুতির তেজঃ শব্দ কি প্রকারে পঞ্চভূতের উপলক্ষণ স্বরূপ হইল এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে—

"নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি।" ৬॥

একমাত্র তেজের সহিতই জীবের মেলন শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু পঞ্চভূতের সহিত জীব মিলিত হয়, ইহাই ঐ উভয় শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সুতরাং তেজঃ শব্দ পঞ্চ ভূতের উপলক্ষণ স্বরূপই বটে।

আমৃত্যুপক্রমাধিকরণ।

"সমানা চামৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য।" ৭।

উৎক্রান্তিকে বাদ দিয়া ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এবং জীবের হৃৎপদ্মে পরস্পর মেলনরূপ মৃত্যু, নির্গুণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষকারী তত্ত্বজ্ঞানী, সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সকলেরই তুল্যরূপ হইয়া থাকে। অধিকন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর লোকান্তরে না যাইয়া হৃৎপদ্মস্থিত পরব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" শ্রুতির এই অংশ একমাত্র জ্ঞানীর জন্য।

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" শ্রুতির অংশ পূর্ব্বোক্ত অপরাপর অংশের ন্যায় সর্ব্ব সাধারণকে অধিকার করিয়া কেন প্রবর্ত্তিত না হয় এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে—

তদাপীত্যধিকরণ।

"তদাপিতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥" ৮॥

ঐ লিঙ্গশরীর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, কেননা কর্ম্মপরায়ণ ও উপাসকদিগের স্বর্গ, নরক ও ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

যদি লিঙ্গ-শরীরটা মৃত্যুকালে স্থূল শরীর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তবে তন্নিকটবর্ত্তী লোকেরা কেন দেখিতে পায় না এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

"সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥" ৯॥

লিঙ্গ শরীরটা পরিমাণ অনুসারেও সূক্ষ্ম বটে, যে হেতু শ্রুতিতে সেই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

"নোপমর্দ্দেনাতঃ।" ১০॥

লিঙ্গ শরীরটা মৃত্যুকালে বাহির হইয়া যায় বলিয়াই আঘাতাদি দ্বারা মৃত্যুর পরে তাহার ব্যথা হয় না।

"অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা॥" ১১॥

এই লিঙ্গশরীরের সংশ্রবে জীবিত অবস্থাতে স্থূল দেহের এই উষ্ণ স্পর্শ সর্ব্বসাধারণ উপলব্ধি করে।

পাঠক বেদান্ত দর্শনে জীবের যেরূপ পরলোকযাত্রার বৃত্তান্ত আছে তাহা শুনিলেন। আসুন এক্ষণে যুক্তির অনুসরণপূর্ব্বক এই সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা যাউক।

পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববাদী প্রভৃতি অনেক জড়বাদীরাই মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষকে আত্মপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই অভিষেক ক্রিয়াটার মূলে তাঁহাদের লৌকিক বুদ্ধির চাতুরী বা বাহাদুরী ব্যতীত আর বেশী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মতে পরলোক শব্দের কোন অর্থ অনুসন্ধানে না পাইলেও একটা অদ্ভুত পূর্ব্বলোক জনক জননীতে পর্য্যবসিত দেখিতে পাই। তাঁহাদের মতে পিতৃবীজ ও মাতৃশোণিতই সন্তানের সচৈতন্য কলেবরে পরিণত হইয়া থাকে। এই মতগুলি হইতে বৈজ্ঞানিক জগতের প্রভূত উপকার হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহা দ্বারা তৎপ্রতি দৈনন্দিন লোকের অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য বাড়িতেছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত মতে দীক্ষিত হইবামাত্র অনেকেই "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পড়েন। যদিও তাঁহারা লৌকিক নীতির সীমা অতিক্রম করা অন্যায় বলিয়া জানেন, তথাপি পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মার উপর আস্থা না থাকায় ঐ নীতিটা কোন প্রকারেই তাঁহাদিগকে স্বার্থের উত্তপ্ত মরুভূমি পার করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। অবশ্য স্বার্থটা ব্যক্তিগত গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ না থাকিতে পারে, স্বজাতির কল্যাণকামনারূপ প্রান্তরেও উহার ব্যাপ্তি দেখিতে পাই; কিন্তু যখন উহা বিজাতির শোণিত পানে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করে, তখন কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন?

প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববাদীরা অনেক মানবমুণ্ডের পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানবীয় বিচারশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি ঊর্দ্ধ মস্তিষ্ক ও তত্রত্য ধূসর পদার্থের উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্ক-কুণ্ডলীর গভীরতা এবং ধূসর পদার্থের তারতম্য অনুসারে মানুষের মানসীশক্তির তারতম্য সংঘটিত হয়। সুতরাং তাঁহারা আর্য্য দার্শনিকদিগের অনুরূপ একটা স্বতন্ত্র আত্মা মানিবার জঞ্জালে পড়েন নাই। দেখিতেছি আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বসু মহাশয়ের উদ্ভিদ্ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রকারান্তরে এই মতটা যে ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম এই যে, উদ্ভিদ্ গুলা বাহির হইতে অনুক্ষণ যে তাপ ও আলোকের শক্তি পাইতেছে, তাহাই দেহস্থিত অণুরাশিকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া দেয়। এই আঁকান বাঁকানটা লজ্জাবতী প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অন্যান্য উদ্ভিদের অণুগুলি বহিঃস্থ উত্তেজনায় বস্তুতঃ বিকৃত না হইলেও উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঐরূপভাবে সাড়া দিবার উপযোগী নহে বলিয়া যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা ধরিতে পারি না। উদ্ভিদে কোন স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি নাই, বহিঃস্থ শক্তিই উহার কার্য্য সম্পন্ন করে।

যখন বসু মহাশয় উদ্ভিদে স্বতন্ত্র জীবনী

শক্তি মানেন নাই, তখন যে অন্যান্য প্রাণীতে একটা স্বতন্ত্র জীবনী-শক্তি আছে, ইহা তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। সুতরাং এই মতের অনুপাতে মানব-মস্তিষ্কে যে বাহিরের শক্তিই খেলা করিতেছে, তাহাতে কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই, এইরূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। আর এই সম্ভাবনাটা দেহতত্ত্ববাদীদের উক্ত নির্ভর করাটাকে ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিলেও বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক সম্পত্তিগুলি যে মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, ইহা বুঝাইয়া দিতেছে। আর এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়াতে নিরঙ্কুশভাবে আমরা বলিতে পারি যে, মানব-মস্তিষ্কে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, উহা বিশ্বশক্তি ভগবতীরই অংশ বটে, কিন্তু দেহতত্ত্ববাদীদিগের অনুমোদিত মস্তিষ্কোত্থিত স্বতন্ত্র শক্তি নহে।

বসু মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববাদীদিগের মতে অপ্রসার ছায়া পড়িলেও আর্য্য দার্শনিকদিগের লিঙ্গশরীরটাও যে ঐ ছায়া হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস করিতে না পারিলে, লিঙ্গশরীরের অস্তিত্ব মীমাংসা করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। "পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং।" এইরূপ একটা লিঙ্গ-শরীর যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে, এই বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন অকাট্য যুক্তির আবিষ্কার হইয়াছে কিনা এইরূপ সন্দেহ থাকিয়াই যাইতেছে। আর যোগের কথা পাড়িয়া অযোগীদিগের চিত্তরঞ্জন করা অসম্ভব না হইলেও বহু প্রয়াসসাধ্য বটে।

যাহা হউক, বসু মহাশয় যে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে ঐ নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আর্য্যদার্শনিকদিগের উদ্ভিজ্জ জীব ও লিঙ্গ শরীরের উপর আঘাত লাগিলেও অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে সুযোগ ঘটিয়াছে। কারণ তিনি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, একই শক্তির বিভিন্ন প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই আবিষ্কার যে বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত এক জীববাদের অংশতঃ অনুরূপ হইয়াছে, বেদান্তমুক্তাবলীর অধ্যয়নকারীকে অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেননা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—মায়া-প্রতিবিম্বিত এক জীবেরই কল্পিত নানা জীব। ইহার উদাহরণে স্বপ্নস্থ এক জীবের কল্পিত অসংখ্য জীবকে দেখান হইয়াছে। কিন্তু বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার জন্য একই মায়ার বৃত্তিরূপ মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী নানা অন্তঃকরণ নানা হইয়াছে মাত্র। এই কথা দ্বারা কেহ ইহা মনে করিবেন না, ঐ আবিষ্কারটা একবারে বেদান্তকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছে।

যুক্তিপথে অগ্রসর হইলে যেরূপ লিঙ্গ শরীরের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানে গোলযোগ ঘটে, সেরূপ আত্মার পূর্ব্ব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। এই বিষয়ে আন্বিক্ষিকী বিদ্যার প্রবর্ত্তক যুক্তি-বিপিনের অদ্বিতীয় কেশরী মহর্ষি গোতম যে সূক্ষ্ম যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। কিন্তু ইহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার জন্য পাঠকবর্গকে বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমরা আশা করি যে, এই বিষয়ে তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন না।

অবতরণ সূত্র—"পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ॥" ৩য় ২আ ৬৪সূ।

পূর্ব্বজন্মে জীব যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ পাপ ও পুণ্যের প্রভাবে বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হয়।

আশঙ্কা সূত্র

"ভূতেভ্যো মূর্ত্ত্যুপাদানবৎ
তদুপাদানং॥" ঐ। ঐ। ৬৫।

যেরূপ কর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তু হইতে পাষাণ ও গৈরিক প্রভৃতি জন্মে, তদ্রূপ কর্ম্মনিরপেক্ষ ভৌতিক পরমাণু হইতে শরীরের উৎপত্তি হইবে না কেন?

সমাধান সূত্র—

"ন সাধ্যসমত্বাৎ" ॥ ঐ। ঐ। ৬৬।

যেরূপ শরীরোৎপত্তি যে কর্ম্মজনিত নহে, ইহা তুমি সিদ্ধ করিতে পার নাই বলিয়া সাধ্য (সাধন করিবার বিষয়ই) রহিয়াছে, তদ্রূপ দৃষ্টান্তে পাষাণাদির উৎপত্তি যে কর্ম্মজনিত নহে, ইহারও দশা বটে। সুতরাং তোমার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে।

পাষাণাদির উৎপত্তি কর্ম্মজনিত নহে, ইহা মানিয়া লইলেও এই দৃষ্টান্ত যে প্রকৃত বিষয়ে অনুপযোগী তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

"নোৎপত্তি নিমিত্তত্বান্মাতা-
পিত্রোঃ॥" ঐ। ঐ। ৬৭।

শরীরোৎপত্তি বিষয়ে পাষাণাদি উৎপত্তির দৃষ্টান্ত অনুরূপ নহে অর্থাৎ অপর প্রমাণ দ্বারা শরীরোৎপত্তি যে কর্ম্মজন্য ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, মাতাপিতা যে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াছেন তজ্জনিত অদৃষ্টকে শরীরোৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে।

"তথা আহারস্য।" ঐ। ঐ। ৬৮।

মাতাপিতার আহারও অদৃষ্ট দ্বারা পরম্পরারূপে শরীরোৎপত্তির কারণ।

অদৃষ্ট দ্বারা আহারকে কারণ না মানিয়া একমাত্র জনকজননীর পরস্পর সম্ভোগকে এই বিষয়ে কারণ বলিলেই হয়, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—

"প্রাপ্তৌ চানিয়মাৎ॥" ঐ। ঐ। ৬৯।

জনক জননীর সম্ভোগ হইলেই নিয়ম পূর্ব্বক গর্ভাধান হয় না, এইজন্য একমাত্র উহাকেই কারণ বলা যাইতে পারে না, পরন্তু অদৃষ্ট এবং আহার প্রভৃতি ক্রিয়াও এই বিষয়ে কারণ।

মহামুনি গোতম যে জীবের বর্ত্তমান দেহ প্রাপ্তি বিষয়ে অদৃষ্টকে কারণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দেখান গেল। এক্ষণে জীব যে শুক্র শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়াতে উৎপন্ন নহে, প্রত্যুত অনাদি নিত্য, এই বিষয়ে তদীয় গভীর যুক্তির অনুসন্ধান করা যাউক।

অবতরণ সূত্র—

"পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য
হর্ষভয়শোকসংপ্রতিপত্তেঃ॥"
২অ ১আ ১৯সূ।

যে বিষয়ে সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক হইয়া থাকে, তাহা সে ইহজন্মে ইতঃপূর্ব্বে কখন উপলব্ধি করে নাই। আর যাহা পূর্ব্বে কখন উপলব্ধ হয় নাই, তদ্বিষয়ে অকস্মাৎ একটা প্রবৃত্তি হওয়া দার্শনিক যুক্তির অনুমোদিত নহে; সুতরাং অন্য কারণ অনুসন্ধানে না পাওয়ায়, পূর্ব্বজন্মে যে ঐ বিষয় সে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিই বর্ত্তমান হর্ষাদির অসাধারণ কারণ। পক্ষান্তরে এই হর্ষ প্রভৃতি আমরা বিবিধ মুখভঙ্গী দ্বারা অনুমান করি।

আশঙ্কা সূত্র—

"পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মিলনবিকারবত্-
দ্বিকারঃ।" ঐ। ঐ। ২০।

মুখবিকাশ প্রভৃতি বিকার দেখিয়াই ঐ শিশুর হর্ষ প্রভৃতি ঘটনার অনুমান করিয়া লওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ, যেহেতু পদ্মকুমুদ প্রভৃতি পুষ্পের সঙ্কোচ-বিকাশের ন্যায় হর্ষাদি ব্যতিরেকেও ঐরূপ বিকার অকস্মাৎ হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

"উষ্ণশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মক-
বিকারাণাং।" ঐ। ঐ। ২১॥

গ্রীষ্ম, শীত ও বর্ষা প্রভৃতি কালই ঐ পাঞ্চভৌতিক পদ্মকুসুম প্রভৃতির সঙ্কোচবিকাশরূপ বিকারের কারণ, সুতরাং উহাকে অকারণক বা অকস্মাদুৎপন্ন বলা যাইতে পারে না। আর যখন দৃষ্টান্তই সকারণক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন দার্ষ্টান্ত মুখবিকাশ প্রভৃতিকে অবশ্য হর্ষাদি জনিত বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে ঐ হর্ষাদির অন্য কারণ না থাকায় পূর্ব্বজন্মানুভূত ভোগ্য বিষয়ের স্মরণকেই তৎকারণ বলা উচিত।

প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত—

"প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যা-
ভিলাষাৎ।" ঐ। ঐ। ২২॥

সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষকে আহারাভ্যাস-প্রসূতই বলিতে হইবে। কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, পূর্ব্বাহার্য্য বস্তুর স্মরণ পূর্ব্বকই বর্ত্তমান আহারাভিলাষ হইয়া থাকে। সুতরাং জীব পূর্ব্ব শরীর হইতে প্রয়াণপূর্ব্বক বর্ত্তমান শরীরে আসিয়া এবং পূর্ব্ব শরীরের আহার্য্য দ্রব্যের স্মরণ করিয়া প্রাথমিক আহারের অভিলাষী হইয়া থাকে।

আশঙ্কা সূত্র—

"অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবত্তদুপ-
সর্পণং।" ঐ। ঐ। ২৩॥

যেরূপ চুম্বক পাথরের অভিমুখে লৌহ পূর্ব্বাভ্যাস ব্যতীত স্বয়ংই উপনীত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত আহারাভ্যাসের অপেক্ষা না রাখিয়া শিশু স্তন্যাভিলাষ করিয়া থাকে, এইরূপ বলিলেই হয়।

দৃষ্টান্তে যে চুম্বকাভিমুখে লৌহগমন নির্দ্দিষ্ট হইল, উহা নির্নিমিত্তক বা সনিমিত্তক এই বিকল্প করিয়া সমাধান করা হইতেছে—

"নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ।" ঐ। ঐ। ২৪।

যদি চুম্বকাভিমুখে লৌহ গমনকে নির্নিমিত্তক বল, তবে লোষ্ট্র প্রভৃতিও চুম্বকাভিমুখে কেন ধাবিত হয় না? আর যদি সনিমিত্তক বল, তবে তোমার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ লৌহের চুম্বকাভিমুখে ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন যেমন কোন কারণ স্বীকার করিবে, অমনি বাধ্য হইয়া তোমায় স্তন্যাভিলাষের কোন না কোন কারণ অবশ্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে; পরন্তু ঐ কারণ পূর্ব্বকালীন আহারাভ্যাস ব্যতীত কাহাকেও বলা যাইতে পারে না।

"বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ।" ঐ। ঐ। ২৫।

বীতরাগ অর্থাৎ কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য জীবের জন্ম দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া প্রাথমিক ইচ্ছার কারণ পূর্ব্বজন্মানুভূত বিষয়ের স্মৃতিই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আশঙ্কা সূত্র—

"সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবৎ তদুৎপত্তিঃ।" ঐ ঐ ২৬।

যেরূপ সুবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য স্বতই পীত প্রভৃতি বর্ণের সহিত উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আত্মাও স্বতই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের সহিত জন্ম গ্রহণ করে, এইরূপ মানিলেই হয়।

সমাধান সূত্র—

"ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাং।"

সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর পীতাদি বর্ণের অনুরূপ আত্মার ইচ্ছাদি গুণকে স্বকীয় সমবায়ী কারণের সহিত উৎপন্ন বলা যাইতে পারে না, কারণ সুখসাধনত্ব প্রভৃতির জ্ঞানকে ইচ্ছাদি গুণের নিমিত্ত কারণ বলিতে হইবে। সুতরাং প্রাথমিক ইচ্ছার পক্ষেও ঐ কারণ আবশ্যক হওয়াতে, পূর্ব্ব জন্মে যে জীব সুখসাধনত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান স্মৃতিকে ঐ কারণ স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। আর ইহা কোন প্রকারে আত্মার পূর্ব্বাস্তিত্ব না মানিলে সম্ভবপর

হইতে পারে না। এক্ষণে আত্মা যে কেশ রোমাদির ন্যায় উৎপন্ন বস্তু নহে,-কিন্তু অনাদি নিত্য পদার্থ ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদে অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চরক সংহিতায় শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই লিখিত আছে—"মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তিচ সত্ত্বমৌপপাদিকমিতি হোবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ নেতি ভরদ্বাজঃ।"

মাতা, পিতা, আত্মা, হিতকর দ্রব্য ও তদীয় রস হইতে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহার সম্পাদনকারী মন, ইহা আত্রেয় ঋষি বলিলেন। পক্ষান্তরে ভরদ্বাজ ঋষি বলিলেন, তাহা নহে। পশ্চাৎ ভরদ্বাজ ঋষির সকল আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক আত্রেয় ঋষি ঐ গর্ভের সম্যক্ সমাধান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আত্মা ও মন যে স্বতন্ত্রভাবে এই গর্ভে আসিয়া সংশ্লিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে সুন্দর মীমাংসাও হইয়াছে। আর্য্য দেহতত্ত্ববাদীরা প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববাদীদিগের মত জড়ীয় রাসায়নিক ক্রিয়াতেই আত্মতত্ত্বের পর্য্যবসান করেন নাই; এই বিষয়ে আর্য্যদার্শনিকদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করা হইয়াছে। অধিকন্তু আত্মার পূর্ব্বাস্তিত্ব সম্বন্ধে কুশাগ্রবুদ্ধি মহর্ষি গোতম যে সূক্ষ্ম যুক্তির উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অকাট্য বলিয়াই বোধ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের ধমনীতে এক্ষণে আর্য্যশোণিত বহিতেছে—যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের তালিকা গণনা করিলে শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও আর্য্যদার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাশ্চাত্য মতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছেন।

বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের অনুসারে যুক্তির অনুসন্ধান করিলেও আত্মা যে উর্দ্ধ মস্তিষ্কের স্বয়ং প্রসূত সম্পত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে, এক্ষণে ইহার বিশিষ্ট আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানের ইহা সিদ্ধান্ত যে, শক্তি ও তদীয় কার্য্যকারিতার অবলম্বন স্বরূপ জড় উভয়েরই মৌলিকরূপ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। শক্তির যেরূপ কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত বা তিরোহিত হইয়া থাকে, জড়েরও সেইরূপ শক্তি-সংগঠিত কৃত্রিম আকার বা সংহত আকারের পরিণাম বা তিরোধান ঘটিয়া থাকে। অণুকে জড়ের মূলস্বরূপ বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ধরিতে পারিলেও শক্তির মূল তত্ত্ব যে কি তাহা আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের নিকট অজ্ঞেয়তার অন্ধকারে সমাচ্ছন্নই রহিয়াছে। এই মতে শক্তির অর্থ—যাহা জড়ের পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। আবার শক্তি ব্যতীত জড় যেরূপ নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়া মানবমনের উল্লাস জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ শক্তিও জড়ের অবলম্বন ব্যতীত পঙ্গুবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, এই উভয়ের মধ্যে একে অপরের অপেক্ষা ব্যতীত কৃতিপ্রয়োগে নিজের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে না বলিয়া উভয়ই পরস্পর-সাপেক্ষ। পরন্তু জড়ের মূলস্বরূপ যে অণু ইহা বুঝাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কোন অমোঘ যুক্তির আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে এখন পর্য্যন্তও সন্দেহ আছে। যাহা হউক, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মনীষীরা অণুকে জড়ের মূল স্বরূপ বলিয়া ধরিয়াছেন, হয়ত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি বা মায়াকে তাহা প্রতিপন্ন করিবেন। ইহা সত্য যে, ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক গবেষণা শক্তির কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই।

কতিপয় কার্য্যের অন্তস্তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া ও কতকগুলির প্রকৃত তথ্য মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া আপন মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে মাত্র। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে তাহার নিকট যাহা একমাত্র মোহকলিলোত্তীর্ণা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারই অধিগম্য বলিয়া বিখ্যাত, সেই আর্য্য-ঋষি-সমুদ্ভূত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া লইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি? শক্তি সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া যাইবে বলিয়া এইবারে ক্ষান্ত থাকা গেল। বারান্তরে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার অভিলাষ রহিল।

যখন বৈজ্ঞানিক যুক্তি অণু ও শক্তিমাত্রের মৌলিক মূর্ত্তিকে অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং নিত্য বলিতেছে, তখন মানব-মস্তিষ্কের অণুরাশি ও শক্তির মূল স্বরূপকেও তাহা বলিতে হইবে। আর যদি উভয়েরই মূল স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল, তবে বর্ত্তমান মস্তিষ্কে যেরূপ উহাদের কার্য্য হইতেছে, কোন অতীত মস্তিষ্কেও তদ্রূপ বা তৎসমানরূপ কার্য্য হইয়া থাকিবে। এইরূপ ভাবী মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান মস্তিষ্কের যে জাতীয় অণুপুঞ্জে শক্তির যে জাতীয় কার্য্য হইতেছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মস্তিষ্কের তজ্জাতীয় বা তৎ-সজাতীয় অণুপুঞ্জে শক্তির তজ্জাতীয় বা তৎ-সজাতীয় কার্য্য স্বীকার না করিলে, শক্তির কার্য্যপ্রণালীটা বিশৃঙ্খল ও নিয়মশূন্য হইয়া পড়ে। আর যদি শক্তির কার্য্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম না থাকে, তবে জলীয় শক্তির কার্য্য আগ্নেয় গিরিতে এবং আগ্নেয় গিরির কার্য্য জলে হইতে পারে। অথবা একই জিনিষে নানাবিধ কার্য্য হইবার আপত্তিটা আসিয়া পড়ে অর্থাৎ শক্তির কার্য্যপ্রণালীর ঐরূপ দশা হইলে একই ব্যক্তি কখন পশু হইয়া শৃঙ্গোত্তোলন ও পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক লাফাইতে, কখন পক্ষী হইয়া পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক উড়িতে এবং কখন সরীসৃপ হইয়া বুকে হাঁটিতে পারে। ফলতঃ এইরূপ দেখিতে পাই না। ক্রমবিকাশবাদীদিগের মতেও বনমানুষ হইতে উৎপন্ন প্রথম মানুষ কখনও হাক্সলির ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যখন স্বজাতীয় অণুরাশিতে শক্তির স্বজাতীয় কার্য্য ক্রমপরম্পরায় বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে এবং অণু ও শক্তি উভয়েরই মৌলিকরূপ নিত্য ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল, তখন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মানবের শারীরিক ও মানসিক সমস্ত সম্পত্তিই রূপান্তরে পূর্ব্বে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। পক্ষান্তরে এইরূপ থাকাকেই প্রেত্যভাব বলা যাইতে পারে। যুক্তি প্রেত্যভাব সম্বন্ধে ইহা হইতে অধিক কোন গূঢ় সমাচার আনিয়া দিতে পারে না। কিন্তু প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদীরা জনকজননীকেই ঐ সম্পত্তির পূর্ব্ব ভাণ্ডার প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যুক্তিবিভ্রাটে পড়িয়াছেন। সন্তানে জনকজননীর আনুরূপ্য উপলব্ধিই এইরূপ বিভ্রাটে পড়িবার কারণ।

গোতম ঋষির অভিহিত সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষের কারণ অনুসন্ধান করিলেই ক্রমবিকাশবাদের পরীক্ষা হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই সমস্যায় ক্রমবিকাশবাদীদিগকে বলিতে হইবে যে, সন্তানে পিতা মাতার অভ্যাস সংক্রমণই এই স্তন্যাভিলাষের কারণ। কেননা সুখ-সাধনত্ব জ্ঞানকে কারণ বলিলে ঘুরিয়া ফিরিয়া জন্মান্তরবাদে গিয়া পড়িতে হয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মস্তিষ্কে যে স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি ও বিচারশক্তি প্রভৃতি আছে এবং এইগুলি যে মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, ইহাও তাঁহারা স্বীকার

করেন। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন স্বতই আসিতে পারে যে, এই অভ্যাসটা কেমন করিয়া সন্তানে আইসে? যদি ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পিতা মাতার মস্তিষ্কের কতক অংশ সন্তানে আসিয়া যায়, তবে আবার ইহার উপর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে যে, ঐ অংশের পরিমাণ হইতে পারে কি না? যদি বলা যায় যে না, তবে মস্তিষ্কের কতক অংশ সন্তানে আসে এই কথাটা কেবল প্রতিজ্ঞামাত্র হইল অর্থাৎ অপ্রমাণিতই রহিল। পক্ষান্তরে ক্রমশঃ সন্তানে মস্তিষ্ক সংক্রমণ হওয়ায় যে পিতা মাতা অনেকগুলি সন্ততির জন্ম দিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে। ফলতঃ সুখ-সাধনত্ব জ্ঞান ব্যতীত যে কোন প্রকার ইচ্ছা হইতে পারে, এই বিষয়ে ক্রমবিকাশবাদীরা কোন উদাহরণ দেখাইতে পারেন না, কিন্তু উহা যে ইচ্ছার কারণ এই বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে কোন্ মত হেয় ও কোন্ মত গ্রহণীয়, তাহা বিচারশীল ব্যক্তি স্বয়ং বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

আত্মার মৌলিকরূপ অনাদি অনন্ত এক-মেবাদ্বিতীয়ং ইহা পরাবিদ্যার অনুশীলনকারীকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে শক্তির মূল তত্ত্বও যে এইরূপ, ইহা বিজ্ঞানবিদেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন। সুতরাং উভয়ের প্রকৃতি সমনিয়ত হওয়াতে উভয়েই পরস্পর তাদাত্ম্য ভাবাপন্ন। ফল কথা, কেবল নামে ভিন্নভাব, বস্তুতে উভয়েই এক। মৌলিকরূপ হইতে কার্য্যকারিত্বের দিকে দৃষ্টির প্রত্যাহার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং বিকৃত না হইয়া জড়কে বিকৃত বা সংযোজিত করা যেরূপ শক্তির কার্য্য, তদ্রূপ আত্মারও বটে। আত্মা স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জড়রূপিণী মায়াকে বিকৃত করিতেছেন। যখন শক্তি ও আত্মা নামে ভিন্ন হইলেও বস্তুতে একই প্রতিপন্ন হইয়া গেল, তখন শক্তির ভূত ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াতে আত্মারও তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। আর আত্মার এই প্রকার অস্তিত্বই প্রেত্যভাবের অর্থ। সুতরাং আর্য্য ঋষিদিগের সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের এই গুরুতর বিষয়টাকে যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া কোন প্রকারেই অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

নকুলীশ পাশুপত দর্শন।*

প্রস্তাবনা।

আমার মতে কোন বিষয়ের প্রবন্ধই হউক, আর পুস্তকই হউক, লিখিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে একটা ভূমিকা বা প্রস্তাবনা লেখা মন্দ নহে। বিশেষতঃ আমি যে অদ্য একটা উদ্ভট-নীরস বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া সহৃদয় সভ্যবৃন্দের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ না দিলে তাঁহাদের নিকট যে গুরুতর অপরাধী হইব, তাহাতে সন্দেহ কি? এই জন্য আমি এ প্রবন্ধের পার্শ্বে একটী ছোট খাট প্রস্তাবনার সংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনেক দিন পূর্ব্বে রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর সাহিত্য সভায় পাঠ করিবার জন্য আমাকে একটী প্রবন্ধ লিখিতে

* সাহিত্য সভার ৯ম বার্ষিক ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বলেন, কিন্তু আমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধির অল্পতার কথা মনে করিয়া এবং সাহিত্য সভার মত বিদ্বৎ-সমাজের সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি, এরূপ কোন নূতন বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে না পারিয়া এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সেই অনুরোধ এক প্রকার চাপা দিয়াই রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি অতি অল্প দিন হইল কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি অন্যান্য আবশ্যক কথার পর আমার নিকট আবার সেই পুরাণ অনুরোধের অবতারণা করেন। এবার কেবল সামান্যভাবে অনুরোধ নয়, একটু বিশেষ আগ্রহও প্রদর্শন করেন, কাজেই একটী প্রবন্ধ অবশ্য লিখিব বলিয়া আমি তাঁহার নিকট স্বীকৃত হইয়া আসিলাম।

গৃহে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন কি নূতন বিষয় আছে যাহা অবলম্বন করিয়া আমার মত অল্পশক্তি ব্যক্তি একটী প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হয়। অনেকক্ষণ অবধি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়াও একটা নূতন বিষয় স্থির করিতে পারিলাম না। যে বিষয়টী মনে করিতে লাগিলাম, দেখিলাম আমা হইতে অধিক শক্তিশালী কৃতবিদ্যগণ সে বিষয়টী অবলম্বন করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং সে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা এক্ষণে চর্ব্বিতচর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না, তাহাতে কেবল সহৃদয় সভ্যগণের নিকট হইতে উপহাস লাভ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। এইরূপ মনে করিয়া আমি নিজের ক্ষুদ্র পুস্তকাগারের এক কোণে অবস্থিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তক খানিকে টানিয়া বাহির করিলাম, মনের আশা—ইহা হইতে যদি কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারি। পুস্তকখানির প্রথম পাতা উল্টাইয়া দেখি "চার্ব্বাক দর্শনম্।" আজকালকার প্রচলিত শিক্ষা প্রভাবে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মানসিক ভাবের যাদৃশ পরিণতি হইয়াছে, তাহাতে চার্ব্বাক দর্শনের আলোচনায় আর কিছু নূতন কথা শিক্ষা দিবার নাই, কেননা ইদানীন্তন বিদ্যালয়ের অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বালকেরা অবধি বেশ বুঝিয়াছে যে, মৃত পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করা কেবল মরা গরুর জন্য ঘাস কাটা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আপনারা সকলেই বোধ হয় ইহা অনুভব করিতেছেন যে, অধুনা আপামর সাধারণ সকলের মনেই "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ," (হেসে খেলে লওরে যাদু মনের সুখে) এইরূপ একটা ঐহিক সুখলাভের তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে কি বৃদ্ধ, কি যুবা কাহাকেইত আর পারত্রিক সদ্গতি উপার্জ্জনের জন্য উৎসুক দেখা যায় না, সকলেই টাকা টাকা করিয়া বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা সহকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় চার্ব্বাক দর্শনের আলোচনা দ্বারা আমাদের কি আর নূতন শিক্ষা হইবে, প্রত্যুত আমরা যেরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে চার্ব্বাকদিগকেই অনেক নূতন কথা শিক্ষা দিতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা কথা বলিতেছি। চার্ব্বাকেরা একমাত্র প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন প্রকার প্রমাণের সত্তা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমরা এক্ষণে তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বুঝিয়া একমাত্র গৃহিণীর বাক্যই প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছি, উঁহার নিকট অনেক সময় প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য রক্ষিত হয় না, প্রত্যুত অপ্রত্যক্ষের উপরও অনেক সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। যেমন আজন্ম সহোদর ভ্রাতার কোন প্রকার দোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না করিলেও কেবল গৃহিণীর বাক্যানুসারেই তাহাকে অনেক প্রকারে দোষী স্থির করিতে হয়। তাই

বলিতেছিলাম, এই সময়ে চার্ব্বাক দর্শনের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

তার পরই বৌদ্ধ দর্শন, আমরা যখন এক্ষণে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরে থাক, বেদকে ঘুম পাড়ানি মাসী পিসীর ন্যায় আদিম যুগের অসভ্যদিগের কবিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, এবং "জপ, তপ, যজ্ঞ, দেব আরাধনা, এ সবেতে আর কিছুই হবে না"—এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত হই না, এবং অহিংসা পরমধর্ম্ম ইহার নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াই পুরুষপরম্পরা-প্রচলিত বলিদান উঠাইয়া দিয়া জবাই করা পশুর মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনাতেই বা আমাদের কি অধিক নূতন শিক্ষা হইবে? এইরূপ ক্রমে ক্রমে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "নকুলীশ পাশুপত দর্শনম্" চক্ষুর সম্মুখে পড়িল, ভাবিলাম ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার আলোচনা বড় একটা দেখি নাই। যাহা হউক, একটা নূতন বিষয় বটে। মহোদয় শ্রোতৃবৃন্দের মন আকর্ষণ করিতে পারুক আর না পারুক, শুনিবামাত্র নামটী তাঁহাদের নিকট নূতন বলিয়া যে বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ভাঁড় লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস ওরফে নখে কাণা যেমন একদিন অন্য কিছু নূতন খেলা দেখাইতে না পারিয়া, স্বয়ং ঝাঁকা মুটের মোট রূপে বিরাজ করিয়া পথে দর্শকবৃন্দের হাস্যোদ্দীপন করিয়াছিল, আজ আমিও সেইরূপ নূতন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের যে উপহাসাস্পদ হইব, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই এ প্রস্তাবনার উপসংহার করিব। বর্ত্তমান কৃতবিদ্য মহোদয়গণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ" নিবন্ধ খানি প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মাধবাচার্য্য যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অধুনাতন বিদ্বজ্জনমাত্রই তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। সেই মাধবাচার্য্যের সময়ে কি দার্শনিক মত—কি ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের মত, যত কিছু বিভিন্ন প্রকারের মত প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটীকে এক একটী দর্শন নামে অভিহিত করিয়া এই সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে আলোচনা করা হইয়াছে। এমন কি, তৎকালের প্রচলিত বৈয়াকরণ মতকেও পাণিনি দর্শন নাম দিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ খানি কি ভাবের গ্রন্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা যদি বলি, বর্ত্তমান সময়ে মাধবাচার্য্যের মত অসীম পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মহাত্মা যদি প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহেই খৃষ্ট দর্শন, মহম্মদ দর্শন, গৌরাঙ্গ দর্শন, কবীর দর্শন, নানক দর্শন, কর্ত্তাভজন দর্শন, ব্রাহ্ম দর্শন, রামকৃষ্ণ দর্শন, রাধাশ্যাম দর্শন প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের নবাবিভূর্ত সাম্প্রদায়িক মতের সন্নিবেশ দ্বারা সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহের একখানি দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত করিতেন; এখন পাঠকগণ ইহার প্রকৃতি অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে এক দিকে যেমন মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক পাতঞ্জলাদি দার্শনিক মতের আলোচনা করা হইয়াছে, অন্য দিকে বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মত সকলেরও যথাযোগ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদিগের অদ্যকার আলোচ্য "নকুলীশ পাশুপত দর্শন"ও একটী সাম্প্রদায়িক মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা ভগবান্ নকুলীশ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পশুপতি উপাসক সম্প্রদায়ের মত।

এইখানেই প্রস্তাবনার উপসংহার করিয়া প্রকৃত অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য যে ভাবে এই

পাশুপত দর্শনের উপোদ্ঘাত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনাদি বহুবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ভগবদুপাসনা বিষয়ক মত সকল প্রচলিত হইবার পরই যেন ঐ পশুপতির উপাসক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যের সিদ্ধান্তের উপর কতদূর আস্থা স্থাপন করা উচিত, তাহা লইয়া আমরা এস্থলে তর্ক বিতর্ক করিতে চাহি না, কেননা তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিলে বৌদ্ধদর্শনকে সাঙ্খ্যদর্শনেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থির করা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা বিদ্বজ্জনমাত্রেই অবগত আছেন। তবে তিনি যে ভাবে বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখমাত্র করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—রামানুজাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগের মতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়াও বিষ্ণুলোকে দাস্যাদিভাবে বিষ্ণুর উপাসনা করে। তাঁহাদের মতে মুক্ত জীবদিগের সংসার-ক্লেশের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা পরমেশ্বরের সহিত একেবারে অভিন্ন হইয়া যান না। প্রত্যুত তাঁহার দাস্যাদিভাবেই কালযাপন করেন। নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শ্লোক দ্বারা বৈষ্ণবসম্মত মুক্তির অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে—

"এবং হ্যহরহঃ শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মানুসারতঃ।
উক্তোপাসনয়া পুংসাং বাসুদেবঃ প্রসীদতি॥
প্রসন্নাত্মা হরির্ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনরূপয়া।
অবিদ্যাং কর্ম্মসংঘাতরূপাং সদ্যো নিবর্ত্তয়েৎ॥
ততঃ স্বাভাবিকা পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ॥
এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥"

এইরূপে মনুষ্যগণ বেদবিহিত এবং স্মৃত্যনুমোদিত বিধানানুসারে শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে, তিনি তাহাদের উপর প্রসন্ন হন। শ্রীহরি তাহাদের নিদিধ্যাসন রূপ ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সদ্যঃ সদ্যই উহাদের-কর্ম্ম-সমুদয়-রূপা অবিদ্যার নিবৃত্তি করেন, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, মনুষ্যগণের যে সকল কল্যাণকর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বাভাবিক গুণ সংসার অবস্থায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহাদের আবির্ভাব হয়। এই সকল গুণ মুক্ত-পুরুষে এবং ঈশ্বরে সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও, ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃকত্ব-রূপ ধর্ম্মই মুক্ত পুরুষগণ হইতে তাঁহার বিশিষ্ট সম্পাদক।"—ইহা দ্বারা সুস্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদিগের মতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়াও পরম ব্রহ্ম বাসুদেবে বিলীন হয় না, তাঁহা হইতে পৃথক্‌রূপে তাঁহার অধীনে থাকিয়াই তাঁহার সেবা করে।"

আরও দেখুন—

"বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ।
নির্দুঃখানন্দভুগ্‌নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে॥
মুক্তানাঞ্চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকাধিপতিস্তথা।
তদ্বশা এব তে সর্ব্বে সর্ব্বদৈব স ঈশ্বরঃ॥"

"মনুষ্য সেই সর্ব্বগুণে পূর্ণ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ জানিয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, মুক্তিলাভের পর সর্ব্বতোভাবে দুঃখসম্পর্করহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া নিত্যকাল সেই ভগবানের সাহায্যে আমোদে কালযাপন করে। সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মুক্ত পুরুষদিগের উপাস্য এবং অধিপতি, মুক্তগণ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াই অবস্থান করে, তিনি সর্ব্বদাই সকলের প্রভু স্বরূপে বিরাজ করেন।"

এই শেষোক্ত শ্লোক দুইটী দ্বারা বৈষ্ণবদিগের মুক্তির স্বরূপ অনেকটা পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল এবং আরও বুঝা গেল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাঙ্গালী ভক্ত রামপ্রসাদের মত—চিনি খাইতেই ভালবাসিতেন, চিনি হইতে ভাল বাসিতেন না।

বৈষ্ণবদিগের এই মতের প্রচার আরম্ভ হইলে কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির এই মত

রুচিকর হইল না। তাহারা বলিল, এ কি, তোমাদের মতে "মুক্ত" এই কথাটীতে সম্পূর্ণ "বদতো ব্যাঘাত" দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে। দেখ, তোমরা যাহাদিগকে মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, তাহাদিগকেই আবার সর্ব্বদা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় এ কথাও বলিতেছ, "মুক্ত" বলিলে আমরা সকলেইত "যাহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখই নষ্ট হইয়াছে, কোন প্রকার বন্ধন নাই" এইরূপ জীবেরই বোধ করি, যাহাকে সর্ব্বদা একজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়, যাহার পরাধীনতার জন্য দুঃখের ক্ষণমাত্র বিরাম নাই, পরতন্ত্রতার বন্ধন যাহাকে সর্ব্বাঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে আবার কি প্রকারে মুক্ত বলা যায়?

যদি অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য বা শক্তি না রহিল, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মন যোগাইয়াই চলিতে হইল, তবে আর সে মুক্ত হইল কিরূপে? তথাবিধ পরাধীন ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকেও যদি "মুক্ত" বলিতে চাও, তবে আমাদের মত সংসারী ব্যক্তিকেও মুক্ত বল না কেন? আমরাওত অনেক সময় আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। আমরাত ইহাই জানি—

"মুক্তাত্মনশ্চ পরমেশ্বরগুণসম্বন্ধিনঃ পুরুষত্বে সতি সমস্তদুঃখবীজবিধুরত্বাৎ পরমেশ্বরবৎ।"

অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য বা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, মুক্তাত্মারাও সেই সেই গুণের আশ্রয় হইয়া থাকে, এবং তাহাদের চৈতন্যবত্ত্বরূপ ধর্ম্মও আছে, অথচ কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রেরও অনুভব নাই, এক কথায় বলিতে হইলে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে পরমেশ্বরের মতই হইয়া পড়ে, তা না হইলেই বা তাহারা আবার "মুক্ত" কিসে? এই প্রকার যুক্তি দ্বারা তাঁহারা বৈষ্ণব মতের খণ্ডনপূর্ব্বক এই পাশুপত মতের সংস্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, সময়ের অল্পতা হেতু আমরা এ বিষয় সম্বন্ধে কোন অপর গ্রন্থ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই, কেবল মাধবাচার্য্যের উক্তিরই যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছি।

যাহা হউক এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, "পাশুপত" এই কথাটীত "পশুপতি" শব্দ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলেই ইহার যৌগিক অর্থ হইল পশুপতি-সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ পশুপতির উপাসনা-বিষয়ক শাস্ত্র। এ পশুপতি কে? তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতিই বা কি প্রকার এবং সেই উপাসনা দ্বারাই বা কীদৃশী মুক্তি লাভ ঘটে? এই তিনটী প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

(১) পশুপতি কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ "পশুপতি" বলিলে সেই কৈলাসাধীশ্বর মহেশ্বরকেই বুঝিয়া থাকে, অথবা কেবল সাধারণ লোক কেন, মহাকবি ভগবান্ শ্রীকালিদাসের "পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ" "পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাৎ"—এই সকল কবিতা দেখিয়া তিনিও যে পশুপতি শব্দটীকে একমাত্র সেই মহেশ্বরের বাচক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ত বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার দেখ, বটুকভৈরব স্তোত্রে মহাদেবের যে অষ্টোত্তর শত নাম কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পশুপতি এই নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—"ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।" এই সকল দেখিয়া আমরা "পাশুপত-দর্শন" এই শব্দটীর শৈব-সম্প্রদায়-বিশেষের উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র এইরূপ অর্থেরই বোধ করিতেছি। যদিও মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে পশুপতি শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে—"পশু শব্দের অর্থ জাগতিক জন্য রূপ সমুদয় কার্য্য, এবং

পতি শব্দের অর্থ ঐ সমস্ত কার্য্যের কারণ, তা হইলেই পশুপতি শব্দের অর্থ হইল—সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি এবং পালনের কারণীভূত পরমেশ্বর।" যদিও সচরাচর আমরা মহেশ্বরকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, কিন্তু অনেক শাস্ত্রে একমাত্র তাঁহাকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কুমার সম্ভবের ষষ্ঠ স্বর্গে সপ্তর্ষি-কৃত মহাদেবের স্তব হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা।
প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে॥
কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ কতম এষ তে॥"

কাজে কাজেই পশুপতি শব্দের দ্বারা মহাদেবকেই যে অভিপ্রেত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এই শাস্ত্রেই পাশুপত ব্রতের যে ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে, পাশুপত দর্শন যে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র, ইহা বুঝিতে আর বাকি থাকে না। আমরা সেই ব্রতের কথা একটু পরেই বলিব। এক্ষণে আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ভাল, "পাশুপত দর্শন" শব্দটীর যে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্ররূপ অর্থ, ইহা এক প্রকার বুঝিলাম, কিন্তু "নকুলীশ" শব্দটী উহার পূর্ব্বে যোগ করা হইয়াছে কেন? এবং উহা দ্বারাই বা কীদৃশ বিশেষ অর্থের সূচনা করা হইয়াছে? ইহার উত্তরে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহ শিবের পর্য্যায়ের মধ্যে নকুলীশ শব্দটীর সন্নিবেশ করিয়াছেন, যথা—"নকুলীশঃ পশুপতিঃ" (অমরকোষ—স্বর্গবর্গ); তন্ত্রসারে শিবপূজা প্রকরণে "নকুলীশ" এই কথাটী মহাদেবেরই অভিধায়করূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—"প্রাণাত্ম নকুলীশলক্ষ্মীভ্যাম্," এবং ঐ প্রকরণেই দেখিতে পাওয়া যায় নকুলী একজন রুদ্র, যথা—"শ্বেতঃ ভৃগ্বীশঃ নকুলী শিবঃ সম্বর্ত্তকস্তথা। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতাঃ ধৃতশূলকপালকাঃ।" বাচস্পত্যাভিধানে নকুলীশ এই কথাটীকে ভৈরব বিশেষের নামরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার স্বরূপ এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ঃ বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রভাক্।" এই সকল প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া, "নকুলীশ"ও যে মহাদেবের একটী নামান্তর, ইহা এক প্রকার প্রতীত হইতেছে। কাজেই "নকুলীশ পাশুপত দর্শন" এই সমস্ত পদটীর নকুলীশ কর্ত্তৃক উক্ত পাশুপত দর্শন এইরূপ অর্থই ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়। তাহলে সাক্ষাৎ মহাদেবই যে এই মতের প্রবর্ত্তক এই প্রকার অনুমান করাও অযৌক্তিক হইবে না। স্বয়ং নকুলীশই যে এই মতের প্রবর্ত্তক, ইহা মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—"তদুক্তং ভগবতা নকুলীশেন, ভস্মনা ত্রিষবণং স্নায়ীত, ভস্মনি শয়ীতেতি"—এই বাক্য দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অথবা কেবল এই বাক্য বলিয়া নয়, মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য পাশুপত দর্শনের যে প্রথম সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইহাতেও এই শাস্ত্রটী যে স্বয়ং পশুপতি কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে নির্ণীত হইতেছে, কেননা এই সূত্রস্থিত "পশুপতেঃ" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ দ্বারা শাস্ত্রকর্ত্তারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা না হইলে, "অথাতঃ পাশুপতযোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—এইরূপ সূত্র করিলেই চলিত, উহাতে "পশুপতেঃ" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপ নিরর্থকই হইত।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, এই পাশুপত দর্শন শৈব সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র এবং ঐ

শাস্ত্রের আদি কর্ত্তা স্বয়ং পশুপতি বা মহাদেব। ইহা যে একটী শৈব সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্র, তাহা মাধবাচার্য্যের—"কেবল মাহেশ্বরাঃ পরমপুরুষার্থসাধনপঞ্চার্থপ্রপঞ্চনপরং পাশুপত শাস্ত্রমাশ্রয়ন্তে"—এই লিখনভঙ্গী দ্বারাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এক্ষণে পাশুপত মতের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য মাধবাচার্য্য এই প্রথম সূত্রটীকে উদ্ধৃত করিয়া উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, এবং আশা করি তাহাতেই আমরা সম্পূর্ণভাবে না হই, অনেকটা কৃতকার্য্য হইব। শ্রোতৃবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ এস্থানে পুনর্ব্বার সূত্রটী উদ্ধৃত করিলাম।

"অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিং
ব্যাখ্যাস্যামঃ॥"

এই সূত্রে যে "অথ" শব্দটি আছে, তাহার অর্থ গুরুর প্রতি শিষ্য-জিজ্ঞাসার অনন্তর, গুরুর নিকট শিষ্যের, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের কি উপায়ে অবসান হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন, পশুপতির পাশুপত যোগ বিধির ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর, ইহা উক্ত ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের প্রধান উপায়। পশু শব্দের অর্থ কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ, কারণ, পশুর মত সৃষ্ট পদার্থ সকল সর্ব্বদা পরাধীন বলিয়া উহাকে পশু নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই কার্য্যরূপ পশুও আবার তিন প্রকার, যথা বিদ্যা, কলা এবং পশু। উহাদের মধ্যে বিদ্যা, বোধ এবং অবোধভেদে দুই প্রকার, এই বোধের আবার বিবেক প্রবৃত্তি এবং অবিবেক প্রবৃত্তি নামে দুইটী ভেদ আছে। বিবেক প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ চিত্ত, কারণ চিত্ত দ্বারাই সমুদয় প্রাণী বাহ্য পদার্থ প্রকাশ সহিত সম্বন্ধ—সামান্যতর বিবেচিত এবং অবিবেচিত যাবৎ পদার্থের বোধ করিয়া থাকে। অবোধরূপা বিদ্যাও ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপা, যাহা শাস্ত্র বলিয়া বিখ্যাত। কলা প্রথমতঃ দ্বিবিধ, কার্য্য এবং কারণ। তন্মধ্যে ১ম কার্য্য দশ প্রকার—পৃথিবী আদি পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, এবং রূপ আদি পঞ্চ গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। ২য় কারণ ত্রয়োদশ প্রকার,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, কর্ণ; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—মুখ, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ, এই দশ, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটী অন্তঃকরণ; যদিও অন্তঃকরণ একই, তথাপি অধ্যবসায়, অভিমান এবং সংকল্প এই তিনটী বিভিন্নরূপ কার্য্য নিবন্ধন উহা সচরাচর তিন প্রকার বলিয়াই পরিগণিত হয়। পশুত্ব ধর্ম্মবিশিষ্টকেই পশু বলা হয়, এই পশুও আবার দুই প্রকার—সাঞ্জন এবং নিরঞ্জন। ইহার মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্তকে সাঞ্জন বলা হয় এবং তাদৃশ সম্বন্ধ শূন্যকে নিরঞ্জন বলা হয়।

এই পশুত্বের মূল মিথ্যাজ্ঞানাদি আত্মাশ্রিত পঞ্চবিধ দুষ্টভাব। যথা—

"মিথ্যাজ্ঞানমধর্ম্মশ্চ সক্তির্হেতুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবিক্তিতঃ॥"

"মিথ্যা জ্ঞান, অধর্ম্ম, আসক্তি, হেতু এবং চ্যুতি অর্থাৎ সৎপথভ্রংশ এই পাঁচটী শাস্ত্রে পশুত্বের মূলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিবেক দ্বারা ইহাদের উচ্ছেদ করিতে হয়।"

উল্লিখিত সকল প্রকার পশুর সৃষ্টি-স্থিতি এবং পালনকারী কারণকেই "পশুপতি" বলা হয়। তিনি যদিও একই, তথাপি গুণ কর্ম্মভেদে তাঁহারও "পতি" এবং "আত্ম" ইত্যাদি নানা ভেদ উক্ত হইয়াছে। "পতি" শব্দের অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃক্ এবং ক্রিয়া-শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধী। দৃক্ শক্তি পাঁচ প্রকার, যথা—দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব। চাক্ষুষ জ্ঞানের নাম

দর্শন। সমুদয় শব্দ জ্ঞানের নাম শ্রবণ। সর্ব্বপ্রকার চিন্তাবিষয়ক জ্ঞানের নাম মনন। অশেষ শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান; এবং উক্তানুক্ত যাবদ্ বিষয়ের সংক্ষেপ বিস্তার এরূপ জ্ঞানের নাম সর্ব্বজ্ঞত্ব। ক্রিয়া শক্তিও তিন প্রকার, মনোযোগিত্ব, কামরূপিত্ব এবং বিক্রমধর্ম্মিত্ব। এইরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিই পতি, যিনি জগতের যাবৎ পদার্থবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ইচ্ছানুসারে সকল প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। "আত্ম" শব্দের অর্থ অনাগন্তুক অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই পশুপতিই জগতের কারণীভূত ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। পশুপতি সম্বন্ধীয়ের নামই পাশুপত। যোগ শব্দের অর্থ—চিত্ত দ্বারা জীবাত্মার সহিত উক্তস্বরূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধ। ইহা আবার দুই প্রকার, প্রথম ক্রিয়াস্বরূপ, দ্বিতীয় ক্রিয়ার উপরমস্বরূপ। জপ এবং ধ্যানাদিকে ক্রিয়া যোগ বলা যায় এবং সংবিৎ ও গতি প্রভৃতিকে ক্রিয়ার উপরম যোগ বলা হয়। ধর্ম্মার্থের সাধক ব্যাপার বিশেষের নাম বিধি। এই বিধি দুই প্রকার, প্রধান বিধি এবং গুণ বিধি। সাক্ষাৎধর্ম্মহেতুকে প্রধান বিধি বলে। এই প্রধান বিধিও দুই প্রকার,—ব্রত এবং দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্নান, ভস্মোপরি শয়ন, উপহার, জপ এবং প্রদক্ষিণ ইহারা ব্রত নামে অভিহিত হয়। ইহার মধ্যে উপহার শব্দের অর্থ নিয়ম, উহার ছয়টী অঙ্গ—যথা হসিত অর্থাৎ গলদেশ ও ওষ্ঠ বাজাইয়া হাহা করিয়া উচ্চ হাস্য,—গীত,—নৃত্য,—হুডুক্কার অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর সংযোগে বৃষনাদ সদৃশ শব্দ,—নমস্কার এবং জপ। দ্বারও ছয়টি, যথা—ক্রাথন,—স্পন্দন,—মন্দন,—শৃঙ্গারণ,—অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণ। ইহাদের মধ্যে অসুপ্ত ব্যক্তির সুপ্তের ন্যায় চিহ্ন দেখানকে ক্রাথন বলা হয়। গাত্রে শীতল বাতাস লাগিলে যেরূপ শরীরে কম্প হয়, শুধু শুধু সেইরূপ শরীর কাঁপানকে স্পন্দন কহে। পায় আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ গতি হয়, শুধু শুধু সেরূপ গমনকে মন্দন কহে। কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া মিছামিছি বাহ্য কামভাব প্রকাশনের নাম শৃঙ্গারণ। কার্য্যাকার্য্য বিবেকবিহীনের ন্যায় লোক-নিন্দিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ কহে। এবং উন্মত্তের মত নিরর্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ বলা হয়। এই সকল লইয়া প্রধান বিধি। অনুস্নান ও নির্ম্মাল্য ধারণকে গুণবিধি বলা হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ ও বিধি অনুশীলন দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিলে, কেবল যে দুঃখের অন্ত হয় তাহা নহে, সেই পরমৈশ্বর্য্যের প্রাপ্তিও হয়। বৈষ্ণবদিগের ন্যায় এই মতাবলম্বিগণও স্বীকার করেন যে, মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরে লীন না হইয়া পৃথক্‌ভাবেই ঈশ্বরের সমীপে বাস করেন। তবে উভয় মতের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, বৈষ্ণবদিগের মতে মুক্তগণ দাস্যাদি ভাবে পরমেশ্বরের অধীন, আর পাশুপতদিগের মতে মুক্তগণ ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সমকক্ষভাবে অবস্থান করেন। বৈষ্ণব মতের সহিত এই পাশুপত মতের আর একটু পার্থক্য এই যে, প্রথম মতে ঈশ্বর জগতের কারণ বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ কারণ নহেন অর্থাৎ তিনি অদৃষ্টাদির সাহায্য ব্যতীত স্বকীয় ইচ্ছানুসারে জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ হন না, কিন্তু শেষোক্ত মতে ঈশ্বর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই স্বয়ং জগন্নির্ম্মাণে সমর্থ।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে পাশুপত ব্রতের কথা বলিলাম, তাহাতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পাশুপত দর্শন একটী শৈবসম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্র। ত্রিসন্ধ্যা শরীরে ভস্ম লেপন,—ভস্মোপরি শয়ন, শৈব ভিন্ন আর কোন

সম্প্রদায়েই এরূপ আচার লক্ষিত হয় না, কারণ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই শৈবগণই ভস্মকে আপনাদের একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অবধূত নামে প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসীদিগের আচারের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের এ সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইবে। তাহার পর পূজা করিতে করিতে উচ্চহাস্য—গালবাদ্য প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল প্রধানতঃ শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। এই সকল কারণেই পাশুপত দর্শনকে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই পাশুপত মত যে মহাকবি বাণভট্টের সময় খুবই প্রচলিত ছিল তাহা তাঁহার কাদম্বরী এবং হর্ষচরিত পাঠে বেশ বুঝা যায়। কাদম্বরীতে কাদম্বরীর অন্তঃপুর বর্ণনা প্রসঙ্গে পাশুপত ব্রতধারিণীদিগের স্বরূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"ধবলভস্মললাটিকাভি-রোক্ষমালিকাপরিবর্ত্তন-প্রচলৎকরতলাভিঃ পাশুপতব্রতধারিণীভিঃ" ইত্যাদি।

ইহাতেও পাশুপত ব্রতধারিণীদিগের শৈব লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে এই পাশুপত মতের সহিত বৈষ্ণব মতের তুলনা করিয়া, বিশেষত্ব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা আর একটু বিশদভাবে বলিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৌল সম্প্রদায়ের মতে যেমন মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন এবং মুদ্রা এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার ধর্ম্মাচরণের একটী অঙ্গ, এবং নানক সম্প্রদায়ের মতে যেমন কেশ, কাংগি (চিরুণ), কাচু (চোরা), কড়া (বলয়) এবং কচ্ছ (জাঙি) এই পাঁচটী ককারাদির ব্যবহার ধর্ম্মাচরণের পক্ষে অপরিহার্য্য, সেইরূপ এই পাশুপত ধর্ম্মেও আট প্রকার বর্গের মৌলিকতা স্বীকার করা হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেকেই পঞ্চ সংখ্যক, সেই প্রধান আটটী বর্গ যথা—

"লাভা মলা উপায়াশ্চ দেশাবস্থা বিশুদ্ধয়ঃ।
দীক্ষাকারিবলান্যষ্টৌ পঞ্চকান্ত্রীণি বৃত্তয়ঃ॥"

(১) লাভ, (২) মল, (৩) উপায়, (৪) দেশ, (৫) অবস্থা, (৬) বিশুদ্ধি, (৭) দীক্ষাকারী, এবং (৮) বল, এই আট প্রকার বর্গ, এবং তিন প্রকার বৃত্তিই এই মতের মূলতত্ত্ব।

(১) উপায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম "লাভ"। এই লাভ (১) জ্ঞান, (২) তপঃ, (৩) দেবতার নিত্যত্ব, (৪) স্থিতি, (৫) শুদ্ধি, এই পাঁচ প্রকার।

(২) আত্মাশ্রিত দুষ্ট ভাবকেই "মল" বলা হয়। এই মলও (১) মিথ্যাজ্ঞান, (২) অধর্ম্ম, (৩) আসক্তি, (৪) হেতু, এবং (৫) চ্যুতি, এই পাঁচ প্রকার।

(৩) সাধকগণের শুদ্ধির কারণই "উপায়" নামে অভিহিত হইয়াছে। (১) বাসচর্য্যা, (২) জপ, (৩) ধ্যান, (৪) সর্ব্বদা রুদ্রস্মরণ, (৫) প্রতিপত্তি, এই পাঁচটী, উপায়ের ভেদ।

(৪) (১) গুরু, (২) জন, (৩) গুহ্য দেশ, (৪) শ্মশান, এবং (৫) রুদ্র, এই পাঁচটী "দেশ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৫) অবস্থা বলিতে যে পর্য্যন্ত লাভ প্রাপ্তি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত যে ভাবে অবস্থান করা হয়, উহার এক একটী ভাবের নাম "অবস্থা"; উহাও (১) ব্যক্তা, (২) অব্যক্তা, (৩) জপ, (৪) আদান ও (৫) নিষ্ঠা, এই পাঁচ প্রকার।

(৬) মিথ্যা জ্ঞানাদির সর্ব্বতোভাবে ব্যপগমের নাম "শুদ্ধি"। এই শুদ্ধি আবার (১) অজ্ঞানের হানি, (২) অসৎ সঙ্গের হানি, (৩) আসঙ্গজনক বস্তুর হানি, (৪) চ্যুতির হানি, এবং (৫) পশুত্বের হানি, এই পাঁচ প্রকার।

(৭) (১) দ্রব্য, (২) কাল, (৩) ক্রিয়া, (৪) মূর্ত্তি, ও (৫) গুরু, এই পাঁচটীকে "দীক্ষাকারী" বলা হয়। এবং—

(৮) (১) গুরুভক্তি, (২) বুদ্ধির প্রসন্নতা, (৩) দ্বন্দ্ব (সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণাদি) পদার্থকে আপনার বশে আনয়ন, (৪) ধর্ম্ম এবং (৫) অবসাদ, এই পাঁচটী "বল"। "বৃত্তি" শব্দের অর্থ—মান ও অপমানের বোধ যাহাতে না হয় এইরূপ একটা অন্নোপার্জ্জনের উপায়, উহা তিন প্রকার, (১) ভিক্ষা, (২) পরিত্যক্ত বস্তু কুড়াইয়া লওয়া এবং (৩) যথালব্ধ বস্তুর গ্রহণ। এই কয়টী পাশুপত ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব।

এখানে একটী কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিব না। উপরি উক্ত প্রত্যেকে পঞ্চ সঙ্খ্যক অষ্ট বর্গ দর্শন করিয়া মনে হইতেছে যে, আর্য্য জাতির পঞ্চ সংখ্যাটা কিছু অধিক প্রিয় ছিল, কেননা তাঁহারা যতদূর পারিয়াছেন পঞ্চসংখ্যা দিয়াই পদার্থের বিভাগ করিয়াছেন। যেমন পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চাস্ত্র, পঞ্চাগ্নি, পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি। অধিক আর কি বলিব, পরাশর যে সকল আপৎকালে রমণীদিগের পত্যন্তর গ্রহণের বিধান করিয়াছেন তাহাদিগকেও পঞ্চসংখ্যা দ্বারাই নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর বৌদ্ধদিগের পঞ্চস্কন্ধ যোগশাস্ত্রের পঞ্চক্লেশ, পঞ্চবৃত্তি প্রভৃতির প্রত্যেকের কথা বলিতে গেলে বোধ হয় অদ্যকার সমস্ত রাত্রে শেষ হয় কিনা সন্দেহ।

আমরা উপরে যাহা ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে পাশুপত দর্শন বা শাস্ত্র যে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্র ইহা এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, ইহা সাধারণ শৈব শাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বরূপ, এবং বিভিন্ন বলিয়াই মাধবাচার্য্য শৈব দর্শন নাম দিয়া একটী স্বতন্ত্র মতের আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার অনেক স্থানে পাগল নাথ নামক শিবের মঠের কথা শুনা যায় বোধ হয়, এবং পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে স্থানে স্থানে পাগলের মত ব্যবহারকারী এক প্রকার সন্ন্যাসীও বিচরণ করিতে দেখা যায়, বোধ হয় ইহারাই উক্ত পাশুপত মতের ভগ্নাবশেষ স্বরূপ। যাহা হউক এক্ষণে সাধারণ শৈব সম্বন্ধে দুই একটী স্থূল কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

সাধারণ শৈব সম্প্রদায়ের মতে পরমেশ্বরকে নিরপেক্ষ কারণ বলিলে তাঁহাতে অবশ্যই বৈষম্যকারিতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি দোষের সদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়, নতুবা এই জগতের সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৈচিত্রের মীমাংসা করা যায় না, তাঁহার বৈষম্যকারিতাদি দোষ ঘুচাইতে হইলে তাঁহাকে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে চলিবে না। তাঁহাদের শাস্ত্রকে সাধারণতঃ তিনটী প্রধান পদার্থ এবং চারটী পাদমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

"ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরুঃ।
সূত্রৈরেভিঃ সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনঃ॥"

এই ত্রিপদার্থ এবং চতুষ্পাদমূলক মহাতন্ত্রকে জগদ্গুরু মহাদেব প্রথমে তিনটী সূত্র দ্বারা সংক্ষেপে বলিয়া পুনর্ব্বার বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সেই তিনটী পদার্থ—পতি, পশু এবং পাশ। এবং বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা এই চারিটী পাদ। ইহাদের মধ্যে পতি শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ শিব, পশু পদার্থ জীবাত্মারই বাচক, পাশ চারি প্রকার, সংসার বন্ধনের হেতু, উহাও চারি প্রকার, মন, কর্ম্ম, মায়া, বোধ শক্তি। বিদ্যা শব্দের অর্থ পশু, পাশ এবং ঈশ্বর। ইহাদের

স্বরূপ নির্ণয়ের উপায়ভূত জ্ঞান, ক্রিয়া শব্দের অর্থ, অনেকবিধ সাঙ্গ দীক্ষা বিধিপ্রদর্শক কর্ম্ম, যোগ শব্দ অভিমত প্রাপ্তিরূপ অর্থের বাচক, এবং চর্য্যা শব্দের অর্থ বিহিতাচরণ ও নিষিদ্ধ বর্জ্জন, এই কয়টী তত্ত্ব প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াই শৈব দর্শন রচিত হইয়াছে। পরে এই শৈব দর্শন বিষয়েও বিশেষরূপ বিবৃতি করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই আজ আমি এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিলাম না। যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, তাহাতে পাশুপত দর্শন যে সাধারণ শৈব দর্শন হইতে বিভিন্ন, ইহা এক প্রকার সূচিত করা হইল। এইখানেই আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার হইল। ইহা হইতে শ্রোতৃবৃন্দের কিছু লাভ হইল কিনা, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন, তবে আমার এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিতে আসিয়া তাঁহাদের অমূল্য সময়ের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সেইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিনয়সহকারে ভূয়োভূয়ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—

"——অত্র গব্যন্তু জীবনীয়ং রসায়নম্
ক্ষতক্ষীণহিতং সেব্যং বল্যং স্তন্য করং সবম্॥"

তাৎপর্য্যার্থ:—নানাপ্রকার দুগ্ধের মধ্যে গো দুগ্ধ জীবনীয়, রসায়ন ক্ষতজনিত ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী; পবিত্র, বলকারক, স্তন্যকর (দুগ্ধবৃদ্ধিকর) এবং সারক।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে;—

"গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নম্।
রক্তপিত্তহরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
জীবনীয়ং তথা বাতপিত্তঘ্নং পরমং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ—গোদুগ্ধ অনভিষ্যন্দী (কফ নিবারক), স্নিগ্ধ গুরু রসায়ন, রক্তপিত্ত নাশক, শীতল মধুর রস এবং মধুর বিপাক,* জীবনীয় এবং অতিশয় রক্তপিত্ত নাশক।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে—

"পথ্যং রসায়নং বল্যং হৃদ্যং মেধ্যং গবাং পয়ঃ।
আয়ুষ্যং পুংস্ত্বকৃদ্ বাতরক্তপিত্তবিকারহৃৎ॥
গব্যং ক্ষীরং পথ্যমত্যন্ত রুচ্যং,
স্বাদু স্নিগ্ধং বাত পিত্তাময়ঘ্নং।
কান্তি প্রজ্ঞা বুদ্ধি মেধাঙ্গপুষ্টিং,
ধত্তে স্পষ্টং বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে॥"

তাৎপর্য্যার্থ—গো-দুগ্ধ পথ্য (হিতজনক) বলকারক, হৃদ্য (তৃপ্তিজনক), মেধ্য (পবিত্র), আয়ুবর্দ্ধক, পুরুষত্বকারক, বায়ু ও রক্তপিত্ত বিকার নাশক। গো-দুগ্ধ পথ্য, অত্যন্ত রুচিকারক, স্বাদু, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্ত-রোগ-নিবারক, কান্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি মেধা ও অঙ্গ পুষ্টিকারক, ইহা স্পষ্টভাবে বীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

* বিপাক—দ্রব্য ভক্ষণানন্তরং পাকে সতি—
মাধুর্য্যাদি পরিণামো। জঠরাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরং "রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ" মিষ্টঃ কটুশ্চ মধুরং অম্লোষ্ণে পচ্যতে রসঃ কটু তিক্ত কষায়ানাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ। মধুরবিপাকস্য শ্লেষ্মাকারিতা অম্লপাকস্য পিত্তকারিতা, বাত শ্লেষ্ম রোগঘ্নতা, কটুপাকস্য বাত কফ পিত্ত-নাশিতা চ।

অত্রি সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"গব্যং পবিত্রঞ্চ রসায়নঞ্চ
পথ্যঞ্চ হৃদ্যং বল পুষ্টিদং স্যাৎ।
আয়ুঃপ্রদং রক্ত বিকার পিত্ত
ত্রিদোষ হৃদ্রোগ বিষাপহং স্যাৎ॥"

বঙ্গার্থ—গোদুগ্ধ, পবিত্র, রসায়ন, পথ্য, হৃদ্য, বল ও পুষ্টিকারক, আয়ুবর্দ্ধক, রক্ত-বিকার, পিত্ত ও ত্রিদোষ নাশক এবং ইহা হৃদ্রোগ ও বিষনাশক।

(৬)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত মাহিষ দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্তঃ—

"মহিষাণাং-গুরুতরং গব্যাচ্ছীততরং পয়ঃ।
স্নেহানূন মনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥"

মহিষদুগ্ধ গব্যাপেক্ষা অধিক গুরু ও শীতল এবং অধিক স্নেহযুক্ত (নবনীত বিশিষ্ট), অনিদ্রা এবং অত্যগ্নিতে ইহা হিতজনক।

ভাবপ্রকাশোক্তঃ—

"মাহিষ্যং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥"

মহিষদুগ্ধ গো দুগ্ধাপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকর এবং গুরুপাক, ইহা নিদ্রাজনক অভিষ্যন্দী (কফবর্দ্ধক), ক্ষুধাধিক্যজনক এবং শীতল।

সুশ্রুতোক্তঃ—

"মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্নিনাশনং।
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎ স্নিগ্ধতরং পয়॥"

অর্থাৎ—মাহিষ দুগ্ধ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (কফবৃদ্ধিকারক), মধুর, অগ্নিনাশক (ক্ষুধা নিবারক) নিদ্রাকর, শীতল এবং গো দুগ্ধ হইতে অধিক স্নেহযুক্ত।

নির্ঘণ্টুক্তঃ—

"সৌম্যন্তু মাহিষং ক্ষীরং বিপাকে
শীতলং গুরু।
বলপুষ্টিপ্রদং বৃষ্যং পিত্ত দাহাস্র নাশনম্॥
শীতং স্নিগ্ধং গুরু সৌম্যং বৃষং
পিত্তাপহং পরং।
জ্ঞেয়াশ্চৈবম্বিধাস্তস্য কিলাটস্তু পয়শ্ছদং॥"

মাহিষ দুগ্ধ "সৌম্য" (মধুর)। ইহা বিপাকে (পরিপাক হইলে) শীতল, গুরু, বল ও পুষ্টিকারক, বৃষ্য (শুক্র বর্দ্ধক) পিত্ত দাহ ও রক্ত নাশক, এবং ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু এবং অত্যন্ত পিত্ত নাশক। মাহিষ দুগ্ধ-জাত কিলাট ও পয়শ্ছদ (সর) তদ্‌গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

মন্তব্য—মাহিষ দুগ্ধ গো দুগ্ধাপেক্ষা যে অধিক স্নেহযুক্ত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উৎকৃষ্ট ও খাঁটি গোদুগ্ধে ⁄০ এক হইতে ⁄১০ দেড় ছটাকের অধিক নবনীত (মাখন) হয় না; কিন্তু মাহিষ দুগ্ধে ⁄১০ হইতে ৵০ অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত মাখন উঠিয়া থাকে। কথিত আছে বিলাতী গাভীর দুগ্ধে প্রায় এক পাউণ্ড (অর্দ্ধ সের) মাখন হয়, ইহা কতদূর প্রকৃত বলা যায় না।

এতদ্দেশে দুই প্রকার মহিষ দেখা যায়; একজাতীয় বাঙ্গড় ও অপরটী কাছড় নামে কথিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কাছড়ের দুগ্ধেই অধিক নবনীত হইয়া থাকে। কাছড় মহিষগুলি অতি বৃহৎকায়, উগ্রপ্রকৃতি এবং প্রায় আরণ্য বলিলেও বলা যায়; ইহাদিগকে জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে ভিন্ন রাখা দুষ্কর। এতজ্জাতীয় মহিষ সুসঙ্গ, সেরপুর, শ্রীহট্ট ও আসাম প্রদেশের কোনও কোনও স্থানে প্রাপ্য; অন্যত্র কোথাও আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। বাঙ্গড় সর্ব্বত্রই সুলভ। এতদ্ব্যতীত হিসারী (পাঞ্জাবদেশীয়) মহিষগুলি দুগ্ধের জন্য বিখ্যাত। ইহারা ২০।২৫ সের কি তদপেক্ষাও অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। বাহুল্য বিবেচনায় মহিষ সম্বন্ধে আর কিছু বলা গেল না।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মহিষ দুগ্ধের বর্ণ এবং তজ্জাত নবনীত ও সরের বর্ণ গোদুগ্ধ ও তজ্জাত নবনীত ইত্যাদি হইতে অধিক শুভ্র এবং ইহার সর অতি পুরু হয়।

(৭)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ছাগী দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত—

"ছাগং কাষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি পয়োলঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্॥"

ছাগ দুগ্ধ কষায় রস বিশিষ্ট, মধুর, শীতল, গ্রাহি (মলরোধক), লঘু, রক্ত পিত্ত ও অতিসার নাশক এবং ক্ষয়কাস ও জ্বর নাশক।

ভাবপ্রকাশোক্ত—

"ছাগং কষায় মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্ত পিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্।"

এই অংশের অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ ইহা অবিকল চরকোক্ত মতের ন্যায়।

অপিচ:—

"অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটু তিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগহরং পয়ঃ॥"

ছাগ স্বভাবতঃ অল্পকায় (ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট) তদ্ধেতু এবং কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ও অল্প পরিমাণ জল পান হেতু ইহার দুগ্ধ সর্ব্বরোগনিবারক।

ছাগী দুগ্ধ সম্বন্ধে নিঘণ্টুক্ত মত অবিকল পূর্ব্বোক্তবৎ, অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

সুশ্রুতোক্ত :—

"গব্যতুল্যং গুণস্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতং।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাসকাসাস্রপিত্তনুৎ॥"

ছাগদুগ্ধ গোদুগ্ধের ন্যায় তুল্য গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা শোষ রোগে অত্যন্ত হিতজনক; ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, সংগ্রাহী (মলরোধক), শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত নাশক।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"অল্পাম্বুপান ব্যায়াম কটুতিক্তাশনৈর্লঘু।
আজঃ শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্তাতিসারজিৎ॥"

অর্থাৎ অল্প জল পান হেতু এবং ব্যায়ামশীলতা ও কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ছাগ দুগ্ধ শোষ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক।

অত্রিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"* * * * * *
* * * * ত্রিদোষঘ্নঞ্চ,
ক্ষীণাজদুগ্ধং গোদুগ্ধবীর্য্যাদধিক গুণং,
ক্ষীণদেহেষু পথ্যতমঞ্চ; স্থূলকায়াজ দুগ্ধং গুণৈঃ কিঞ্চিদূনম্।"

ছাগ দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক; ক্ষীণকায় ছাগ দুগ্ধ—গোদুগ্ধ বীর্য্য (দ্রব্যশক্তিকে বীর্য্য বলা যায়) অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট এবং ইহা ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে পথ্যতম (হিতজনক)। স্থূলকায় ছাগ-দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অল্প গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মন্তব্য—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, গো দুগ্ধাপেক্ষা ছাগ দুগ্ধে লবণাক্ত পদার্থ ও ছানার ভাগ অধিক; তথাপি হৃষ্ট পুষ্ট সুস্থ এবং যাহাদের পরিপাক-শক্তি প্রবল এবংবিধ বালকের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতজনক। যে ছাগীর দুগ্ধ ব্যবহার করাইতে হইবে তাহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিলে তাহার দুগ্ধ দুগ্ধগুণবিশিষ্ট হয়। কারণ ছাগ অতিশয় যথেচ্ছভোজী। অতএব তাহাকে বাঁধিয়া খাওয়ানই উচিত।

(৮)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নারী দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত—

"জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
লাবণং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চক্ষুশূলিনাম্॥"

নারী দুগ্ধ জীবন, হিত, বৃংহণ (বলকারক), সাত্ম্য (দেহানুকূল) ও স্নিগ্ধতাকারক। রক্তপিত্তে ইহার নস্য এবং চক্ষু শূলে ইহার তর্পণ (অঞ্জন) হিতজনক।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং
বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চোতনয়োর্ব্বরম্॥"

নারী দুগ্ধ লঘু, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত বিনাশক। ইহা চক্ষুশূল ও অভিঘাত নাশক এবং নস্য ও আশ্চোতনে (নেত্রাঞ্জনে) শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"মানুষং বাতপিত্তাস্রগভিঘাতাক্ষিরোগনুৎ।
তর্পণাশ্চোতনৈর্নস্যৈঃ * * * ॥"

নারী দুগ্ধের তর্পণ (নেত্রপূরণ) আশ্চোতন (অঞ্জন) ও নস্য দ্বারা বাত পিত্ত, রক্ত বিকার অভিঘাত এবং চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

নিঘণ্টুক্ত :—

"স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং চাপি চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষী পয়ঃ॥
নাশনং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চাক্ষিশূলহৃৎ।
মধুরং মানুষী ক্ষীরং কষায়ঞ্চ হিমং লঘু।
চক্ষুষ্যং দীপনং পথ্যং পাচনং রোচনঞ্চ তৎ॥"

অর্থাৎ—নারী দুগ্ধ স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর (দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক), চক্ষুষ্য (চক্ষের হিতকর), বলকারক, জীবন হিত, বৃংহন (শুক্রবর্দ্ধক), সাত্ম্য, স্নেহন (চাকচিক্য কারক), রক্তপিত্ত নাশক এবং ইহার তর্পণে চক্ষুশূল নাশ করে। নারী দুগ্ধ কষায়, হিম, লঘু, চক্ষুষ্য, দীপন (অগ্নিবর্দ্ধক), পথ্য (হিতকর), পাচন (পরিপাককারক) ও রুচিজনক।

যে সকল প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের ব্যবহার্য্য তৎসমস্তের বিষয়ই বলা হইল, অধুনা অশ্বিনী, গর্দ্দভী ও অন্যান্য এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী (অখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত প্রাণী) উষ্ট্রী, মেষী ও হস্তিনী দুগ্ধের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাদি ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল।

(৯)

অশ্ব, গর্দ্দভ ও অন্যান্য এক ক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধের গুণ।

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত)

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"বাড়মুষ্ণং ত্বৈকশফং লঘু, শাখাবাতহরং
জড়তাকরং
পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্বানং যুক্ত্যাশৃতমতোঽন্যথা।"

অশ্বাদি এক ক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধ অত্যন্ত উষ্ণ বীর্য্য, লঘু, শাখা-বাত (বাহু প্রভৃতির বাত), নাশক অম্ল লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট, জড়তাকারক ও অভিষ্যন্দী (কফকারক)। এ সমুদয় অপক্কাবস্থায় (কাঁচা অবস্থায়) গুরু কিন্তু উপযুক্তরূপে জাল দিয়া নিলে তাহার অন্যথা হয় (লঘু হয়)।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"রুক্ষোষ্ণং বড়বা ক্ষীরং বল্যং শোষানিলোপহং।
অম্লং কটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা॥"

অশ্ব দুগ্ধ বলকারক রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোষ ও বায়ুনাশক অম্ল ও কটু স্বাদবিশিষ্ট, লঘু ও স্বাদু। অন্যান্য এক ক্ষুরবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ এই প্রকার জানিবে।

নিঘণ্টুক্ত :—

"অশ্বক্ষীরং বৃষ্যাম্লং দীপনং লঘু।
দেহ স্থৈর্য্যকরং বল্যং গৌরবকান্তিকৃৎপয়ঃ।
শাখাবাতহরং সাম্লঞ্চ রুচি দীপ্তিকৃৎ॥"

অশ্বক্ষীর বৃষ্য (বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক), অম্লস্বাদযুক্ত, দীপন (অগ্নিবর্দ্ধক) লঘু, দেহের স্থৈর্য্যকারক, বল্য (বলকারক), গৌরব ও কান্তি বৃদ্ধিকর, শাখা বাতনাশক এবং রুচি ও দেহের দীপ্তিকারক।

নিঘণ্টুক্ত গর্দ্দভী দুগ্ধের গুণ :—

"কাসশ্বাসহরং ক্ষীরং গার্দ্দভং বালরোগনুৎ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥

বলরুদ্ গর্দ্দভীক্ষীরং বাতশ্বাসহরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং দীপনং পথ্যদং স্মৃতম্॥"

গর্দ্দভী দুগ্ধ কাস ও শ্বাস নাশক, ইহা বালরোগ (শিশুদের পীড়া) নাশক; মধুরাম্ল রস, রুক্ষ, লবণানুরস, গুরু, বলকারক, অত্যন্ত বায়ু ও শ্বাস নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পথ্যদ (হিতজনক) বলিয়া জানিবে।

সুশ্রুতোক্ত :—

"উষ্ট্রৈণেকশফং বল্যং শাখাবাতহরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥"

এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণিজ (অশ্বাদির) দুগ্ধ বলকারক, শাখা বাত নাশক, মধুরাম্ল ও লবণানুরস, রুক্ষ এবং লঘু।

(১০)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত উষ্ট্রী দুগ্ধের গুণ।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
কৃমিকুষ্ঠ কফানাহ শোথোদরহরং পয়ঃ॥"

ঔষ্ট্র দুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণ রস, অগ্নিবৃদ্ধিকর, এবং ইহা কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ রোগ) শোথ ও উদরী রোগ নিবারক।

চরকোক্ত :—

"রুক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীনামীষৎ সলবণং লঘু।
শাস্তং বাতকফান্নাহ কৃমিশোথোদরার্শসাম্॥"

উষ্ট্রী দুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ লবণ স্বাদযুক্ত, লঘু, বাত, কফ, আনাহ, কৃমি, শোথ, উদর ও অর্শরোগে প্রশস্ত।

নিঘণ্টুক্ত :—

"উষ্ট্রীক্ষীরং কুষ্ঠশোফহরং তৎপিত্তার্শঘ্নং
তৎকফাটোপহারি।
আনাহার্ত্তি জন্তু গুল্মোদরাণ্যাং শ্বাসোল্লাসং
নাশয়ত্যাশু পীতম্॥"

উষ্ট্রী দুগ্ধ কুষ্ঠ ও শোথ নাশক। ইহা কফ আটোপ (বাত জন্য উদর স্ফীতি), আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ) গুল্ম ও উদরী নাশক।

(১১)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত মেষী দুগ্ধের গুণ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"* * * অহৃদ্যং তৃষ্ণমাবিকম্
বাতব্যাধিহরং হিক্কা শ্বাস পিত্ত কফপ্রদম্॥"

মেষ দুগ্ধ অহৃদ্য (মুখ রুচিকারক নহে) ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বাতব্যাধি নাশক; হিক্কা, শ্বাস, পিত্ত ও কফ প্রদ।

নিঘণ্টুক্ত :—

"অবিকন্তু পয়ঃ স্নিগ্ধং কফপিত্তহরং পরং।
স্থৌল্যং মেহহরং পথ্যং লোমশং গুরুবৃদ্ধিদম্॥
ঔরভ্রং মধুরং স্নিগ্ধমুষ্ণং তিক্তং কফাপহং।
গুরু শুদ্ধানিলে পথ্যং শোফে চানিলে শোনিতে"

অর্থাৎ—মেষ দুগ্ধ স্নিগ্ধ, অত্যন্ত কফ ও পিত্ত নাশক, মেহ নাশক, পথ্য (হিতজনক), লোমশ (রোম বৃদ্ধিকর), গুরু এবং বৃদ্ধিদ (স্থূলতাকারক)।

ইহা (মেষ দুগ্ধ) মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত ও কফনাশক, গুরু এবং ইহা কেবল বায়ু রোগে এবং বায়ু ও রক্তজনিত শোফে হিতজনক।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"আবিকং লবণং লঘু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রনুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥"

মেষ দুগ্ধ লবণ স্বাদযুক্ত, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং অশ্মরী রোগ (পাথুরী Stone) নাশক, ইহা অহৃদ্য (রুচিকর নহে), তর্পণ (তৃপ্তিদায়ক), কেশ বৃদ্ধিকারক, শুক্র, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক এবং গুরু ও বায়ুজাত কাসরোগে এবং কেবল বায়ুরোগে শ্রেষ্ঠ।

(১২)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত হস্তিনী দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত :—

"হস্তিনীনাং পয়ো বল্যং গুরু স্থৈর্য্যকরং পরম্॥"

হস্তিনী দুগ্ধ বলকারক, গুরু ও অত্যন্ত স্থৈর্য্যকর (শরীরের দৃঢ়তাকারক)।

নিঘণ্টুক্তঃ—

"হস্তিন্যা মধুরং বৃষ্যং কষায়ানুরসং গুরু।
স্নিগ্ধং শীতকরঞ্চাপি চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ—হস্তিনীদুগ্ধ মধুর, বৃষ্য (শুক্র বর্দ্ধক) কষায়ানুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, চক্ষুষ্য ও বলবর্দ্ধক।

সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশোক্ত হস্তিনীদুগ্ধ গুণও উক্ত প্রকার কথিত হইয়াছে, অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

(১৩)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত আরণ্য মৃগী দুগ্ধের গুণ।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"মৃগীনাং জঙ্গলোত্থানামজাক্ষীরসমং পয়ঃ॥"

সমস্ত আরণ্য মৃগী দুগ্ধের গুণ ছাগ দুগ্ধের তুল্য (ছাগ দুগ্ধের গুণ দ্রষ্টব্য)।

মন্তব্য :—আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দুগ্ধের গুণাদি নাতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অবস্থা, কাল, দেশ ও পাত্রাদি ভেদে নানা প্রকার প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের পক্ষে হিতজনক হইলেও, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা গো দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ ও হিতজনক। বলা বাহুল্য যে, শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তদভাবে গো, ছাগ ও গর্দ্দভী দুগ্ধই তাহার পক্ষে পথ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই; এ বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কথিত হইয়াছে যে;—

"আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ"

আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধক এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থিরতা সম্পাদক, হৃদ্য (রুচিকর) আহারাদিই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, দুগ্ধ (বিশেষতঃ গো দুগ্ধ) এবং তজ্জাত পদার্থ নিচয়ই সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক প্রিয় আহার। গো জাতির অপরিসীম উপকারিতা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহার রক্ষা, পালন ও উন্নতিকল্পে বিবিধ সুনিয়ম প্রচারিত করিয়া গিয়াছিলেন; অধুনা সেগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আমরা ক্রমশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

(১৪)

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণাদির তারতম্য।

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণাদির অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, রক্তবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ তাহার আহার্য্য অতি সহজে জীর্ণ হয়। শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত (কাজলা) বর্ণের গাভীর দুগ্ধ নিকৃষ্ট এবং পরিমাণেও অল্প হইয়া থাকে; ইহাতে নবনীতের ভাগও কম থাকে। সরের ন্যায় (Creamy Colour) শুভ্রবর্ণা গাভীর যদি রোম মসৃণ হয় এবং তাহার চর্ম্ম ও ক্ষুর এবং কর্ণাভ্যন্তরভাগ হরিদ্রাভ হয় তবে সে অধিক দুগ্ধবতী হয়, এবং তাহার দুগ্ধে নবনীত ও ছানা ইত্যাদি অধিক থাকে। কেবল শ্বেত বর্ণা গাভীর দুগ্ধ ভাল নয় এবং তাহার দুগ্ধের পরিমাণও অল্প হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গাভীর বর্ণদ্বারা দুগ্ধের গুণাদি নিরূপিত হওয়া দুরূহ; তবে তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বিলাতী রক্তবর্ণা এবং ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ

উৎকৃষ্ট। এখন দেখা যাউক, এ বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণের মত কি? বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে তাঁহারা এতাদৃশ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা এবং গভীর অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারিগুণাধিকং।
সীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ।
শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্তা চিত্রাচ বাতহৃৎ॥"

কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক এবং অধিক গুণবিশিষ্ট (পাশ্চাত্য মতের সহিত এই মতের ঐক্য আছে); পীতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ পিত্তনাশক, শুক্লা গাভীর দুগ্ধ গুরু ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক (পাশ্চাত্য মতটীও এই মতের পোষক বলিয়াই বোধ হয়), রক্তবর্ণা ও চিত্রা (বিবিধ বর্ণ মিশ্রিত) গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক। চরকোক্ত মত "আহার্য্য পদার্থের সহিত গো দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ" শীর্ষক প্রবন্ধ (১৬শ প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য।

অত্রিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"অত্র শ্বেতা দুগ্ধং শ্লেষ্মাকরং রক্তায়া বাতলং
পীতায়াঃ পিত্তসংশমনং বিশিষ্টং কৃষ্ণায়াশ্চ
পিত্তলম্॥"

অর্থাৎ—(গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণ ভেদ হয়) তন্মধ্যে—শ্বেতবর্ণার দুগ্ধ শ্লেষ্মাকর, রক্তার বায়ু বর্দ্ধক, পীতবর্ণার পিত্ত নাশক এবং কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ বিশিষ্ট (বিশেষ গুণ বিশিষ্ট) এবং পিত্ত বর্দ্ধক।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে :—

"গবাং সিতানাং বাতঘ্নং কৃষ্ণানাং পিত্তনাশনম্
বাতঘ্নং রক্তবর্ণানাং ত্রীন্ হন্তি কপিলা পয়ঃ॥

পাঠান্তর :—

"বাতঘ্নং রক্তবর্ণানাং গোদুগ্ধঞ্চ ত্রিধা
ভবেৎ।"

শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতঘ্ন, কৃষ্ণার দুগ্ধ পিত্তনাশক, রক্তবর্ণার বাতঘ্ন এবং কপিলার দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক।

(পাঠান্তর :—গো দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক।)

আমাদের শাস্ত্রে একাদশ প্রকার কপিলার বিষয় কথিত হইয়াছে; যথা (১) সুবর্ণ কপিলা, (২) গৌর পিঙ্গলা, (৩) রক্তাক্ষী, (৪) গুড় পিঙ্গলা, (৫) বহুবর্ণা, (৬) শ্বেত পিঙ্গলা, (৭) শ্বেত পিঙ্গলাক্ষী, (৮) কৃষ্ণ পিঙ্গলা, (৯) পাটলা, (১০) পুচ্ছ পিঙ্গলা, (১১) ক্ষুর শ্বেতা। এই একাদশ প্রকার কপিলার প্রত্যেকের দুগ্ধে গুণাদির পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রে কপিলা গাভীর অত্যন্ত প্রশংসা ও তাহার দানাদিতে বিশেষ ফলাধিক্য কথিত হইয়াছে। কুতূহলী পাঠকবৃন্দ এ বিষয় শাস্ত্রোক্ত মত পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। অতএব এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা হইল না।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে :—

"বৎসৈকবর্ণয়োঃ শস্তং ধবলীকৃষ্ণয়োর্বাপি।"

ধবলী ও কৃষ্ণা গাভীর বৎসও যদি তত্তৎ বর্ণযুক্ত হয় (অর্থাৎ ধবলীর ধবল বৎস এবং কৃষ্ণার কৃষ্ণবর্ণ বৎস হয়) তবে তাহাদের দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত মত গুলির মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও, স্থূলতঃ প্রায় একই প্রকার। অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় গাভীর বর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বাবস্থায় সম্ভবপর নহে।

(১৫)

দেশ ও জাতিভেদে গো দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ।

দেশভেদে ও গাভীর জাতিভেদে দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণের অনেক পার্থক্য লক্ষিত

হয়; এক জাতীয় গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গাভীর মধ্যে (১) হিসারী (পাঞ্জাব দেশীয়), (২) কাটেবারী (গুজরাট ও কচ্ছ দেশীয়), (৩) মেলোরী (মান্দ্রাজ দেশীয়), (৪) গুরুগুরিয়া (মুলতান্ দেশীয়) এবং (৫) নাগোরী (নাগপুর ও মধ্য ভারতের) গাভী উৎকৃষ্ট; এ গুলির মধ্যে আবার "হিসারী ও কাটেবারী" গাভীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের এক একটী গাভী ৮০ তোলা পরিমাণ সেরের ১০ হইতে ১৫।১৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে; ইহাদের দুগ্ধ সুস্বাদু এবং সদ্গুণ বিশিষ্ট।

বিলাতী গাভী নানা জাতীয় তন্মধ্যে (1) Short horn, (2) Ayrshire, (3) Jersy, (4) Alserney, (5) Garensey, (6) Devon, (7) Kerry, (8) Devte kerry, (9) Welsh.—

এই কয়টীই উৎকৃষ্ট জাতীয়। ইহাদের এক একটী উৎকৃষ্ট গাভী ১৫।১৬ সের হইতে অর্দ্ধমণ কি ২৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। এ কথা আমাদের ধারণার অতীত হইতে পারে, কিন্তু ইহা অকাট্য সত্য। এই ভারত বর্ষেও এক সময়ে (যখন ইহা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর লীলা নিকেতন ছিল) দ্রোণদুগ্ধা (৩২ সের দুগ্ধ দাত্রী) গাভী বর্ত্তমান ছিল; "কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ" এই বঙ্গদেশে ৩২ সের দূরের কথা ৩২ তোলা দুগ্ধবতী গাভীই দুর্লভ বলা যায়। আমাদের দেশ এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; ক্রমশঃ অবস্থা আরও কত দূরে গিয়া দাঁড়াইবে কে বলিতে পারে। ভারতবর্ষের ন্যায় "সুজলা, সুফলা এবং শস্যশ্যামলা" দেশে চেষ্টা করিলে এখনও দ্রোণদুগ্ধা না হউক অন্ততঃ ২০।২২ সের দুগ্ধবতী গাভী উৎপন্ন হইতে পারে; "যত্নেন কিমসাধ্যম্", এ কথা মনে রাখিয়া গো-জাতির উন্নতি বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত গাভী অপেক্ষা শীত প্রধান দেশীয় গাভীর দুগ্ধে অধিক নবনীত ও ছানা থাকে।

নিম্নদেশ ও জলাকীর্ণ ভূমিতে বিচরণশীলা গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ অধিক ও নবনীত এবং শর্করার ভাগ কম থাকে। কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক ভূমি এবং পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বিচরণশীলা গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ কম থাকে এবং পূর্ব্ব কথিত উপাদানগুলি (নবনীত ও ছানা প্রভৃতি) অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

এ বিষয়ে ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে।

"জঙ্গালানূপশৈলানাং চরন্তীনাং যথোত্তরং।
পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে॥"

জঙ্গলাকীর্ণ, অনূপ (জল বহুল) স্থানে ও পার্ব্বত্য দেশে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ যথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ (আহারানুযায়ী) হইয়া থাকে।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে;—

"জঙ্গলানূপদেশেষু পারত্তীনাং যথোত্তরং।
পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথা চৈষাং বিবর্দ্ধতে॥"

এই শ্লোকটার তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই অনুরূপ, অতএব বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না।

"কৈশ্চিদুক্তো বিশেষাচ্চ বিশেষ দেশভেদতঃ"

উক্তঞ্চ—দেশেষু দেশেষু চ তেষু তেষু
তৃণাম্বুনী যাদৃশ দোষযুক্তে—তৎসেবনাদেব
গবাদিকানাং গুণাদি দুগ্ধাদিষু—
তাদৃশং মতম্—

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন দেশ ভেদে বিশেষতঃ দুগ্ধের বিশেষত্ব হয়; কথিত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তৃণ ও জলাদি যাদৃশ দোষযুক্ত, তাহা সেবনে গবাদির দুগ্ধে তাদৃশ গুণাদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আহার্য্য পদার্থের সহিত গো দুগ্ধের গুণাদির সম্বন্ধ বিচার।

স্তন্যপায়ী স্ত্রী জাতীয় প্রাণী সমূহের ভুক্ত পদার্থই পরিণামে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়; এ বিষয়ে সুশ্রুতোক্ত মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, তথাপি প্রসঙ্গাধীন এখানেও তাহা সন্নিবেশিত হইল।

"রস প্রসাদো মধুরঃ পঞ্চাহার নিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্য-
মিত্যভিধীয়তে॥"

অতএব আহার্য্য পদার্থের গুণভেদে গবাদির দুগ্ধের গুণবৈষম্য জন্মানই স্বাভাবিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়াও থাকে তাহাই। কথিত আছে, কাশ্মীর দেশীয় গাভী তদ্দেশ-জাত সুবিখ্যাত এবং সুগন্ধী কুঙ্কুমরেণু (জাফরান্) ভক্ষণ করিয়া যে দুগ্ধ দেয় তাহা তদ্ গন্ধ যুক্ত হয়। পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, শালগম্ প্রভৃতি উগ্রগন্ধী দ্রব্যাদি ভক্ষণে গো দুগ্ধ উগ্রগন্ধী হইয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ। সাধারণতঃ জলাভূমিতে বিচরণশীলা গাভীর দুগ্ধ তরল ও জলীয় স্বাদ বিশিষ্ট হয় এবং তাহাতে নবনীত ও শর্করার ভাগ কম থাকে, কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিতে যে সমুদয় গাভী চরিয়া বেড়ায় ও তৃণাদি ভক্ষণ করে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় ও সুস্বাদু হয় এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি সার পদার্থ অধিক থাকে। পরিষ্কার কাঁচা ঘাস খাইলে গাভীর দুগ্ধ সুস্বাদু হয় এবং দুগ্ধের বর্ণও পরিষ্কার হয়। তুলার বীজ আহারে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি অধিক হয়। গম, যব প্রভৃতির ভূষিতে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণাদি বৃদ্ধি হয়। সর্ষপ খোল অপেক্ষা তিসি ও তিলের খোলে দুগ্ধের স্বাদ ভাল হয় এবং তাহার পরিমাণ ও গুণাদিও বৃদ্ধি পায়, সর্ষপ খোলে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। মাষপর্ণী (মাষাণী) অথবা মাষ কলায়ের ডাল পাতা প্রভৃতি ও ইক্ষু (আক) খাইলে গো দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে এবং দুগ্ধের স্বাদ ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে;—

"ইক্ষ্বাদা মাষপর্ণ্যাদা ঊর্দ্ধশৃঙ্গী চ যা ভবেৎ।
তাসাং গবাং হিতং ক্ষীরম্——"

ইক্ষু ও মাষপর্ণ ভক্ষণশীলা ও ঊর্দ্ধশৃঙ্গী গাভীর দুগ্ধ হিতজনক। কচুর ডাঁটা জলে সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ লাল ও পাতলা হয়, নিম্ব গুলঞ্চ এবং বাবলার ফল খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়; নটেশাক খাওয়াইলে দুগ্ধ সুস্বাদু হয়।

এ বিষয়ে নির্ঘণ্টুক্ত মত পূর্ব্ব প্রস্তাবে (১৫শ প্রস্তাবে) উদ্ধৃত হইয়াছে;—অতএব এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

আরও কথিত হইয়াছে যে;—

"পিণ্যাকান্নাশিনীনাঞ্চ গুর্ব্বভিষ্যন্দি তদ্ ভূশম্।"

অর্থাৎ—পিণ্যাক (তিল কল্ক, তিলের খোল) এবং অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত গুরু ও অভিষ্যন্দী (কফ বর্দ্ধক) হয়।

রাজনিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে;—

"খল্বন্নভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফপ্রদং।
তত্তু বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কম্॥

অন্ন ভক্ষণজাত গো দুগ্ধ গুরু এবং কফ প্রদ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা বলকারক এবং অত্যন্ত বৃষ্য (শুক্র বর্দ্ধক) ও সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে গুণদায়ক।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে;—

"মাষপর্ণভৃতাং ধেনুং গুষ্টিং পুষ্টাং চতুস্তনীং।
সমানবর্ণবৎসাঞ্চ জীববৎসাঞ্চ বুদ্ধিমান্॥
রোহিণীমথবা কৃষ্ণামূর্দ্ধশৃঙ্গীং মদারুণাং।
ইক্ষ্বা মার্জ্জণাদাং বা সান্দ্রক্ষীরাঞ্চ ধাবয়েৎ॥
কেবলস্ত পয়স্তস্যাঃ শৃতং বাঽশৃতমেব বা।
শর্করা মধু সর্পির্ভির্যুক্তং তদ্ বৃষ্যমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাষপর্ণ ভক্ষণ কারিণী একবার মাত্র প্রসূতা (গৃষ্টি), পুষ্টা (সবল দেহ বিশিষ্টা) সমান বৎসবর্ণা (যে গাভীর বৎস মাতৃবর্ণ বিশিষ্ট), জীববৎসা (যাহার বৎস জীবিত আছে), রোহিণী (রক্ত বর্ণা) অথবা কৃষ্ণা, ঊর্দ্ধশৃঙ্গী অদারুণা (শান্ত স্বভাব বিশিষ্টা), ইক্ষু (আক) ও অর্জ্জুন বৃক্ষ ভক্ষণ কারিণী, সান্দ্রক্ষীরা (যাহার দুগ্ধ গাঢ়) গাভী পালন করিবেন। উপরোক্ত প্রকার গাভীর দুগ্ধ অন্য দ্রব্যাদি যোগ করিয়া অথবা শর্করা, মধু ও ঘৃত যুক্ত করিয়া শৃত (জ্বাল দেওয়া) বা অশৃত (ঠাণ্ডা) অবস্থায় পান করিলে তাহা অতিশয় বল-কারক হয়।

মন্তব্য:—ব্যাখ্যাত শ্লোকটী কেবল আহার্য্য পদার্থের গুণবিচারমূলক নহে, ইহাতে অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে, সে গুলি অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সম্পূর্ণভাবেই উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।

(১৭)

ঋতু ও কাল ভেদে দুগ্ধের গুণাদির তারতম্য বিচার।

বিভিন্ন ঋতুতে এবং প্রাতঃকালাদি সময় বিশেষে গো দুগ্ধের গুণাদির অনেক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশাখ মাস হইতে নব তৃণাদি আহারজনিত গো দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণাদি বৃদ্ধি হয়; এবং দুগ্ধ কিছু তরল হয়, বর্ষারম্ভে দুগ্ধের জলীয় ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নবনীত প্রভৃতি হ্রাস হয়। বর্ষা অন্তে শরৎ-কালের প্রারম্ভ হইতে দুগ্ধের পরিমাণ কিছু হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার নবনীত ইত্যাদি বাড়িতে থাকে। শীতকালে দুগ্ধ গাঢ় মিষ্ট এবং অধিক সারভাগ (নবনীত ছানা প্রভৃতি) বিশিষ্ট হইয়া থাকে। শীতকালে দুগ্ধের অম্লতা হয় এবং সর ভাগ বৃদ্ধি হয়। সময় বিশেষে দুগ্ধের গুণাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, প্রাতঃকালীন দুগ্ধে নবনীত ও অন্যান্য সার পদার্থ অধিক থাকে, এবং সর্ব্ব কালেই দোহনের প্রথম ভাগ অপেক্ষা শেষ ভাগে দুগ্ধে সার পদার্থ অধিক থাকে, এবং অধিক গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। দোহনের প্রথম ভাগে দুগ্ধে ছানা ও শ্বেতসার (albumen) অধিক থাকে এবং শেষ ভাগে নবনীত ও সর (cream) অধিক থাকে। এ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশের মত এই যে:—

"বৃষ্যং বৃংহণ মগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে
পয়ো।
মধ্যাহ্নেতু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং
দীপনম্॥

* * * *

রাত্রৌ পথ্যমনেক দোষশমনং চক্ষুর্হিতং
সংস্মৃতম্॥"

বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত শর্ব্বরীঃ
ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ।
বিদাহীন্নপানানি দিবা ভুঙ্‌ক্তে হি যো নরঃ
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা
পিবেৎ॥"

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

বিজয়ায়।

(১)

ওরে—নবমী চলিয়া গিয়াছে যে,—
মায়ের—চরণ-সিন্দুর মুছায়ে নে।
বরণডালা, কুসুম মালা—
বরষের মত সাজায়ে দে।
ওরে, নবমী চলিয়া গিয়াছে যে!

(২)

ওমা—মিনতি, আবার এস গো—
সন্তান সাথে ব'স গো।
দেবতা সঙ্গে, সুফলা বঙ্গে—
ভক্তের প্রেমে ভেস গো,
মা,—আবার বঙ্গে এস গো।

(৩)

বিজয়া দশমী আসিল;
ভবানী, ভবনে ভাসিল।
ভক্ত বাঙালী—হইল কাঙালী,
শম্ভু হরষে হাসিল।
বিজয়া দশমী আসিল।

(৪)

স্বামীর চরণ আজিরে,—
পূজিব আদরে সাজিরে;
সোহাগ করি, গহনা পরি—
আয় তোরা বোন হাসিরে!
চরণ পূজিব আজিরে।

(৫)

আজিরে দশমী বিসর্জ্জন,
আয় আয় তোরা আয়রে বন;—
প্রতিজ্ঞা করি, চরণ ধরি,
পরাণ করিগে সমর্পণ;
আয় আয় তোরা আয়রে বন।

(৬)

লব পদধূলি চরণের;
ক'ব সাথী তুমি মরণের।
ভবানী, লক্ষ্মী, করিব সাক্ষী,—
মিটাব পিপাসা জনমের;
লব পদধূলি চরণের।

(৭)

কহিব সখাহে ভুলনা—
ঘৃণায় ও পদে দ'লনা,
মনের হরষে বরষে বরষে—
বুকে রেখ, ফেলে দিওনা;
ঘৃণায় ও পদে দ'লনা।

(৮)

হাসি মুখে কথা কহিও,
প্রণাম চরণে ধরিও;
তোমারি ভক্ত, তোমাতে রক্ত,
আজি আশীর্ব্বাদ করিও;
প্রণাম চরণে ধরিও।
নাথ—প্রণাম চরণে ধরিও॥

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যদিস্যাৎ পান পড়া খান লাউসেন।
নিজঘর বলিয়া এখনি আসিবেন॥
তুষ্ট হলা শুনিয়া সুরিক্ষা বাণেশ্বর।
পসরা সাজায় দাসী হরিষ অন্তর॥
ছাঁচি পানে অপরূপ সাজাইল বিড়ি।
মাত্র পড়্যা ডালায় ঔষধ রাখে বেড়ি॥
পাছে লাগে তাম্বুলেতে রবির কিরণ।
উপরেতে আচ্ছাদিল নেতের বসন॥
নানা আভরণ পরে নাসবেশ করি।
মাথায় পসরা করে চলিল সুন্দরী॥
বাজারে রাখিল দাসী পানের দোকান।
লাউসেন কর্পূর লয়্যা কর অবধান॥
কর্পূর পাতর কয় লাউসেন কুমারে।
গোলাহাট ছাড়িয়া থাকিব কত দূরে॥
মালিনীর ঘরে ছিল লাউসেন রায়।
বিদায় হইয়া যে গৌড় দেশ যায়॥
প্রখর মাজুনি আঁটে বাঁধিয়া কোমর।
ফলা খাড়া রয়্যা চলে কর্পূর পাতর॥
লাউসেন আগে যান পশ্চাতে কর্পূর।
রঘুনাথ সঙ্গে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
আকুল হইল যত নগরের নারী।
অনিমিকে দেখে রূপ দাণ্ডায়ে দুসারি॥
হুতাশনে কাঞ্চনের কান্তি নাহি টুটে।
বলে সব সুন্দরী মনের মত বটে॥
ভুলাবার তরে তারা ঔষধ উড়ায়।
বিশাসয় সুন্দরী সেনের পাছু ধায়॥
লাউসেন কর্পূরে দেখে মদন চঞ্চল।
কুরঙ্গনয়নী হয় যৌবনে বিকল॥
হাটিলা বাজারে যান ভাই দুইজন।
সুরিক্ষার দাসীর সহিত দরশন॥
নূতন যৌবন রামা দেখে রূপের ছন্দ।
বিকসিত কমলে চুয়াল মকরন্দ॥
রূপ দেখে দাসীর হল হরষিত মন।
চিত্রলেখা অনিরুদ্রে দেখিল যেমন॥
পান বেচে দোকানে লাবণ্য কথা কয়।
সেনকে বলিছে পান লহ মহাশয়॥
কর্পূরের গুঁড়ি আছে তাম্বুলে মিশাল।
রবির কিরণে লাগে পরম রসাল॥
রসিক পুরুষ জানে এ পানের কথা।
ভক্ষণেতে দূরে যায় মুখের জড়তা॥
সাত বিড়ী রোজ প্রতি পান গৌড়েশ্বর।
একটী বিড়ীর মূল্য এক এক মোহর॥
কর্পূর বলেন শুন সেন যুবরাজ।
ক্ষমা দিয়া চলহে তাম্বুলে নাহি কাজ॥
সেনকে বলেন তখন আকার ইঙ্গিতে।
কত মুনি ভুলে গেছেন এই পান খেতে॥
এ দেশের দুশ্চারিণী রমণী সকল।
পান খেলে হবে ভাই ঔষধে পাগল॥
রাত্রে করে মানুষ দিবসে করে অজা।
ঔষধের গুণেতে রমণী সব রাজা॥
দাসীকে কর্পূর বলে শুনগো রূপসী।
পান নাহি খাই মোরা ধর্ম্মের তপসী॥
বিবেকী হইয়া নাহি করি ঘর বাস।
তীর্থবাসী হইব মনের অভিলাষ॥
অল্পকালে পরবাসে করিল গোঁসাই।
কিসে খাব তাম্বুল সঙ্গেতে কড়ি নাই॥
এত যদি প্রতারণা করিল কর্পূর।
মনে মনে যুক্তি করে ময়নার ঠাকুর॥
পান নিতে দোকানে দাণ্ডান সদাকর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন মায়াধর॥
পান নিতে কর্পূর লাউসেনে করে মানা।
ময়নার রাজা তখন করেন ভাবনা॥
প্রহ্লাদেরে অনুকূল হলে নারায়ণ।
প্রভুর বলেতে করে গরল ভক্ষণ॥

হরিপদে মন যার ঔষধ কি করে।
পান কিন্যা নিব দেখি কি করিতে পারে॥
কোন কর্ম্ম না হয় ইষ্টেতে মন হলে।
মাল সারেঙ্গ ধলকে বধিলাম অবহেলে॥
বাঘ কামদল মেলাম জালন্দার পাটে।
দারুণ কুমার মেলাম তারা দীঘির ঘাটে॥
বারুই বধূ বাদ দিল বধিয়া কুমার।
তাথে রক্ষা করিল ঠাকুর কর তার॥
এত মনে যুক্তি করি নিতে গেল পান।
কর্পূর কৈল ঠেলা পানের দোকান॥
দোকান ফেলিল যদি কর্পূর পাতর।
পান গুয়া গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
কোপে রক্ত বরণ হইল মুখশশী।
কর্পূরের কোমরে ধরিল গিয়া দাসী॥
সর্ব্বনাশ করিল বিদেশী দু ভাই।
ঘন ঘন দেয় মাগী দ্বারীর দোহাই॥
সুরিক্ষার কাছে চল করিবারে দেখা।
নহে দিবি গুণকার পাঁচ লক্ষ টাকা॥
ভয়াতুর কর্পূর লোচনে বহে জল।
পাবক দেখিয়া যেন হরিণ চঞ্চল॥
রাখ দাদা লাউসেন বিষম সঙ্কটে।
প্রাণ পাছে যায় ভাই মাগীর দাপটে॥
লাউসেন বলেন আমার নাহি চারা।
আপনি ফেলিলে ভাই পানের পসরা॥
গুণকার দিতে ভাই সঙ্গে নাই ধন।
ইহার উপায় তবে করিব কেমন॥
খুঁজে দেখ সঙ্গে যদি কড়ি কিছু থাকে।
তবে সে এড়ান পাই বিষম বিপাকে॥
এত যদি কহিল দুর্ল্লভ সদাকর।
অম্বর খুঁজিয়া দেখেন কর্পূর পাতর॥
কাণা কড়ি কর্পূর পাইল কড়া সাত।
কড়ি হাতে করিল ময়নার মহীনাথ॥
ভাবনা করেন সেন দেব মায়াধরে।
পার হতে নারি প্রভু বালাই সাগরে॥
বিপাকেতে ঠেকিল কর্পূর সহোদর।
কড়ির উপরে প্রভু হবে ধ্বজাগর॥
এক মনে ধর্ম্মরাজে স্মরণ করিতে।
কাণা কড়ি মাণিক হইল আচম্বিতে॥
প্রবোধিল দাসীকে মাণিক্য দিয়া করে।
কুকর্ম্ম করিল কর্পূর দোষ দিব কারে॥
অসম্ভব দেখিয়া দাসীকে চমৎকার।
চলে রামা নটিনীকে দিতে সমাচার॥
বেশ করে বেউশ্যা বসিয়া আছে ঘরে।
কহিতে লাগিল দাসী হয়ে যোড় করে॥
হেন অপরূপ আমি না দেখি নয়নে।
দেবতার বল বুঝি আছে লাউসেনে॥
একে একে কহিল সকল বিবরণ।
কাণা কড়ি হাতে হল অমূল্য রতন॥
তুমি বল আমার দেবতা পক্ষবল।
রূপে গুণে তোমা হোতে অধিক সকল॥
এ নাগর ভুলাইতে নারিলাম আমি।
সাধ থাকে দেখিতে পয়ান কর তুমি॥
এত শুনে গা তুলে সুরিক্ষা বাণেশ্বর।
গমন করিল লয়ে দু কুড়ি নাগর॥
সবাকে দিয়াছে রামা অষ্ট অলঙ্কার।
বাজুবন্দ মাদুলী সোণার কণ্ঠহার॥
নাগর সহিত চলে সুরিক্ষা রূপসী।
তারাগণ সমুখে উদয় যেন শশী॥
রাজহংস গমনেতে করিল পয়ান।
কাঞ্চনের বাটায় নাগর যোগায় পান॥
লাউসেন ভেটিতে সুরিক্ষা নটী যায়।
চারিদিকে নাগর সব চামর ঢুলায়॥
সপ্তস্বরা বীণা বেণী খমক খঞ্জুরী।
কেহ বা বাজায় কেহ নাচে তান ধরি॥
বাদ্যে নাচে নাগর ঔষধে বাঁধা মন।
সেনের নিকটে সবে দিল দরশন॥
কর্পূর বলেন দাদা হের দেখ চেয়ে।
নিজে এলো সুরিক্ষা দু কুড়ি নাগর লয়ে॥
কি করিব দাদা হে পালাতে পথ নাই।
বিষম সঙ্কটে বড় ঠেকাল গোঁসাই॥
পথ আগুলিল গিয়া দু কুড়ি নাগর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন মায়াধর॥

সরাণেতে সঙ্গে করি দু কড়ি নাগর।
লাউসেনে আগুলে সুরিক্ষা বাণেশ্বর॥
সঙ্গেতে নাগর সব ঔষধে আদুল।
চামর ঢুলায় কেহ যোগায় তাম্বুল॥
তা দেখিয়া কর্পূরের মুখে নাহি কথা।
তরাসেতে যেমন হইল মহীলতা॥
দাণ্ডাইল কর্পূর লাউসেন তপোধন।
সুরিক্ষা দেখিল রূপ ভুবনমোহন॥
লাউসেনের সম্মুখেতে দাণ্ডাল নটিনী।
স্বর্গ হ'তে এল যেন ইন্দ্রের নাচনী॥
চারিদিকে দাণ্ডাইল দু কুড়ি নাগর।
লাউসেনে জিজ্ঞাসে সুরিক্ষা বাণেশ্বর॥
কোথা যাবে কি নাম নিবাস কোন দেশ।
কোন কুলে উৎপত্তি কহিবে সবিশেষ॥
দাণ্ডায়ে কে বটে কহ তোমার দক্ষিণে।
পরিচয় পেলে সে সন্তুষ্ট হব মনে॥
সেনে কয় সুন্দরী সমুখে যোড় কর।
লাউসেন বলে বাড়ী ময়না নগর॥
নাম ধরি লাউসেন ময়নার মহীনাথ।
মাতা মোর রঞ্জাবতী কর্ণসেন তাত॥
ক্ষত্রি কুলে উৎপত্তি কর্পূর ছোট ভাই।
রাজ সম্ভাষণেতে গৌড় দেশ যাই॥
নৃপতির সাক্ষাতে বিশেষ কার্য্য আছে।
পথ ছেড়ে দাও রামা সন্ধ্যা হয় পাছে॥
যেতে চাই গৌড় ছাড়িয়া দেহ পথ।
বেলা নাহি পাছে ডুবে পতঙ্গের রথ॥
সুরিক্ষা বলেন, সেন যেতে পাবে নাই।
আমার মন্দিরে আজ থাক দুই ভাই॥
গোলাহাট দিয়া যেই যায় গৌড় পুরে।
সাত দিন রয়ে যায় আমার মন্দিরে॥
কিশোর বয়স দেখি তরুণ যৌবন।
কেন যাবে কষ্ট পেতে গৌড় ভুবন॥
এক দণ্ড সুখ নাহি রাজার দরবারে।
চুরী ডাকা প্রত্যাবধি গৌড় সহরে॥
মহাম্মদ পাত্রের দয়ার নাহি লেশ।
অবিচারে সকল প্রজাকে দেয় ক্লেশ॥
নৃপতির বাক্য নাহি শুন মহাশয়।
সরাণেতে চোর ডাকাতের বড় ভয়॥
গৌড় যাইতে সেন কেন কর ধ্যান।
মকরন্দ কৌতুকে কমলে কর পান॥
গোলা হাট সহরে রাজত্ব কর রায়।
অগোর কস্তুরী চুয়া মাখাইব গায়॥
কিন্নর সমান গুণী নৃত্য করে এসে।
গীত শুন তাণ্ডব কৌতুক দেখ বসে॥
বিদ্যা পড়িবার তরে না কর ভাবনা।
নদ্যা হতে পণ্ডিত এসেছে কত জনা॥
অধ্যাপক পণ্ডিত সকল মোর বশ।
নাটক নাটিকা দেখ কাব্যকলা রস॥
তিন সন্ধ্যা যোগায় গঙ্গাজল চিনি।
দাসী হয়ে অঙ্গে চামর ঢুলাব আপনি॥
দিবা রাত্রি মধুপান করিবে কৌতুকে।
পালঙ্কেতে তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে॥
কর্ণে হাত দিল তখন সেন গুণধাম।
তিনবার স্মরণ করিল রাম নাম॥
জানিলাম সুন্দরী গো জানিলাম এতক্ষণ।
পথ ছেড়ে দাও সুরিক্ষা শুন নিবেদন॥
রাজা ভেটে যেতে চাই ময়না অবনী।
পথ পানে চেয়ে মোর জনক জননী॥
এত শুনে সুরিক্ষা নটিনী তখন বলে।
রেখেছি দারুণ ফাঁদ আকাশ পাতালে॥
অল্পকালে অভয়া আমারে দিল বর।
বর দিল হক্ তোমার দু কুড়ি নাগর॥
গুণে দেখ দুজনা নাগর আঁটে নাহি।
এতদিনে পরিপূর্ণ করিল গোঁসাই॥
মনে কর গোলাহাটে ছাড়াইয়া যাব।
দু ভাই এ চরণে ডাঁড়ুকা এখন দিব॥
সমস্যা পূরিতে পার গৌড়পুরে যাবে।
না পারিলে আমার রন্ধনে ভাত খাবে॥
কথা শুনে লাউসেন হাসে খল খল।
বল বল সুরিক্ষা সমস্যা দেখি বল॥
কর্পূর পাতর বলে হেস নাহি সেন।
নটিনীর কথায় দেবতা কাঁপিবেন॥

সুরিক্ষা লাউসেনে হয় প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
গোলাহাট সহরে আইল সর্ব্বজন॥
বেউশ্যাকে বেড়ে বসে নাগর সকল।
দুই ভাইয়ে বসিলেন পাতিয়া কম্বল॥
সমস্যা পূরিতে আমি যখন নারিব।
দু ভায়েতে তোমার রন্ধনে ভাত খাব॥
রন্ধন করিবে মোর নিয়ম মাফিকে।
প্রভাতে ভোজন নাহি কাক যদি ডাকে॥
যদি পার সমস্যা পূরিতে সদাকর।
আমার আবস্থা কোরো সভার ভিতর॥
সেন বলে সমস্যা পূরিতে যদি পারি।
তোমার নাসিকা কান কাটিব সুন্দরী॥
এত শুনে সুরিক্ষা নটিনী দিল সায়।
সত্য করিলেন তবে লাউসেন রায়॥
বিয়ন মুনি মৃগাঙ্ক পৃথিবী হুতাশন।
সেন বলে সাক্ষী থাক যত দেবগণ॥
দুইজনে সাক্ষী করিলেন দেবগণে।
প্রহেলিকা বলে তবে সেন বিদ্যমানে॥
প্রকাণ্ড শরীর অতি ভীমসেন নয়।
ভোগী বটে নয় সে যে রাজার তনয়॥
ত্রিশূল ধরয়ে সেই নয় হরি হর।
নটী বলে বলহে ময়নার সদাকর॥
হস্ত নাহি পদ নাহি নাক আঁখি।
শরতে উদয় তাঁর অঙ্গে নাহি দেখি॥
বিষয় করয়ে সেই হয় মহাতেজা।
তার ভয়ে পাৎসা কাঁপে কহ মহারাজা॥
দেহ ধরে সুন্দর নাসিকা মুখ তায়।
রক্ত মাংস বর্জ্জিত আহার নাহি খায়॥
আহার করিতে গেছে প্রাণে নাহি মরে।
পুনরপি সেই দেহের তত্ত্ব নাহি করে॥
সকল পুরাণ তুমি জান মহাশয়।
বেউশ্যা বলেন সেন না কহিলে নয়॥
বনেতে জনম তার বন বিনে মরে।
বনচর সেই বন প্রবেশিতে নারে॥
ঘুমেতে যখন থাকে নাহি মুদে আঁখি।
নারী বলেন লাউসেন এবার বল দেখি॥

সমিস্যা বলেন যত সেন সব কয়।
নটী বলে সেন নাহি হল পরাজয়॥
তখন ভাবেন রামা দেবী ভগবতী।
এইবার বলহে ময়নার মহীপতি॥
কামেশ্বরী কাঁউরের আসে কামিখ্যাতে।
ধাউত কোথা বসে নারীর অষ্টাঙ্গ থাকিতে
সমিস্যা শুনিয়া সেন ঠেকিল সঙ্কটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥
সুরিক্ষা দিলেক যদি ধাউতের কথা।
সমিস্যা শুনিয়া সেন করে হেঁট মাথা॥
ধাউতের বচন খুঁজেন সদাগর।
কুমারসম্ভব দেখে অমর জুমর॥
ভারবী নৈষধ ভট্টি মেঘদূত দেখা।
মুরারী বেদান্ত দেখা নাটকণা টীকা॥
মাঘ রঘু স্মৃতি সাইত্রি হারাবলি।
মেদিনীকর রত্নমালা দেখিল সকলি॥
অষ্টাদশ পুরাণ আগম খুঁজিলেন।
ধাউতের বচন পেলাম নাহি কেন॥
সেন বলে এ কথা ব্রহ্মার অগোচর।
এতদিনে বিমুখ হলেন মায়াধর॥
কেন সত্য করিলাম সুরিক্ষার সনে।
মোর সম অজ্ঞান নাহিক ত্রিভুবনে॥
বিষণ্ণ বদন হল ভাবিতে ভাবিতে।
কেমনে খাইব অন্ন নটিনীর হাতে॥
নটী বলে রাজা হে ভাবনা কর দূর।
রন্ধন করিতে রাত্রি হইবে উছুর॥
পথশ্রান্ত দু ভাইয়ের মলিন বদন।
রন্ধন করিব চল করিবে ভোজন॥
সমস্যাতে হারিলেন লাউসেন রায়।
সুবর্ণের ডাঁড়ুকা দিলেক দুই পায়॥
কর্পূরের পায় দিল রূপার শিকল।
চারি দিকে বেড়ে চলে নাগর সকল॥
নাগর সকল সঙ্গে হরষিত মন।
নিজ ঘরে সুরিক্ষা দিলেক দরশন॥
দু কুড়ি নাগর লয়ে উত্তরে ভবনে।
রাজপাত্রে বসাইল বিচিত্র আসনে॥

সমাদর করিয়া সুরিক্ষা নটী কয়।
সত্যবন্দী আপনি হয়েছ মহাশয়॥
কি বলিব সকল পুরাণ জান রায়।
সত্য হেতু নারায়ণ হলে শিলাকায়॥
রাত্রি হল কষ্ট পাও ভাই দুই জন।
আজ্ঞা হক যাই আমি করিতে রন্ধন॥
সেন বলে রন্ধন করিবে মোর কাছে।
প্রবাসেতে আমার নিয়ম এক আছে॥
বলি আমি যদি থাকে করিতে যোগ্যতা।
অন্ন খাব দুই ভাইএ নাহিক অন্যথা॥
সর্ব্বকাল আতপের অন্ন খেয়ে থাকি।
উড়ি ধান ভানিবে সোলার করে ঢেঁকি॥
আঁও হাঁড়ি নিজ হাতে করিবে নির্ম্মাণ।
নদীর আনিয়া বালি করিবে উনান॥
চালুনীতে জল আন তারা দীঘি হোতে।
ভাল বসন ভিজাইয়া জ্বালন কর তাথে॥
কাক ডাকে রজনী প্রভাত যদি হয়।
ভোজন নাহিক তবে কহিনু নিশ্চয়॥
সুরিক্ষা বলেন তবে করি আয়োজন।
রন্ধন করিব কাছে দেখিবে এখন॥
রন্ধনের সামগ্রী করিতে নটী যান।
সেনের বচন শুনে উড়িল পরাণ॥
যে সব কহিল সেন সব অসম্ভব।
কিরূপেতে আয়োজন হইবে ঐ সব॥
মনে যুক্তি করেন সুরিক্ষা বাণেশ্বর।
ভবানীকে পূজিয়া মাগিয়া লব বর॥
স্মরণ করিয়া মনে চণ্ডী দশভুজা।
দেবীর আলয়ে রামা আরম্ভিল পূজা॥
চাঁপা হার শতদল পদ্ম আমলকী।
মল্লিকা শ্রীফল দল করবী কেতকী॥
জবাফুল ধূপ দীপ অগৌর কস্তূরী।
ঘৃত মধু চন্দন রাখিল সারি সারি॥
উপহার আমান্ন সোণার বারকোসে।
বেউশ্যা করেন পূজা দেবীর উদ্দেশে॥
ষোড়শ উপচারেতে পূজিয়া মহেশ্বরী।
মহাবিদ্যা জপ করে সুরিক্ষা সুন্দরী॥
বীজমন্ত্র জপ করে সুরিক্ষা নটিনী।
নিজরূপে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণী॥
বর মেগে লহ বলে হেমন্তের বেটী।
কেন ঝি এতেক পূজার পরিপাটী॥
তোর পূজা নিতে গো কৈলাস ত্যজে আসি
গণেশ কার্ত্তিক হোতে তোরে ভালবাসি॥
সুরিক্ষা বলেন বল আপনার গুণে।
ব্রহ্মা আদি দেবতা পদ না পায় ধেয়ানে॥
শক্তিরূপা সীমন্তিনী জগতের মাতা।
ত্রিগুণধারিণী তুমি হরি-ভক্তি-দাতা॥
মহিমা তোমার বড় দশমে লিখন।
তোমা পূজে কৃষ্ণপতি পেলে গোপীগণ॥
কি বলিতে পারি গো অভয় রাঙ্গা পায়।
আপনি দিয়াছ বর ভৈরবী গঙ্গায়॥
দু কুড়ি নাগর প্রায় বন্দী হল ঘরে।
রন্ধন করিতে যাই লাউসেনের তরে॥
রাজা লাউসেন দিল বিষম আরতি।
কেমনে হইব পার কহ ভগবতি॥
নিজ হাতে আও হাঁড়ি গড়িবারে বলে।
উড়িধান কেমনে ভানিয়া দিব সোলে॥
চালুনীতে কেমনে আনিয়া দিব জল।
বসন ভিজায়ে বলে জ্বালিতে অনল॥
বালীর তিউড়িতে কেমনে পাক হয়।
ভবানী বলেন বাছা না করিহ ভয়॥
রাঁধ গিয়া সকল হইবে অনায়াসে।
বর দিয়া জয়চণ্ডী গেলেন কৈলাসে॥
বর পেয়ে নটীর দ্বিগুণ হল বল।
ইঙ্গিতে করিল রামা যা চাই সকল॥
এক দণ্ডে করিল সকল আয়োজন।
লাউসেনের কাছে গেল করিতে রন্ধন॥
কর্পূর বলেন দাদা পরিপাটী দেখ।
রন্ধনের সামগ্রী নটিনী করিলেক॥
আর কি বলিব দাদা সর্ব্বনাশ হল।
রন্ধন করিতে ঐ নটিনী বসিল॥
বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট পদ শতদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥

রন্ধন করিতে ত্বরা আনন্দিত মন।
পেড়া হতে আনে রামা অমূল্য বসন॥
রাত্রি হল বিস্তর পাকের তড়াবড়ি।
জল দিয়া সাজাইল বালীর তিউড়ি॥
ঘৃতে ধুয়ে আঁও হাঁড়ি বসাইল তায়।
বসন ভিজিয়া সব আনতে যায়॥
নটিনীকে বর দিয়া গেছেন ভবানী।
দপ্ দপ্ ভিজা বস্ত্র জ্বলিল আপনি॥
পরিপাটী করিয়া নটিনী করে পাক।
ঘন কুচি করিল পুয়ালি নটে শাক॥
গোটাকত তায় দিল কচুর সে বেঁজি।
বরবটি বুট দিল কাঁটালের মজি॥
জল দিল রামজনি চড়ায়ে বেসার।
পরিপাক লবণ দিয়া করিল সুসার॥
জ্বলি ভাটি ঘন কাটি পিঠালীর কালে।
ভবক উঠিয়া গেল আদা হিঙ্গু ঝালে॥
মনে করে ভোজন করিতে চান ভূপ।
ঘৃতে সাঁতুলিয়া নামায় ঘণ্ট অপরূপ॥
সূপ রাঁধে সুন্দরী ঘুরাইয়া দেয় কাঠি।
হবি দিয়া সাঁতুলে মসলা পরিপাটি॥
তুলাইল কোলে রাখি সুবর্ণ কটরা।
আদা ঝাল দিয়া রাঁধে মানের নাস্করা॥
বেথো শাক ভাজিয়া সোণার থালে রাখে।
নবীন নালিতা শাক ঘৃত দিয়া ছাঁকে॥
কাঁচকলা করলা বার্ত্তাকু পলাকড়ি।
দুগ্ধ গুড়ে মিশাল ভাজিল ফুলবড়ী॥
গোটা দুই নারিকেল ভাজিল পাণিফল।
দধি গুড় দিয়া রাঁধে আমের অম্বল॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ক্রমে করিল রন্ধন।
অবশেষে রামজনি চড়াল ওদন॥
লাউসেন বলে শুন কর্পূর পাতর।
এত দিনে আমায় ছাড়িল মায়াধর॥
নটিনীর হাতে অন্ন খাইব কেমনে।
বিষ খেয়ে দু ভাই মরিব এখানে॥
না যাইব ফিরে আর ময়না ভুবন।
আর না দেখিব পিতা মাতার চরণ॥
কি জানি দারুণ বিধি লিখেছে ললাটে।
কুকর্ম্ম করিয়া কেন এলাম গোলাহাটে॥
মনে কষ্ট করেন ময়নার মহীপাল।
কর্পূর পাতর করে রজনী আটকাল॥
কেমনে প্রভাত হয় মনের বাসনা।
আকাশ পানেতে চান ভাই দুইজনা॥
দশ দণ্ড রাত্রি আছে বুঝিলেন প্রায়।
বেউশ্যা বাড়িল অন্ন স্বর্ণের থালায়॥
দুই থালে অন্ন বেড়ে করে নিবেদন।
গা তুলিয়া দুই ভাইয়ে করয়ে ভোজন॥
রেঁধে রেঁধে আমার কোমর হল জড়।
ভাবনা কোরো না আমি কুলীনের বৌ॥
প্রাণনাথ হয়ে আমার নাহি ভাব দুঃখ।
কালি পারা হইল সোণার চাঁদ মুখ॥
ঢাল খাঁড়া এখানে আসনে পড়ে রহুক।
রাজপাত্রে ভোজন করিতে সুরু হোক॥
এত শুনি নটিনীকে বলে দুই ভাই।
স্বর্ণের থালায় মোরা অন্ন নাহি খাই॥
থালা ঝারি মজ কর তেঁতুলের পাতে।
ভোজন করিতে তবে পারি তোমার হাতে
এত যদি কহিলেন লাউসেন রায়।
সুরিক্ষার ইঙ্গিতে নাগর সব ধায়॥
ব্যক্তি চারে উঠে গিয়া তেঁতুলের গাছে।
আনিয়া দিলেক পত্র সুরিক্ষার কাছে॥
ভবানীকে স্মরিয়া বসিলে সুন্দরী।
বাটা বাটী পত্রের করিল থালা ঝারি॥
ছল করে অন্ন বাজে পত্রোদক করি।
দুই থালে বেষ্টিত ব্যঞ্জন সারি সারি॥
বসিতে আসন রেখে ডাকে লাউসেনে।
ভোজন করয়ে রাজা পত্রের বাসনে॥
আজ্ঞা হয় ঘৃত দিব অন্নের উপর।
এত শুনি কাতর হইল সদাকর॥
সত্যবন্দী হইলাম খাইতে হ'ল ভাত।
জাতি রক্ষা করহে ঠাকুর যদুনাথ॥
বিষপানে প্রহ্লাদে রাখিলে নারায়ণ।
গজ দেহ ধরে রাজা ইন্দ্র ক্রমণ॥

জল খেতে গেল গজ পিপাসা পীড়িত।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে রণ কুম্ভীর সহিত॥
অভয় চরণে তুলে দিল পদ্ম ফুল।
গজরাজে রাখিলে হইয়ে অনুকূল॥
পরাভব প্রতিজ্ঞাতে পাণ্ডব নন্দন।
দ্রৌপদীর করিলা হে লজ্জা নিবারণ॥
সর্ব্ব ঘটে থাকহে অনন্তরূপ ধর।
বেউশ্যার ঘরে আজি জাতি রক্ষা কর॥
কিবা জানি স্তব স্তুতি অভয় চরণে।
দয়া করি রাখ প্রভু দাসীর নন্দনে॥
গণ্ডুষ ধরিয়া হাতে সেন করে ধ্যান।
স্বর্গপুরে জানিল ঠাকুর ভগবান্॥
ভক্ত রাখিবার তরে হইল চিন্তিত।
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিলা সঙ্গীত॥

একাবলী ছন্দ।

গণ্ডুষ ধরি স্তব করে সেন।
স্বর্গেতে ধর্ম্মরাজ জানিলেন॥
শুন হনুমান্ মোর ভারতি।
এইবার রাখ সেনের জাতি॥
পৃথিবীকে গেছে কশ্যপ সুত।
হেন বুঝি সাঙ্গ না হল ব্রত॥
বেশ্যার হাতে খাইতে অন্ন।
গণ্ডুষ ধরেছে সত্যের জন্য॥
কাক ডাকে রাত্রি প্রভাত হয়।
সেনের তবে সে প্রতিজ্ঞা রয়॥
মহারুদ্র তুমি পুরাণে গণি।
রাম অবতারে তোমারে জানি॥
ত্রিভুবনে তুমি না কর শঙ্কা।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া পোড়ালে লঙ্কা॥
তোর তেজে নহে দেবতা ধৈর্য্য।
শীঘ্রগতি চল আনিতে সূর্য্য॥
কাছে যম রাজা ইন্দ্র আছিল।
প্রভু বলে মোর সঙ্গেতে চল॥
যদি অন্ন খান ময়নার রাজা।
কলি যুগে মোর না হবে পূজা॥
ভক্তের কারণে করহ শ্রম।
কোকিল ইন্দ্র কাক হবে যম॥
ডাকিতে ডাকিতে চলহ গাছে।
উপনীত ধর্ম্ম সেনের কাছে॥
নটীকে রাখিল বিষ্ণু মায়াতে।
ধর্ম্ম ধরিলেন সেনের হাতে॥
গোলাহাটে ধর্ম্ম নটীর ঘরে।
হনুমান্ গেছে সূর্য্যের তরে॥
অস্তাচল হোতে মার্গেতে যান।
রথের ধ্বজা দেখে হনুমান্॥
হনু বলে এই সূর্য্যের রথ।
প্রণাম করিয়া আগুলে পথ॥
হনুমান্ বলে শুন মহাশয়।
উদয় দিতে চল মহাকায়॥
সুরিক্ষার সনে সেনের কক্ষা।
প্রভাত হইলে তবে সে রক্ষা॥
নহে অন্ন খান নটীর হাতে।
ধর্ম্ম পাঠাইল তোমারে নিতে॥
সূর্য্য বলে তুমি জ্ঞানেতে হীন।
রাত্রি যোগে বল করিতে দিন॥
আট দণ্ড রাত্রি এখন স্থিতি।
উদয় করিতে আনে আরতি॥
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে তোর জননী।
তার কথা ভাল রূপেতে জানি॥
জারজাত বেটা বিপিনে বৈসে।
নকরালি করে ডাকিতে আসে॥
হনুমান্ বলে বড় না দেখি।
কোপেতে আরক্ত হইল আঁখি॥
দর্প করে হনু ভানুরে বলে।
যেকালে লক্ষ্মণ পড়িল শেলে॥
আমারে পাঠাল গন্ধমাদনে।
পথে দেখা হল তোমার সনে॥
বিশল্যকরণী আনিতে যাই।
সে সব কথা পাশরিলে ভাই॥
বগলে করিয়া তোমার রথে।
পর্ব্বত উথাড়ে করিলাম মাথে॥

অহঙ্কার কর মোর নিকটে।
কামান পাঠাব চড়ের পেটে॥
সূর্য্যের বিমান বাঁধিয়া লেজে।
উদয় শিখরে তুলিল তেজে॥
কাক ডাকে পূর্ব্বে প্রকাশ হেরি।
গা তুলিলা সেন গণ্ডুষ ফেলি॥
ভক্তাধীন ধর্ম্ম রাখিলা সেনে।
দ্বিজ রামচন্দ্র সঙ্গীত ভণে॥
দিন হল প্রকাশ গণ্ডুষ ফেলে সেন।
ভকত বৎসল ধর্ম্ম সেনে রাখিলেন॥
লাউসেন বলে সুরিক্ষা বাণেশ্বরে।
বেড়ী ঘুচাও যাই মোরা গৌড় সহরে॥
বেশ্যা বলেন বিধি বিড়ম্বিল তোরে।
মনে কর আর ফিরে যাবে গৌড়পুরে॥
প্রতিজ্ঞাতে তোমারে রাখিল নিরঞ্জন।
কালি গেল আজি এখন করাব ভোজন॥
কোমর বাঁধিয়া চাঁছ ফুলের বাগান।
কর্পূর পাতর রাজ ভানিয়া দেহ ধান॥
ধর্ম্মের সেবক কর অহঙ্কার তুমি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপাতে পারি আমি॥
ধাউৎ কথা বলে স্পষ্ট করিয়া আমাকে।
গৌড় চলে যাও সেন কেবা তোমায় রাখে
ধর্ম্মরাজে জিজ্ঞাসে ময়নার গুণমণি।
ধর্ম্ম বলেন ধাতের কথা আমি নাহি জানি
বলিতে লাগিল ধর্ম্ম ডেকে হনূমানে।
স্বর্গপুরে যাহ বাছা ধাউতের কারণে॥
বিধি বিষ্ণু প্রভৃতি যতেক দেবগণ।
সবাকে জিজ্ঞাসা ক'রে পবননন্দন॥
এত শুনি হনূমান্ চলে দ্রুতগতি।
অবিলম্বে পাল গিয়া অমর বসতি॥

প্রথমে গেলেন হনু ব্রহ্মার আলয়।
যোড় করে জিজ্ঞাসেন পবনতনয়॥
ব্রহ্মা বলেন জানি নাই ধাউৎ কেমন।
এই কথা বলিতে পারেন নারায়ণ॥
উপনীত হনূমান্ বিষ্ণুর মন্দিরে।
নারায়ণে জিজ্ঞাসা করেন যোড়করে॥
নারায়ণ বলেন একথা নাহি জানি।
এই কথা বলিতে পারেন শূলপাণি॥
এত শুনে দ্রুত চলে পবনকুমার।
যেখানে বসিয়া আছেন ভোলা মহেশ্বর॥
বিশ্বনাথে জিজ্ঞাসেন মারুৎ কুমার।
বেশ্যার বাড়ীতে বসিয়া নিরাকার॥
ধাউতের কথা বলে দাও দিগম্বর।
হেঁট মাথা করে তবে ভাবেন শঙ্কর॥
ভাবিত হইল বড় দেব ত্রিনয়ন।
অন্য দেব কি জানিবে ইহার সন্ধান॥
শিব বলেন থাক হনু দলিজে বসিয়া।
একবার পার্ব্বতীকে আসি জিজ্ঞাসিয়া॥
ভবানীকে জিজ্ঞাসিতে গেল ভূতনাথ।
শ্বেত মাছিরূপে হনু গোড়াল পশ্চাৎ॥
ভবানীকে বলেন ঠাকুর ত্রিলোচন।
মনে পড়ে গেল বড় অপূর্ব্ব কথন॥
ভাবিতে গণিতে মোর শুকাইল গা।
কি কর বসিয়া ঘরে কার্ত্তিকের মা॥
আজি এস দুজনে বসিব বরাসনে।
বিরলে বসিয়ে কথা কব কাণে কাণে॥
দুর্গা বলেন আজি যাও কুচনির পাড়া।
গায় পারা বল হৈছে খেয়ে ভাঙ্গের গুঁড়া
শিব বলেন এ ঘর কন্যা হল গড়ে।
বৃদ্ধ যুবার ঘর হলে মেয়ে মাথায় চড়ে॥

ক্রমশঃ

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দুর্গার চরিত্র, অতুল মাহাত্ম্য,
শুনহ বৎস জৈমিনি।
অতি বিস্তারিয়া, কব বিশেষিয়া,
তব হিতকারি বাণী॥
পর্ব্বত মন্দরে, নারদ শঙ্করে,
যে কথা হইল দুজনে।
কলুষ নাশন, শুন সর্ব্বজন,
দ্বিজ রামনিধি ভণে॥ ৯॥

পয়ার ছন্দ।

মন্দর পর্ব্বত পরে দেবগণ যত।
ঋষি মুনি গন্ধর্ব্বাদি সকলে আগত॥
সেই গিরিশোভা নানা বৃক্ষ সমন্বিত।
সুগন্ধি পুষ্পেতে দশদিক আমোদিত॥
সুমেরুর শৃঙ্গ আভা পর্ব্বত মন্দর।
তাহে বসি নারদাদি দেবদেব হর॥
সুখেতে বসিয়া শিব হৃষ্ট কলেবরে।
দেখিয়া নারদ জিজ্ঞাসিলা জোড় করে॥
ত্রিজগতে পূজ্য তুমি ভক্তে দয়া কর।
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্রহ্মময় শুদ্ধ কলেবর॥
পরম বস্তুর তত্ত্ব জান জগৎপতি।
ঋষি মুনি অন্য দেব কার বা শকতি॥
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা লয়ে শিরোপরে।
বহন করিছ প্রভু পরম সাদরে॥
ভালের ভূষণ তব শশী মনোহর।
জিজ্ঞাসি যা কৃপা করি কহ মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর তুমি এই তিন জনা।
কোন্ দেবতার সবে কর উপাসনা॥
ভক্তি করি ভজ সর্ব্বে কোন দেবতারে।
কারে ভজি ব্রহ্মপদ কহিবা আমারে॥
তত্ত্ববক্তা আর নাই তিন লোক তলে।
তুমি বিনা তত্ত্বকথা কার সাধ্য বলে॥
তোমাদের উপাস্য দেবতা যিনি হন।
অবশ্য জানিতে চাহি কহ ত্রিলোচন।
বেদব্যাস কহিলেন শুনহ জৈমিনি।
শিব যা কহিলা নারদের বাক্য শুনি॥
নারদের কথা শুনি দেব পঞ্চানন
পুন পুন নারদে করিলা নিবারণ॥
তদন্তরে নারদে কহিলা পশুপতি।
যাহা জিজ্ঞাসিলা বাপু গোপনীয় অতি॥
গুহ্যতম কথা যাঁর উপাসনা করি।
অপ্রকাশ্য যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
নারদে এতেক যদি কৈলা পঞ্চানন।
জোড় করে নারায়ণে কৈলা তপোধন॥
আপন দেবতা না কহিলা ত্রিপুরারি।
কহিলা গোপন কথা প্রকাশিতে নারি॥
কৃপাময় গঙ্গাধর দেবের দেবতা।
আপন দেবতা কৈতে কৈলা কৃপণতা॥
তোমাদের উপাস্য দেবতা যিনি হন।
কৃপা করি কহ শিবে আমারে তা কন॥
শুনি নারায়ণ কৈলা শুন বাপধন।
সে দেবতা শুনে কি তোমার প্রয়োজন॥
তোমাদের দেবতা আমরা আছি সবে।
আমাদিগে ভজিয়া পরম পদ পাবে॥
যাঁর উপাসনা করি আমরা সকল।
সে দেবতা জানিয়া তোমার কোন্ ফল॥
নারদে এতেক যদি কহিলা মাধব।
হরি হরে মহামুনি আরম্ভিলা স্তব॥
গলবস্ত্রে ভক্তি করি হয়ে জোড়কর
কহেন নারদ শুদ্ধ আত্মা কলেবর॥
প্রসীদ শরণাগতে দেব ত্রিলোচন।
কৃপা করি সুপ্রসন্ন হও নারায়ণ॥
সুপ্রসন্ন হও শিব ফণী আভরণ।
প্রসীদ আমাকে হরি কৌস্তুভভূষণ॥

সুপ্রসন্ন হও গঙ্গাধর চক্রধর।
প্রসীদ প্রসীদ গদাধর দিগম্বর॥
ত্রিপুরনাশকে নমঃ কংসবিনাশনে।
তৃণাবর্ত্তনাশকায় অন্ধকঘাতিনে॥
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ জনার্দ্দনে।
বৃষারূঢ়ে নমো নমঃ গরুড়বাহনে॥
এইরূপে নারদ করিলা বহু স্তব।
স্তবে তুষ্ট হয়ে শিবে কহিলা মাধব॥
পাপে মুক্ত হয় ইহা করিলে শ্রবণ।
রামনিধি বলে সবে শুন দিয়া মন॥ ১০॥

ত্রিপদী।

নারদের স্তুতিবাণী, শুনি দেব চক্রপাণি,
পরম সন্তোষ হয়ে স্তবে।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়ে, নারদে সদয় হয়ে,
কহিতে লাগিলা প্রভু ভবে॥
ভক্ততম জ্ঞানযুত, নারদ ব্রহ্মার সুত,
শুদ্ধ আত্মা তপস্যা সফল।
নারদে অবশ্য পর, অনুগ্রহ কর হর,
তাহে তুমি ভকতবৎসল॥
বিষ্ণুর বচন শুনি, ভকতের হিত জানি,
স্বীকার করিলা প্রভু হর।
তবে পুন জোড় করে, জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বরে,
বিশেষি নারদ মুনিবর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি আর, তোমাদের তিন জনার,
সকলে করিয়া উপাসনা।
কার সাধ্য করে রদ, পাইলা পরম পদ,
ইন্দ্র আদি লোকপাল গণা॥
আপনারা তিন জনা, কার কর উপাসনা,
যে দেবতা পূর্ণ ব্রহ্মময়।
অনুগ্রহ মোর প্রতি, যদি থাকে পশুপতি,
কহ তাহা হইয়া সদয়॥
যাঁর পদ প্রভাবত, ঐশ্বর্য্য পাইলা এত,
নিরন্তর ভজহ যাঁহারে।
সেই দেবতার নাম, কহ তবে গুণধাম,
যদি কৃপা করহ আমারে॥

সবিনয়ে এই বাণী, কহিলা নারদ মুনি,
দেব দেব ঠাকুর শঙ্করে॥
যাহা কৈলা মুনিবর, মনোযোগে যোগীশ্বর,
শিব তাহা শুনিয়া সাদরে॥
এক ব্রহ্ম দুর্গাদেবী, তাঁহার চরণ ভাবি,
দেব দেব ধেয়ানে থাকিলা।
নিরমল জ্ঞানী হর, এক মুহূর্ত্তের পর,
নারদেরে কহিতে লাগিলা॥
শিব কৈলা শুন মুনি, জগদম্বা সনাতনী,
যে মূল প্রকৃতি বিশ্বমাতা।
মর্ম্ম কথা শুন কয়ি, যিনি পরম ব্রহ্মময়ী,
তিনি আমা সবার দেবতা॥
এই ব্রহ্মা আর হরি, আমি যেন ত্রিপুরারি,
তিনে সৃষ্টি স্থিতি লয়কর।
কোটি কোটি এই মত, ব্রহ্মাণ্ড আছয়ে যত,
তাহাতেও ব্রহ্মা হরিহর॥
সেখানেও সৃষ্টি হয়, স্থিতি হয়ে অন্তে লয়,
জগদম্বা সকলকারিণী।
তেজোময়ী মূর্ত্তি নাই, ব্রহ্মাণ্ড যতেক ঠাঞি,
লীলা করি শরীরধারিণী॥
তাঁর যবে লয় মন, জগত প্রসব হন,
পালন করেন তা সবার।
শেষে যবে ইচ্ছা হয়, সকল করিতে লয়,
পুন সব করেন সংহার॥
মায়া স্বরূপিণী তেঁহ, জগত করেন মোহ,
তিনি পূর্ণ ব্রহ্মময়ী ধন্যা।
লীলা করি ভগবতী, যিনি দক্ষ প্রজাপতি,
পূর্ব্বে হয়েছিলা তাঁর কন্যা॥
দক্ষের ছাড়িয়া মায়া, হিমন্তে করিয়া দয়া,
পুন গিরিকন্যা ভগবতী।
কত লীলা হয় তাঁর, তাহা সব কহা ভার,
অংশ হৈলা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
দুর্গা অংশে হয়ে তাঁরা, লক্ষ্মী হৈলা বিষ্ণুদারা,
সাবিত্রী পাইলা ব্রহ্মা যিনি।
শুন সবে এক মনে, দ্বিজ রামনিধি ভণে,
গান দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১১॥

পয়ার ছন্দ।

শিব বাক্য শুনিয়া নারদ-মুনিবর।
পুনশ্চ কহিলা শিবে জুড়ি দুই কর॥
আমাকে প্রসন্ন যদি হৈলা প্রভু ভব।
বিস্তার করিয়া তবে কহ মোরে সব॥
পূর্ব্বে যদি ব্রহ্মময়ী দক্ষকন্যা হলে।
তুমি বা কিরূপে তাঁরে পত্নীভাবে পেলে॥
পরে দেবী যদ্যপি হিমন্তকন্যা হন।
কিরূপে তাঁহাকে পুন পেলে ত্রিলোচন॥
কিরূপে বা প্রসবেন পুত্র দুইজনে।
মহাবল ষড়ানন দেব গজাননে॥
নারদের কথা শুনি কৈলা ত্রিলোচন।
মনোযোগে শুন মুনি পূর্ব্ব বিবরণ॥
জগতে না ছিল পূর্ব্বে তারা সূর্য্য সোম।
না ছিল আকাশ বায়ু দিকের নিয়ম॥
অগ্নি আদি তেজ নাহি ছিলা দিবারাত্র।
পূর্ণব্রহ্মময়ী সূক্ষ্মা একা ছিলা মাত্র॥
পূর্ণব্রহ্মময়ীর মাহাত্ম্য শুন কয়ি।
যোগীর অগম্যা তিনি নিত্যানন্দময়ী॥
জ্ঞানময়ী শুদ্ধা তিনি ক্ষয় নাহি তাঁর।
তাঁহার মহিমা কহা কি সাধ্য আমার॥
উপদ্রবহীনা দেবী জগতব্যাপিনী।
সকলের বড় তিনি শুন মহামুনি॥
তাঁহার হইল ইচ্ছা সৃষ্টির কারণ।
অরূপা আছিলা রূপ করিলা ধারণ॥
চতুর্ভুজা মুক্তকেশী লোহিতনয়না।
দলিত অঞ্জন আভা অম্বুজরসনা॥
কেশরীবাহনা উচ্চস্তনী দিগম্বরী।
চমৎকার মূর্ত্তি হৈলা মহা ভয়ঙ্করী॥
নিজ গুণে কৈলা সত্ত্ব পুরুষ অদ্ভুত।
অচৈতন্য সত্ত্ব রজস্তমগুণ যুত॥
সেই পুরুষেরে দেবী দেখি ততক্ষণে।
আপনাতে আক্রমণ ইচ্ছা কৈলা মনে॥
অঙ্গ সঙ্গে পুরুষ হইলা শক্তি পর।
তিন গুণে তিন হৈলা ব্রহ্মা বিষ্ণু হর॥
তথাপি না সৃষ্টি হয় দেখি মনে ভাবি।
সেই পুরুষেরে দুই অংশ কৈলা দেবী॥
জীবাত্মা হইলা আর পরমাত্মা তায়।
আপনাতে তিন অংশ করিলা স্বেচ্ছায়॥
এক অংশে মায়া হৈলা দ্বিতীয়া পরমা।
তৃতীয় অংশেতে হৈলা পূর্ণ বিদ্যানামা॥
মোহিত করেন মায়া জগত সংসার।
সংসারে প্রবৃত্ত নর এ কর্ম্ম মায়ার॥
জীবেরে ব্যাপিত মায়া সকলের কায়।
তথাপি মায়াকে জীব দেখিতে না পায়॥
মায়া না থাকিলে বল কেবা কোথাকার।
মায়া হেতু বলে লোকে আমার আমার॥
পরিস্পন্দ শক্তি আদি তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্ম।
সংসারে নিবর্ত্ত আদি পরমার কর্ম্ম॥
মায়া ও পরমাশ্রিত স্ত্রী-পুরুষ যত।
মায়াতে হইয়া মগ্ন বিষয়েতে রত॥
বিদ্যা পঞ্চমূর্ত্তি হৈলা শুন মহামতি।
গঙ্গা ও সাবিত্রী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মময়ী তিনি তদন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে॥
প্রত্যক্ষ সবাকে কৈলা করি কৃপাদৃষ্টি।
সৃষ্টি হেতু তোমাদিকে করিলাম সৃষ্টি॥
যারে আমি নিয়োজন করিতেছি যাতে।
তাহাই করহ সর্ব্বে মোর ইচ্ছা মতে॥
রজগুণে ব্রহ্মা সৃজ প্রাণী চরাচর।
অসংখ্য আশ্চর্য্য কর বিবিধ স্থাবর॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু সৃষ্টি পাল সাবধান।
তমোগুণাক্রান্ত হর মহা বলবান॥
সৃষ্টি নাশে ইচ্ছা যবে হবেক আমার।
অন্তে হর এ জগত করিবা সংহার॥
তিনে পরস্পর কর যেই কর্ম্ম যার।
সাহায্য করিব আমি তোমা সবাকার॥
স্বেচ্ছায় সাবিত্রী আদি পঞ্চমূর্ত্তি ধরি।
বিহার করিব হয়ে তোমাদের নারী॥
বহু শত জন্তুর বনিতা হব আর।
প্রসব হইবে প্রাণী বিবিধ প্রকার॥

এক্ষণে করহ ব্রহ্মা সৃষ্টি যত নর।
অন্য সৃষ্টি পশ্চাতে হবেক বহুতর॥
এই কথা কয়ে মহাবিদ্যা পরাৎপরা।
অন্তর্ধান হৈলা ব্রহ্মাদির অগোচরা॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস মহামুনি।
রামনিধি ভণে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১২॥

লঘু ত্রিপদী।

কন শূলপাণি, শুন মহামুনি,
দেবী চলি গেলা যদি।
আজ্ঞা মতে তাঁর, জগত সংসার,
সৃষ্টি আরম্ভিলা বিধি॥
বিচারিয়া ফল, সৃষ্টি কৈলা জল,
সর্ব্ব আগে বিধিবর।
জলময় দেখি, মনে হয়ে সুখী,
তপ আরম্ভিলা হর॥
পূর্ণা শক্তি যিনি, পত্নী হন তিনি,
এই আশা করি মনে।
শুদ্ধাচারী হয়ে, দেবী ধেয়াইয়ে,
বসিলেন যোগাসনে॥
শিব কর্ম্ম জানি, দেব চক্রপাণি,
পরম পুরুষ যিনি।
পূর্ণা পত্নী আশে, তাঁহার উদ্দেশে,
তপে মন দিলা তিনি॥
যাঁহার কারণে, তপস্বী দুজনে,
ব্রহ্মা তাঁরে পাইবারে।
সৃষ্টি ক্ষমা দিলা, তপেতে বসিলা,
বিষ্ণুনাভিপদ্ম পরে॥
আদ্যাশক্তি যিনি, পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি,
পত্নীভাবে তাঁরে পান।
এই বাঞ্ছা করি, ব্রহ্মা হর হরি,
আছেন করিয়া ধ্যান॥
ব্রহ্মাদি তপস্যা, করিতে পরীক্ষা,
পরমা প্রকৃতি যিনি।
বৃহৎ মূর্ত্তি ধরি, [মহা ভয়ঙ্করী,
নিকটে আইলা তিনি॥

ব্রহ্মা যেই স্থানে, আগে সেই খানে,
গেলা হয়ে সকৌতুক।
দেবী মূর্ত্তি হেরি, মহা ভয়ঙ্করী,
ব্রহ্মা ফিরাইলা মুখ॥
ফিরিলা যে মুখে, দেবী সেই দিকে,
পুনরপি দাঁড়াইলা।
সম্মুখে দেখিয়া, অতি ভয় পাইয়া,
পুন মুখ ফিরাইলা॥
চারি দিকে ফিরি, দেবী মূর্ত্তি হেরি,
হইলা চতুরানন।
ব্রহ্মা ভীত হয়ে, তপস্যা ছাড়িয়ে,
শেষে কৈলা পলায়ন॥
দেবী তদন্তরে, বিষ্ণুর গোচরে,
রহিলা হইয়া স্থির।
দেখি ভয়ঙ্করী, ভয় পেয়ে হরি,
হইলা সহস্র শির॥
ভয়ের কারণ, সহস্র চরণ,
সহস্র লোচন হয়্যা।
দেবী মূর্ত্তি হেরি, ভয় পেয়ে হরি,
জলেতে ডুবিলা গিয়া॥
শুন মুনিবর, দেবী তদন্তর,
শিবের সম্মুখে আসি।
মনে চিন্তা কৈলা, দুহে ক্ষান্ত হৈলা,
শিবেরো তপস্যা নাশি॥
চারি দিকে ফিরি, মহাদেবে ঘিরি,
ভীমা কৈলা নানা রঙ্গ।
আপনি হারিলা, করিতে নারিলা,
মহেশের ধ্যান ভঙ্গ॥
শিব জানি ছিলা, মহাবিদ্যা আলা,
তপস্যা চর্চ্চিতে সব।
বুঝিয়া আশয়, না করিয়া ভয়,
ধেয়ানে রহিলা ভব॥
শিবের অটল, তপস্যা সফল,
দেখি পূর্ণা ভগবতী।
শুদ্ধ কলেবরে, [দেখি মহেশ্বরে,
স্বীকার করিলা পতি॥

শুন মুনি কয়ি, দেবী ব্রহ্মময়ী,
পূর্ব্বেতে কৈলা স্বীকার।
সেই দেবী কর্ত্রী, অংশেতে সাবিত্রী,
হইলা ব্রহ্মার দার॥
আর যে উৎপত্তি, লক্ষ্মী সরস্বতী,
যেই দুই দেবী তাঁরা।
পরম পুরুষ, জানিয়া নিস্তব্ধ,
হইলা বিষ্ণুর দারা॥
তপস্যা সাধিয়া, দুহে পত্নী পায়া,
বিভা কৈল শুভ দৃষ্টি।
দেবী স্বেচ্ছামত, চরাচর যত,
ব্রহ্মা আরম্ভিলা সৃষ্টি॥
ব্যাসের রচিত, মহা ভাগবত,
তাহে যে কহিলা তিনি।
ভাষা বিরচনে, রামনিধি ভণে,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১৩॥

পয়ার ছন্দ।

সৃষ্টি করিবারে কয়ে ছিলা ভগবতী।
পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্টি কৈলা সৃষ্টিপতি॥
ক্ষিতি আদি সৃষ্টি ব্রহ্মা করিলেন যত।
কত বা তাহার মধ্যে হয়ে গেল হত॥
ক্ষণেকে সৃজিলা ব্রহ্মা নিজ পুত্র দশ।
মরীচি পুলহ অত্রি ক্রতু অঙ্গিরস॥
প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু নারদ প্রভৃতি।
পুলস্ত্যাদি এই দশ শুন মহামতি॥
দক্ষাদি সৃজন কৈলা মনুষ্যাধিপতি।
মনে জন্মাইলা কন্যা সন্ধ্যা রূপবতী॥
পুত্র এক মনে জন্মাইলা তদন্তর।
কামরূপী কাম হৈলা শুন মুনিবর॥
পুষ্পের ধনুক আর পঞ্চ পুষ্পবাণ।
আপনি বিধাতা কামে করিলা প্রদান॥
স্ত্রী পুরুষ যত আছে ত্রিভুবন পরে।
নিয়োজিলা সর্ব্বলোকে মুগ্ধ করিবারে॥
পরে ব্রহ্মা দুই ভাগ কৈলা নিজ কায়।
বাম অর্দ্ধে শতরূপা কন্যা হৈলা তায়॥
দক্ষিণার্দ্ধে জনমিলা স্বায়ম্ভুব মনু।
তেজস্পন্ন হৈলা যেন মধ্যাহ্নের ভানু॥
স্বায়ম্ভুব মনু হয়ে কামে মুগ্ধ মন।
শতরূপা নামে কন্যা করিলা গ্রহণ॥
শতরূপা ভার্য্যা গর্ভে রূপে গুণে ধন্যা।
স্বায়ম্ভুব মনু হৈতে হৈলা তিন কন্যা॥
পুত্র দুই হৈলা আর শুন মুনিবর।
তা সবার নাম কহি শুন অতঃপর॥
জ্যেষ্ঠা কন্যা আকুতী দ্বিতীয়া দেবহুতি।
তৃতীয়া হইলা কন্যা নামেতে প্রসূতি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত সর্ব্বগুণযুত।
নামেতে উত্তানপাদ কনিষ্ঠ যে সুত॥
দেব-ঋষি তাঁরা দুহে শুন মতিমান।
আকুতি কন্যাকে কৈলা রুচিকে প্রদান॥
কর্দ্দমেরে দিলা যাঁর নাম দেবহুতি।
দক্ষেরে প্রসূতি কন্যা দিলা মহামতি॥
কর্দ্দমের নয় কন্যা দেবহুতি গর্ভে।
অরুন্ধতী আদি হৈলা রূপ গুণা সর্ব্বে॥
কর্দ্দমের কন্যা যত আদি অরুন্ধতী।
তাঁদিগে গ্রহণ কৈলা বশিষ্ঠ প্রভৃতি॥
চৌদ্দ কন্যা দক্ষের হইল তদন্তর।
তা সবার নাম কহি শুন মুনিবর॥
অদিতি প্রথমা পরে দিতি দনু কাষ্ঠা।
সুনি তিমি বিনতা ও কদ্রুর অরিষ্ঠা॥
স্বাহা ভানুমতী পরে এক নাম ভাষা।
বার এই অপর সুরসা ক্রোধবশা॥
স্বাহা কন্যা অগ্নিকে দিলেন করে দান।
তের কন্যা কশ্যপেরে করিলা প্রদান॥
সেই সব পত্নীতে কশ্যপ মুনিবর।
নানাবিধ সন্তান জন্মালো বহুতর॥
বিস্তর হইল প্রজা সংখ্যা করা ভার।
কশ্যপের সন্তানেতে ব্যাপিল সংসার॥
এইরূপে সৃষ্টি সব করিলেন ধাতা।
দেখি তুষ্টা জগদম্বা ত্রিভুবনমাতা॥
পুটাঞ্জলি হয়ে ব্রহ্মা সম্মুখে থাকিলা।
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মে কহিতে লাগিলা॥

মহাভাগবতে যাহা কৈলা দ্বৈপায়ন।
ভাষা মতে দ্বিজ রামনিধি বিরচন ॥ ১৪ ॥

ত্রিপদী।

ব্রহ্মময়ী তদন্তরে, কহিলেন সৃষ্টিকরে,
সাবিত্রী যে মোর অংশে হন।
হয়ে অতি শুদ্ধমনা, সাবিত্রীর উপাসনা,
ত্রিসন্ধ্যা করেন দ্বিজগণ ॥
তিনি তোমা পান পতি, লক্ষ্মী আর সরস্বতী,
আমার অংশেতে হৈল যাঁরা।
ত্রিলোকপালক হরি, দুইজনে তাঁরে বরি,
হরিকে পাইলা পতি তাঁরা ॥
শক্তি পান তেকারণে, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে,
বিষয়েতে হৈলা তৎপর।
ইহা বলি মহামায়া, শিবেরে করিল দয়া,
চলিলেন তাঁরে দিতে বর ॥
দুর্গারে করিয়া ধ্যান, দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান,
বসে যেন অচল প্রস্তর।
পূর্ণভাবে পান নারী, মনে এই বাঞ্ছা করি,
মহাযোগী হয়েছেন হর ॥
শিবের তপস্যা হেরি, কহিলেন বিশ্বেশ্বরী,
সুপ্রসন্না হইলাম আমি।
তব অভিলাষ যাহা, বর চাহ দিব তাহা,
বহু আরাধনা কৈলা তুমি ॥
দেবীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুনেছি যে প্রধানা প্রকৃতি।
যাঁহার অংশেতে হন, ব্রহ্মময়ী পঞ্চ জন,
লক্ষ্মী বাণী সাবিত্রী প্রভৃতি ॥
তার মধ্যে ব্রহ্মা যিনি, সাবিত্রী লইলা তিনি,
লক্ষ্মী সরস্বতী পান হরি।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবতী, আমাকে করহ পতি,
আমি এই অভিলাষ করি ॥
লীলা করি কোনখানে, আপনার স্বেচ্ছাধীনে,
যদ্যপি আপনি জন্ম লও।
প্রসন্না হইলা তবে, আমার বনিতা হবে,
কৃপা করি এই বর দেও ॥
শিবের বচন শুনি, জগদম্বা কৈলা বাণী,
স্বীকার করেছি বর দিব।
প্রকৃতি যে পূর্ণা আমি, প্রার্থনা করিছ তুমি,
তোমার গৃহিণী আমি হব ॥
প্রসূতির গর্ভজাতা, দক্ষ প্রজাপতি সুতা,
হব আমি কিছু দিন পরে।
পূর্ণ ভাবে জন্ম লব, তোমার বনিতা হব,
বিবাহ করিবা তুমি মোরে ॥
দক্ষরাজ তদন্তর, করিবেক অনাদর,
তোমাকে আমাকে অপমানে।
কোপেতে করিয়া ভর, তেজি সেই কলেবর,
পুন আমি যাইব স্বস্থানে ॥
তোমার হবেক মোহ, ত্যজিবা আঁখির লোহ,
অন্তরে করিবা বহু খেদ।
দক্ষে হয়ে অপরাধ, তাহে হবে পরমাদ,
তুমি আমি হইব বিচ্ছেদ ॥
তুমি মোরে পত্নী পেয়ে, অতিশয় প্রীত হয়ে,
তোমাতে আমাতে দুইজনে।
নিজস্থানে গেলে আমি, আমা ছাড়া হয়ে তুমি,
রহিতে নারিবা কোনখানে ॥
অতি সুপ্রসন্না হয়ে, এই কথা শিবে কয়ে,
বিশ্বেশ্বরী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
শুনহে নারদ মুনি, দেবীর বচন শুনি,
তুষ্ট হৈলা শিব ভগবান ॥
তদন্তরে শুন মুনি, একদিন পদ্মযোনি,
মনেতে হইয়া হরষিত।
দক্ষে কৈলা শুন পুত্র, তোমার মঙ্গল সূত্র,
যাহাতে তোমার হবে হিত ॥
পরমা প্রকৃতি যিনি, পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তিনি,
শিব আরাধনা কৈলা তাঁর।
যাচিলেন পত্নীভাবে, শিবের বনিতা হবে,
জগদম্বা কৈলা অঙ্গীকার ॥
অতএব শুন কয়ি, কোনখানে ব্রহ্মময়ী,
জন্ম নিয়া করিবা গ্রহণ।
জন্ম নৈলে ভগবতী, শিব হৈবা তাঁর পতি,
অবশ্য তা না হবে খণ্ডন ॥

যেখানে জন্মিবা তিনি, পতি হৈবা শূলপাণি,
আমার বচন তুমি ধর।
প্রার্থনা করহ তাঁরে, জন্মেন তোমার ঘরে,
ভক্তি ভাবে উগ্র তপ কর ॥
তিনি কন্যা হৈবা যার, কত ভাগ্য কব তার,
সফল জীবন সেই ধন্য।
পিতৃলোক ধন্য তার, হেন কেবা আছে আর,
কত বা সঞ্চয় তার পুণ্য ॥
জগদম্বা আদ্যা যিনি, ত্রিলোকবন্দিতা তিনি,
কন্যা হৈবা যার তপোবল।
তপস্যায় দেহ মন, যদি তব কন্যা হন,
নিজ জন্ম করহ সফল ॥
ব্রহ্মা দিলা অনুমতি, শুনি দক্ষ প্রজাপতি,
কহিলা যদ্যপি ইহা হয়।
পিতা তবে শুন কয়ি, যিনি পূর্ণব্রহ্মময়ী,
মোর কন্যা হয়েন নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা মোরে দিলে তুমি, তপস্যা করিব আমি,
কদাচ ইহাতে নাহি আন।
দ্বিজ রামনিধি ভণে, শুন সবে একমনে,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী গান ॥ ১৫ ॥

পয়ার ছন্দ ॥

ব্রহ্মার আজ্ঞায় তবে দক্ষ প্রজাপতি।
ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে গেলা শীঘ্রগতি ॥
কন্যা হয়ে জন্ম লন ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী।
তপস্যা আরম্ভ কৈলা এই বাঞ্ছা করি ॥
পঞ্চতপা বৃক্ষের গলিত পত্র খেয়ে।
পবন আহার শেষে অনশনে রয়ে ॥
এক পদে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ দুই কর।
এরূপেতে গেল বহু শতেক বৎসর।
অধোশির ঊর্দ্ধপদে সম্বরিয়া টাল।
এইমত তপস্যায় গেল বহুকাল ॥
দেবমানে সংখ্যা তিন সহস্র বৎসর।
অম্বিকারে আরাধিলা দক্ষ প্রজাকর ॥
দক্ষের তপস্যা দেখি ঘোরতর অতি।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে আইলা ভগবতী ॥
স্নিগ্ধ অঞ্জন আভা ভূষা মণিময়।
দীর্ঘ চারি হস্তে খড়্গ পদ্মবরাভয় ॥
মুক্তকেশী দিগম্বরী সুচারু দশনা।
গলে দোলে মুণ্ডমালা কেশরীবাহনা ॥
প্রস্ফুটিত নীল পদ্ম নয়নের ছবি।
মহাতেজস্পন্না যেন মধ্যাহ্নের রবি ॥
দক্ষেরে কহিলা বৎস কিবা চাহ তুমি।
কহ তব মনোনীত বর দিব আমি ॥
দক্ষ কৈলা মাতা যদি দাসে কৈলা দয়া।
মোর গৃহে জন্মে হও আমার তনয়া ॥
দেবী কৈলা দক্ষ তবে শুন মোর বাণী।
পূর্ব্বে মোরে আরাধনা কৈলা শূলপাণি ॥
প্রার্থনা করিলা শম্ভু পত্নী হই তাঁর।
আমিও পূর্ব্বেতে তাহা করেছি স্বীকার ॥
যেখানে জন্মিব পূর্ব্বে আছে সত্য বাণী।
তব ঘরে জন্মে হব হরের গৃহিণী ॥
এই তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি তোমারে।
আমি পূর্ণা প্রকৃতি জন্মিব তব ঘরে ॥
কনক গৌরাঙ্গী হব ত্রিলোকবন্দিনী।
রূপে নিরুপমা হব তোমার নন্দিনী ॥
কিন্তু দক্ষ তব কন্যা থাকিব তাবত।
তপস্যার পুণ্যক্ষয় না হয় যাবত ॥
তোমার তপের পুণ্য ক্ষীণ হৈবে যবে।
তখন যেমন হবে বলি শুন তবে ॥
এইরূপ ধরি পুন তোমার ভবনে।
তব পুরী ছাড়ি আমি যাইব স্বস্থানে ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত আছে আর।
মায়াতে মোহিত হবে জগত সংসার ॥
শিব কৈলা শুন মুনি এই কথা কয়ে।
সহসা গেলেন দেবী অন্তর্দ্ধান হয়ে ॥
দক্ষ প্রজাপতি গেল আপন ভবন।
ব্রহ্মারে সকল কথা কৈলা নিবেদন ॥
তপস্যায় যে বর দিলেন ভগবতী।
ব্রহ্মারে কহিলা তাহা দক্ষ প্রজাপতি ॥
পরে যে প্রকৃতি পূর্ণা আদ্যা সনাতনী।
দক্ষের দয়িতা গর্ভে জন্মিলা আপনি ॥

কালে প্রসূতির হৈল প্রসব সময়।
শুভদিন সুনির্ম্মল দশ দিকচয়॥
শুভক্ষণে কন্যা এক প্রসবিলা তিনি।
কোটি চন্দ্র সম আভা কাঞ্চনবরণী॥
ফুল্ল ইন্দিবর যেন সুদীর্ঘলোচনা।
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী অষ্টভুজা শুভাননা॥
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি হৈল ততক্ষণে!
দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য কৈলা দেবগণে॥
কন্যা হৈলা শুনি দক্ষ তখনি দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা আনন্দিত হয়্যা॥
দশদিনে দক্ষ নিজ বান্ধব সংহতি।
বিচারি কন্যার নাম রাখিলেন সতী॥
শরচ্চন্দ্র সমান বাড়িলা দিনে দিনে।
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রামনিধি ভণে॥ ১৬॥

লঘু ত্রিপদী।

কহেন শঙ্কর, শুন মুনিবর,
কালে যোগ্যা হৈলা সতী।
দক্ষ দেখি তাঁরে, বিভা দিবা কারে,
ভাবিতে লাগিলা অতি॥
পরমা প্রকৃতি, মোর কন্যা সতী,
এ কন্যা কারে বা দিব।
পত্নী অভিলাষে, — ইহাঁর উদ্দেশে,
তপস্যা করিলা শিব॥
ইনি তদন্তর, দিয়াছিলা বর,
প্রতিশ্রুত হৈলা যাহা।
যত্ন করি তবে, তাহে বা কি হবে,
অন্যথা না হবে তাহা॥
কিন্তু অংশে যার, রুদ্র অবতার,
রুদ্র মোর আজ্ঞাকারী।
আদর করিয়া, তাহাকে বরিয়া,
কন্যা দিতে নাহি পারি॥

সতী স্বয়ম্বরে, শ্রেষ্ঠ সুরাসুরে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণে।
নিমন্ত্রণ দেই, উপযুক্ত এই,
না কহিব পঞ্চাননে॥
স্বয়ম্বর জন্য, সভা শিবশূন্য,
উদ্যোগ করিব তবে।
ভবিতব্য গুণে, বিধাতার মনে,
যে থাকে অবশ্য হবে॥
দক্ষ প্রজাপতি, চিন্তিয়া এমতি,
নিমন্ত্রিলা সুরপুরে।
বিনা শূলপাণি, সভা কৈলা তিনি,
সতী কন্যা স্বয়ম্বরে॥
দক্ষের ভবন, অতি সুশোভন,
বর্ণনা করিবে কেবা।
স্বয়ম্বর কাজে, রম্যা পুরী মাঝে,
করিলা আশ্চর্য্য সভা॥
দেবাসুর সর্ব্বে, ঋষি মুনি বর্গে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ।
পেয়ে নিমন্ত্রণ, আসি সর্ব্বজন,
করিলা সভারোহণ॥
তেজে দিবাকর, পরম সুন্দর,
কান্তি চন্দ্রসম আভা।
দিব্য মাল্যধর, পরম সুন্দর,
কনক কিরীটী শোভা॥
দেবতা প্রভৃতি, বসি সুরপতি,
সকলের হস্তী রথে।
আভরণচয়, হেম মণিময়,
দীপ্তি পায় কত মতে॥
ছত্র নানাবিধি, ধ্বজ পতাকাদি,
চামর প্রভৃতি সাজে।
আর বহুমত, তাহা কব কত,
শোভা দক্ষপুর মাঝে॥

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

সংস্কৃত-সাহিত্যে গীতার স্থান।

সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে গীতা যেরূপ সার্ব্বজনীন আদর ও গৌরব লাভ করিয়াছে, নিখিল সংস্কৃত-সাহিত্য-জগতের মধ্যে অপর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে সে আদর, সে গৌরব লাভ যে ঘটে নাই, অবিসংবাদিতরূপে ইহা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে গীতার পরিচয় প্রদান প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়। গীতার বিষয় অবগত নহেন, অধুনা জগতের সমগ্র সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এরূপ মানবই বিরল। প্রাচ্যের ত কথাই নাই, ইহলোক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত আজ গীতার তত্ত্ব-মাহাত্ম্যে ঐকান্তিক মোহিত। পবিত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির মধ্যে গীতার স্থানই বর্ত্তমানকালে যেন সর্ব্বোচ্চ বলিয়াই মনে হয়। কি ব্রাহ্ম-সমাজ, কি আর্য্য-সমাজ, কি সনাতনী-সম্প্রদায়, কি বৈদান্তিক সম্প্রদায় সকলেই প্রগাঢ় আদর সহকারে ও সাগ্রহে গীতার আলোচনায় একান্ত কুতূহলী। রামানুজ-সম্প্রদায়, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে নানকপন্থী, দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সকলেই গীতার মহান্ তত্ত্বে সম্যক্ মুগ্ধ। সংসারবিরাগী অসংখ্য সাধু ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও গীতার অধ্যয়নে অহরহঃ নিবিষ্টচিত্ত—গীতার প্রতি তাঁহাদের সম্ভ্রম দৃষ্টিও অসাধারণ। তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের সুচারু সামঞ্জস্য বিধানে গীতার ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক অপূর্ব্ব ও অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। গীতার পাঠে তাই তাঁহাদের অগাধ আস্থা ও অটুট অনুরাগ। হিন্দু সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র নর নারী দৃষ্টিগোচর হয়, এক গীতা ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা অবগত নহেন। এরূপ সহস্র সহস্র লোকও পক্ষান্তরে বিরল নহে, যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গীতার সমগ্র শ্লোক-তত্ত্ব অবগত নহেন—অথচ গীতার সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান তাঁহাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সমগ্র গীতাখানিকে হস্তামলকবৎ সম্যক্‌রূপে স্মৃতির আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যাও বর্ত্তমানে প্রচুর। প্রতি দিন প্রাতঃসন্ধ্যায় দুইবার করিয়া ভক্তি-সহকারে যথানিয়মে গীতা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, এরূপ লোকও বহুলপরিমাণে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে গীতার ন্যায় অপর কোন গ্রন্থের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ আর বাহির হয় নাই। হিন্দু-পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দুর নিকটও গীতা পরম আদরের সামগ্রী। কি ইংরেজী, কি হিন্দী ও কি ভারতের অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় গীতার অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। জানি না

জগতের আর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে এরূপ সংস্করণ-গৌরব ঘটিয়াছে কি না। এক্ষণে স্বতঃই এরূপ একটী প্রশ্নের উদয় হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নহে যে, গীতার মধ্যে এমন কি অসাধারণ বিশেষত্ব ও অনন্যসুলভ অপূর্ব্বত্ব বিদ্যমান, যাহাতে পরস্পর বিপরীত মত ও ভাব সঙ্কুল ভিন্ন ভিন্ন সমাজমধ্যেও উহার প্রভাব এরূপ নিরঙ্কুশ, এমনই বা কোন্ অচিন্ত্য গরীয়সী শক্তির বলে গীতা মহীয়সী, যাহাতে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহার নিকট চির-নতশির। হিন্দুর অপৌরুষেয় বেদ অবশ্য হিন্দুর নিকট চিরকালই অটুট শ্রদ্ধা ও দিব্য ভাবের আস্পদ বটে, কিন্তু অপরের কথা দূরে থাকুক, উহা সাধারণ আর্য্যাচারসেবী হিন্দুর নিকটও অবারিত দ্বার নহে, কিন্তু গীতা-রাজ্যে সকলেই উন্মুক্ত-গতি। গীতার চিরমনোহর দিব্য নিকুঞ্জে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। গীতা পূত পুণ্য সনাতন কল্পপাদপ। যিনি যে আশা ও যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া উহার দিব্য চারু স্নিগ্ধ তলে উপনীত হন, সে আশা ও সে ভাব তাঁহার তৎক্ষণাৎ সফলতা লাভ করে এমনই গীতার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব! অশান্তি-দাবদগ্ধ সংসারের পথিক চারুছায়াসমন্বিত গীতারূপী মনোজ্ঞ বিটপি-তলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেই তাহার তাবৎ সন্তাপ নিমেষমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই গীতা অধ্যয়ন করিতে পারেন, সেই ভাবেই তিনি গীতাকে নিজ বোধগম্য করিয়া লইতে পারেন এবং সেই ভাবেই তিনি গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন। গীতার আলোচনায় চিন্তা-শক্তি উত্তরোত্তর বিকাশ প্রাপ্ত হয় ও উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। গীতার আলোচনায় সুধীর আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে। গীতা কোমলতা ও কঠোরতার এক অপূর্ব্ব যুগপৎ সংমিশ্রণ! দিব্য ভাবের বিকাশ ও প্রসৃতি বিষয়ে গীতার শক্তি অমোঘ, অথচ উহাতে পার্থিব মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশ ও পরিপুষ্টি পক্ষে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সংসার-নাট্যশালার ঐন্দ্রজালিক মোহ গীতার দিব্যপ্রভাব মূলে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে সমর্থ নহে। এক গীতাই উদ্দীপনা ও সংযম এই উভয় ভাবেরই প্রণোদক। এক দিকে ইহা যেমন পার্থিব কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উন্মেষিত করিয়া মানুষকে ধীরে ধীরে সংসারের কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করে, অন্য দিকে উহা তেমনই আবার তদীয় অন্তরস্থ দুর্দ্দমনীয় রিপু ও মনোবৃত্তিসমূহকে সংযমের সুখময় পথে পরিচালিত করে।

গীতার আর একটি চমৎকার বিশেষত্ব এই যে, ইহা মানুষের মনকে ক্রমাগত নির্দ্দোষ কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করে, অথচ কৃত বা করণীয় কর্ম্মের ফলের সহিত তাহাকে সম্পৃক্ত হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া থাকে। সংসারের অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্ত মধ্যে কি করিয়া মনের স্থৈর্য্য ও শমতা রক্ষা করিতে হয়, একমাত্র গীতাই তাহার নির্দ্দেশক। পক্ষান্তরে পার্থিব কর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূরণ ও আত্মার চিরাকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় লাভের সহায়তা পক্ষেও গীতা আদৌ নীরব নহে। যে সময়ে গীতার প্রচার, ভারতের সেই সুদূর প্রাচীনকালে, হিন্দুসমাজস্থ অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, তাহার দিব্য সমন্বয়সাধনে গীতার প্রয়াস-সফলতাই গীতার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। সার্ব্বজনিকভাবে লোকানুরাগ আকর্ষণ করিবার শক্তি গীতার কেন আছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে, অসঙ্কুচিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, গীতা মানবজীবনের জটিল সমস্যা-সাধন-কল্পে যে অলৌকিক

কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভূমণ্ডলে আর কোন গ্রন্থ সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানি না। জন্ম মরণ-সঙ্কুল মানব জীবনের মধ্যে যে সমস্ত সুস্পষ্ট-বৈষম্য অহোরাত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বল দেখি তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিব্য মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত জগতের আর কোন্ গ্রন্থ করিতে সমর্থ হইয়াছে? ঘাত-প্রতিঘাত-সম্ভূত মানব-জীবনের তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন বৈষম্যরাজির মধ্যে কি করিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে, এই একটি মাত্র প্রশ্নেই মানব-হৃদয় সর্ব্বকালেই দোলায়মান। একমাত্র হিন্দুর গীতাই কিন্তু তাহার সুন্দর মীমাংসক। জ্বালা-যন্ত্রণাময় ও মোহ-মৃত্যু পরিকীর্ণ ক্ষণ-ভঙ্গুর এ সংসারে আমরা প্রতিনিয়তই অসুখ, অশান্তি ও অতৃপ্তি বেষ্টিত—অধর্ম্ম ও দুর্নীতি অনুক্ষণই আমাদের উপর নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অনাবিল সুখ ও ধর্ম্ম-ভাবের পুণ্যসংস্পর্শ লাভ কদাচিৎ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। আত্মা ত কোন অবস্থাতেই সংসারের কলুষ-মালা ভেদ করিয়া দিব্য-ধাম-প্রয়াণোপযোগী অবস্থা লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত পদে পদে উহা নানা পার্থিব তুচ্ছ নীচতা-সংস্পর্শে উত্তরোত্তর মলিন ভাবাপন্ন হইতে থাকে। জীবনের নানা বিসদৃশ ঘটনার আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া আমরা মুহুর্মুহু মুহ্যমান হইয়া পড়ি, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ স্বার্থপরতার দুর্জ্জয় প্রভাব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, সংকীর্ণতার সীমার মধ্যেই আমরা চির অবস্থিত, নৈতিক অধঃপতনে মন আমাদের অবিরাম কলুষিত। যে অনাবিল নিঃস্বার্থ প্রেম অবিরাম বিরাজমান থাকিয়া পরিদৃশ্যমান এই নিখিল বিশ্ব-সংসারকে ঐক্যের এক মহাসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, মানব-প্রকৃতির যে এক চিরমনোরম সৌন্দর্য্যনিবন্ধন মানুষ মানুষ হইয়াও স্বর্গের দেবতা, সে প্রেম সে সৌন্দর্য্য নরকের কীট আমরা—আমাদের মধ্যে কোথায়? বস্তুতঃ এ জীবনে পদে পদে অবসাদগ্রস্ত হওয়ার বহু পথই আমাদের চারিদিকে নিত্য বিদ্যমান। উৎসাহ-বহ্নিকে অবিরাম উদ্দীপিত রাখিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-পাশে উদ্দাম চিত্তকে সতত সংযত রাখিতে পারে, জগতে এমন কিছুর অস্তিত্ব বাস্তবিকই অতি বিরল।

অনেক সময়ে আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য-সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার সমাধানে আমাদের সমগ্র শক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়, তথাপি সেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব কিছুতেই যেন অপসারিত হইতে চায় না। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনে এমন একটি সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তিনি প্রকৃতির কতিপয় বাহ্য ও সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্য পূরিত বিধানের সম্মুখে অবশভাবে মূঢ়চিত্ত হইয়া পড়েন, সে বিধানকে তিনি ঈশ্বরেরই বিধান বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন। উহার উপর মানুষের সমাজের মধ্যেও আবার এবংবিধ কতিপয় বিধান-বন্ধন বর্ত্তমান, যাহার প্রভাব নিতান্ত নগণ্য নহে, সে প্রভাবের সম্মুখেও তাঁহাকে নিত্য নতশির হইয়া থাকিতে হয়। মাঝে মাঝে মানুষের এমনই একটা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তিনি আত্মজীবনের ভীষণ শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়েন, অবাধ ইচ্ছানীতি যে কিরূপ অশান্তিজড়িত, তাহাও তিনি তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সে আলোচনায় তখন তাঁহার হৃদয় এমনই অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, তাঁহার মনে হয়, সংসার-ক্ষেত্রে নিজ কর্ত্তৃত্ব-ভাবশূন্য হওয়াই তাঁহার পক্ষে বরং

ভাল ছিল; অবাধ ইচ্ছাকে তৃপ্ত রাখিয়া এবং স্বভাববিহিত কর্ম্মমাত্রে নিজ কর্তৃত্বের দাবী রাখিয়া, অভিমান-বশে তিনি আর তখন নিজের জীবনকে গৌরবাস্পদ করিয়া তুলিতে চাহেন না, প্রত্যুত সংসার-ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ-কল্পে তিনি তখন ঐকান্তিক আগ্রহবান্ হইয়া কেবল মোহান্ধকারেই বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সংসারপ্রবাহেই আপনাকে ভাসমান রাখিতে বাধ্য হন। কেহ কেহ বা আবার তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব বা পরিচালক বিশেষের উপদেশপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদেরই পাদপদ্মে নিজেদের ইচ্ছাসম্ভূত তাবৎ কর্তৃত্বাভিমান অর্পণ করিয়া সুখী, কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। আত্মাভিমান পূরিত ও স্বেচ্ছাচারমূলক কর্ম্ম নিষ্পত্তি অপেক্ষা উক্ত পথই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা তাঁহাদের জীবনের গুরুতর সমস্যা সাধনোদ্দেশে অকপট ব্যগ্রতা সহকারে অন্তর্নিহিত বিবেকের উপদেশ-বাণী লাভ করিতে সমধিক ঔৎসুক্য সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ ভাবে ভগবানের উপদেশ বাণী লাভার্থেও কেহ কেহ ঐকান্তিক আগ্রহবান্। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও জটিল সমস্যা যাহা, তাহার সমাধান ব্যাপারে একমাত্র গীতাই কেবল সফল চেষ্ট। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে জগতের যাবতীয় সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের নিকট তাই সর্ব্বকালেই গীতার এত আদর, এত গৌরব। গীতার বিশেষ অভিনবত্ব ও সুদুর্লভ অপূর্ব্বত্ব এই যে, যতই উহার আলোচনায় ব্রতী থাকিবে, ততই উহা নিত্য নূতন ভাবে নূতন রসে ও নূতন মাধুর্য্যে তোমার হৃদয়কন্দরকে অভিষিঞ্চিত করিয়া তোমাকে নিত্যই নূতন নূতন রসের আস্বাদন করাইতে থাকিবে। উহা নিত্য উপভোগ করিবে, অথচ উহাতে তোমার বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইবে না। আর্য্য কবির অপূর্ব্ব কবিত্ব-নিদর্শন গীতায়—আর্য্য ঐতিহাসিকের ঐতিহাসিক উপাদান-সম্ভার গীতায়, ভীতি-সঙ্কুল সংসার-কাননের নীতি-মার্গের নির্দ্দেশ গীতায়। গীতা ব্রহ্মচারীর আশ্রয়, গীতা গৃহীর গৃহ-সূত্র, গীতা বানপ্রস্থের অবলম্বন, গীতা ভিক্ষুর ভরসা, গীতা বৈদিকের বেদ, তান্ত্রিকের তন্ত্র, দার্শনিকের দর্শন, তার্কিকের তর্কশাস্ত্র, গীতা আর্য্যের অপূর্ব্ব বিজ্ঞানগ্রন্থ, গীতা ভারতের দিব্য সমুজ্জ্বল অধ্যাত্ম রত্ন। এক কথায় এক গীতাই একাধারে সর্ব্বশাস্ত্র। মোহাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত করিতে গীতার শক্তি অলৌকিক। নিষ্কাম সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে গীতার কৃতিত্ব অসাধারণ। কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির বিস্ময়কর সমন্বয় সাধন করিয়া গীতা জড় জগতে চৈতন্য সঞ্চারের সামর্থ্য ধারণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম যুদ্ধের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিজের পবিত্র বিধান প্রচার দ্বারা গীতা জগতের জীবকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ যুদ্ধ কিছুতেই জীবহন্তারক বা সংসারের উচ্ছেদসাধক নহে, প্রত্যুত উহা কামক্রোধাদি দুরন্ত রিপুকুল সমাক্রান্ত নিষ্কলঙ্ক আত্মার মলিনতা-সম্পাদক পাঞ্চভৌতিক পরিদৃশ্যমান নশ্বর এই দেহের নাশক মাত্র। গীতা কেবল উক্তরূপ দিব্য উপদেশ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; ভারতভূমির চির আকাঙ্ক্ষণীয় অধ্যাত্ম রাজ্যের অক্ষয় যোগভাণ্ডারও গীতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনাদির সহিত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতির লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম যখন বন্ধুবান্ধবগণের অকপট সন্ধি চেষ্টা স্বত্বেও একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীয় সখা সব্যসাচীর স্যন্দনের সারথ্য স্বীকার

করিয়া যথার্থ পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। মহাবলী পরন্তপ অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সেই অজস্র সৈন্য সমাবেশ সন্দর্শন করিয়া সমাগত আত্মীয় স্বজন ও পূজনীয় গুরুগণের আশু বিনাশ আশঙ্কায় একান্ত কাতর ও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই রণস্থলেই অর্জ্জুনের চিত্ত-বৈক্লব্য অপসারণ-মানসে যে দিব্য মধুময় উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই গীতা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্ব শাস্ত্রের শিরোভূষণরূপে গীতা স্বতঃই দেদীপ্যমান। বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মাশ্রয়ের উপদেশই আপাতদৃষ্টিতে গীতার একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, বস্তুগত্যা কিন্তু তাহা নহে। নিজ নিজ স্বভাব-অনুসারেই মানুষ নিজ নিজ করণীয় কর্ম্মাধিকার লাভ করিয়া থাকেন, এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে করিতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পড়েন। কর্ম্ম ভিন্ন জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব, পক্ষান্তরে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহ না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ আদৌ সুদূরপরাহত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও একটি সুদূর অথচ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে বিদ্যমান, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কর্ম্মের ফল শান্তি, অনন্তর নিত্য সুখলাভই জীবের চরম ও মুখ্য লক্ষ্য। ঐ নিত্য সুখই ভগবদ্ভক্তির নামান্তরমাত্র। অতএব ভক্তির সহিত কর্ম্মেরও যে একটি সম্বন্ধ আছে, তাহাও অতি নিশ্চিত। উক্ত ভক্তিই গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য! অর্জ্জুন দেখিলেন, যাঁহাদের সহিত তাঁহার রক্ত মাংসের গাঢ় সম্বন্ধ, যাঁহারা তাঁহার চির-স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি ভালবাসার সুখময় আস্পদ, অকিঞ্চিৎকর রাজ্য-সুখের মোহময় প্রলোভনে তাঁহাদিগকে বধ করিতে হইবে। অর্জ্জুন আরও দেখিলেন—দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় গুরুকে ও ভীষ্মের ন্যায় চিরপূজ্য পিতামহকে সংসারের সর্ব্ববিধ আপদ রাশি হইতে রক্ষা করিতে তিনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তুচ্ছ বিষয় ভোগের স্পৃহা-মোহে তাঁহাদিগের বধসাধনও অনিবার্য্য। অর্জ্জুন আরও বুঝিলেন—নিজের জন্য, নিজের ভ্রাতৃবর্গের জন্য, হস্তিনার বিশাল সাম্রাজ্য করতলগত করিতে হইলে উহাঁদের নিধন-সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, কারণ উহাঁদের বধসাধন ব্যতীত অরাতিপক্ষের উপর জয়লাভ সুদূরপরাহত। দ্রোণ ভীষ্ম বর্ত্তমানে শত্রুপক্ষ যে বিষম অপরাজেয়, অর্জ্জুন দিব্যজ্ঞানে তাহা বুঝিয়াছিলেন। উপস্থিত যুদ্ধোপলক্ষে নিজ অন্তরঙ্গ আত্মীয় বর্গ, অকপট সুহৃদ্-মণ্ডলী ও চির ভক্তি-ভাজন নমস্য গুরুবর্গ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট-সাধন করেন নাই। সম্পূর্ণ নিরপরাধ এরূপ সহস্র সহস্র সমাগত জনের শোণিতে রণস্থল যে রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে হইবে, এই লোমহর্ষণ চিন্তায় অর্জ্জুন আরও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

একদিকে অকারণ ও সকারণ অসংখ্য আত্মীয় স্বজনের বিনাশ-অনিবার্য্যতা, অন্য দিকে বিধাতৃ-বিহিত ক্ষত্রধর্ম্মের কঠোর অনুশাসনে নিজ পৈত্রিক-সিংহাসন অত্যাচারী দুর্য্যোধনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক বংশ প্রতিষ্ঠার অক্ষুণ্ণতা রক্ষার কর্ত্তব্যতা, পরস্পর বিপরীত ভাবসমন্বিত কঠোর সমস্যাময় এবংবিধ অবস্থা-বৈচিত্র্যে অর্জ্জুনের চিত্ত অধুনা বিষম সংক্ষোভিত। কি শিষ্যভাবে, কি পৌত্রভাবে, কি ভ্রাতৃভাবে, কি বন্ধুভাবে, কি প্রাকৃত মনুষ্যভাবে অরাতি পক্ষের তাবৎ লোকের বধ সাধন-প্রয়াস যে অতীব ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানেরই নামান্তর, অর্জ্জুন তাহা বুঝিলেন। পক্ষান্তরে রাজকুমাররূপে, বীরপুরুষরূপে, চিরভক্তি

ভাজন অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ ভ্রাতৃরূপে, সাধ্বী সীমন্তিনী-কুরুকর-নিগৃহীতা পাঞ্চালীর স্বামিরূপে ও লোক-ললামভূতা কুন্তীর বীর্য্যবান্ পুত্ররূপে তদীয় বংশ-গৌরব শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ যুদ্ধোদ্যমও যে তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য, এ বুদ্ধিও তাঁহাতে দিব্য প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়লব্ধ নিজেদের প্রণষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ এবং যে দুর্জ্জয় নীচাশয় পাপাত্মা দুর্য্যোধন দুষ্ট অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তদীয় সাধ্বী পত্নী ও চিরবরণীয়া মাতৃদেবীকে অকারণে বৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিতা ও নিগৃহীতা করিয়াছে তাহার সমুচিত শাস্তিবিধানও যে তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাও অর্জ্জুন বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অবহেলায় যে ঘোর প্রত্যবায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি মোহবশে অর্জ্জুনের দারুণ চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত। অর্জ্জুন বুঝিলেন, কর্ত্তব্যের অবহেলনে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সে পাপ, সে প্রত্যবায় স্বজনহননের প্রত্যবায় অপেক্ষা সমধিক গুরুতর নহে। ইহা বুঝিয়াই যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুনের বিরতিবাসনার সঞ্চার হইল। কিন্তু সেই বাসনা সঞ্চার কালেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই রথে—তাঁহারই পার্শ্বে স্বয়ং বিরাজমান। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ দিব্য প্রজ্ঞাবলে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের জনক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধে অর্জ্জুনের চিত্ত-বৈক্লব্য উপস্থিত হইবে, তাই ঐ ধর্ম্মযুদ্ধের কর্ত্তব্যতা অর্জ্জুনের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়া তাঁহার সংশয়াকুলিত সজ্ক্ষুব্ধ চিত্তকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এই গৃহযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল—তিনি জানিতেন, উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহার কর্ত্তব্যও নিতান্ত সামান্য নহে। ক্ষত্রিয়ের বীর সন্তান ক্ষত্র ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শত্রু-ব্যূহের সম্মুখে তাঁহারই চক্ষের উপর, আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষ-জনোচিত চিত্ত-বৈক্লব্যে অভিভূত হইয়া অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, এবং নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডুকুলে কলঙ্কের দূরপনেয় কালিমা লেপন করিবে, ইহা তিনি কেবল লাঞ্ছনা ও অপমান জনক বলিয়া মনে করিলেন না, প্রত্যুত উহা তাঁহার নিকট ঘোর পাপেরই ভিত্তিভূমি বলিয়া প্রতিভাত হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উভয় সঙ্কট বুঝিয়া চতুরচূড়ামণি অচ্যুত সে সময়ে একটু কূট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। কৌশলী কৃষ্ণ বলিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রাতঃকালে যাহার মুখ প্রথমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তাহারই পক্ষ আমি অবলম্বন করিব। মোহমত্ত দাম্ভিক দুর্য্যোধন রাজোচিত অভিমানে স্ফীত হইয়া যথাসময়ের পূর্ব্বেই আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোভাগস্থ মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া অতি দীন ও ম্লান ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদদেশে আসন পরিগ্রহ করিলেন। চক্রীর কূট চক্র এইখানেই সফলতা লাভ করিল; দীনতার নিকট দাম্ভিকতাকে আজ পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। স্বভাবের সনাতন রীতিই ত এই। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন—পাদদেশে পরন্তপ দীনভাবে সমাসীন। দাম্ভিক দুর্য্যোধন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষোভে রোষে ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কোন্ পক্ষ কাহাকে চাও? নিরস্ত্রমাত্র আমাকে অথবা আমার অযুত পরিমাণ দিব্যায়ুধসম্পন্ন নারায়ণী সেনাকে? তীক্ষ্ণদর্শী অর্জ্জুন নিরস্ত্র কৃষ্ণকেই প্রার্থনা করিয়া বসিলেন, পক্ষান্তরে উল্লাসোদ্বেগে

মোহমুগ্ধ দাম্ভিক দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুত সেনা-সাহায্যই প্রার্থনা করিল। ন্যায় ও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া পশুবলের প্রভাব যে অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহা বোধগম্য করিবার ইহাই দিব্য অবসর। অর্জ্জুন দিব্য দৃষ্টিতে তাহা বুঝিলেন; দাম্ভিক দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারিল না। উভয়ের জীবনের বৈচিত্র্য-পরাকাষ্ঠা এইখানেই স্পষ্ট প্রতিভাত। সেই আসন্ন যুদ্ধ সময়ে জীবনের জটিল সমস্যাপূরিত মুহূর্ত্তে চিত্ত-বৈক্লব্যাভিভূত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সহায়নিরপেক্ষ হইয়া যদি রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যচক্র নিশ্চয়ই অন্য দিকে প্রবর্ত্তিত হইত। অর্জ্জুনের গুণে ও অর্জ্জুনের অকৃত্রিম ভালবাসায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট চির সখ্য পাশে আবদ্ধ। পরস্পরের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব বর্ত্তমান। এ অবস্থায় তাঁহার চক্ষের উপর অর্জ্জুনের মোহ-বুদ্ধি-নিবন্ধন পাণ্ডবকুলের পরাজয় ও আশু বিনাশে তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবেই, তদ্ব্যতীত নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডবকুলে দুরপনেয় কালিমা সঞ্চারও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ধর্ম্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট এ অন্যায়াচার উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। এরূপ গুরুতর বিষয়ে উপেক্ষা করিলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টার অনাবিল জীবনে পাপের সংস্পর্শ সংঘটন অনিবার্য্য। কারণ তাঁহার সে উপেক্ষা দৃষ্টিতে স্পষ্টই বুঝিতে হইবে, পাপবুদ্ধি দুর্য্যোধনের অন্যায়াচারজনিত পাপের সমুচিত শাস্তিবিধান দূরে থাকুক, প্রত্যুত তিনি তাঁহার ধূর্ত্ততা, অসাধুতা, শঠতা ও বিজীগিষা বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া প্রকারান্তরে পরোক্ষে প্রভূত পরিমাণে তাঁহাকে সাহায্যই করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণপ্রাজ্ঞ মহাজন ব্যক্তি কখনই ঐরূপ অন্যায়াচারের প্রশ্রয় প্রদানে তিলমাত্রও প্রস্তুত নহেন। তাই এ যুদ্ধ ব্যাপারে সম্বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই যথাকর্ত্তব্যে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। কিরূপ সূক্ষ্ম তর্ক ও যুক্তি সমন্বিত বুদ্ধি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই গীতার অন্তর্নিবিষ্ট বিষয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারে অর্জ্জুনের হৃদয়ে যে সুগভীর সন্দেহের সঞ্চার হইয়া তদীয় চিত্তকে বিষম সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অতি সাধারণ, অতি স্বাভাবিক—অহোরাত্রই সে সন্দেহ মানবজাতির মনে উদিত হইতেছে। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য উভয় খণ্ডের মানবজাতিই এই মানসিক ভাব-বৈষম্যে সদাই সংক্ষোভিত—জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এ দুশ্চিন্তার দুরন্ত প্রভাব সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত। জীবনের এই জটিল সমস্যা সাধনে অশক্ত হইয়া যখন আমরা নিদারুণ দুশ্চিন্তাবশে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি, তখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সাধু মহাত্মার উপদেশ লাভ আমাদের ভাগ্যে সর্ব্বথা ঘটিয়া উঠা দুর্ঘট। তাই গীতার ন্যায় সনাতন তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থের এত প্রচার, এত গৌরব ও এত আদর।

এক্ষণে এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি ভারতের অথবা জগতের অপর কেহ কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে গীতার অন্তর্নিবিষ্ট আলোচ্য বিষয়ের সন্নিবেশ জগতের কুত্রাপি আর কোন গ্রন্থে কি পরিদৃষ্ট হয় না? পূর্ব্ব মনীষিগণের অজ্ঞাত এমন কোন বিশেষ অভিনব তত্ত্ব গীতায় পরিলক্ষিত হয় কি? শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত তত্ত্বই যে আদৌ মৌলিকতাপূর্ণ এ কথা কি গীতার কৃষ্ণ অসঙ্কোচে বলিতে পারেন? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদে কি গীতা-

প্রকটিত তত্ত্বের সন্নিবেশ ও মীমাংসা নাই। প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এমন কোন কথা বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই, যাহা সম্পূর্ণ নূতন ও আদৌ মৌলিকতা পূর্ণ। তাহাই যদি হইল, তবে জগতের সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে একমাত্র গীতারই বা এত আদর ও এত গৌরব কেন? একটু নিবিষ্ট-চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে এ প্রশ্নের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। গীতার উপাখ্যানভাগ এমনই স্বাভাবিক ও এমনই প্রাকৃত ভাবব্যঞ্জক যে, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সমর্থ। সে পক্ষে ইহা কোন বাধা কোন বিঘ্ন মানে না বা মানিতে চায় না। স্বভাবের নীতি অনুসারে প্রথমেই যে অবস্থাটি মানুষের মর্ম্ম-স্থান স্পর্শ করে, সেই অবস্থা হইতেই গীতার আরম্ভ বা সূচনা। জীবনের জটিল-সমস্যা-সমাধান-প্রয়াসে মানুষের যে পদে পদে অসংখ্য সঙ্কটময় আবর্ত্তে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা, গীতার গল্পাংশ হইতেই তাহা অবগত হইতে পারা যায়, কিন্তু সেই গীতাই আবার পরক্ষণে মানুষকে সন্দেহের সেই সঙ্কটময় আবর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের জীবনেও যখন ঠিক এইরূপ সন্দেহ ও সমস্যার সঞ্চার হইয়াছিল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জ্জুন যখন ঘোর অবসাদ-বশে মুহ্যমান, তখন শ্রীভগবান্‌রূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত এই দিব্য গীতা এমনই অসাধারণ নিপুণতা ও গাম্ভীর্য্য-সহকারে অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তুলিল যে, অর্জ্জুন সকাশে তখন সে সমস্যার দিন সমাধান হইয়া গেল, জীবনের তাবৎ জটিল রহস্যের মীমাংসা তখন তাঁহার হস্তামলকবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসিত তাবৎ বিষয়ের উত্তর বড়ই সরল বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই সুশৃঙ্খলা-গ্রথিত। প্রাকৃত মানব ভাব হইতে তাহার সূচনা বটে, কিন্তু পরিসমাপ্তি তাহার অলৌকিক দেবত্বে। যেরূপে ও যে উপায়ে ক্রমশঃ ভগবানের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সে প্রত্যুত্তর পরিপূর্ণ। জীবন্ত জীবন-নাটকের তাবৎ প্রাণ-স্পর্শিনী শক্তির সমাবেশ তাহাতে বর্ত্তমান। বিজ্ঞতাপূর্ণ বাগ্মিতা ও দিব্য মহ-ভাবে তাহা আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। যে উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসারে বিষয় মাত্রেই বাস্তব জ্ঞান-সঞ্চার হয় ও তাহা হইতে পরোক্ষে দিব্য অভিজ্ঞতা অধিগত হইয়া থাকে, তাহা-রও অবিরাম আশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের সে দিব্য বাণীতে পূর্ণ প্রকটিত। অভিনিবেশসহকারে গীতার আলোচনায় নিযুক্ত হউন, দেখিবেন জীবন-বিজ্ঞানের নানা গুরুগম্ভীর তত্ত্বে উহা পরিপূর্ণ। সে তত্ত্ব-কথার অবতারণায় ভাষার কোথাও কোন জটিলতা নাই, সে অবতার-ণার উপসংহারভাগ অতি সহজ, অতি সরল, অতি স্পষ্ট।

সে তত্ত্বের ভাষার ছত্রে ছত্রে স্নেহ ও ভালবাসার ভাব যেন উছলিয়া পড়িতেছে। প্রাণদানস্বরূপ গীতা তোমার নিকট হইতে কেবল পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা ও ভগবানের অটল বিশ্বাস চাহে, আর কিছুই নহে; সে শ্রদ্ধায় সে বিশ্বাসে অবশ্য তোমার জীবনের সর্ব্ববিধ দুরিত রাশি অপসারিত হয়। কি বিজ্ঞান-শাস্ত্র, কি দর্শনশাস্ত্র—ইহার সুচারু আলোচনা গীতায় বর্ত্তমান। মানবের মানস-রাজ্যে জীবনমরণের যে অস্ফুট দুর্গম প্রশ্নের চির-কাল উদয় হইয়া আসিতেছে, তাহার সুন্দর মীমাংসা এক গীতাতেই দেখিতে পাইবেন। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ঘটিত প্রহেলিকার

সমাধানে, সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে এবং এই বিশ্বরাজ্যে মানবের স্থান নির্ব্বাচনে গীতার কৃতিত্ব অসাধারণ ও প্রভাব অলৌকিক—ভাষারই বা তাহার কি লালিত্য, কি মাধুর্য্য, ছত্রে ছত্রে তাহার সঙ্গীতের যেন মনোরম ঝঙ্কার। বলা বাহুল্য, গীতার সূচনায় ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব বা জটিলতাপূর্ণ বিজ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উত্থিত হয় নাই। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের বধ-সাধনের অনিচ্ছাভাব হইতেই তাহার উৎপত্তি। অর্জ্জুনের মোহ-নিরাকরণে শ্রীকৃষ্ণের সফ-লতা কি সুন্দর, গীতার আলোচনায় তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতার ন্যায় জটিল ও দুরূহ সমস্যা যুক্ত গ্রন্থে একই কথার বার বার অবতারণা ও বাহ্যতঃ পরস্পর বিপরীত ভাব-ব্যঞ্জক বাক্যের যে সমাবেশ থাকিবে, তাহা আদৌ বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে। গীতা সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, ইহার অন্তরগত ভাব ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়—কিছুতেই তাহা প্রতিহত হইবার নহে। ইহার মোহিনী শক্তিতে মানব মাত্রেই বিমোহিত। কাহা-রও কাহারও মতে অদ্বৈতবাদই গীতার উপ-দেশ, অদ্বৈতবাদীরা একমাত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করেন। কেহ কেহ বা গীতাকে দ্বৈতভাবেরই উপদেষ্টা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় হইতেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্,
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

৯ম অঃ ১০ শ্লোক—

"আমারই কর্ত্তৃত্ব-শক্তি-নিবন্ধন,
করেন প্রকৃতি এ বিশ্ব-সৃজন,
তাই জগতের হে কুন্তিনন্দন!
বার বার পরিবর্ত্তন হয়॥

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে, পুষ্টি, অগ্নিবৃদ্ধি এবং শুক্রবৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফনাশক, পিত্তনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক হয়। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন ও নানা দোষ নাশ এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। রাত্রি কালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিবে এবং অজীর্ণ আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া পাত্রে অবশিষ্ট রাখা উচিত নহে (কেন? তাহা বুঝিতে পারিলাম না)। যে ব্যক্তি দিবাভাগে বিদাহী (দাহজনক) অন্নাদি পান ভোজন করে, তাহার পক্ষে সেই বিদাহশান্তির জন্য রাত্রিতে দুগ্ধ সেবন প্রশস্ত।

প্রাতঃকালীন দুগ্ধ গুরু হওয়ার কারণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

"রাত্রৌ চন্দ্রগুণাধিক্যাদ্ব্যায়ামাকরণাত্তথা।
প্রাভাতিকং প্রায়ঃ পয়ঃ প্রাদোষাদ্ গুরু
শীতলম্॥
দিবাকর করাঘাতাৎ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
প্রাভাতিকাত্তু প্রাদোষং লঘু বাত কফাপহম্॥"

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—

"প্রায়ঃ প্রাভাতিকং ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি শীতলং।
রাত্রৌ সোমগুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতস্তথা।
দিবাকরাভিতপ্তানাং ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
বাতানুলোমি শ্রান্তিঘ্নং চাক্ষুষ্যঞ্চাপরাহ্নিকম্॥"

উপরোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাভাতিক দুগ্ধ প্রায়ই গুরু, বিষ্টম্ভী (কফবর্দ্ধক) এবং শীতল, কারণ রাত্রিকাল সোমগুণাধিক (ঠাণ্ডা), তাহাতে আবার জন্তুগণের ব্যায়ামাভাব; প্রাতঃকালের পর জীবগণ সূর্য্যতাপে অভিতপ্ত হয় এবং ব্যায়ামানুশীলন ও বায়ু সেবন করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদের দুগ্ধ প্রদোষে (বিকাল বেলায়) বাতানুলোমন (বায়ুনাশক), শ্রান্তিনাশক, চাক্ষুষ্য (চক্ষুর হিতকারী), লঘু এবং কফনাশক হইয়া থাকে।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিবর্দ্ধনকরং পূর্ব্বাহ্নপীতং পয়ো।
মধ্যাহ্নে বলদায়কং কফহরং কৃচ্ছ্রস্য বিচ্ছেদকম্।

* * * *

রাত্রৌ ক্ষীরমনেকদোষসমনং সেব্যং ততঃ সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ—পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে তাহা বৃষ্য (বলকারক), বৃংহণ (শুক্রবর্দ্ধক) ও অগ্নিবর্দ্ধক হয়। মধ্যাহ্নে পীত দুগ্ধ পুষ্টিকারক, কফনাশক এবং কৃচ্ছ্র (মূত্রকৃচ্ছ্র) নিবারক হয়। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে তাহা অনেক দোষ নষ্ট করে; অতএব সর্ব্বদাই (প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রিতে) দুগ্ধ সেবন করিবে।

অন্যচ্চ—

"নিশা শীতাংশুসংশীতং নিদ্রালস্যশ্রমানুগং।
সঘনং শীতকফকৃৎ ক্ষীরং প্রাভাতিকং ভবেৎ।
গব্যং প্রত্যুষমি ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি দুর্জরম্।
তস্মাদভ্যুদিতে সূর্য্যে যাম যামার্দ্ধমেব বা
সমুত্তার্য্যে ততো গ্রাহ্যং তৎপথ্যং দীপনং লঘু॥"

রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে শৈত্য হেতু এবং নিদ্রা, আলস্য ও শ্রমানুসারে (শ্রমের অভাবে) প্রাভাতিক দুগ্ধ ঘন, শীতল, ও কফকারক হয়। প্রাতঃকালের গোদুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভী (কফবর্দ্ধক) এবং দুর্জর হয় (সহজে জীর্ণ হয় না); অতএব সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর বা অর্দ্ধ প্রহর অতীত হওয়ার পর দুগ্ধ দোহন করিলে, সেই দুগ্ধ পথ্য (হিতজনক) দীপন (অগ্নিবর্দ্ধক) এবং লঘু হয়।

ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—

"নন্থু শিষ্টা ভোজনান্তে দুগ্ধং পিবন্তি।"

(হিতকামী) শিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে (অন্নাদি আহারের পর) দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। ইহার কারণ উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, কুতূহলী পাঠকবৃন্দ তাহা দেখিলেই সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচন।"

আহারান্তে সর্ব্বশেষে দুগ্ধ পান করিবে, কখনও সর্ব্বশেষে দধি আহার করিবে না; ইহার কারণ ভাবপ্রকাশে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারেন।

(১৮)

অবস্থা ও বয়োভেদে গোদুগ্ধের গুণাদির তারতম্য।

যে সকল গাভী ক্ষুদ্রকায়া (ছোট), ব্যায়ামশীলা (চরিয়া বেড়ায়) এবং যত্নে

পালিতা ও সুস্থ দেহবিশিষ্ট, তাহাদের দুগ্ধ সুস্বাদু, অধিক নবনীত ও সর পদার্থ (ছানা প্রভৃতি) যুক্ত হয়, বৃহৎকায় গাভী অপেক্ষা তাহাদের দুগ্ধ পরিমাণে অল্প হইলেও অধিক গুণবিশিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট গাভীর আহার্য্যের পরিমাণও অল্প, অতএব তাহার পালনব্যয়ও কম পড়ে।

সর্ব্বদা বদ্ধাবস্থায় থাকিলে (বাড়িতে বাঁধা থাকিলে) গাভীর দুগ্ধ তত সুস্বাদু হয় না। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গোপালক বলেন যে, বদ্ধাবস্থায় রক্ষিত গাভীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। গাভীকে মধ্যে মধ্যে মাঠে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত, তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যও রক্ষিত হয় এবং দুগ্ধও সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়।

প্রথম-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধে নবনীত অল্প এবং জলীয়ভাগ অধিক থাকে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়বার বৎস প্রসবের পর হইতেই গাভীর দুগ্ধ ক্রমে গাঢ় ও মিষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি সারভাগ বৃদ্ধি পায়। ৫।৬ বৎসর বয়স্কা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৮ বৎসর হইতেই গাভীর দৈহিক বল হ্রাস হইতে থাকে (কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ নহে) এবং তৎসহ দুগ্ধের পরিমাণও কমিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে নবনীত ইত্যাদি বাড়িতে থাকে ও দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয়। ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই গাভীর দুগ্ধ ভাল থাকে; অতঃপর গুণের হ্রাস হয়। অধিকবয়স্কা গাভীর দুগ্ধ শিশুকে ব্যবহার করাইতে হইলে, তাহাতে পরিস্কৃত জল, চুণের জল ও মিশ্রি মিশাইয়া দেওয়া উচিত। জল ইত্যাদির পরিমাণ শিশুর বয়স ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতি বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ তত ভাল নহে। গাভীর বৎস যত বড় হইতে থাকে, তাহার দুগ্ধ পরিমাণে তত কম হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে নবনীত প্রভৃতির পরিমাণ অধিক হইতে থাকে।

রাজনিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"গুণহীনং নিঃসারং ক্ষীরং প্রথমপ্রসূতানাং
মধ্যবয়সাং রসায়নমুক্তমিদং দুর্ব্বলন্তু বৃদ্ধানাম্॥"

অর্থাৎ—প্রথম-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ গুণহীন এবং সাররহিত, মধ্যবয়স্থা গাভীর দুগ্ধ রসায়ন (জরাব্যাধিবিনাশক), বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ দুর্ব্বল (বলকারক নহে)।

আরও কথিত হইয়াছে—

"মধুরং ত্রিদোষনাশনং ক্ষীরং মধ্যপ্রসূতানাং।
লবণং মধুরং ক্ষীরং বিদাহজননং চিরপ্রসূতানাম্॥"

মধ্য-প্রসূতার (গাভীর দুগ্ধ দেওয়ার সম্পূর্ণকালের মধ্যভাগে) দুগ্ধ মধুর ও ত্রিদোষ নাশক। চিরপ্রসূতা গাভীর (যাহার বৎস বড় হইয়াছে) দুগ্ধ লবণ ও মধুর স্বাদযুক্ত এবং বিদাহজনক।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"বষ্কয়িণ্যাস্ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ঃ।"

চিরপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, তর্পণ (তৃপ্তিদায়ক) ও বলকারক।

গাভীকে পুনঃ পুনঃ দোহন করিলে দুগ্ধে ক্রমে নবনীতের অল্পতা হয় এবং বৎসও দুর্ব্বল হইয়া যায়। ইহাতে গাভীরও বলহানি হয়। অতএব দিবসে দুই বারের অধিক গাভী দোহন করা উচিত নহে। বৎস, মাতৃ-দুগ্ধ ত্যাগ করিবার (দুধ ছাড়িবার) অব্যবহিত পূর্ব্বে দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয় এবং তাহা অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। দোহনকালে গাভীর অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সে যাহাতে চঞ্চল, ভীত অথবা বিমনস্ক না হয় এবং দোহনকারী কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে

আহত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দোহনকালে বৎসকে তাহার সম্মুখে এমনভাবে রাখিতে হইবে যে, মাতা অনায়াসে তাহাকে সস্নেহে লেহন করিতে পারে। হঠাৎ আহার্য্য ও স্থান পরিবর্ত্তনে এবং দোহনকারীর পরিবর্ত্তনে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, দোহনের পূর্ব্বে গাভীকে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত। দোহনের পূর্ব্বে গাভীর স্তন ও ওলান ধুইয়া দিলে ভাল হয়। প্রথম দোহনের সময় কিছু দুগ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ ওলানে জমা দুগ্ধ অনিষ্টজনক হয়।

(১৯)

দুগ্ধের বর্ণ দেখিয়া তৎসম্বন্ধে গুণাদি বিচার।

অবস্থা, কাল, জাতি ও আহার ব্যবহার ভেদে গোদুগ্ধের বর্ণ সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য হয়। এস্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দুগ্ধের গুণাদি বিচার বিষয়ে বলা যাইতেছে॥

(১) গাঢ় ও অতি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধে ছানা অধিক থাকে। ঈদৃশ দুগ্ধ, দধি, ছানা, পনীর (Cheese) প্রভৃতি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(২) নীলাভ তরল দুগ্ধ ;—ইহাতে নবনীত ও ছানার ভাগ অল্প থাকে, কিন্তু ইহা মিষ্ট এবং সুস্বাদু ; এবংবিধ দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযোগী ; ইহাতে দধি, ছানা, ভাল নবনীত (মাখন) জন্মে না।

(৩) হরিদ্রাভ গাঢ় দুগ্ধ ;—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মালাই (সর) নবনীত প্রভৃতি প্রস্তুতের পক্ষে এই প্রকার দুগ্ধ প্রশস্ত, কারণ ইহা অধিক নবনীতযুক্ত হয়।

একটী কাচ পাত্রে অল্প দুগ্ধ রাখিয়া সেই পাত্রটী একটু সূর্য্যালোকে ধরিলেই দুগ্ধের বর্ণ লক্ষ্য করা যায়। উদ্দেশ্য ও অবস্থা বিবেচনায় দুগ্ধের বর্ণ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে, কারণ বাজার হইতে আনীত দুগ্ধ অনেক প্রকার দুগ্ধমিশ্রণজাত এবং তাহা কৃত্রিমতা দোষে দূষিত থাকে।

(২০)

দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখার অপকারিতা।

দুগ্ধ যেমন জীবনীয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া ব্যবহার করিলে তেমনই অনিষ্টজনক, এমন কি প্রাণনাশকও হইতে পারে; কারণ বায়ুস্থিত দূষিত জীবাণুর আকর্ষণ ও সম্প্রসারণ পক্ষে দুগ্ধের অসীম শক্তি আছে। মানব চক্ষুর অবিষয়ীভূত অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবাণু বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান আছে, তাহার অনেকগুলিই বিষাক্ত। অতএব গাভী দোহন করিয়াই পাত্রের মুখ তৎক্ষণাৎ আবৃত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধ ধূলি, মক্ষিকা এবং দূষিত জীবাণু হইতে রক্ষিত হইবে। দুগ্ধে দুর্গন্ধও অতি সহজে সঞ্চারিত হয়, অতএব পরিষ্কৃত স্থানেই গোদোহন করা সঙ্গত। গোশালার অভ্যন্তরে গোদোহন করিলে তাহা দোহনান্তে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আনা উচিত। মল মূত্রাদি যুক্ত গোশালাতে এবং পূতিগন্ধময় স্থানে গোদোহন না করাই শ্রেয়ঃ। বাজারে বিক্রয়ার্থ দুগ্ধ প্রায়ই অনাবৃত অবস্থায় আনীত, অতএব এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধের দূষিত জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধিকারক পদার্থ জগতে আর নাই ; তাহাতেই অগ্নিকে

পাবক বলা যায়। বাজার হইতে আনীত ও অনাবৃত অবস্থায় বহুক্ষণ রক্ষিত দুগ্ধ অগ্নিপক্ক না করিয়া ব্যবহার করা কখনও সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে গৃহস্থ মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

(২১)

কি প্রকার পাত্রে গোদোহন, দুগ্ধ রক্ষা ও পান করা উচিত।

গোদোহনের জন্য মৃণ্ময় (মেটে হাঁড়ী), কাষ্ঠময়, কাংস (কাঁসার), কলাই করা লৌহ (Enamelled iron) ও দস্তার পাত্রই শ্রেষ্ঠ ; সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন হাঁড়িই উৎকৃষ্ট। গোদোহন করার পূর্ব্বে যে কোন প্রকার পাত্রই হউক, তাহা বেশ পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। মাটির হাঁড়ি হইলে তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে একটু উষ্ণ ও শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে; ইহাতে পাত্রস্থিত রোগজনক জীবাণু নষ্ট হইয়া যাইবে। ধাতুময় পাত্র কোন প্রকার অম্ল পদার্থ, বালি এবং ভস্ম (ছাই) দ্বারা ঘসিয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয়। ধাতু পাত্রগুলি অম্ল ইত্যাদি দ্বারা ঘসিয়া পুনর্ব্বার গরম জলে ধৌত করিতে হয়। স্থূল কথা, দোহন পাত্র অতি পরিষ্কৃত হওয়া চাই, অন্যথায় দুগ্ধ অচিরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

অধুনা পাত্র বিশেষে রক্ষিত দুগ্ধের গুণাদি বলা যাইতেছে ;—

পাশ্চাত্য মতে কলাই করা তাম্র পাত্র দুগ্ধ রক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ তাম্রপাত্রস্থিত দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়, অতএব তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এই যে—
"তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানং উচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনং।
দুগ্ধেচ লবণং দদ্যাৎ সদ্য গোমাংসভক্ষণম্॥"

তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্টে ঘৃত ভোজন, এবং লবণ যোগে দুগ্ধ পান সদ্য গোমাংস ভক্ষণ তুল্য (অতএব অকর্ত্তব্য)। আরও কথিত হইয়াছে ;—
"গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা।"

ঘৃত ব্যতীত অন্যান্য গব্য পদার্থ তাম্র পাত্রস্থ হইলে মদ্যতুল্য হইয়া থাকে।

মতান্তরে কথিত হইয়াছে,
"পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি"

অনুদ্ধৃত-সার দুগ্ধ (যে দুগ্ধের নবনীত প্রভৃতি উঠান হয় নাই) তাম্র পাত্রে রাখিলে দূষিত হয় না।

পাশ্চাত্য মতে রৌপ্যের গিল্টি করা (Silver plated) অথবা রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা শীঘ্র অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হয়, (টকিয়া যায়)।

লৌহ পাত্রস্থিত দুগ্ধ একটু লালচে (রক্তবর্ণ) হয় এবং তজ্জাত সর প্রভৃতি একটু কাল হয়। কিন্তু ইহাতে দুগ্ধ টক হয় না।

পিত্তলের পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা হরিদ্বর্ণ (সবুজ রং) এবং বিস্বাদ হইয়া যায়।

টিনের পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া তাহা চা'র (Tea) সহিত মিশাইলে নীলাভ হইয়া যায় এবং বিস্বাদও হয়।

পোড়া মাটির নূতন হাঁড়িতে দুগ্ধ রাখিলে তাহাতে মেটে গন্ধ হয়, কিন্তু পুরাতন হাঁড়ি হইলে তাহা হয় না, বস্তুতঃ ইহা দুগ্ধ রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

দস্তা অথবা কাঁসার পাত্রও দুগ্ধ রাখার পক্ষে মন্দ নহে।

চীনামাটি ও কাচের পাত্র তাপের অপরিচালক, অতএব এগুলি দুগ্ধ রাখার পক্ষে প্রশস্ত নহে, কারণ এবংবিধ পাত্রস্থ দুগ্ধ সহজে টক হইয়া যায়।

দুগ্ধ রাখার পাত্র অতি নির্ম্মল ও পরি-

কৃত হওয়া চাই, নতুবা নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

আজকাল এলুমিনাম্ নামক এক প্রকার নবাবিষ্কৃত ধাতু পাত্র প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে দুগ্ধ রাখিলে কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা আমাদের জানা নাই।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে পানীয় পদার্থ (দুগ্ধ প্রভৃতি) মৃণ্ময়, স্ফাটিক (Crystal), কাচ (Glass), মণিময় (বৈদূর্য্য প্রভৃতি) পাত্রে পান করা প্রশস্ত।

চর্য্যা চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

"তাম্রে তাপহরং পাত্রে সৌবর্ণে পিত্তনাশনম্।
রৌপ্যে শ্লেষ্মহরং প্রোক্তং কাংস্যে রক্ত-
প্রসাদনম্॥
আয়সে তু শৃতং ক্ষীরং কৃমিপিত্তকফপ্রণুৎ।
কান্তসারময়ং শ্রেষ্ঠং ত্রিদোষঘ্নং রসায়নম্॥

কুষ্ঠ প্রমেহ পিড়িকা কৃমি গুল্মাগ্রশূলনুৎ।
মৃৎপাত্রে তু শৃতং ক্ষীরং তাম্রপাত্রে শৃতং

তাৎপর্য্য এই যে—তাম্রপাত্রে দুগ্ধ
দিলে তাহা তাপহারী, সুবর্ণপাত্রে পিত্তনাশ
রৌপ্যে শ্লেষ্মানাশক, কাংস্যে (কাঁসারপাত্রে
রক্তনাশক, লৌহপাত্রে কৃমি পিত্ত ও
নাশক হয়, কান্তসারময় পাত্রে (চুম্বক-লৌ
পাত্রে) দুগ্ধ জাল দিলে তাহা ত্রিদোষঘ্ন
রসায়ন (জরা ব্যাধিনাশক) হয়। লৌ
কুষ্ঠ, প্রমেহ, পিড়িকা (চুলকান), কৃমি
গুল্ম, রক্তদোষ এবং শূলনাশক বলিয়া
জানিবে। মৃৎপাত্রে দুগ্ধ জাল দিলে তাহা
তাম্রপাত্রে জাল দেওয়া দুগ্ধের তুল্য গুণ
বিশিষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে তাম্র
পাত্রে দুগ্ধ জাল দেওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ,
আমাদেরও ইহাই মত। অতএব তাম্রপাত্রে
দুগ্ধ জাল না দেওয়াই ভাল মনে করি।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সাহিত্যে শিক্ষা ও ভুয়োদর্শন।

অধুনা আমাদের দেশে কাব্য ও কবিতার অভাব নাই;—অন্ততঃ এই কথা যত্র তত্র প্রকাশ। ৺ বঙ্কিম বাবু স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই", অন্যে পরে কা কথা! অধুনাতন মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে অনেক কবিতা দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল কবিতা কয়জন পড়েন, বলিতে পারি না। কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে ত্রৈমাসিক তালিকা বাহির হয়, তাহা দেখিলেও মনে হয়, বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই আক্ষেপ করেন, "কাব্য কবিতার যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? এক্ষণে সাহিত্যের ও সব হাল্‌কা অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি গুরু বিষয়ে পুস্তক লেখ, তবে ত সাহিত্য উন্নত হইবে।" আবার কেহ কেহ বলেন, "প্রেম বিষয়ক কাব্য অনেক হইয়াছে, এখন বীররসপূর্ণ, জাতীয় ভাব উত্তেজক কাব্য লেখ।" ফলতঃ আমাদের অনেকেরই ধারণা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্য, প্রধানতঃ প্রেমকাব্যের সংখ্যা অনেক হইয়াছে, আর তাহার আবশ্যকতা নাই।

বড়ই দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হই-

ছে যে, কাব্য-সাহিত্যের প্রাচুর্য্যের বিষয় ইরূপ যেখানে সেখানে উদ্ঘোষিত ও প্রচা- ত হইলেও এরূপ প্রাচুর্য্য আমাদের দৃষ্টি াচর হয় না। সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে শি রাশি পদ্য বাহির হইলেও যাহাকে াব্য বলে সেরূপ রচনা কোথায়? বর্ষার ারম্ভে ভূমিতে যেমন সহস্র সহস্র শিলীন্ধ্র দ্গত হয় ও ২।৪ দিন থাকিয়াই কোথায় মলাইয়া যায়, আমাদের এই পদ্য রচনাগুলির স্তিত্বও সেইরূপ অচিরস্থায়ী। অনেক াব্য-গ্রন্থেরই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় না। তবে যে সকল গ্রন্থকার ধনবান্, উচ্চপদস্থ, অথবা যাঁহাদের মুরুব্বি আছে, তাঁহাদের পুস্তকগুলিরই কথঞ্চিৎ প্রচার হয় এবং কতক লোক বুঝিয়া ও অধিকাংশ লোক না বুঝিয়াই "বাহবা" দেন। পদস্থ ও সম্পত্তিশালী গ্রন্থকারদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের আদর ও প্রচার গ্রন্থের গুণের জন্য হয় না,—তাহা গ্রন্থকারদিগের ধনমান ও পদগৌরবাদির ফলমাত্র। অধুনা যে সকল ধনী ও পদস্থ কবির কাব্য সমাজে আদৃত ও পঠিত হইতেছে, তাঁহারা পরলোক গমন করিলে, অল্প হইতে এক বা দুই শতাব্দী পরে তাঁহাদিগের রচিত কাব্যসমূহের দশা কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে "মহাকাব্য" আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলিবেন, 'আছে বৈ কি। মাইকেলের মেঘনাদ বধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র, প্রভাস এই সব ত মহাকাব্য।' আর? উত্তরদাতা এবার নিশ্চয়ই নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে থাকিবেন। সহজেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের সাহিত্যে তবে এই তিনখানি ভিন্ন আর মহাকাব্য নাই! আবার যদি সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলিবেন বাঙ্গালায় মহাকাব্য একখানিও নাই। নাটক? এখানেও বিস্তর মতভেদ। অনেকে গিরীশ বাবু, অমৃত বাবু, ক্ষীরোদ বাবু প্রভৃতির রচিত এবং থিয়েটারে মহাধুমধামের সহিত অভিনীত পুস্তকগুলিকে নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিবেন। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে আমরা নিতান্তই হতাশ হইব।

এরূপ কেন হইল? বাঙ্গালা সাহিত্যে এত কাব্য কবিতা আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তবে অনুসন্ধান করিতে গেলে মহাকাব্য অথবা নাটক একখানিও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেকেরই পছন্দ হইবে না। কিন্তু সত্যের খাতিরে, সাহিত্যের মঙ্গলার্থে, আমাদের "যথাজ্ঞান" উত্তর দিতে হইতেছে। প্রথম কারণ এই যে, দেশে প্রকৃত কবির অভাব। আমাদের দেশের অনেকেরই প্রকৃতি কবিত্ব-ময়, ইহা অতি সত্য কথা। বঙ্গদেশের নরনারীর মধ্যে অনেকেই কৈশোরকালে নিজ নিজ হৃদয়ে কবিত্বের একটা প্রবল আবেগময় প্রভাব অনুভব করেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি নিজ নিজ হৃদয়ের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। বঙ্গভাষা পদ্যরচনার অনুকূল এবং ছন্দঃ ও অলঙ্কারশাস্ত্র না থাকায় যে কোন প্রকারে দুই চারি পংক্তি রচনা করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অনেক অল্পবয়স্ক লেখকই মনে করেন, তাঁহার কবি-প্রতিভা আছে, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই প্রকৃত কবিতা। এরূপ আত্মবঞ্চিত লেখকের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার অবস্থা ভাল, তিনি যাহা লেখেন, তৎক্ষণাৎ পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দেন এবং অনুগত লোক, কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গ প্রভৃতি তোষামোদকারিগণ খুব প্রশংসা

করিতে থাকেন। ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি তিন বা ততোধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিবার পর লেখকের বয়স হয়, তখন তিনি নিজ বিষয় কার্য্যে বা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন,—কবিতা ও কল্পনা চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ বা মাসিক পত্রাদির সাহায্যে নিজ নিজ রচনা প্রকাশ করেন। নিজের রচনা, নিজের নাম, মুদ্রিত দেখিবার একটা মোহ সকলেরই আছে। এইরূপে দেশে নিত্য নিত্য নূতন নূতন কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের উদ্ভব হইতেছে। আমাদের এই অভাগ্য দেশে জাত অসংখ্য মানবশিশুর ন্যায় এই সকল কবিতা-শিশুর জন্মও অত্যধিক, মৃত্যুও তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অত্যধিক। এই সকল রচনা প্রায়ই জন্মমাত্র মরিয়া যায়, অথবা অত্যল্পকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া পরে লোপ পায়।

এই সব লেখকদিগের মধ্যে অনেকেরই মিলাইয়া 'অক্ষর গণিয়া' চলনসই পদ্য লিখিবারও ক্ষমতা নাই। আর সেইরূপ ক্ষমতা থাকিলেই, শব্দে শব্দে মিল দিয়া পদ্য লিখিবার স্বাভাবিকী একটু ক্ষমতা থাকিলেই কবি হওয়া যায় না। তাহা হইলে পাঁচালীকার ৺দাশরথি রায়ও মহাকবি হইতে পারিতেন। কবিতা লিখিতে গেলে প্রতিভা ও শিক্ষা উভয়ই সমান আবশ্যক। প্রস্তর মধ্যে স্বর্ণরেণু স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এই স্বর্ণ-প্রস্তর একখণ্ড লইয়া রাজমহিষীর গলদেশে ঝুলাইয়া দিলে তাঁহার শ্রী বাড়ে কি? বিবিধ কৌশলময় যন্ত্রাদি যোগে প্রস্তর হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম স্বর্ণরেণু সকল একত্র সংগৃহীত এবং নানা শিল্পকলা-দ্বারা সেই সংগৃহীত স্বর্ণ হইতে সুগঠিত ও মণিমাণিক্য খচিত রমণীয় হেমহার প্রস্তুত হইলে তবে রূপ-যৌবনোজ্জ্বলা রাজমহিষীর আদরের ও শোভাবৃদ্ধির সামগ্রী
পুনশ্চ স্বর্ণ না থাকিলে কেবল যন্ত্র-য
শিল্প কৌশল দ্বারা কোন অলঙ্কার হয় ন
যন্ত্রের পারিপাট্যে অথবা শিল্পীর দক্ষ
পিত্তলাদি নিকৃষ্ট ধাতু হইতে ক্ষণস্থা
ঔজ্জ্বল্যশালী একটা নকল কিছু নির্মি
হইতে পারে বটে, কিন্তু দুই দিন পরে ময়
ধরিয়া যে পিতল সেই পিতল হইয়া যাইবে
মহা প্রতিভান্বিত স্কচ্ কবি বারন্স্ (Burns
যদি উপযুক্তরূপ শিক্ষা পাইতেন, তা
হইলে তিনি পৃথিবীর মহাকবি সমাজে অ
সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইতেন, সন্দেহ নাই;
কিন্তু শিক্ষার অভাবে তাঁহার প্রতিভা কেবল
কতকগুলি গ্রাম্য গীত রচনা করিতে পারি-
য়াছে মাত্র। শিক্ষাহীন প্রতিভা কখনই
উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে পারে না;
আবার প্রতিভাহীন শিক্ষা কেবল ছন্দঃ ও
ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের নিয়মগুলি অভ্যাস
করিয়া কোনরূপে কতকগুলি প্রাণহীন পদ্য
রচনা করিতে পারে মাত্র।

আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষাহীন প্রতিভা ও প্রতিভাহীন শিক্ষামাত্র সহায়ে অনেকে শ্লাঘনীয় কবিযশঃ লাভ করিতে অগ্রসর হন, সুতরাং রাশি রাশি পদ্য দ্বারা দেশ ছাইয়া গেলেও বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পত্তি—খাঁটি কাব্য অথবা নাটক খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর হইয়াছে। নকল জিনিসই সস্তা হয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এইরূপ ঝুটা নকল জিনিসেরই আধিক্য হইয়াছে। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিভা ও সৎশিক্ষা উভয়ের একত্র শুভ সম্মিলন না হইলে কখনও কবিত্বের উদ্ভব হয় না। কবিত্ব লাভ করিতে গেলে প্রথমতঃ স্বাভাবিকী প্রতিভা থাকা যেমন আবশ্যক, উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা সেই প্রতিভাকে শক্তিশালিনী

করা তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। কালিদাসের মত রীতিমত তপস্যা করিতে না পারিলে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে, বিশেষতঃ পৃথিবীর সকল প্রকার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ কবির পক্ষে সর্ব্বাদৌ আবশ্যক। সৌন্দর্য্যজ্ঞান কবির মুখ্য সম্পত্তি বা মূলধন। বন উপবন, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, পাহাড় পর্ব্বত, নির্ঝর প্রস্রবণ, ফল ফুল প্রভৃতির প্রাকৃতিক, দেশ জনপদ, গ্রাম নগর, তীর্থ দেবালয়, উদ্যান প্রাসাদ প্রভৃতি মানবসৃষ্ট দৃশ্যাবলী কবিকে অঙ্কিত করিতে হয়। প্রভাত, মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কালের, গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর, পশুপক্ষী তরুলতা মানবাদি জীবসমূহের বর্ণনা কাব্যের সাধারণ বিষয়। রমণীর সৌন্দর্য্য কবিতার আর এক প্রধান উপকরণ। বাহিরের এই সব সৌন্দর্য্যের জ্ঞান ব্যতীত কবিকে মানবহৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ অধিগত করিতে হয়। কবি যদি নিজে এই সব বাহ্য এবং অন্তর সৌন্দর্য্য নিচয়ের প্রত্যক্ষানুভব না করেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে ঐ সকল সৌন্দর্য্যের সজীব আলেখ্য বাহির হওয়ার কোন আশা নাই। এই নিমিত্তই মহাকবি ভবভূতি কবির "শত শিক্ষার" উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যেরূপভাবে হিমালয়ের, মহাসমুদ্রের, মহারণ্যে বসন্ত-বিকাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মহাকবি ভবভূতি যেরূপে দণ্ডকারণ্যভাগের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অমরুশতককার যেরূপে সহস্র প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে মানবহৃদয়ের কোমলতম, পবিত্রতম প্রেমবৃত্তির বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা কি আমরা বঙ্গসাহিত্যের কোন কাব্যে দেখিতে পাই? অসম্ভব। জন্মাবচ্ছিন্নে কলিকাতার বাহিরে না গিয়া এবং শিবপুরের কোম্পানীর বাগান এবং আলিপুরের "জু" বাগানে অরণ্যজাত নিসর্গলক্ষ্মীর শোভার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে মেহগিনি কাঠের টেবিলের নিকট সাটীনের গদীমণ্ডিত চেয়ারে বসিয়া কালিদাস-ভবভূতি-বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিদিগের ন্যায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র অঙ্কন করা যে অসম্ভব, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হয়? পূর্ণচন্দ্রালোকে যেমন সাগরবারি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, প্রকৃতিদেবীর উদার ও পবিত্র অঙ্গশোভা দেখিয়া কবির হৃদয়সমুদ্রও তদ্রূপ উথলিয়া উঠে। নিজে সৌন্দর্য্যসাগরে ডুব দিয়া মজিতে না পরিলে কে অপরকে তাহা অনুভব করাইতে পারে? আমাদের আধুনিক কবিদিগের বর্ণনা যে বালকদিগের মুখস্থ পাঠ সদৃশ নিরর্থক, নির্জীব ও নিষ্ফল বোধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

সংস্কৃত-সাহিত্যে "কবি" বলিয়া পরিচয় দেওয়ারও সুবিধা ছিল না। প্রতিভার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত কবিতার জড়াংশ আয়ত্ব করাও বিশেষ শ্রম-সাপেক্ষ ছিল। ব্যাকরণ, ছন্দ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে উত্তমরূপ অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া কবিতা বা নাটক লিখিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। সেইজন্য তখন আজিকালকার মত রাশি রাশি কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যাইত না। "কবি" নাম বড় আদরের নাম ছিল। রাজা অপেক্ষাও কবি অধিকতর ভাগ্যবান্ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। কবির পূজা সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল। এখন "কবি" বড় সুলভ হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার অন্যতর কারণ, এখন কোন বন্ধন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার ও ছন্দঃশাস্ত্রের অস্তিত্বই নাই। ব্যাকরণও যে আছে, তাহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। সুতরাং বাঙ্গালী কবিরা

সত্য সত্যই "নিরঙ্কুশ"।* তাহার উপর পাঠকমণ্ডলীর সেরূপ বিচার নাই। কাব্য কি তাহার বিচার নাই। কাব্য নাটকাদি প্রায়ই মহিলাদিগের প্রিয়পাঠ্য, তাঁহারা সময়ের আতিশয্যে অতিশয় ভারাক্রান্ত, যেরূপ হউক একটা গল্প বা কিছু পাইলেই কৃতার্থ। সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা বা অনুশীলন এদেশে নাই বলিলেই হয়। কোন কোন মাসিকপত্রে মুদ্রিত পুস্তকাদির সমালোচনা বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহা আদৌ "সমালোচনা"—সম্যক্ প্রকারে আলোচনা—নামেরই যোগ্য কি না, তাহাতেই সংশয়। সমালোচক শুধু বিজ্ঞ ও বিদ্বান্ হইলেই যে ভাল সমালোচনা করিতে পারিবেন, তাহা নহে। কাব্য সমালোচনা করিতে গেলে অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ কাব্যগুলি ভাল করিয়া পড়িবার জন্য সময় ও ধৈর্য্যের আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জ্ঞান, অধিক বিদ্যা, কবিত্ব গ্রন্থকারের অপেক্ষা. না থাকুক, ন্যূন থাকিবে না; তৃতীয়তঃ পক্ষপাত, ব্যক্তিগত প্রেম বা বিদ্বেষ হইতে তাঁহাকে দূরে থাকিতে হইবে। সমালোচনাগুলি পড়িলেই আমাদের মনে হয়, উহা বিদ্রূপ মাত্র। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অথবা ধনবান্ ভূস্বামী প্রভৃতির লেখনী হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই প্রশংসিত হয় এবং অজ্ঞাত দরিদ্র লেখকের পুস্তক সম্বন্ধে "নিয়ম রক্ষার" মত সমালোচনা অর্থাৎ "মন্দ নহে," "অভ্যাস থাকিলে কালে প্রশংসা পাইবার যোগ্য হইবেন" এইরূপ বাঁধা গৎ দুই এক ছত্র ছাপিয়া দেওয়া হয়। এমনও শুনা যায় যে, গ্রন্থকার সমালোচকের সহিত দু' চারি বার দেখা করিয়া তোষামোদ বা উপায়ান্তরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে ভাল সমালোচনা বাহির হয়। স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ডাক্তার) এবং রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের পর নিরপেক্ষ সমালোচনা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা আধুনিক কালের প্রসিদ্ধ সমালোচক, তাঁহাদের শিক্ষা ও প্রতিভার উপর অনেক লেখকেরই তাদৃশী ভক্তি নাই। কর্ণধার ও দিগ্‌দর্শনহীন তরণীর মহাসমুদ্রে যে গতি হয়, উপযুক্ত সমালোচক এবং অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের অভাবে বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যেরও সেইরূপ গতি হইয়াছে।

সকল দেশের সাহিত্যে স্ত্রী-সৌন্দর্য্য কাব্যের এক প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। এই স্ত্রী-সৌন্দর্য্য সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ যেরূপ সূক্ষ্মরূপে দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যের কথা দূরে থাকুক, বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশের কবিগণ তদ্রূপ পারেন নাই। তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মানসিক বিকারে রমণীর দেহের, বদনমণ্ডলের, ভ্রূযুগলের, ওষ্ঠাধরের, ললাটের বিশেষতঃ নয়নযুগলের ভাবান্তর হইয়া কি চমৎকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণ কিরূপ নিপুণতার সহিত তাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়। মানসিক বিকার হইতে নায়িকার রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প, স্বরের জড়িমা এবং হেলা, লীলা, বিভ্রম, বিব্বোক, বিলাস, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, কিলকিঞ্চিৎ প্রভৃতি নানা প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তনসূচক সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে সকলের অনুশীলন আধুনিক সুরুচি-সঙ্গত হইবে কি না জানি না। তবে কেবলমাত্র নয়নের ভাবান্তর সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ আছে, অদ্য তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। মনের ভাবান্তরের সহিত নয়নের ভাবান্তর উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেই ভাবান্তরের মধ্যে এরূপ নিপুণতার সহিত শ্রেণী বিভাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ধন্য তাঁহাদের শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন! এই চক্ষুভঙ্গীই কত প্রকারে কত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহার মধ্যে কতিপয় বিভাগের নাম ও লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি:—

১। অদ্ভুতা।

সমাকুঞ্চিতপক্ষ্মাগ্রা বিস্ময়োদ্ভূততারকা।
সৌম্যা বিকসিতান্তাচ দৃষ্টিঃ স্যাদদ্ভুতাভিধা॥

২। অলস।

অলসং তদভীষ্টার্থাদ্ ব্রীড়াদৈন্যর্যন্নিবর্ত্ততে।

৩। আকেকরা।

আকুঞ্চিতপুটাপাঙ্গ সঙ্গতার্থনিমেষিণী।
মুহুর্ব্যাবৃত্ততারা চ দৃষ্টিরাকেকরা স্মৃতা॥

৪। কটাক্ষ।

যদ্‌গতাগতিবিশ্রান্তিবৈচিত্রেণ বিবর্ত্তনম্।
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তম্ কটাক্ষং প্রচক্ষতে॥
অপাঙ্গে তারাবিক্ষেপঃ কটাক্ষ ইতি কথ্যতে॥

৫। কান্তা।

হর্ষপ্রসাদজনিতা কান্তাত্যর্থং সমন্মথা।
সভ্রূক্ষেপকটাক্ষা চ শৃঙ্গারে দৃষ্টিরিষ্যতে॥

৬। কুঞ্চিতা।

অনাকুঞ্চিতপক্ষ্মাগ্রা পুটৈরাকুঞ্চিতৈস্তথা।
সংনিকুঞ্চিততারা চ কুঞ্চিতা দৃষ্টিরুচ্যতে॥

৭। চতুর।

চতুরং কিঞ্চিদুচ্ছ্বাসান্মধুরা রচনা ভ্রুবোঃ।

৮। জিহ্মা।

ললিতাকুঞ্চিতপুটা শনৈস্তির্য্যগ্বিসর্পিণী।
নিগূঢ়া গূঢ়তারাচ জিহ্মাদৃষ্টিরুদাহৃতা॥

৯। দীনা।

অর্ধস্রস্তোত্তরপুটাচ্ছন্নতারাজলাবিলা।
মন্দসংচারিণী দৃষ্টির্দীনেতি পরিকীর্ত্ত্যতে॥

১০। নির্ব্বিকারা।

ললিতা কুঞ্চিতা যাচ যাচ ধীরাবলোকিনী।
নির্ব্বিকারা চ দৃষ্টিঃ সা সাধ্বেব্যাকারগুপ্তিষু॥

১১। নিষ্পন্দ।

নিষ্পন্দং তদ্‌যদন্যত্র দৃষ্টান্ন স্পন্দতে ক্বচিৎ।

১২। বলিত।

বলিতং তন্নিবৃত্তস্য ভূয়স্ত্র্যস্রাবলোকনম্।

১৩। বিকসিত।

বিকসিত যদ্বিষয়ে বিশেষমবগাহতে॥

১৪। বিকূণিত।

ভাগত্রয়স্য সংকোচো বিকাসস্ত্বপরস্য চ।
যস্যাদ্‌ষ্টির্ব্বিলেক্ষণ তদ্বিকূণিতমুচ্যতে॥

১৫। বিষাদিনী।

বিষাদবিস্তীর্ণপুটা পর্য্যস্তান্তা নিমেষিণী।
কিঞ্চিন্নিষ্টব্ধতারাচ নার্য্যাদ্‌ষ্টির্ব্বিষাদিনী॥

১৬। বিস্তারী।

যেনাশ্লিষ্টো হি বিষয়স্তদ্বিস্তারীতি কথ্যতে।

১৭। বিস্ফারিত।

আয়তং বিস্ফুরত্তারং বিস্ফারিতমুদাহৃতম্।

১৮। বিস্মিতা।

বিস্ময়োৎফুল্লতারাচ হৃষ্টোভয়পুটাঞ্চিতা।
সমা বিকসিতা দৃষ্টির্বিস্মিতা বিস্ময়ে স্মৃতা॥

১৯। প্রসন্ন।

প্রসন্নং তদ্‌ভবেৎ সভ্রূবিলাসং সস্মিতং চ যৎ।

২০। মধুর।

শীতলীক্রিয়তে তাপো যেন তন্মধুরং স্মৃতম্।

২১। মসৃণ।

মসৃণং তত্তু বিজ্ঞেয়মনুরাগকষায়িতম্।

২২। মুকুলা।

সুখোন্মীলিত তারা চ মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে।

* এ সম্বন্ধে আমাদের মহাকবিগণও কিরূপ নিরঙ্কুশ, তাহা পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের রচিত "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামক সমালোচনা পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইবেন। এই পুস্তকে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রসিদ্ধ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নামক মহাকাব্য সমালোচিত হইয়াছে।

রতান্তে চ শ্রমে চৈব সুখসংভোগভাবনে ॥
গন্ধে স্পর্শে চ হর্ষে চ মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে।
মুগ্ধা নিমীলিতাস্তাব মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে ॥

২৩। মুকুলিতা।

দৃষ্টির্মুকুলিতা স্বপ্ন-সুখ-নিদ্রাসু বর্ত্ততে।

২৪। মুগ্ধ।

স্বভাবালোকিতং মুগ্ধং ভাবগর্ভমপিচ্ছলাৎ ॥

২৫। ললিত। ললিতা।

প্রেমার্দ্রযস্ত বিকসত্তারং ললিতমীরিতম্।
মধুরাকুঞ্চিতারাচ সভ্রুক্ষেপা চ সস্মিতা।
সমন্মথবিকারা চ দৃষ্টিঃ সা ললিতা মতা ॥

২৬। লোল।

ধারাবাহিকসঞ্চারো যস্ত তল্লোলমুচ্যতে।

২৭। শঙ্কিতা।

কিঞ্চিচ্চলা স্থিরা কিঞ্চিন্নমিতা তির্য্যগায়তা।
গূঢ়া চকিততারা চ শঙ্কিতা দৃষ্টিরুচ্যতে ॥

২৮। শূন্যা।

তারাসমপুটাস্নিগ্ধা নিষ্কম্পা শূন্যদর্শনা।
বাহ্যার্থগ্রাহিণী শ্যামা শূন্যদৃষ্টিস্তু চিন্তনাম্ ॥
নিশ্চলা সমতারা চ ধ্যানাদ্ গ্রাহ্যমগৃহ্নতী।
তথা সমপুটোপেতা শূন্যা দৃষ্টিরুদাহৃতা ॥

২৯। সস্পৃহ।

ভূয়োভূয়ঃ স্পৃহা যত্র দৃষ্টেস্তৎ সস্পৃহং ভবেৎ।

৩০। স্তিমিত।

স্বগোচরান্ন চাল্যেত যত্তৎ স্তিমিতমুচ্যতে ॥

৩১। স্নিগ্ধা। স্নিগ্ধ।

কিঞ্চিৎ সহাসেব সবিস্ময়েব
সত্রাসমুৎক্ষেপকটাক্ষযুক্তা।
স্নিগ্ধা নিকামং প্রমদৈব নিষ্ঠা
শৃঙ্গারজা দৃষ্টিরিহ প্রদিষ্টা ॥
স্নিগ্ধং যদ্রতিভাবেন স্নেহগ্রামেণ সংযুতম্ ॥

৩২। স্ফুরিতা।

স্ফুরিতাস্নিষ্টপক্ষ্মাগ্রা মুকুলোর্দ্ধপুটাচ্ছ্রিতাঃ।

৩৩। স্মের।

প্রস্ফুরৎ পক্ষ্মতারং যত্তৎ স্মেরমিতি কথ্যতে ॥

চক্ষুর ভাবান্তর এবং তদ্ধেতু দৃষ্টির নানা প্রকার সূক্ষ্ম শ্রেণীর বিভাগ যেরূপ প্রদর্শিত হইল,—এইরূপ বদনমণ্ডলের, ভ্রূযুগলের, ললাটের, গ্রীবার, হস্তপদাদির, বক্ষোদেশের ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকারের বা ভাবান্তরের সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ আলঙ্কারিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্য নাটকে একটী শব্দ, একটী বিশেষণ ব্যর্থ প্রযুক্ত হইত না। সুশিক্ষিত শারীরশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত যেরূপ নরদেহের অসংখ্য অস্থি, মাংস-পেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ুজাল ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত থাকেন, ভারতের পুরাতন কবিও তদ্রূপ সৌন্দর্য্যের অসংখ্য অনন্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম স্তর ও শ্রেণীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচিত একটী শ্লোকের মধ্যে যত সৌন্দর্য্য নিহিত থাকিত, অধুনাতন বাঙ্গালী কবির রচিত একখানি পুস্তকেও তত সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় না। যত দিন বাঙ্গালী কবি শিক্ষার পথে, ভূয়োদর্শনের পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর না হইবেন, যত দিন পর্য্যন্ত দেশে প্রকৃত কাব্যামোদী পাঠক এবং বিজ্ঞ, বিবেচক ও নিরপেক্ষ সমালোচকের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত ছন্দঃ অলঙ্কার ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র রচিত এবং অনুশীলিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উচ্চ অঙ্গের স্থায়ী কাব্য-সাহিত্যের আশা করা নিষ্ফল।* কবি বলিয়াছেন, কাব্য সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অমৃত ফল। আমরা কি সেই অমৃতের অধিকারী হইব না?

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

* ইয়ুরোপে প্রত্যেক দেশে বিশেষ বিশেষ কবির কাব্যালোচনা করিবার নিমিত্ত কত সভা-সমিতি ক্লব স্থাপিত আছে এবং নিত্য নিত্য কত কত নূতন নূতন সভা-সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। এ দেশে প্রকৃত গাঢ়তার সহিত প্রাচীন বা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের অনুশীলন করেন, এরূপ ব্যক্তি দুর্লভ। উন্নতি কি বড়ই সহজ? বাঙ্গালীর নানা বিষয়ে চীৎকার শুনিয়া কবির সেই

"নাচের পুতুল হয় কি বড় তুল্লে উঁচু ক'রে?"

মনে পড়ে।

ভূকম্পন।

ঝড় বৃষ্টি, মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতগুলি এখন পৃথিবীর নিত্য-সহচর হইলেও, ইহাদিগকে কখনই পৃথিবীর চির-সহচর বলা যায় না। কোন এক বিশাল ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা রাশি হইতে স্খলিত হইয়া উত্তপ্ত পৃথিবী যখন তাপ বিকিরণ করিতে করিতে জলস্থল ও প্রাণি-উদ্ভিদ্‌ময় সৃষ্টির সূত্রপাত করিতেছিল, তখন মেঘ বৃষ্টি ও বায়ু বর্ত্তমান আকারে ছিল না। কিন্তু ভূমিকম্প ঠিক্ এখনকারই মত পৃথিবীকে কাঁপাইত। বরং সেই সময়ে উহার প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য উভয়ই অত্যন্ত অধিক ছিল। পৃথিবীর বড় বড় সমুদ্র ও পর্ব্বতগুলি ঐ সকল ভূমিকম্পের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন। ইহাঁরা বলেন,—অতি প্রাচীনকালে ভূপৃষ্ঠ যখন কর্দ্দমবৎ ছিল, তখনকার প্রবল ভূমিকম্প-গুলি উত্তপ্ত কোমল মৃত্তিকা অত্যন্ত অসম করিয়া দিত। আট্‌লান্টিক প্রভৃতি সাগর এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত সেই সকল প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভূমিকম্পের ন্যায় একটা এত বড় প্রাকৃতিক ব্যাপার বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আজ কয়েক বৎসর মাত্র বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা যে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

কোনস্থানে ভূমিকম্প হইলে কি কারণে তাহার উৎপত্তি হইল, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা আজও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না বটে, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদগণ একত্র গণনায় বসিলে, কোন্ বৎসরে ভূকম্পনের প্রাচুর্য্য হইবে, এখন তাহার হিসাব করা চলে; এবং তা ছাড়া পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে এই সকল ভূমিকম্প হইবে, তাহা স্থির করিয়া বলাও এখন ইহাঁদের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না।

ভূমিকম্পের সময় দিক্ ও প্রাবল্যাদি পরিমাপ করিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া অধ্যাপক মিল্‌নি (Milne) সাহেব বিষয়টির অনুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। পরীক্ষাগারের যন্ত্রে অতি মৃদু কম্পনের সময়েও দিক্ ও প্রবলতা আপনা হইতেই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। গত ছয় সাত বৎসরে পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল ভূমিকম্প হইয়াছে, যন্ত্রের লিপি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারই বৈজ্ঞানিকগণ এখন সুস্পষ্ট জানিতে পারিতেছেন। এই সকল কম্পন-লিপি মিলাইয়া দেখা হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভূকম্পনতত্ত্বের যে সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, সেগুলি সত্যই বিস্ময়কর। এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ভূকম্পনকে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ রকমের প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন। অপর প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত ইহার যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, একথা কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে হয় নাই। কিন্তু এখন মিলনি সাহেবের গবেষণার ফলে অনেক প্রাকৃতিক কার্য্যের সহিতই ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থানের সহিত যে ভূমিকম্পের খুব একটা নিকট সম্বন্ধ আছে, মিল্‌নি সাহেব তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। অনেক ভূকম্পনকেই

তিনি পূর্ণিমা তিথির নিকটবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইতে দেখিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন ভূপৃষ্ঠের খুব নিকটবর্ত্তী হয়, বা সূর্য্য যখন ঠিক্ বিষুব রেখার উপরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনও তিনি অনেক ভূকম্পনের সংঘটন দেখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বায়ুমণ্ডলের চাপ ও তাপের পরিবর্ত্তন এবং পৃথিবীর চৌম্বক রেখার বিচলনের সহিতও উহার নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া মিল্‌নি সাহেব স্থির করিয়াছেন।

চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থানের সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনার কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। উহাদেরই আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তি করে। সুতরাং অপর কারণের সহিত এই আকর্ষণ মিলিত হইলে যে সহজেই ভূমিকম্প সংঘটিত হইবে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপ এবং পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তি কোন্ সূত্রে ভূকম্পনের সহিত সম্বন্ধ, তাহা আজও আমরা জানিতে পারি নাই।

পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ (Orbit) যে সমতলে অবস্থিত, পৃথিবী তাহার উপর ঠিক্ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া ঘুরে না। অক্ষরেখাকে (axis) সেই সমতলের উপর বাঁকাইয়া রাখিয়া পৃথিবী আবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু আবর্ত্তনের সময় অক্ষরেখা একবারে নিশ্চল থাকে না। পৃথিবীর আকার আবার ঠিক্ গোল নয়। ইহার বিষুবপ্রদেশের মৃত্তিকারাশি যেন মেরু প্রদেশের তুলনায় ফাঁপিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তা' ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বাংশ সমঘন (Homogeneous) পদার্থ দিয়াও নির্ম্মিত নয়। এই সকল কারণে চন্দ্র সূর্য্য এবং অপর জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমভাবে অসিয়া পড়ে না। কাজেই এই অবস্থায় পৃথিবীর অক্ষরেখা নিশ্চল থাকিতে পায় না। লাটিম ঘুরাইতে থাকিলে, তাহারও অক্ষ নিশ্চল থাকিয়া ঘুরে না। নিজের গুরুত্বে লাটিম্ ভূতলশায়ী হইবার চেষ্টা করে, এবং আবর্ত্তনবেগ তাহাকে খাড়া রাখিতে চায়। এই দুই বেগের ফলে লাটিমের অক্ষরেখার বিচলন আরম্ভ হয়,—ইহার চূড়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কন করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিতে থাকে। পূর্ব্বে যে চন্দ্র সূর্য্যাদির আকর্ষণের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া উহার অক্ষরেখাকে নিশ্চল থাকিতে দেয় না। লাটিমের চূড়া যেমন এক একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কন করিতে আরম্ভ করে, পৃথিবীর অক্ষরেখাও সেই প্রকারে মহাকাশে এক একটি বৃত্ত অঙ্কন করিতে করিতে ঘুরিতে থাকে। প্রায় ছাব্বিশ হাজার বৎসরে এক একটি বৃত্তের পূর্ণাঙ্কন সম্পন্ন হয়।

পৃথিবীর অক্ষরেখার উহাই একমাত্র বিচলন নয়। বৃত্তাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শিরঃসঞ্চলনও (Nutation) অবিরাম চলে। ইহার ফলে বৃত্তাঙ্কন করিতে করিতে অক্ষরেক্ষার প্রান্ত ক্রমাগত সেই বৃত্তক্ষেত্রের ভিতরে বাহিরে যাওয়া আসা করিতে থাকে। এই শিরঃসঞ্চালনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দেখিয়াছেন, ইহাও চন্দ্র সূর্য্যাদি নানা জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের ফল। গণনায় দেখা যায়, যে সকল আকর্ষণে পৃথিবীর অক্ষরেখার বিচলন হয়, তাহাই অনিয়মিতভাবে বাড়িয়া কমিয়া শিরঃসঞ্চলন উপস্থিত করে।

ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় কোন বৈজ্ঞানিকই পৃথিবীর অক্ষরেখার পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত বিচলন বা অনিয়মিত শিরঃসঞ্চলন লইয়া হিসাব করেন নাই। সকলেই পৃথিবীকে একটি নিশ্চল গ্রহ মনে করিয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে

দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে মেরু প্রদেশের মৃত্তিকারাশি বিষুবপ্রদেশে আসিয়া জমা হইয়া পৃথিবীকে চেপ্‌টা করিয়া দিয়াছে, তাহাও হিসাবে ধরা হয় নাই। এই ভ্রমের ফল বৈজ্ঞানিকগণ হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। এই চেষ্টাতেও ইহাঁরা নানা ভূমিকম্পের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পৃথিবীর অক্ষরেখার বিচলনের সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধের কথা অধ্যাপক মিল্‌নির মনে প্রথমে উদিত হইয়াছিল। অক্ষরেখার চারিদিকে সামগ্রী পরিমাণ সমান রাখিয়া কোন জিনিস যখন স্থিরভাবে ঘুরিতে থাকে, তখন জোর করিয়া তাহাকে কোন এক নূতন অক্ষের চারিদিকে ঘুরাইতে চাহিলে জিনিসটিতে একটা বিপ্লবের সূত্রপাত করা হয়। এই অবস্থায় উহার প্রত্যেক অণুটি নূতন অক্ষরেখা চারিদিকে সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। আবর্ত্তনের বেগ প্রচুর হইলে সামান্য বাধাবিঘ্ন তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিবে না; সকল বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা নূতন অক্ষরেখার চারি পার্শ্বে নিয়মিত স্থান অধিকার করিয়া বসিবে।

মিল্‌নি সাহেব অনুমান করিতেছেন, চন্দ্র সূর্য্যাদি নানা জ্যোতিষ্কের অনিয়মিত আকর্ষণে যখন পৃথিবীর অক্ষরেখার পরিবর্ত্তন ও শিরঃসঞ্চলন উপস্থিত হয়, তখন উহার নানা অংশের মৃত্তিকারাশি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন অক্ষরেখার চারিদিকে সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। শিলাময় কঠিন মৃত্তিকা অংশ এই চেষ্টায় নড়িতে পারে না, কিন্তু ভূগর্ভ বা ভূপৃষ্ঠের যে সকল মৃত্তিকা জমাট বাঁধে নাই, সেগুলি ইহাতে বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া পড়ে। মিল্‌নি সাহেবের মতে, ভূগর্ভ বা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশের এই বিচলনই ভূমিকম্পের একটি প্রধান কারণ।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি বুঝিলে অক্ষরেখার বিচলনের সঙ্গে পৃথিবীর নানা অংশের মৃত্তিকারাশিরও বিচলনের চেষ্টা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা পাঠক বুঝিবেন। লর্ড কেলভিন্, হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক হাজার বর্গ মাইল ভূখণ্ড যদি দশ ফিট গভীর মাটি লইয়া ভূপৃষ্ঠে উপরে ছয় শত ফিট উচ্চ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়ায়, তবে পৃথিবীর অক্ষরেখার প্রায় ৩৪ ফিট বিচলন হয়।

জর্জ ডারুইন সাহেবও ঐ প্রকার একটা হিসাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উন্নতি অবনতির দ্বারা যেমন অক্ষরেখার পরিবর্ত্তন হয়, তেমন অক্ষরেখার পরিবর্ত্তন দ্বারাও যে ভূপৃষ্ঠ চঞ্চল হইতে পারে, একথা ইহাঁদের কাহারও মনে আসে নাই। মিল্‌নি সাহেব ইহা বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, যে বৎসরে পৃথিবীর শিরঃসঞ্চলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ঠিক্ সেই বৎসরেই তিনি ভূমিকম্পের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

অক্ষরেখার অনিয়মিত বিচলনে পৃথিবীর শিরঃসঞ্চলন উপস্থিত হইলে ভূকম্পনের উৎপত্তি হয়, এই কথাটি সত্য হইলে, এক স্থানের ভূকম্পনে অতি দূরবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ কম্পন ও অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, যেন একটি ছোট লাটিম তাহার অক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জোরে ঘুরিতেছে, এবং তাহার মাথার উপরকার ক্ষুদ্র ছিদ্রটি দিয়া যেন একটি ছোট গুলি ভিতরে প্রবেশ করান গেল। বলা বাহুল্য, লাটিমটি এখন আর খাড়া হইয়া ঘুরিবে না। যে একটি নূতন ভার ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অক্ষের চারিদিকে সুসজ্জিত রাখিবার সামর্থ্য লাটিমের নাই। কাজেই

এই অবস্থায় সেটি হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিতে থাকিবে। এখন মনে করা যাউক, ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায় আর একটি লৌহ বর্ত্তুলকে যেন লাটিমের ভিতর প্রবেশ করান গেল। দ্বিতীয় গোলকটি প্রবিষ্ট হইবামাত্র লাটিমটি অতি অল্পকালের জন্য ঈষৎ চাপল্য দেখাইয়া বেশ খাড়া হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। এই অবস্থায় যদি কেহ গুলি দুটির অবস্থান পরীক্ষা করিতে চাহেন, তবে তিনি লাটিমের কোন এক ব্যাসের দুই প্রান্তে সে দুটিকে স্পষ্ট অবস্থিত দেখিবেন। ইহার পরও যদি আরও একটি বর্ত্তুলকে লাটিমের গর্ভে প্রবেশ করান যায়, তবে ঠিক্ পূর্ব্বেরই ন্যায় সেটি অতি অল্পকালের জন্য বিচলন প্রকাশ করিয়া স্থির হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে। ভিতরের খবর লইতে গেলে দেখা যাইবে, বর্ত্তুল তিনটি লাটিমের পরিধিকে তিনটি সমান অংশে ভাগ করিয়া অবস্থান করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত লাটিম-বর্ত্তুল ব্যাপারটিকে ভূ-কম্পনতত্ত্বে প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, ঘূর্ণ্যমান লাটিমে দ্বিতীয় বর্ত্তুল প্রবেশ করাইবা মাত্র যেমন বর্ত্তুল দুইটি বিপরীতমুখী হইয়া ব্যাসের দুই প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে, কোন একস্থানে ভূমিকম্প হইলে পৃথিবীর যে প্রদেশ ঠিক্ তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত, সেখানেও একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কারণ দ্বিতীয় বর্ত্তুলটি পাইয়া সেটিকে প্রথমের বিপরীত দিকে টানিয়া আনিয়া যেমন লাটিমটি স্থিরভাবে ঘুরিতে পারিতে ছিল, পৃথিবী সে প্রকার কোন জিনিসই ভূপৃষ্ঠে পায় না। কাজেই যেস্থানে ভূমিকম্প হইয়া তথাকার মৃত্তিকারাশি ঠিক বিপরীত দিকের মাটিকে কাঁপাইয়া ফাটাইয়া সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, লাটিম-বর্ত্তুলের হিসাবটা যত সহজ, পৃথিবীকে লাটিম মনে করিয়া এবং ভূমিকম্পের মৃত্তিকা-স্ফীতিকে বর্ত্তুল ধরিয়া গণনায় বসিলে হিসাব তত সহজ হয় না। ভূকম্পনের গণনায় ভূমধ্যাকর্ষণকেও হিসাবের ভিতর টানিয়া আনিতে হয়, এবং তা ছাড়া নানাপ্রকার বিচলন সত্ত্বেও, পৃথিবীর সমবেত সামগ্রী-পরিমাণ যে অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, তাহাও মনে রাখিতে হয়। কাজেই হিসাব জটিল হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহার ফল অবিকল লাটিম-বর্ত্তুলের ফলের অনুরূপ হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কেবল অনুমানমূলক নয়। বহু ভূকম্পন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার সত্যতা হাতে হাতে দেখা গিয়াছে। উদাহৃত লাটিমের ভিতরকার বর্ত্তুলত্রয় যেমন পরিধিকে তিন ভাগে খণ্ডিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একই ভূকম্পনের সেই প্রকার ত্রিমূর্ত্তি কয়েকবার সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে।

গত ১৯০৬ সালের ভূমিকম্পের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। ৮ই এপ্রিল তারিখে বিসুভিয়সে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ঘন ঘন কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আবার সেই মাসেরই ১৬ই তারিখে ফরমোজায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং ১৮ই তারিখে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহর একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই তিনটি স্থানকে ঠিক একই অক্ষাংশে (Latitude) অবস্থিত দেখা যায়, এবং পরস্পরের ব্যবধানগুলিকেও ঠিক একই দেখা গিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের একতাকে কখনই আকস্মিক বলা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি ছাড়া অধ্যাপক মিল্‌নি সাহেব ভূমিকম্পের দ্বিত্ব ও ত্রিত্বের আরও অনেক উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯০৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ভূমিকম্প হওয়ার পরই ২৯শে তারিখে কলিকাতায় একটি কম্পন অনুভূত হয়, এবং সেই বৎসরেরই ১৭ই আগষ্ট তারিখে ভালপারেসের (Valparaise) ভীষণ ভূমিকম্পের দু'দিন পরেই আষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সহসা কম্পিত হইয়া পড়ে। ভূচিত্রে ঐ স্থানগুলিকে ঠিক পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থিত দেখা যায়।

মিল্‌নি সাহেবের সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা গুলির একতা দেখিলে, উহার সত্যতার প্রতি আর সন্দিহান হইবার কারণ দেখা যায় না। সুতরাং যে বৎসরে পৃথিবীর অক্ষরেখার অধিক বিচলন হয়, সে বৎসরটা যে পৃথিবী শান্তিতে কাটাইতে পারিবে না, তাহা এখন প্রায় নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে কোন্ সময়ে ভূমিকম্প হইবে, তাহা দ্বিত্ব ত্রিত্বের নিয়মানুসারে চালনা করিয়া স্থির করার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই। কোন স্থানে ভূমিকম্প হইলে তাহার ঠিক বিপরীত প্রদেশের মৃত্তিকারাশি কাঁপিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সেখানকার ভূগর্ভের অবস্থা কম্পনের অনুকূল না হইলে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা অধিক আসিয়া দাঁড়ায়। কাজেই কোন স্থানে ভূকম্পন হইলে সেই অক্ষাংশের অপর দুই তিন স্থানে কম্পনের সম্ভাবনা আছে, কেবল ইহাই এখন বলা যাইতে পারে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কাশ্মীরের পথ।

আমি ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ কাশ্মীর-ভ্রমণ-মানসে বারাণসী ধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। আশ্রয় স্থান হইতে একাযোগে দিবা প্রায় ৯৷৷০ ঘটিকার সময় শিকুরোল ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, আউধ এবং রোহিলখণ্ড বিভাগের পশ্চিমগামী ডাকগাড়ী (এই ডাকগাড়ী পশ্চিম প্রদেশের মোগলসরাই হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা পেশোয়ার পর্য্যন্ত যাতায়াত করে) প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত। সুতরাং আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। পূর্ব্বাহ্ণ ঠিক ১০টার সময় শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র গাড়ী ছাড়িল—মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল; ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

আমি গতিশীল ট্রেণের উভয় পার্শ্বস্থ রমণীয় দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যথাক্রমে প্রতাপগড়, রায়বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, বালামউ, সাজাহানপুর, বাঁশবেরেলী, মুরাদাবাদ, নজিমাবাদ ও সাহারাণপুর প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন নগর সকল অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ (পঞ্জাব) প্রদেশে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর গতির বিরাম নাই; বিশিষ্ট ষ্টেসন সমূহে কোথাও ১০, ১৫, ২০ মিনিট অপেক্ষা করিয়া শত শত যাত্রী ত্যাগ ও গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত ছুটিয়াছে। কতজন গাড়ীতে উঠিল, ব্যগ্রতা বশতঃ দ্রব্যাদি পড়িয়া রহিল, কাহার বা দ্রব্যাদি রহিয়া গেল বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, ইত্যাদি প্রকার লোকের দুঃখ-কোলাহল শ্রুত হওয়া গেল। নিবিড় অন্ধকার; রাত্রি প্রায় তৃতীয়

প্রহর অতীত। চক্ষে নিদ্রা নাই। গাড়ী চলিলে আমার নিদ্রা হয় না, কাজে কাজেই আমি যথাস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া আছি। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন উষার আলোকে উদ্ভাসিত হইল। গাড়ীও আম্বালা ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সাহারাণপুর পরিত্যাগ করিয়া গাড়ী এন্. ডবলিউ রেল লাইন (উত্তর পশ্চিম রেল পথ) দিয়া চলিতেছে। এই লাইন সাহারাণপুর হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে। আম্বালা ষ্টেসনে ই, আই, রেল লাইনের সহিত এন্, ডব্লিউ লাইনের সংযোগ হইয়াছে। দিনকর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উভয় লাইনের কাল্‌কা ও পেশোয়ার-গামী ডাকগাড়ী এই স্থানে একই সময়ে উপস্থিত হইল। গাড়ী এইস্থানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বলিয়া, আমি গাড়ী হইতে নামিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম। দেশভেদে লোকের আকৃতি প্রকৃতি পরিচ্ছদ ও ভাষাগত অল্পাধিক পরিবর্ত্তন স্বভাবসিদ্ধ। এখানে সে প্রভেদ বেশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল। প্লাটফর্ম্মে বিচরণশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলের মস্তকেই বৃহৎ আয়তনের এক একটী পাগড়ী শোভা পাইতেছে। কাহারও কাহারও কেশ শ্মশ্রু স্বাভাবিক রহিয়াছে, দেহও সুদীর্ঘ, দেখিলেই সুপুষ্ট ও সুদৃঢ় বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতি নির্ভীকতা-ব্যঞ্জক, ভাষা পঞ্জাবী।

যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবামাত্র আম্বালা ত্যাগ করিয়া গাড়ী আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। একে একে পঞ্চনদ প্রদেশের আম্বালা, রাজপুড়া, লুধিয়ানা, বিল্বৌড়, জলন্ধর, অমৃতসহর, লাহোর ও গুজরানওয়ালা অতিক্রমপূর্ব্বক বেলা ২॥০টার সময় উজিরাবাদে আমাকে নামাইয়া দিয়া ট্রেন পেশোয়ার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। আমার জম্বু পর্য্যন্ত টিকিট ছিল, এই উজিরাবাদে নামিয়াই অন্য লাইনে জম্বু যাইতে হয়। সুতরাং এইস্থান হইতেই আমাকে জম্বু লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। কিন্তু আমি নূতন যাত্রী, কোথা হইতে জম্বুর গাড়ী ছাড়িবে, তাহা জানি না। সম্মুখেই এক খানা ট্রেন সজ্জিত; যাত্রিগণ মহাব্যস্ততার সহিত সেই ট্রেনে আরোহণ করিতেছে। আমি পঞ্জাবী ভাষানভিজ্ঞ বলিয়া কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না। চিত্ত ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হইতেছে; ক্ষুৎপিপাসায় দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক ভাগ্যক্রমে এমন সময় একজন টিকিট কলেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া তাড়না সম্ভোগের সহিত জানিলাম, "সম্মুখেই জম্বুর ট্রেন, এখনই ছাড়িবে।" ক্ষণকালের জন্য আমার ক্ষুৎপিপাসা উড়িয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। এই ট্রেন বরাবর জম্বু পর্য্যন্ত যায় না, অর্দ্ধ পথ শিয়ালকোটে গিয়া থাকে। পরে রাত্রি ৮টার সময় যে ট্রেন যায়, তাহাতে জম্বু যাইতে হয়। শিয়ালকোটে যাইয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। এক ব্যক্তির নিকট জানিলাম, উজিরাবাদে থাকা অপেক্ষা শিয়ালকোটে গিয়া অপেক্ষা করাই ভাল। কারণ সেই স্থানে স্নানপানের ও বিশ্রামের বেশ সুযোগ আছে।

গাড়ীতে উপবেশনের পরেই ট্রেন ছাড়িল। এই লাইনের গাড়ী অতি ছোট ছোট; অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে চলিতে লাগিল। রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত প্রান্তর গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যে ধূ ধূ করিতেছে। তন্মধ্যে কৃষকগণ কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিয়া এক একখানি হরিৎ শ্যামবর্ণের শস্য ক্ষেত্র জন্মাইয়াছে। বিশুষ্ক প্রান্তর মধ্যে বায়ু-আন্দোলিত শ্যামল শস্যের ক্ষেত্রগুলি

কি মনোহর সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছে। যেন গ্রীষ্মাকাশে খণ্ড খণ্ড নব জলধর উদিত হইয়াছে। চাতক মেঘ দেখিলে জল প্রাপ্তি আশায় যেরূপ প্রফুল্ল হয়, আমিও পিপাসিত থাকায় শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি দর্শনে সেইরূপ বোধ করিতেছিলাম। অবশেষে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী শিয়ালকোটে উপস্থিত হইল। আমিও অবতরণপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ পান্থশালার ও স্নানার্থ জলাশয়ের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম।

ষ্টেশনের সমীপেই প্রাচীন বৃহৎ বট বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত একটী স্থান দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহার সংলগ্নেই একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কূপ আছে। এই আশ্রমে একজন বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন, তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি তথায় বিশ্রামস্থান পাইলাম। আশ্রমস্থ বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম, এবং শৌচাদি সমাপনান্তে কূপের স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া শরীর জুড়াইলাম ও আকণ্ঠ জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিলাম। দুই দিনের ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত অবস্থায় এই কূপের জল যেন অমৃতবৎ বোধ হইল।

এই স্থানের অনতিদূরেই শিয়ালকোট সহর, বহির্দ্দেশ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন, কেবলই অট্টালিকা-শ্রেণী, উহার অভ্যন্তরে চলাচলের পথ বা গলি নাই। আমি বাবাজীর নিকট দ্রব্যাদি রাখিয়া জলযোগ ও সহর দর্শন মানসে তদভিমুখে গমন করিলাম। শিয়ালকোট সহরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী, আয়তনেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; প্রশস্ত রাজপথ সকলের উভয় পার্শ্ব বড় বড় অট্টালিকা ও বিপণীমালায় পরিপূর্ণ। নগরের সংলগ্নে একটী প্রাচীন ভগ্ন দুর্গ আছে। উহা প্রায় সমতল ভূমি হইতে ২৫।৩০ ফিট উচ্চ হইবে। সহরের দিক হইতে দুর্গে আরোহণের একটী প্রশস্ত সোপান আছে। আমার কার্য্য সমাপ্ত হইলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কৌতূহল বশে দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এই উচ্চ ভূমিখণ্ড সুবিস্তৃত; এক সময়ে উহা সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কালের প্রতিঘাতে এক্ষণে তাহার কোনও প্রকার শ্রী নাই। কেবল একদিকে একটী থানা আছে; তাহাতে নগর-পুলিশ থাকে। অপর দিকে সাধারণের একটী পাঠাগার আছে। তাহাতে নগরের লোকেরা আসিয়া সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পড়ে। অপর সমস্ত স্থান খোলা ময়দান। এই উচ্চ স্থান হইতে সহরের অনেক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরিকেরা সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে এখানে বায়ু সেবন করিতে আসিয়া থাকে।

গাড়ী আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই মনে হওয়ায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাবাজীর সহিত আমার দুই চারিটী কথার আদান প্রদান হইল; তন্মধ্যে বিশেষ কথা এই, আমি যে ৺কাশীধাম হইতে ৩০।৩২ ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালকোটে আসিয়াছি, তাহা কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। যাহা হউক, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাবাজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ষ্টেসনে আসিয়া জানিলাম, এখনও গাড়ী আসিতে ১॥০ দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সুতরাং প্লাটফর্ম্মের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ষ্টেসনের মধ্যে আমি একমাত্র বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সমস্তই তদ্দেশীয়, উচ্চ নীচ সকল অবস্থার লোকই পরস্পর সহাস্য কৌতুকের সহিত পঞ্জাবী ভাষায় বাক্যালাপ করিতেছে।

ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও এ সকল আমি অল্প-বিস্তর বুঝিতে পারিতেছিলাম। আমার পক্ষে ভাষা নূতন বলিয়াই হউক, অথবা ভাষার লালিত্য জন্যই হউক, পঞ্জাবী-বুলি আমার কর্ণে বেশ মধুর বোধ হইতেছিল। আমার পার্শ্বেই জম্বুগামী এক ভদ্রলোক ২টী শিশু সন্তান লইয়া খেলা করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রীড়া কৌতুকেও আমার মন আকৃষ্ট হইতেছিল। পঞ্জাবের লোকদিগের মধ্যে কৌতুক-প্রিয়তা কিছু অধিক বলিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৮টা বাজিল, ট্রেন ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমিও আমার যৎসামান্য তল্পী লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমি একাকী, জম্বু অপরিচিত স্থান, তাহাতে রাত্রিকাল, বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে ২।১ ব্যক্তিকে আমার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর না পাওয়ায় কিছু চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু আমি যে গাড়ীতে উঠিয়াছি, সেই গাড়ীতে আমার পূর্ব্ব পরিচিত (উজিরাবাদ হইতে আগত) জম্বু ষ্টেটের সৈন্য বিভাগের এক-জন কর্ম্মচারীও আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি স্বেচ্ছায় আমাকে সেই স্থানে পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অতি-ক্রম করিয়া রাত্রি ১০টার সময় তাওই নামক ষ্টেসনে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। তাওই জম্বুর ষ্টেসন; এই লাইন এইখানেই শেষ হইয়াছে। কাশী হইতে জম্বু অর্থাৎ তাওই ষ্টেসন পর্য্যন্ত ইণ্টার ক্লাশের ভাড়া ১৩৶১০ তের টাকা সাড়ে তিন আনা মাত্র।

গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সৈনিক পুরু-ষের সহিত আমি একা আরোহণ করিলাম। জম্বু একটী নিম্ন পার্ব্বত্য প্রদেশ, ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় ১ মাইল দূরে কিঞ্চিদুন্নত পাহা-ড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যে তাওই নামক একটী নদী প্রবাহিত আছে। এই নদীর নাম অনুসারে ষ্টেসনের নামকরণ হইয়াছে। দূর হইতে নগরটী বহিঃপ্রাকার ও বৃহৎ তোরণ-পরিরক্ষিত দুর্গের মত পর্ব্বতোপরি পরিদৃষ্ট হয়, এবং নগরাভ্যন্তরস্থ উচ্চ উচ্চ সৌধমালা ও অত্যুচ্চ মন্দিরশিখর সকল বহির্দ্দেশ হইতে অতি সুন্দর দেখায়।

আমরা একা যোগে তাওই নদীর দোদুল্য-মান বৃহৎ সেতু পার হইয়া ক্রমে নগর-তোরণ সমীপে আসিলাম। এই দ্বার শতাধিক সোপান উপরি অবস্থিত। পাদচারীদিগের পক্ষে প্রবেশ ও বহির্গমনে ইহাই নগরের প্রশস্ত কটক। শকটাদির জন্য ক্রমোন্নত আর একটী পথ আছে, তাহা পাহাড়ের গাত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আমরা সেই পথে একা যোগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো-হণ করিতে লাগিলাম। জ্যোৎস্নাদীপ্ত জম্বু রাজনগরীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে অনতিবিলম্বে একা আর একটী তোরণ দ্বারের মধ্য দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। সহরের মধ্যে একা কিছুক্ষণ চলিবার পর একটী অত্যুচ্চ মন্দির সমীপে যাইয়া দাঁড়াইল। উভয়ে একা হইতে নামিয়া নিজ নিজ ভাড়া দিয়া একাওয়ালাকে বিদায় করিলাম। পরে সেই সহগামী সৈনিক পুরুষ মন্দির নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই সেই ৺রণবীরেশ্বর মন্দির; মহান্ত সরস্বতী গিরিজি ঐ মন্দিরেরই মহান্ত। আপনি তথায় যান। তাঁহার সৌজন্যে আমি পরিতুষ্ট ও বড়ই উপকৃত হইলাম। তিনি আমার নিকট বিনীতভাবে বিদায় চাহিলে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

ধীরে ধীরে অদূরবর্ত্তী মন্দির সংলগ্ন

আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমস্থ প্রায় সকল ব্যক্তি তখন নিদ্রিত; ২।১ জন যাহারা জাগরিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সরস্বতী গিরিজি আশ্রমে উপস্থিত নাই, হরিদ্বারে গিয়াছেন। উক্ত মহান্তজীর সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। যাহা হউক, সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ আমাকে তথায় থাকিবার আশ্রয় দিলেন। আমিও মাত্র এক ঘটী জল দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া আমার কম্বল মাটীতে বিছাইয়া তদুপরি শ্রম-ক্লান্ত দেহ লম্বিত করিয়া সর্ব্বসুখ অনুভব করিলাম, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

মহান্তজীর সহিত কাশ্মীর যাইব এরূপ কথোপকথন পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই হেতু আমি জম্বুর পথে আসিয়াছিলাম। মহান্তজীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া কয়েক দিন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কার্য্যবশতঃ আরও কয়েক দিন অর্থাৎ পক্ষাধিককাল আমাকে জম্বু থাকিতে হইয়া-ছিল। এই সময়ের মধ্যে জম্বুর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে না পারিলেও যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাচীন জম্বু নগরী পুরাকাল হইতেই স্বনামপ্রসিদ্ধ, সমৃদ্ধিশালী এবং ধর্ম্মভাবে সমুদ্ভাবিত ছিল। বর্ত্তমানেও তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। জম্বু আয়তনেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাওই নদীর তীরবর্ত্তী প্রায় দুই মাইল লম্বা হইবে। প্রস্থও প্রায় সার্দ্ধ মাইলের ন্যূন হইবে না। অনুন্নত পর্ব্বতো-পরি সমতল ক্ষেত্রে সহর প্রতিষ্ঠিত; ৩০০।৩৫০ ফিট নিম্ন দিয়া কলনাদিনী তাওই নদী নগরের পূর্ব্বপার ধৌত করিয়া দক্ষিণ দিকে বক্র গমনে প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ও বন-ভূমি এবং দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। জম্বু সহর সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; বর্ত্তমান সময়ে স্থানে স্থানে উহা ভগ্ন দশায় পরিণত হইয়াছে। সকল দিকেই নগর প্রবে-শের কয়েকটী কটক আছে। পূর্ব্বে ঐ সকল দ্বার বন্ধ করিলে প্রবেশ ও বহির্গমনের উপায় থাকিত না। কিন্তু এ সময়ে উহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

নগরের মধ্যে কতকগুলি প্রশস্ত রাজপথ আছে। সমস্তই প্রস্তর দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বাঁধান, তাহা বহুদিনেও ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। পথের উভয় পার্শ্বে প্রাচীন ও আধু-নিক উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা ও দেবমন্দির সমূহ নগরের সর্ব্বত্রই সগৌরবে শোভা পাইতেছে। তাওই নদীর তীরে নগরের উত্তরাংশে জম্বু মহারাজের বৃহৎ রাজপ্রাসাদ অবস্থিত; স্থানীয় অধি-বাসিগণ ইহাকে "মন্তী" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মন্তীর চারিদিক্ উচ্চ উচ্চ সুন্দর অট্টালিকায় বেষ্টিত; মধ্যস্থলে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, সর্ব্বসাধারণে ঐ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারে। প্রবেশের দুই দিকে দুইটী বৃহৎ দ্বার আছে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে প্রবেশের ও বহির্গমনের উপায় থাকে না। নগরের পশ্চিম প্রান্তে বৃহৎ এক উদ্যান মধ্যে প্রকাণ্ড একটী আজব ঘর আছে (এতদ্দেশে যাহাকে যাদু ঘর বলে)। ঐ গৃহ মধ্যে মৃত পশুর কঙ্কালাদি ও জম্বু রাজ্যের প্রাচীন শিল্প-জাত দ্রব্যাদি ও অস্ত্র শস্ত্র চারিদিকে সজ্জিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান রাজাধিরাজ ৭ম এড্-ওয়ার্ড যখন রাজপুত্ররূপে ভারতবর্ষে আগ-মন করেন, সেই সময়ে তাঁহার অবস্থিতির জন্য জম্বু মহারাজ ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আজবঘর সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া নগরের গণ্য মান্য লোকেরা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় এই স্থানে বায়ু সেবন করিতে আসিয়া থাকেন। ইহার সমীপেই জম্বুরাজের একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। উহা ব্যতীত জম্বুতে অন্য স্কুল নাই। স্কুল সংলগ্ন একটী ময়দান আছে। উহাতে রাজসৈন্যগণ কাওয়াজ করিত।

এতদ্ব্যতীত জম্বু নগরে দর্শনযোগ্য বহু সংখ্যক দেবালয় আছে। তন্মধ্যে স্বর্গীয় মহারাজ রণবীরেশ্বরের (বর্ত্তমান জম্বু ও কাশ্মীর দেশের মহারাজ প্রতাপ সিং বাহাদুরের পিতা) প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ মন্দির ও রণবীরেশ্বর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় মহারাজ মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া যথাক্রমে বিষ্ণুপুরী ও শিবপুরী নামে ঘোষণা করিতে মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের গতি সর্ব্বথা অব্যর্থ। তিনি বিষ্ণুপুরীর নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিয়া স্বনাম অনুসারে 'রণবীরেশ্বর মন্দির' রাখেন। শিবপুরী অর্দ্ধ নির্ম্মিত হইলে তাঁহার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হয়। তিনি উহা অনুভব করিয়া অতি দ্রুতভাবে কেবল মূল মন্দিরটী প্রস্তুত করেন এবং শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই পরলোক গমন করেন। সেই জন্য রণবীরেশ্বর মন্দির এখনও নির্ম্মাণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। রণবীরেশ্বর মন্দির বা শিবপুরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ; বহুদূর হইতে ইহার মন্দিরচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়; মধ্যস্থলে একটীমাত্র মন্দির, উহার সহিত আরও মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহা আর সম্পন্ন হয় নাই। এখনও আয়োজন সামগ্রী বহু পরিমাণে পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিবলিঙ্গ অতি বৃহৎ, সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উহার উপর জল পুষ্পাদি দিতে হয়। এই প্রধান লিঙ্গ ভিন্ন আরও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ১০টী শিবলিঙ্গ আছে এবং স্ফটিকনির্ম্মিত একাদশ রুদ্র ও শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর হর-গৌরীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া ঐ মন্দিরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণ-লিঙ্গ শৃঙ্খলাপূর্ব্বক ধারাবাহিকরূপে স্থাপিত আছে, তাহার সংখ্যায় প্রায় লক্ষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরী বা রঘুনাথজীর মন্দির; ইহা দর্শন করিলে যেন বস্তুতঃ বিষ্ণুলোকেরই অনুমান হয়। পুরীর বহির্ভাগ বহুদূর উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত; সুন্দর শিল্পযুক্ত সুপ্রশস্ত অতি উচ্চ ও বৃহদাকার ফটক, প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে ২টী মন্দির, ইহার পরেই সুন্দর পুষ্পোদ্যান, তৎপরে ঠিক মধ্যস্থলে পঞ্চদশটী উন্নত শিখর বিশিষ্ট মন্দির, পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান রঘুনাথজীর মন্দির। এই প্রধান মন্দির এবং ঐ ১৫টী মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ কতকগুলি গৃহ আছে। অর্থাৎ রঘুনাথজীর মন্দির কেন্দ্ররূপে ধরিলে ক্রমান্বয়ে বেষ্টনীরূপে গৃহ সকল, তৎপরে মন্দির সমূহ, তৎপশ্চাৎ পুষ্পোদ্যান, সর্ব্বশেষ প্রাচীর। এইরূপে বিষ্ণুপুরী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রী_____

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

গৃহশিক্ষা—অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও চরিত্রগঠনবিষয়ে মা ও মেয়ের কথোপকথন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

অধুনা আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অগ্রে আমাদের গৃহসংস্কার করিতে না পারিলে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে এমন অনেক সুগৃহিণী ছিলেন, যাঁহারা পুত্রকন্যাদিগকে লালন পালনের সহিত সুশিক্ষা প্রদান করিতেন, এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে ভবিষ্যতে পুত্রকন্যাগণ সংসারের শীতবাতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু অধুনা কালবশে সেরূপ সুগৃহিণীর একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, ইহার ফলেই আমরা অধঃপতনের পথে এত দ্রুত অগ্রসর হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং এ সময়ে আমাদিগকে আবার উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইলে, পুত্রকন্যাদিগকে সুশিক্ষায় ও সদুপদেশে শিক্ষিত করিতে হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন স্ত্রীশিক্ষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আমরা ঈপ্সিত ফলের অধিকারী হইতে পারি নাই। এই ফল লাভের জন্য গৃহ-সংস্কারের বিশেষ আবশ্যক। সমালোচ্য পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে, বলিয়া আশা করা যায়।

পুস্তকখানিতে পাঁচটী প্রস্তাব আছে। প্রথম প্রস্তাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কথা, দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কথা, তৃতীয় প্রস্তাবে নীতিশিক্ষা বিষয়ক কথা, চতুর্থ প্রস্তাবে স্কুলশিক্ষা বিষয়ক কথা, এবং পঞ্চম প্রস্তাবে ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক কথা আছে। ইহার সকল কথাই প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় কথাগুলি আবার এমন সরল ভাষায় লিখিত যে, তাহা বুঝিবার জন্য কাহাকেও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। মাতা ও কন্যার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অতি কঠিন বিষয়গুলিও সহজ ও সুখবোধ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশা করি, গৃহশিক্ষা গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া বালক বালিকাগণের ভাবী জীবন গঠনের শিক্ষার সহায়তা করিবে।

শুভ বিবাহতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

বিবাহ-বিধান একটা সার্ব্বজাতিক সংস্কার। কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই এই সংস্কার প্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য সমাজ হইতে হিন্দু সমাজে এই সংস্কারের কিছু পার্থক্য আছে। অন্যান্য সমাজে ইহা কেবল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের একটী অনুকূল অবলম্বন মাত্র; কিন্তু হিন্দু সমাজে ইহা ধর্ম্মসাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য সমাজে সংসারের নশ্বর খাতায় ইহার রেজেষ্টারি হয়, কিন্তু হিন্দু সমাজে ধর্ম্মের অবিনশ্বর খাতায় অনন্তকালের জন্য ইহার রেজেষ্টারি হইয়া থাকে। অন্যান্য সমাজে ঐহিক ভোগ বাসনার চরিতার্থতার জন্য ইহার অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু হিন্দু সমাজে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।" তাই হিন্দু সমাজে

বিবাহটা: এত আড়ম্বর ও পবিত্রতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধুনা নানা কারণে এই পবিত্র সংস্কারটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে 'শুভ বিবাহতত্ত্ব' প্রণয়ন করিয়া বিপ্রদাস বাবু যে সমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বিবাহের উদ্দেশ্য কি, সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ পাত্রীকে বিবাহ করা উচিত, ইত্যাদি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত নিমন্ত্রণ পত্র এবং বিবাহের প্রীতি উপহার কবিতা পর্য্যন্ত এই পুস্তকে বিশদরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির কুলনির্ণয়, বিবাহ বিষয়ে জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহের মন্ত্র সমূহের অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থকার এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিবাহ সংস্কার ও পুত্রোৎপাদনের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ, বিবাহ বিষয়ক নিষিদ্ধ বিধি প্রভৃতিও বেশ সহজ ভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। আজি কালি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা কেবল শাস্ত্রীয় প্রমাণকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্য গ্রন্থকার ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণের সহিত ডারউইন, স্পেন্সার, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত সমূহও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে তরুতলবাসী ফলমূলাহারী আর্য্য ঋষিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত সত্য। ভরসা করি, ইহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহোদয়গণ হাস্যের ফুৎকারে ব্যাস মনু প্রভৃতিকে উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়া সমাজকে অধোগতির মুখ হইতে রক্ষা করিবেন।

অধুনা সময়টা এমনই পড়িয়াছে যে, আমরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই, অথচ আমরা সামাজিক আচার ব্যবহার কিছুমাত্র অবগত নহি। এজন্য অনেক সময়েই অনেককে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। বিশেষতঃ বিবাহ ব্যাপারে—যেখানে একটু ত্রুটী হইলেই আর রক্ষা থাকে না। এরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থখানির দ্বারা আমরা যে কত উপকার লাভ করিতে পারিব, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমাজতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ গ্রন্থকার যেরূপভাবে ইহাতে সামাজিক কার্য্যকলাপের আলোচনা করিয়াছেন, এবং যেরূপে অবশ্যকরণীয় আচারগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকখানিকে একাধারে গুরু, পুরোহিত, যজমান, গৃহী, গৃহিণী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক অভিভাবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক অনেকেই লিখেন, কিন্তু এরূপে সমাজের অভাব অনুভব করিয়া সেই অভাব পূরণের জন্য বিপ্রদাস বাবুর মত কয়জন লেখক স্বীয় লেখনী সঞ্চালন করিয়া থাকেন? যাহা হউক, আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশা করি, এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে।

হেমেন্দ্রলাল—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্যারাগণ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অধুনা এমন একটা সময় পড়িয়াছে যে, উপন্যাসের নাম শুনিলেই বিজ্ঞমণ্ডলী ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের এই নাসিকা-কুঞ্চন ব্যাপারটা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক, তাহা নহে। আজি কালি বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রের বিশাল গ্রাস হইতে যে রাশি রাশি উপন্যাস উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহাদের

অধিকাংশই অপাঠ্য। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে কেহ বা ভাষার আমূলকৃত্য করিতেছেন, কেহ ব্যাকরণের সপিণ্ডন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতেছেন, কেহ বা তাবের অগাধ সমুদ্রে ডুব দিয়া অ-ভাবের অ-মূল্য মণিমাণিক্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইতেছেন, আবার কেহবা ভাষা, ভাব, ব্যাকরণ এই ত্রিতয়ের গয়াকৃত্য পর্য্যন্ত শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই এখন সুধীবৃন্দ আর উপন্যাসের দিকে ঘেঁসিতে চাহেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই ধারণাটীকে সর্ব্বত্র সুসঙ্গত বলিতে পারি না। এই সকল অপাঠ্য উপন্যাস-স্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে যে দুই একখানিও সুপাঠ্য উপন্যাস মিলিতে পারে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। একটা প্রাচীন কবিবাক্য আছে, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।" আমরাও ছাই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এইরূপই—অমূল্য না হউক—একটী রত্নের সন্ধান পাইয়াছি; এবং অদ্য তাহারই আলোচনার জন্য এতটা ভূমিকার অবতরণা করিলাম।

"হেমেন্দ্রলাল" উপন্যাসের প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ ইতঃপূর্ব্বে "সরমার সুখ" "পরিণয় কাহিনী" প্রভৃতি আরও দুই এক খানি উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইয়াছেন। কিছু খ্যাতিও যে না পাইয়াছেন এমন নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানির দ্বারা তাঁহার সে খ্যাতি কেবল অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, পরন্তু কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট হইবে।

গ্রন্থের মূল আখ্যানভাগ এই:—পূর্ব্ব বঙ্গে জয়নগর গ্রামে ঘোষবংশীয় কয়েক ঘর বঙ্গজ কায়স্থ বাস করিতেন। ইহাঁরা জয়নগরের রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রায়বংশেই হেমেন্দ্রলালের জন্ম। হেমেন্দ্রলাল দুই বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীন হইয়া অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাত ভৈরবচন্দ্র রায় এবং জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী মহামায়ার স্নেহে ও আদরে প্রতিপালিত হন। পূর্ব্বে ইহাঁদের অবস্থা ভাল থাকিলেও তৎকালে নানা কারণে হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাল্যকালে হেমেন্দ্র গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া এবং মৌলবীর নিকট আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি, লাঠিখেলা, তরবার, বন্দুক ও বর্ষা চালনায় সুদক্ষ হন। এই সময়ে দশ বৎসরের বালিকা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে হেমেন্দ্রের বয়স বিংশতি বর্ষ। জাহাঙ্গীর নগরে গিয়া তিনি উত্তম সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং কিছুদিন তথায় থাকিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া তিনি কেবল কুস্তি, লাঠিখেলা, দাঙ্গা হাঙ্গামা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। এদিকে ভৈরবচন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই অসচ্ছল হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং তিনি হেমেন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে বিরত দেখিয়া বিরক্ত হন, এবং একদা তাঁহাকে ভাতের সঙ্গে ছাই খাইতে দিতে পত্নীকে আদেশ করেন। জ্যেষ্ঠতাতের তিরস্কারে হেমেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য লুকাইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

পথমধ্যে আহম্মদ কাশেম আলি খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। কাশেম আলিও সপরিবারে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিলেন। তখন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট। হেমেন্দ্র, কাসেম আলির সঙ্গী হইলেন। রাত্রিকালে খাঁ সাহেবের নৌকায় ডাকাত পড়িয়া তাঁহার কন্যা সুরত-

উন্নিসাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। হেমেন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন। ইহাতে কাশেম আলি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পুত্রস্থানীয় করিয়া লন।

ইহার পর মুর্শিদাবাদে গিয়া কাশেম খাঁর চেষ্টায় হেমেন্দ্র প্রথমে নবাবের বিশ্বাসী দূত রূপে নিযুক্ত হন। পরে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় তিনি বঙ্গের ভাবী নবাব, নবাবজাদা সিরাজ-দ্দৌলার কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। সিরাজ তাঁহাকে আপনার বিশ্বস্ত শরীররক্ষী ও পারি-ষদের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধ কাশেম খাঁ কন্যার সহিত মক্কাযাত্রা করেন, এবং আপনার সমস্ত সম্পত্তি হেমেন্দ্রকে দিয়া যান। হেমেন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই সিরাজের কৃপায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতায় সিরাজদ্দৌলা তাঁহার উপর অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। পরে আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইলে সিরাজ যখন বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিলেন, তখন হেমেন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ইহাই উপন্যাসের মূল আখ্যায়িকা। ইহার মধ্যে অবান্তর ঘটনাও অনেক আছে। সেই সকল অবান্তর ঘটনার সহিত হেমেন্দ্রের ভাগ্যসূত্র বিজড়িত। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এই উপন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটী চরিত্রের আলোচনা করিব।

গ্রন্থের নায়ক হেমেন্দ্রলাল। প্রথমেই আমরা যখন কার্য্যক্ষেত্রে হেমেন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম, তখন তিনি একটী দুরন্ত গ্রাম্য বালক। সে কালের বনিয়াদি বংশের বালক যেমন হওয়া উচিত, হেমেন্দ্রও তাহাই। তিনি বাঙ্গালা ও তৎকালপ্রচলিত আরবী ও পারস্য ভাষায় শিক্ষিত; লাঠি খেলিতে ও কুস্তী লড়িতে মজবুত, দাঙ্গা হাঙ্গামায় অভ্যস্ত। তখন দাঙ্গা হাঙ্গামাটা প্রায়ই ছিল; কিছু পয়সা খরচ করিলেই তখন এমন বিচার কিনিতে পাওয়া যাইত না। এখন বিচারে যাহা হয়, তখন লাঠি দ্বারাই অনেক স্থলে তাহা হইত। তাহা ছাড়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও এক আধটু সংঘর্ষ ছিল। এইরূপ নানা কারণে তখন প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিত। সেই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামের মধ্যে হেমেন্দ্রকেও লিপ্ত দেখিতে পাই। কিন্তু সে প্রবলের পক্ষে নয়—দুর্ব্বলের পক্ষে; সে অত্যাচারীর হইয়া লাঠি ধরিত না—অত্যাচারিতের হইয়া ধরিত। এইখানেই আমরা হেমেন্দ্রের চরিত্রের একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাই। হেমেন্দ্রের অনুচর রামমোহনও শক্তিশালী লাঠিয়াল ছিল, কিন্তু তাহার চরিত্রে এ বিশেষত্ব টুকু নাই। বৃদ্ধ ভৈরবচন্দ্র কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভাল-বাসিতেন না; তিনি নিষেধ করিতেন, শাসন করিতেন; কিন্তু মহামায়ার ও ধাত্রী কল্যাণীর আদরে ও স্নেহে সে শাসন টুকু কোথায় ভাসিয়া যাইত। সুতরাং ভৈরবচন্দ্র এই দুরন্ত বালকটীকে কোন-রূপে শাসন করিতে না পারিয়া শেষে তাহার বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, দুরন্ত হিমু এইবার শান্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না, মত্ত হস্তী এ কুসুম-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল না।

কিন্তু এততেও যাহা হয় নাই, এক দিনের একটী ঘটনায় তাহা হইল। যে দিন পতি-দেবতার আদেশ লঙ্ঘনে অক্ষম হইয়া সাধ্বী মহামায়া তাঁহার স্নেহের হিমুর অন্ন-পাত্রের পাশে ছাই দিলেন, সেই দিনে হিমুর যে শক্তি সামান্য লাঠিখেলায় চাপা পড়িয়া ছিল, তাহা গর্জ্জিয়া উঠিল। হিমু প্রতিজ্ঞা

করিল, "যে দিন নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাইব, সেই দিন এ বাড়ীতে ভাত খাইব। নচেৎ রূপার থালে সোণার বাটীতে খাইব, নতুবা আর না।" দুঃখের বিষয় হিমু সে কালের ছেলে। আজিকালিকার বুদ্ধিমান্ ছেলে হইলে সে নিশ্চয়ই সেই রাত্রিতেই বাড়ি ফেলিয়া আপনার বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া জেঠা মহাশয়ের এই রাগের যথেষ্ট প্রতিশোধ দিত। কিন্তু হায়! হিমু সে কালের ছেলে; তাই সে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া, নিঃসম্বলে উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইল।

যেখানে অধ্যবসায় সেইখানেই সফলতা, যেখানে একাগ্রতা, সেইখানেই সিদ্ধি। হেমেন্দ্রেরও অধ্যবসায় ছিল, একাগ্রতা ছিল; তাই পথে কাশেম খাঁর ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত মিলিত হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি অনুকূল দৃষ্টিতে চাহিলেন।

ইহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া হেমেন্দ্রলাল যখন নবাবজাদার অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন, যখন তিনি সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে অবস্থিত, তখনই আমরা তাঁহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সে কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া? ঐ দেখ, হেমেন্দ্রের স্বীয় শয্যাপ্রকোষ্ঠে কে দাঁড়াইয়া? ফৈজী নয়? নবাবজাদা সিরাজ-দ্দৌলার প্রিয়পাত্রী রূপলাবণ্যবতী ফৈজী। ঐ দেখ, তাহার বিলাসবিভ্রমসজ্জিত দেহের কি সৌন্দর্য্য, চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গিময় নয়নে কি লোকচিত্তবিজয়ী বিলোল কটাক্ষ; ঘন সুচি-ক্কণ কুন্তলরাশি তাহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই পাশে প্রফুল্ল স্থল কমলতুল্য মুখখানি সৌন্দর্য্যে ঢলঢল করি-তেছে, কর্ণমূলে হীরক মুক্তাখচিত ঝুমকা ঝলমল করিতেছে; আর ফৈজী ফুল্ল রক্তোৎ-পল সদৃশ হস্তে হেমেন্দ্রের পা দুখানি জড়া-ইয়া তাহার প্রেম ভিক্ষা করিতেছে! কি ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা! কিন্তু এ পরীক্ষায় হেমেন্দ্র জয়ী হইলেন; বিবিধ সদুপদেশে তিনি ফৈজীর চিত্তের গতি ফিরাইয়া দিলেন।

তারপর আর এক পরীক্ষা। সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ নবাবজাদা যখন কৈজীকে জীবন্তে সমাহিত করিবার জন্য হেমেন্দ্রের উপর ভার দিলেন, তখন হেমেন্দ্র আর এক পরীক্ষায় পড়িলেন। যে ফৈজী একদিন তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, সহস্র দর্শ-কের মধ্যে নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া নবাবজাদার নিকট তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া ছিল, আজি সেই ফৈজীকে জীবিতাবস্থায় সমাহিত করিতে হইবে। এখানে কর্ত্তব্যের সহিত কৃতজ্ঞতার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। শেষে কর্ত্তব্যেরই জয় হইল। কর্ত্তব্যপরায়ণ হেমেন্দ্রলাল স্বয়ং অকৃতজ্ঞ হইয়াও প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তোমরা তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিতে হয় বল, কিন্তু তিনি 'কর্ত্তব্য-বিমুখ' নহেন, 'নিমকহারাম' নহেন।

হেমেন্দ্রের চরিত্র যেরূপে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। হেমেন্দ্রের আর একটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যত-গুলা জমিদারী কিনিয়াছিল, তাহার একটাও নিজের নামে বা নিজের স্ত্রীর নামে না রাখিয়া সবগুলাই জ্যেষ্ঠতাতের নামে কিনিয়া দিয়াছিল।

গ্রন্থে যে কয়েকটী স্ত্রী-চরিত্র আছে, তন্মধ্যে সুরতউন্নিসার চরিত্রই প্রধান। সুরত এ জগতের নয়, সে স্বর্গের ছবি। তাহার সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, প্রেম স্বর্গীয়, ভালবাসা স্বর্গীয়। তাহার ভালবাসা অনন্ত, অসীম, সুগভীর। স্বর্গের ছবি সুরত এই পাপপঙ্কিল সংসারে সংসারী সাজিতে পারিল না; তাই সে

পিতার সহিত মক্কা যাত্রা করিয়া আপনার অনন্ত প্রেম অনন্তদেবের পাদমূলে ঢালিয়া দিতে চলিল। তাহার ভালবাসা পৃথিবীর কেহ বুঝিতে পারে নাই, পৃথিবীর উপরে যিনি—তিনি বুঝিবেন না কি?

এই উপন্যাসখানিতে আমরা আর একটা জিনিস পাই—সেটা সেকালের একটা খাঁটী চিত্র। সেকালের ভৈরবচন্দ্র রায়, সেকালের গৃহিণী মহামায়া, সেকালের ব্রীড়াবনতা বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া, সেকালের প্রভুভক্ত অনুচর রামমোহন, এ সকল একালে আর দেখা যায় না। সেকালের গৃহিণীরা কিরূপে গৃহিণীপণা করিতেন, সদা লজ্জাশীলা বধূরা কিরূপে সংসারের মাঝে নীরব আনন্দে দিনপাত করিতেন, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী স্বামীর আদেশ পালনের জন্য কিরূপে ইচ্ছার বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠানেও সঙ্কুচিত হইতেন না, গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে তাহার বেশ একটী প্রস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সামাজিক বিপ্লবের দিনে এইরূপ চিত্রকে আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করিতে পারিলাম না।

ফলকথা উপন্যাসখানি বেশ সুন্দর ও স্বভাবানুগত হইয়াছে। এরূপ উপাখ্যান আজি কালিকার বাজারে দুর্লভ বলিলেও বলা যায়।

সাহিত্য-সভার কার্য্যবিবরণী।

৯ম বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩১৫ সাল, (১০ই মে, ১৯০৮ খৃঃ) রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

১। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং অনুমোদিত হইল।

৩। সভার নিয়মাবলীর ৫৫ ধারা অনুসারে ১৩১৫ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৯টী শূন্যপদে সভ্য নির্ব্বাচন জন্য সভায় উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক ১৫ জনের নাম প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইলে, উপস্থিত সভ্যগণ গোপনে মত (ভোট) দান করিলেন ও মত-গণনায় নিম্নলিখিত ৯ জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত প্রাপ্ত হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।

(২) শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার বাহাদুর বি, এল।

(৩) শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ।

(৪) শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল।

(৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

(৬) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম,এ, বি, এল।

(৭) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৮) শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি, বি, এ, এল্, এম্, এস্।

(৯) শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীকে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি "ভক্তের দেবত্ব প্রাপ্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধ সমালোচনার্থ আহূত হইয়া, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকার ধন্যবাদের পাত্র। প্রবন্ধে হিন্দু শাস্ত্র হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, যুক্তি প্রমাণ না দিলেও চলিত। ধর্ম্ম ভিন্ন যে জাতিগত উন্নতি হয় না, সে বিষয়ে তিনি শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের সহিত একমত।

৬। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকার ধন্যবাদার্হ। প্রবন্ধের ভাষা ভাল ও অপভ্রংশদুষ্ট নহে। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধকার যদি প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের মত সঙ্কলন না করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রবন্ধ আরও চিত্তাকর্ষক হইত। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে আমরা স্বভাবতই আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনুশীলনে অবস্থিতি করি, সুতরাং এরূপ সময়ে আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্ব সমূহের অনুশীলন সময়োপযোগী বলিতে হইবে। আধ্যাত্মিক শক্তিই ভারতবর্ষের প্রধান শক্তি, এই শক্তির অনুশীলনে মঙ্গল বই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। অতঃপর তিনি প্রবন্ধকারকে ব্যক্তিগতভাবে ও সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিয়া বলিলেন যে, মনুষ্য দৈত্যত্ব ও দেবত্ব দুই-ই প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রবন্ধকার বাইবেল হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বেদের ছায়া মাত্র। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা শক্তি অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব অনায়াললব্ধ ইত্যাদি।

৮। পরিশেষে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধের ভাষা অতি সুন্দর এবং প্রবন্ধটী সময়োচিত হইয়াছে। প্রথমে জ্ঞান যোগ, তৎপরে কর্ম্মযোগ এবং তৎপরে ভক্তিযোগ। জ্ঞানযোগে প্রধান শ্রীমৎ শঙ্কর, কর্ম্মযোগে বুদ্ধ, এবং ভক্তিযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। ভক্তি ভিন্ন জাতীয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে না। হিন্দুর দেশে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলে সমধিক জ্ঞাত আছেন বলিয়া, বোধ হয়, প্রবন্ধকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি অল্পই বলিয়াছেন। প্রবন্ধকার সম্পূর্ণ ধন্যবাদের পাত্র।

৯। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে, সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

৫ম বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশন।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল; ১৪ই জুন, ১৯০৮ খৃঃ রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকা।

১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৩। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন,—

মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম, এ, বি, এল মহাশয়ের পরলোক গমনে সাহিত্য-সভা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও তাঁহার মৃত্যু জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

এই মন্তব্যের এক খণ্ড প্রতিলিপি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পুত্রবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সাহিত্য-সভার সংস্থাপকদিগের অন্যতম এবং সভার স্থাপন দিবস হইতে যতদিন কর্ম্মক্ষম ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত সভার কার্য্যে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত; বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য সভা একজন পরম হিতৈষী সভ্য হারাইয়াছেন। আশা করি, সমবেত সভ্যগণ সকলেই পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের অনুমোদন করিবেন। অনুমোদিত হইলে, ঐ মন্তব্যের এক খণ্ড প্রতিলিপি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পুত্রের নিকট প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের কতিপয় হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ কথায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা নির্দ্ধারিত হয়।

৪। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, "Pay sam for zang" এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট "Descriptive catalogue of the Sanskrit manuscript" নামক পুস্তক উপহার দান করায়, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে অদ্যকার সভার প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৬। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিরোধ করিতে দুর্গা নাহি সয় তর।
হাতে ধরে ভবানীকে বসাল শঙ্কর॥
তুমি জান অতেব জিজ্ঞাসি এই কথা।
কহ দেখি নারীর ধাউৎ বসে কোথা॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু ছেড়ে দাও হাত।
কোথা হতে একথা আইল অকস্মাৎ॥
আমি নাহি জানি প্রভু করি নিবেদন।
শিব বলে না কহিলে ত্যজিব জীবন॥
বলিতে লাগিল চণ্ডী না পেরে এড়াতে।
নারীর ধাউৎ বসে বাম লোচনেতে॥
হনুমান্ শুনিলেন থাকিয়া মাছি কায়।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ধরে অভয়ার পায়॥
করপুটে স্তব করে পবনকুমার।
তোমা হতে সৃষ্টি হল জগৎ সংসার॥
করালবদনা শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
রক্তবীজে সংহারিয়া রাখিলে অবনী॥
অমর ভুজঙ্গ নর উদ্দেশেতে সেবে।
তোমা সেবে শ্রীরাম বধিলা দশগ্রীবে॥
বলি রাজার দেশে হরি হরেতে সমর।
দিগম্বরী বেশেতে রাখিলে ধরাধর॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জগতের গতি।
তোমা হতে ধর্ম্মের হইবে বার মতি॥
হরগৌরী দোহার লইয়া পদরেণু।
লাউসেনে বলিতে চলিল বীর হনূ॥
পুনর্ব্বার গোলাহাটে হনূ উপনীত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥
সুরিক্ষার ঘরে বন্দী ময়না রাজন্।
উপনীত হল তখন পবননন্দন॥
ধাউতের কথা হনূ সেনে দিল কয়ে।
স্বর্গে গেলা ধর্ম্মরাজ দেবগণে লয়ে॥
লাউসেন পাইল ধাউতের উপদেশ।
সুরিক্ষাকে তখন বলেন সবিশেষ॥
পরম জ্ঞিয়ানি বলে আপনাকে ভাব।
হের আজ নটিনী সমস্যা পুরে দিব॥
নটী বলে, যদি বল ধাউৎ সন্ধান।
পরাজয় হইব তোমার বিদ্যমান॥
লাউসেন বলে নটী শুন সাবধানে।
পুরে দিব সমস্যা তোমার বিদ্যমানে॥
কামেশ্বরী কাঁউরের আশে কামাখ্যাতে।
নারীর ধাউৎ বাস বাম লোচনেতে॥
শত মধ্যে লাউসেন সমস্যা পূরিল।
নটিনীর চাঁদমুখ কালিপারা হল॥
জিনিলেন সমস্যাতে লাউসেন রায়।
আচম্বিতে চরণের ডাঁড়ুকা খসে যায়॥
সেন বলে, শুন ওহে কর্পূর পাতর।
সুরিক্ষার নাক চুল কাট অতঃপর॥
পুরুষের অন্তক সুরিক্ষা নাম ধরে।
অশেষ প্রকারে মাগী দুঃখ দিল মোরে॥
গৌড় যেতে পথের জঞ্জাল কর দূর।
লাফ দিয়া সুরিক্ষারে ধরিল কর্পূর॥
পাক দিয়া বেসর ধরিল বাম হাতে।
অমনি কাটিল নাসা বেসর সহিতে॥
শূর্পণখার নাক যেন কাটিল লক্ষ্মণ।
দুই কাণ কেটে কাটে বিনোদ লোচন॥
রক্ত পড়ে ঝলকে বসন ভিজে যায়।
সমাজেতে সুরিক্ষা না কাঁদিল লজ্জায়॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কুয়ার ভিতর।
জলে পড়ে সুরিক্ষা গেলেন যমঘর॥
লুটাইয়া দিলেন নটীর যত ধন।
দ্রব্য পেয়ে ধনী সে হইল কত জন॥
বন্দী ছিল কারাগারে ছ কুড়ি নাগর।
মুক্ত করে সবাকে দিলেন সদাগর॥
নটিনীর নাক চুল ফলায় বাঁধিয়া।
দুই ভাই গৌড় যান বিদায় হইয়া॥

গোলাহাট রাখিয়া শঙ্করপুর যায়।
উপনীত লাউসেন ভৈরবী গঙ্গায়॥
কর্পূর পাতর বলে শুন সদাগর।
ঐ দেখ দেখা যায় গৌড় সহর॥
বৌড় বাঁশের গড় ওই রাজার মহল।
লাল নীল, সোণা বাঁধা পতাকা সকল॥
মামাদের বাড়ী ওই রমতি নগরে।
লাউসেন তখন বলেন ধীরে ধীরে॥
শুন ভাই কর্পূর আমার নিবেদন।
গঙ্গোদকে স্নান করে পূজি নিরঞ্জন॥
তবে এখন যাইব গৌড় এই বটে।
বসন ভূষণ রাখি ভৈরবীর তটে॥
কর্পূর বলেন দাদা ঐ কথা ভাল।
ধর্ম্ম-পূজা করিবারে ঘাটে উত্তরিল॥
স্নান দান করিয়ে পূজিল শতবার।
জল খেয়ে কোমর বাঁধিল পুনর্ব্বার॥
ঘাটে এনে লায়্যা পাকি যোগাল তরণী।
নৌকায় চাপিতে যান সেন গুণমণি॥
লাউদত্ত কামার গৌড়েতে তার ঘর।
ফলাখান দেখে করে প্রশংসা বিস্তর॥
পার হতে লায় চাপে লাউসেন রায়।
এক সমিভ্যারেতে দুজনে চলে যায়।
পরস্পর দুই জনে হল পরিচয়।
চরণে প্রণাম করে লাউদত্ত কয়॥
লাউদত্ত বলে শুন ময়নার নাথ।
ভৈরবী গঙ্গায় তুমি হইলে সেঙ্গাত॥
কোলাকুলি দুই জনে প্রেম আলিঙ্গন।
জাহ্নবীতে সেঙ্গাত পাতান দুই জন॥
কর্ম্মকার নিবেদন করে যোড় হাতে।
আজি চল উত্তরিবে আমার বাড়ীতে॥
পদরেণু পেয়ে যে পবিত্র হোক্ ঘর।
কালি দেখা করাইব রায় গৌড়েশ্বর॥
কর্পূর বলেন তবে ঐ কথা ভাল।
মামার বাড়ীতে আজি উত্তরিবে চল॥
এত যুক্তি করি কর্ম্মকারের সহিত।
পার হয়ে ভৈরবী গৌড়ে উপনীত॥
গৌড় দেখিল যেন অযোধ্যানগর।
রামের সমান প্রজা পালেন গৌড়েশ্বর॥
কৃষ্ণ পূজা দেখে রাজা সবার আলয়।
পাঠ গীত ভারত পুরাণ কত হয়॥
উত্তরিল লাউসেন কামারের ঘরে।
বসিতে আসন দিল অতি সমাদরে॥
শাল ঘরে বাসা দিল সেন তপোধনে।
চরণ প্রক্ষালি দোঁহে বসিল আসনে॥
ফলাখান দেখে হল সবাকার মন।
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন গঠন॥
কেহ বলে, এই ফলা বিশাইএর গড়া।
ফলাখান যেমন তেমন বটে খাঁড়া॥
পরিপাটী আয়োজন করিয়া অপার।
সেঙ্গাত বলিয়া সেবা করে কর্ম্মকার॥
সন্তুষ্ট হইল বড় ময়নার ঠাকুর।
সমুখেতে ফলাখান টাঙ্গিল কর্পূর॥
রাত্রে হবে হস্তী বধ গৌড় ভিতর।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন নারায়ধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সুরিক্ষা দলন পালা সমাপ্ত।

রাজসম্ভাষণ ও হস্তীবধ পালা।

কামারের সঙ্গে হল সেনের মিতালি।
শাল ঘরে উত্তরিল লাউসেন ঢালি॥
সেঙ্গাত বলিয়া সেবা কর্ম্মকার করে।
কর্পূর পাতর ফলা টাঙ্গিল দুয়ারে॥
পালঙ্কেতে শুলেন ময়নার মহীনাথ।
দেখিতে সেনের ফলা গৌড়ে পড়ে জাত॥
ফলা দেখে সবাকার মুগ্ধ হল মন।
সবে বলে এই ফলা বিশারি গঠন॥
সোণা রূপা হরিতাল হিঙ্গুল ডগডগ।
ফলাখানার কারণে মলিন হয় খগ॥
ওইরূপে রহিল ময়নার সদাগর।
মহামদ পাত্র লয়ে শুন অতঃপর॥
ডুবিল হেলির জাল সন্ধ্যা কাল প্রায়।
হেন বেলা পাতর দরবার ভেঙ্গে যায়॥
দেয়ান ভাঙ্গিয়া চলে মাহুদানা বড়।
রমতিনগরে বাড়ী গৌড়ের নিয়ড়॥
বাড়ী যেতে কামারের সম্মুখে সরাণ।
কায়স্থ মুহুরী কত আগে পিছে ধান॥
কোমর বাঁধা লোক সব চলেছে সত্বর।
রাখিল একাশি পাড়া বায়ান্ন সহর॥
ঘর চলে পাতর রাজার প্রায় দেখি।
পাল্কী উপরে ছোই স্বর্ণ ঝিকিমিকি॥
ফলাখান টাঙ্গা আছে কামারের ঘরে।
রহ রহ বলে পাত্র রাখিল কাহারে॥
দূরে হোতে পাতর করিছে অনুমান।
এমন রূপের ফলা কে করে নির্ম্মাণ॥
শাস্ত্র মত অপূর্ব্ব লিখন তায় আছে।
শাল ঘরে দপ্ দপ্ চিকুর পড়িছে॥
এক দৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহশ্চ নৃসিংহ বামন॥
দেখে পরশুরাম জমদগ্নির কুমার।
নিজবলে নিঃক্ষত্রিয় করিল একুশ বার॥
তার পর দেখে দশরথ নৃপমণি।
সাত শ পঞ্চাশ দেখে দশরথের রাণী॥
পাটরাণী কৌশল্যা সুমিত্রা কেকৈই।
চারি পুত্র ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবন জই॥
লক্ষ্মণের কাছে রাম রাজীবলোচন।
বাম দিকে দেখেন ভরত শত্রুঘ্ন॥
যেকালে গেলেন রাম মুনির তপোবনে।
তাড়কা মেলেন রাম লক্ষ্মণের সনে॥
বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গে মিথিলা নগরে।
ভাঙ্গিল হরের গণ্ডি জনক রাজার ঘরে॥
পুষ্পবৃষ্টি করে শিরে দেবতা সকল।
তা দেখিয়া পাত্রের লোচনে বহে জল॥
সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যা যাইতে।
তখন পরশুরাম আগুলিল পথে॥
পরশুরামের হরে লয়ে তেজখান।
অযোধ্যাতে উপনীত রাজীব নয়ন॥
রাম রাজা হবেন সবার অভিলাষ।
সত্য করে কেকোই করিল সর্ব্বনাশ॥
বনবাসে যান রাম সীতা চন্দ্রমুখী।
সঙ্গে গড়াইল তখন লক্ষ্মণ ধানুকী॥
রামের কোমল নাম অমৃতের প্রায়।
বর্ণনা করিতে যে বাহুল্য হয়ে যায়॥
লঙ্কা জয় করিলেন বধিয়া রাবণে।
সীতা উদ্ধারিয়া এল অযোধ্যা ভবনে॥
এইরূপে ফলাখান দেখিছে পাতর।
যদুকুলে রাম কানু দেখে তার পর॥
গোপকুলে পরকাশ গোকুল নগরে।
গোধন চরান নন্দ যশোদার ঘরে॥
কংস বধিয়া কুরু পাণ্ডবের রণ।
দশ অবতার ফলায় দেখিল লিখন॥
দক্ষিণেতে দেখিল ঠাকুর নিরঞ্জন।
শূন্য পথে ধৌত রথে উলুক বাহন॥
রমাই পণ্ডিত কাছে করে যোড় কর।
গৌড়ের ভূপাল দেখে রায় গৌড়েশ্বর।
রত্ন সিংহাসনেতে বসিয়া নৃপমণি।
রাজার বামেতে দেখে ভানুমতী রাণী॥

শিরেতে ধবল ছত্র সুবর্ণ জড়িত।
সম্মুখে ভারত পড়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত॥
নবলক্ষ সেনাপতি জোহার করেন।
রাণী রঞ্জাবতী দেখে রাজা কর্ণসেন॥
ধর্ম্মের সেবক দেখে লাউসেন রাউতে।
সহোদর সুন্দর কর্পূর পাত্র সাথে॥
তের ডোম দেখে লাউসেনের নফর।
শাখা শুকা দুইবীর কানু সিংহবর॥
কালুবীরের রমণী লক্ষ্মাকে দেখে তায়।
মহাপাত্র গড় করে ডোমনীর পায়॥
দাঁতে কুটা করিয়া পায়ের ধূলা লেই।
বাটুয়া কক্কুর মুণ্ডে নগ্নি করে দেই॥
তা দেখিয়া পাত্র হল জলন্ত অনল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল।
অমর্য্যাদা দেখে পাত্র ফলার উপর।
লোহিত লোচনেতে কাঁপয়ে কলেবর॥
রঞ্জার মুখাল দেখে অনুমানে চিনে।
পাত্র বলে এই বেটা লাউসেন ভাগিনে॥
এত দিনে শত্রু মোর হল বলবান্।
কেমন প্রকারে বেটার বধিব পরাণ॥
গোবিন্দের মামা ছিল কংস মহীপাল।
নারদের বোলে যেন বাড়িল জঞ্জাল॥
পাত্র বলে সেই মত ভাগিনা আমার।
আঁটকুড়ি রঞ্জাকে করিব এইবার॥
লোক মুখে শুনেছিলাম দেখিলাম এই।
পাকা দাড়ি মুচুড়িয়া গোঁফে তার দেই॥
মহামদ নাম ধরি বুদ্ধির সাগর।
মরিতে এসেছে বেটা গৌড় সহর॥
পাল্কী নামাল গিয়া কদম্বের তলে।
যুক্তি আরম্ভিল পাত্র ডাকিয়ে কোটালে॥
পাত্র বলে কোটাল বচন রাখ মোর।
লাউসেনে বধিব বলিয়া হাতী চোর॥
সহরেতে ঢেড়রা পিটিয়া কর মানা।
বিদেশী কুমারে বাসা দিবে যেই জনা॥
দড় দড় সবাকে বলিবে সমাচার।
বাসা দিলে ভূপতি নিবেন গুনাকার॥
সেনের বধিতে প্রাণ যদি পার ভাই।
চড়নের ঘোড়া দিব সোণার কাবাই॥
জাইগীর লিখিয়া দিব ময়না বসতি।
নবলক্ষ দলের করিব সেনাপতি॥
কোটাল বলিছে তখন বুকে যোড়হাত।
সর্ব্বকাল আমি হে তোমার খানে জাত।
ব্যক্তি দশ লোক নিল করিয়ে সংহতি।
সহরে উত্তরে গৌড়ের নিশাপতি॥
ডাক দিয়া কোটাল সহর মাঝে কয়।
গৌড় সহরেতে চোরের হল ভয়॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কিবা দণ্ডী ব্রহ্মচারী।
বাসা দিলে সহরে হইবে গুণাগিরি॥
বারে বারে বাজারে সবাকে যাই বলে।
বিদেশী অতিথি কিবা কুটুম্বের ছেলে।
মহামদ পাত্রের দরবার জান সবে।
বাসা দিলে কালি তবে গুণাগিরি হবে।
কামারের ঘরে ছিলা ময়নার নাথ।
সেন বলে মন দিয়া শুনহে সেঙ্গাত॥
তোমার বাড়ীতে আর রহিতে না পারি।
দুই ভাই এ বৃক্ষের তলায় বাসা করি॥
কর্ম্মকার বলে সেঙ্গাত করি নিবেদন।
গুণাগার দিব আমি তোমার কারণ॥
ধন উপার্জ্জন করে পুরুষ হইলে।
তোমা হেন সেঙ্গাত পাইব কোথা গেলে।
কদাচ না রহিল ময়নার মহীনাথ।
কোলাকুলি দু সেঙ্গাতে হল অশ্রুপাত।
রাত্রিযোগে দুই ভাই বিদায় হোলেন।
তরুতলে শুলেন কর্পূর লাউসেন॥
ফলা খাড়া শিয়রে ঘুমেতে অচেতন।
পাতরের কাছে কোটাল কহিল তখন।
পাত্র বলে শুন ইন্দ্রজাল নিশাচর।
সেনের শিয়রে লয়ে বাঁধ করিবর॥
হরষিত ইন্দ্রজাল শুনিয়া ভারতী।
অবিলম্বে আনিল রাজার পাট হাতী॥
বৃক্ষতলে ধর্ম্মের সেবক নিদ্রা যায়।
বধিতে সেনের প্রাণ মাতঙ্গ ফিরায়॥

দেব হস্তী ধর্ম্মের সেবক বলে জানে।
কড় পেতে ধরে তখন সেনের চরণে॥
ধর্ম্মরাজা রাখিল ময়নার যুবরাজে।
প্রহ্লাদ বৈষ্ণবে যেন না বধিল গজে॥
না বধিল লাউসেনে বুঝিয়া কারণ।
শিয়রেতে নিশাপতি বাঁধিল বারণ॥
তবে সমাচার দিল মাহুদা নাবড়ে।
মন্ত্রণা করিয়া কোটাল সহরে দৌড়ে॥
সর্ব্বনাশ হল রাজার হাতী নিল চোরে।
হায় হায় করে সবাই গৌড় সহরে॥
নিদ্রা যান বৃক্ষতলে ভাই দুই জনে।
হাতী চোর বলিয়া ধরিল লাউসেনে॥
বিপত্তে পড়িল বড় ভাই দুই জন।
দুই ভাইকে বাঁধিলেক নিগূঢ় বন্ধন॥
কাছি দিয়া কোমরে বাঁধিল কারাগারে।
পাথর দিলেক সেনের বুকের উপরে॥
পাঁচ ক্রোশ ঘরখান একটী দুয়ার।
রক্ষক দুয়ারি সব রাখে কারাগার॥
লাউসেনে বন্দী করে পাত্র গেল ঘর।
ধর্ম্মরাজে স্মরণ করেন সদাগর॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নূতন সঙ্গীত॥

করুণা রাগ।

কারাগারে বন্দী হয়ে, ধর্ম্মরাজ স্মরণিয়ে,
স্তব করে রাজার নন্দন।
বিষম পাত্রের নন্দী, কারাগারে করে বন্দী,
প্রাণ রক্ষা কর নিরঞ্জন॥
নমঃ নমঃ নমঃ ধর্ম্ম, অনাদি পরম ব্রহ্ম,
তুমি দেব দেবতার জ্যেষ্ঠ।
পতঙ্গ মৃগাঙ্ক তারা, আকাশ পাতাল ধরা,
সত্ত্ব রজঃ তম তব শ্রেষ্ঠ॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, সুরপুরে পুরন্দর,
মূর্ত্তিভেদে ফিরহ আপনি।
ভুবন পাবন নাম, অযোধ্যাতে তুমি রাম,
চন্দ্রবংশে তুমি যদুমণি॥
যে জন তোমার ভক্ত, তারে তুমি অনুরক্ত,
শুনেছি ভারত উপাখ্যানে।
ক্ষীরোদ সমুদ্র কূলে, গজরাজে উদ্ধারিলে,
প্রহ্লাদে রাখিলে বিষপানে॥
হংসধ্বজ নৃপবরে, প্রতিজ্ঞা পূরণ করে,
সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে ফেলে।
অন্তরে পাইয়া ভয়, ভাবে তব পদদ্বয়,
সুধন্বাকে আপনি রাখিলে॥
পড়িয়া বিষম পাকে, কাতর কিঙ্করে ডাকে,
প্রাণ যায় নিগূঢ় বন্ধনে।
আমি নরাধম অতি, কিবা জানি স্তব স্তুতি,
দাসে দয়া কর নিজ গুণে॥
আসিতে গৌড়ের পথে, কত বিঘ্ন হল তাতে,
আপনি রাখিলে কৃপাময়।
ঘুচিল মনের সাধ, দৈবেতে সাধিল বাদ,
আর না যাইব নিজালয়॥
নাহি করি হাতী চুরী, মামা মোর হল বৈরী,
খলতা করিয়া কষ্ট দেন।
স্তব করে লাউসেন, স্বর্গে ধর্ম্ম জানিলেন,
হনূমানে ডাকিয়া কহেন॥
শুন বাপু হনূমান্, সেনের রাখিতে প্রাণ,
ঝাট যাহ গৌড় সহরে।
হাতী চোর করে তাকে, পাথর দিয়াছে বুকে,
কারাগারে দুই সহোদরে॥
প্রভুর আরতি পাই, চলে হনূ ধাওয়াধাই,
গৌড়েতে দিলেন দরশন।
ধর্ম্ম-পদ অরবিন্দে, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
নিশাভোগ রজনী সবাই নিদ্রাগত।
বন্দিশালে উপনীত পবনের সুত॥
পদাঘাতে কপাট করিয়া চুরমার।
সেনের নিকটে গেলা পবনকুমার॥
বুকের পাথর ফেলে সমুদ্রের জলে।
বন্ধন ঘুচায়ে সেনে করিলেন কোলে॥
হনূর চরণে সেন হয়ে প্রণিপাত।
হনূমান্ মাথায় বুলান পদ্ম হাত॥

আশীর্ব্বাদ করে হনু জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ ভাই লাউসেন বন্দী কেন হেথা॥
যোড় হাতে লাউসেন কহে ধীরে ধীরে।
হাতী চোর বলে পাত্র বন্দী করে মোরে॥
বন্দী করে পাতর ভূপতি নাহি জানে।
হনুমান্ বলে ভাই থাক এইখানে॥
খালাস হইবে কালি ভাই দুইজন।
গৌড়েশ্বর ভূপতিকে কহিব স্বপন॥
লাউসেনে বলে হনু চলিল সত্বরে।
স্বপন কহেন গোড়েশ্বরের শিয়রে॥
হনুমান্ বলে রাজা শুন সাবধানে।
সর্ব্বনাশ তোমার হইল এতদিনে॥
ধর্ম্মের তপস্বী বন্দী তোমার আলয়।
ভৃত্য অপরাধেতে স্বামীর দণ্ড হয়॥
সাধুজনা বন্দী, কালি করিবে খালাস।
পরিচয় দিলাম আমি রঘুনাথ-দাস॥
না করিলে গৌড় হবে লঙ্কার সমান।
এত বলি হনুমান্ হল অন্তর্ধান॥
তার পর ভূপতি দেখিল শেষকালে।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত ধনঞ্জয় চালে॥
স্বপন দেখিয়া উঠে রায় গৌড়েশ্বর।
রজনী প্রভাত পুষ্পে ডাকয়ে ভ্রমর॥
পীযূষের সমান কোকিল ডাকে ডালে।
মুখ পাখানিলা তখন ভৃঙ্গারের জলে॥
বার দিয়া মহারাজ বসিল দেয়ানে।
ভৃত্যগণ দুদিকে চামর পাখা টানে॥
পঞ্চপাত্র বসিল কায়স্থ সারসিরি।
নবলক্ষ দল বসে নৃপতিকে ঘেরি॥
মণ্ডল সকল বসে লয়ে প্রজাগণে।
পাত্র মহামদ বসে রাজার দক্ষিণে॥
রায় গৌড়েশ্বর তখন জিজ্ঞাসে পাতরে।
ধর্ম্মের সেবক কেন বন্দী কারাগারে॥
বিপরীত স্বপন দেখিলাম নিশাকালে।
সাধু জনে খালাস করিয়া দিতে বলে॥
মহামদ বলে রাজা ভাব অকারণ।
কদাচিৎ সত্য নয় নিশার স্বপন॥
হস্তী চুরী করিতে নাহিক ধর্ম্ম-ভয়।
সাধু ব্যক্তি বলে তারে কোন্ শাস্ত্রে কয়।
বন্দী করে রেখেছি দুবেটা হাতী চোরে।
আজ্ঞা হোক্ মাথা কাটি দরবার ভিতরে।
রাজা বলে চোরখান দেখিব কেমন।
ধর্ম্মমত বিচার করহ সভাজন॥
ভূপতি ইঙ্গিতে কোটাল দ্রুত ধায়।
যেখানে আছেন বন্দী লাউসেন রায়॥
অঙ্গের বন্ধন নাহি বুকের পাথর।
বন্দিশালে বসে আছেন ধর্ম্মের কিঙ্কর॥
কোটাল দেখিয়া হল পাবকের প্রায়।
পুনরপি সেনকে বাঁধিয়া লয়ে যায়॥
কর্পূরের সহিত লইয়া তপোধনে।
উপনীত হল কোটাল রাজার দেয়ানে॥
দরবারে দাণ্ডাইল দুই সহোদর।
কম্প হয়ে দেখে রূপ রায় গৌড়েশ্বর॥
নবলক্ষ সেনাপতি না পালটে আঁখি।
বলে সবাই এমন সুন্দর নাহি দেখি॥
কত সুধা দিয়া বিধি নির্ম্মাণ করেছে।
রাজদণ্ড কপালে প্রণাম চিহ্ন আছে॥
হেন বুঝি বটে কোন রাজার নন্দন।
কৃষ্ণ বলরাম যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাজা বলে দুই ভাই চোর মেনে নয়।
অভিপ্রায় বুঝি কোন রাজার তনয়॥
পরিচয় মানে তখন রায় গৌড়েশ্বর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন মায়াধর॥

অষ্টাক্ষরী ছন্দ।

সেনে দেখে মহাতেজা।
পরিচয় মাগে রাজা॥
অন্তরে না কর ভয়।
দেহ মোরে পরিচয়॥
পরিচয় সেন দেন।
পিতা মোর কর্ণসেন॥
ক্ষত্রকুলে উৎপত্তি।
কনকসেনের নাতি॥

রঞ্জা বিদ্যাধরী মাতা।
কর্পূর অনুজ ভ্রাতা॥
নাম লাউসেন মোর।
ময়না নগরে ঘর॥
ধর্ম্ম মোর পক্ষ বল।
মহামল্ল সারেঙ্গ ধল॥
দুর্জ্জয় সমর ধীর।
বধিলাম সাত বীর॥
মল্লডোর বাঁধি ভালে।
গৌড় আসিবার কালে॥
প্রচণ্ড বিশাল রূপ।
জালন্দা এ বাঘ ভূপ॥
পর্ব্বত সমান বাসি।
দন্ত যেন তীক্ষ্ণ অসি॥
অভয়া চণ্ডীর বরে।
কামদল নাম ধরে॥
সমরে বধিয়া প্রাণ।
লয়ে এলাম লেজ কান॥
তারা দীঘি বনমাঝে।
কুম্ভীর তথি বিরাজে॥
প্রলয় কুম্ভীর মারি।
বারুই বধূ জয় করি॥
উপনীত গোলাহাটে।
সুরিফা আগুলে বাটে॥
সমস্যা তাহার পূরে।
নাসিকা ছেদন করে॥
আইলাম গৌড় পুরে।
মেসো মামা ভেটিবারে॥
বিধি প্রতিকূল মোর।
গৌড়ে হলাম হাতী চোর॥
পাত্র পানে রাজা চান।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান॥
সেন দিল পরিচয় রাজার হুজুরে।
রাজা আনন্দিত দেখে রঞ্জার কুমারে॥
শালে ভর দিয়া যে পূজিল নিরঞ্জনে।
মনস্তাপ রঞ্জার ঘুচিল এত দিনে॥
দুই ভাইএর বন্ধন করিয়া দিল দূর।
সমাদরে বসাইল গৌড়ের ঠাকুর॥
মহামদ মাত্র তখন বলে যোড় হাতে।
বিষম চোরের মায়া নারিলে বুঝিতে॥
মুনিজন ভুলে রাজা তুমি কি করিবে।
মোর কথা না রাখ আখেরে কষ্ট পাবে॥
এই রীতে সর্ব্বদেশ লুঠ করে খায়।
চোরের মন্ত্রণা বড় বুঝা নাহি যায়॥
সভামাঝে বীরপণা কহিল যে সব।
বুঝিতে সকল কথা লাগে অসম্ভব॥
মাল বধ আদি করে যে সব কহিল।
এ সকলের চিহ্ন তবে কোথা রেখে এল॥
লেজ কান বাঘের দেখাক্ দেখি এনে।
নিশ্চয় জানিব বটে লাউসেন ভাগিনে॥
নৃপতি দিলেন সায় পাতরের বোলে।
সেন বলে আছে সব বকুলের তলে॥
সকলের চিহ্ন আছে ফলার ভিতর।
লোক দিয়া ফলাখানা আন নৃপবর॥
এত শুনে আজ্ঞা দিল গৌড়েশ্বর রায়।
একজনে বলিতে শতেক জন ধায়॥
বকুলের তলায় গিয়া হল উপনীত।
ফলাখান দেখে সবাই হইল চিন্তিত॥
বিশাইএর গড়া ফলা তুলিতে না পারে।
পর্ব্বত জাঁকিলা যেন ফলার উপরে॥
নব লক্ষ দলে যত ছিল রাউৎ রাণা।
সেনের ফলা তুলিতে নারিল কোন জনা॥
শত শত ব্যক্তি ধরে নারিল নাড়িতে।
সমাচার দিল কোটাল রাজার সাক্ষাতে॥
আনিতে নারিনু ফলা শুন গৌড়পতি।
হাতী চোর বিনে আনে কাহার শকতি॥
এত শুনে মহারাজ বিস্ময় ভাবেন।
রাজার আদেশ শুনি চলে লাউসেন॥
আশি মনের ভর ফলা বামহাতে লয়ে।
পুনর্ব্বার রাজার কাছে উত্তরিল গিয়ে॥
ফলাতে আছিল চিহ্ন দিল তপোধন।
বিস্ময় ভাবিল তখন গৌড়েশ্বর রাজন॥

ধন্য ধন্য করে দেখে যতেক লস্কর।
মহামদের মুণ্ডে যেন পড়িল বজ্জর॥
অন্তরে ভাবেন পাত্র করিয়ে লাবড়ি।
কিরূপে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি॥
এত দিনে দরবারে রিপুর হল বল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় ধর্ম্মের মঙ্গল॥
খলতা করিতে বুদ্ধি সঞ্চারে তখন।
পাত্র বলে মহারাজ শুন নিবেদন॥
মহাবীর সাত ভাই মল্ল সারেঙ্গ ধল।
প্রণাম করিত যাকে নব লক্ষ দল॥
ধরাধর কাঁপিত যাহার বীর দাপে।
বালক হইয়া বধ করিল কিরূপে॥
পরম্পরায় তার কথা শুনেছি সকল।
এসেছিল ময়নাকে ধুকুয়া চামদল॥
বসন্তে মারিয়া গেল মল্ল সাত জনা।
লাউসেন ভাগিনা তার বাঁধে বীরপনা॥
জালন্দায় বাঘ রাজা পার্ব্বতীর বর।
যার ভয়ে রাজ্য ত্যজে জাল্লাল শিখর॥
জাল্লাল শিখরের মুখে সমাচার পেয়ে।
আপনি সাজিলে নব লক্ষ দল লয়ে॥
সেনা লয়ে ভঙ্গ দিলে দেখে সেই বাঘে।
হেন বাঘ বধিল এ কথা মনে লাগে॥
অবধানে মহারাজ শুন তার কথা।
জল্লাল শিখর পূর্ব্বে রেখে ছিল জাঁতা॥
জন্ম হলে মৃত্যু আছে কে করে লঙ্ঘন।
দৈব যোগে জাঁতায় সামালে মৃগাদন॥
আহার বিহনে বাঘ ত্যজিল পরাণ।
আনিলেন ভাগিনা তাহার লেজ কাণ।
চর পড়ে শুকাইল তারা দীঘির নীর।
অর্ক তাপে অনাহারে মরিল কুম্ভীর॥
তবে বল বারুইএর বাঁচাল নন্দন।
এ সকল কথায় ভুলিবে কোন্ জন॥
গোলাহাটে ভুলিল নটীর রূপ দেখে।
মধু রসে বশ করে কাটিল নাসিকে॥
তবে যদি ভাগিনের সখা মায়াধর।
কহিতে উচিত কথা নাহি আপন পর॥
যে কালে গেলেন হরি কংস বধিবারে।
কুবলয় হাতী বধেন রাজার দুয়ারে॥
এত যদি ভাগিনে বটেন যোদ্ধাপতি।
দেখি এখন দরবারে বধিয়া দেন হাতী॥
পাট্টা লেখে দিব রাজ্য ময়না ইনাম।
লাউসেন রাউৎ দরবারে হক্ নাম॥
পাতরের বচনে ভূপতি দিল সায়।
দর্প করে উঠে তখন লাউসেন রায়॥
রাবণ কুপিল যেন অঙ্গদের ভাষে।
কাল সাপের তর্জ্জনে গরুড় যেন রুষে॥
ভূপতিকে লাউসেন করে নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে আজি বধিব বারণ॥
হাতী আন লাউসেন দরবারে ডেকে বলে
চমৎকার লাগে তখন নব লক্ষ দলে॥
রাজা না বলিতে আজ্ঞা দিলেক পাতর।
মাহুত আনিতে যায় ক্ষেপা করিবর॥
উপনীত মাহুত যেখানে করিশাল।
বাঁধা আছে কুঞ্জর যেমন যম কাল॥
চারি পায় ঘুচাইল লোহার শিকল।
চলে যেতে বারণ অবনী টলমল॥
ক্ষেপা হাতী মাহুত আনিল ত্বরা করি।
দূরে হোতে দেখি যেন হিমালয় গিরি॥
হলক্কে হেলায় শুণ্ড গলে স্বর্ণ ঘণ্টা।
দুই দন্ত বিকট যেমন স্তম্ভ দুটা॥

ক্রমশঃ।

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

প্রাণায়াম ও মন্ত্র-শক্তি।

একটি প্রবাদ বচন আছে,—

"স্বগৃহে পায়সং ত্যক্ত্বা
ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতিঃ॥"

নির্ব্বোধ মানব নিজ গৃহে বল-পুষ্টিকর সুস্বাদু পায়সান্ন উপেক্ষা করিয়া কুৎসিত ভিক্ষান্নের জন্য পর্য্যটন করে। এই কথাটা যেন হতভাগ্য ভারতবাসী আর্য্যবংশীয় আমাদের উপরেই ঠিক খাটিতেছে। আমাদের শরীর রক্ষার প্রধান সামগ্রী অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ; তাহা ত পরের করায়ত্ত পূর্ব্বেই হইয়াছে, অবশিষ্ট এই পাঞ্চভৌতিক দেহের উপাদান ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—তন্মধ্যেও ক্ষিতি অনেক দিন হইতেই হারাইয়াছি, জলও প্রায় পরায়ত্ত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর লোকে বলে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকা—সেই বায়ুটুকু লইয়াও বড় গোল উপস্থিত, কেন না, আমি রোগাক্রান্ত হইলাম, যত দিন আমার সত্ত্ব ছিল, তত দিন চিকিৎসকের শুভাগমন হইত, এখন নিঃসত্ত্ব হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়া চিকিৎসক আমায় উপেক্ষা করিলেন; আর অনুমতি দিলেন, "এখন যাও তুমি, সমুদ্রের বায়ু ভক্ষণ কর, অথবা মধুপুরে, বৈদ্যনাথে, সিমুলতলায় বা দার্জ্জিলিংয়েও নয়, কিন্তু সিমলা বা মসুরি পাহাড়ে যাইয়া বায়ু ভক্ষণ করিতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ এ যাত্রায় * * *।" চিকিৎসকের ঐরূপ মধুরায়মান আশ্বাস বাক্যে তখনই আমার প্রাণপক্ষী উড়ু উড়ু করিতেছিল। ভাবিলাম চিকিৎসকের আদেশানুসারে সিমলা বা মসুরির বায়ু ভক্ষণ করা আর ঘটিল না, প্রাণপক্ষী দক্ষিণ সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ু অতিক্রম করিয়া, হয়ত বা যমালয়ের বায়ু সেবন করিতেই যাত্রা করে।

তখন হঠাৎ প্রাণপক্ষীর মনে পড়িল,—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং" সহসা বিবেচনা না করিয়া কোনও কার্য্য করা উচিত নহে! "বিপদি ধৈর্য্যং" বিপৎকালে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে। ইহা ভাবিয়া আমি প্রাণের সহিত চিন্তা করিতে বসিলাম, ভাবিলাম এখন কি কর্ত্তব্য? কার সহিতই বা এই বায়ু ভক্ষণের পরামর্শ করি? তখন মনে হইল আর্য্য ঋষিগণই বা এই বায়ু ভক্ষণ সম্বন্ধে লিপিমুখে কি পরামর্শ দেন? এই ভাবিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের শরণাপন্ন হইলাম, তন্মধ্যে "ভীষটাচার্য্য" বলেন—

"দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজদেবতা-গো-
গুর্ব্বর্চ্চন প্রণতিভিশ্চ জপৈস্তপোভিঃ।
ইত্যুক্ত পুণ্যনিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ,
প্রাক্‌পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রযান্তি।"

(মলমাসতত্ত্ব)

যদি পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মজনিত রোগ উপচিত হয়, তবে সেই রোগ, দান, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দেবতা গো গুরুর

সেবা প্রণাম ইষ্টমন্ত্র জপ এবং তপস্যা দ্বারা প্রশমিত হয়।

এই ভীষটাচার্য্যের উক্ত বচনে "তপস্যা" শব্দের অর্থালোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম যে, "প্রাণায়াম"ই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ইহাতেই অশেষ দুরারোগ্য রোগ প্রশমিত হয়, এবং বিনা অর্থব্যয়ে নিজ নিজ বাস ভবনে বসিয়াই উক্ত রোগনাশক প্রাণায়ামরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান চলিতে পারে।

একে রোগে শারীরিক বল এবং চিকিৎসকের 'প্রণামি' ও ঔষধের মূল্যাদি দানে আর্থিক বল রহিত হইয়া আমি নিঃসত্ত্ব হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং ঘরে বসিয়া প্রাণায়ামে বায়ু ভক্ষণে আরোগ্যের প্রত্যাশায় আর সমুদ্রের বা পর্ব্বতের বায়ু ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইল না।

তৎপরে অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া রোগের মূল কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম, অনেকানেক আর্য্য ঋষিদের মত সংগ্রহ করিলাম, প্রথমতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মন্বাদি ঋষির বচন শুনিলাম।

মনু, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ বলিলেন, রোগ ও অল্পায়ুর কারণই অধর্ম্ম ও অনাচার, আর আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ স্বধর্ম্ম ও সদাচার।*

তখন মনে মনে ভাবিলাম, স্মৃতিকার মন্বাদি ঋষিগণ হয়ত বা লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ে কোথাও বা পুণ্য বা স্বর্গাদির প্রলোভন, কোথাও বা পাপ নরক বা রোগাদির ভয় প্রদর্শন করিয়া স্তুত্যর্থবাদ বা নিন্দার্থবাদে বচনোপন্যাস করিতে পারেন, রোগ বা আরোগ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারের উপদেশ যথেষ্ট নাও হইতে পারে।

অতএব শারীরবিজ্ঞানবিৎ চরকাদি ঋষিরাই বা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম চরক বলেন,

অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ এবং পরিণাম এই তিনই রোগের কারণ।*

এ প্রবন্ধে অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ ও পরিণামের ব্যাখ্যা অনুপযোগী, অতএব প্রজ্ঞাপরাধের বিষয়ই বলা যাইতেছে। যে প্রজ্ঞাপরাধ হইতে রোগ উদ্ভূত হয়, তাহার স্বরূপ কি? এতদুত্তরে মহর্ষি চরক বলেন,

"ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ
কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষ-
প্রকোপনং॥"

"বিনয়াচারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণং।
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং॥"
"ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনং।
ঈর্ষামানমদক্রোধ লোভ মোহ মদভ্রমাঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ।
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজোমোহসমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণং॥"

অর্থ—নিজের বুদ্ধি ধৈর্য্য ও স্মৃতিভ্রংশ দোষে যে সকল অন্যায় কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ কহে। এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, তাহার শরীরস্থ বাত, পিত্ত ও

* "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥
দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ ভবেৎ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥"
(মনু ৪।১৫৫—১৫৮)
(বিষ্ণু ৭১।৯১—৯২)
(বশিষ্ঠ ৬।৪—৯)

* "তৎ ত্রিবিধমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেত্যতস্ত্রিবিধকল্পা ব্যাধয়ঃ।"
ইতি চরক নিদানস্থান।

শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মায়।

সমুচিত বিনয় ও নিজ আচার পরিত্যাগ, মাননীয় জনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, জানিয়া শুনিয়া অহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এবং ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়োক্ত সচ্চরিত্রতার পরিত্যাগ, ঈর্ষা, অহঙ্কার, মত্ততা, ক্রোধ, লোভ, অজ্ঞানতা ও ভ্রম এবং ঈর্ষাদিজনিত পরের অনিষ্টাচরণ বা নিজের দৈহিক অনিয়মাচরণ এবং রজোগুণ ও তমোগুণ প্রযুক্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, পণ্ডিতেরা ইহাকেই প্রজ্ঞাপরাধ বলেন। এই প্রজ্ঞাপরাধই ব্যাধির কারণ। চরকের ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় নামক অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত সচ্চরিত্র ও সদাচার বর্জ্জন করাও প্রজ্ঞাপরাধ।* যথা—"দেব গো ব্রাহ্মণ গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যানর্চ্চয়েৎ," "অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদঃ," "বশ্যাত্মধর্ম্মাত্মা," "নানৃতং ব্রূয়াৎ," "নান্যস্ত্রিয়মভিলষেৎ," "ন পাপৈঃ পাপী স্যাৎ" "নাধার্ম্মিকৈঃ সহাসীত," "ন পাপবৃত্তান্ ভৃত্যান্ ভজেত," "নানার্য্যমাশ্রয়েৎ," "নাস্নাত্বা......অন্নমাদদীত," "ন পর্য্যুষিতং অন্যত্র মাংস হরিতক শুষ্কশাক ফলভক্ষ্যেভ্যঃ," "ন নক্তং দধিভুঞ্জীত"† "ন সন্ধ্যাস্বভ্যবহার সেবী স্যাৎ" "ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ" ইত্যাদি।

অর্থ—যাহারা নীরোগতা এবং দীর্ঘায়ু ইচ্ছা করিবে, তাহারা দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ ও জ্ঞানিগণকে গৌরব করিবে, অতিথি সৎকার ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে, জিতেন্দ্রিয় এবং ধার্ম্মিক হইবে, মিথ্যা কথা কহিবে না, পরদারস্পৃহা করিবে না, পাপীর সংসর্গে পাপ অর্জ্জন করিবে না (১) অধার্ম্মিকের সহিত একত্র বসিবে না, দুশ্চরিত্র ভৃত্য রাখিবে না, অনার্য্য জাতির সর্ব্বথা আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, স্নান না করিয়া আহার করিবে না, মাংস, হরীতশাক, শুষ্ক শাক এবং ভক্ষ্য ফল ছাড়া অপর বাসী বস্তু আহার করিবে না, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অতিরিক্ত জোর দিয়া দর্শনাদি কার্য্য করিবে না।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সচ্চরিত্রতার সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করে, সে শত বৎসর যাবৎ কোনও রোগে আক্রান্ত হইবে না।

এই ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়োক্ত সদ্বৃত্ত বর্জ্জন করাও প্রজ্ঞাপরাধ, এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, তাহার শরীর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়, এবং সে অল্পায়ু হয়।

আবার বাগ্‌ভটাচার্য্যও (সূত্রস্থান ৪।৩৭) সংক্ষেপে বলিলেন—

"নিত্যং হিতাহার-বিহারসেবী, সমীক্ষ্যকারী,
বিষয়েষ্বশক্তঃ।
দাতা শমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী চ
ভবত্যরোগঃ॥"

অর্থ—যে ব্যক্তি নিত্যই হিতকর আহার, হিতকর বিহার এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, এবং বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিরহিত, দাতা, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, এবং সজ্জনের সেবাকারী হয়, তাহার কোন রোগ হইবে না।

সুশ্রুতসংহিতায়ও সদাচার, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবনের কারণ, তাহার পরিত্যাগ, রোগ ও অল্পায়ুর কারণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

উপর্য্যুক্ত চরক ও বাগ্‌ভটাচার্য্য ও সুশ্রুতের বচন শ্রবণে তখন দেখিলাম ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রব-

* ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায় অতিবিস্তৃত, তাহা হইতে অতি সংক্ষেপে অল্পমাত্র উদ্ধৃত হইল।

† "দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধি-
ভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাং॥"
মহাভারত—গান্ধারী।

র্ত্তক মন্বাদি ঋষি এবং শারীরত্বরিৎ চরকাদি ঋষি সকলেই একতালে নাচিয়াছেন, এক সুরে গাহিয়াছেন যে, "স্বধর্ম্ম ও সদাচারই আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর হেতু এবং তাহার ত্যাগই রোগ ও অল্পায়ুর হেতু।"

তখন রোগের কারণ যে অধর্ম্ম ও অনাচার, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। সন্দেহ রহিল না বটে, কিন্তু উক্তরূপ সদাচার এবং সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হওয়াও বড় সুকঠিন, মানবজাতির ওরূপ প্রজ্ঞাপরাধ পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ মানব চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

"পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥"

(জীবন্মুক্তি বিবেক।)

মানবজাতির ইহাই স্বভাব যে, তাহারা পুণ্যের ফল সুখভোগ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে, কিন্তু পুণ্য করিতে চাহে না, তাহাতে বড়ই নারাজ; আবার পাপের ফল দুঃখটুকু আদৌ চাহে না, কিন্তু পাপ করিতে বেশ নিপুণ; সুতরাং যদি মুনিবচনানুসারে কেবল সদাচার ও সচ্চরিত্রতার বলেই মানবজাতিকে শূন্যে শূন্যে দীর্ঘজীবী করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর চিকিৎসার প্রয়োজনই হইত না, বা চিকিৎসাশাস্ত্রেরও প্রয়োজন হইত না।

ফলতঃ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র কত কত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রোগ বা চিকিৎসার বিষয়টা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বলেন নাই। কেন বলেন নাই? না, তাঁহারা জানিতেন যে, আমাদের উপদিষ্ট সদাচার, ধর্ম্ম এবং নীতি অনুসারে চলিলে নিশ্চয়ই রোগ হইবে না, তার আবার উল্লেখ বা চিকিৎসার বিষয় কি বলিব? তাঁহারা বলিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

যদিও তাঁহারা স্থূলরূপে রোগের বিষয় না বলিয়া থাকেন, পুত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধানচ্ছলে বলিতে ত্রুটী করেন নাই, বরং "অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে" অর্থাৎ অনভ্যস্ত অসহনীয় অতি শীতোষ্ণ অতি কটু অম্ল প্রভৃতি বস্তুর সেবনে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত যে রোগ জন্মে, তাহার নিবৃত্তি চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত উপায়ের দ্বারাই সম্ভবপর বটে, কিন্তু অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগের অতিরিক্ত স্থলে অর্থাৎ কর্ম্মজরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধেও চিকিৎসা শাস্ত্র হস্তসঙ্কোচ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে—

"যথাশাস্ত্রস্তু নির্ণীতে যথা ব্যাধি চিকিৎসিতঃ
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ"

(মলমাস-তত্ত্ব।)

যে ব্যাধি শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাও হইয়াছে, এবং ব্যাধি অনুসারে চিকিৎসাও ঠিকই করা হইতেছে, কিন্তু তথাপি রোগের চিকিৎসা হইতেছে না, সেই ব্যাধিকে "কর্ম্মজ" বলা যায় (অর্থাৎ জন্মান্তর কৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম জন্য দুরদৃষ্টই উক্ত ব্যাধির কারণ)।

শাস্ত্রালোচনায় দেখিলাম, মানবদেহে তিন প্রকারে রোগ জন্মিয়া থাকে, যথা—দোষজ রোগ, কর্ম্মজ রোগ এবং কর্ম্ম-দোষজ রোগ।

অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে অর্থাৎ অনভ্যস্ত অতি শীত, অত্যুষ্ণ, অতি কটু ও অত্যম্লাদি বস্তুর অতি সেবন প্রযুক্ত বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত রোগকে "দোষজ" রোগ কহে। বিনা কারণে অর্থাৎ অতি শীত, উষ্ণ, কটু, অম্লাদি সেবন না করিলেও যে রোগ জন্মে, তাহাকে "কর্ম্মজ" রোগ বলা যায়। অর্থাৎ প্রাক্তন্ দুষ্কৃত কর্ম্মজনিতই সেই রোগ, ইহা বুঝিতে হইবে। এবং অল্পমাত্র কারণে অর্থাৎ অত্যল্প শীতোষ্ণাদি

সেবনে বাতপিত্তশ্লেষ্মাদির বৈষম্য জনিত অতি ভীষণ অসাধ্য রোগকে "কর্ম্মদোষজ" বলা যায় অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি কর্ম্ম ফলে অল্প কারণেও যে উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মদোষজ অনুমান করা যায়। মহর্ষি শাতাতপ এই কথা বলিয়াছেন—

"যথা নিদানং দোষোত্থঃ কর্ম্মজো
হেতুভির্ব্বিনা।
মহারম্ভোঽল্পকেহেতাবন্তিমো দোষ
কর্ম্মজঃ॥"

অর্থ—কারণ ক্রমে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম "দোষজ," বিনা কারণে যে রোগ জন্মে, তাহা "কর্ম্মজ" এবং সামান্য একটুকু কারণে মারাত্মক যে রোগ জন্মে, তাহা "দোষ-কর্ম্মজ"।

শুদ্ধ দোষজ (বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত) রোগ, ঔষধ সেবনেই নিবৃত্ত হয়,* কর্ম্মজ রোগ দান, দয়া, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গো, গুরুসেবা ও জপ তপস্যা দ্বারা প্রশমিত হয়,† আর দোষকর্ম্মজ রোগ প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, দয়া ও জপ তপস্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে এবং ঔষধ দ্বারা দোষ ক্ষয় অর্থাৎ বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য অপনীত হইলেই চিকিৎসিত হয়।‡

* স্বহেতু দুষ্টৈরনিলাদিদোষৈরুপপ্লুতৈঃ স্বেষু
পরিস্খলদ্ভিঃ।
ভবন্তি যে প্রাণভৃতাং বিকারাস্তে দোষজা
ভেষজশুদ্ধিসাধ্যাঃ॥

† "দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজদেবতাগো
গুর্ব্বর্চ্চন প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুগ্রৈঃ।
এভিশ্চ পুণ্যনিচয়ৈরুপচীয়মানাঃ
প্রাক্‌পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্রযান্তি॥"

‡ "দানাদিভিঃ কর্ম্মভিরোষধীভিঃ কর্ম্ম-
ক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ।
সিদ্ধন্তি যে যত্নবতাং কথঞ্চিত্তে কর্ম্ম-
দোষপ্রভবা গদাস্তু॥"

(মলমাসতত্ত্বে ভগবদ্বাক্য)

বৈদ্যশাস্ত্র বলেন (সারাবলী),—

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং।
এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥"

যাহারা শরীরের হিতকর বস্তু আহার করে, যাহারা সচ্চরিত্র এবং নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বী, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, তাহাদেরই এই ১২০ বৎসর আয়ু নিরূপিত হইল, ইহাই বৃদ্ধ মুনিগণের প্রবাদ।

এই ১২০ বৎসর আয়ু সম্বন্ধে একটুকু বুঝিবার আছে, তাহা এই—মানবের আয়ুটা নিয়ত কি অনিয়ত? এবং মৃত্যুটা কাল মৃত্যু, না অকাল মৃত্যু? এ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রেই অনেকানেক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, বিশেষতঃ চরকের বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত আছে, সে সকল বিচার এস্থলে অনাবশ্যক। এস্থলে সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তত্ত্ব এইমাত্র বক্তব্য যে, আয়ুর একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, আয়ু কারণবশে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়, যেমন পাশাপাশি দুইটী গাছ জলাভাবে মরিতেছিল, কিন্তু যেটাতে কেহ জল দিল, সেটি বাঁচিল, যেটা জল পাইল না সেইটা মরিল, যেমন গৃহশোভার জন্য যে চিত্রিত ঘটটা তুলিয়া রাখা হয়, সেইটা শতবৎসর তথায় রহিল, আর যেটা সর্ব্বদা ব্যবহার করা গেল, সেইটা ঘা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তোলা চিত্রিত ঘটটাও ক্রমে ক্রমে লোনা ধরিয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ঐ ভাঙ্গিবার কারণ একমাত্র কালকেই বুঝিতে হইবে। এরূপ কাল কর্ত্তৃক ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ মনুষ্যাদিও একদিন মরিবে, ইহারই নাম কালমৃত্যু। এই কালমৃত্যু অপরিহার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও কালমৃত্যুর অধীন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা জানিয়াছিলেন যে, কোনরূপ অত্যাচার না ঘটিলেও কলিযুগে

মানব শরীর ১০৮ বা ১২০ বৎসরের অধিক টিকিতে পারে না, ইহারই নাম ইদানীং কাল মৃত্যু। এই কালমৃত্যু হটান যায় না, অকাল মৃত্যুকে হটান যায়, অকাল মৃত্যু অর্থাৎ একশত বৎসরের এইদিকে ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদিতে যাহারা মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ, তাহাদিগের মৃত্যু দূর করিবার জন্যই যত কিছু প্রাণায়াম, জপ, হোম, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন মণিমন্ত্র ও ঔষধাদি সেবনের উপদেশ শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন।

যথা বৈদ্যশাস্ত্র—

"ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো
নিবার্য্যতে॥
একোত্তরং মৃত্যুশতং হ্যথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞঃ স্যাৎ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ
স্মৃতাঃ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি
ভেষজৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যু র্ন
শাম্যতি॥"

অর্থ—এই পৃথিবীতে কেহই অমর নহে, এ হেতু মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু রোগ নিবারণ করা যায়। একশত এক প্রকার মৃত্যু, ইহা অথর্ব্ব ঋষি সম্প্রদায়ের মত, তন্মধ্যে একটা মাত্র কাল মৃত্যু, তা ছাড়া অপর একশতটাই আগন্তু মৃত্যু অর্থাৎ অকাল মৃত্যু। যে সমস্ত আগন্তু অর্থাৎ ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সের মৃত্যু, তাহা ঔষধ, জপ, হোম, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি উপায়ে প্রশমিত হয়, কিন্তু কালমৃত্যু প্রশমিত হয় না।

চরক বলেন—

"তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং অতো
বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ।"
(বিমান, ৩।)

অর্থ—অতএব পূর্ব্বোক্ত বিনয়, আচার, জপ, তপস্যা, সন্ধ্যা, পবিত্র আহার প্রভৃতি হিতকর আচরণই দীর্ঘ জীবনের মূল, আর উহার বিপরীত আচরণই অকাল মৃত্যুর কারণ।

এই যে নূতন একটা "পেলেগ," ওলাউঠা অথবা বসন্ত রোগে কোন কোনও বৎসর কোন কোন দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, তাহারও কারণ মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—

এক সময়ে নানাজাতীয় লোকের এক জাতীয় ব্যাধি ও তাহাতে তাহাদের ভীষণ-ভাবে মৃত্যুর কারণ এই যে, বায়ু, জল, মৃত্তিকা ও কাল দূষিত হইয়াই ওরূপ দেশসংহারক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বায়ু দূষিত হইলে, এইরূপ স্বভাব ধারণ করে, যথা—বায়ুতে অস্বাভাবিক ঋতুর গুণ, যেমন শীত কালের বাতাস উষ্ণ, গ্রীষ্মের বাতাস শীতল, অত্যন্ত ভিজা ভিজা, অতি চঞ্চল অর্থাৎ এই জোরে বহিতেছে, আবার যেন বাতাস নাই, অত্যন্ত পরুষ অর্থাৎ গায়ে যেন আঘাত লাগে, অতি শীতল, অসহনীয় উষ্ণ, অতি রূক্ষ অর্থাৎ যাহার স্পর্শে গাত্র যেন শুকাইয়া যায়, অত্যভিষ্যন্দি অর্থাৎ যে বায়ুস্পর্শে ঘর্ম্ম নিবারিত হয় না, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর শব্দবিশিষ্ট, চারিদিক্ হইতে প্রবলবেগে প্রবাহিত, ঘূর্ণা বায়ু, দুর্গন্ধময় বাষ্প, ধূলি ও ধূমবিশিষ্ট হইয়া থাকে।*

দূষিত জল এইরূপ হয়,—অতি দুর্গন্ধ, বিবর্ণ, বিস্বাদ, বিকৃতস্পর্শ, অত্যন্ত ময়লাযুক্ত এবং মৎস্য, পক্ষী, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ

* তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ যথা—ঋতি বিষমমতিস্নিগ্ধমিতবৃত্তি পরুষমতি শীতোষ্ণ মতি রুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতি ভৈরবারবমতি প্রতিহত পরস্পরগতিমতি কুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতা পাংশু ধূমোপহতমিতি।"

চরক-বিমান ৩।

যে জল ছাড়িয়া যায়, যে জল পানে তৃপ্তি বোধ হয় না ও যাহাতে শৈত্য মাধুর্য্য গুণ থাকে না, তাহাই দূষিত জল। এইরূপ জল সেবনে দুরারোগ্য রোগ জন্মে।*

দেশ দূষিত হইয়া এইরূপ স্বভাবাপন্ন হয়† যথা—মৃত্তিকার স্বাভাবিক রূপ ও গন্ধ বদলাইয়া যায় এবং ভিতরে বাহিরে ময়লা আবর্জ্জনা-জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়। সর্প, মশক, পঙ্গপাল ও ইঁদুরের উপদ্রব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শকুনি, পেচক, শৃগালাদি দ্বারা দেশ ব্যাপ্ত হয়। উদ্যান নানাবিধ তৃণ ও উলুখড়ে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এমন কি যে দেশে কখনও যে সকল তৃণ, লতা, বৃক্ষ ও পশুপক্ষী দেখা যায় নাই, দেশ দূষিত হইলে সে সব নূতন নূতন তৃণ, বৃক্ষ, পশু পক্ষিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, শস্য সকল শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, পবন ধূমযুক্ত হয়, মধ্যাহ্ন সময়েও যেন সমস্ত দেশে বাতাসের সহিত ধূম বহিতে থাকে, যেন কোথাও আগুন লাগিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। পক্ষী

* "উদকস্তু খলু অত্যর্থ বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস স্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত জলচরবিহঙ্গসুপক্ষীণ জলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ"।

(চরক-বিমান, ৩য় অধ্যায়।)

† দেশঃ পুনঃ প্রকৃতি বর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুলং উপসৃষ্টং ব্যাল মশক-মক্ষিকা মূষকোলুক শ্বাশানিক-শকুনজম্বুকাদিভিঃ। তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলং অপূর্ব্ববদাপতিতং শুষ্ক নষ্টশস্যং প্রধ্মাত পতত্রিগণং উৎকৃষ্টখগণং উদ্‌ভ্রান্তব্যথিত বিবিধ-মৃগপক্ষিসঙ্ঘং। উৎসৃষ্ট স্ব স্ব ধর্ম্ম সস্য লজ্জা পরগুণজনপদং। শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণ সলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাত নির্ঘাত ভূমিকম্পমতিভয়ারাবরূপং। রুক্ষতাম্রারুণ সিতাভ্রজাল সংবৃতার্কচন্দ্রতারকং। অভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব। সত্রাসরুদিতমিব। সন্তমস্কমিব। গুহ্যকাচরিতমিব। আক্রন্দিতশব্দ বহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।"

(চরক, বিমান, অধ্যায়)

ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে, কুক্কুর উর্দ্ধ মুখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে, বিবিধ মৃগপক্ষিগণ কাতরভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, দেশবাসী লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম্ম, সত্যকথা, লজ্জা, সদাচার ও সদ্‌গুণ পরিত্যাগ করে, বিনা কারণে পুষ্করিণীর জল কম্পিত ও উচ্ছলিত হয়, মুহুর্মুহু ভীষণ শব্দে উল্কা ও বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প হয়, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণ রূক্ষ তাম্রবর্ণ ধারণ করে, আকাশ শুভ্রমেঘে আবৃত হয়, বিনা কারণে মানবগণ সদা শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়। যেন কোথাও কে রোদন করিতেছে, যেন অন্ধকারে চারিদিক্ আবৃত হইয়া রহিয়াছে, যেন কোথাও ভূত প্রেতগণ বেড়াইতেছে, এবং বিকটশব্দ শুনা যাইতেছে। ইহাই দেশ দূষিতের লক্ষণ, ইহাতেই দেশের অমঙ্গল।

কাল দূষিত হইলে ঋতুর বিপরীত লক্ষণ অথবা যে ঋতুর যে লক্ষণ নহে, তাহার অতিরিক্ত লক্ষণ বা তাহা হইতে অল্পলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন শীতের সময় শীত না হওয়া, বর্ষার সময় বর্ষা না হওয়া ইত্যাদি। এইরূপ হইলে অমঙ্গলের লক্ষণ জানিবে।*

যখন দেশ উৎসন্ন যাইবার হয়, তখন প্রথমে বায়ু দূষিত হয়। সেই দূষিত বায়ুস্পর্শে জল দূষিত হয়, জলের সংশ্রবে দেশও দূষিত হয়, দেশের সংস্পর্শে কাল দূষিত হইয়া থাকে।†

* কালঃ খলু যথর্ত্বলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গাহিতং ব্যবস্যেৎ।"

(চরক, বিমান, ৩ অধ্যায়)

† "বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালঃ
স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্গরীয়স্তরমর্থবিৎ।"
(চরক, বিমান, ৩ অধ্যায়)

এখন এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে পারে যে, কি কারণে সেই বায়ু জল দেশ ও কাল দূষিত হয়? বরং জল বায়ু দেশ ও কালকে যদি দূষিত উপপন্ন করিতে পারা যায়, তবে সেই দূষিত জল পান করিয়া, দূষিত বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, দূষিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন ফল মূল শস্যাদি ভোজন করিয়া ও দূষিত কালের সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধে মানবগণের রস রক্তাদি দূষিত হইয়া ব্যাধি জন্মিতে পারে, ইহা অনায়াসেই উপপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইবার মূল কি? এতদুত্তরে চরক বলেন—

"বায়াদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য
মূলমধর্ম্মঃ।"

অর্থ—বায়ু জল দেশ ও কাল দূষিত হইবার মূল কারণ দেশবাসী মানবগণের অধর্ম্ম।

উক্ত শারীরতত্ত্ববিৎ চরকাদির বচন শ্রবণ করিয়া ভাবিলাম, যখন এক একটা মহাদেশ ধ্বংসকারক রোগের কারণ দূষিত বায়ু জল মৃত্তিকা এবং কাল, এবং ইহাদের বৈকৃত্যের মূল অধর্ম্ম—অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্ম্ম আচার, খাদ্যাখাদ্য বিচারাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন, তখন আমার একটা শরীরের বায়ু জল মৃত্তিকা দূষিত হইবার অবশ্যই অধর্ম্ম ও দুরাচারই কারণ হইবে। ইহা স্থির করিয়া রোগ বিমুক্তি ও জীবন শিক্ষার পরামর্শের জন্য একজন বিজ্ঞ ধার্ম্মিক প্রাচীন ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম।

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মৃদু কটু বাক্যে কহিলেন, বাপু! লোকে কথায় বলে "সাধ আছে, ফুঁ আছে, দুধ আর বাটী নাই" তোমারও ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। তুমি নিজে ব্রাহ্মণ, চাল চলন ব্যবহার ম্লেচ্ছের মত, ইচ্ছা থাকিলেই কি ওরূপ ব্যবহারে সুস্থ বা দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে? ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের আচারে চলিবে, চণ্ডাল, চণ্ডালের আচারে চলিবে, তবেত হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া দীর্ঘজীবী হইবে। ফলাহারশীল বাদুড় পক্ষী যদি মৎস্য মাংস এবং পুতি দুর্গন্ধ মাংস এবং মল-ভোজী কুক্কুর যদি হবিষ্যান্ন ও পবিত্র ঘৃত ভোজন করে, তবে কি তাহারা নীরোগ শরীরে অধিক দিন জীবিত থাকে? দেখ বাপু! তুমি যুবক, এখন লোহা খাইয়া জীর্ণ করিবার সময়, এখন সাগু খাইতে শিক্ষিত হইতেছ, তবে আর স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া মিছামিছি চেঁচামেচি করিতেছ কেন? আর কয় দিনই বা বাঁচিবে? দেখিতেছি, তোমাদের এই শ্রেণীর যুবকেরা ৫০।৫৫ বৎসরের ওদিকেত যাইতেছ না, অথচ অনেকে ঘি, দুধ, মাংস প্রভৃতি বলপুষ্টিকর খাদ্য যথাসময়ে খাইতেছ, কিন্তু স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু পাইতেছ না। অতএব বাপু, এখনও সময় আছে, যদি সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইতে চাও, তবে ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও।

ঋষিগণ অভ্রান্ত ত্রিকালজ্ঞ, সমস্ত বস্তুর শক্তি তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবি-তর্কভাবে মানিয়া চলা উচিত। কিন্তু তোমরা ইংরেজীনবিস, প্রত্যেক বিষয়েই তোমরা "কেন'র" অবতারণা না করিয়া থাকিতে পার না, কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা লৌকিক বিজ্ঞানের বিষয় নহে, কেবল যৌগিক বিজ্ঞানেই যোগিগণ তাহা জানিতে পারেন, এ হেতুতেই সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে,

"আর্ষন্তু যোগিনাং বিজ্ঞানং লোক-
ব্যুৎপাদনায় নালং।"

অর্থ—যোগিগণের বিজ্ঞান আর্ষ—ঋষির উদ্ভাবিত, উহা লোকসাধারণকে বুঝাইতে শক্য নহে।

তথাপি তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটী বিষয়ের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

শুনিতে পাই, এখন ইংরেজীধরণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা বেলা ৭।৮টার সময় জাগিয়া বাসী মুখে "চা-বিস্কুট" খাইবে, এবং "চুরট্" টানিতে টানিতে খবরের কাগজ লইয়া পায়-খানায় বসিয়া তাহা পড়িবে, এই তাহাদের ভদ্রতার লক্ষণ, কিন্তু দেখিতে পাই প্রায়ই তাহারা রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ৫০।৫৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই হতভাগ্য জন্মভূমি ছাড়িয়া স্বর্গভূমির উন্নতি সাধন করিতে যায়।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন বিধানার্থ শাস্ত্রের আদেশ উহার বিপরীত। যথা—

সুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভার্থ অতি প্রত্যূষে জাগিয়া শয্যায় পদ্মাসনে বসিয়া মস্তকে গুরুর উপদেশ অনুসারে অতিবিস্তৃত শুক্লবর্ণ জলার্দ্র সহস্রদল পদ্মাদি চিন্তা করিবে।* তৎ-পরে পায়খানায় যাইবে। ইহাতে মন স্থির হয়, বুদ্ধি কর্ত্তব্য পথের অনুসরণ করে, ইন্দ্রিয়বর্গ সবল এবং মস্তিষ্ক শীতল হয় ও মস্তকস্থ যাবতীয় রোগ ও কেশরোগ বিদূরিত হয়, এমন কি গাঢ় চিন্তা করিতে করিতে কিছু দিন পরে সূক্ষ্মরূপে পদ্মের গন্ধ পাওয়া যায়। পায়খানায় গুরুর উপদেশানুসারে "অগ্নিসার" ধৌতিক্রিয়া করিবে, তাহাতে উদরাময় থাকে না, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।†

বেদের আদেশ এই যে—প্রত্যূষকালের সমীরণ মধুময়, জল মধুপ্লুত, পৃথিবীর ধূলি মধুসিক্ত, বৃক্ষাদি মধুযুক্ত,* সুতরাং মধু যেমন ত্রিদোষঘ্ন বল পুষ্টি আয়ুর্বৃদ্ধিকর, উষাকালের বায়ু জল মাটি ও বৃক্ষাদিও তেমনি ত্রিদোষ নষ্ট করে, বল পুষ্টি আয়ু বৃদ্ধি করে, সেইহেতু প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে পুষ্পচয়নার্থ উদ্যানে যাইয়া পুষ্পচয়নচ্ছলে বৃক্ষাদি হইতে মধুময় তাড়িত সংগ্রহ এবং ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে চিত্তের বৈরাগ্য ও একাগ্রতা সাধন করিতে পারে। ইহার ফলে মানব অনায়াসে বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ভালরূপে উপ-র্য্যুক্ত নিয়মগুলির অনুষ্ঠান করিলে নিজেই ইহার গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, ইহা তর্ক দ্বারা বুঝান নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর প্রাণায়ামের বিষয় শ্রবণ কর;—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রাতঃসন্ধ্যার পরে পুষ্পচয়ন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে গেলে অতি বিস্তৃত হইবে এবং ততক্ষণ তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে, অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উহার প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য মহৎ এবং স্বাস্থ্য-মূলক।

সন্ধ্যার সময় আদি অন্তে ও মধ্যে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমন করিতে হয়। আচমনের জলটা তাম্রময় কোষায় বা পঞ্চপাত্রে তুলসী বা বিল্বপত্র যুক্ত থাকিবে। ঐ জলটা ছোট তাম্রময় কুসীতে লইয়া গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি বাহির করিয়া

* "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থ-
মায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য মৈত্র্যং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"
(স্মৃতিঃ)

† "নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসার এষা ধৌতির্যোগিনাং প্রাণদায়িনী॥
উদরাময়কং হত্বা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ।"
(গ্রহযামল)

* মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্মধুনক্তমুতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজো" ইত্যাদি।
(ঋগ্বেদ, ১ অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৮শ বর্গ।)

ব্রাহ্মতীর্থ (করমূল) দ্বারা অত্যল্প পরিমাণে পান করিতে হয়। ইহারই নাম আচমন, এই আচমনাত্মক মন্ত্রপূত জলপান বিশেষ স্বাস্থ্যকর।

তারপর প্রাণায়ামের কথা। প্রাণায়ামের মত শারীরিক ও মানসিক দোষনাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক নাড়ীপরিষ্কারক হৃৎপিণ্ড-সংশোধক আয়ুবর্দ্ধক ক্রিয়া আর দ্বিতীয় নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত এইরূপ।

নারায়ণের স্তবে ভক্তপ্রবর মহাত্মা ধ্রুব বলিয়াছেন—

"প্রাণায়ামোঽসি সর্ব্বেষু সাধনেষু
শুচিষ্বহো।"
(কাশীখণ্ড ২১।৪২)

অর্থ—হে ভগবন্! যত কিছু পবিত্র সাধন আছে, তন্মধ্যে তুমি "প্রাণায়াম"।

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-ধৃত অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—

"কুর্ব্বন্তেঽপীহ পাপানি যে ত্বাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।
উভে সন্ধে ন তেষাং হি বিদ্যতে ভুবি পাতকং॥
ত্রিঃ পঠেদ্যাবত্ প্রাণঃ প্রাণায়ামেন যো দ্বিজঃ।
বর্ত্ততে ন স লিপ্যেত পাতকৈরুপ-পাতকৈঃ॥"

অর্থ—হে পাবনি, পাপকর্ম্ম করিয়াও যে সকল পাপী প্রাতে এবং সায়ংকালে তোমাকে চিন্তা করে, পৃথিবীতে তাহাদের কোন পাপই আর থাকিতে পারে না। এবং যে ব্রাহ্মণ তোমার (গায়ত্রীর) দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রাণ-বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়ামতৎপর হয়, সে অধঃপাতের মূল কারণ পাপ দ্বারা লিপ্ত থাকে না।

বৃহদ্বিষ্ণু বলেন;—

"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপা-পনুত্তয়ে।
দহন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈ-র্দ্বিজস্য তু॥"

অর্থ—সকল পাপবিনাশের জন্য দ্বিজগণ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ব্রাহ্মণের সকল পাপই একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা দূরীভূত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

পূর্ব্বজন্ম।

১। কোন কোন বাদী বলেন যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মজ সংস্কার হইতে যে বর্ত্তমান জন্ম সূচিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই। এক্ষণে কোন্ যুক্তি আশ্রয় করিয়া উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে? আর্য্য দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ন্যায়, যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আশ্রয় করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই বিশ্বে কোন বস্তুর একবারে নাশ (ধ্বংস) নাই, সকল দ্রব্যই সেই এক মূলশক্তি (মূল উপাদান, The one without a second) প্রভাবে একবার আবির্ভূত, একবার তিরোহিত হইতেছে। কোন বস্তুর অত্যন্ত অভাব হয় না। যখন কোন বস্তুর তিরোভাব (নাশ) হয়, তখন সেই বস্তু সেই অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যায়; এইরূপে ঐ মূলশক্তি

প্রভাবে তাহার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন (ক্রিয়া বা প্রচলন) প্রতিক্ষণ চলিতেছে; এই পরিবর্ত্তনই (যাহা যায়, একভাবে থাকে না) জগতের ও জীবের স্থূল শরীরের মৃত্যু (নাশ)। এই জগৎ বলিতে গম ধাতুর গতি-শীল অর্থ ধরিয়া বস্তু মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল প্রমাণ হয়। হিন্দু শাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কত পূর্ব্বে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেই মূল শক্তির প্রচলন বা কম্পন হইতে বিকাশ স্থির করিয়াছেন দেখ। The whole universe is physical manifestation of the energy, এই energyর (মূলশক্তির) প্রথম বিকাশ মহ-ত্তত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার, এবং এই অহঙ্কারিক মহাভূতাদি বিশ্ব সংসার। এখন এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটী পরমাণু হইতে মানব পর্য্যন্ত (ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত) সকলে বারবার যাইতেছে ও আসিতেছে না কি? অতএব আর বলিতে পারা যায় না যে, জীবের প্রাগ্‌ভাব বা পূর্ব্বজন্ম নাই। বেশ, আমাদের পূর্ব্ব অস্তিত্ব এই যুক্তিতে থাকা সিদ্ধ হইল; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমা-দের স্মরণ থাকে না কেন? ইহার উত্তরে যদি বলি যে, আমাদের ইহজন্মের যৌবন কালে মস্তিষ্কাদি সকল ইন্দ্রিয় পূর্ণ বিকাশ হইলেও অনেক ঘটনা মনে রাখিতে পারি না কেন? অনেক ঘটনা একবারে বিস্মৃত হই কেন? এতদুত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কোন অন্তরায় বা কোন নূতন ভাবাবেশ বশতই আমরা সব ভুলিয়া যাই। সেইরূপ কোন বিশেষ অন্তরায় বা নূতন শক্তি (ভাবাবেশ) হইতে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয়সকল বিস্মৃত হই। ইহজন্মেই দীর্ঘকালে ও বহু কর্ম্মজ বাসনা হইতে চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই নিজ নিজ ইহজন্মের সমস্ত ঘটনাবলী (প্রত্যেক দিব-সের) স্মরণ করিলে এই বিস্মৃতির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবার চিত্তের অন্তরায় ধারণা ধ্যানাদি (অষ্টাঙ্গ যোগ) অনুষ্ঠান দ্বারা দূর করিলে, কোন এক সংস্কার বীজে সংযম করিলে, পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইহার ফল অনু-ষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পার, এখানে তর্ক যুক্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক জাতি-স্মরের উল্লেখ আছে; ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্য-ভারতী, তাঁহার অতীত জন্মের উজ্জ্বল ছবি স্মরণ করিয়া দিবারাত্র অশ্রুজলে (ভগবৎ বিরহে) ভাসিতেন। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধেরও অতীত জন্মের জ্ঞান হইয়াছিল।

২। মনে কর ইহজীবনেই আমরা অনেক সময়ে (মূর্চ্ছা, স্বপ্ন ও ভাবাবেশে) অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার পরক্ষণে কিছুই স্মরণ করিতে পারি না; এরূপ বিস্মৃতির কারণ কি স্থির করিবে? তোমাকে বলিতেই হইবে যে, ঐ ঘটনার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়াদি মস্তিষ্ক যেরূপ-ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার পরক্ষণে বা এখন তাহা নাই, ঐ সময় কোন নূতন শক্তি আসিয়াছিল, এখন তাহার তিরো-ভাব হইয়াছে, তাই ঐ ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছি।

সহজ অবস্থায় ইহজীবনে যখন বহু ঘটনা ভুলিয়া যাই, তখন নানা অন্তরায় প্রভাবে অতীত জীবনের বিষয় ভুলিয়া যাইব, ইহা কোন্ বিচিত্র কথা?

এটী অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কোন কোন মানুষ কোন মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা বা তাড়িত শক্তি স্বীয় শরীরে সঞ্চার পূর্ব্বক তাহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অধি-কার করিয়া অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ঐ প্রেতাবেশ বা

তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে যদি কাগজ খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, কেমন সন্দেস খাইলে? উত্তরে আবিষ্ট ব্যক্তি বলিবে, "অতি উত্তম সন্দেস খাইলাম," ইত্যাদি অনেক অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিতে পাইবে। ঐ আবিষ্ট ব্যক্তির সেই একই আমিত্ব, সেই একই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ হইতেছে, অথচ সে অপর ব্যক্তির ন্যায় বলিতেছে যে, "আমি সত্যই সন্দেস খাইতেছি।" এই সকল ঘটনা দেখিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহার বাহ্য শরীরাদির কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও ভিতরে ভিতরে উহার অস্মিতা (আমার ভাব বা দেহাভিমান) বদলাইয়া গিয়াছে। আবার তাড়িতশক্তি তুলিয়া লইলে সে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইবে।

৩। কোন বাদীরা বলেন যে, যদি ঈশ্বর ইহজন্মে আমাদের অতীত জন্মের পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করেন, তাহা আমাদের স্মরণ না থাকায়, সে দণ্ড ও পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। এই কারণে পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানাদির পূর্ব্বজন্ম উড়াইয়া দিবার ইহা প্রধান যুক্তি, ইহার আনুষঙ্গিক আরও ২।১টী ক্ষুদ্র যুক্তি আছে। ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। ইহার উত্তর এক কথায় এই যে, সকল আস্তিক (ঈশ্বরবাদী) ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ ধারণা ও অনুভূতি হইলে, আর তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ড ও পুরস্কার দাতা (ঈশ্বর) বলিয়া ভ্রান্তি আসিবে না। সকল আস্তিকের ও প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকের মতেই এই বিশ্বের যিনি মূল কারণ, তিনি এক, এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি সমষ্টি। অধিকন্তু আস্তিকগণ তাঁহাকে জ্ঞানময় (omniscient) আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক তাঁহাকে (মূলকারণকে) যে সর্ব্বশক্তি-সমষ্টি (all-powerful) বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ জ্ঞান (চিৎশক্তিও) আসিল; তাহা না হইলে সর্ব্বশক্তি বাধ হয়। এইখানে "সার্ব্বভৌমিকধর্ম্ম ও অবতারবাদ" গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রস্তাব খাটাইয়া বল দেখি যে, ঐরূপ একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ অচল গম্ভীর ধীর শুদ্ধ বুদ্ধ ঈশ্বরের দণ্ডধারী রাজা বা সম্রাটের এইরূপ সচলতা (চিত্তবিক্ষেপ বা বিকার) হইতে পারে কি যদ্দ্বারা তিনি আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের জন্য সদা ব্যস্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তে দণ্ড পুরস্কার ব্যবস্থা করিতেছেন? রাজা বা সম্রাটের সবল বিক্ষিপ্ত চিত্ত আছে, তাই তিনি তাঁহার প্রজার দণ্ড পুরস্কার (নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই) ব্যবস্থা করিতেছেন না কি? তোমাদের প্রতিপাদ্য ঐরূপ মূল কারণে (ঈশ্বরে) বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্বার্থ নাই, থাকিলে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার বিধান করিতেন। ঐ দেখ আর্য্যদর্শন (আর্য্য দর্শন কেন, সকল ঈশ্বরবাদীই) সেই ঈশ্বরের কি স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শুন,—ওঁ ঈশানস্তাপনাশং নিরতিশয় বিবোধাত্মকোপাধিযুক্তং, নিত্যৈশ্বর্য্যস্থ চিত্রং ভুবনমময়মলং যস্য সম্বোধনেন, কৈবল্যস্থানযুক্তং গুণমলরহিতং তং কৃপাকল্পবৃক্ষম্, শ্রদ্ধাবীর্য্য প্রজাত স্মৃতিমুদিতহৃদো ধীমহি শ্রেয়সে নঃ॥"

"ঈশান, তাপনাশক, নিরতিশয় বিজ্ঞানাত্মক উপাধিযুক্ত, গুণমলরহিত, কৃপাকল্পবৃক্ষ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাবীর্য্য-প্রজাত স্মৃতিমুদিত হৃদয়ে আমরা আমাদের পরমার্থের জন্য ধ্যান করি।" তোমার কৃত ভাল মন্দ উভয় বিধ কার্য্যেই তিনি মাধ্যস্থ (উদাসীন), এইজন্য সর্ব্বদাই তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজমান আছেন; তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ ইহজন্মে স্মরণ থাক্ বা নাই থাক্,

তাহাতে ঐ পূর্ব্বজন্মের বাধা হইবে কেন? আমাদের কৃতকর্ম্মের (ক্রিয়া) পরিণাম, সংস্কারবীজ হইতে এই শরীর; সুতরাং সেই পূর্ব্বস্মৃতি (এই পাপ করিয়াছিলাম, তাহার দোষে এই জন্মে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, এই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার গুণে এই সুখভোগ করিতেছি ইত্যাদি স্মরণ) না থাকায়, ঐ ক্রিয়া পরিণামের (সংস্কার বীজের) বাধা হইবে কেন?

৪। মরণ-ত্রাস হইতেও পূর্ব্বজন্ম থাকা প্রমাণ হয়। পূর্ব্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অনুভূত দুঃখের স্মরণ হইলেই প্রাজ্ঞ মানব হইতে অজ্ঞ সদ্যোজাত শিশু (সদ্যোজাত শিশু কেন? কীটাণু পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই) মরণ ভয়ে ভীত হয়। এই মরণ-ভীতিই অভিনিবেশ পদবাচ্য। এই অভিনিবেশের সংস্কার জীবের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, দীর্ঘকালের বহু কর্ম্মজ অভ্যাস হইতেই আমাদের সংস্কার জন্মে, আর এই সংস্কার বীজরূপে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত থাকে, অর্থাৎ মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাই অনেক কার্য্যে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা স্বতঃবাধ্য হইয়া পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সেই সকল কার্য্য করিয়া থাকি। এই যুক্তির সত্যতা মানব মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতএব এই যুক্তিবলে প্রমাণ হয় যে, আমরা (সকল জীবই) পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ অনেকবার জন্মিয়া মরিয়াছি বলিয়াই ইহজন্মে কোন একটী সামান্য শরীর দুঃখ (ব্যাধি) দেখিলেই মরণভয় (অভিনিবেশ) হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা পূর্ব্ব জন্ম থাকা সিদ্ধ হইতেছে।

কোন একটী সদ্যোজাত শিশুর হস্ত প্রথমে প্রদীপ-শিখার উপরে ধরিলে সে ভীত হইবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি তাহার হস্ত ঐ দীপ-শিখার উপরে ধরা যায়, সে ভয়ে আর তথায় হাত দিতে চাহিবে না, সরাইয়া লইবে; এই ভয়ের হেতু কি পূর্ব্বদাহ-জনিত অনুভব নহে? সকল জীবের অভিনিবেশ (মরণ-ভয়ও) ঐরূপ পূর্ব্ব সংস্কারের। এক্ষণে ধীর বিজ্ঞ পাঠক ও শ্রোতা এই অভিনিবেশ বিষয়টী অনুচিন্তন করিলেই পূর্ব্বজন্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

৫। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পথের ভিখারী, কেহ প্রাসাদবাসী সম্রাট্, ইত্যাদি জীবজগতের নানা বিচিত্র ভাব দেখিয়াও পূর্ব্বজন্ম থাকা সিদ্ধ হয়।

যদি পূর্ব্বপক্ষ কর যে, ঈশ্বর ঐরূপ নানাভাবে জীবসকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য হইয়াছে। তাহা বলিতে পার না, যেহেতু সকল ঈশ্বরবাদীই তাঁহাকে নিরপেক্ষ ও পরম করুণাময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঐরূপ নিরপেক্ষ পরম করুণাময় ঈশ্বর কি বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করিয়া জীবকে নানাবিধ ক্লেশ দিতে পারেন?

যদি বল আপনা আপনি ঐ সৃষ্টি-বিচিত্রতা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ আপনা আপনি অর্থেই পদার্থের স্ব স্ব ভাবে (যাহার ভিতরে যাহা নিহিত আছে) অভিব্যক্তি। এই স্ব স্ব ভাবই জীবমাত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার-বীজ, এই সংস্কার বীজ হইতেই ঐ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্রতা)। অতএব ইহা দ্বারাও পূর্ব্বজন্ম প্রমাণ হইতেছে।

শ্রীসঃ—

কাশ্মীরের পথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পুরীকেন্দ্রস্থ প্রধান মন্দিরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি; এই মূর্ত্তি মনুষ্য-প্রমাণ উচ্চ, এবং বহুমূল্য বস্ত্র-রত্নালঙ্কার দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী গৃহসকলে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ শালগ্রাম শিলা সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থাপিত আছে। সর্ব্বশেষের মন্দির সমূহে নানাবর্ণের মূল্যবান্ প্রস্তরে নির্ম্মিত বহুতর বৃহৎ বৃহৎ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত পুরী মধ্যে আরও যে কত নানাবর্ণের মূল্যবান্ প্রস্তরে নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্যেক মূর্ত্তির নীচে "রণবীর সিংহ" এই বাক্যটী খোদিত আছে। পুরদ্বারে যে দুইটী মন্দির আছে, উহা স্বর্গীয় মহারাজ গোলাপ সিংহ ও রণবীর সিংহের সমাধিমন্দির। গোলাপ সিংহ রণবীর সিংহের পিতা। উভয় মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে; তন্মধ্যে গোলাপ সিংহের সমাধি-মন্দিরে স্ফটিক নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট একটী শিবলিঙ্গ আছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। পুরীস্থ মন্দিরগুলির শিখর দেশ অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ কলস দ্বারা সুশোভিত।

অঙ্গরাগ সহিত সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত; নিত্য পূজাদিরও পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। গীত বাদ্যে দেবালয় সর্ব্বদা উৎসবে পূর্ণ থাকে। নগরের লোকেরা সর্ব্বক্ষণই মন্দির দর্শন করিতে আসে, এবং দর্শন করিয়া ভক্তিভাব বর্দ্ধন ও আনন্দ অনুভব করে। এই মন্দিরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শালগ্রামশিলা স্থাপিত আছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ দেখিলেও ঐরূপ অনুমান হয়। এত শালগ্রাম শিলার এক স্থানে সমাবেশ ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা বা শুনা যায় নাই।

এই সমস্ত কীর্ত্তি দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে, ইহাতে বহু আয়াস ও অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণতা ও অবিচলিত চেষ্টা না থাকিলে কখনই বিশাল যশোকীর্ত্তি অর্জ্জন করা যায় না। জম্বুরাজ্যাধিপ স্বর্গীয় রণবীর সিংহের মধ্যে সে গুণের প্রচুর সমাবেশ ছিল। ইনি প্রায় কোটি মুদ্রা দ্বারা স্বরাজ্যে এক ধর্ম্মার্থ বিভাগ স্থাপন করেন। ইহার উপসত্ব হইতে তিনি জম্বু এবং কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহাতীর্থসমূহের অন্নছত্রের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই সমস্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। আমি দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও হিমালয় মধ্যস্থ বদরিকাশ্রম ইত্যাদি তীর্থস্থানে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের স্বাধীন ও মিত্ররাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও কাশ্মীর জম্বুরাজ্যের ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ সুবন্দোবস্ত দেখা যায়, তাহাতে ঐ দুই রাজ্যকে সমতুল্য বলিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল। এরূপ সুব্যবস্থা অপর কোনও রাজ্যে দেখা যায় নাই।

জম্বু নগরের অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। পথ, ঘাট সততই জনপূর্ণ থাকে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার লম্বা জামা ও পায়জামা পরে, মস্তকোপরে এক প্রকার উড়ানি দেয়, কর্ণে এক প্রকার কাশ্মীর দেশীয় পাখীর পালক ও কর্ণবেধ করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে। পুরুষেরা নানাবর্ণের বৃহৎ বৃহৎ পাগড়ী শিরোপরি ধারণ করে। ইহাদের চলিত ভাষা ডোগড়া, পঞ্জাবী ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ডোগড়া ভাষার বর্ণমালা স্বতন্ত্র, স্থানীয় লেখাপড়ার কার্য্য ডোগড়া এবং উর্দ্দু ভাষাতেই হইয়া থাকে। জম্বুর পার্ব্বতীয় প্রদেশকে ডোগড়া দেশ বলে। জম্বুতে শীত-গ্রীষ্ম দুইই অত্যন্ত বেশী, সহরে জলের কল থাকা সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে জল না পাওয়ায় জলকষ্ট হইয়া থাকে। দুই একটী পুষ্করিণী যাহা আছে, তাহার জল অতিশয় খারাপ।

সাধুদর্শন।

জম্বু সহর হইতে তিন মাইল দূরে বন-প্রান্তে মৌজগিরি নামক একজন মহাত্মা সামান্য একটী কুটীরে অবস্থিতি করেন। দুই দিন তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার স্বভাবও নামের অনুরূপ; তিনি সর্ব্বদাই আত্মভাবে সদানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু তিনি মৌনীও নহেন, আপন মনে যাহা হয় বলেন, বাক্যের মধ্যে কেবল দুনিয়া সংসারকে গালাগালি দেওয়া, অথচ কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে; ইহাই তাঁহার গালির বিশেষত্ব। তিনি লোক-সঙ্গ ভালবাসেন না; অধিক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে, জঙ্গল মধ্যে চলিয়া যান। তিনি যে কুটীরে বাস করেন, তাহার মধ্যে কখনও কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। তিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে খেয়াল বশে যখন যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক ঠিক ফলিয়াছে, এইরূপ শুনা যায়।

জম্বুর স্বর্গীয় মহারাজ রণবীর সিংহ বাহাদুর বাবা মৌজগিরির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন; তাঁহার সময় হইতেই বাবাজির সেবার ভার রাজসরকারের উপর আছে। ইহাঁর বয়স কত হইয়াছে, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না; এবং কত দিন হইতে তিনি ঐ স্থানে বাবাজি অবস্থায় আছেন, তাহারও কোনও ঠিক খবর পাওয়া যায় না। আমার বিবেচনায় তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর বলিয়া অনুমান হইল। বাস্তবিক তিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু; এক কম্বল গায়ে দিয়া চির দিন কাটাইতেছেন; উৎকট গ্রীষ্মের সময়েও তাঁহাকে কম্বল গায়ে দিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিলে মনে শান্তিসুখ অনুভূত হয়।

নানা দিক্ হইতে যে সকল সাধু কাশ্মীর যাত্রার জন্য জম্বুতে মহান্তজির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সকলেই গ্রীষ্মের প্রকোপে কাশ্মীর যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু মহান্তজির কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে ২২শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। ২০।২২ জন সাধু, ৪৫ জন অপর লোক, মহান্তজির জন্য একটী ঘোড়া ও ভার বহিবার (মালপত্র অর্থাৎ বিছানাদি) জন্য একটী ঘোড়া, এতদ্ব্যতীত তুরী, তরবারি, রৌপ্যের আশা, ইত্যাদি জামাতের* সঙ্গে ছিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া জামাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে জম্বু পরিত্যাগ করিল।

সাধুসকল ভারতবর্ষের কে কোন্ দেশ হইতে আসিয়া জামাতে মিলিত হইয়াছে, তাহার কোনই পরিচয় নাই, সাধুদের সে সমস্ত পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। পূর্ব্বে সকলেই সকলের অপরিচিত; কিন্তু এক্ষণে

* মহন্তের অধীনে অনেক সাধু এক সঙ্গে চলিলে তাহাকে জামাৎ বা মণ্ডলি বলে।

সকলেই একত্র এক উদ্দেশে সমবেত হইয়া চলিয়াছে। গমন সময়ের এই সম্মিলন ভাব সকলেরই মনে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্দীপনা করিয়াছিল।

জম্বু পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, অপর দিকে খর প্রবাহিত তাওই নদীর তীরবর্ত্তী বালুকা পথ দিয়া আমরা চলিলাম। গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যে বালি তাতিয়া অগ্নিবৎ হইয়াছিল। উক্ত বালি পথে পাদুকা সংযোগেও চলিতে উত্তপ্ত বোধ ও পদ প্রোথিত হওয়ায় আমরা ধীর গতিতে চলিতেছিলাম। এইরূপে আমরা জম্বু হইতে তিন মাইল দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেন্তর বাগ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বেন্তর বাগে একটী রামমন্দির আছে; উহা পুঞ্চ রাজ্যের রাজা (কাশ্মীররাজের অধীন রাজ্য) মতি সিংহ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে রাম সীতা লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মন্দির বন্য প্রদেশে অবস্থিত।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে এক প্রকার প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ চত্বর আছে। সান্নিধ্যেই একটী বাঁধান উত্তম কূপ আছে। আমরা এই দেবালয়েই আশ্রয় লইলাম। এবং চত্বর উপরি স্ব স্ব আসন বিস্তার করিয়া বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিতে হইলে কোনও প্রকার আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে থাকা বিশেষ আবশ্যক। ক্ষুৎপিপাসা বোধ হইলেই কিঞ্চিৎ আহার করিয়া জল পান করা উচিত; তাহা হইলে শারীরিক কোনও প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। মহাস্তজি পূর্ব্বেই তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকটেই কিছু কিছু মিছরী, শক্তু, শকর প্যারা, পকরী, পরিমাণ মত দিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমরা তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রামে রত হইলাম।

একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে আবার পাথর-নির্ম্মিত চত্বরের উপর আমরা উপবেশন করিয়াছিলাম। দিনমানের উত্তাপে উক্ত চত্বর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল। পাথর সহজে শীতল হয় না, সুতরাং রাত্রিতে শয়ন করিয়া আমাদের কোনও প্রকারেই নিদ্রা হইল না; সকলেই এক প্রকার জাগিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল, এই দিন আমাদিগকে শুষ্ক প্রদেশ অতিক্রম করিতে হইবে; এই হেতু রাত্রি অবসানের পূর্ব্বেই আমরা গমনোদ্যোগ করিলাম।

জম্বু হইতে ৩০ মাইল দূরে পর্ব্বতাভ্যন্তরে উদমপুর সহর। এই পার্ব্বতীয় প্রদেশ গ্রীষ্মকালে অতিশয় গরম ও শুষ্ক হয়; দিবা ভাগে সূর্য্যোত্তাপে গমন দুঃসাধ্য। আষাঢ় মাস শেষপ্রায়, তথাপি বৃষ্টির নামমাত্র নাই। স্বভাবতই এতদ্দেশে বৃষ্টি দেরীতে হয়, এবার বৃষ্টি হইতে আরও দেরী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্ম চরম সীমায় উঠিয়াছে। আর এক কথা, পার্ব্বতীয় দেশের অভ্যন্তরস্থ উচ্চতর প্রদেশ অপেক্ষা নিম্নতর প্রদেশে গ্রীষ্মাধিক্য অত্যন্ত অধিক হয়।

তল্পীতল্পা বাঁধিয়া ঘোটকপৃষ্ঠে চাপাইয়া স্ব স্ব বহন উপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। অন্ধকার রাত্রি; পথপার্শ্বস্থ ঝোড় জঙ্গল তিমিরবর্ণে আবৃত হইয়া নিশার অন্ধকার আরও গাঢ়তম করিতেছে। অদূরে গ্রামসম্মুখে সারমেয়গণ মধ্যে মধ্যে উচ্চ শব্দ করিয়া রজনীর গভীরতা জ্ঞাপন করিতেছে; নিস্তব্ধ প্রকৃতি দেবী দিবসের কোলাহলশ্রান্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া যেন নিঃশব্দে অতি ধীর গমনে কালের সহিত মিলিত হইতেছে। দূর হইতে দূরতর ঊর্দ্ধ গগনে নক্ষত্রজাল মিটি মিটি

আলোকমালায় অম্বর উদ্ভাসিত করিতেছে। তমোময়ী যামিনী যেন রত্নখচিত অসীম বস্ত্রদ্বারা আবৃত হইয়া শোভিত হইয়াছে।

আমরা বিভাবরীর ঈদৃশ চিত্তশান্তিকর বেশ দর্শন করিতে করিতে অতি বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া অদম্য উৎসাহে চলিয়াছি। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সঙ্গীরা যেদিকে যাইতেছে, আমিও সেই দিকে অন্ধের মত গমন করিতেছি। আমরা ২।১ টী ক্ষুদ্র গ্রাম ও শুষ্ক নদী পার হইয়া পর্ব্বত-পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রবেশ আরম্ভ হইল। পথও অপেক্ষাকৃত ভাল পাইলাম। কিন্তু পর্ব্বত আরোহণে শ্রম উপস্থিত হইল। কিছুদূর চলার পরেই আমার পিপাসা বোধ হইয়াছিল। পর্ব্বত আরোহণের শ্রম ও এতদ্দেশের মরুসদৃশ গরমে জলতৃষ্ণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল, সঙ্গীদিগকে অসহ্য পিপাসার কথা জ্ঞাপন করিয়া জল পাইবার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা জানিতেন, এতদ্দেশে জল পাওয়া দুষ্কর। অগ্রে জল পাওয়া যাইবে, এই বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহারা আমাকে গমনে উৎসাহিত করিতেছিলেন। আমিও আশা-বাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহাদের সহিত দ্রুতগমনে চলিয়াছিলাম। আমি যতই পাহাড়ে চড়িতেছি, ততই গরম ও শুষ্ক প্রদেশ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। এখানেও জল পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। শরীর এত পরিশ্রান্ত হইয়াছে যে, ঘামে কাপড় ভিজিয়া যাইতেছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসেও গরম বোধ হইতেছে। এরূপ স্থলে কত কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপে প্রায় পাঁচ মাইল চলিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর আসিয়া সমতল স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে কতকগুলি পথিক পথপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে জল থাকা সম্ভাবনায় আমাদের সঙ্গীরা চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে ডাকিলে ২।১ জন জাগ্রত হইয়া নিকটেই একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহাদের নিকট আমরা মৃত্তিকা কলসী দেখিতে পাইলাম। উহাতে শীতল জল আছে মনে করিয়া ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রার্থনা করা হইল। প্রথমতঃ তাহারা ঐ জল দিতে অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু আমাদের দলবল অধিক এবং সাধু দেখিয়া ভয়ে ভক্তিতে জল দিতে বাধ্য হইল। জলে অল্প শৈত্য ও দুর্গন্ধ থাকিলেও আকণ্ঠ জল পান করিলাম। ঐ জলপানে আমি যে কি প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। সেইখানে চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান একটী পুষ্করিণী আছে, উহারই জল কলসীতে ছিল। জলপানের পর বিনা বিশ্রামে পথ চলা উচিত নহে, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অপর সঙ্গী সাধুদের ইচ্ছা অনুসারে আমাকেও বাধ্য হইয়া তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইল; কারণ একেত অপরিচিত পার্ব্বতীয় পথ, তাহাতে রাত্রি কাল। রাত্রি অবসানে আমরা অনুন্নত একটী পর্ব্বত-মূলে উপস্থিত হইলাম। ঐ পর্ব্বত পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। এই স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি বলিয়া একটী কূপ আছে। সঙ্গীরা জলযোগ করিবার জন্য কূপের নিকট উপবেশন করিল। আমারও ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইয়াছিল। সুতরাং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমার সঙ্গীরা কূপের জলে শক্তু গুলিয়া পান করিতেছে দেখিয়া আমিও তাহাদের দেখাদেখি উক্ত কূপের জলে শক্তু ও মিছরী একত্রে গুলিয়া পান করিলাম। পার্ব্বতীয় পথ চলিবার সময় সঙ্গে জলযোগোপযোগী দ্রব্য রাখিবার ইহাই উপকারিতা। কূপের জল কিরূপ, তাহা শক্ত,

মিছরী মিশ্রিত থাকায় পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু পরে মুখ ধুইবার সময় খালি জল মুখে দিয়া জানিতে পারিলাম যে, উহা পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত। এমন কি মুখে দিয়া বমন হইবার উপক্রম হইল। উহাতে উদরের গোলযোগ হইতে পারে বলিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভগবৎ কৃপায় তাহা কিছুই হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রী——

সংস্কৃত-সাহিত্যে গীতার স্থান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের পরিপোষক, পক্ষান্তরে রামানুজপ্রমুখ অপরাপর সম্প্রদায় দ্বৈতবাদাবলম্বী। গীতার এমনই বিশেষত্ব যে, প্রাগুক্ত উভয় মতবাদীই গীতার সাহায্যে অনায়াসেই স্ব স্ব মতবাদের অনুকূল মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন। নির্দ্দোষ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমগ্র গীতাখানি দ্বৈতবাদ পরিপোষণের পক্ষেই যেন সমধিক অনুকূল। প্রতিকূলবাদীর মতবাদ খণ্ডন করিতে অপর পক্ষ গীতার সাহায্যে অপূর্ব্ব যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিতে সক্ষম হয়েন। গীতার জটিলতা-সমাধান-কল্পে বিপরীত মতবাদীদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ভূরি অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সে নৈপুণ্য ও জ্ঞানের মধ্যে এমনই কৃতিত্ব ও সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যে, সাধারণ পাঠক তাহার সীমা-মাত্র স্পর্শ করিবারও সামর্থ্য ধারণ করেন না; তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি সে নৈপুণ্যের মোহে ও সেই জ্ঞানের দুস্তর প্রভাবে পদে পদে বিপর্য্যস্ত; পক্ষান্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বানুসন্ধানী মাত্রের মনই কিন্তু তদালোচনায় বিশেষ কুতূহলী, সে সৌন্দর্য্যের সরস সুধা-পানে তাঁহারা সদাই বিভোর।

এক্ষণে গীতার বিষয়ীভূত সাংখ্য ও যোগ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সাংখ্যের লক্ষ্য জ্ঞানমার্গ ও যোগের লক্ষ্য ভক্তি ও কর্ম্মমার্গ। সাংখ্য-মত অনুসারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, গীতা জ্ঞানকেই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে যোগমতাবলম্বিগণ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া এই কথা বলেন যে, ভগবান্ যোগ ও কর্ম্মকেই জগতে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন, ঐ মার্গদ্বয় অবলম্বন করিয়াই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিভুর সান্নিধ্যলাভে সক্ষম হওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাহিরের ভাষা ধরিয়াও যদি গীতার বিষয়ীভূত তত্ত্বের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও শেষোক্ত মার্গকেই অপেক্ষাকৃত সুকর ও ভ্রান্তিশূন্য বলিয়াই যেন মনে হয়। যোগই যে গীতার চরম লক্ষ্য ও উপদেশ, গীতার প্রতি অধ্যায়ের উপসংহারভাগেই তাহার সুস্পষ্ট আভাষ প্রকটিত। যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ, পুরুষোত্তমযোগ, সন্ন্যাসযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, বিভূতিযোগ, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ, ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত লইয়াও সম্প্রদায়গত মতদ্বৈধের অভাব নাই। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধাবান্, কিন্তু

আর্য্যসমাজীরা তাহাতে আদৌ আস্থা সম্পন্ন নহেন; তাঁহাদের মতবাদের অনুকূলে তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে কোথাও ঈশ্বরত্বের আরোপ করেন নাই, গীতার বহুস্থলেই তিনি নিজেকে প্রাকৃত মানব বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন।

থাকুক এ মত-দ্বন্দ্ব; তাহাতে কোন পক্ষেরই কোনরূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তর্কবাদীরা পরস্পর একদেশদর্শিতার মোহময় আবেশে এই মূল তত্ত্বটী একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান যে, ধর্ম্মবিশেষের কোন দুরূহ জটিলতত্ত্ব মীমাংসার জন্য গীতা-কর্ত্তা গীতার অবতারণা করেন নাই, প্রত্যুত অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে উদ্বোধিত করিবার জন্যই তাঁহার এ অবতারণা। বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, গীতাকার গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে কোথাও তিল পরিমাণেও নিজের ঈপ্সিত বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে তখন যে দৈন্য ও যে মোহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা যে নিতান্ত অসঙ্গত ও অকিঞ্চিৎকর, রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন যে অতি ধর্ম্মবিগর্হিত ও দুর্নীতি-ব্যঞ্জক, যে ক্লীবভাবে অর্জ্জুন অধুনা অবসাদাচ্ছন্ন, তাঁহার ন্যায় বীরের পক্ষে তাহা যে বড়ই লজ্জাস্কর, ন্যায়ের পথ পরিহার করিয়া তুচ্ছ ভাববিশেষে অভিভূত অবস্থায় কর্ত্তব্য লঙ্ঘন যে মহাপাপ, এবং ধর্ম্মযুদ্ধে অরাতিকুলের নির্ম্মূল প্রয়াস যে আদৌ অধর্ম্ম ও নীতিবিগর্হিত নহে, উপদেশস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় কেবল তাহাই বুঝাইয়াছেন। অর্জ্জুনকে উহা বুঝানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য, আর ঐরূপ বুঝাইতে গিয়াই, ভারতের তদা প্রচলিত তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন মুখ্য মতবাদের একত্র সমাহার তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সেই সমাহার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন, বাহ্যতঃ ঐ সমস্ত মতবাদের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলেও মূলতঃ কিন্তু তত্ত্বাবতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সাংখ্য ও যোগের কথা তুলিয়া বলিলেন;—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি
ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্
যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স
পশ্যতি॥'

৫ম অঃ ৪—৫ শ্লোক।

"সাংখ্য" আর "যোগ" বিভিন্ন উভয়,
কহে মূঢ়েরাই পণ্ডিতেরা নয়।
যে কোন একটি করিলে আশ্রয়,
উভয়েরই ফল লভয়ে নর॥ ৪
লভেন যে স্থান জ্ঞানযোগিগণ
কর্ম্মযোগীরাও তাহে শক্য হ'ন।
"সাংখ্য" "যোগে" সাম্য নিরখে যেজন,
সেজন সম্যক্‌দর্শী এ ভবে॥ ৫

অর্জ্জুনের তাবৎ আপত্তি ও সন্দেহ শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ নৈপুণ্যসহকারে নিরাকৃত করিয়া দেন। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সময়ে সময়ে যদিও কতকগুলি অবান্তর ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অপর কিছুই নহে, অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্নমালার মীমাংসা তাঁহাকে ব্যপদেশেই সেরূপ করিতে হইয়াছিল। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের বিশদ বিবৃতিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে কিন্তু বিশেষ অভিনবত্ব এই যে, এবংবিধ জটিল ও দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও এক কেশমাত্র পরিমাণেও স্বীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বারবারই তিনি তাঁহার লক্ষ্য-পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কখন তিনি অর্জ্জুনকে নিজ যন্ত্রমের দিকে লক্ষ্য করিতে

বলিতেছেন, কখন বা তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিতে বলিতেছেন। নিজ প্রভাব বিস্তার দ্বারা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সময়ে সময়ে ভয় প্রদর্শন করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। "মানব জীবন নিরর্থক নহে এবং বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্যের প্রতিপালনই জীবনের চরম নীতি" শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মত ও অভিপ্রায়। দিব্য ও জলন্ত ভাষায় এই সত্যেরই তিনি প্রচার করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ত্তব্যপালনের মধ্যেই মুক্তির পথ ও চির অনাবিল আনন্দ বিরাজমান। এই কর্ত্তব্যপালন হইলেই জীব জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় আরূঢ় হইবার সামর্থ্য ধারণ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় জীব ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া জন্ম মৃত্যুর দুশ্ছেদ্য পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরানন্দ ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন।

জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে মানুষকে গীতা-কথিত জ্ঞান-কর্ম্ম-ধ্যান-সন্ন্যাস ভক্তি বিজ্ঞান এবং যোগের অন্যান্য অঙ্গ অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার যে কোন মার্গ অবলম্বন করিলেই অভীষ্টের সিদ্ধি অনিবার্য্য। সকলেরই চরম লক্ষ্য এক—তাহা ভগবানের সান্নিধ্যলাভ জনিত চিরানন্দ। কি করিয়া মানবজীবনের গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের পথে অগ্রসর হইতে হয়, গীতায় তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত। মানবজীবন যে উদ্দেশ্যহীন নহে, এই নীতি যে কেবল গীতারই প্রকটিত একটি নূতন তত্ত্ব, তাহা নহে। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেরই ছত্রে ছত্রে এ তত্ত্ব পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত। কর্ত্তব্য পালনের পথে স্বজন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্জ্জুন ইহা বুঝিয়াছিলেন; তবে তাহাতে কোনরূপ প্রত্যবায় সঞ্চারের সম্ভাবনা কি না, এই সন্দেহ-দুশ্চিন্তায় অর্জ্জুনের চিত্ত বিষম সঙ্ক্ষোভিত। তদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, না—উহাতে কোন পাপের সম্ভাবনা নাই। নিজ যুক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমেই মুক্তকণ্ঠে আত্মার অবিনশ্বরতা ঘোষণা করিয়া বলিতে হইল যে, প্রকৃত পক্ষে জগতে কেহ কাহারও হন্তারক নহে বা হইতে পারে না, এবং কেহ কাহার কর্ত্তৃক নিহতও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় মত এই যে, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সাধনই জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি এবং ঐ নীতি হইতেই জীবনের গতি পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। সংসার-পয়োধির জীবন-তরীর উহাই কর্ণ ও দিগ্‌দর্শন; জীবনের সমস্ত সঙ্কুল জটিল পথে ঐ নীতিই ধ্রুব তারা—অচিন্ত্য ব্রহ্মলাভের উহাই একমাত্র শরণি। কর্ত্তব্য বুদ্ধির সকাশে অরাতিপক্ষের ত কথাই নাই, স্বজন বিনাশেও কোন পাপ নাই। অধিকার-বিহিত প্রত্যেকের ধর্ম্মবুদ্ধি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কেন হউক না, তাহা কিছুতেই অন্যায় বা পাপজনক হইতে পারে না। দস্যু তস্কর ও নরহন্তৃগণের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া রাজা পাপভাগী নহেন। স্বদেশ-প্রেমিক বীর পুরুষ স্বদেশ রক্ষার জন্য ন্যায় যুদ্ধে আক্রমণকারী অরাতির নিপাত সাধন করিয়াও অন্যায় কার্য্য করেন না। ক্ষয় রোগীর যথাভাবে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসক যদি রোগীর মৃত্যুর কারণ হন, তথাপি তিনি তাহাতে পাপের ভাগী নহেন। এক্ষণে এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে সহসা কেহ যেন উপনীত না হন যে, গীতা অবস্থানির্ব্বিশেষে সর্ব্বকালেই অরাতিবিনাশ-নীতির সমর্থন করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যপালন করিতে হইলে আনুষঙ্গিক অপর যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, তাহা জানিয়া লইবার জন্য গীতা আমাদিগকে শাস্ত্রান্তরের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গীতা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, মানব যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তুমি কি করুণা, কি সহানুভূতি, কি ভক্তি, কি ভালবাসা, কি স্নেহ, কি প্রীতি, কি অপর কোন স্বার্থমূলক দুর্ব্বল মনোবৃত্তির মোহময় প্রভাবে বিচলিত হইয়া কঠোর কর্ত্তব্য সাধন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। পক্ষান্তরে কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া যদি তোমার অন্তঃকরণে তিলমাত্র কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে উহার কোনটিরই উৎসর্গ করিতে হইবে না। আবার ঐ কর্ত্তব্য সাধনের ন্যায্যতা সম্বন্ধে যদি তোমার দোলায়মান চিত্তের মধ্যে কোন রূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তাহা যে আদৌ ধর্ম্ম্য বা সঙ্গত নহে, সহসা এ সিদ্ধান্তেও যেন উপনীত হইও না। উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এবং নির্ম্মল বিবেক-বুদ্ধি-সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা শাস্ত্রবিশেষের উপদেশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে যদি তুমি উপনীত হও, আপাত দৃষ্টিতে যাহা অতি পাপজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অনুষ্ঠান ব্যতীত তোমার কঠোর কর্ত্তব্য কিছুতেই সম্পাদিত হইবার নহে, তাহা হইলে জগতের লোকে তাহাতে যাহাই কেন বলুক না, এবং তাহাতে যাহাই কেন ঘটুক না, সে কর্ত্তব্য সাধনে তুমি কিছুতেই সঙ্কুচিত হইও না। তোমার কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে করুণা প্রীতি স্নেহ ভালবাসা লজ্জা বা অপর কোন স্বার্থের ভাব অন্তরায়-স্বরূপ দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না, এক কথায় কোন প্রতিকূলতাতেই ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর তোমার আর তখন ঘটিবে না। এই স্বর্গীয় মধুর দিব্য উপদেশই বাহ্যে জটিলতাবৃত গীতার অন্তর্নিবিষ্ট বিষয়। সাধারণ মানবের নিকট সে উপদেশ একটু দুস্ফুট ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, ফল বিশেষের কঠিন আবরণমধ্যস্থ দিব্য সুস্বাদু পানীয় ও রসাল শস্যবিশেষ উপভোগ করিয়া যেমন তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভে সমর্থ হওয়া যায়, সংসার-তাপতপ্ত পথিকও সেইরূপ গীতার বাহ্য জটিলতা ভেদ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত মহাভাবের রসাস্বাদনে নিযুক্ত হউন, নিমেষের মধ্যে তাঁহার তাবৎ তাপ ক্লেশ ও দুস্তর দুরিতরাশি সূর্য্যোদয়ে তমোতিরোধানের ন্যায় অপগত হইবে। পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পূরিত ভীম রণপ্রাঙ্গণে শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনের চিত্ত-বৈক্লব্য ও মহামোহ অপসারণ মানসে শ্রীকৃষ্ণের মধুর ঝঙ্কারময় এই গীতার রচনা হয়। অর্জ্জুনের চিরবৈরী, যুধিষ্ঠিরের মহাশত্রু এবং স্বদেশের অমঙ্গলকারী অত্যাচারপরায়ণ খলমতি পাপাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক পাণ্ডবের ন্যায়লব্ধ রত্নময় সিংহাসন করতলগত করিবার জন্য একান্ত লোলুপ। দুর্ব্বুদ্ধিবশে সে মনীষী গুরুজনের উপদেশ মানিল না, সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, সমরই সুতরাং ক্রমশঃ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যথাসময়ে যথাস্থানে উভয় পক্ষেরই বিপুল বাহিনী যথারীতি সন্নিবেশিত হইল। কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুনের যুদ্ধরথ উভয় বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান, অর্জ্জুন একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—দেখিলেন, তাঁহার বিপক্ষদলে তাঁহারই বহু আত্মীয় স্বজন ও চিরনমস্য গুরুজনগণ বিরাজিত, উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহাদের বধ সাধন ব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধির কণামাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্জ্জুন সে দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিলেন, অবসাদবশে তাঁহার বীর হস্তের গাণ্ডীব পর্য্যন্ত অবশভাবে স্খলিত হইল। অর্জ্জুন তখন যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ মহা সঙ্কট বুঝিয়া উপস্থিত যুদ্ধের ধর্ম্মতা ও ন্যায্যতা

সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে নানা মতে বুঝাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ক্রমশঃ বুঝিলেন, এ যুদ্ধ ধর্ম্ম যুদ্ধই বটে, ইহাতে বিপক্ষ পক্ষাবলম্বী স্বজনগণের বধ সাধনে কোনরূপ পাতক সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই, অর্জ্জুনের চিত্তের ক্লৈব্য ভাব শ্রীকৃষ্ণের অকাট্য যুক্তিমুখে বাষ্পবৎ তিরোহিত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

গৌরাঙ্গের যতিভাব না গোপীভাব ?

বাঙ্গালীর গৌরাঙ্গদেব যে আদরের ও গৌরবের জিনিষ, এই বিষয়ে মতামতের তালিকা সংগ্রহ করিলে অমত অপেক্ষা মতের দিকেই অধিকাংশ লোক নাম স্বাক্ষর করিবেন। যদিও অল্পসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর লোককে বাদ দিলে গৌরাঙ্গপন্থীদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অনেক উচ্চশ্রেণীর লোকও তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বিশেষ গৌরব করিতে পারেন। আজ গৌরাঙ্গের নাম শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র ব্যক্তির যে সদ্ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহার কারণ কি ইহা নহে যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সমস্ত নিয়ম পালন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন? তিনি পার্থিব ভাব তুলিয়া চিন্ময় ভগবদ্ভাবে যদি আপনাকে মিলাইয়া দিতে না পারিতেন, তবে কখন জনসাধারণ ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিত না। এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমান সময়ে গৌরাঙ্গ-জীবনের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যদিও ভগবান্ শ্রীশঙ্করের জীবন বিবরণ সম্বন্ধেও প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা ইদানীন্তনকালে অতীব সুকঠিন, তথাপি তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়নে তদীয় মহত্ত্বের অনেক পরিচয় পাইয়া থাকি। পাষণ্ড ব্যতিরেকে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে শঙ্করভাষ্য পড়িয়া তাঁহার গৌরব না করিয়া থাকিতে পারে? ভারতবর্ষের ত কোন কথাই নাই, 'ইউরোপ' ও আমেরিকা' পর্য্যন্ত তাঁহার মহত্ত্বঘোষণার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ মহত্ত্ব স্বীকার করিবার কোন সুযোগ নাই। কেননা তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ দেখিয়া আমরা স্বকীয় চক্ষু সফল করিতে পারি না। অবশ্যই বৌদ্ধবিপ্লব হইতে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষণকারী বিদ্যামূর্ত্তি শঙ্করের ন্যায় তাঁহার নিকট বেদ ও দর্শন শাস্ত্রের মীমাংসাপূর্ণ উচ্চতম গ্রন্থ পাইবার আশা করিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি যে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক পাঠকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করিতে পারিতেন না, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায়?

চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, এই বিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া উঠাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদি সন্ন্যাসের অনুপাতে তাহা নিরূপণ করিতে যাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে কোন প্রকারেই নবরসের গৌরাঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে এইরূপ মানিয়া লইলে সন্ন্যাস ধর্ম্মের

সামঞ্জস্য থাকে না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অনেকেই গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া বসিতে পারেন। অবশ্যই ইদানীন্তন কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি পবিত্রভাবে তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন। কিন্তু এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারিলেও তদীয় মতানুসারে চৈতন্য-জীবনের মীমাংসা করিয়া লইতে মন চাহে না। ইহার কারণ এই যে, গৌরাঙ্গের সমসাময়িক ভক্তেরা যে ভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আধুনিক লেখকদিগের ঐ ভাবের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তাঁহাকে গোপীভাবাশ্রিত মধুররসের আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা গৌরাঙ্গদেবকে গোপীভাবের রসিক বলিতে চাহেন না, তাঁহাদের অপেক্ষা রূপ, সনাতন, সার্ব্বভৌম ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কথা অধিক মূল্যবান্।

স্তবমালায় রূপ গোস্বামী কৃত স্তব—

বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদং। ২।

যিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেমের সারস্বরূপ, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার চক্ষুর অতিথি হইবেন?

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যো কৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।৩।

যিনি গোপাঙ্গনাদিগের অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্গার রস হরণ করিয়া উহা স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য তদীয় কান্তিতে নিজের নব নীরদ প্রভাকে আবৃত করিয়া লইয়াছেন, বিনোদনকারী সেই চৈতন্যদেব আমাদিগকে কৃপা করুন।

সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ ভাগবতামৃতে লিখিত আছে—

জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ মধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধী।
গত পরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যং। ১।

স্বয়ং কৃত টীকা—

"যস্য চৈতন্যাখ্যরূপমবতারস্তস্মাৎ। অনুভবস্য সাক্ষাৎকারস্যাপি কিমুত জ্ঞানস্য পদং ব্যবসিতং বিষয়ং প্রাপ্তং। অয়মর্থঃ—

যদ্যপি শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবদবতার এব তথাপি প্রেমভক্তিবিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাত্তেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবো হপি ব্যজ্যতে অনুরূপেণ নিরন্তরমুন্মত্তা তস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমবিশেষেণ তদ্বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাপি তাদৃশ এব বোধ্যতে।

মূলের অর্থ—

যাহার গৌরাঙ্গরূপ অবতার হইতে ব্রজগোপীদিগের প্রেম সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শিত ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি নিজ পদারবিন্দে প্রেম বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ ও বিবিধ মধুর রসের সমুদ্র স্বরূপ, সেই অনির্ব্বচনীয় কিশোর শ্যামসুন্দরের জয় হউক।

টীকার তাৎপর্য্য—

যদিও চৈতন্যদেব ভগবানের অবতার, তথাপি প্রেমভক্তিবিশেষের অর্থাৎ কান্তাভাবাশ্রিত ভক্তির প্রকাশার্থ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গোপীদিগের অনুরূপ প্রেমচিহ্ন সকল ব্যক্ত করিতেন, সুতরাং তাঁহার নিজেরও গোপীভাব ছিল, ইহা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি যখন রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেম করিতেন, তখন তাঁহার প্রতি কৃষ্ণেরও তদনুরূপ (যেরূপ রাধার প্রতি) প্রেম ছিল, ইহাও জানা গেল।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত স্তোত্র—

সিংহস্কন্ধং মধুর মধুর স্মের গণ্ডস্থলান্তং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারং।

বিভ্রৎকান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য ॥১৩॥

যাহা সিংহের ন্যায় উন্নত স্কন্ধবিশিষ্ট ও হাস্যবদনযুক্ত, যাহাতে শৃঙ্গার রসের বিস্ময়-জনক বিকার সমূহ ব্যক্ত হইয়াছে, যাহার কান্তি প্রস্ফুটিত সুবর্ণ পদ্মের কেশরের ন্যায় মনোভিরাম, সেই একতাপ্রাপ্ত রাধামাধবের শ্রীঅঙ্গ তোমাদিগকে রক্ষা করুক।

সমতুঙ্গপ্রেমোন্মদরসতরঙ্গং মৃগদৃশা-
মনঙ্গং গৌরাঙ্গং স্মরতু গতসঙ্গং মম মনঃ ॥১০॥

যাহাতে প্রেমের উচ্ছ্বাস ও রসের তরঙ্গ তুল্যভাবে উন্নত হইয়াছে, সেই রমণীবৃন্দের অনঙ্গ স্বরূপ গৌরাঙ্গদেবকে আমার মন বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ করুক।

সার্ব্বভৌমকৃত স্তোত্র—

শ্রীমদ্গৌরহরেঃ প্রগল্ভমধুরা ভক্তি-
প্রদাতুর্জ্জনৈঃ
সেবা শ্রীব্রজযোষিতামনুগতা নিত্যা সদা
শিক্ষ্যতে। ৩।

ভক্তিদাতা গৌরহরি হইতে ভক্তেরা প্রগল্ভমধুর ব্রজগোপীদিগের অনুগত সেবা শিখিতেছে।

ঐ—

ব্রজবিপিনরহস্য প্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৭ ॥

অর্থাৎ ব্রজের বনে যে রাধা কৃষ্ণের সহিত বিলাস করিয়াছেন, তাঁহার উল্লাসে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয় মধ্যে বিহার করুন।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ১ অঙ্ক। ৬৩ পত্র।

সংপ্রতি সংপ্রতিপদ্যমান তদাস্বাদ স্বাদর-গৃহীতসমুচিতবিগ্রহস্য পীযূষমাহিতগণ্ডুষ-মাচামতোঽঙ্গুলিবিবরবিগলিতা ইব তৎকণা ক নামাস্মাভিরপি আচাম্যতে।

এক্ষণে সেই গোপীপ্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য নিজে আদর করিয়া যোগ্য দেহ ধারণ করিয়াছ এবং সৌভাগ্যবশতঃ নিরবধি সেই মধুর শৃঙ্গার রসরূপ অমৃত গণ্ডুষ গণ্ডুষ পান করিতেছ। পক্ষান্তরে তোমার অঙ্গুলির ছিদ্র দ্বারা পতিত সেই প্রসাদের কণিকা আমরাও পাইতেছি। ইহা চৈতন্যদেবের বর্ণনা।

ঐ নাটকে ১০ অঙ্কের ৬৮০ পত্রে লিখিত আছে—

অদ্বৈতোক্তি—

হেলাখেলায়িতেনাতনি কলিমথনং
খ্যাপিতো ভক্তিযোগা
ব্যক্তিং তত্রাপি নীতঃ পরম সুনিভৃতঃ
প্রেমনামা পদার্থঃ।
কাপি কাপি প্রকীর্ণা পুরুতর সুভগম্ভাবুকা
ভাবুকানাং
তত্রাপ্যাভীরনারী মকুটমণিমহাভাব
বিস্তানবস্থা।

চৈতন্যদেব হেলা করিয়া খেলা করিতে করিতে কলি বেটাকে শিক্ষা দিয়াছেন; ভক্তিযোগ ও পরমগুপ্ত ব্রজবালার প্রেমরস বিলাইয়াছেন। বিশেষতঃ কোন কোন অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তকে রসিকবৃন্দের পরম হিতকারী দোষগন্ধশূন্য শ্রীমতীর মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

মাহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত রূপ গোস্বামী প্রভৃতির এইরূপ ভক্তি দেখিয়া অনেকেই এইরূপ মনে করিতে পারেন, "হইতে পারে চৈতন্য দেবকে রাধাকৃষ্ণের মিশ্রিত অবতার করিয়া লওয়া শিষ্যদের স্বকীয় অপ্রমার কারুকার্য্যই বটে; কিন্তু তিনি স্বয়ং যদি রাধাভাব বা কৃষ্ণভাবের কোন চিহ্ন না দেখাইতেন, তবে কখন শিষ্যেরা এইরূপ অপরূপ কল্পনা করিতে সাহস করিতেন না। তিনি স্বয়ং রাধা সাজিয়া শ্যামসুন্দরের বিলাস শয্যাশায়ী হইয়া

ছিলেন বলিয়া রাধার এবং কৃষ্ণ সাজিয়া রাধার কুঞ্জে যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের অবতার তাঁহাকে শিষ্যেরা করিয়া লইয়াছিল। আর তিনি যে এই লীলা করিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চ ভাব ও উন্নত শিক্ষা চৈতন্যের সময়ে ছিল না, সুতরাং তাঁহার ন্যায় কোন মহাপুরুষ যদি তৎকালে রাধা ও কৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া তদনুরূপ হাবভাব করিতেন, তবে তাঁহাকে কেহই পাগল বলিয়া বিশ্বাস করিত না। বিশেষতঃ তদানীন্তন লোকেরা অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিল বলিয়া গুরুর দোষও শিষ্য সমক্ষে গুণরূপেই পরিণত হইয়া যাইত। এইজন্য শিষ্যদিগকেও অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে পারা যায় না; কারণ এইরূপভাবেই তাহারা শিক্ষা পাইত। এক্ষণেও কোন কোন স্থলে এই প্রকার গুরুভক্তি আপন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে।

এই ত গেল শিষ্যদিগের কথা। আবার স্বয়ং গুরুদেব মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন;—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

পদাবলী ৩৪১।

চৈতন্যদেব রাধিকার হর্ষ, উৎকণ্ঠা দৈন্য, প্রৌঢ়ি ও বিনয়ের অনুকরণ করিতেছেন। লম্পট কৃষ্ণ আমাকে চরণানুগতা দাসীজ্ঞানে আলিঙ্গন দিয়া আত্মসাৎ বা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহত করুক, অথবা যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক না কেন, কিন্তু আমার প্রাণনাথ সেই বটে, অপর কেহ নহে।

তিনি যে গোপীভাবের রসিক ছিলেন যখন মহাপ্রভুর স্বকীয় উক্তি দ্বারা ইহা প্রতি-পন্ন হইতেছে, তখন শিষ্যদের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দেওয়া বা তাঁহাকে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রহ্মপ্রেমী করিয়া তুলা কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? আর এই রূপ করিলে রসতত্ত্ববিৎ গৌরাঙ্গভক্তেরা অবশ্যই বলিয়া উঠিবেন যে, আমাদের উজ্জ্বল রসের গৌরকে নীরস হৃদয়হীন লোকগুলা মায়াবাদী সন্ন্যাসী করিয়া লইয়াছে। ফলতঃ এইরূপ বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, উল্লিখিত শ্লোকটা মহাপ্রভুর স্বরচিত নহে, কিন্তু শিষ্যেরা নিজের মত প্রচার করিবার জন্য তাঁহার রচিত বলিয়া জাল করিয়া লইয়াছে, তবে স্বতন্ত্র কথা।

এক্ষণে চৈতন্যের গোপীভাবটা যেরূপ পাকা হইয়া দাঁড়াইল, ইহাতে তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপর আঘাত না লাগিয়া থাকিতে পারে না। কেননা সন্ন্যাস ধর্ম্মে স্ত্রীভাব ও শৃঙ্গার রসটা বড়ই দূষণীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এইস্থলে মধুর রসের গৌরাঙ্গভক্তেরা বলেন যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, নিজের হৃদ্গত ভাবকে আচ্ছাদন করিবার জন্য, পরন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুযায়ী জীবন লাভ করিবার জন্য নহে। এই কথাটা অবশ্যই "যদি যাইবি পূরবে বলিবি উত্তরে" ইত্যাদি গোপীভাবের নীতি অনুসারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু একজন ধর্ম্মাচার্য্যের এই প্রকার কপটভাব কখনও বিচারশীল ব্যক্তির ভক্তি তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতে দেয় না। মহাপ্রভুর ঐ গোপীভাবটাকে তাঁহার কোন কোন ভক্তেরা এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের সামঞ্জস্য ত দূরের কথা, উহা দ্বারা তাঁহার চরিত্র পর্য্যন্ত কলঙ্কিত না হইয়া থাকে না। লোচন দাসের কোন গ্রন্থে লিখিত আছে;—

চৈতন্যদেব বাতায়ন দ্বারে বাহির হইয়া নদীয়ার নব যুবতীর বিলাসকুঞ্জে যাইয়া

পরকীয়া রস আস্বাদন করিতেন। লোচন দাস মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও একজন বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন। ঐ গ্রন্থও এখনও পর্য্যন্ত কোন কোন গৌরাঙ্গপন্থী সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে মুদ্রিত করিতে সাহস করিতেছেন না। তাঁহার প্রকাশ্য পদকল্পতরু গ্রন্থে লিখিত আছে, "পীরিতি কুঁদেতে কিবা উহারে কুঁদিল গো কুটিল নয়ন কামশরে"। এই বর্ণনা মহাপ্রভু সম্বন্ধে হইয়াছে।

সহজিয়াদের বিচিত্র বিলাস গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের সাঠী নাম্নী কন্যার সহিত পরকীয়া রস আস্বাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যেরূপ রসিকতা করিয়া গিয়াছেন, উহা দ্বারা তাঁহার উপর বিবেকশালী ব্যক্তির ভক্তি থাকিতে পারে না।

পাঠক, মহাপ্রভু যে মধুর রসের আচার্য্য ছিলেন, ইহা তাঁহার নিজোক্তি ও ভক্তদিগের বর্ণনা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়া গেল। এক্ষণে গোপীভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

গোপীভাবের অর্থ ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণবিষয়িণী রাগানুগা ভক্তি। রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে' এরূপ লিখিয়াছেন ;—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥"

ব্রজবাসী মনুষ্য ও অপর প্রাণীদিগের যে রাগাত্মিকা ভক্তি স্পষ্টভাবে বিরাজ করিতেছে, তদনুগামিনী ভক্তিকে রাগানুগা বলা হয়। রাগাত্মিকা আবার দুই প্রকার ; ১ম কামরূপা, ২য় সম্বন্ধরূপা।

১ম—

"সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
মদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেবকেবলমুত্তমঃ।"

যাহা সম্ভোগ তৃষ্ণাকেও প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহা কামরূপা ; কারণ ইহাতে সকল চেষ্টাই কৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য।

২য়—

"সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।"

'আমি গোবিন্দের পিতা, আমি গোবিন্দের মাতা ইত্যাদি অভিমানকে সম্বন্ধরূপা ভক্তি বলা হইয়া থাকে।

এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে কামরূপা ভক্তিকে মধুররসাশ্রিতা বলা যায়। ইহা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা ভেদে দুই প্রকার।

রাধিকা ও ললিতা প্রভৃতি কৃষ্ণবিলাসিনীরা জীব গোস্বামীর মতে স্বকীয়া। অর্থাৎ কৃষ্ণ ইহাদিগকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কৃষ্ণবিলাসিনী ব্রজবালিকাদিগকে পরকীয়া বলিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বল নীলমণির টীকাতে ইহা লইয়া জীব ও বিশ্বনাথের বড় বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু গৌরাঙ্গপন্থীদিগের মধ্যে অধিকাংশই পরকীয়া রসের ভক্তি করিয়া থাকেন। জীব গোস্বামীকে এই শ্রেণীর লোকেরা শুষ্ক ও অরসিক মনে করেন। অনেকে আবার সুযোগ পাইলে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার উপর গালি বর্ষণ করিতেও ছাড়েন না। ফলতঃ জীব গোস্বামী গৌরাঙ্গপন্থীদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসমবাদিনী' উপাদেয় গ্রন্থ।

যাহা হউক মধুররসের ভক্তি সেবন না করিলে যে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। মধুর রসের ভক্তি সাধন করিবার প্রণালী রূপগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমন্বিতং।
তৎতৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং
ব্রজে সদা ॥" ১৫।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চৈবহি।
তত্তাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥"

"কৃষ্ণ এবং তাঁহার অভিলষণীয়া রাধিকা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার স্মরণ পূর্ব্বক ব্রজলীলার কথোপকথনে রত হইয়া আমি বৃন্দাবনে বাস করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিবে।"

ব্রজগোপীর ভাব লাভ করিতে যাহারা অভিলাষী, তাহাদিগকে ব্রজগোপীদের ন্যায় বাহ্য শরীরে ও মনঃকল্পিত গোপীশরীরে কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। কেহ সাধক শব্দের রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কৃষ্ণের অংশভোগ্যা পরিচারিকা এবং সিদ্ধ শব্দের অর্থ ললিতা প্রভৃতি কৃষ্ণসংভোগ্যা সখী মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে এই শ্লোকযুগলকে মূল ভিত্তি করিয়া রসোৎকর্ষ করিতে করিতে গৌরাঙ্গপন্থীরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। পরকীয়া রসের সেবকদিগের মধ্যে মহামান্য নরোত্তমদাস বলিয়াছেন—

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ রূপালঙ্কারভূষিতাং ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত বিলাস করিবার সময়ে ললিতা প্রভৃতির সঙ্গিনী পরিচারিকারা তদীয় আজ্ঞানুসারে যেরূপ সেবা করিত, আপনাকে সেইরূপ কল্পনা করিয়া সেইরূপে কৃষ্ণসেবা করিবে।

সনৎকুমারতন্ত্রে নিম্নলিখিত বচন আছে—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং ॥"

আপনাকে সখীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী রূপযৌবনসম্পন্না মনোভিরামা রাধিকা বলিয়া চিন্তন করিবে।

নরোত্তম দাস এই তন্ত্রের অনুসারে আপনাকে রাধিকা কল্পনা করিয়া কৃষ্ণসেবা করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মধুর রসের ভক্তিকেই গৌরাঙ্গভক্তেরা সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। আর তাঁহাদের এই ভাবটা অনেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আসন জমাইয়া বসিয়াছে। কতকগুলা লোক গৌরাঙ্গপন্থীদের কোন গ্রন্থ না দেখিয়াও মধুর রসের নামে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই রসের ভক্তিতে উভয় দিকই বজায় থাকে। অনেকে আবার নিরাকারবাদী হইয়াও ঐ ভক্তিতে গলিয়া যায়। নিরাকার ঈশ্বরের প্রেমবিলাসিনী হইয়া তাঁহার সহিত কি প্রকারে মধুর রস ওরফে শৃঙ্গার রস আস্বাদন করিতে পারা যায়, ইহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারি নাই। সাকারবাদীরা বরং প্রভুর প্রেমসোহাগিনী হইয়া কথঞ্চিৎ মনের সাধ মিটাইয়া লইতে পারেন।

প্রকৃত পক্ষে মধুর রসের ভক্তি কামসম্পর্ক হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া ইহার সেবনকারীদিগকে বাহুল্যরূপে ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনে পড়িতে দেখা যায়। গৌরাঙ্গপন্থী বৈষ্ণবেরা যে গোপীর প্রেমে কামের গন্ধ নাই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বৃন্দাবন ও নদীয়ার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তুলেন, তাহার কারণ গোপীদিগের প্রতি তাঁহারা অতিভক্তি করিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহন রূপ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া কামে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া যাইতেন। পক্ষান্তরে ভগবানের সহিতও যাহারা পার্থিব সুখভোগ করিতে চাহে, তাহারাও যদি ভক্ত বলিয়া পরিচিত হয়, তবে ঐ প্রকার ভক্তির অস্তিত্ব এই মুহূর্ত্তেই জগৎ হইতে উঠিয়া যাউক্। কেননা কামাদি রিপুর আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই ভক্তগণ ভগবানের শরণাপন্ন

হইয়া থাকেন। ফলতঃ গৌরাঙ্গপন্থীরা ভগবদ্ভক্তিতে শৃঙ্গার রসের সমাবেশ করিতে যাইয়া সমাজের মহান্ অনিষ্ট করিয়াছেন; এবং মহাপ্রভুকে ঐ ভক্তির আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করায় কেবল অদূরদর্শিতারই পরিচয় দেন নাই, কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীকে তদীয় ভক্তিতেও বঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, উহা প্রকারান্তরে চৈতন্যদেবের পবিত্র যতিজীবনে কলঙ্ক লেপনের উদ্যোগে পরিণত হইয়াছে মাত্র।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(২২)

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়।

সাধারণতঃ শীতকালে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহা অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, সমতল ভূমিতে খাঁটি দুগ্ধ ১৫।১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং পর্ব্বতশিখরে প্রায় ইহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

রাজ নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"মুহূর্ত্ত পঞ্চকাদূর্দ্ধং ক্ষীরং ভবতি বিকৃতং।
তদেব দ্বিগুণে কালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥"

উক্তঞ্চ—ক্ষীরং মুহূর্ত্তশ্রিত যোষিতং যদতপ্ত-
মেব বিকৃতিং প্রযাতি।
উষ্ণঞ্চ দোষং কুরুতে তদূর্দ্ধং বিষোপমং
স্যাদূষিতং দশানাম্॥"

অর্থাৎ—পাঁচ মুহূর্ত্তের (দিবারাত্রির মানের ত্রিশ ভাগের এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলা যায়) ঊর্দ্ধকালস্থায়ী দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং ইহার দ্বিগুণ কালে তাহা মানবকে বিষবৎ নাশ করে। (অতএব তাহা অব্যবহার্য্য)। আরও কথিত হইয়াছে যে, অতপ্ত দুগ্ধ তিন মুহূর্ত্ত (এক মুহূর্ত্তের পরিমাণ মোটামুটি হিসাবে দুই দণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টাকাল) কাল স্থায়ী হইলে বিকৃত হয়, তদূর্দ্ধকাল পরে তাহা উত্তপ্ত করিলে দূষিত হয় এবং দশ মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী দুগ্ধ বিষতুল্য হয়। অনেক দূরস্থান হইতে আনীত দুগ্ধ আন্দোলনবশতঃ পাত্রের সহিত পুনঃ পুনঃ ঘৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দেশীয় দুগ্ধব্যবসায়িগণ উক্ত দোষ নিবারণার্থ দুগ্ধপূর্ণপাত্রে বিরণ পত্র, (বিন্নার পাতা), তুলসী পত্র, অথবা ২।৪টী কাঁচা লঙ্কা মরিচ দিয়া থাকে; কিন্তু এগুলি কতদূর উদ্দেশ্যসাধক, তাহা বলা যায় না। পাশ্চাত্যমতে দুগ্ধে Venilla (এক প্রকার orchid—পরগাছা) Salycelic Acid (সেলিসিলেক্ এসিড্) ফর্ম্মালিন, বোরাসিক্ এসিড্, অথবা Borax (সোহাগা-চূর্ণ) দিয়া রাখিলে তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পূর্ব্বোক্ত এসিডের কোনও প্রকার স্বাদ নাই, অতএব ইহাতে দুগ্ধ বিস্বাদ হয় না।

ফারণ্‌হিটের তাপমান যন্ত্রের ৬৫° ডিগ্রী হইতে ৬৮° ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপযুক্ত দুগ্ধে এক পাইণ্টে (২০ আউন্সে) ২ গ্রেণের ন্যূন সেলিসিলিক্ এসিড্ মিশাইলে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং ৮৫° ডিগ্রী উত্তাপ বিশিষ্ট দুগ্ধে

উক্ত পরিমাণ এসিড মিশাইলে সমস্ত দিনমান অবিকৃত থাকে। কম উত্তাপের দুগ্ধে পূর্ব্ব কথিত এসিড ৪ গ্রেণ পরিমাণ মিশ্রিত করিলে তাহা ১২।১৩ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি ব্যতীত দুগ্ধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখার জন্য নিম্নোক্ত ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

যথা;—

1. Chemecal (রাসায়নিক)
2. Physical (প্রাকৃতিক)
3. Condensation (ঘনীভূতকরণ)

(১) কোনও প্রকার alkaline salt (ক্ষার পদার্থ, যথা সোডা, পটাস্ প্রভৃতি) এবং anteseptic (পচননিবারক, যথা, সুরাবীর্য্য (alcohol), chloride of zinc (ক্লোরাইড্ অব জিঙ্ক) এবং লবণ প্রভৃতি) যোগে দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে chemical (রাসায়নিক) উপায় বলা যায়।

(২) কোনও প্রকার শীতল পদার্থ (বরফ ইত্যাদি) যোগে এবং অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ও বায়ু সঞ্চালন দ্বারা দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে physical (প্রাকৃতিক) উপায় বলা যায়।

(৩) জাল দিয়া দুগ্ধের জলীয় ভাগ দূর পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া তাহাতে শর্করা প্রভৃতি যোগে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে condensation (ঘনীভূতকরণ) বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্তটীই (প্রাকৃতিক [physical] উপায়ই) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ফলদায়ক। শৈত্যযোগে (বরফ-যোগে) দুগ্ধ ১৩।১৪ দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধের সমস্ত দুর্গুণ এবং তৎস্থিত বিষাক্ত জীবাণুও নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় পবিত্রকারক পদার্থ আর জগতে একটীও নাই, তাই ইহাকে পাবক বলা যায়। রুগ্ন ব্যক্তির আনীত, রুগ্না গাভীর অথবা কদর্য্য জল প্রভৃতি মিশ্রিত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে শোধিত হয়। শৈত্যযোগে রক্ষিত দুগ্ধ ১৪ দিন পরে বিস্বাদ হয় এবং ২৮ দিবস পরে তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়। ৩।৪ দিবস পরে এবংবিধ দুগ্ধ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। বায়ু সঞ্চালনে দুগ্ধ তদপেক্ষা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধিকৃত রাখা যায়, অতএব সংক্ষেপে বায়ু সঞ্চালনের উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ কোনও উচ্চস্থান হইতে দুগ্ধের ধারা পাত করিলে তাহা বায়ু সংযোগে কণাভাব ধারণ করিবে। এতদবস্থায় সেই দুগ্ধকে তারের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জাল দ্বারা আবৃত মুখবিশিষ্ট পাত্রে প্রবিষ্ট করাইলেই তাহাকে ইবেটেড্ (বায়ুসঞ্চালিত) দুগ্ধ বলা যায়। বরফ অথবা করকা (শিলা Hailstone) প্রভৃতি শীতল পদার্থের উপর বায়ু প্রবাহিত করিয়া সেই শীতল বায়ু দুগ্ধে উপরোক্ত উপায়ে সঞ্চালিত করিতে পারিলে ইরেসন্ আরও উৎকৃষ্ট হয় এবং ইহাতে দুগ্ধ নির্দ্দোষ অবস্থায় অনেকক্ষণ অবিকৃত থাকে।

অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের আস্বাদন ও গন্ধের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে এবং দুগ্ধস্থিত গ্যাস (Gas) গুলি বাহির হইয়া যায় ও তাহাতে গুণহানি হয়; অতএব দুগ্ধপাত্রের মুখ আবৃত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে উষ্ণ করিয়া তাহাতে শীতল জলধারা পাতে ঠাণ্ডা করিলে উপরোক্ত দোষ ঘটে না। এবংবিধ উপায়ে দুগ্ধ উত্তপ্ত করার অনেক যন্ত্র পাওয়া যায়। সেগুলিকে refrigerator (রিফ্রিজারেটার) বলে, এসব যন্ত্র সচরাচর ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

Antiseptic (পচন নিবারক পদার্থ) যোগে দুগ্ধ রক্ষার উপায়টী তত নিঃসন্দেহ জনক নহে, অতএব ইহার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা যাইতে পারে না, এই জন্য এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এখন condensation (ঘনীভূত করণোপায়) বিষয়ে ২।৭টী কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকা মহাদেশস্থ নিউ ইয়র্ক (New York) নগরের অন্তঃপাতী Whiteplain (হোয়াইট প্লেইন্) নিবাসী Mr. Gael Borden (মেঃ গেইল্ বোরডেন্) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৮৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথম condensed milk (জমাট দুগ্ধ) প্রস্তুত করণ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে এবংবিধ দুগ্ধ শর্করাদি যোগে মিষ্ট করিয়া টীনের পাত্রে বদ্ধাবস্থায় তিনি প্রথমতঃ সৈনিক বিভাগে প্রচলিত করেন; অতঃপর ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে উক্ত মহাত্মার উদ্ভাবিত উপায়ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর দুগ্ধ জমাট অবস্থায় দেশ দেশান্তরে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা ইংলণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেডিবিয়া, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় সভ্য দেশ হইতে প্রচুর জমাট দুগ্ধ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ভারতবর্ষেও আজকাল এবংবিধ দুগ্ধ নগরে নগরে, এমন কি পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে; ইহা আমাদের পক্ষে শুভসূচক কিনা বিবেচ্য। সম্প্রতি কোনও উৎসাহী বঙ্গীয় যুবক Condensed milk (জমাট দুগ্ধ) প্রস্তুত করিয়া টীন পাত্রে আবদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতেছেন, এক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত; কিন্তু টীন পাত্রে দীর্ঘকাল রক্ষিত দুগ্ধ স্বাস্থ্য-হানিকর কিনা, এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় ইহা অনিষ্টজনক, শিশুকে এবংবিধ দুগ্ধ ব্যবহার করান ভাল নহে। আমাদের দেশে ক্রমে যে প্রকার দুগ্ধাভাব হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় দধি প্রভৃতির জন্যও অচিরে আমাদিগকে ইয়ুরোপের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য।

Condensed Milk (জমাট দুগ্ধ) প্রস্তুত করণোপায় পাঠকগণ ইংরেজি গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় উদ্ধৃত হইল না। Condensed milk দুই প্রকার (১) শর্করাযুক্ত এবং (২) শর্করাবিহীন। এতদুভয় প্রকার দুগ্ধে কি পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে নারী দুগ্ধের প্রায় তুল্য হয় তাহা পশ্চাতে প্রদর্শিত হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

সানুবাদ অভিধান-চিন্তামণিঃ। জৈন পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র সূরি প্রণীতঃ। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা ১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীচতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সংস্কৃত ভাষায় অমরকোষ, মেদিনী, বিশ্ব প্রভৃতি কোষগ্রন্থের ন্যায় ইহাও একখানি প্রাচীন সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ। প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি এই কোষগ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকর্ত্তার নামানুসারে অনেকে ইহাকে "হেমচন্দ্র কোষ"ও বলিয়া থাকেন। এ দেশে এই গ্রন্থখানি দুর্লভ। বহু দিন পূর্ব্বে ৺ রামদাস সেন মহাশয় দেবনাগরাক্ষরে মূল পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন। কিন্তু তাহা অধুনা সুলভপ্রাপ্য কি না বলা যায় না। অধুনা বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরল বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে এই দুর্লভ পুস্তকখানি প্রকাশ করায় সংস্কৃত ও বঙ্গীয় সাহিত্যের যে মহদুপকার সংসাধিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ দেশে কোষগ্রন্থের মধ্যে অমরকোষই সমধিক প্রচলিত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে দেখা যায় যে, ইহা অমরকোষ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, বরং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। প্রথমতঃ ইহার কাণ্ডগুলি যেরূপ সুপ্রণালীমত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। তারপর ইহাতে এক একটী শব্দের কত অধিক প্রতিশব্দ আছে, তাহার দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। অমর-কোষে সূর্য্যের ৩৭টী মাত্র নাম আছে, কিন্তু ইহাতে ৬৭টী নাম আছে। অমরকোষে ব্রহ্মার নাম ২০টী, ইহাতে ৪০টী, অমরকোষে কিরণের নাম ১১টী, ইহাতে ৩৯টী। তদ্ব্যতীত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা অমরকোষে নাই। যথা—অশ্ব, হস্তি প্রভৃতির জাতিভেদ, গতিভেদ, রূপভেদে বিভিন্ন নাম ইত্যাদি। আমরা অমরকোষের নিন্দা করিতেছি না, কেবল তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইতেছি যে, ইহা প্রচলিত অভিধান অপেক্ষা কিরূপ উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ।

মূল গ্রন্থখানি যেমন, অনুবাদও তেমনই সুন্দর ও যথাযথ হইয়াছে। মূলের নিম্নেই অনুবাদ। অনুবাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেবল সংস্কৃতশাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন নহেন, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক। সুতরাং এ অনুবাদের অধিক পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা কেবলমাত্র এই অনুবাদ দেখিয়াই যে স্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। অনুবাদকের কৃতিত্ব কেবল অনুবাদে নহে, তাঁহার আরও কৃতিত্ব দেখিলাম সূচীপত্রে। কেবল এই সূচীপত্রই ৩০০ পৃষ্ঠা পরিমিত। অকারাদি বর্ণমালানুক্রমে এক একটী শব্দ ধরিয়া এই সুবিস্তৃত সূচীপত্র রচিত হইয়াছে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের যে কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সূচীপত্র দৃষ্টে অনায়াসে মূল পুস্তক হইতে ইচ্ছামত শব্দ বা বিষয় দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সুবিস্তৃত সূচীপত্র সঙ্কলন করিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যে প্রগাঢ় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে

গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ সমস্তই উৎকৃষ্ট। ফল কথা, গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে যত্ন ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভরসা করি, বিদ্বৎসমাজে এই দুর্ল্লভ কোষগ্রন্থখানি প্রভূত সমাদর লাভ করিবে।

উপসংহারে এই দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খানিকে সহজ ও সুলভ্য করার জন্য আমরা অনুবাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গুরু শিষ্য-সংলাপ ও জ্বর চিকিৎসা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

ইহা একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৩টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ত্রিদোষ এবং ত্রিগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বায়ুর, তৃতীয় অধ্যায়ে পিত্তের, চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লেষ্মার দোষ, গুণ ও কার্য্যাদি আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইহাদেরই বিকারাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাধারণ জ্বরের কথা, সপ্তম অধ্যায়ে সন্নিপাত জ্বর, অষ্টম অধ্যায়ে বিষম জ্বর, নবম অধ্যায়ে আগন্তু জ্বর, দশম অধ্যায়ে লাক্ষণিক ও ঔপদ্রবিক জ্বরের বিষয় কথিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে জ্বর চিকিৎসার প্রণালী, দ্বাদশ অধ্যায়ে সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা, এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরাতন জ্বর চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে। এগুলি সাধারণভাবে বলা হইল। ইহার মধ্যে আরও বহু প্রকার জ্বর ও তাহার চিকিৎসা-প্রণালী সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা দ্বারাও যে বিশেষ ফললাভ করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে অধুনা আর কাহারও সন্দেহ নাই। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে চরকাদি ঋষিবৃন্দ এতদ্দেশীয় জল বায়ু উদ্ভাপাদির বিষয় সম্যক্ প্রণিধান করিয়া এদেশের উপযোগী যে চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সুপ্রয়োগে তদ্দ্বারা আমরা সুমহৎ ফল লাভ করিতে পারি। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাবলম্বনে গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে জ্বরাদির উৎপত্তি ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ক অনেক কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এই গ্রন্থে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু, পিত্ত, কফ কিরূপে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কিরূপে তাহা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক নিগূঢ় কথার আলোচনা করিয়াছেন। সহজ ও সুবোধ্য ভাষায় এই সকল দুরূহ বিষয় ব্যক্ত করা সহজ পাণ্ডিত্যের কার্য্য নহে। ইহাতে গ্রন্থখানি যে সুখপাঠ্য হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল সুখপাঠ্য নহে, ইহা সাধারণের মহোপকার সাধনেও সমর্থ হইবে। মনোযোগ সহকারে গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিলে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। এরূপ গ্রন্থ যে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সকলকেই এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

গণ্ডেতে সিন্দুর যেন প্রভাতের ভানু।
হাতী দেখে সবাকার শুকাইল তনু॥
মহামদ পাতর মাহুতে ঠারি কয়।
হস্তীকে লইয়া যাও শুঁড়ির আলয়॥
সুরাপানে মাতঙ্গ মাতাও ত্বরা পর।
ভাগিনাকে যেমন পাঠায় যমঘর॥
এত শুনে মাহুত ফিরাল করীবরে।
হাতী লয়ে উপনীত শুঁড়িদের ঘরে॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নূতন সঙ্গীত॥
আজ্ঞা দিল পাতর মাতাতে করীবরে।
উত্তরিল মাহুত মাধব শুঁড়ির ঘরে॥
সহরের পূর্ব্ব দিকে শুঁড়ির আলয়।
ঐরাবত দেখিয়া শুঁড়িকে লাগে ভয়॥
মাহুত বলেন ভাই কর অবধান।
ভূপতির হাতীকে করাও সুরাপান॥
সুরা দেহ মূল্য পাবে না কর ভাবনা।
পাতর দিবেন কালি ভাঙ্গিয়া খাজনা॥
পাত্রের শুনিয়া নাম ভয় হল বাড়া।
এনে দিল হস্তীকে মদিরা সাত ঘড়া॥
শাঁপের উপরে সুরা ঢালিল সকল।
কড় পেতে চুমুক জুড়িল দন্তাবল॥
যত দেয় তত খায় নাহি তুলে অঙ্গ।
চৌদ্দ ঘড়া মদ খেয়ে মাতিল মাতঙ্গ॥
ঐরাবত গা তুলে করিয়ে সুরাপান।
দাণ্ডাইতে ধরণী হইল কম্পমান॥
প্রথমে ভাঙ্গিল হাতী শুঁড়ির দেওয়াল।
শুণ্ডে করে বারণ বিদরে ফেলে চাল॥
শব্দ করে ছুটিল দেখিয়া লোক জনে।
পাথর ধরিয়ে শুণ্ডে ফেলায় গগনে॥
পর্ব্বত পাহাড় ভাঙ্গে দিয়ে অঙ্গ ঝাড়া।
বড় বড় গাছকে উখাড়ে করে গুঁড়া॥
নগর পানেতে ধায় মাতলা বারণ।
ডেকে বলে লাউসেন পালাও সর্ব্বজন॥
দুই সারি সহর সরাণে হাতী ধায়।
দোকান ফেলিয়া কত দোকানি পালায়॥
লোক জন বলে দুঃখ দিলেক পাতর।
গৌড় সহরে আর নাহি হল ঘর॥
বাজার ভাঙ্গিতে হাতী করিল পত্তন।
বিপরীত দাঁদালে মরিল কতজন॥
দলিজ দুয়ারা ভাঙ্গে দেয়াল প্রাচীর।
মাতয়াল হল হাতী নাহি হয় স্থির॥
এইরূপে ভাঙ্গে হাতী একাশি বাজার।
গৌড়েশ্বর তখন পেলেম সমাচার॥
সেনাপতি নবলক্ষ দলে যত আছে।
কাহার শকতি যায় কুঞ্জরের কাছে॥
রাজা বলে লাউসেন কর অবগতি।
হাতী জব্দ করে রাখ গৌড় বসতি॥
ঘর ভাঙ্গে লোকজন পায় মনস্তাপ।
বধ কর হস্তীটাকে ভালা মোর বাপ॥
পক্ষবল তোমার ঠাকুর করতার।
এ গৌড় সহর বাছা রাখ এইবার॥
এত শুনে গা তুলিল ধর্ম্মের কিঙ্কর।
মল্ল ছাঁদে আঁট করে বাঁধিল কোমর॥
পর্ব্বত সমান হাতী যেন যম কাল।
কুবলয়ের কাছে যেন দাণ্ডাল গোপাল॥
মালসাটে দেউলে কপাট যেন পড়ে।
লাফ দিয়ে লাউসেন ধরে হাতীর শুঁড়ে॥
হাতীর শুণ্ড লাউসেন ধরে বামহাতে।
অঙ্কুশ মাহুত ভেজায় হাতীর মাথে॥
ডাক ছাড়ে ডাগর মাতিল করিবর।
সুগ্রীব বালীতে যেন বাজিল সমর॥
সেনের প্রতাপ দেখে নব লক্ষ সেনা।
ধন্য ধন্য গৌড় পুরে বলে সর্ব্বজনা॥

রণ করে লাউসেন রুষিল ঐরাবত।
সপ্তজলনিধি কাঁপে অবনী পর্ব্বত॥
মাতঙ্গ মানুষে রণ দেখে লাগে ডর।
করিবরে আছাড়ে ময়নার সদাকর॥
লাউসেনে ধরিয়া আছাড় মারে হাতী।
শূন্যে ফিরে লাউসেন রাউৎ যোদ্ধাপতি॥
অঙ্গে পড়ে শোণিত নিকলে কালঘাম।
রাম রাবণেতে যেন বাজিল সংগ্রাম॥
হাতীর সঙ্গে রণ করে সেন তপোধন।
কেশীর সহিত যেন কেশবের রণ॥
বীরদাপে ধূলা উড়ে মহাঘোরতর।
লাউসেনের দাপটে কুঞ্জর হল জর॥
দুই দন্ত উথাড়ে ময়নার মহীপাল।
পঙ্কেতে বালক যেন উথাড়ে মৃণাল॥
শুণ্ডে ধরে গগনে ফিরায় সদাকর।
হাড় গোড় চূর্ণ হয়ে পড়িল কুঞ্জর॥
মাহুতের সহিত মরিল দন্তাবল।
তা দেখিয়া মহাপাত্র হাসে খল খল॥
অল্পকালে ভাগিনা অভ্যাস বটে ভাল।
ভোজবাজী দেখিয়া সবাই ভুলে গেল॥
পাত্র বলে মহারাজা সকল ভেল্কী।
বধিলেক বারণ বাঁচায়ে দেকু দেখি॥
তবে জানি লাউসেন ধর্ম্মের দাস বটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস বামটে॥
কাল সাপের গরল মন্ত্রেতে নাশ হয়।
খলের অন্তরে বিষ পড়িবার নয়॥
পরদ্রোহ বিনে তার নাহি ধর্ম্মনীত।
কদাচ না ঘুচে ভাই যার যেবা রীত॥
হস্তী বধ করিলেন লাউসেন রায়।
নাবড়ি করিয়া পাত্র রাজারে বুঝায়॥
এই সব কথা রাজা আমি সব বুঝি।
ভুলে গেল সবাই দেখিয়া ভোজবাজী॥
ধর্ম্মের সেবক যদি সেন তপোধন।
তোমার সাক্ষাতে হাতী পাবেক জীবন॥
করিবর প্রাণ পেলে নিশ্চয় জানিব।
ঘোড়া শিরোপা ময়না জায়গীর লেখে দিব॥
নবলক্ষ দল হতে তবে বলবান।
আজি হতে লাউসেন সেনার প্রধান॥
বারণ বাঁচাতে সেন যদি না পারেন।
লক্ষ টাকা দোষ দণ্ড দরবারে দিবেন॥
পাত্রাধীন নরপতি পাত্রের বচনে।
হস্তীকে বাঁচাতে ভার দিল লাউসেনে॥
যোগেন্দ্র পুরুষ সেন ধর্ম্মের কিঙ্কর।
ঘৃতাহুতি পেয়ে যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
প্রতিজ্ঞা পূরিয়া কয় রাজার সভায়।
কুঞ্জর বাঁচাব আমি ধর্ম্মের কৃপায়॥
ভক্তাধীন যদ্যপি বটেন ভগবান।
সভা মধ্যে কুঞ্জর পাবেক প্রাণদান॥
ভূপতি দিলেক ভার বাঁচাতে বারণে।
স্নান করে লাউসেন পূজে নিরঞ্জনে॥
ভয়ত্রাতা ভরসা করিয়া নিরঞ্জন।
করপুটে স্তব করে সেন তপোধন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।
অখিলের পতি তুমি দেব নিরঞ্জন॥
তুমি রাত্রি তুমি দিবা তুমি শশধর।
তুমি ধর্ম্ম নিরাকার তুমি দিবাকর॥
তুমি প্রভু রুদ্র ভানু প্রলয়ের কর্ত্তা।
শূন্যেতে বসিয়ে জান সকলের বার্ত্তা॥
সৃজন পালন তুমি অমরের গুরু।
কারণ পঞ্চের প্রভু বাঞ্ছা কল্পতরু॥
ন্যায় পথে রয়েছ পাদুকে আরোহণ।
এইবার কর প্রভু লজ্জা নিবারণ॥
প্রাচীন পুরুষ তুমি সংসারের গতি।
পাণ্ডব বংশের ধ্বজা অর্জ্জুন সারথি॥
স্মরণ করিয়া সেন রাজরাজেশ্বরে।
পুষ্প জল দিল রাজা কুঞ্জর উপরে॥
কুঞ্জর উপরে সেন পুষ্প জল দিতে।
জীবন পাইল হাতী মাহুত সহিতে॥
প্রাণ দান পেয়ে যদি গা তুলে বারণ।
ধন্য ধন্য লাউসেন করে সর্ব্বজন॥
পুষ্প জল দিয়া সেন বাঁচাল কুঞ্জরে।
এমন ধর্ম্মের মায়া কে বুঝিতে পারে॥

শালে ভর দিয়া রঞ্জা পেলেন তনয়।
এত দিনে হল রঞ্জার ভাগ্যের উদয়॥
হাতী প্রাণ পেতে রাজার আনন্দ অপার।
সমাদরে সেনের করেন পুরস্কার॥
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥

ত্রিপদী ছন্দ।

জানিল নিশ্চয়, রঞ্জার তনয়,
ধর্ম্মদাস তপোধন।
দেখি তেজোরাশি, যত গৌড়বাসী,
হলকম্প লোকজন॥
গৌড় সহরে, রাজার দরবারে,
বধিয়া বাঁচাল হাতী।
নবলক্ষ সেনা, পাসরে আপনা,
ত্রাস ভাবে গৌড়পতি॥
শুনেছি পুরাণে, অর্জ্জুন বিমানে,
গোবিন্দ সারথি যেন।
বুঝি অনুমানে, সেই মত সেনে,
অনুকূল নিরঞ্জন॥
ভাগ্যবতী রঞ্জা, পুত্র মহাতেজা,
ধন্য প্রভু মায়াধর।
সমাদরে সেনে, বসাল আসনে,
মহারাজা গৌড়েশ্বর॥
সর্ব্ব লোক বলে, নব লক্ষ দলে,
দিতে নাহি অনুপাম।
রাজা দিল পান, সেনের প্রধান,
রাউৎ লাউসেন নাম॥
নানা অলঙ্কারে, দুই সহোদরে,
করিল রাজা ভূষিত।
কর্ণে কর্ণপুর, তমঃ করে দূর,
গজমুক্তা বিজড়িত॥
শিরে স্বর্ণ চিরা, কপি যার হিরা,
বিভাবসু যিনি ছটা।
জরি জামা গায়, মখমলি পায়,
স্বর্ণেতে রঞ্জিত বুটা॥
দেখি রণ তেজা, আনন্দিত রাজা,
বাঁধাইল বীরপনা।
রাজা গৌড় রায়, পাত্রে দিল সায়,
জাইগীর লেখ ময়না॥
লয়ে মসীপত্র, লেখে মাহু পাত্র,
নৃপতির সন্নিধানে।
ময়না বিলাত, লক্ষ তঙ্কা হোত,
জাইগীর ইলাম সেনে॥
সৈন্যের প্রধান, মহা বলবান,
সম্মুখ সংগ্রামে বীর।
লেখিল দপ্তরে, লাউসেন কোঙারে,
রাউৎ প্রধান বীর॥
ডাকিয়া বিরলে, গৌড়েশ্বর বলে,
দেহ এনে এক বাজী।
তুরকি ইরাকি, আন ভাল দেখি,
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজি॥
যত ঘোড়া আনে, নাহি লাগে মনে,
সেনে কহেন নৃপমণি।
অশ্বশালে গম্য, কর মনোরম্য,
বাছিয়া লহ আপনি॥
ধর্ম্মের চরণে, রামচন্দ্র ভণে,
বামটে সহরে বাটী।
সৌরীর সন্তান, কর অবধান,
গয়ঘড় বন্দী ঘাটী॥

পয়ার।

বীরবালা বাঁধাইল রায় গৌড়েশ্বর।
ইনাম জাইগীর দিল ময়না নগর॥
বড় বড় ঘোড়া এনে দিল লাউসেনে।
তুরঙ্গ দেখিয়া সেনের না লাগিল মনে॥
বাজিশালে সেনে যেতে গৌড়পতি কয়।
লহ গিয়া ঘোড়া যেটি মনোরম্য হয়॥
কর্পূর বলেন শুন সেন গুণমণি।
মোরে সঙ্গে কর আমি ঘোড়া ভাল চিনি॥
নব লক্ষ দল হতে যার তেজ বাড়া।
পর্ব্বতের সমান বাছিয়া দিব ঘোড়া॥

এত বলে দুই ভাই করিল গমন।
ভূপতির অশ্বশালে দিল দরশন॥
তিন ক্রোশ প্রশস্ত দেখিল ঘোড়াশাল।
ঘোড়া দেখে হাসেন ময়নার মহীপাল॥
ধন্য রাজা গৌড়পতি বাগলার ঈশ্বর।
উড়িষ্যা বঙ্গের রাজা যারে দেয় কর॥
রণযোদ্ধা ঘোড়া সব নয়নে বসন।
তুরকী, ইরাকী, তাজি, পার্ব্বত্য টাঙ্গন॥
সেন বলে শুন ভাই কর্পূর পাতর।
এই সব ঘোড়া নাহি হল মনোত্তর॥
ঘোড়া খুজে দুই ভাই মনস্তাপ করে।
হেন বেলা দেখে ঘোড়া আণ্ডির পাথরে॥
খোঁটা পোতা লোহার শিকল চারি পায়।
ক্ষেপা ঘোড়া, ঘোড়ার আঘাসি ঘাস খায়॥
কর্পূর বলেন শুন সেন গুণবান।
ঘোড়ার মধ্যেতে এই ঘোড়ার প্রধান॥
এই ঘোড়ার মাফিক শিখাই যদি হয়।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল করিতে পারি জয়॥
সেন বলে বটে মোর মনেতে লেগেছে।
উপনীত দুই ভাই তুরঙ্গের কাছে॥
হিঁসারিল তুরঙ্গ রাউৎ দেখে শালে।
লাউসেনে দেখে ঘোড়া ব্যস্ত হয়ে বলে॥
সুরপুরে ছিলাম আমি সূর্য্যের বাহন।
তোমার কারণেতে পাঠান নিরঞ্জন॥
বিপরীত যখন বিধাতা হয় বাম।
মহীতলে এসে হল ক্ষেপা ঘোড়া নাম॥
নাম হল ক্ষেপা ঘোড়া গৌড় সহরে।
নরপতি গৌড়েশ্বর না চিনে আমারে॥
পায় দিয়া দাঁড়ুকা বারতা নাহি লয়।
চেলাদার ঘোড়ার আঘাসি খেতে দেয়॥
অধর্ম্মি জনার আমি নাহি সহি ভার।
বিরানই কাহন বধেছি আশোয়ার॥
গমনের কালেতে পবনে ভর করি।
এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেতে পারি॥
কলিযুগে দেখি তোমার নিষ্পাপ শরীর।
ধর্ম্মপুত্র যেমন ভূপতি যুধিষ্ঠির॥
মোরে নিতে শঙ্কা নাহি কর তপোধন।
নিশ্চয় কহিলাম আমি তোমার বাহন॥
আরোহণ মোর পিঠে যখন হইবে।
অর্জ্জুনের সমান তখন তেজ পাবে॥
এত শুনে লাউসেন হরষিত মনে।
প্রণাম করিল তখন অশ্বের চরণে॥
বন্ধন ঘুচায়ে নিল আণ্ডির পাথরে।
ঘোড়া লয়ে উপনীত রাজার দরবারে॥
ক্ষেপা ঘোড়া দেখে তখন ভূপতি কহেন।
কার বোলে এ ঘোড়া এনেছ লাউসেন॥
কত শত সিপাই বধেছে এই ঘোড়া।
দাঁড়ুকা দিলাম পায়ে নাহি আঁটে দড়া॥
আরোহণ হলে পাছে আছাড়ে তোমারে।
মনস্তাপ করে সবে লাউসেনের তরে॥
মনে মনে যুক্তি করে মাহুদা পাতর।
এইবার ভাগিনা যাবেন যমঘর॥
দরবারে বসিয়া পাত্র বলে ভাগিনাকে।
রাজার হুজুরে বায়ু দৌড়াবে ঘোড়াকে॥
তবে জানি রাউৎ তেজের পাব সীমা।
একবার ঘোড়াটাকে করিবে তাজিমা॥
এনেছ সখের ঘোড়া আণ্ডির পাথর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান মল্লভূমে ঘর॥
ঘোড়াকে দৌড়াতে যদি পাত্র দিল ভার।
লাউসেন দরবারে করিল অঙ্গীকার॥
দৌড়াবেন ঘোড়াকে ময়নার গুণমণি।
বারাল করিতে গেল ঘোড়ার সাজনি॥
অন্য দিনে ক্ষেপা ঘোড়া নাহি হয় স্থির।
সেনের কারণে হল পরম সুধীর॥
ত্বরিতে তুরঙ্গ সাজায় স্মরি রাম নাম।
বদনে দিলেক তুলে লোহার লাগাম॥
আগাড়ি পিছাড়ি দিয়া বাঁধিল যতনে।
আচ্ছাদিল বসন ঘোড়ার বিলোচনে॥
অঙ্গের মার্জ্জনা করে সুবর্ণ খড়রায়।
দুই হেরি সোণার নুপুর দিল পায়॥
সুরঙ্গ সোণার জিন বসাইল এঁটে।
জেরবন্দ খুগীর সোণালি দুমচিটে॥

গলবন্ধ বড় শিকল কড়ান খেঁচনী।
ঝঞ্ঝাল ঘাগর উর্ম্মাল রণরণি॥
আট থোপ দুপাশে সোণার ঝলমল।
পেশবাজ পাখর পুত্তঙ্গ জলাজল॥
ঝুরি ঝাঁপা স্কন্ধে সাজে লোমের বেনানি।
তায় বেড়া মণি মুক্তা প্রবাল গাঁথনি॥
শিরে দিল গজকাচ চামর শিখীপাখে।
বদনে সোণার পাটা বিষ্ণুকী ঝলকে॥
কপালে পদক সাজে অরুণের ছটা।
গলা বেড়া জিজির সোণার জয়পাটা॥
চলে যেতে চঞ্চল চরণে দিয়া লাল।
ঘোড়া লয়ে লাউসেনে যোগাল বারাল॥
অশ্ব দেখে গৌড়েশ্বর ভাবিল অন্তরে।
না জানি দারুণ ঘোড়া কি জানি কি করে॥
অনেক রাউৎকে বধিল এই হয়।
লাউসেনের তরে রাজা পেল বড় ভয়॥
রাজা কয় লাউসেনে নিষেধ বচন।
পাছে ক্ষেপা ঘোড়ায় চড়ে হারায় জীবন॥
লাউসেন বলে মেসো কর অবগতি।
অবশ্য রাখিতে চাই মামার ভারতি॥
ক্ষত্রি হয়ে সমর করিতে করে ভয়।
বীরপণা সংসারে তাহার নাহি রয়॥
সিপাই হইয়া ঘোড়া জব্দ নাহি করি।
রাউৎ লাউসেন নাম অকারণ ধরি॥
এত বলে স্মরণ করিয়ে নিরঞ্জন।
লম্ফ দিয়া ঘোড়ায় হলেন আরোহণ॥
হংস উপর বিরিঞ্চি বৃষেতে ত্রিপুরারি।
গরুড় উপরে যেন চাপিলেন হরি॥
গোটা তিন ঘোড়ায় চাবুক মারে রায়।
দাবানল দেখিয়া হরিণ যেন ধায়॥
ভর দিয়া পবনে দাপট মেরে চলে।
অমনি উঠিল ঘোড়া আকাশ মণ্ডলে॥
ঘোড়া বলে সাবধান লাউসেন বীর।
স্বর্গপুরে দেখাইব ধর্ম্মের মন্দির॥
ঐ দেখ রামের দেশ অযোধ্যা ভুবন।
দেখ রায় মথুরা গোকুল বৃন্দাবন॥
কাশী কাঞ্চি বারাণসী দ্বারকা নগর।
লীলা ছলে জগন্নাথ দেখ সদাকর॥
সাগর সঙ্গম ওই দেখিবারে পাই।
দেখ রাজা নবদ্বীপে গৌর নিতাই॥
কর্পূর ধনের বাড়ী ঐ দেখ কাঁউর।
ভদ্রকালী বিরাজেন অজয় ঢেকুর॥
ইছাই ঘোষ রাজা হল যাঁহার কৃপায়।
শিমুল্যার গড়খান ওই দেখা যায়॥
দেখাইল কৈলাসে পার্ব্বতী ত্রিলোচন।
স্বর্গপথ দিয়া ঘোড়া করিল গমন॥
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিল দণ্ড দশে।
মহামদ পাত্র হেথা মনে মনে হাসে॥
শুন শুন নৃপতি কহিতে করি ভয়।
লাউসেন ভাগিনা গেলেন যমালয়॥
ক্ষেপা ঘোড়ায় চাপিল করিয়া অহঙ্কার।
ঐরূপে কত শত মল আশোয়ার॥
পর্ব্বতে আছাড় খেয়ে মল লাউসেন।
এমন বচন শুনি কর্পূর কাঁদেন॥
আসিতে যে গৌড়পুরী না পড়িল বাধা।
মোরে ছেড়ে কোথা গেলে লাউসেন দাদা॥
প্রাণ কেমন করে দাদা গেলে কোন পথে।
কি বোল বলিব গিয়া মায়ের সাক্ষাতে॥
কাতর হইয়া কাঁদে কর্পূর পাতর।
তখন জানিল ঘোড়া আণ্ডির পাথর॥
চলে ঘোড়া শূন্যপথে হইয়া ত্বরিত।
সেনে লয়ে রাজার দরবারে উপনীত॥
লাউসেনে দেখে সবার হরিষ অন্তর।
দরবার ভাঙ্গিয়া তখন পাত্র গেল ঘর॥
বড় মামী লাউসেনের ভানুমতী রাণী।
দেখা করাইতে লয়ে গেল নৃপমণি॥
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া সেন গুণধাম।
মামীর চরণে গিয়া করিল প্রণাম॥
আশীষ করিয়া রাণী ভাসে অশ্রুজলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥
কোলে করে রাজা রাণী বলে লাউসেনে।
শাস্ত্রে ভর দিল বলি তোমার কারণে॥

মৃত বাঁচাইয়া বর দিল নিরঞ্জন।
অন্ধকের নড়ি তুমি কৃপণের ধন॥
রহিল রাজার ঘরে ভাই দুই জনা।
প্রভাতে বিদায় হয়ে যাবেন ময়না॥

বিদায় হবেন কালি ময়না নগর।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

অথ রাজ-সম্ভাষণ ও হস্তীবধ পালা সমাপ্ত।

অথ দেশাগমন পালা।

দেহারা বিশ্রাম স্থান গোকুল নগর।
শঙ্খাসুর ঠাকুর বন্দিব যোড়কর॥
দয়া কর ধর্ম্মরাজ লয়েছি শরণ।
তোমা বিনা কেবা করে লজ্জা নিবারণ॥
তাল মান রাগ ছন্দ ভেদ নাহি হয়।
কত রাগ কে কার রমণী বটে হয়॥
নরাধম কি জানিব তোমার বর্ণনা।
ব্রহ্মা আদি দেব করে উদ্দেশে সেবনা॥
আসরে নামিয়া বুক করে দুর দুর।
লজ্জা নিবারণ কর প্রভু শঙ্খাসুর॥
গৌড় পুরে ছিলেন ময়নার গুণমণি।
পোহাইল শর্ব্বরী উদয় দিনমণি॥
ঘর যেতে সাজন করিল সদাকর।
সঙ্গেতে অনুজ ভাই কর্পূর পাতর॥
ভানুমতী মাসী কাঁদে আকুল পরাণ।
বিদায় হইয়া সেন নিজ দেশ যান॥
ধর্ম্মদাস সেনকে জানিল সর্ব্বজন।
মহাবীর নাম হল দরবারে লিখন॥
আণ্ডির পাথর ঘোড়া ময়না বসতি।
লাউসেনে দিলেন গৌড়ের মহীপতি॥
নানা ধন দিয়া বিদায় করিল রাজন।
লাউসেন করেন ঘোড়ায় আরোহণ॥
সেনের সঙ্গেতে ধায় অনুজ কর্পূর।
ভূপতির মহল রাখিল কত দূর॥
গৌড় পশ্চাতে করে লাউসেন বালা।
রমতি নগর গেল ছয় দণ্ড বেলা॥

কর্পূর পাতর কয় লাউসেন বীরে।
মামাদের বাড়ী এই রমতি নগরে॥
ঐ দেখ মহল দেউলে ধ্বজা উড়ে।
গড়খানা বেষ্টিত বেউড় বাঁশ ঝাড়ে॥
ছয় ভাই মামাতো কেমন মামি দেখি।
আজি চল মামার বাড়ীতে গিয়া থাকি॥
প্রণাম করিব চল মাতামহীর পায়।
কয় হাতী তুরঙ্গ দেখিব তবলায়॥
মামাকে দেখেছি মাত্র রাজার দরবারে।
ভাল মন্দ বারতা বলিতে চাই ঘরে॥
কি বোল বলিবে যদি জননী জিজ্ঞাসে।
কর্পূরের বচন শুনিয়া সেন হাসে॥
বটে ভাই কর্পূর বলেছ বিলক্ষণ।
মামার গুণেতে যেতে নাহি হয় মন॥
এত দুঃখ দিলেক দুঃখের নাহি ওর।
মিছা কথায় বন্দী করে বলে হাতী চোর॥
নৃপতিকে নানা সৎ প্রকারে বুঝায়।
অরি ভাবে প্রাণ নিতে মাতঙ্গ যুঝায়॥
বধ করে পুনর্ব্বার বাঁচাইলাম হাতী।
তুমি কি না জান হে সঙ্গের বট সাথী॥
পক্ষবল আমার ঠাকুর মায়াধর।
অতএব তরি এলাম বিপত্তি সাগর॥
সেনের বচন শুনি কর্পূর পাতর।
মনেতে লাগিল কথা না দিল উত্তর॥
দুই ভাই রমতি নগর দিয়া যান।
কালুবীর লয়ে কিছু কর অবধান॥

হীরা দীঘির পাড়ে থাকে ডোম তের ঘর।
তেঁতুল তলায় কালু আগুলে শূকর॥
হাতে গুলুতাই করে ফিরে কালু ডোম।
দূরে দেখে ডরায় দুরন্ত কাল যম॥
পাড়ের উপরে বীর দাণ্ডাইয়া আছে।
মাছরাঙ্গা পক্ষী বসে তেঁতুলের গাছে॥
বাটুল জুড়িল কালু পক্ষীর উপর।
বসুন্ধরা ভয় পেয়ে হইল কাতর॥
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলা যেই কালে।
গন্ধমাদন লয়ে হনু অযোধ্যায় চলে॥
আকাশে চলেছে হনু মাথায় পর্ব্বত।
শত্রু বলে বজ্জর বাটুল মারিল ভরত॥
রাম শব্দ করে হনু ভূতলে অস্থির।
সেই মত বাটুল জুড়িল কালু বীর॥
হুহুঙ্কার শব্দেতে বাটুল দিল ছেড়ে।
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল পক্ষী গেল উড়ে॥
হায় হায় করে কালু পক্ষী উড়ে যেতে।
কালুর প্রতাপ সেন দেখিল সাক্ষাতে॥
বীর ডাল ভেঙ্গে গেল বাটুল সন্ধানে।
আঁকাড়ে না পায় ডাল আট আট যোয়ানে
সেন বলে কর্পূর করহ অবধান।
পৃথিবীতে বীর নাহি ইহার সমান॥
জরাসন্ধ সুরথ অর্জ্জুন ইন্দ্রজিৎ।
সেই মত এই জনা সমরে পণ্ডিত॥
পরিতে বসন নাহি কষ্ট বড় পায়।
ময়নাতে লয়ে যাই যদি সঙ্গে যায়॥
বীরবালা বাঁধাই মহল তুলে রাখি।
কর্পূর বলেন পরিচয় লয়ে দেখি॥
তেঁতুলের তলে কালু হাতে গুলুতাই।
জিজ্ঞাসিতে বীরকে গেলেন দুই ভাই॥
লাউসেন বলে বীর কর অবগতি।
নিজ নাম কহ কোন্ কুলেতে উৎপত্তি॥
বৃকোদর সম তেজ দেখি যে তোমার।
কোন্ গ্রামে থাক হে চাকর বট কার॥
নাম ধরি কালুবীর ডোমের ছাওয়াল।
গৌড়েশ্বর রাজার চাকর সর্ব্বকাল॥

জয় সিংহের পুত্র পিতামহ বলরাম।
পাঁচ পুরুষ রমতি নগরে করি ধাম॥
রমতি নগরে থাকি তের ঘর ডোম।
সংগ্রামে পণ্ডিত সবে কেহ নই কম॥
জমি আছে বিঘা কত নানা বাব তায়।
নিরবধি জঠর জ্বালায় প্রাণ যায়॥
তালপত্র কুটীর দেখহ বিদ্যমান।
দুখ দেয় পাতর পালাতে নাই স্থান॥
কর্পূর পাতর বলে শুন সদাকর।
তের ডোম লেখা আছে ফলার উপর॥
প্রায় বুঝি এক জনা বীর তার বটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥
সেন বলে শুন বীর যদি লাগে মনে।
এক বোল বলিহে তোমার বিদ্যমানে॥
লাউসেন নাম বাড়ী ময়না নগর।
মহামদ পাত্র মামা মেসো গৌড়েশ্বর॥
রাজা ভেটে রাজ্য পেলাম ময়না ইলাম।
ঘোড়া পেলাম আণ্ডির পাথর যার নাম॥
দেখিলাম সাক্ষাতে তোমার বীরপণা।
তোমাকে লইয়া যেতে হইল বাসনা॥
রমতি নগরে কেন কষ্ট পাও ভাই।
পরিজন সহিত ময়নাতে লয়ে যাই॥
আপনার নিকটে মহল তুলে দিব।
লয়ে যাই ধর্ম্মমত পালন করিব॥
কষ্ট নাহি পাবে হে জাইগীর দিব করে।
বীরবালা বাঁধাব মাথায় স্বর্ণ চিরে॥
এত শুনি প্রণাম করিয়া বীর কয়।
ময়নাকে নিশ্চয় যাইব মহাশয়॥
নিবেদন করি তব চরণ যুগলে।
ছেড়ে যাব রমতি ডোমনী যদি বলে॥
সতত আমোদে ভোলা না হয় ঠাউর।
ডোম জাতি আমাদের ডোমনী চতুর॥
দণ্ড দুই থাকিবে তরুর তলে বসে।
একবার আসি আমি লক্ষ্মাকে জিজ্ঞাসে॥
বসিলা বকুল তলে দুই সহোদর।
যুক্তি করিবারে গেল কালু সিংহবর॥

শুকা বুনে ধুচুনি শাকাই বুনে ঝুড়ি।
লক্ষার সনে তালাই বুনে ময়ুরা বহুড়ী॥
জাতি বৃত্তি সবাই করিছে নিজালয়।
কালু বীর লক্ষার কাছেতে বসে কয়॥
মন দিয়া শুন হেদে শাকাইএর মা।
অপরূপ বচন শুনিয়া এলাম বা॥
রাজার দরবারে হাতী বধিল যে জন।
পাত্রের ভাগিনা সেই রঞ্জার নন্দন॥
নবলক্ষ দলের সর্দ্দারী বীর বানা।
ঘোড়া জাইগীর পেল দক্ষিণ ময়না॥
পথে দেখা পেয়ে বড় করিল সম্মান।
আমাদিগে ময়না লইয়া যেতে চান॥
অন্ন বিনে কত সহি উদরের জ্বালা।
জাড়কালে গায়ে দিতে না জুটে ঝেতলা॥
আর না পাইবে দুঃখ কুলো ঠেকা বেচে।
কপাল না রুজু হলে পুরুষত্ব মিছে॥
উদ্যোগ বিনেতে কার দুঃখ নাহি যায়।
এত দিনে প্রসন্ন হলেন যদুরায়॥
তের ডোম সহিত ময়নাকে চলে যাব।
লাউসেন রাজার চাকর সবাই হব॥
বৃক্ষতলে বাটচেয়ে বসে দুই ভাই।
চল লক্ষা এ দেশ ছাড়িয়া চলে যাই॥
বোল শুনে ডোমনী করিল হেঁট মাথা।
এত দিনে দেশান্তরি করিল বিধাতা॥
পাঁচ পুরুষ রমতি নগরে করি বাড়ী।
পরলোক হয়েছেন শ্বশুর শাশুড়ী॥
সাত পাঁচ গণিয়া প্রবোধ দিল মনে।
নিবাস ছাড়িতে হল অন্নের কারণে॥

ডোমগণে ডাক দিয়া আনিল তখন।
হরিদাস মাধব সুন্দর সনাতন॥
হীরাধর, রূপাই, সুবল দিল দেখা।
দুই পুত্র বীরের নামেতে শাকা শুকা॥
তলোয়ার বাজিলে না থাকে গায় চিনা।
দেখা দিল চাঁপা ভাল বীরের ভাগিনা॥
শানা ডোম কালুর শ্বশুর বীর ঘাটু।
হাতী পাড়ে পাটনে পাতিয়া বাম হাটু॥
শাঁড়ু ভাই কালুর নামেতে হাতে গড়া।
শিঙ্গাদার দিল দেখা তের দলুই ছাড়া॥
তরুতলে লাউসেন কর্পূর পাতর।
দেখা করিবারে তখন চলিল সত্বর॥
সামন্ত ঝকড় আগে পাঁচু দলুইগণ।
দেখিল বকুলতলে রাজার নন্দন॥
ঘোড়ার লাগাম ধরি কর্পূর ভাই আছে।
শ্রীরামের সঙ্গে যেন লক্ষ্মণ সেজেছে॥
প্রণাম করিল লক্ষা চরণে দোহার।
তের দলুই ডাক ছাড়ে জোহার জোহার॥
দেখে আনন্দিত হল রঞ্জার তনয়।
যোড় হাতে তখন ডোমনী কিছু কয়॥
ভাবিয়া ময়ূর ভট্ট পদশতদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
দলুইগণ জোহার করিল লাউসেনে।
সামন্ত ঝকড় কয় সেন বিদ্যমানে॥
জীবন জুড়াল দেখি রাতুল চরণ।
সাধু সঙ্গে বিধাতা করাল দরশন॥
রাম রাজা যেমন এমন মনে বাসি।
এতদিনে প্রভাত হইল ঘোর নিশি॥

ক্রমশঃ

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বাদ্য কত কব, মৃদঙ্গ পনব,
সহস্র সহস্র কাঁসি।
দুন্দুভি মাদোল, ডম্ফ কাড়া ঢোল,
তুরি ভেরি বীণা বাঁশি॥
বাদ্যের নিঃস্বন, পূরিল গগন,
গন্ধর্ব্বেরা করে গান।
সুন্দরী অপ্সরা, নৃত্য করে তারা,
হয়ে অতি সাবধান॥
শুন মুনিবর, লগ্ন তদন্তর,
শুভ জানি প্রজাপতি।
সভা স্বয়ম্বরে, আনিলা সত্বরে,
ত্রৈলোক্য-সুন্দরী সতী॥
সতী দেবী আসি, সভাতে প্রবেশি,
অতি বড় সভা দেখি।
সভার বিভব, নিরখিয়া সব,
মনেতে হইলা সুখী॥
হেনই সময়, দেব মৃত্যুঞ্জয়,
উপনীত হৈলা আসি।
কেহ না দেখিলা, শূন্যেতে থাকিলা,
বৃষভ উপরে বসি॥
দক্ষ প্রজাপতি, কৈলা মাতা সতী,
দেখ এ সভাতে এসে।
দেব দৈত্য যত, গন্ধর্ব্বাদি কত,
ঋষি মুনি সবে বসে॥
করহ বরণ, মাল্য সমর্পণ,
তব ইচ্ছা হয় যারে।
সতী সভা জন, কৈলা নিরীক্ষণ,
দেখিতে না পান হরে॥
শিবে না দেখিয়া, মনে ক্ষুণ্ণ হয়্যা,
সতী দক্ষরাজবালা।
মালা হস্তে তুলি, শিবায় নমঃ বলি,
ভূমেতে রাখিলা মালা॥
সতী মালা দিলা, সাক্ষাতে দেখিলা,
হয়ে অতি ত্বরাপর।
বর বেশ ধরি বৃষভ উপরি,
সভাতে আইলা হর॥
কোটি শশী আভা, চিত্র বস্ত্র শোভা,
সুগন্ধি লেপন গায়।
গলে দিব্য হার, স্বর্ণ অলঙ্কার,
মণিতে জড়িত তায়॥
ফুল্ল পদ্ম যেন, শোভা ত্রিনয়ন,
ভালে অর্দ্ধ শশধর।
সতী-দত্ত মালা, শিরে তুলি নিলা,
দেবের দেবতা হর॥
সকলে দেখিলা, শিবে মালা দিলা,
বিশ্বের জননী সতী।
মালা শিরে ধরি, অন্তর্দ্ধান করি,
গেলা দেব পশুপতি॥
দেবাসুর তবে, তুষ্ট হৈলা সবে,
যে কেহ আছিলা তায়।
মহাভাগবতে, রচি ভাষামতে,
দ্বিজ রামনিধি গায়॥

১৭॥ পয়ার ছন্দ।

স্বয়ম্বরে শিবে যদি মালা দিলা সতী।
সতীকে আদরহীন কৈলা প্রজাপতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ।
সকলে কহিলা দক্ষ শুনহ বচন॥
তব এই কন্যা সতী এই স্বয়ম্বরে।
বরণ করিলা পতি দেবদেব হরে॥
অতএব শিবে আন শুন মতিমান।
বিধিমতে শিবে কন্যা কর সম্প্রদান॥
শুনি দক্ষ দেবীবাক্য পড়ে গেল মনে।
নিমন্ত্রিয়া দক্ষ আনাইলা ত্রিলোচনে॥

যেইমত রীতি আছে শাস্ত্রের বিধান।
সেই মতে দক্ষ শিবে সতী কৈলা দান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ঋষি মুনি হয়ে সকৌতুক।
বিধানে সতীকে সবে দিলেন যৌতুক॥
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা দেবগণ।
সহস্র সহস্র হৈল দুন্দুভি বাজন॥
তুষ্ট হৈলা দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নিন্দা করিবেন দক্ষ বুঝিলেন হর॥
হিমালয় গিরিবর সুশোভন অতি।
সতী লয়ে হিমালয়ে গেলা পশুপতি॥
শিব সঙ্গে সতী গেলা দক্ষ করে কোপ।
দিব্যজ্ঞান তাহার হইল সব লোপ॥
ক্ষীণপুণ্য মতিচ্ছন্ন হয়ে প্রজাপতি।
সতী শিবে নিন্দিয়া কহিল মূঢ়মতি॥
জ্ঞানাবধি দেখি শিব জটা ভস্ম ধরে।
ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কন্যা দিলাম তাহারে॥
সতী কন্যা বৃথা হৈলা অতি বুদ্ধিহীনা।
বর তিনি আর না পাইলা শিব বিনা॥
এই মতে নিন্দা করি নানা কথা কয়ে।
কান্দিতে লাগিলা দক্ষ মনে দুঃখী হয়ে॥
শিবে নিন্দি দক্ষ যদি করিলা ক্রন্দন।
দধীচি পরম জ্ঞানী শিবপরায়ণ॥
দধীচি কহিলা দক্ষ কি নিন্দিহ হরে।
পরম পুরুষ শিব নাহি জান তাঁরে॥
মোহে না জানিয়া নিন্দ দেবের দেবতা।
তব কন্যা সতী যিনি তিনি বিশ্বমাতা॥
সতীকে করহ নিন্দা তত্ত্ব নাহি জানি।
পরমা প্রকৃতি পূর্ণা ব্রহ্মময়ী তিনি॥
পরম পুরুষ শিব পূর্ণা শক্তি সতী।
সংশয় ইহাতে না করিহ প্রজাপতি॥
বহু ভাগ্য ছিল তব পুণ্যের সঞ্চয়।
তাহে তব কন্যা সতী তোমার আলয়॥
অতি উগ্র তপস্যা করেন যদি ধাতা।
কিংবা বিষ্ণু ইন্দ্রাসুর শ্রেষ্ঠ যে দেবতা॥
আদ্যাশক্তি সতী যিনি তনয়া তোমার।
কন্যা ভাবে ইহাকে পাওন বড় ভার॥
অতএব না মর্ম্ম জানি নিন্দা কর তাঁরে।
মায়াতে বঞ্চিত বুঝি করেন তোমারে॥
সাবধান হও দক্ষ করিয়া যতন।
হাতে পেয়ে হারাইবা অমূল্য রতন॥
দক্ষ কৈলা পরম পুরুষ শিব যদি।
জগত ঈশ্বর সেই যদ্যপি অনাদি॥
বিরূপ ত্রিনেত্র কেন ভিক্ষা মেগে খায়।
কেন বা শ্মশানে বাস ভস্ম মাখে গায়॥
কহতো দধীচি মুনি ইহার কারণ।
রামনিধি বলে দক্ষ শুন দিয়া মন॥

১৮॥ ত্রিপদী ছন্দ।

দক্ষের বচন শুনি, দধীচি যে মহামুনি,
কহিতে লাগিলা সুনিশ্চয়।
তত্ত্ব কথা শুন মর্ম্ম, সদাশিব পূর্ণ ব্রহ্ম,
সর্ব্বেশ্বর নিত্যানন্দ ময়॥
তাহার আশ্রিত যেই, দুঃখভাগী নয় সেই,
দেবের দেবতা পশুপতি।
ত্রৈলোক্যে পূজয়ে যাঁরে, ভিক্ষুক কহিছ তাঁরে,
এ কেবল তোমার দুর্ম্মতি॥
ব্রহ্মা আদি পরাৎপরা, প্রধান দেবতা যাঁরা,
তত্ত্বদর্শী যোগী করে ধ্যান।
তথ্য কথা প্রচন্দ্রূপ, শিবের পরম রূপ,
কদাচিত দেখিতে না পান॥
রূপের তুলনা যাঁর, তিন লোকে পাওয়া ভার,
কোটি চন্দ্র দ্যুতি যাঁর কান্তি।
যাঁর রূপে তম হরে, বিরূপ কহিছ তাঁরে,
এ তোমার বুঝিবার ভ্রান্তি॥
আশুতোষ পশুপতি, সর্ব্বঠাঞি তাঁর গতি,
দিব্যপুরী অথবা শ্মশানে।
নির্ব্বিকার ভগবান, সকলি তাঁহার স্থান,
অবিশেষ সকলি সমান॥
সে অপূর্ব্ব শিবলোক, দেখিলে না থাকে শোক,
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ তা হয়।
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ পুরী, ব্রহ্মলোক মনে করি,
তার এক কণা সম নয়॥

স্বর্গে যে কৈলাস আর, সুদুর্ল্লভ দেবতার,
তাহাতে অনেক দেবগণ।
স্বর্গের উত্তম ঠাঞি, তার সম আর নাই,
চতুর্দ্দিকে কল্পবৃক্ষ বন॥
কৈলাস এমন স্থান, ব্রহ্মলোক লজ্জা পান,
বৈকুণ্ঠ কি তার সম হয়।
কৈলাস যে পুরী আছে, দুই লোক তার কাছে,
ষোড়শ কলার কলা নয়॥
পৃথিবীতে ত্রিপুরারি, আর কৈলা কাশী পুরী,
মুক্তিক্ষেত্রময় সেই পুরী।
মরিবারে সেই স্থানে, বাঞ্ছা হয় দেবগণে,
কি কহিব মানবাদি করি॥
এ সব আলয় তাঁর, তুমি বল নাই আর,
শ্মশান ব্যতীত স্থান তাঁর।
কহিলাম সত্য সব, ত্রিলোকের কর্ত্তা ভব,
না মানহ দুর্ম্মতি তোমার॥
শুন দক্ষ কহি হিত, মোহে আর কদাচিত,
নিন্দা না করিহ মহেশ্বরে।
তব কন্যা সতী যিনি, পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তিনি,
বহু ভাগ্যে জন্ম তব ঘরে॥
কহিলেন শূলপাণি, শুন হে নারদ মুনি,
এই মত অনেক প্রকার।
দধীচি কহিলা তথ্য, ঈশান ঈশ্বর সত্য,
না মানিয়া দক্ষ কদাচার॥
মুহুর্ম্মুহু বারে বারে, নিন্দা করি মহেশ্বরে,
খেদ করি কান্দিতে লাগিলা।
হে বৎসে হা সতী কন্যা, প্রাণতুল্যা তুমি মান্যা,
মোরে ত্যজি কোথায় থাকিলা॥
শোকার্ণবে মোরে ফেলি, তুমি কোথা গেলা চলি
পালঙ্কে শয়ন হৈত ঘুমে।
ত্রৈলোক্য-সুন্দরী হয়ে, বিরূপ পতিকে লয়ে,
কেমনে থাকিবা প্রেতভূমে॥
দক্ষের ক্রন্দন শুনি, দধীচি যে মহামুনি,
প্রিয়বাক্যে বহু সান্ত্বাইলা।
দধীচি পরম ধীর, দক্ষের চক্ষের নীর,
মুছি পুন কহিতে লাগিলা॥
প্রজাপতি হও স্থির, তুমি জ্ঞানবান ধীর,
মূর্খপ্রায় রোদনে কি কার্য্য।
দেবদেব পশুপতি, জেনে তবু হেন মতি,
হৈল তব এ বড় আশ্চর্য্য॥
স্ত্রী পুরুষ যত আছে, আকাশ পাতাল মাঝে,
ক্ষৌণি মধ্যে কিংবা থাকে জলে।
সর্ব্ব নারীরূপা সতী, পুরুষেতে পশুপতি,
শুন দক্ষ এমতি সকলে॥
দেবদেব শিব যিনি, অনাদি পুরুষ তিনি,
নিশ্চয় জানিহ প্রজাপতি।
মূর্ত্তিহীনা পরাৎপরা, মায়াছলে রূপ ধরা,
পরমা প্রকৃতি এই সতী॥
বহু ভাগ্যে পেলে মান্যা, পরাৎপরা সতী কন্যা,
শিবে পেলে তেমতি জামাতা।
ইহা না মানহ যদি, তোমাকে বঞ্চিত বিধি,
নিতান্ত জানিবা এই কথা॥
তুমি অতি শোকাকুলি, শুন যাহা আমি বলি,
তবে সে তোমার ভাল হয়।
পরমা প্রকৃতি সতী, ঐ মত পশুপতি,
ইহাতে না করিহ সংশয়॥
দধীচি মুনির বাক্য, শুনি প্রজাপতি দক্ষ,
পুনরপি কহিলা যে বাণী।
দ্বিজ রামনিধি ভণে, শুন সবে একমনে,
গান দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥

১৯। পয়ার ছন্দ।

দক্ষ কৈলা যে কথা কহিলা মহামুনি।
সত্য মোর কন্যা আদ্যা প্রকৃতিরূপিণী॥
পরম পুরুষ শিব ত্রিলোক ঈশ্বর।
শুনেও মনেতে নাহি ধরে মুনিবর॥
দেবতা শিবের পর কেহ নাহি আর।
ঋষিরা কহেন সত্য এমতি প্রকার॥
পরম পুরুষ শম্ভু সর্ব্বে বটে কয়।
তথাপি আমার মনে প্রত্যয় না হয়॥
শিবেরে যে দূষি আমি কিসের কারণ।
তাহার আমূল কহি করহ শ্রবণ॥

প্রজা সৃষ্টি কৈলা যবে পিতা সৃষ্টিধর।
স্থাবর জঙ্গম বহু জীব জন্তু নর॥
কীট পতঙ্গাদি সৃষ্টি কৈলা বড় ক্ষুদ্র।
সেইকালে সৃষ্টি হৈল একাদশ রুদ্র॥
ভয়ানক কর্ম্মা সবে ভীম-পরাক্রম।
ভীমরূপী সবে যেন কালান্তক যম॥
কোপবান অতি যেন কালান্তের কাল।
চক্ষুগুলা রক্তবর্ণ পরে বাঘ ছাল॥
লোম কটা শিরে জটা আর কব কত।
নাশিতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল উদ্যত॥
সৃষ্টিলোপ করে পিতা দেখি তা সবারে।
তখনি আমাকে আজ্ঞা কৈলা উচ্চস্বরে॥
ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণ না পায় প্রশ্রয়।
শীঘ্র কর পুত্র তব বশ যাতে হয়॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা যত রুদ্রমূর্ত্তি।
দর্প্প হত হয়ে হৈল মোর আজ্ঞাবর্ত্তি।
রুদ্রগণ মোর আজ্ঞাকারি হৈলা যদি।
আমার অশ্রদ্ধা শিবে হৈল তদবধি॥
যার অংশে উৎপত্তি হইল রুদ্রগণে।
মোর অগ্রে বড় তারে কহ কি কারণে॥
কহিলাম তোমাকে বিশেষ যত সত্য।
অতএব শিবের কি আছয়ে মহত্ত্ব॥
রূপে গুণে পরাৎপরা মোর কন্যা সতী।
তার কি পতির যোগ্য এই পশুপতি॥
সৎপাত্রে কন্যাদান করণ বিহিত।
পুণ্যকীর্ত্তি তাহাতে বাড়য়ে সুনিশ্চিত॥
তেকারণে বান্ধব লইয়া বুদ্ধিমান।
কুলশীল রূপ জেনে কন্যা করে দান॥
ইহা জানি পূর্ব্বে আমি সতী স্বয়ম্বরে।
ডাকি নাই কুলশীল বিবর্জ্জিত হরে॥
স্পষ্ট কহিলাম মুনি মনের যে কথা।
অপাত্রে সতীকে দিয়া পাইলাম ব্যথা॥
যাবত আমার আজ্ঞাবর্ত্তি রুদ্রগণ।
শিব যে উত্তম পাত্র তদবধি নন॥
মোরে শাস্তি দিতে শিব না পারে যাবত।
সত্য কহিলাম শিবে নিন্দিব তাবত।
নারদে কহিলা শিব শুন মহামতি।
এমতি কহিল যদি দক্ষ প্রজাপতি॥
দক্ষ বাক্য শুনিয়া দধীচি মহামুনি।
মনে মনে বিবেচনা করিলা আপনি॥
মহামূঢ়মতি দক্ষ অতি মন্দ রীত।
বুঝিলাম হবে মূর্খ শিবেতে বঞ্চিত।
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তে সতী শিবে।
তার জানা ভার মূঢ় দক্ষ কি জানিবে॥
অতি জ্ঞানবান ভক্তে যত্নপিহ জানে।
পাপাত্মা পাষণ্ড জনে জানিবে কেমনে॥
মূঢ়মতি দক্ষ অতি অহঙ্কারে মত্ত।
পরিণামে কিবা হবে না বুঝিল তত্ত্ব॥
এত চিন্তা করিয়া দধীচি নিজ মনে।
পুন কিছু না কহিয়া গেলা নিকেতনে॥
পুনঃ পুনঃ বহু দুঃখ চিন্তিয়া অশেষ।
নিজ গৃহে দক্ষ গিয়া করিলা প্রবেশ॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস মহামুনি।
রামনিধি ভণে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥

২০। লঘু ত্রিপদী।

ওথা মৃত্যুঞ্জয়, গেলা হিমালয়,
সতীকে লইয়া যবে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, এল বহুতর,
দরশনাকাঙ্ক্ষী সবে॥
গিরিরাজরাণী, সতী এল শুনি,
ঋষিপত্নীগণে মিলা।
সঙ্গে সহচরী, কন্যা ভাব করি,
সতীকে দেখিতে এলা॥
দেবগণ তুষ্টি, কৈলা পুষ্পবৃষ্টি,
অপ্সরা যত প্রধান।
নৃত্য কৈলা তারা, হয়ে হৃষ্টপরা,
গন্ধর্ব্বে করিল গান॥
গিরিরাণী মেনা, প্রভৃতি অঙ্গনা,
মুনিপত্নী আদি সব।
আচার যেমনি, হুলুশঙ্খধ্বনি,
কৈলা মহামহোৎসব॥

তেক প্রমথ, হৈল দণ্ডবত,
সতী শিবে সর্ব্বজনা।
ক্ষ বাদ্য গাল, দিয়া করতাল,
নৃত্য কৈলা হৃষ্টমনা॥
রগণ পরে, সতী মহেশ্বরে,
প্রণমিয়া সর্ব্বজনে।
হা হর্ষ হয়ে, অনুমতি লয়ে,
গেলা নিজ নিজ স্থানে॥
নকা প্রভৃতি, যতেক যুবতী,
পুলকিত কলেবরে।
নিপত্নীগণ, আদি সর্ব্বজন,
গেলা যাঁর যেই ঘরে॥
নকা সুন্দরী, সতীরূপ হেরি,
হয়ে অতি চমৎকার।
নে কৈলা যিনি, সতীর জননী,
ধন্য জন্ম হৈল তার॥
মতি ভাবিয়া, প্রত্যহ আসিয়া,
সতীর নিকটে রাণী।
হ বা যেমত, তাহা কব কত,
তনয়া সমান জানি॥
টী রূপ গুণে, আর্দ্র হয়ে মনে,
মেনকা কৈল নিশ্চয়।
এঁরে কন্যা ভাবে, আরাধিব তবে,
ইহাতে নাহি সংশয়॥
মহেশের দার, উদরে আমার,
কন্যা হয়ে জন্ম লন।
ইহাই প্রার্থনা, করি আরাধনা,
জীবন করিয়া পণ॥
এমতি চিন্তিয়ে, শুদ্ধমতি হয়ে,
সতী পূর্ণব্রহ্ম জানি।
নিত্য অকপটে, সতীর নিকটে,
আসি গিরিরাজরাণী॥
নিমেষের তরে, দুহে কেহ কারে,
কভু না হয় বিস্মৃতি।
র-গৃহিণী, সহ গিরিরাণী,
পীরিতি বাড়িল অতি॥

শুন মুনিবর, কহি তদন্তর,
নন্দি কৈলা আগমন।
জ্ঞানবান বর, দক্ষ অনুচর,
শিব ভক্তি পরায়ণ॥
গলবস্ত্র হয়ে, ক্ষিতি লোটাইয়ে,
শিবের চরণ বন্দি।
জোড়কর হয়ে, অগ্রে দাঁড়াইয়ে,
কহিতে লাগিলা নন্দী॥
শুন প্রভু হর, আমি দক্ষচর,
স্বরূপ তোমারে কয়ি।
দধীচি তপস্বী, যিনি ব্রহ্মঋষি,
তাঁর শিষ্য আমি হই॥
তাহে জানি আমি, দেবদেব তুমি,
শরণাগত বৎসল।
না করিহ মোহ, মোরে জ্ঞান দেহ,
রাখ নিজ পদতল॥
তুমি ত নিস্তব্ধ, পরম পুরুষ,
ত্রৈলোক্যে সবার গতি।
সৃষ্টিস্থিতি আর, করেন সংহার,
পূর্ণাশক্তি এই সতী॥
ভক্তিযুক্ত হয়ে, এই মত কয়ে,
গদগদ ভাষামতে।
নন্দী ভক্ত দৃঢ়, তুষ্ট কৈলা বড়,
দেব দেব বিশ্বনাথে॥
নন্দী পুনর্ব্বার, করিয়া বিস্তার,
স্তব কৈলা পঞ্চাননে।
মহাভাগবতে, ব্যাসের সম্মতে,
দ্বিজ রামনিধি ভণে॥

২১॥ পয়ার ছন্দ।

পুটাঞ্জলি গলবস্ত্র লোমাঞ্চ শরীর।
এক পদে দাঁড়াইয়া চক্ষে বহে নীর॥
পূর্ণব্রহ্ম সতী শিব আছে অনুভব।
গদগদ স্বরে নন্দী আরম্ভিলা স্তব॥
পরমপুরুষ তুমি ত্রিজগত মাঝে।
তুমি সবাকার আদি যত লোক আছে॥

তুমি বিধি স্থষ্টি সব তোমা হৈতে হয়।
স্থষ্টি রক্ষাকর্ত্তা তুমি কালে কর লয়॥
ঈশ্বরত্ব তোমার সকল কর্ম্মে ক্ষম।
তুমি শিশু তুমি যুবা তুমি বৃদ্ধতম॥
এক ব্রহ্ম তুমি প্রভু কি কব বাখান।
দেবগণে চরণে শরণ দেহ দান॥
সমুহ চন্দ্রিমা যিনি তব অঙ্গ আভা।
পঞ্চমুখে নিরমল শশিকর শোভা॥
ভালে শোভে অর্দ্ধ চন্দ্র শিরে সর্পমণি।
অঙ্গময় আভরণ বেড়া কত ফণী॥
ব্রহ্মাদি দেবতা তব পাদপদ্মে নত।
তব পদকমলে প্রণাম বহু শত॥
তোমাকে যে পূজে নিত্য তব নাম গায়।
সতত যে জপে মন্ত্র হেলায় শ্রদ্ধায়॥
অবশ্য তোমার লোকে বাস হয় তার।
তোমার কৃপায় স্বর্গে করয়ে বিহার॥
হে শঙ্কর দেবদেব দেহ পদছায়া।
তুমি বিনা কেবা আর দীনে করে দয়া॥
নন্দী যদি মহেশে করিলা এত স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে নন্দীকে কহিলা পশুপতি॥
কি তোমার অভিলাষ কহ নন্দী তুমি।
চাহ তব মনোনীত বর দিব আমি॥
নন্দী কৈলা শুন প্রভু জগত ঈশ্বর।
কৃপা যদি কৈলা মোরে দেহ এই বর॥
দাস হয়ে সদা তব নিকটেতে থাকি।
নিরন্তর চক্ষে তব পাদপদ্ম দেখি॥
শিব কৈলা যে বর চাহিলা বাছাধন।
অবশ্য হবেক তাহা নহিবে খণ্ডন॥
অনুক্ষণ আমার নিকটে বাস হবে।
প্রিয়ভক্ত আমার হইয়া তুমি রবে॥
যেই স্তব আমারে করিলা নন্দীশ্বর।
ভক্তি যুক্তে এ স্তব করিবে যেই নর॥
ত্রিভুবনে অমঙ্গল তাহার না হবে।
চিরকাল সুখে থাকি অন্তে মোক্ষ পাবে॥
প্রমথ আমার যত আছে স্থানে স্থান।
আজি হৈতে হৈলা নন্দী সবার প্রধান॥
প্রমথের কর্ত্তা হৈলা শুন মহামতি।
সুখেতে আমার পুরে করহ বসতি॥
শুন হে নারদ নন্দী এই বর পাইলা।
শিবের প্রভাবে প্রমথের কর্ত্তা হইলা॥
শিব কৈলা শুনহ নারদ মুনিবর।
সতী পেয়ে অনঙ্গে পীড়িত হৈলা হর॥
প্রমথ সকল আর নন্দী মহাবলে।
বিশ্বনাথ অনুমতি করিলা সকলে॥
আমার আজ্ঞায় নন্দী প্রমথ প্রভৃতি।
কিছু দূরে গিয়া সবে থাক শীঘ্রগতি॥
স্মরণ যাহাকে আমি করিব যখন।
আমার নিকটে সেই আসিবে তখন॥
তাবত সকলে গিয়া দূরেতে বসিবে।
আজ্ঞা বিনা মোর কাছে কেহ না আসি
শিবের বচন শুনি তখনি সত্বরে।
নিকট ছাড়িয়া সবে চলি গেলা দূরে॥
মহাভাগবত কৈলা ব্যাস ভগবান।
রামনিধি বিরচিলা পুরাণ প্রমাণ॥

২২॥ ত্রিপদী ছন্দ।

প্রেত ভূত দানা লয়ে, নন্দী কিছু দূরে গিয়ে,
সকলে করিলা অবস্থিতি।
নির্জ্জন হইয়া রঙ্গে, অঙ্গ-সঙ্গ সতী সঙ্গে
আরম্ভ করিলা পশুপতি॥
বিশ্রাম নাহিক মাত্র, অঙ্গ-সঙ্গ দিবারাত্র,
সতী শিবে অভিলাষ মত।
অতি প্রীত দুই জনে, সতী আর ত্রিলোচনে,
বিশেষ কহিব তাহা কত॥
কখন বা শূলপাণি, বন্য পুষ্প তুলে আনি,
মাল্য নির্ম্মাইয়া কুতূহলে।
প্রেমভাবে মগ্ন হয়ে, শিব সেই মালা লয়ে,
প্রদান করেন সতী গলে॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রায়, সতীর বদন তায়
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম যদি হয়।
প্রেমাদরে সকৌতুক, নিজ হস্তে সতীমুখ
মুছাইয়া দেন মৃত্যুঞ্জয়॥

র্বত গহ্বরে ক্ষণে, কখন পুষ্পের বনে,
কভু নদীতীরে করে ঠাঞি।
ঙ্গামতে সম্ভোগ, অন্য কর্ম্মে মনোযোগ,
কদাচিত ক্ষণমাত্র নাই॥
তী বিনা পশুপতি, বিশ্বনাথ বিনা সতী,
কার আর কিছু নাই মনে।
হে সদা এক ঠাঞি, নিমিষ বিচ্ছেদ নাই,
পরম পীরিত দুই জনে॥
থন কৈলাস গিরে, কখন মন্দর পরে,
এক সঙ্গে সতী ত্রিলোচন।
খন সুমেরু পর, সতী সহ যান হর,
ক্ষণ কেহ কার ছাড়া নন॥
তী সহ নিরন্তর, যথা তথা যান হর,
পুনরপি হিমালয়ে আসি।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী সতী, পেয়ে দেব পশুপতি,
বিহার করেন শুন ঋষি॥
দিবা রাত্র নাহি জ্ঞান, বেড়াইয়া নানা স্থান,
অঙ্গ সঙ্গে থাকি নিরন্তর।
আপনার মায়াবলে, রঙ্গ রস কুতূহলে,
গেল দশ হাজার বৎসর॥
বিরল সময় জানি, হিমন্ত রাজার রাণী,
প্রত্যহ সতীর কাছে গিয়ে।
কন্যাভাবে আরাধনা, মানস করিয়া মেনা,
নিরন্তর ভক্তিযুক্তা হয়ে॥
রে রাণী বিধিমত, করিলা অষ্টমী ব্রত,
শুক্লাষ্টমী পূর্ণ সংবৎসর।
পুন মহা অষ্টমীতে, পূজা কৈলা বিধিমতে,
আয়োজন করি বহুতর॥
ব্রত পূর্ণ হৈল যবে, শঙ্কর-গৃহিণী তবে,
মেনকারে হইয়া সদয়া।
স্বীকার করিলা তিনি, সংশয় না চিন্ত রাণী,
হব আমি তোমার তনয়া॥
সতী অঙ্গীকার শুনি, হরষিত গিরিরাণী,
দিবানিশি ঐ ধ্যান মনে।
শঙ্করীর বর পেয়ে, পরম হরিষ হয়ে,
রহিলেন গিরির ভবনে॥
হেথা দক্ষ প্রজাপতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
প্রতিদিন শিবনিন্দা করে।
সামান্য লোকের মত, নিন্দা করে অবিরত,
মান্য বলে নাহি মানে হরে॥
অপ্রীত হইলে প্রায়, সর্ব্বদা কুযশ গায়,
ক্ষুদ্র লোকে যেই মত কয়।
শুন মহামুনিবর, অকৌশল পরস্পর,
শিব দক্ষে হৈল অতিশয়॥
নারদ চিন্তিয়া পরে, এক দিন দক্ষ ঘরে,
উপনীত হইলেন গিয়া।
দক্ষ নারদেরে দেখি, মনেতে হইয়া সুখী,
পূজা কৈলা পাদ্য অর্ঘ দিয়া॥
নারদ সাধিতে কাজ, কৈলা শুন দক্ষরাজ,
তুমি সদা নিন্দা কর শুনি।
নিন্দা শুনি মহেশ্বর, কোপেতে করিয়া ভর,
স্থির যাহা কৈলা শুন বলি॥
প্রেত ভূত দানাগণ, সঙ্গে লয়ে পঞ্চানন,
আপনি আসিবা তব বাসে।
ভস্ম অস্থি ভূতগণ, করিবেক বরিষণ,
কুল সহ তোমার বিনাশে॥
তোমার মঙ্গল চাই, স্নেহে কহিলাম তাই,
প্রকাশ না হয় কদাচন।
স্বস্থানেতে যাই আমি, উপায় চিন্তহ তুমি,
লয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ॥
দক্ষেরে এতেক কয়ে, নারদ সত্বর হয়ে,
স্বর্গপথে গেলা মহামুনি।
দক্ষ হৈলা সুচিন্তিত, রামনিধি বিরচিত,
গান দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥

২৩॥ পয়ার ছন্দ।

দক্ষে কয়ে গেলেন নারদ মুনিবর।
তব কুল নাশিবারে আসিবেন হর॥
ইহা শুনি দক্ষ অতি বিচিন্তিত মনে।
ডাকাইয়া কহিতে লাগিলা মন্ত্রিগণে॥
আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী তোমরা সকল।
সর্ব্বদা করহ চিন্তা আমার মঙ্গল॥

কিন্তু মোর মন্দ চিত্তে বিপক্ষ যে লোক।
তাহাতে কারই কিছু নাহি মনোযোগ॥
নারদ মহর্ষি আজি এসেছিলা হেথা।
তিনি মোরে কহিয়া গেলেন এই কথা॥
কোপযুক্ত হয়ে শিব করিয়াছে মনে।
ভূত সহ আসিবেক আমার ভবনে॥
ভস্ম অস্থি রক্তবৃষ্টি করিয়া প্রলয়।
নাশিবে আমার কুল নাহিক সংশয়॥
অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী বট সর্ব্বজন।
কি কর্ত্তব্য বল দেখি কি করি এখন॥
ইহা শুনি মন্ত্রিগণ সভয় অন্তরে।
কহিল এ কথা রাজা মনে নাহি ধরে॥
দেবদেব মহাদেব সদাশিব যিনি।
অকারণে এমন করিবা কেন তিনি॥
তুমিও শাস্ত্রজ্ঞ বট শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান।
উপযুক্ত আজ্ঞা কর ইহার বিধান॥
দক্ষ কৈলা যজ্ঞ আমি করিব সর্ব্বদা।
শিব বিনা নিমন্ত্রিব সকল দেবতা॥
ভূত অধিপতি শিব শ্মশানেতে ঘর।
সর্ব্ববিঘ্ননিবারক বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর॥
যজ্ঞ রক্ষা করিতে বরিব যজ্ঞেশ্বরে।
পুণ্য কর্ম্মে ভূতনাথ কি করিতে পারে॥
সংযত হইয়া যজ্ঞে বসিব যেইক্ষণে।
আসিতে নারিবে শিব আমার ভবনে॥
দক্ষ কৈলা মোর যুক্তি করি এই কাজ।
ভয়ে মন্ত্রী বলে এই ভাল মহারাজ॥
তদন্তরে গেলা দক্ষ ক্ষীরোদ নিকটে।
বিষ্ণু আরাধনা কৈলা থাকি তার তটে॥
দক্ষের তপস্যা হেরি অতি ঘোরতর।
সদয় হইয়া বিষ্ণু দেন তাকে বর॥
বিষ্ণু কহিলেন দক্ষ তপে ক্ষান্ত হও।
সদয় হইয়াছি বর বাঞ্ছামত লও॥
দক্ষ প্রজাপতি তবে কৈলা জোড়করে।
মানস করেছি এক যজ্ঞ করিবারে॥
তুমি যজ্ঞেশ্বর আমি যজ্ঞে হব দীক্ষা।
কৃপা করি সে যজ্ঞ করিবা তুমি রক্ষা॥
দক্ষের বচন শুনি বিষ্ণু ভগবান।
চলিলা দক্ষের পুরে বর দিয়া দান॥
তদন্তরে দক্ষ আসি আপন ভবনে।
বিনা শিব নিমন্ত্রণ কৈল সর্ব্বজনে॥
নিমন্ত্রণ ব্রহ্মারে করিল দক্ষরাজ।
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি দেবতা সমাজ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি যত মুনিবর।
সিদ্ধ যক্ষ পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
তাবত পর্ব্বত আর অসুর প্রভৃতি।
সকলেরে নিমন্ত্রিল দক্ষ প্রজাপতি॥
মহা আড়ম্বর কৈল হৈল বড় রব।
যজ্ঞেতে করিল দক্ষ মহামহোৎসব॥
সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কৈল সবাকার।
কোন খানে বাকি কেহ না রহিল আর॥
বিধি বিড়ম্বনে শিবে ভাবিয়া বিপক্ষ।
সবে মাত্র সতী শিবে না কহিল দক্ষ॥
নিমন্ত্রিত আগমন কৈলা যবে সর্ব্বে।
সবাকারে কৈল দক্ষ অতি মত গর্ব্বে॥
সতী শিব আমি না করিব নিমন্ত্রণ।
এই হেতু যদ্যপি না আইসে কোন জন॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড | ১৩১৫ সাল, পৌষ। | ৯ম সংখ্যা।

কাশ্মীরের পথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া আমার শরীরে আবার নব শক্তির আবির্ভাব হইল। তখন আমি দ্বিগুণ উৎসাহে সম্মুখের পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমরা পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া একটী নয়নারাম দৃশ্য দর্শন করিলাম। দূরতর এক অত্যুন্নত পর্ব্বতশিখরে শ্যাম জলধরসকল শৃঙ্গ আবৃত করিয়া বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। মধুমক্ষিকার পুষ্পচুম্বনের ন্যায়, খণ্ড খণ্ড বারিদমালা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্ব্বতচূড়াতে লাগিতেছে, কিন্তু আকাশের অপর দিকে কোথাও বিক্ষিপ্ত হইতেছে না। গ্রীষ্মাকাশের এক প্রান্তে এই শোভা দর্শন করিয়া মনে অত্যন্ত আনন্দের উদ্ভব হইল। ঐ পর্ব্বতের নাম বৈষ্ণবদেবীর পাহাড়। এতদঞ্চলের পর্ব্বতমালার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপরে বৈষ্ণবদেবী নামক এক মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

পার্ব্বতীয় প্রদেশে চলিতে হইলে সমতল পথ কোথাও পাওয়া যায় না; সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর নামা উঠা করিয়া চলিতে হয়। আমরা পর্ব্বত হইতে নামিয়া উক্তরূপ পথমধ্যে কাঁচাপিণ্ড নামক একটী চটী এবং একটী পার্ব্বতীয় নদী অতিক্রম করিয়া "সরালী" নামক চটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নদীটী স্বীয় গভীর কলেবর বিস্তার করিয়া মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার জল অতি স্বচ্ছ। সর্ব্বত্রই উপলখণ্ড জল ভেদ করিয়া উত্থিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমরা উহার উপর দিয়া নদী পার হইলাম। পাদুকা জল স্পর্শ করিল না।

অতঃপর আমরা ক্রমে ক্রমে বেস্তর বাগ হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী সরালী নামক চটীতে বেলা ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সরালীতে স্বর্গীয় রাজা রাম সিংহ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণীর প্রতিষ্ঠিত একটী ধর্ম্মশালা ও একটী পুষ্করিণী আছে। রাম সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান মহারাজ প্রতাপ সিংহ বাহাদুরের মধ্যম ভ্রাতা। ঐ ধর্ম্মশালার দ্বিতল গৃহে আমরা আশ্রয় লইলাম; এবং পুষ্করিণীর জলই স্নানপানের জন্য ব্যবহার করিলাম। জল অপরিষ্কার, সবুজ বর্ণ; পানের অযোগ্য। পড়াওতে (চটীতে) আসিয়া পৌঁছিলেই আর আমাকে আহারাদির জন্য চিন্তিত হইতে হইত না, কারণ জামাতের সাধুরাই খাদ্যাদি তৈয়ারীর যোগাড় করিত। অদ্য মধ্যাহ্নকালে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাল রুটী প্রস্তুত হইল। স্নান সন্ধ্যান্তে আমরা তাহাই ভোজন করিলাম। কিন্তু তীব্র গ্রীষ্মাতিশয্যে জলপান দ্বারাই উদর পূর্ণ

করিতে হইল, অধিক আহার করা গেল না। শীতল জলের অত্যন্ত অভাব বোধ হইতেছিল। ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধানকারী সাধু নূতন প্রক্রিয়া ক্রমে আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল দিয়াছিলেন। তিনি জলপূর্ণ কলসীর গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া উক্ত পুষ্করিণীর গভীরতম প্রদেশে ২।১ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। জল শীতল করিবার এইরূপ আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া আমাদের কাহারও জানা ছিল না। ধর্ম্মশালার চারিদিকে প্রশস্ত ময়দান, বায়ুর প্রতিবন্ধক কোনও দিকেই ছিল না। দিবাভাগে তীব্র গরম থাকিলেও সন্ধ্যাগমে ঐ স্থান শীতল হইয়াছিল। আমরা ধর্ম্মশালার উন্মুক্ত ছাদে স্ব স্ব আসন বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। সে রাত্রে আমাদের বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন গন্তব্য পথের দিকে দুই মাইলেরও উর্দ্ধ উচ্চ এক পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

২৪শে তারিখ রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ ২ ঘটিকার সময় আবার আমরা পর্ব্বতে চড়িতে আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বত গাত্রে পথ থাকিলেও অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পদস্খলনের আশঙ্কা হইতেছিল। অতিশয় সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ করিয়া চলিতে হইতেছিল। পদস্খলন হইলে কোথায় যে পর্ব্বততলে গিয়া পতিত হইতে হইবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। উক্ত পথে সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরও প্রাদুর্ভাব আছে। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইলে কি প্রকার শারীরিক বলের আবশ্যক, তাহা অনুমান করা যায় না। উচ্চে যত উত্থিত হওয়া যায়, তত দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কুকুরের মত শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে। ২০।২৫ ধাপ চলিয়া পাদক্ষেপের সামর্থ্য থাকে না। ৪।৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া তবে অগ্রসর হওয়া যায়। নতুবা শ্বাস প্রশ্বাসের আধিক্যে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার মত হয়।

পর্ব্বত আরোহণের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া শ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আমরা পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম। পর্ব্বতশিখরে অতি শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, আমরা এক উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া সমস্ত ক্লান্তি দূর করিলাম। আমার অত্যন্ত পিপাসা বোধও হইয়াছিল, পর্ব্বতোপরি কোথাও জল ছিল না। কিন্তু স্নিগ্ধ বায়ু সেবনে সমস্ত কষ্টের উপশম হইয়া গেল। পার্ব্বতীয় শোভা অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তথাপি আমরা এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। এই চড়ায়ের নাম খাড়াধার; বাস্তবিকই ইহা অতিশয় খাড়া চড়াই।

পর্ব্বতের অপর দিকে আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর নিম্নে আসিয়া একটী শীতল জলের ঝরণা পাইলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করিয়া জলপান করিলাম। নামিতে বিশেষ কষ্ট ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে—সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বেই আমরা পর্ব্বত হইতে নামিয়া পড়িলাম। এই খানে জম্বু হইতে উদমপুর পর্য্যন্ত শকটাদি চলাচলের যে পথ আছে, তাহা পাইলাম। ঐ পথ অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আমরা যে পথে আসিলাম, তাহা সোজা পথ। উক্ত পথে কিছুদূর চলিয়া একটী নদী পার হইয়া, আমরা অপর একটি সোজা রাস্তায় উদমপুর গিয়াছিলাম।

আমরা এক্ষণে যে প্রদেশ দিয়া চলিতেছি, উহা উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তর মধ্যেই একটী পথ। ঐ পথ দিয়া বণিক্‌গণ ভারবাহী বলীবর্দ্দ, ঘোটক, উষ্ট্র প্রভৃতি লইয়া দলে দলে সারি সারি যাতায়াত করিতেছে। উহাদের

গলঘণ্টার উচ্চ ধ্বনিতে দিক্ নিনাদিত হইতেছিল। এই সকল জন্তুর সাহায্যে এতদ্দেশীয় বণিক্‌গণ পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিয়া থাকে।

প্রান্তর মধ্য হইতে অনুন্নত পর্ব্বতোপরি বিস্তৃত উদমপুর সহর দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। উদমপুরের পরবর্ত্তী ক্রমোচ্চ পর্ব্বতমালা একের পর আর অগণিত শিখর উন্নত করিয়া যেন আকাশ চুম্বন করিয়া রহিয়াছে। উহাদের ক্রমসন্নিবেশ দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। মেঘাকার পর্ব্বতশ্রেণী নিম্নতর উচ্চতরের হৃদয় আলিঙ্গন করিয়া বাৎসল্য ভাবে এবং সমুন্নত শৃঙ্গগণ পরস্পর সন্নিবিষ্ট থাকিয়া সখ্যভাবে কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া শোভা পাইতেছিল। উহা দেখিয়া বিশাল নগরাজেরই প্রধান নগর বলিয়া অনুমান হইতেছিল। আমরা এই সমস্ত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বেলা প্রায় ৯টার সময় উদমপুর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে অনেকগুলি শীতল জলের ঝরণা পাইয়াছিলাম। সরালী হইতে উদমপুর ১২।১৩ মাইল দূর।

উদমপুর আসিয়া আমরা নারায়ণ চৈতন্য ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আশ্রয় লইলাম। ইনি মহান্তজীর পূর্ব্ব পরিচিত। আশ্রমের নিম্নেই অপ্রশস্ত ক্ষুদ্রকায়া দেবকী নামক একটী নদী আছে। উহা প্রায় বার মাসই শুষ্ক থাকে। নদীগর্ভে ২।৩ হস্ত গভীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর কূপ আছে। কূপগুলি তল হইতে উপর পর্য্যন্ত প্রস্তরমণ্ডিত। উহা হইতে জলধারা বহির্গত হইয়া ক্ষীণ ধারায় সর্ব্বদাই নদীগর্ভে প্রবাহিত হয়। কখনও কখনও বৃষ্টি হইলে নদী প্লাবিত হয়। কূপের জল পরিষ্কার ও শীতল।

উদমপুর সহর দেবকী নদী হইতে প্রায় ৩০০।৪০০ ফিট উচ্চ হইবে। সহরের কোথাও জল পাওয়া যায় না। সমস্ত অধিবাসীকেই নদীগর্ভস্থ কূপের জল স্নান পান ও ভোজনের জন্য ব্যবহার করিতে হয়। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি ইতর, সকল প্রকার স্ত্রীলোকই প্রত্যহ দুই বেলা কূপ হইতে জল লইয়া যায়। শিরোপরি ছোট বড় ২।৩টা ও কক্ষে একটী পাত্র লইয়া শত শত বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা জল লইয়া সারি সারি সিঁড়ি পথে সহরে আরোহণ করে, এবং নামিতে থাকে। ইহা একটী বড়ই মনোরম দৃশ্য। সহর হইতে নদীগর্ভে উঠিবার ও নামিবার অনেকগুলি সোপান আছে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা অতিশয় কম।

সহরের নিম্নে নদীতীরে অনেকগুলি প্রাচীন দেবমন্দির আছে; উহা সংস্কার অভাবে ভগ্নদশায় পরিণত হইতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে কাশীতুল্য এবং দেবকী নদীকে গঙ্গার সমান তীর্থ বলিয়া শ্রদ্ধা করে। এই স্থানের নিম্নেই একটী শ্মশান আছে; উহাতেই সমস্ত নগরের মৃতদেহ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আমাদের জামাতের মহান্তজীর কার্য্যবশতঃ উদমপুরে আমাদিগকে তিন দিন থাকিতে হইয়াছিল। আমাদের আহারাদি নারায়ণ চৈতন্যের আশ্রমেই হইত। সুযোগ মত আমরা সহর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাদৃশ দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। সহর মধ্যে কোথাও ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইলাম না; সমস্তই মাটী ও কাঠের ঘর। সহরের বিস্তৃতি বহুদূর। এখানকার লোক সংখ্যা দ্বাবিংশ সহস্রের কম হইবে না। ইহা জম্বু ষ্টেটের একটী জেলা। এখানে মহারাজের আদালত আছে। এই আদালতে একজন বাঙ্গালী বিচারক (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অল্পক্ষণ

আলাপ হইয়াছিল। তাহাতে জানিলাম, এই স্থানে সামান্য "জর জাড়ি" ছাড়া অন্য কোনও ব্যায়ামের প্রকোপ হয় না। স্বাস্থ্য বরাবর ভাল থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীর উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য পাওয়া অতি দুষ্কর। শীত কালে শীত অধিক হয়। সহুরে অত্যন্ত জলকষ্ট। উক্ত বাঙ্গালী মহাশয় আমাকে সযত্নে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

২৬শে আষাঢ় মধ্যাহ্নে আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা উদমপুর হইতে যাত্রা করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে তিন দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, পথ চলিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু আমাদের গমনের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘমুক্ত প্রখর সূর্য্যোত্তাপ কষ্ট দিতে লাগিল।

উদমপুর হইতে কিছুদূর গমনের পরেই বেখুরবাগে পরিত্যক্ত তাওই নদী পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ দিয়া তাওই নদী কলকলনাদে খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কত কত নির্ঝরিণী যে ঝর ঝর শব্দে পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া নদীতে মিলিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাওই নদীর উভয় তীরে অত্যুন্নত বিশালকায় পর্ব্বতমালা হরিদ্বর্ণের গুল্ম বৃক্ষে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রের নিম্নপ্রদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পার্ব্বতীয়দিগের দুই এক খানি কুটীর দূরে দূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কুটীর সকলের অবস্থান দেখিলে মনে হয় কি উপায়ে তাহারা যাতায়াত করে। যেন কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। কুটিরগুলি দেখিলে যোগীদিগের শান্তি আশ্রম বলিয়া অনুমান হয়।

নদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশস্থ বক্রপথে আমরা চলিয়াছি। পথের বক্রতা এত বেশী যে, যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ৩।৪ মাইল পথ চলিবার পর পুনরায় সেই পরিত্যক্ত স্থানের ৩।৪ রশি ব্যবধানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। এমন কি সেই দুই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করা যায়। এই প্রদেশে আর শুষ্কতা-জনিত কষ্ট হয় নাই, কারণ সর্ব্বত্রই পর্ব্বত-গাত্রে ঝরণা প্রবাহিত ছিল।

ভ্রমণ করিতে করিতে আমি যখন যে প্রদেশে উপস্থিত হই, তখন সেই প্রদেশের কোনও না কোনও স্বাভাবিক ভাবে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। আমি দেখিলাম, নগর গ্রাম পল্লীতে বাস করিয়া যে সকল সুখ অনুভব করিয়া থাকি, এই পার্ব্বতীয় কুটীরবাসীদের মধ্যে বোধ হয় তাহার কিছুই নাই। তাহারা কি সুখে এই অরণ্যমধ্যস্থ কুটীরে বাস করে? কেন ইহারা এই কষ্টকর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া সহরে যায় না? তবে কি উহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার অনুভূতি নাই? কিন্তু তাহা নহে; তাহাদের স্বভাবের উপর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় উল্লাসের সহিত আপন আপন আবাস-কুটীরে আগমন করিয়া থাকে, এবং সেই বিজন বন্য কুটীর ত্যাগ করিয়া আবশ্যক কর্ম্মের জন্য অন্যত্র যাইতে অত্যন্ত অসুখ বোধ করে।

এই ভাব যে এতদ্দেশেই আবদ্ধ, তাহা নহে। প্রত্যক্ষই দেখা গিয়াছে, শুষ্কময় মরু প্রান্তরে, বিজন অরণ্য মধ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-শিখরে, অর্ণব-বেষ্টিত দ্বীপ মধ্যে, যাহার যেখানে আবাসভূমি, তাহাই তাহার গরীয়ান্ সুখকর ও অতিপ্রিয়; অপর স্থানে সুখস্বচ্ছন্দতার আকর থাকিলেও স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কোথাও সে যাইতে প্রস্তুত হয় না। এমন কি সে কোনও প্রদেশাগত ধনশালী সুখীকে দেখিলেও প্রবাসী বলিয়া তাহাকে অসুখী মনে করে। আমাদের গমনপথের উভয়পার্শ্বস্থ দুই এক খানি কুটীরবাসী মনুষ্যের উপেক্ষাপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদিগের উপর পড়িয়াছিল।

আমার চিন্তার পরিবর্ত্তন হইল। আমি ভাবিলাম, স্ব স্ব স্বদেশ-ভাব পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। উহার কোথাও প্রভেদ নাই। জন্মভূমির স্নেহপূর্ণ ভাব ব্যষ্টিরূপে থাকিয়া সমষ্টিরূপে পৃথিবীতে অসীমত্ব লাভ করিয়াছে। তখন মনে হইল, এক বিশ্বনিয়ন্তারই এই জগৎ; তাঁহারই এই বিশ্বসৃষ্টি; বিশ্বপ্রেমিকের হৃদয়েই সেই ভাবের বা প্রেমের বিকাশ হয়। এই চিন্তায় আমার চিত্ত বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না, অন্তরে বিশ্বপতির উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। সমস্ত বিশ্বই আমার স্বদেশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ভ্রমণ বিষয়ে বর্ণনা করিতে গিয়া আমার ক্ষুদ্র চিন্তা অন্যভাবে ধাবিত হইয়াছে। যাহা হউক, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অতিশয় পরিশ্রান্ত দেহে আমরা চানেনী নামক পড়াওতে (চটীতে) আসিলাম। পথমধ্যে চানেনীরাজের উচ্চ প্রাসাদ বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। উহা দ্বারা আমাদের পথের দূরত্ব জানিতে পারা যাইতেছিল। তাওই নদীর পরপারে আমরা কাশ্মীররাজের একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র দুর্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহা কাশ্মীররাজের এক সময়ের পরাক্রমের নিদর্শন দিতেছিল।

আতপ তাপে ও পথশ্রমে এই দিন আমি পরাওতে আসিয়া যার পর নাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন কি আমার কথা বলিবার সামর্থ্য ছিল না। এই পড়াওতে কতকগুলি ঝরণা ছিল; তন্মধ্যে একটী ঝরণা কিছু উচ্চ হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী কুণ্ডে পতিত হইতেছিল, উহার জল অতি শীতল। ইহার নিকটে উপবেশন করিয়া ও মহান্তজীর স্বহস্তে সযত্নে প্রস্তুত সরবৎ পান করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সুস্থ হইলাম। চানেনী পড়াও উদমপুর হইতে ১৫ মাইলের অধিক হইবে। চানেনী কাশ্মীর মহারাজের অধীন, একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ী রাজ্যের রাজধানী। এই চানেনী রাজবংশ বহু পুরাকাল হইতেই বিদ্যমান আছে। প্রবাদ আছে, এই রাজবংশে পার্ব্বতীদেবীর জন্ম হইয়াছিল। এখনও সেই জন্মস্থানে বৎসরান্তে একবার করিয়া মেলা হইয়া থাকে। উহা এতদ্দেশে তীর্থ বলিয়া খ্যাত। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীররাজবংশের কন্যাদির বিবাহ হয়। বর্ত্তমান চানেনীরাজের সহিত স্বর্গীয় রাজা রামসিংহের কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

রাত্রিবাসের জন্য আমরা এক মুদির দোকানের বারাণ্ডায় আশ্রয় লইলাম। অতি সঙ্কীর্ণ স্থান, কোনও প্রকারে সকলের সঙ্কুলান হইল। সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সমস্ত রাত্রি অল্প অল্প বৃষ্টি হইল, এজন্য শীত বোধ হওয়ায় এক নিদ্রাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পূর্ব্ব দিনের শারীরিক দুর্ব্বলতা আর নাই, আবার পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছি। মনে হইল, নিদ্রাদেবীর কি অমৃতময়ী শক্তি, তাঁহার ক্রোড়ে একবার শয়ন করিয়াই সমস্ত পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।

বৃষ্টি হওয়ায় পর্ব্বতগাত্রের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল, চলিবার উপায় ছিল না। এই হেতু প্রত্যূষে আমাদের চলা বন্ধ হইল। জলযোগোপযোগী রুটী প্রস্তুত পূর্ব্বক আমরা সামান্য আহার করিয়া বেলা প্রায় ৯।১০ টার সময় পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। অদ্য আমাদিগকে

একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে, এই পর্ব্বত চড়াইয়ের নাম পত্নীতলাওয়ের চড়াই। উহা চানেনী হইতে ক্রমোন্নত। এইরূপ ক্রমোন্নত ৬ মাইলের পর ২৷৷০ মাইল অতি খাড়া চড়াই অতিক্রম করিতে হয়।

চানেনীর এই পার্ব্বতীয় প্রদেশ বেশ উর্ব্বর বলিয়াই বোধ হইল। পর্ব্বতসকলের পাদ হইতে শিখর পর্য্যন্ত থাক্ থাক্ করিয়া কাটিয়া পার্ব্বতীয়েরা আপন আপন কর্ষণোপযোগী জমি প্রস্তুত করিয়াছে। উহাতে তৎকালোচিত ধান্য ও অপর শস্যাদি হরিৎ বর্ণে সুন্দর শোভা পাইতেছিল। এতৎ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের উপযোগী জলেরও অভাব নাই।

আমরা ৬ মাইল চলিয়া পত্নীতলাও চড়ায়ের পাদমূলে আসিলাম। যত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া খাড়া চড়ায়ে আরোহণ করিতে হয়, তাহা সহ্য করিয়া আমরা পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলাম। যতই আমরা শিখর সমীপস্থ হইলাম, ততই অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। নিম্নতর ভূমির শোভা অতিশয় চিত্তমুগ্ধকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কত কত ধূমাকার মেঘখণ্ড আমাদিগকে আবৃত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল; তাহাতে আমাদের গাত্রবস্ত্রাদি অল্প অল্প সিক্ত হইতেছিল। সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে আসিয়া দেখিলাম, আমরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্ব্বতশিখরে আসিয়াছি। এতদ্দেশীয় পর্ব্বতশৃঙ্গসকল দেবদারু চীর ইত্যাদি বৃক্ষ দ্বারা পরিশোভিত। মেঘমালা অতি দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের নিম্নে অবস্থিত পর্ব্বতে মেঘ গর্জ্জন হইতেছে ও বিদ্যুত খেলিতেছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বারিদদল কখনও পর্ব্বতশৃঙ্গ আবৃত করিয়া অধিত্যকাভূমি খালি রাখিতেছে, কখনও শৃঙ্গ উন্মুক্ত রাখিয়া অধিত্যকা আবৃত করিতেছে। যাহা ক্ষণমুহূর্ত্তে নীচে দেখিলাম, তাহাই উপরে এবং যাহা উপরে ছিল, তাহা আবার নীচে আসিতেছে। শিখর হইতে শিখরান্তরে, অধিত্যকা হইতে অধিত্যকান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, জলধর সমূহ অবিরাম বিচরণ করিতেছে। যে দিকে একখণ্ড গমন করিতেছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শত শত খণ্ড ধাবিত হইতেছে। ঈদৃশ বারিদ-ক্রীড়া কীদৃশ সুন্দর-দর্শন ও আনন্দপ্রদ, তাহা বর্ণনাতীত। একাগ্রমনে দর্শন করিলে মনে হয়, যেন উহাদের জীবনীশক্তি আছে, এবং বালকরূপে পর্ব্বতশৃঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে।

পত্নীতলাওয়ের শেষ উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অপর দিকে একখানা দোকান ছিল। সেইখানে আমরা বিশ্রাম করিলাম। এইখানে অত্যন্ত শীত, সুতরাং আমাদের শ্রান্তি দূর করিতে আর অধিক সময় লাগিল না। দোকানে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় এবং উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়, সেজন্য দোকানদারের খ্যাতি আছে। পথিকেরা সকলেই এই দোকান হইতে কিছু না কিছু কিনিয়া খায়। আমরা দুগ্ধ পান করিলাম ও এক প্রকার ঘাসের আচার খাইলাম। উহা বেশ সুস্বাদু।

আমরা পত্নীতলাও হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই মাইল নীচে একটী চটীতে আসিলাম। এই চটী হইতে বটোতী গ্রাম দুই মাইল; এখান হইতে এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের মধ্যস্থ বটোতী গ্রাম বর্দ্ধিষ্ণু। এখানে জম্মু ষ্টেটের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস আছে। এবং অপর লোকেরও থাকিবার ২।৪ খানা বেশ ভাল বাঙ্গালা আছে। নাতিশীতোষ্ণ বটোতী গ্রাম বেশ উত্তম স্থান। অপরাহ্ণকালে চানেনী হইতে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে বটোতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন ঘর বাড়ী গোস্মাইএর বাড়ীতে আমরা আশ্রয় লইলাম। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী দশ নাম (তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী, ভারতী, সাগর, বন, পর্ব্বত, অরণ্য, গিরি, পুরী) সন্ন্যাসিগণ গোস্মাই নামে অভিহিত। উহাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা "ঘর বাড়ী গোস্মাই" নামে পরিচিত। আমাদের স্নান ভোজনে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। বটোতীতে খাদ্যদ্রব্যের দোকান অনেক আছে। অদ্য ২৭শে আষাঢ় শেষ হইল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বদিন যে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, সকালেও তাহার বিরাম হয় নাই।

কুজ্ঝটিকার মত সমস্ত পাহাড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। পথের অল্প দূরেও কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না; মধ্যে মধ্যে খুব জোরে বৃষ্টি হইয়া যাইতেছিল। ছাতা থাকিলেও আমাদের গাত্রবস্ত্র সিক্ত হইতেছিল; পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও কর্দ্দমযুক্ত। এইরূপ অবস্থায় উক্ত দুর্গম পথে ক্রমনিম্নভাবে ৩।৪ মাইল আসিবার পর বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় জলধরসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আমরাও মেঘের নীচে নামিয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রী——

সংস্কৃত-সাহিত্যে গীতার স্থান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভাবদ্বন্দ্বে সঙ্ক্ষোভিত হইয়া অর্জ্জুনের চিত্ত যখন বিষম দোলায়মান, সেই সময়েই তাঁহাকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যুদ্ধব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে পরোক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। অর্জ্জুনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু অর্জ্জুন যে স্নেহ ও ভক্তিভরে বিকলচিত্ত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য লঙ্ঘন দ্বারা পাপের প্রাধান্য বিস্তারে প্রশ্রয় প্রদান করতঃ নিজ আত্মাকে কলুষিত করিবে, ধর্ম্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহা একান্তই অসহ্য ও অসঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনও সেই পথের অনুসরণ করিলেন। উভয়েই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন এ কর্ত্তব্য সাধনের পরিণাম ভীষণ ভয়াবহ হইবে, হইয়াছিলও তাহাই। কুরুকুল মাত্রই তাহাতে নির্ম্মূল নহে, ধরিত্রী এ যুদ্ধাবসানে একেবারে বীরশূন্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যুদ্ধই যখন তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলেন, তখন পরিণাম ভীষণতার আশঙ্কা স্বত্বেও তাঁহারা চরমে নিজ নিজ আত্মার মঙ্গলের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন উদ্দেশে সে পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গীতার উহাই মূল মর্ম্ম। উক্ত মূল সত্যের সরল সমাধান কল্পে গীতার মধ্যে বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা আছে। গৌণ সত্য বলিয়া সেগুলিকে

গণ্য করা যাইতে পারে। হউক তাহারা গৌণ, তাহাদের প্রভাবও নিতান্ত সামান্য নহে। তাহারাও এক একটা জলন্ত সত্য স্থানীয়। যেরূপেই হউক, নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও প্রত্যেকে স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ত্তব্য পালন করিবে। তাহা যতই কঠোর হউক না প্রত্যেককেই তাহার সহজাত ধর্ম্মে চির আস্থাবান্ থাকিতে হইবে, ইহাই গীতার শিক্ষা, ইহাই গীতার অমূল্য উপদেশ। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছেন ;—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"
৩য় অঃ। ৩৫ শ্লোক।

পূর্ণ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে,
স-দোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ জগতে,
মৃত্যুও মঙ্গল নিজ ধর্ম্মমতে,
পরধর্ম্মে পার্থ বিষম ভয় ॥ ৩৫

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ ; পরধর্ম্মে প্রচুর ভয় বর্ত্তমান, অতএব স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুর বশবর্ত্তী হওয়াও শ্রেয়স্কর। পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত ধর্ম্ম অর্থে যদি "কর্ত্তব্য কার্য্য" বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপেও করা যাইতে পারে।

"অন্যের সম্পাদিত কর্ত্তব্য অপেক্ষা নিজের সদোষ কর্ত্তব্যও শ্রেষ্ঠ, নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া মৃত্যু স্বীকারও শ্লাঘার বিষয়। প্রত্যুত অন্যের কর্ত্তব্য যারপর নাই বিপদ্ সঙ্কুল।"—(বেশান্তের অনুবাদ)

জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রাগুক্ত উভয় ব্যাখ্যাই সঙ্গত। কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে অর্জ্জুনের হৃদয়ে যে তীব্র সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধারাবাহিকরূপে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

১। গীতার প্রথম অধ্যায়ে "বিষাদযোগ" ধেয় অর্জ্জুন-চিত্তের অবসাদ ভাব বর্ণনা। তাহাতে প্রথমেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। উভয় বাহিনীর মধ্যস্থ রথাসীন অর্জ্জুন নিজের মনোভাব সম্বন্ধে সখা ও সারথী কৃষ্ণকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ঐ চিত্রে প্রকটিত। তাহার ভাষা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই সরল। সাধারণ মানুষ সে অবস্থায় যে সরল ও স্বাভাবিক ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে, অর্জ্জুনও তদনুরূপ ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঠিক বালজনোচিত ভাষায় ও ভাবে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

"দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥
১ম অঃ—২৮—৩০।

এ স্বজন গণে হে বৃষ্ণিনন্দন,
যুদ্ধার্থ আগত করি দরশন,
হতেছে বিশুষ্ক আমার বদন,
অঙ্গও নহেক আমার বশ ॥ ২৮
হ'তেছে আমার এদেহ কম্পিত,
আতঙ্ক আবেশে দেহ রোমাঞ্চিত,
কর হ'তে মোর গাণ্ডীব স্খলিত,
দেহের দহন হ'তেছে আর ॥ ২৯
না পারি বসিতে আর জনার্দ্দন!
হ'য়েছে উদ্ভ্রান্ত প্রায় মোর মন,
অতি বিপরীত যে সব লক্ষণ,
তাহাই নয়নে পড়ে আমার ॥ ৩০

"বিপরীত দুর্নিমিত্ত রাজি আমি দেখিতেছি

এই বাক্যে অর্জ্জুন তাঁহার তাৎকালিক মানসিক উত্তেজনা ও দৈন্যভাবের কেমন সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিলেন। এই কথার পরই উপস্থিত যুদ্ধে পরিণামে জয় লাভই যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেই বা কি ইষ্টলাভ হইবে? অপেক্ষাকৃত দার্শনিকতা ভাবপূর্ণ ও মহোচ্চভাবব্যঞ্জক ভাষায় অর্জ্জুন তাহা বলিতেছেন—

"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং
সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ-
র্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ
সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতা-
মহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যা-
জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

সংহারি' সমরে এ স্বজনগণ,
শ্রেয়ঃ কিছু নাহি করি' দরশন,
বিজয় বাসনা না মোর মনন,
কিম্বা রাজ্য সুখ(ও) কিছু না চাই ॥ ৩১
রাজ্যে আমাদের কিবা প্রয়োজন?
কিসেরই বা তরে ভোগ ও জীবন,
রাজ্য, ভোগ, সুখ যাঁদের কারণ,
হেথায় তাঁদের দেখিতে পাই ॥ ৩২
(যখন)
আচার্য্য প্রভৃতি নিজ জনগণ
ধন-প্রাণ ত্যাগে হে মধুসূদন,
করিয়া সঙ্কল্প যুদ্ধের কারণ
অবস্থিত এই রণ-প্রাঙ্গণে,
বধিলেও এঁরা আমায় তখন,
আমি ইহাঁদিগে করিব হনন
এ আশা দূরেতে থাকুক এখন
ইচ্ছাও তাহার করি না মনে ॥ ৩৩-৩৪
ধরিত্রী ত দূরে থাক্ জনার্দ্দন!
যদি এ ত্রৈলোক্য রাজ্যের কারণ
হয় সংহারিতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
কিবা হবে সুখ মোদের তা'য় ॥ ৩৫

অনন্তর আত্মীয়-স্বজন বিনাশে যে পাপেরই সঞ্চার, যুক্তি সহকারে অর্জ্জুন এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যদিও অর্জ্জুনের স্বজনবর্গ মোহাভিভূত হইয়া কুলের বিনাশ ও বন্ধুবর্গের প্রতি শত্রুতায় কোনরূপ পাপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু অর্জ্জুন তাহা দিব্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলের বিনাশ যাহারা ভীষণ পাপাবহ বলিয়া মনে করে, বিপক্ষ পক্ষের তদ্বিষয়ে অজ্ঞতায় তাহাদের সে পাপ তিল মাত্র খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় না। অর্জ্জুনের সহজ বুদ্ধিতে যে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলিয়া প্রতিভাত, তিনি তাহারই অবতারণা করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের আশু পরিণাম কুলক্ষয় ও তজ্জনিত মহা অধর্ম্ম ও পাতক সঞ্চার। অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

"যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভি র্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক-
ক্রিয়াঃ ॥ ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ
শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

"যদিও ইহারা লোভ নিবন্ধন
হতচেতা হ'য়ে হে বৃষ্ণিনন্দন!
নারিছে করিতে ধারণা এখন
মিত্রদ্রোহে আর ক্ষয়ের* পাপ ॥ ৩৭ ॥
কিন্তু বল বল ওহে জনার্দ্দন!
কুলক্ষয়-জাত দোষের দর্শন
করিয়াও আজ মোরা কি কারণ
হ'ব না বিরত হ'তে এ পাপ! ॥ ৩৮
কুলক্ষয় যদি হয় জনার্দ্দন!
নষ্ট হয় কুল-ধর্ম্ম-সনাতন
অবশিষ্ট কুল তাহার কারণ
অচিরে অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হয় ॥ ৩৯
হইলে বার্ষ্ণেয়! অধর্ম্ম প্রবল
হয় দ্বিচারিণী পুরস্ত্রী সকল,
স্বেচ্ছাচারা যদি হয় নারীদল
বর্ণ-সঙ্করের উদ্ভব হয় ॥ ৪০
বর্ণ-সঙ্করেরা জন্মিলে ধরায়
কুল কুলনাশী নরকেতে যায়,
অনন্তর পিতৃলোক সমুদয়
পিণ্ডোদক লোপে পতিত হ'য় ॥ ৪১
তা'দের সাঙ্কর্য্য দোষেতে কেশব
সনাতন কুল জাতি ধর্ম্ম সব
হ'বে যে উৎসন্ন নহে অসম্ভব
বলেছেন ইহা পণ্ডিতগণ ॥ ৪২
করেছি আমরা এ কথা শ্রবণ
নষ্ট-কুলধর্ম্ম যেই জনগণ
করয়ে বসতি তা'রা অনুক্ষণ
ভীষণ নরকে বিষাদমতি ॥ ৪৩

যুক্তির অবতারণায় এবংবিধ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অর্জ্জুন অকস্মাৎ সখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"স্বজন বধ-রূপ গুরুতর পাপে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হস্তে নিধন লাভ করিতে বরংচ প্রস্তুত আছি, এবং তাহাই আমার পক্ষে পরম মঙ্গলজনক" এই কথা বলিয়াই—হস্তের গাণ্ডীব দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুরন্ত শোক-সংবিগ্ন মানসে অর্জ্জুন রথোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের ইহাই স্থূলমর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় মোহভাব অপসারণ মানসে শ্রীকৃষ্ণ বীরোচিত অথচ একটু তিরস্কার ভাবে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

"হে অর্জ্জুন! এই অনার্য্য-সেবিত
অধর্ম্ম্য আর সে, অকীর্ত্তি পূরিত—
মোহ কোথা হতে হ'ল উপস্থিত
তোমাতে এ ঘোর সঙ্কট কালে ॥ ২
"হ'ওনা কাতর হে কুন্তিকুমার!
উপযুক্ত ইহা নহেক তোমার
উঠ পরন্তপ! বচনে আমার—
তাজিয়া হৃদয় দৌর্ব্বল্য-জালে ॥ ৩

ক্ষত্রিয় বীরের যোগ্য কথাই বটে। আর্য্য ক্ষত্রিয়ের চিত্তকে স্বধর্ম্মবিহিত কর্ত্তব্য পালনে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে ঐ কয়টি মর্ম্মস্পর্শী মৃদু তিরস্কার বাক্যই যথেষ্ট। অর্জ্জুনের মোহভাবের অযশস্করত্ব এবং তাহার শোচনীয় পরিণাম আভাসের উহা কি সুন্দর উক্তে-জনাময় জীবন্ত চিত্র!!

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণের উক্ত তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু বাক্যবাণ অর্জ্জুনের চিত্তকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না—অর্জ্জুনের মোহবিকল চঞ্চল চিত্তের কাছে উহা ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি তখন আবার অধিকতর করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন :—

"কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ, মধুসূদন
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং
ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্
রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

"বল বল মোরে হে মধুসূদন!
ভীষ্ম দ্রোণ সম পূজার্হ এমন—
গুরুজন প্রতি বাণ বরষণ
আজি এ সমরে করি' কি ক'রে? ॥ ৪
গুরু হত্যা হ'তে এমর ভুবনে
ভিক্ষাবৃত্তি আমি শ্রেয়ঃ বুঝি মনে
বধিলেও অর্থ কাম গুরুগণে
রুধিরাক্ত ভোগ্য ভুঞ্জিতে হ'বে ॥ ৫

আত্ম সংবরণে অসমর্থ হইয়া মোহাবেশে ঐ কথাগুলি বলিয়াই, অর্জ্জুন যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন—হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশেষ নম্রতা সহকারে নিজের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে—উপস্থিত যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়া বলিলেন :—

"নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম
যদি বা নো জয়েয়ুঃ
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ
প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম
সংমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং
শাধি মাং ত্বং প্রপন্নম্ ॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছো-
ষণমিন্দ্রিয়াণাম্
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্য সুরাণামপি
চাধিপত্যম্ ॥ ৮

"কিবা শ্রেয়ঃ তাহা বুঝিতে না পারি,
জয় পরাজয় যা হো'ক মুরারি।
চাহিনা বাঁচিতে যা'দিগে সংহারি'
ধার্ত্তরাষ্ট্র সেই সম্মুখে সবে ॥ ৬
"দৈন্য-উপহত ধর্ম্ম মূঢ়মন—
হইয়া তোমায় সুধাই এখন
কহ কিবা মোর মঙ্গল সাধন?
শিষ্য আমি তব প্রপন্ন আর ॥ ৭
নিঃশত্রু সমৃদ্ধ রাজ্য এ ধরায়
পেলেও প্রভুত্ব কিংবা অমরায়
ইন্দ্রিয়-শোষক শোক দূর যায়
না পাই দেখিতে উপায় তার ॥ ৮

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াই বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, আর আমি যুদ্ধ করিব না।" নিজ মনোভাবের অনুকূলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যে কথাগুলি শুনাইয়া ছিলেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের ন্যায্যতা সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া যে উপদেশ তিনি দিয়া আসিলেন, অভিপ্রেত সিদ্ধির পক্ষে তাহা আদৌ সফলতা-প্রসূ হয় নাই। তিনি বুঝিলেন মোহমুক্ত হইয়া অর্জ্জুন যাহাতে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন, অধুনা অপেক্ষাকৃত সেই সুগম উপদেশেরই বিশেষ প্রয়োজন। এইবার শ্রীকৃষ্ণকে অবিনশ্বর আত্মার সহিত ধ্বংসশীল দেহের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া জীবন মরণের জটিলতাপূর্ণ মহাতত্ত্বের সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ করিলেন। যথা :—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি
পণ্ডিতাঃ ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ

* কুলক্ষয়ের।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব
ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব
ভারত ॥ ১৮

"অশোচ্য বিষয়ে তুমি শোকান্বিত
কথাগুলি কিন্তু জ্ঞানী জনোচিত
পণ্ডিতেরা পার্থ! মৃত কি জীবিত
না করেন শোক কাহার(ও) তরে" ॥ ১১
"তুমি আমি আর এ ভূপালগণ
না ছিলাম আগে নহেক এমন
পরেও র'বনা নহে হে এমন
আগেও ছিলাম র'বও পরে" ॥ ১২
"দেহী যথা দেহে কৌমার যৌবন—
জরাপ্রাপ্ত হয় হে কুন্তিনন্দন!
দেহান্তর প্রাপ্তি জীবের(ও) তেমন
দেহনাশে ধীর মুগ্ধ না তাই" ॥ ১৩
"ইন্দ্রিয়-সংযোগে পার্থিব-বিষয়
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখপ্রদ হয়,
জন্ম নাশ শীল সে সব বিষয়
অনিত্য বুঝিয়া সহিবে তাই" ॥ ১৪
"ও সব সম্বন্ধ হে পুরুষবর!
নারে দিতে ব্যথা যা'রে নিরন্তর
সম সুখ দুঃখ সেই ধীর নর
মুক্তিপাত্র শেষে অনাসে হন ॥ ১৫

"নাহি অসতের অস্তিত্ব ধরায়
অভাবের দশা সৎ নাহি পায়
উভয় ভাবের তত্ত্ব সমুদায়—
ক'রেছেন স্থির তত্ত্বজ্ঞগণ ॥ ১৬
"ব্যাপি এই বিশ্ব বিরাজে যে জন
"অবিনাশী তিনি জেনো অনুক্ষণ
জন্মনাশ হীন যিনি হে এমন
বধিতে তাঁহারে পারে কি লোক ॥ ১৭।
"দেহী এ জীবের দেহ স্বভাবতঃ
অন্ত সমন্বিত জানিও ভারত!
অতএব তুমি হও যুদ্ধে রত
ত্যজিয়া দেহের বিষয়ে শোক ॥ ১৮

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মমত পরিপোষণ মানসে অপেক্ষাকৃত গাঢ় যুক্তির অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন
হন্যতে" ॥ ১৯
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা
ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি
নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়
মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫

"হন্তা মনে করে যে জন আত্মায়
কিংবা যে নিহত ভাবয়ে তাঁহায়
উভয়েই তারা অজ্ঞ এ ধরায়
নাহি হ'ন ইনি হন্তা বা হত ॥ ১৯
"জন্ম কিংবা মৃত্যু নাহিক আত্মার
জাত বা বর্দ্ধিত না' হ'ন আবার
শাশ্বত পুরাণ অজ নিত্য আর
দেহের নাশেতে না হ'ন হত ॥ ২০
যে জন ইহাকে অজ ও শাশ্বত
নিত্য অবিনাশী ব'লে অবগত
না নাশেন তিনি কা'কেও ভারত!
কিংবা কাহা হ'তে হত না হ'ন ॥ ২১
"ত্যজি জীর্ণবাস যথা ভবে নর
পরে নব বাস—হে কুরুপ্রবর!
ত্যজিয়া তেমতি জীর্ণ কলেবর
নবদেহ আত্মা করে ধারণ ॥ ২২
"শস্ত্র এঁরে নারে করিতে ছেদন
অনলেও এঁর না হয় দহন,
সলিলেও ইনি ক্লিন্ন নাহি হ'ন
অনিল(ও) ইহাঁয় শোষিতে নারে ॥ ২৩
"এই জীবাত্মার হে কুন্তিনন্দন!
নাহিক দহন ছেদন শোষণ
সর্ব্বগত ইনি স্থাণু সনাতন
অচল অক্লেদ্য জানিবে তাঁরে ॥ ২৪
"অচিন্ত্য অব্যক্ত এ আত্মা ভারত!
নির্ব্বিকার ভাব ইনি অবিরত
অতএব এঁকে বুঝিয়া এমত
শোক ত্যাগ তব কর্ত্তব্য এবে ॥ ২৫

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ মর্ম্মস্পর্শী কবিত্বের ভাষায় আত্মার অবিনশ্বরত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। বিষয়টি যে অতি জটিল ও গুরুতর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণের পক্ষে আত্মার এ তত্ত্ব বিষম দুষ্ফুট ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু এ বিষয়ে গীতাকারের উদ্দেশ্য ও মনোভাব অতি সহজ, অতি স্পষ্ট ও অতি সরল। গীতাকারের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যাঁহারা সরল মনে গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে গীতাকার দেহ ও আত্মার পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিয়া যে সমস্ত দুষ্ফুট ও দুরবগাহ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মগ্ন হইয়া দিশেহারা হইবার প্রয়োজন নাই। কূট তর্ক ও গাঢ় সন্দেহময় সে সমস্ত জটিল তত্ত্বে যাঁহারা লব্ধ-জ্ঞান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার সুন্দর মীমাংসা পূর্ণ শাস্ত্রান্তরের শরণাগত হউন। স্থূল দেহের বিনাশ-সাধন করিয়া অর্জ্জুন যে দেহস্থ জীবকে বিনষ্ট করিতে যাইতেছেন না, এবং তাহার বিনাশ-সাধন যে আদৌ সম্ভবপর নহে, মাত্র ইহাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, আর উহা বুঝানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের ঐ উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। দৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক এই স্থূল দেহই নাশ ও পরিবর্ত্তনশীল, অতীন্দ্রিয় আত্মা শাশ্বত সনাতন ও চির অবিনাশী।

অনন্তর জাত জীবমাত্রেরই মৃত্যু যে অনিবার্য্য, তাহাই বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণের অপর যুক্তির অবতারণা। যথা :—

"অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে
মৃতম্
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতু-
মর্হসি ॥ ২৭
"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত!
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮
নিত্য জাত যদি ভাব জীবাত্মায়
কিম্বা নিত্য মৃত মনে কর তাঁয়
তা'হলেও তুমি এই অবস্থায়
কেন কর শোক না পাই ভেবে ॥ ২৬
"জাত প্রাণীদের মরণ নিশ্চয়
মৃতের(ও) আবার পুনঃ জন্ম হয়
অতএব অনিবার্য্য যে বিষয়

শোক হেতু তাহা নহেক হেন ॥ ২৭

"আদিতে অব্যক্ত ভূত সমুদয়
মাত্র মধ্যে তা'রা প্রকাশিত হয়
হ'বে নিধনেও অব্যক্তে বিলয়
অতএব শোক অনর্থক কেন ? ॥ ২৮

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ অপর যুক্তির অবতারণা দ্বারা অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের দিকে তদীয় লক্ষ্য আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন :—

"স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন
বিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥৩২

করিয়াও নিজ ধর্ম্ম আলোচনা
হেন ভীত তুমি হইতে পার না
যে হেতু ক্ষত্রের ধর্ম্ম যুদ্ধ বিনা
কিছু আর যবে নাহিক শ্রেয়ঃ ॥ ৩১
"যদৃচ্ছা ক্রমেতে নিজে বর্ত্তমান,
উদ্ঘাটিত স্বর্গ দ্বারের সমান
ঈদৃশ সমর সুখী পুণ্যবান্,
ক্ষত্রবীরে রহি লভে কৌন্তেয় ॥ ৩২

অনন্তর পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে এই আসন্ন ধর্ম্ম-যুদ্ধে ঔদাসীন্যের পরিণাম ও তদনন্তর কিই বা কর্ত্তব্য, তাহাই স্পষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি
তেঽব্যয়াম্
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং॥৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু
কিম্॥৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে
মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপ
মবাপ্স্যসি॥৩৮

কিংবা পার্থ! যদি এই ধর্ম্ম রণ
করিতে তোমার না হয় মনন
নিজ ধর্ম্ম কীর্ত্তি ত্যাগ-নিবন্ধন—
পাপভাগী তোমায় হইতে হ'বে॥ ৩৩

ক্রমশঃ

শ্রীহরিগোপাল বসু।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

		নারী দুগ্ধ	শর্করা যুক্ত জমাট দুগ্ধ ৭ গুণ জলমিশ্রিত	শর্করা বিহীন জমাট দুগ্ধ। ৪ চারি গুণ জল মিশ্রিত
1.	Proteed (ছানা)	শতকরা ২ ভাগ	শতকরা ১.৩ ভাগ	শতকরা ২.১ ভাগ
2.	Fat (চর্ব্বী)	শতকরা ৩.৫ ভাগ	শতকরা ১.১ ভাগ	শতকরা ১.৯ ভাগ
3.	Sugar (শর্করা)	শতকরা ৭ ভাগ	শতকরা ৬.৭ ভাগ	শতকরা ২.৬ ভাগ

যে যে অবস্থায় গোদুগ্ধাদি মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং তত্তদবস্থার ফলাফল।

দুগ্ধ (১) ধারোষ্ণ, (২) অপক্ক (কাঁচা), (৩) ফেন, (৪) ঈষদুষ্ণ, (৫) মাখনটানা, (৬) বিশেষ ভাবে আবর্ত্তিত (ঘন), (৭) দৃঢ় (ক্ষীরসা বা মেওয়া), (৮) চূর্ণীকৃত ইত্যাদি অবস্থায় মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়; এতদ্ব্যতীত শর্করাদি ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ যোগে দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) ধারোষ্ণ দুগ্ধ—গো দোহন করা মাত্র দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকে, এই অবস্থার দুগ্ধকে ধারোষ্ণ বলা যায়, ইহা সফেন, মিষ্ট, মসৃণ এবং ঈষৎ জান্তব গন্ধ যুক্ত এবম্বিধ দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিশেষ গুণ কথিত হইয়াছে :—

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে

* * * * ধারোষ্ণমমৃতোপমম্।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘুশীতং
সুধাসমং।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু
মাহিষম্॥"

অর্থাৎ—ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং অমৃতসম; ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর, ত্রিদোষনাশক। ধারা-শীতল গোদুগ্ধ ত্যাগ করিবে। গোদুগ্ধ ধারোষ্ণ এবং মাহিষ দুগ্ধ ধারা-শীতলই প্রশংসনীয়।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"উক্তং গব্যাদিকং দুগ্ধং ধারোষ্ণমমৃতোপমং।
সর্ব্বাময়হরং পথ্যং চিরসংস্থন্তু দোষদম্॥
দোহনাস্তু শীতং মহিষীপয়শ্চ গব্যঞ্চ
ধারোষ্ণমিদং প্রশস্তম্।"

অর্থাৎ—গবাদির ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য বলিয়া কথিত; ইহা সর্ব্বরোগনাশক, পথ্য (হিতজনক), কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দোষজনক হয়। গব্য দুগ্ধ ধারোষ্ণ এবং মহিষ দুগ্ধ দোহনান্তে শীতল হইলে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণং গুণবৎ ক্ষীরং বিপরীত-
মতোঽন্যথা।"

অর্থাৎ—ধারোষ্ণ দুগ্ধ গুণবিশিষ্ট কিন্তু তদ্বিপরীতে (শীতল হইলে) তাহার অন্যথা হয় (গুণহীন হয়)।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণমমৃতং পয়ঃ শ্রমহরং নিদ্রাকরং
কান্তিদং।
বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিবর্দ্ধকমতি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য, শ্রমনাশক, নিদ্রাকর, এবং কান্তিদায়ক, ইহা বৃষ্য (বলকারক), বৃংহণ (শুক্রবর্দ্ধক), অগ্নিবর্দ্ধক, অতিশয় স্বাদু, এবং ত্রিদোষনাশক। অপিচ—

"ধারোষ্ণমমৃতং পথ্যং ধারাশীতং
ত্রিদোষকৃৎ।"

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য, পথ্য এবং ধারাশীতল দুগ্ধ ত্রিদোষকারক।

(২) অপক্ব দুগ্ধ—অপক্ব দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) সেবন করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় এবং ইহা নানাপ্রকার বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা দূষিত থাকে। এবংবিধ দুগ্ধ পান করিতে হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া একটু উষ্ণ করিয়া (১৫।২০ মিনিট পর্য্যন্ত) লওয়া কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে।

"আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মাবিবর্দ্ধনং।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যঞ্চ গব্যমাহিষবর্জ্জিতম্।
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিতম্॥"

অর্থাৎ—আম দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) কফবর্দ্ধক, গুরু এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, অতএব গো ও মহিষ দুগ্ধ ব্যতীত সর্ব্ব প্রকার অপক্ব দুগ্ধই অপথ্য (অহিতজনক) বলিয়া জানিবে। কিন্তু নারী দুগ্ধ অপক্ব অবস্থাতেই হিতজনক, জ্বাল দেওয়া হইলে তাহা অনিষ্টকারী হয়।

ভাব প্রকাশে আরও উক্ত হইয়াছে—

"অর্দ্ধোদকং ক্ষীরং শিষ্টমামাল্লঘুতরং
ভবেৎ।
পয়োঽভিষ্যন্দি গুর্ব্বাণং প্রায়শঃ পরি-
কীর্ত্তিতম্।

অর্থাৎ—দুগ্ধে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে তাহা অপক্ব দুগ্ধ হইতে লঘুতর হয়। কাঁচা দুধ প্রায়শঃ গুরু এবং অভিষ্যন্দী (কফবর্দ্ধক)।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—

"ক্ষীরং ন যুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং—
পয়োভিষ্যন্দি গুর্ব্বাণং যুক্তা শৃতমতোঽ-
ন্যথা।"

অর্থাৎ কাঁচাদুধ কখনও ব্যবহার করিবে না। ... ... কাঁচা দুধ অভিষ্যন্দী (কফকারক) গুরু, কিন্তু তাহা উপযুক্তরূপে জ্বাল দিয়া লইলে তদন্যথা (লঘু) হয়। নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে

"ক্ষীরং কাস শ্বাস কোপায় সর্ব্বং গুর্ব্বামং
স্যাৎ প্রায়শো দোষদায়ি———।"
... নারী ক্ষীরন্ত্বামমেবাময়ঘ্নম্।"
ভবেচ্ছীতং যত্তু ন পাচিতং তদখিলং বিষ্টভ্য
দোষপ্রদম্।"

অর্থাৎ—প্রায় সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধই অপক্বাবস্থায় কাস, শ্বাস প্রকোপকারক, গুরু এবং দোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু নারীদুগ্ধ অপক্ব অবস্থায়ই রোগনাশক। যে দুগ্ধ শীতল ও অপক্ব, তৎসমস্তই বিষ্টভ্য দোষকারক (মলরোধক) হইয়া থাকে।

(৩) দুগ্ধ ফেন।—গাভী ও অন্যান্য দুগ্ধ-

ত্রী স্ত্রীজাতীয় জীবের দোহনকালে স্তন্য-রা দোহন-পাত্রে আহত হইয়া পাত্রের পরিভাগে যে ফেন জন্মে, তাহাকে "দুগ্ধফেন" লা যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

গোদুগ্ধপ্রভবং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবং।
বেং ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনম্॥
হ্নিবৃদ্ধিকরং পথ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু।
তিসারেঽগ্নিমান্দ্যেচ জ্বরেঽজীর্ণে প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ—গোদুগ্ধজাত ফেন অথবা ছাগী দুগ্ধের ফেন ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, পথ্য, সদ্যতৃপ্তিজনক এবং লঘু। হা অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে, এবং জীর্ণ রোগে প্রশস্ত। অত্রিসংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণ গোঽপশয়ঃফেনমজানাং বেতিশস্যতে।
মন্দাগ্নীনাং কৃশানাঞ্চ বিশেষাদতিসারিণাম্॥
উৎসাহদীপনং বল্যং মধুরং বাতনাশনং।
স্যোবলকরঞ্চৈব তচ্চ ক্ষীর বিলোড়িতং॥
ণ জ্বরাতিসারেচ সমেচ বিষমে জ্বরে।
মন্দাগ্নৌ কফমাশ্রিত্য পয়ফেনং প্রশস্যতে॥"

তাৎপর্য্যার্থ—কৃষ্ণা গাভী, অশ্ব, অথবা ছাগদুগ্ধজ ফেন প্রশস্ত, এ সকল মন্দাগ্নি, কৃশ, বিশেষতঃ অতিসারী রোগীর পক্ষে হিতজনক এবং এ সমুদয় উৎসাহবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক মধুর ও বায়ুনাশক। ফেন দুগ্ধের সহিত আলোড়িত হইলে সদ্য বলকারক হয়। দুগ্ধ-ফেন ক্ষীণাবস্থায়, জ্বরাতিসারে সম ও বিষমজ্বরে এবং কফাশ্রিত মন্দাগ্নিতে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

(৪) ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।—ফারণ্‌হিটের (তাপমান যন্ত্রের) ২১২° ডিগ্রী এবং সেন্টিগ্রেড্ তাপমানের ১০০° ডিগ্রী উত্তাপে দুগ্ধ জল ফুটিতে আরম্ভ করে এবং ফারণ্‌হিটের ৩২° ডিগ্রী এবং সেন্টিগ্রেডের ০° শীতে জল জমিয়া বরফ হয়, কিন্তু ফারণ্‌হিটের ৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীতল না হইলে দুগ্ধ জমে না। দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে ঈষদুষ্ণ (এক দুই বলকের দুধ) বলা যায়; ইহা রোগী ও শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ১৫।২০ মিনিট পর্য্যন্ত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে রাখিলেই ফুটিতে আরম্ভ করে, এবং তাহার দূষিত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে—

"শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ।"

"মেষী দুগ্ধ জাল দিয়া উষ্ণ থাকিতে এবং ছাগী-দুগ্ধ শীতল হইলে হিতজনক হয়।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"তচ্চেৎ ক্বাথাবর্ত্তিতং পথ্যমুক্তম্।"

তাহা (দুগ্ধ) ক্বাথাবর্ত্তিত হইলে হিতজনক হয়। উক্ত গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে—

"নারীক্ষীরন্তু শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃত-
শীতন্তু
পিত্তনুৎ ... ... শৃতশীতং ত্রিদোষঘ্নং।"

নারীদুগ্ধ জ্বাল দিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিলে কফ ও বাত নাশক হয় এবং তাহা শীতল হইলে পিত্ত ও ত্রিদোষ নাশক হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

"তদেবোষ্ণং লঘুতরমনভিষ্যন্দি বৈ শৃতং।
বর্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ স্তন্যং ... ...।"

অর্থাৎ—নারীদুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য দুগ্ধ জ্বাল দিলে লঘুতর এবং অনভিষ্যন্দী (কফনাশক) হয়।

(৫) মথিত দুগ্ধ (মাখনটানা দুধ)।—দুগ্ধের নবনীত (মন্থন দ্বারা) উঠাইয়া খাইলে তাহা একটু নীলাভ হয়, ঈদৃশ দুগ্ধ কিছু উষ্ণ করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বালকের পক্ষে অত্যন্ত হিতজনক। ১২ ঘণ্টার পর এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ইহার পর তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"ক্ষীরং গব্যং অথাজন্বা কোষ্ণ দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্॥"

অর্থাৎ—গব্য অথবা ছাগ দুগ্ধ মথিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহা পান করিলে লঘু, বৃষ্য, (বলকারক) এবং বাত, পিত্ত ও কফ নাশক হয়।

(৬) বিশেষভাবে আবর্ত্তিত দুগ্ধ (ঘন দুধ ক্ষীর প্রভৃতি)।—ঘন দুধ ও ক্ষীর সুস্বাদু গুরু এবং বলকারক। শুষ্ক গোময়ের (ঘুঁটের) আগুনে দুগ্ধ আবর্ত্তিত করিলে তাহা অতি সুস্বাদু হয় এবং দুগ্ধের বর্ণও অতি পরিষ্কার হয়। দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, সামান্য অমনোযোগে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। জ্বাল দেওয়ার সময় দুগ্ধ পুনঃ পুনঃ আলোড়িত করিতে হয়। একটী পাত্রে জল রাখিয়া তদুপরি দুগ্ধপূর্ণ পাত্র রাখিয়া উভয় পাত্রের সংযোগস্থল ময়দা অথবা মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার বর্ণ অতি শুভ্র হয় এবং দুগ্ধের স্বাদও মিষ্ট হয়। দুগ্ধ পাত্রের মুখটী ঢাকিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

নিঘণ্টুক্ত :—

"সুশৃতঞ্চ পয়ঃ পীতং পীযূষাদপি তদ্গুরু।"

ঘন দুগ্ধ পান করিলে তাহা পীযূষ (সদ্য প্রসূতা গাভীর দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়) হইতে গুরু।

উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে—

"চতুর্ভাগং সলিলং নিধায় যত্নাৎ সদাবর্ত্তিত মুত্তমং।
সর্ব্বাময়ঘ্নং বলপুষ্টিকারি বীর্য্যপ্রদং ক্ষীরম[illegible] প্রশস্তম্।"

অর্থাৎ—চতুর্ভাগ (চারি ভাগ) [illegible] মিশাইয়া দুগ্ধ উত্তমরূপে আবর্ত্তিত করি[illegible] (জ্বাল দিয়া ঘন করিলে) তাহা সর্ব্বরো[illegible] নাশক, বলকারক, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যপ্র[illegible] হয়, এতাদৃশ দুগ্ধ অতি প্রশস্ত।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"তদেবাতি শৃতং সর্ব্বং গুরু বৃংহণমুচ্যতে।"

অর্থাৎ—সর্ব্ব প্রকার দুগ্ধ অতি শৃ[illegible] (জ্বাল দিয়া ঘন) করিলে গুরু ও বৃং[illegible] (বলকারক) হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা

ভারতের বিদ্যা।

"ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু।"

একদিন ভারতের এমন দিন ছিল, যে দিন ভারতীয় আর্য্যগণ ধনে, মানে, বুদ্ধি বিদ্যায় এবং সর্ব্বোপরি চরিত্রে, পৃথিবীর সমুদায় সভ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন য়ুরোপ সমস্ত ভূমণ্ডলের গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জাতির শিক্ষার ভার, উন্নতির ভার এখন যেমন য়ুরোপের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে,—অন্ততঃ য়ুরোপীয়গণ তাহা মনে করিয়া White ma[illegible] burden বাক্যের জন্মপ্রদান করিয়া[illegible] বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সেকালে অধুনা[illegible] সভ্য দেশসমূহ ঘন ও নির্জ্জন অরণ্যাচ্ছা[illegible] বৃকভল্লুকাদি শ্বাপদদিগের নিবাসভূমি [illegible] সেই সময় ভারতে ভগবানের বিমল জ্যো[illegible] উদ্গত হইয়াছিল এবং তথা হইতে [illegible] আলোক ধরণীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া[illegible] মনুসংহিতায় যখন দেখি, মহর্ষি বলি[illegible]

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

মনুঃ ২২০॥

(এই আর্য্যাবর্ত্তদেশে প্রসূত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অগ্রজন্মা মনুষ্যদিগের নিকট পৃথিবীর সমস্ত মানব নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করুক্।)

তখন এই দেশের পূর্ব্বগৌরবের কথা ভাবিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিষণ্ণ হই। হায়! এই সেই দেশ! আজ যদি মহর্ষি মনু স্বর্গলোক হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষি দেশে * আগমন করেন, তিনি কি ইহাকে তাঁহার সেই প্রিয় জন্মভূমি বলিয়া চিনিতে পারিবেন? তিনি যে বড় গৌরবেই বলিয়াছিলেন :—

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥"

মনুঃ। ২। ১৮॥

(সেই (ব্রহ্মাবর্ত্ত) দেশে মনুষ্যদিগের যে আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেই সদাচার কহে।)

এখন সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূভাগবাসী মানবদিগের আচার দেখিয়া তিনি কি মনে করিবেন? আমরা বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া অনর্থক সময় হরণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি লইয়া বৃথা ক্রন্দন করিবার নিমিত্তও এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনায় ফল কি? তবে আমরা এই মাত্র বলি যে, আমরা চিরকাল এরূপ ছিলাম না;—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে গৌরবে সর্ব্ব বিষয়েই অতি উচ্চস্থানীয় ছিলেন ইহা নিশ্চিত সত্য কথা, আর অধুনা আমাদিগের যে হীনাবস্থা উপস্থিত, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কেন, কি পাপের ফলে আমাদের এই নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহার অনুসন্ধান করা এবং যদি এই কারণের নিরাকরণের সম্ভাবনা থাকে, তাহার উপায় চিন্তা করা, প্রত্যেক ভারতসন্তানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরাও সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

শিক্ষার লোপই ভারতের সর্ব্বপ্রকার অবনতির কারণ, ইহা কেবল আমাদিগের মত নহে,—ইহা দেশীয় ও বিদেশীয় বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মত। ভারতের উন্নতির যুগে বর্ণজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়াও নিতান্ত অসম্ভব ছিল, শূদ্রও সেকালে মহাবিদ্বান্ হইত। বর্ত্তমান কালে সেই পুণ্যময় পঞ্চনদ এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাই নিতান্ত অল্প, বৈশ্য শূদ্রের কথা বলিয়া আর লাভ কি? মনুসংহিতা এখনও ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য ও মাননীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পূজিত হইতেছে;—সেই মনুসংহিতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন :—

"বেদমেব সদাভ্যসেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥"

মনু ২.১৬৬

(দ্বিজ তপস্যাচরণ করিতে করিতে বেদা-

---

* "সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥"

মনুঃ—২।১৭।১৯।

সংক্ষেপতঃ ব্রহ্মাবর্ত্ত পূর্ব্বপঞ্জাব এবং ব্রহ্মর্ষি আধুনিক আগরা ও অযোধ্যা প্রদেশ (Agra Province) বলা যাইতে পারে।

,ভ্যাস নিশ্চয়ই করিবেন, কারণ বেদাভ্যাসই তাঁহার পরম তপস্যা।)

স্বয়ং বেদ বলিতেছেন, মনুষ্যমাত্রেই বেদ-পাঠ করিবেন,—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়
চারণায়॥"

যজুঃ ২৬।২।

(পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন "যেমন আমি সমস্ত মনুষ্যের নিমিত্ত এই কল্যাণী অর্থাৎ ইহ পরলোকের মঙ্গলকারিণী বেদ বাণীর উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ তোমরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ভৃত্য প্রভৃতি সকলকেই এই বেদবাণীর উপদেশ দিবে।)*

বেদপাঠ না করিলে সে সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌরুষরাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা
বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনুঃ ২।১৫৭।১৫৮।১৬৮।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

মনুঃ ২।১১।

(কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ যেরূপ নাম মাত্র হস্তী ও মৃগ, বস্তুতঃ কিছুই নহে, তদ্রূপ অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণও নামমাত্র দ্বিজ। নপুংসক নর ও অনুর্ব্বর ভূমির ন্যায় অবেদজ্ঞ দ্বিজগণের জন্মও সম্পূর্ণ নিষ্ফল। যে সকল দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠে অথবা অন্য কার্য্যে পরিশ্রম করে, তাহারা জীবিত কালেই সবংশে শূদ্রত্ব বা হীনত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা বেদশাস্ত্র এবং তদনুকূল শাস্ত্রের অবমাননা করে, তাহারা নাস্তিক এবং ভদ্র সমাজে থাকিবার অযোগ্য।)

যাহা হউক শাস্ত্রের সর্ব্বত্র বেদাধ্যয়নের নিতান্ত আবশ্যকতা ও প্রশংসা এবং অবেদাধ্যায়ীর বিস্তর নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক শিক্ষার এত আদর প্রাচীনকালে কেন ছিল? বেদে কি আছে? বর্ত্তমান কালে ভারত এক প্রকার বেদজ্ঞানশূন্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ বঙ্গদেশ

* বেদে এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে শূদ্র ও মহিলাদিগের বেদ অধ্যয়নের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা বলিবেন যে, তাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। মহিলাদিগের বেদাধিকার সম্বন্ধে পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই সামান্যতঃ দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। সাধারণতঃ "স্ত্রী শূদ্রৌ নাধীয়াতাম্" বলিয়া শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করা হইয়া থাকে। এই শ্রুতি কোন্ বেদে আছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি এই বাক্য আসল শ্রুতি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে শূদ্রদিগের পক্ষে একেবারে অধ্যয়ন মাত্রেই নিষিদ্ধ হয়, অর্থাৎ শূদ্রগণ বর্ণমালাই শিক্ষা করিবেন না এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু উপবেদ শুশ্রুত, বিশ্ববিখ্যাত রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দুর মাননীয় অনেক পুরাণে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে মন্ত্রসংহিতা ব্যতিরেকে সমুদায় শাস্ত্র পাঠের অধিকার শূদ্রকে দেওয়া হইয়াছে অবগত হওয়া যায়। ব্যবহারেও দেখা যায় যে শূদ্রগণ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেছেন। মনুসংহিতাতে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করান এবং যিনি শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের নিন্দা দেখা যায় (মনুঃ ৩।১৫৬।) সকল দিক বিবেচনা করিলে মনু বেদের উল্লিখিত মন্ত্রানুসারে অতীতকালে শূদ্রগণও বেদাদি বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, ইহাই আমাদিগের মনে হয়। উপনিষদেও শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার এবং মহাভারতে ব্যাধের নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিক্ষার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। সমরান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যে একেবারে বেদশূন্য হইয়াছে, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারা যায়। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি দূরে থাকুন, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণও বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহেন। সাবিত্রী-মন্ত্র ও সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রগুলি ভিন্ন বেদের আর কোন অংশও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই বলিলে অসত্য কথা বলা হইবে কি? সাবিত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রগুলির যথাযথ অর্থজ্ঞানও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাই বলিলে যদি সানহানিকর আইনের চক্রে পড়িতে না হয়, তবে তাহাও বলিতে আমরা প্রস্তুত আছি। অনেক পাঠ করবলিবেন, ভাল আমরা বেদ জানি না,—তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা কি বিদ্বান্ নই? আমরা কি পণ্ডিত নই? আমাদিগের কি উন্নতি হইতেছে না? বেদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে "A very early attempt, on the part of thinkers of a rude age and race, to form a cosmological throng" এবং "The real movement of philosophic thought begins, it is true, not in India but in Ionia" উক্ত অতি বড় অধ্যাপক A. E. Gaugh সাহেব জগতের সমক্ষে তাঁহার Philosophy of ten Upanishads নামক পুস্তকে কহিয়াছেন,—দেশীয় বিদেশীয় বহু পণ্ডিত বেদকে 'কৃষকের গান,—সভ্য কৃষকের নহে, আদিম কালের অসভ্য কৃষকের গান, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বেদকে ভক্তি করেন এমন পণ্ডিতেরাও বেদে কতকগুলি জড়শক্তির আরাধনা ও পূজা দেখিয়া থাকেন। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, জল, অগ্নি, সোমরস প্রভৃতি কতকগুলি নিতান্ত জড় বস্তুর উপাসনা শিক্ষা করিয়া কি ফল? বরং আমরা জড়ের উপাসনা ও আরাধনা করিতে করিতে জড়ত্ব লাভ করিবার পথে যাইতে ছিলাম, সেই পূজোপাসনা ত্যাগ করিয়া ভালই হইয়াছে।" কেহ বা বলিবেন, "আমাদের বেদ বেদান্তের ঋষিমুনিগণ, এমন কি শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত কেবল চক্ষু মুদিয়া ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া গিয়াছেন,—নির্জ্জন বনাশ্রমে বসিয়া কতকগুলা অসার ভাবনা ভাবিয়া মরিয়াছেন,—কেবল অজ্ঞাত ও অদৃশ্য পরলোকের কথাতেই মগ্ন হইয়াছেন,—তাহাতে আমাদের লাভ কি? আমরা জীবিত জাতি, আমরা চাই বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আমরা চাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া জগতে ঐশ্বর্য্য ও সম্মান লাভ, আমরা চাই নৌবিদ্যা, তড়িদ্বিদ্যা, গতিবিজ্ঞান, বাষ্পযান, ব্যোমযান, প্রভৃতি বিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্র,—বেদ পড়িয়া আমাদের কি লাভ ইত্যাদি। আধুনিক ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই বিশ্বাস যে ভারতীয় ঋষিগণ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিলেও তাঁহারা ভৌতিক বা জড় বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং আধুনিক সময়ে প্রাচীন বেদপাঠে বিশেষ কোন ফল নাই।

এই যে মত, এই যে আপত্তি,—ইহা সমস্তই অজ্ঞানের ফল। আর্য্য ঋষিদিগের মতে বেদ অপৌরুষেয় ভগবদ্দত্ত জ্ঞান,—বিদ্যার অপর নাম বেদ। যাঁহারা আর্য্য গ্রন্থাদি কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বিদ্যামাত্রেই বেদের অন্তর্গত। লৌকিক ও পারমার্থিক সমস্ত বিদ্যার আকর বা খনি বেদ। বৃক্ষ গো মহিষ মনুষ্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা, বাণিজ্য-বিজ্ঞান, জড় বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি, রাজধর্ম্ম, ধাতুবিদ্যা বা স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি মানুষের ইহ-পরকালের আবশ্যক যত কিছু বিদ্যা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই "বেদ" এই নামের অন্তর্গত ছিল। এখন আমাদিগের যেরূপ

হীনাবস্থা, তাহাতে এই কথা অত্যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আজ কাল আমরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছি যে, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের এবং কোপারনিকস ও গালিলিও প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ভূমণ্ডলের গোলত্ব এবং গতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। আমাদিগের বিদ্যালয়ে ইহা ত শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, কোপারনিকসের জন্মের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের লোক ভূমণ্ডলের প্রকৃতি ও গতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন,—নিউটনের জন্মের অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পণ্ডিতগণ পৃথিবীর মহাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণের বিষয় অবগত ছিলেন,—এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে ভারতীয় আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা আমার নিজের বা ভারতীয় কোন পণ্ডিতের কথা নহে। মিঃ ওয়েবার, সার মনিয়ার উইলিয়ামস, মুসোঁ বেলি, কাউণ্ট Biornstjerna মেসার্স কোলম্যান, পোকোক, হার্ডি ও ব্যারণ হমবোল্ট প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াই ভারতের অতি উন্নত সভ্যতা ও বিদ্যা সম্বন্ধে এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়া ও সর্ব্বত্র শিক্ষা এবং সভ্যতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছেন। তাঁহারাই প্রমাণ করিতেছেন যে, মহর্ষি মনুর কথা "আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনগণের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর লোক সভ্যতা ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।" ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখনও যাঁহারা এ সকল বিষয়ে সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতা জাতীয় কলেজের শিক্ষকদিগের পাঠ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দা মহাশয়ের "Hindu superiority" নামক ইংরাজী বই খানি অন্ততঃ পক্ষে পড়িতে বিনীত অনুরোধ করি। ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিলেও পাঠক প্রাচীন আর্য্যদিগের সভ্যতা ও বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

য়ুরোপ নাকি মিসরীয়, য়ুদীয় এবং সেমেটিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির নিকট সভ্যতা ও শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তজ্জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না যে, মিশরীয় এবং য়ুদীয় সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন সভ্যতা থাকিতে পারে। অতি অল্পকাল মাত্র কয়েকজন বিশেষ অধ্যবসায়শীল য়ুরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলার চেষ্টায় এই ভ্রম অপসারিত হইয়া পৃথিবীর সমুদায় সভ্যতার মূলস্বরূপ ভারতের আর্য্যসভ্যতার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগকে, অন্য কথা দূরে থাকুক, এই সাগরাম্বরা ধরিত্রীর বয়স সম্বন্ধেই তাঁহাদিগের চিরকাল-পোষিত ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। হিব্রু পুরাণের মতে পৃথিবী দেবী বালিকা মাত্র;—ভূবিজ্ঞানের অভ্রান্ত অস্ত্র এক দিকে, অন্য দিকে প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য সেই পুরাণের মতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের অন্যান্য মতও ক্রমে পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা আসিয়াছে। পণ্ডিতবর মোক্‌সমূলারও বলিয়াছিলেন যে, খৃঃ পূঃ ৩৫০ পূর্ব্বে ভারতের লোকে লিখিবার প্রণালী অবগত ছিলেন না। সার উইলিয়ম জোন্স যে বলিয়াছিলেন যে "দেবনাগরী লিপি হইতে পশ্চিম এসিয়ার লিপি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল" (Asiatic researches Vol I, p. 423) তাহা উড়িয়া গিয়াছিল! Count Bjorustjena বলিয়াছিলেন "হিন্দুগণ অন্ততঃ ২৮০০ খৃঃ পূঃ অর্থাৎ আব্রাহামের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বেও পুস্তক লিখিতেন" (Theogony of the Hindus তাহাও অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই। ইংল-

ণ্ডের Ballial কলেজের প্রাচ্য বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ১৮৮৩ খৃঃ London সহরে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদিগের মহাসভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, সূত্রশাস্ত্র প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে লিখিত হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে দলিল এবং তাহার লেখকদিগের সম্বন্ধে বহু আইন ঘটিত তর্ক ও তাহার মীমাংসা আছে। এইরূপ বিবিধ প্রমাণ থাকিলেও আমাদের গুরুগণ বলিতেন যে, মিশরীয় এবং ফিনীশিয় লিপি হইতে ভারতের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের স্বাভাবিক চতুরতার বলে এই আশ্চর্য্য দেবনাগরী লিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমরাও অতিশয় সুবোধ বালকের মত পাশ্চাত্য গুরুদিগের কথা বেদবাণীবৎ অভ্রান্ত মনে করিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সময়ে অসময়ে সভায় সমিতিতে অথবা মাসিক পত্রে নানাচ্ছন্দে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছিলাম। সম্প্রতি সে সুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহীশূর রাজ্যের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্রপট্টণ শ্যামশাস্ত্রী বি, এ, মহাশয় খাস ইংরাজি ভাষায় Indian Antiquary নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং বহু ফলকচিত্র দ্বারা হাতে কলমে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দেবনাগরী লিপি ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং উহা আমাদের খাঁটি স্বদেশী, উহাতে বিদেশীয় কোন গন্ধ মাত্রও নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর পক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রমাণের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা দূরে থাকুক, অনেকেই ঐ প্রবন্ধের সারবত্তা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ঐরূপ, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়াছেন যে—গ্রীক বীর সেকন্দর সাহের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতে স্থাপত্যশিল্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই অর্থাৎ হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে এই শিল্পশিক্ষা করিয়াছিল। সেকন্দর সাহের সহিত যে সকল রাজ-মিস্ত্রী আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদিগের গুরু হইয়া এই বিদ্যা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তাই ভারতের শিল্প দেখিয়া সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর মামুদ গজনবী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া খালিফকে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রাসাদ ও মন্দিরাদি মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের মত সুদৃঢ় ও স্থায়ী। ভারতের এই অপবাদ সম্বন্ধে অবশ্য কর্ণেল উড, শ্রীমতী ম্যাসিঙ্, শ্রীযুক্ত ফারগুসন, থরন্‌টম্ ও অধ্যাপক হীরেন (Prof. Heeren) প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ প্রতিবাদ করিয়া ভারতের মুখ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের পুত্রকন্যাগণ কি করিয়াছেন? ভারতের কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের পুস্তক অথবা নিদর্শনের অনুসন্ধান করিয়াছেন? Patriotism বা দেশ-ভক্তি একটা খপুষ্প নহে যে, অমনি আকাশে ফুটিয়া উঠিবে। দেশ কি, দেশের কি ছিল কি আছে, তাহা না জানিলে দেশের প্রতি ভক্তি আসিবে কিরূপে? ইংরেজ-বিদ্যার্থী "নিউটন" এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ইংরেজজাতি সম্বন্ধে যে একটা অতি উচ্চ অঙ্গের গৌরব অনুভব করেন, আমাদের পুত্র কন্যাদিগের সেরূপ গৌরবের কোন্ নাম আমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি? কেবল মাত্র অপরকে নিন্দা বা ঈর্ষা করিতে পারিলেই দেশ-ভক্তি শিক্ষা করা যায় না।

যাউক সে অবান্তর কথা। সত্যই কি আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে স্থাপত্য

বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম? মিথ্যা কথা। অ মাদের বেদেই যে স্থাপত্য শিল্পের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। সে প্রাচীন কালে,—যে সময়ে সেই বেদ ভারতে সুপ্রচারিত,—সেই সময়ে গ্রীস কোথায়? রামায়ণ গ্রন্থখানি ত আমাদিগের শ্বেতাঙ্গ গুরুমহাশয়দিগের মতেই সেকন্দরের পিতা-পিতামহের জন্মেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাই। সেই ভারতের অতি প্রাচীন আদিকাব্য রামায়ণে আমরা অযোধ্যা ও লঙ্কা প্রভৃতি নগরের যে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, সে সকল কি কাল্পনিক? আমরা পাঠকদিগের অনুমতি লইয়া অযোধ্যানগরীর বর্ণনা সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
আয়তা দশচ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।
উচ্চাটালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রগণোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥
সামন্ত রাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্॥
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥
চিত্রমষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥"

ইত্যাদি।

বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫ম সর্গ।

(কোশল দেশে অযোধ্যা নামক নগরী ছিল। সেই মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘা, ত্রিযোজন বিস্তৃতা, মহাপথ সকলে সুবিভক্ত, অতিশয় শোভাময়ী, তাহার রাজপথ গুলি সুন্দর ও সর্ব্বদা জলসিক্ত, এবং প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ। সেই নগরী কবাট ও তোরণ যুক্ত, সুবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথশোভিত, সমস্ত যন্ত্র সমন্বিত, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ, অতিশয় শোভা এবং প্রভাযুক্ত এবং ঐ নগরে সর্ব্বশিল্প-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সমূহ, অনেক সূত, এবং মাগধ জাতি বাস করিত। তাহাতে ধ্বজসমূহে অলঙ্কৃত উচ্চ উচ্চ আবাস বাটী ও চারিদিকে শত শত শতঘ্নী অস্ত্র স্থাপিত ছিল। উদ্যানাম্র ও শাল কানন সেই নগরীর চারি দিকে মেখলার ন্যায় শোভা পাইত এবং সেই নগরে রমণীদিগের অনেক নাট্যালয় ছিল। তাহার চারিদিকে গভীর পরিখা থাকায় সেই নগরী শত্রুদিগের পক্ষে দুর্গম ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তথায় বহুসংখ্যক অশ্ব গজ উষ্ট্রাদি পশুপাল, বহু সামন্তরাজ, নানা দেশাগত বণিক্‌সমূহ ও তাঁহাদিগের আবাস স্থান ছিল। তথায় উচ্চ ত্রিতল, সপ্ততল পর্ব্বতাকার বৃহৎ বৃহৎ মণিভূষিত প্রাসাদ সমূহ, অস্ত্রাগার, যন্ত্রাগার প্রভৃতি অনেক গৃহ ছিল এবং সেই সকল প্রাসাদে সুন্দরী মহিলাগণ বাস করিতেন। শোভায় সম্পদে উহা ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য ছিল।)

আমরা স্থানাভাব বশতঃ অতি অল্পাংশ মাত্রই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার সম্বন্ধে কাহারও কি কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে? এই বিংশ শতাব্দীর তথা কথিত উচ্চস্তরের প্রতীচ্য সভ্যতার আমলে ভারতে এই রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যার ন্যায় একটীও নগর আছে কি? বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীর আয়তন এই অযোধ্যার এক চতুর্থাংশও হয় না। অন্যান্য সম্পদ এবং স্থাপত্য-শিল্প

সম্বন্ধে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পার্থক্য স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। লঙ্কা নগরীর বর্ণনা তুলিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রীক আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতীয় রাজা প্রজা বৃক্ষকোটরে অথবা গিরি-গহ্বরে বাস করিতেন এরূপ মত প্রকাশ করিতে যাঁহারা "সাহস" করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা করিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশের শ্রীযুক্ত রামরাজা মহাশয় হিন্দুদিগের স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়ে এক অতি উচ্চাঙ্গের গবেষণা পূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে অতি প্রাচীনকালের রচিত "মানসার," "মায়ামত," "কাশ্যপ," "বৈখনস," "সকলাধিকার চন্দ্রিকা," "বিশ্বকর্ম্ম," "সনৎকুমার," "সারস্বত্যম্" ও "পঞ্চরাত্রম্" প্রভৃতি অনেক পুস্তকের আলোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানসার" পুস্তক অতি বৃহৎ এবং ৫৮ খণ্ডে বিভক্ত এবং ভূমি পরিমাণ ও স্থপতি শিল্পের সমুদয় আবশ্যক বিষয় অতি বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে উহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি অনেকে অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন "মানসার" গ্রন্থের কয়েক অধ্যায় অধুনা "মেন সুরেশন্" (Mensuration) নামে পরিচিত ও প্রচারিত আছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও বিদ্যার অনেক পরিচয় আজিও পাওয়া যায়। এখনও যদি আমরা মনোযোগী হই, তাহা হইলে অনেক লুপ্তপ্রায় রত্নের উদ্ধার হইতে পারে। এ বিষয়ে ভারতবাসী এখনও বিশেষ অগ্রসর হন নাই;—আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া এ সম্বন্ধে অগ্রসর হউন, দেশ কি ছিল, কি হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান লউন,—দেশকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখুন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদ যাবতীয় বিদ্যার আকর। বেদ অর্থশূন্য কতকগুলি নির্ব্বোধ কৃষকের গান অথবা জড় পদার্থের স্তুতিতে পূর্ণ নহে। বেদ যে জড়বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মবিদ্যার সম্পূর্ণ আকর, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে একটী বেদ-মন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখাইব। পাঠক দেখিবেন, বেদমন্ত্র সকল কিরূপ গম্ভীর অর্থ যুক্ত এবং উহার অর্থ উদ্ধার করিতে গেলে কিরূপ একতান মনে তপস্যার প্রয়োজন। আমরা যে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা এখানে দিতেছি, তাহা প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মুখস্থ আছে, অথচ কয়জন লোকে উহার প্রকৃত অর্থ হৃদ্‌গত করিয়াছেন? সেই মন্ত্রটী এই :—

উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥
যজুঃ ৩৮।২৪॥

এই শ্লোকের পদ :—উৎ। বয়ম্। তমসঃ। পরি। স্বঃ। পশ্যন্তঃ। উত্তরম্। দেবম্। দেবত্রা। সূর্য্যম্। আগন্ম। জ্যোতিঃ। উত্তমম্॥

ইহার অন্বয়।—উৎ তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্তঃ উত্তরং (চ) দেবং (পশ্যন্তঃ) বয়ং দেবত্রা উত্তমং জ্যোতিঃ সূর্য্যম্ আগন্ম॥

পদার্থ :—(উৎ) ব্যাকরণের ক্রিয়াপদে যেমন উপসর্গ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ উপসর্গ দ্বারা ক্রিয়াপদকে যেমন সহায়তা দেওয়া হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত সৃষ্টির ভিতর সকল ক্রিয়া প্রপঞ্চের সহায় এবং উচ্চ, নীচ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, প্রভৃতি দ্রব্যের আকার এবং পরিমাণ জ্ঞানের হেতুভূত, সমস্ত সাকার বা মূর্ত্তিমান পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সমবায়ি কারণ, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে পরিণামী, যোগ দর্শনের "দৃশ্য" বেদান্তের "মায়া," সাংখ্যের "প্রকৃতি," ন্যায়ের "পরমাণু," গীতার "প্রধান" "অব্যক্ত" ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ নিত্য, শাশ্বত ও অবি-

নাশি "সৎ" নামক জগতের উপাদান কারণ (তমসঃ পরি স্বঃ) তমঃ হইতে সত্বগুণ পর্য্যন্ত,—সাংখ্যের তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্বগুণশীল, যোগশাস্ত্রমতে স্থিতি ক্রিয়া প্রকাশশীল, উপনিষদ্ বা বেদান্তের লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল বর্ণময় ঐ "উৎ"কে (পশ্যন্তঃ) কেবলমাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ দ্বারা জানিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া ন্যায়শাস্ত্রানুসারে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা প্রকৃত পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা, অর্থাৎ নানারূপ বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে উহার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক আসল জ্ঞানলাভ করিয়া (উত্তরম্) উৎ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম, উন্নত, শ্রেষ্ঠ এবং সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, হ্রস্ব দীর্ঘ, উচ্চাবচ সম বিষম প্রভৃতি নানারূপ দ্বন্দ্বরূপী জ্ঞানময় সংসারপ্রবাহে নিমগ্ন (দেবম্) ক্রীড়া বিজিগীষা ব্যবহার দ্যুতি স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি গতি প্রীণন মর্দ্দন পরিকূজন দান দীপন দ্যোতন শীল "সচ্চিৎ" নামধেয় দিব্যগুণ কর্ম্মস্বভাব যুক্ত জীবাত্মাকে (চ পশ্যন্তঃ) বেদমার্গ সম্মত মহর্ষি পতঞ্জলি কথিত অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া (বয়ং) আমরা, অহংতা বা অস্মিতা অর্থাৎ "আমি, আমি আছি" ইত্যাকার ভাবনাযুক্ত অসার সংসারানলে নিরন্তর দগ্ধ প্রতিরুদ্ধ প্রগাঢ় ইচ্ছাজনিত দ্বেষ ও হিংসায় জর্জ্জর, অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু দুঃখাগ্নি জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ, অবিদ্যা ও মোহপ্রভাবে বুদ্ধিশূন্য অবস্থায় জন্মজরামরণরূপী সংসারচক্রে আরূঢ়, প্রাক্তন এবং পুরুষার্থ দ্বারা নিতান্ত বিপন্ন, বিষয়-বিষ পানজনিত তৃষ্ণা-বাসনা-অহঙ্কাররূপ বিকারে আচ্ছন্ন জীবগণ (দেবত্রা) দেব হইতে অর্থাৎ জীবাত্মা হইতেও (উত্তমম্) উৎকৃষ্টতম, অণু হইতেও অণু, মহান্ হইতেও মহান্ উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত, ক্লেশকর্ম্ম ও আশা-তৃষাদি বিরহিত, সর্ব্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক (জ্যোতিঃ) স্বপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতি, পরমগুরু (সূর্য্যম্) সকলের প্রসবিতা, প্রেরয়িতা, অধিষ্ঠাতা, নিয়ামক, ঐশ্বর্য্যানন্দঘন, নিরতিশয় জ্ঞানক্রিয়া সামর্থ্যশীল, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে (অগন্ম) যথাবৎ সম্যক্‌প্রকারে জানিয়া প্রাপ্ত হই।

ইহার ভাবার্থ সংক্ষেপতঃ এই যে, পরম দয়ালু পরমকারুণিক সমস্ত প্রাণীর পিতা-মাতা বন্ধু গুরু বৈদ্য রাজা প্রাণ ও জীবনরূপী পরমাত্মা লোকের মঙ্গলের জন্য এই বেদমন্ত্রে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন ;—

'হে জীবগণ, তোমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম এই যে, তোমরা প্রথমে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়া তদনন্তর জীবাত্মার সম্বন্ধে বিদ্যায় পরিপক্কতা লাভ করিবে ও সর্ব্বশেষে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ও শিক্ষা দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।' মূলমন্ত্রে প্রথমে 'উৎ' বা প্রকৃতির, মধ্যে 'উত্তর' বা জীবাত্মার, এবং শেষে 'উত্তম' অথবা পরমাত্মার শিক্ষার বিষয় কথিত হইয়াছে। এইরূপ ক্রম বা সোপান রক্ষার কারণও অতিশয় সঙ্গত ও সুন্দর। প্রকৃতি বা জড়জগৎ সম্বন্ধে কাহারও অবিশ্বাস নাই, পরন্তু আমরা দিবারাত্র আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারে জড়জগতের জ্ঞান অহরহঃ লাভ করিতেছি এবং প্রথমে আমাদিগের দৃষ্টি এই চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরি-নদী-বন-উপবন-পশু-পক্ষী-সমধ্যাসিত ও চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিপ্রদীপ্ত জগতের উপরেই পতিত হয়, সুতরাং জড়-প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ আমাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা। জড়প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যসমাজের কীদৃশ উন্নতি হয়, আধুনিক য়ুরোপ ও আমেরিকা তদ্বিষয়ে মহতী শিক্ষা

দিতেছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরও আমাদিগকে এই জড়প্রকৃতির জ্ঞান প্রথমে লাভ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। জড়-প্রকৃতির পর জীবাত্মা। জীবাত্মারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। "আমি আছি কি না?" এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে কদাপি উদয় হয় না। এই জীবাত্মার তত্ত্ব শিক্ষার উপায় মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-দর্শনে দেখাইয়াছেন। জীবাত্মার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান (Practical knowledge) লাভ করার পর তবে মানুষ সেই পরমশ্রেষ্ঠ, পূর্ণশক্তি, পূর্ণজ্ঞান পরমাত্মার স্বরূপ ও জ্ঞান লাভের অধিকারী ও উপযুক্ত হয়। প্রকৃতি-জ্ঞান লাভ না হইলে জীবাত্মার জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব এবং জীবাত্মার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ না হইলে পরমাত্মজ্ঞানও সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই ভগবান আমাদিগের কল্যাণার্থ ঐরূপ সুগম ও ক্রমোচ্চ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন নাই, বা তজ্জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা না বুঝিয়াই এই অপবাদ দিয়াছেন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি অনেকে বলিতে পারেন, উল্লিখিত বেদমন্ত্রের যে অর্থ ও ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে উহা আমাদের কপোলকল্পিত অর্থাৎ বেদবাক্যের উপর অযথা গোঁড়ামি দেখাইবার জন্য বহু কষ্ট-কল্পনা দ্বারা ঐরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, নিরুক্ত ব্যাকরণ এবং ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রে বেদমন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রণালী বিহিত হইয়াছে, ঐরূপ প্রণালী অনুসরণ করিয়াই আমরা উপরি লিখিত অর্থ বুঝিয়াছি। যাঁহাদের সন্দেহ হয়, তাঁহারা স্বয়ং বেদার্থের উপায় স্বরূপ নিরুক্তাদি গ্রন্থ দৃষ্টি করিয়া অর্থ করিয়া লইতে পারেন। এ সম্বন্ধে আরও আপত্তি হইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে, মনুষ্যজাতি যে সময়ে অতিশয় অসভ্যাবস্থায় ছিল, সে সময়ে মনুষ্য কখনই এরূপ উচ্চ আদর্শের সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কল্পনাও করিতে পারে না, সুতরাং বেদমন্ত্রের এতাদৃশ গম্ভীর ও গৌরবময় অর্থ হইতে পারে না। শেষোক্ত আপত্তির উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য যে, আর্য্যজাতি বেদকে অপৌরুষেয় এবং পরমাত্মার অমোঘবাণী বলিয়া চিরকাল পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পক্ষে বেদবাক্যের গাম্ভীর্য্য বা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। মহর্ষি কণাদ স্বীয় বৈশেষিক দর্শনে বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে ॥ ৬ । ১ । ১ ॥"

অর্থাৎ বুদ্ধি পূর্ব্বক বেদবাক্য রচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা বেদবাক্যের প্রামাণ্য বিষয়ে বা অর্থ গৌরব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভগবান কণাদ বলিয়াছেন "বেদের রচনা বুদ্ধি পূর্ব্বক করা হইয়াছে।" পরমাত্মার অনন্ত বুদ্ধি যে বাক্যের প্রসূতি, সে বাক্যের গৌরব সম্বন্ধে আবার সন্দেহ কি? আমরা লৌকিক ব্যবহারে দেখিতে পাই যে, কর্ম্মকর্ত্তার বুদ্ধির পরিমাণের তারতম্যে কার্য্যের উৎকৃষ্টতার তারতম্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির বুদ্ধি অধিক, তাঁহার কার্য্যও উৎকৃষ্ট হয়। আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকি। আকাশভেদী মেঘস্পর্শী বিশাল মহীধর হইতে নরদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুজাল দেখিয়া আমরা বিশ্বস্রষ্টার অগাধ ও অনন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতেছি। বেদমন্ত্রেরও প্রত্যেক চরণে, বাক্যে ও পদে তাঁহার পূর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে,—ইহা বেদাধ্যায়ী বেদভক্ত এবং বেদজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন,—"মন্ত্রামননাৎ।" নিরুক্ত ৭।৩।৬॥ অর্থাৎ মনন, বিচার, বা চিন্তা হইতেই মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবার আপত্তি হইতে পারে, "কণাদ যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিলে কি হয়, আমরা যখন বেদ মন্ত্রের অতি সামান্যাংশও বুঝিতে পারি না, তখন উহার প্রামাণ্য বা গৌরব কিরূপে স্বীকার করি?" এই আপত্তির উত্তরেই ত ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন "মনন হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের চিন্তা হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে।"—যে বাক্য পরমেশ্বরের মনন বা চিন্তা হইতে জাত, আমরা বিনা মননে বা বিচারে তাহা বুঝিব কিরূপে? উহাকে বুঝিতে গেলে রীতিমত তপস্যা ও চিন্তা বা মনন আবশ্যক। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন,—

"ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।"

ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১॥

অর্থাৎ পরম জ্ঞানময় পরমেশ্বরের তপস্যা হইতে ঋত (নিয়ম) ও সত্য (বেদবিদ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিয়াছেন "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ" অর্থাৎ সেই মহাভূত পরমাত্মার সহজ নিঃশ্বাস লীলার ন্যায় চতুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র মহর্ষিদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহারা তপস্যা ও মনন করিয়াছিলেন তাই তাঁহাদের হৃদয়ে এই সর্ব্বকল্যাণময়ী বেদবাণী প্রকটিত হইয়াছিলেন। অধুনা যদি আমরা তপস্যা ও মনন করি, আমরাও বেদের যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। অন্যথায়, অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় নভেল পাঠ করিবার মত বেদ পাঠ করিলে কি আমরা উহা বুঝিতে পারি? কদাপি নহে। যাঁহারা ভক্তি সহকারে বেদের অধ্যয়ন করেন, তৎ সম্বন্ধে তপস্যা ও মনন করেন, তাঁহারা সহজেই বেদার্থ বুঝিতে পারেন। বেদরূপী ভগবান দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন। সুন্দরী ও সুশীলা রমণী যেমন পতিপ্রেমে তন্ময় ও তদ্গত হইয়া স্বীয় বস্ত্রাপসারণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রিয়তমের নিকট নিজ অসূর্য্যম্পশ্য ও মানব-নয়নের অগোচর নগ্নরূপরাশি সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশ করেন, বেদও তদ্রূপ নিজ ভক্তের নিকট নিজ মহিমা প্রকটিত করিয়া দেন। ইহা আমার নিজের কাল্পনিক উপমা নহে, বেদ স্বয়ং এই উপমা দিয়াছেন,—

"উতোত্বস্মৈতন্বং বিসস্রে জায়েবপত্য
উশতী সুবাসাঃ॥

ঋগ্বেদ ॥১০।৭১।৪॥

উপমাটি হয়ত আধুনিক সুরুচিসঙ্গত নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা যে সুসঙ্গত উপমা আর নাই, তাহা আমরা নির্ভয়ে বলিতে প্রস্তুত আছি।

যাহা হউক, আমাদিগের আলোচ্য বেদ মন্ত্রে কিরূপ রচনার বুদ্ধিমত্তা, অর্থের মহত্ব এবং ভাবের গৌরব আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক। আমরা দেখিয়াছি, এই মন্ত্রে প্রথমে জড় প্রকৃতি (উৎ) তৎপরে জীবাত্মা (উত্তরম্) এবং সর্ব্বশেষে পরমাত্মা (উত্তমম্) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ক্রম বা সোপান পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব ব্যতিরেকে চতুর্থ তত্ত্ব আমাদিগের জ্ঞাতব্য নাই এবং কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক শ্রেয় সাধন জন্য এই ত্রিবিধ তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করা যে পরমাবশ্যক, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে "এই মন্ত্রের কথিত ক্রমানুসারে জ্ঞানলাভ করিবার আবশ্যকতা কি? প্রথমে প্রকৃতি, পরে জীবাত্মা

এবং তৎপরে পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিব কেন? বরং অগ্রে পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই ত সঙ্গত; যে হেতু, উপনিষদে দেখিতেছি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং ভবতি" অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে, তাঁহাকে জানিলেই আর সব আপনিই জানা যায়।" অথবা দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলিতে পারেন "যেহেতু জীবাত্মা মধ্যম তত্ত্ব এবং তাঁহার সহিত এক দিকে প্রকৃতি ও অন্যদিকে পরব্রহ্মের সহিত সুদৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তজ্জন্য শ্রুতিবাক্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" প্রভৃতি বাক্যানুসারে জীবাত্মার সম্বন্ধেই প্রথমে জানা উচিত।" এই উভয়বিধ আপত্তিই অমূলক। প্রথমতঃ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন, প্রত্যুত প্রকৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। প্রথমে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমশঃ অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতেই চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতি স্থূল, জীবাত্মা সূক্ষ্মতর, পরমাত্মা সূক্ষ্মতম। প্রথমে স্থূলের জ্ঞান পরে সূক্ষ্মের জ্ঞান আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিদ্যালয়ে অথবা শিল্পাগারে শিক্ষার্থীকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সহজ হইতে কঠিন বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইহাই সরল পন্থা। লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখুন, যিনি এম্, এ, পাশ করিয়াছেন, তিনি বর্ণমালা জ্ঞাত আছেন, ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু কেহই বর্ণমালা শিক্ষা না করিয়া এম্, এ, পাশ করিতে পারেন নাই। পরন্তু লোকে সর্ব্বত্রই আমরা ক্রমশঃ অধম হইতে উত্তমের জ্ঞান ও স্থূল হইতে সূক্ষ্মের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই জ্ঞান হইতেই অধিকারী ভেদ হয়। উত্তমের জ্ঞান হওয়ার পর অধম যে অজ্ঞাত থাকে না, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং শ্রুতির বাক্য "পরমাত্মাকে বিদিত হইলে নিখিল সংসার জড়জীব সমস্ত বিদিত হওয়া যায়" পরম সত্য। অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া বৃথা সময় ও কালহরণ করার কোন আবশ্যকতা নাই। জড়-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না করিলে জীবাত্মার সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যে অসম্ভব এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে গেলে যে জীবাত্মার সম্বন্ধে পরিপক্ক জ্ঞানলাভ নিতান্তই আবশ্যক তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা শ্রুতির অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, বেদের সর্ব্বত্রই এই ত্রিবিধ শিক্ষার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। জড় প্রকৃতি, চেতন-জীবাত্মা এবং অনন্ত শক্তি চৈতন্যময় পরমাত্মা এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয় বেদে কথিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বেদের অপর নাম ত্রয়ী। আরও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রকৃতি জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষাদান করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। যে শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না করা যায় সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আয়ুর্ব্বেদ অথবা রসায়নাদি বিজ্ঞান পাঠকালে শবচ্ছেদ ও যন্ত্রাদির সহায়তায় পুস্তকের উপদিষ্ট বিদ্যার প্রত্যক্ষ সাধন না করিলে বিদ্যার্থী তাঁহার অধীত বিদ্যা বুঝিতে পারেন না। দুইটী বাষ্প একত্রিত হইলে জল উৎপন্ন হয়, চূর্ণ হরিদ্রা সংযুক্ত হইলে বর্ণান্তর পরিগ্রহ করে অথবা কোন ঔষধ সেবন করিলে শারীরিক তাপের হ্রাস হয়, ইহা মুখস্থ করিলে বিশেষ ফল নাই, কিন্তু দেখিতে পাইলে তবে দৃঢ় ধারণা জন্মে। যাঁহারা ঘৃত খান নাই, তাঁহাদিগকে ঘৃতের আস্বাদন বুঝাইয়া দিতে পারা যায় এরূপ শব্দের সৃষ্টি বোধ হয় অদ্যাপি হয় নাই। বর্ণ বা গন্ধ জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঠিক

ঐরূপ। ফলতঃ শিক্ষা হাতে কলমে না হইলে যে কোন বিশেষ ফল হয় না, তাহার প্রমাণের জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে কেন? আমাদের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষাই তদ্রূপ। বেদের শিক্ষা কিন্তু আধাআধি ছিল না। প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বই Theoretical এবং Practical উভয়রূপেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এই Theoretical শিক্ষার নাম "অপরা" এবং Practical শিক্ষার নাম "পরা-বিদ্যা" ছিল। পুস্তক হইতে বা গুরুমুখে যাহা শিক্ষা করা হইত,—তাহা প্রকৃতি, জীবাত্মা অথবা ব্রহ্ম যে বিষয়েরই হউক,—তাহাকে "অপরা-বিদ্যা" বলিত। এই জন্যই উপনিষদে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাঽপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" স্পষ্ট লিখিত আছে। জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে Practical শিক্ষা ও জ্ঞান অনেক সভ্যদেশে বর্ত্তমান আছে এবং উহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষও সাধিত হইতেছে, কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে Practical জ্ঞানলাভ করিবার পন্থা ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ভারতের এই গৌরব আমাদের হৃদয়ে যে আনন্দের উদ্রেক করে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।

এই একটী মন্ত্রের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা কত তত্ত্বই পাইলাম, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনও শেষ হয় নাই। প্রকৃতিকে "উৎ" নাম জীবাত্মাকে "উত্তর", "দেব" নাম এবং পরমাত্মাকে "উত্তম" "জ্যোতিঃ" "সূর্য্য" নাম কেন দেওয়া হইয়াছে, তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ প্রকৃতির স্বভাবগত কেন, উহারা কি, এইরূপ কত আবশ্যক কথা বলা হয় নাই এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থানই বা কোথায়! নিজাম রাজ্যের পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মহাশয় এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে কথিত মর্ম্মার্থের জন্য আমরা এই প্রতিভাবান পণ্ডিতের নিকট কৃতজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে একখানি বৃহৎ পুস্তক না লিখিলে এরূপ গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী বেদবাণীর অর্থ প্রকাশ করা যায় না। বঙ্গদেশে এরূপ চেষ্টা কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। আমরা অতি ভয়ে ভয়ে এই পথে অগ্রসর হইয়াছি। যদি দেশবাসীর এ বিষয়ে উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, মধ্যে মধ্যে এইরূপে বেদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে যত্নবান থাকিব।

আমাদিগের আরও দুর্ভাগ্য যে বেদের সম্বন্ধে অসংখ্য ভ্রান্তমত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের বিশ্বাস বেদান্ত বা উপনিষৎ শাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু বেদে ব্রহ্মের নাম গন্ধও নাই। বেদে সূর্য্য চন্দ্রাদি কতকগুলি জড় পদার্থের পূজা এবং উপাসনা মাত্র লিখিত আছে। বৈদিক ঋষিগণ নাকি রাত্রিশেষে উষার আগমন এবং তৎপরে সূর্য্যোদয়, রাত্রিতে চন্দ্রের প্রকাশ, আকাশে একবার বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ মেঘমালার বিকাশ পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য নক্ষত্র;—কখনও উল্কাপাত কখনও বজ্রপাত কখনও বা দাবানল এইরূপ নানা অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও উৎপাত দেখিয়া ভয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তত্তৎ ভৌতিক পদার্থের স্তুতি ও তোষামোদ করিয়া গিয়াছেন। কখনও বা সোমরস পানে মত্ত হইয়া সরল প্রাণে সরল গ্রাম্যগীত গাহিয়াছেন। হায়! পরম জ্ঞানময় পরমাত্মার তপস্যা ও মনন হইতে জাত বেদবাণীর কি মর্য্যাদা। অজ্ঞ

পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, বেদে জড় প্রকৃতির পূজা অথবা কৃষকের গীতের পরিচয় পান, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে ঐরূপ কথা নাই। প্রত্যুত চতুর্ব্বেদের মন্ত্রসংহিতা জড় জীব ও ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ তত্ত্ব বিদ্যায় পূর্ণ। ঋগ্বেদের "অগ্নিমীলে" মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্রেই ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্ট দেদীপ্যমান। উপনিষদ বা বেদান্ত বেদের উপসংহার বা শেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদে ব্রহ্ম না থাকিলে তিনি বেদান্তে কিরূপে আসিবেন? বেদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজিত।

বৈদিক দেবতাদিগের অর্থ "শতপথ" নামক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেশ স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। সম্প্রতি মাত্র সংক্ষেপে দেখাইতে চাহি যে, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার বিষয় বেদেই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, হুতাশন, আদিত্য, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতা জজ, মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, কালেক্টর প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন,—পুরাণের দেবতার কথা বলিতেছি না, বৈদিক দেবতার কথা বলিতেছি, এইগুলি এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ, অনন্তদয়াধার, অনন্তন্যায়বান প্রভৃতি যেমন পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম, ঠিক সেইরূপ অর্থেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি নাম এক পরব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা কষ্টকল্পনা বা মনগড়া অর্থ নহে, বেদ মন্ত্রেই তাহা সুব্যক্ত। এই দেখুন;—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ
স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং
মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২২॥

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমা।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স
প্রজাপতিঃ॥" যজুর্ব্বেদ ৩২।১॥

"স বরুণঃ সায়ং অগ্নির্ভবতি স মিত্রো
ভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভূত্বাঽন্তরিক্ষেণ যাতি স
ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবম্॥"
অথর্ব্ববেদ ॥১৩৩।১৩॥

"স ধাতা স বিধাতা স বায়ুর্ণভ উচ্ছ্রিতম॥৩॥
স সোঽর্য্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ॥৪॥
সো অগ্নিঃ স উ সূর্য্যঃ স উ এব মহাযমঃ॥৫॥"
অথর্ব্ববেদ ॥ ১৩। ৪ ॥

এই উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি এত সরল যে উহার অনুবাদ করিবার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। আমরা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মাই ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদমন্ত্রে কথিত হইয়াছেন ও পূজিত হইয়াছেন। জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব যে তত্ত্বেরই অনুসন্ধান করুন সর্ব্বার্থ ফলপ্রদ বেদ সকল তত্ত্বেরই শিক্ষা দিতে সমর্থ। সেই হেতু আমরা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলিয়া আসিয়াছি বিদ্যার অপর নাম বেদ, বেদ লৌকিক ও পারমার্থিক সমুদায় বিদ্যার আকর। দর্শন, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যার প্রসূতি বেদ। বেদহীন হইয়াই ভারতের শিক্ষা লোপ পাইয়াছে। শিক্ষার লোপ বশতঃই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। আমরা যদি জগতে উন্নতিলাভ করিবার ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে শিক্ষার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, শিক্ষা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। শিক্ষার মূল বেদে। যদি ভারতে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপন ও অনুশীলন জাগ্রত হয়, যদি ভারতে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, যদি পুনশ্চ ভারতের নরনারী প্রকৃত ও পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শারীরিক

মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে কৃতকার্য্য হয়, তবেই ভারতের উন্নতির আশা আছে। ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে পবিত্র এবং মার্জ্জিত করিয়া সৎপথে চালিত করুন; তিনি আমাদিগকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিন। অতঃপর সেই পরমপ্রভু পরমাত্মার উপদিষ্ট বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট সভক্তি প্রার্থনা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করি।

"যস্মিন্নৃচঃ সাম যজুংষি যস্মিন্
প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিঁশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥
সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্
নেনীয়তেঽভীশুভির্ব্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং
তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥"

যজুর্ব্বেদ॥ ২৪॥ ৫। ৬।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

দ্রৌপদী। (কাব্য)। শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত পবিত্র গ্রন্থ মহাভারতের দ্রৌপদীকে কে না জানেন? যে মহীয়সী মহিলার অতুল গুণগ্রামে মহাভারত গ্রন্থ অলঙ্কৃত, যাঁহার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীরত্ন-পঞ্চকের অন্তর্নিবিষ্ট, সেই পুণ্যবতী বীর্য্যশালিনী মহিলা বনবাসকালে দুর্য্যোধনকৃত অপমান ও পাণ্ডবগণের দুর্গতি স্মরণে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কৌরববধার্থ উত্তেজিত করেন। মহাকবি ভারবি তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে সংস্কৃত ভাষায় ইহাঁর মুখ দিয়া যে জ্বলন্ত গৈরিকস্রোত নিঃসারিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখিকা বঙ্গভাষায় সেই স্রোত বহাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখিকার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। পুস্তকখানি এমনই ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতে হয়। ইহা সাধারণ গৌরবের কথা নহে। আমাদের আরও গৌরবের বিষয় এই যে, এই ওজস্বিনী ভাষার লেখিকা জনৈকা বঙ্গ রমণী। আমরা লেখিকার লিপিকুশলতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি।

জয়চাঁদের চিঠি। শ্রীযুক্ত রামাচরণ বসু প্রণীত। ১১৪।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা পত্রাকারে লিখিত উপন্যাস। ইহাতে ১৮ খানি পত্র আছে। প্রত্যেক পত্রই কৌতূহলোদ্দীপক নানা বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উপাখ্যান বঙ্গভাষায় নূতন বলিতে হইবে। ইহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক কথাই আছে। সামাজিক, বৈষয়িক, রাজনৈতিক প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অনেক গুহ্য রহস্য অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুস্তকখানি পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। বাজে নাটক বা উপন্যাস অপেক্ষা যে ইহা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট হিতকর ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি, এবং সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শিব অনুরোধ করি না আসিবে যেই।
এই যজ্ঞে কদাচ না ভাগ পাবে সেই॥
পরম পুরুষ ব্রহ্ম ভগবান্ যিনি।
যজ্ঞ রক্ষা করিবারে এসেছেন তিনি॥
আমার মুখেতে সবে এসেছ হেথায়।
ভয় ত্যজি থাক সর্ব্বে চিন্তা নাই তায়॥
দক্ষ-বাক্য শুনি সর্ব্ব দেবে হৈল ভয়।
শিবশূন্য সভা যদি না জানি কি হয়॥
যজ্ঞ রক্ষা করিতে আইলা নারায়ণ।
ইহা শুনি নির্ভয়ে বসিলা দেবগণ॥
সতী বিনা অদিত্যাদি সর্ব্ব কন্যাগণে।
আনি দক্ষ তুষ্ট কৈল বস্ত্র-আভরণে॥
করিল যজ্ঞের দ্রব্য যে মত বিধান।
অন্নাদি সঞ্চয় কৈল পর্ব্বতপ্রমাণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কৈল মহানদী।
রসের সামগ্রী কৈল যেন মহোদধি॥
দ্রব্য আয়োজন করে হয়ে শুদ্ধমতি।
যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত হৈলা দক্ষ প্রজাপতি॥
স্বয়ং বসুমতী তাহে যজ্ঞবেদি হন।
যজ্ঞকুণ্ডে আপনি থাকিলা হুতাশন॥
প্রজ্বলিত হৈল অগ্নি করে হন্ হন্।
নির্ধূম হইয়া শিখা পরশে গগন॥
ব্রহ্ম কর্ম্মে বিধাতা আপনি লৈলা ভার।
নিযুক্ত হইল হোতা অষ্টাশি হাজার॥
স্বশিষ্য আছিলা যত ঋষি মুনি ভাগে।
বেদ পাঠে প্রবৃত্ত হইলা সেই যাগে॥
যজ্ঞ যিনি আপনি হইয়া মূর্ত্তিমান্।
বেদিতে বসিলা যজ্ঞে করি অধিষ্ঠান॥
ত্রৈলোক্য রক্ষার কর্ত্তা নারায়ণ যিনি।
যজ্ঞ রক্ষা করিবারে বসিলেন তিনি॥
এরূপে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দক্ষ প্রজাকর।
দধীচি লইয়া কিছু শুন অতঃপর॥

মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস মহামুনি।
রামনিধি ভনে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥

২৪। লঘু ত্রিপদী।

সভাতে বসিয়া, শিবে না দেখিয়া,
দধীচি প্রধান মুনি।
কৈলা ওহে দক্ষ, এত বড় যজ্ঞ,
কভু না দেখি না শুনি॥
কহিলাম দড়, যজ্ঞ এত বড়,
ন ভূত ন ভবিষ্যতি।
যজ্ঞে আগমন, সর্ব্ব দেবগণ,
স্বয়ং আদি লক্ষ্মীপতি॥
যজ্ঞেতে আসিয়া, সাক্ষাতে বসিয়া,
নিজ নিজ ভাগ মত।
হয়ে হর্ষ মন, আহুতি গ্রহণ,
করেন দেবতা যত॥
প্রাণী মাত্র দেখি, কেহ নাহি বাকি,
তুমি জ্ঞানবান্ অতি।
নাহি দেখি কেনে, দেব ত্রিলোচনে,
যিনি দেব অধিপতি॥
দধীচির বাণী, দক্ষরাজ শুনি,
কহিতে লাগিলা রাগে।
শুন তপোধন, শিবে নিমন্ত্রণ,
আমি করি নাই যাগে॥
শ্মশানেতে থাকে, অঙ্গে ভস্ম মাখে,
সঙ্গে প্রেত ভূত চয়।
যজ্ঞ মহোৎসবে, পুণ্য কর্ম্ম হবে,
ইতে শিবে আনা নয়॥
দক্ষের বচন, শুনি তপোধন,
কহিতে লাগিলা পুন।
ওহে দক্ষরাজ, কিবা কর কাজ,
আমি যা কহি তা শুন॥

জীব হীন জনে, রত্ন আভরণে,
যেন শোভা নাহি হয়।
তেমতি এ যাগে, শিব বিনা লাগে,
যে মত শ্মশানময়॥
শুনি মুনি বাক্য, কোপে কহে দক্ষ,
বুঝে কর্ম্ম করি আমি।
তোমা নিমন্ত্রণ, কৈলা কোন্ জন,
কেন বা আইলে তুমি॥
বলত তোমারে, জিজ্ঞাসা কে করে,
আপনা বুঝ কেমন।
বুঝিলাম আমি, দুষ্ট দ্বিজ তুমি,
যে হেতু কহ এমন॥
দক্ষ প্রজাপতি, এত কৈল যদি,
বুদ্ধি হয়ে বিপরীত।
দধীচি বুঝিয়া, ক্রোধ সংবরিয়া,
কহিতে লাগিলা হিত॥
আমি নিমন্ত্রিত, কিংবা অনাহূত,
এসেছি তব দুর্ম্মুখে।
রাখ মোর বাণী, আন শূলপাণি,
নিমন্ত্রণ কর তাঁকে॥
বিনা মৃত্যুঞ্জয়, যজ্ঞে ফলোদয়,
না হবে শুন এ কথা।
কথা অযথার্থ, তাহা যথা ব্যর্থ,
বেদহীন দ্বিজ যথা॥
আর যে বিশেষ, বৃথা সেই দেশ,
যেই দেশ গঙ্গাহীন।
ওহে প্রজাপতি, জানিবা তেমতি,
বৃথা যজ্ঞ শিব বিনা॥
আর বুঝ মনে, যেমত বিধানে,
আকাঙ্ক্ষা করে যে বৃথা।
নারী বৃথা সেই, পতিহীনা যেই,
শিব বিনা যজ্ঞ তথা॥
আর অপুত্রক, গৃহী অনর্থক,
তিলহীন যে তর্পণ।
তা যথা নিষ্ফল, তেমতি সকল,
যজ্ঞ বিনা ত্রিলোচন॥
আর শুন এই, কোশা বিনা যেই,
সন্ধ্যা করে বৃথা হয়।
হোম বিনা ঘৃত, নিষ্ফল সে মত,
যজ্ঞ বিনা মৃত্যুঞ্জয়॥
যেই দামোদর, সেই গঙ্গাধর,
শিব স্বয়ং নারায়ণ।
দুহাকার স্থির, একই শরীর,
ভেদ নাহি কদাচন॥
পূজা অপমানে, একেতে দুজনে,
তাহে অন্যমত নয়।
যদি শিব নিন্দে, তা হয় গোবিন্দে,
বিষ্ণু নিন্দা শিবে হয়॥
একে পূজা করে, নিন্দে যে অপরে,
সেই মূঢ়মতি জন।
নিন্দিয়া একেরে, যাঁর পূজা করে,
তিনি না প্রসন্ন হন॥
শিবে অপমানে, যজ্ঞ সমাধানে,
মনেতে করেছ আশ।
শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ, তব এই যজ্ঞ,
কোপেতে করিবা নাশ॥
দক্ষ কহে হরি, সৃষ্টি রক্ষাকারী,
তিনি যজ্ঞ রক্ষাকর।
শ্মশান নিবাসী, সেখানেতে আসি,
কি করিবে মোরে হর॥
প্রেতভূমি প্রিয়, শম্ভু যজ্ঞপিয়,
আইসে আমার মখে।
দেখি তব হরে, চক্র লয়ে করে,
গোবিন্দ বারিবা তাঁকে॥
শুনি কন মুনি, দেব চক্রপাণি,
তোমা সম মূঢ় নন।
পরম পুরুষ, তিনি যে নিস্তব্ধ,
ধ্বংসহীন ভগবান্॥
হবেক বিচ্ছেদ, হরিহরে ভেদ,
এ না বিবেচনা করি।
জ্ঞানশূন্য হৈয়া, তোমার লাগিয়া,
যুদ্ধ কি করিবা হরি॥

দেখ যে মাধবে, নিবারিতে ভবে,
এথা হয়ে তব পক্ষ।
যেমত রাখিবা, অচিরে দেখিবা,
আপন নয়নে দক্ষ॥
ছাড়হ দুর্ম্মতি, নাহি আর গতি,
যজ্ঞ পূর্ণ যদি হবে।
এখন যাইয়ে, স্তুতি মতে কয়ে,
আন সতী সহ ভবে॥
ব্যাসের সম্মত, মহাভাগবত,
পুরাণ প্রমাণ জানি।
ভাষা বিরচণে, রামনিধি ভনে,
দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥

২৫। পয়ার ছন্দ।

শিব কৈলা নারদ করহ অবধান।
দধীচির বাক্যে দক্ষ কোপে কম্পমান্॥
চক্ষু করে রক্তবর্ণ বলে নিজগণে।
দূর কর দূর কর দধীচি বামনে॥
এত আজ্ঞা দিল যদি দক্ষ প্রজাপতি।
হাস্য করে কহিলা দধীচি মহামতি॥
দূর কি করিবা মোরে ওই ওহে মূঢ়।
আপন মঙ্গল হৈতে তুমি হৈবা দূর॥
শিবের কোপের দণ্ড হইয়া উৎপত্তি।
অচিরে তোমার শিরে পড়িবে দুর্ম্মতি॥
ইহা কহি মুনি হয়ে কোপে কম্পমান্।
দুই চক্ষু হৈল যেন তাম্রের সমান॥
তেজে যেন মধ্যাহ্নকালের দিবাকর।
সভা হৈতে উঠিয়া গেলেন মুনিবর॥
দধীচি গেলেন দেখি দুর্ব্বাসা চ্যবন।
বামদেব গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ॥
শিবের মাহাত্ম্য যাঁরা জানেন তদন্ত।
যজ্ঞ ছাড়ি উঠি তাঁরা গেলেন যাবন্ত॥
মুনিগণ গেলা দেখি দক্ষ প্রজাপতি।
অবশেষ দ্বিজগণে করি বহু স্তুতি॥
দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া হয়ে অকাতর।
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল অনন্তর॥
তদন্তে কহিল তার যত বন্ধুভাগে।
সতীকে কদাচ না আনিবা এই যাগে॥
শুনহ নারদ দক্ষ হয়ে মতিচ্ছন্ন।
সতী শিবে নিন্দা করি হইল ক্ষীণ পুণ্য॥
উত্তমা প্রকৃতি যারে জানিয়ে নিশ্চিত।
সে মহামায়াতে দক্ষ হইল বঞ্চিত॥
কৈলাসে ছিলেন জগদম্বা সনাতনী।
সকল জানিলা তিনি অন্তরযামিনী॥
দক্ষের বৃত্তান্ত দেবী সকল জানিলা।
বসিয়া শিবের পাশে ভাবিতে লাগিলা॥
গিরিরাজ-পত্নী মেনা মোরে ভক্তিভাবে।
আকাঙ্ক্ষা আছিল তাঁর মোরে কন্যা পাবে॥
প্রেমভাবে তাঁর সঙ্গে করেছি নিশ্চয়।
তব কন্যা হব ইথে নাহিক সংশয়॥
পূর্ব্বে দক্ষ আমার তপস্যা কৈল যবে।
প্রার্থনা করিয়াছিলা মোর কন্যা হবে॥
সেইকালে কহিয়াছিলাম আমি তাঁরে।
অনাদর যবে তুমি করিবে আমারে।
ক্ষীণপুণ্য তোমার হইয়া তেকারণে।
মায়া ত্যজি মোহ করে যাইব স্বস্থানে॥
প্রজাপতি ক্ষীণপুণ্য হইল নিশ্চিত।
অতএব সেইকাল হৈল উপস্থিত॥
ক্ষীণপুণ্য দক্ষ মোরে কৈল অনাদর।
তারে ত্যজি স্বস্থানে যাইব অতঃপর॥
পরে জন্ম লব গিয়া হিমন্তের ঘরে।
পুনর্ব্বার পতি পার দেব দেব হরে॥
দক্ষকন্যা সতী এই স্থির করে মনে।
ছল চেষ্টা রৈল দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে॥
দক্ষালয় হইতে নারদ মুনিবর।
হেনকালে আইলা যথা দেবদেব হর॥
তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে মহেশ্বরে।
প্রণাম করিলা মুনি পড়ি ক্ষিতিপরে॥
প্রণমিয়া মুনিবর সম্মুখে থাকিলা।
দক্ষের যজ্ঞের কথা কহিতে লাগিলা॥
বড় যজ্ঞ আরম্ভিল দক্ষ প্রজাপতি।
নিমন্ত্রণ স্বর্গমর্ত্ত পাতাল প্রভৃতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর পর্ব্বত যাবত।
উরগ কিন্নর আদি প্রাণী যে তাবত॥

যত জন বৈসে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে।
যজ্ঞে দক্ষ নিমন্ত্রণ করেছে সকলে॥
ত্রৈলোক্যে যে কেহ আছে সবাকারে দেখি
নিমন্ত্রণে সতী আর তুমি মাত্র বাকি॥
সতী আর তোমাকে না দেখি দক্ষবাসে।
মনোদুঃখে ত্যজিয়া এসেছি তব পাশে॥
উচিত তথায় দুহে করহ গমন।
বিলম্ব করণে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শিব কৈলা আমাদের সেখানে কি কাজ।
বাঞ্ছামত যজ্ঞত করুক দক্ষরাজ॥
নারদ কহিলা ইতে তব অপমান।
মূঢ় দক্ষ যদি যজ্ঞ করে সমাধান॥
সেই যজ্ঞে যদি তব ভাগ নাহি থাকে।
তবে কি অবজ্ঞা লোকে না হবে তোমাকে
তেকারণে দক্ষযজ্ঞে ভাগ লও আগে।
অথবা করহ বিঘ্ন দক্ষের সে যাগে॥
শিব কৈলা না যাইব আমি কিংবা সতী।
গেলেও না যজ্ঞভাগ দিবে প্রজাপতি॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস তপোধন।
ভাষামতে দ্বিজ রামনিধি বিরচন॥

২৬। লঘু ত্রিপদী।

শিবের বচন, করিয়া শ্রবণ,
নারদ তাহার পরে।
যিনি শিবজায়া, সতী মহামায়া,
কহিতে লাগিলা তাঁরে॥
তুমি জগন্মাতা, গমনেতে তথা,
তোমার উচিত হয়।
তব পিতা দক্ষ, করে মহাযজ্ঞ,
আহূত জগতময়॥
যার পিত্রালয়, মহোৎসব হয়,
যে কন্যা শ্রবণ করে।
তাহে ধৈর্য্য ধরে, কহ মান করে,
কেবা থাকে নিজ ঘরে॥
তোমার ভগিনী, আর যিনি যিনি,
সবে এল শীঘ্রগতি।
তাঁদিগে সবারে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
তুষ্ট কৈলা প্রজাপতি॥
শুন সুরেশ্বরি, দক্ষ দর্প করি,
যেমত বর্জ্জিল তোমা।
যাহ তার বাসে, দর্পের বিনাশে,
কদাচ না কর ক্ষমা॥
দেব পরাৎপর, মহাযোগী হর,
সমপূজা অপমান।
যজ্ঞে না চলিবা, বিঘ্ন না করিবা,
তাহে নাহি অবধান॥
সতী সম্বোধিয়া, এরূপে কহিয়া,
প্রণমিয়া থাকি দূরে।
নারদ তপস্বী, যিনি দেবঋষি,
পুন গেলা দক্ষ পুরে॥
কৈলা শূলপাণি, মুনিবাক্য শুনি,
হইয়া চঞ্চল মতি।
যজ্ঞ দরশনে, ইচ্ছা করি মনে,
শিবেরে কহিলা সতী॥
দ্রব্য অতিশয়, করিয়া সঞ্চয়,
আমার জনক দক্ষ।
প্রভু শুন বাণী, যজ্ঞপিহ তিনি,
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ॥
তোমারে আমারে, যাওয়া তথাকারে,
উচিত অন্তরে মানি।
আমরা নিশ্চিত, হৈলে উপস্থিত,
সম্মান করিবা তিনি॥
শিব কৈলা প্রিয়া, এমত চিন্তিয়া,
কদাচিত যাওয়া নয়।
অনাহ্বানে যাওয়া, কিংবা মৃত্যু হওয়া,
এ দুই সমান হয়॥
রূপে বিদ্যাধর, ধনে যক্ষেশ্বর,
এহেতু দক্ষ গর্ব্বিত।
মোরে হেলা করে, ইতে তার ঘরে,
যাওয়া অতি অনুচিত॥
অপমান মোরে, করিবার তরে,
যজ্ঞ করে প্রজাপতি।

আমি কিংবা তুমি, গেলে যজ্ঞভূমি,
যে হবে শুন তা সতি॥
বিনা অপমান, না হবে সম্মান,
লোকে হবে উপহাস।
দক্ষ দর্প ভরে, মোরে তুচ্ছ করে,
যাওয়া নহে তার বাস॥
শ্বশুরের ঘরে, যদি জামাতারে,
আদর গৌরব রয়।
তবে যাওয়া বটে, নহে এই ঘটে,
মরণ অধিক হয়॥
যে হয় জামাই, শ্বশুরের ঠাঁই,
আদর অপেক্ষা করে।
শ্বশুর তেমতি, আইলে বিপতি,
সমাদরে লবে ঘরে॥
অনাদর যথা, জামাতার তথা,
শ্রেয়ঃ বটে বিবর্জ্জনে।
নহে ধর্ম্মহানি, কহি সত্যবাণী,
তথ্য শুন বরাননে॥
জামাতার দ্বেষ, যে করে বিশেষ,
অতি পাপে মজে সেই।
করি এই চিন্তা, জামাতার নিন্দা,
না করে সুধীর যেই॥
জামাতার এই, শ্বশুরের যেই,
অপ্রিয়তা করা নয়।
কৈলে অসঙ্গত, জন্ম বহুশত,
নরকে পড়িয়া রয়॥
অসম্মান পরে, শ্বশুরের ঘরে,
জামাতা কভু না যায়।
কেহ কোনখানে, গেলে অনাহ্বানে,
মরণ সমান তায়॥
বিশেষতঃ সতী, শ্বশুর বসতি,
ইহা কিনা বুঝ তুমি।
এই সে কারণে, না যাব এক্ষণে,
শ্বশুর ভবনে আমি॥
অপ্রিয় যে যার, তথা যাওয়া তার,
অনুচিত দক্ষ মুখে।
শ্বশুরের প্রীত, করিতে উচিত,
ধর্ম্মাশ্রয় করে তাকে॥
হয় রূপবান্, বাড়য়ে সন্তান,
নিশ্চয় জানিবা অতি।
করিলে অপ্রীত, জানিবা নিশ্চিত,
হানি হয় শুন সতি॥
অতএব না যাব, গেলে পিতা তব,
মনেতে নহিবা সুখী।
আর অহর্নিশে, মোরে এই ভাষে,
অতি সুদরিদ্র দুঃখী॥
অনাহূত গেলে, আমারে দেখিলে,
বিশেষতঃ কবে আর।
বিনা নিমন্ত্রণে, শ্বশুর ভবনে,
দুর্ব্বাক্য সহন ভার॥
আর শুন কথা, আইলে জামাতা,
শ্বশুর শক্তির মত।
যেমত পারিবে, জামাতাকে দিবে,
নহে ধর্ম্ম হয় হত॥
এহেতু যে স্থান, এমত বিধান,
সম্মান অপেক্ষা অতি।
অপমান লাভে, সেখানে কে যাবে,
কহত বিনা দুর্ম্মতি॥
অতএব সতি, হও ক্ষমাবতী,
বিবেচনা কর আগে।
নহ নিমন্ত্রিত, যাওয়া অনুচিত
তোমার পিতার যাগে॥
শিবের বচন, শুনি সতী কন,
প্রভু যে কৈলা নিশ্চয়।
বুঝিলাম তথ্য, সবি বটে সত্য,
ইহাতে নাহি সংশয়॥
কিন্তু শুন কথা, তুমিত জামাতা,
পূর্ব্বে আমাকে কৈলা দান।
গেলে যজ্ঞ মাঝে, পড়ে চক্ষুলাজে,
হৈতে বা পারে সম্মান॥
শুনি কন ঈশ, দক্ষ কি তাদৃশ,
যে না বুঝে হিতাহিত।

যত জন বৈসে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে।
যজ্ঞে দক্ষ নিমন্ত্রণ করেছে সকলে॥
ত্রৈলোক্যে যে কেহ আছে সবাকারে দেখি
নিমন্ত্রণে সতী আর তুমি মাত্র বাকি॥
সতী আর তোমাকে না দেখি দক্ষবাসে।
মনোদুঃখে ত্যজিয়া এসেছি তব পাশে॥
উচিত তথায় দুহে করহ গমন।
বিলম্ব করণে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শিব কৈলা আমাদের সেখানে কি কাজ।
বাঞ্ছামত যজ্ঞত করুক দক্ষরাজ॥
নারদ কহিলা ইতে তব অপমান।
মূঢ় দক্ষ যদি যজ্ঞ করে সমাধান॥
সেই যজ্ঞে যদি তব ভাগ নাহি থাকে।
তবে কি অবজ্ঞা লোকে না হবে তোমাকে
তেকারণে দক্ষযজ্ঞে ভাগ লও আগে।
অথবা করহ বিঘ্ন দক্ষের সে যাগে॥
শিব কৈলা না যাইব আমি কিংবা সতী।
গেলেও না যজ্ঞভাগ দিবে প্রজাপতি॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস তপোধন।
ভাষামতে দ্বিজ রামনিধি বিরচন॥

২৬। লঘু ত্রিপদী।

শিবের বচন, করিয়া শ্রবণ,
নারদ তাহার পরে।
যিনি শিবজায়া, সতী মহামায়া,
কহিতে লাগিলা তাঁরে॥
তুমি জগন্মাতা, গমনেতে তথা,
তোমার উচিত হয়।
তব পিতা দক্ষ, করে মহাযজ্ঞ,
আহূত জগতময়॥
যার পিত্রালয়, মহোৎসব হয়,
যে কন্যা শ্রবণ করে।
তাহে ধৈর্য্য ধরে, কহ মান করে,
কেবা থাকে নিজ ঘরে॥
তোমার ভগিনী, আর যিনি যিনি,
সবে এল শীঘ্রগতি।
তাঁদিগে সবারে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
তুষ্ট কৈলা প্রজাপতি॥
শুন সুরেশ্বরি, দক্ষ দর্প করি,
যেমত বর্জ্জিল তোমা।
যাহ তার বাসে, দর্পের বিনাশে,
কদাচ না কর ক্ষমা॥
দেব পরাৎপর, মহাযোগী হর,
সমপূজা অপমান।
যজ্ঞে না চলিবা, বিঘ্ন না করিবা,
তাহে নাহি অবধান॥
সতী সম্বোধিয়া, এরূপে কহিয়া,
প্রণমিয়া থাকি দূরে।
নারদ তপস্বী, যিনি দেবঋষি,
পুন গেলা দক্ষ পুরে॥
কৈলা শূলপাণি, মুনিবাক্য শুনি,
হইয়া চঞ্চল মতি।
যজ্ঞ দরশনে, ইচ্ছা করি মনে,
শিবেরে কহিলা সতী॥
দ্রব্য অতিশয়, করিয়া সঞ্চয়,
আমার জনক দক্ষ।
প্রভু শুন বাণী, যদ্যপিহ তিনি,
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ॥
তোমারে আমারে, যাওয়া তথাকারে,
উচিত অন্তরে মানি।
আমরা নিশ্চিত, হৈলে উপস্থিত,
সম্মান করিবা তিনি॥
শিব কৈলা প্রিয়া, এমত চিন্তিয়া,
কদাচিত যাওয়া নয়।
অনাহ্বানে যাওয়া, কিংবা মৃত্যু হওয়া,
এ দুই সমান হয়॥
রূপে বিদ্যাধর, ধনে যক্ষেশ্বর,
এহেতু দক্ষ গর্ব্বিত।
মোরে হেলা করে, ইতে তার ঘরে,
যাওয়া অতি অনুচিত॥
অপমান মোরে, করিবার তরে,
যজ্ঞ করে প্রজাপতি।

আমি কিংবা তুমি, গেলে যজ্ঞভূমি,
যে হবে শুন তা সতি॥
বিনা অপমান, না হবে সম্মান,
লোকে হবে উপহাস।
দক্ষ দর্প ভরে, মোরে তুচ্ছ করে,
যাওয়া নহে তার বাস॥
শ্বশুরের ঘরে, যদি জামাতারে,
আদর গৌরব রয়।
তবে যাওয়া বটে, নহে এই ঘটে,
মরণ অধিক হয়॥
যে হয় জামাই, শ্বশুরের ঠাঁই,
আদর অপেক্ষা করে।
শ্বশুর তেমতি, আইলে বিপ্পতি,
সমাদরে লবে ঘরে॥
অনাদর যথা, জামাতার তথা,
শ্রেয়ঃ বটে বিবর্জ্জনে।
নহে ধর্ম্মহানি, কহি সত্যবাণী,
তথ্য শুন বরাননে॥
জামাতার দ্বেষ, যে করে বিশেষ,
অতি পাপে মজে সেই।
করি এই চিন্তা, জামাতার নিন্দা,
না করে সুধীর যেই॥
জামাতার এই, শ্বশুরের যেই,
অপ্রিয়তা করা নয়।
কৈলে অসঙ্গত, জন্ম বহুশত,
নরকে পড়িয়া রয়॥
অসম্মান পরে, শ্বশুরের ঘরে,
জামাতা কভু না যায়।
কেহ কোনখানে, গেলে অনাহ্বানে,
মরণ সমান তায়॥
বিশেষতঃ সতী, শ্বশুর বসতি,
ইহা কিনা বুঝ তুমি।
এই সে কারণে, না যাব এক্ষণে,
শ্বশুর ভবনে আমি॥
অপ্রিয় যে যার, তথা যাওয়া তার,
অনুচিত দক্ষ মুখে।
শ্বশুরের প্রীত, করিতে উচিত,
ধর্ম্মাশ্রয় করে তাকে॥
হয় রূপবান্, বাড়য়ে সন্তান,
নিশ্চয় জানিবা অতি।
করিলে অপ্রীত, জানিবা নিশ্চিত,
হানি হয় শুন সতি॥
অতএব না যাব, গেলে পিতা তব,
মনেতে নহিবা সুখী।
আর অহর্নিশে, মোরে এই ভাষে,
অতি সুদরিদ্র দুঃখী॥
অনাহূত গেলে, আমারে দেখিলে,
বিশেষতঃ কবে আর।
বিনা নিমন্ত্রণে, শ্বশুর ভবনে,
দুর্ব্বাক্য সহন ভার॥
আর শুন কথা, আইলে জামাতা,
শ্বশুর শক্তির মত।
যেমত পারিবে, জামাতাকে দিবে,
নহে ধর্ম্ম হয় হত॥
এহেতু যে স্থান, এমত বিধান,
সম্মান অপেক্ষা অতি।
অপমান লাভে, সেখানে কে যাবে,
কহত বিনা দুর্ম্মতি॥
অতএব সতি, হও ক্ষমাবতী,
বিবেচনা কর আগে।
নহ নিমন্ত্রিত, যাওয়া অনুচিত
তোমার পিতার যাগে॥
শিবের বচন, শুনি সতী কন,
প্রভু যে কৈলা নিশ্চয়।
বুঝিলাম তথ্য, সবি বটে সত্য,
ইহাতে নাহি সংশয়॥
কিন্তু শুন কথা, তুমিত জামাতা,
পূর্ব্বে আমাকে কৈলা দান।
গেলে যজ্ঞ মাঝে, পড়ে চক্ষুলাজে,
হৈতে বা পারে সম্মান॥
শুনি কন ঈশ, দক্ষ কি তাদৃশ,
যে না বুঝে হিতাহিত।

অনাহূত গেলে, মোরে সভাস্থলে,
মান রাখে কদাচিত ॥
অহর্নিশ এই, নিন্দা করে সেই,
মোর নামে প্রজাপতি।
রামনিধি ভনে, পূজিবে সে কেনে,
বুঝে কিনা বুঝ সতী ॥

২৭। পয়ার ছন্দঃ।

শিবের বচন শুনি দক্ষকন্যা সতী।
কহিতে লাগিলা শিবে বিমরিষা অতি ॥
যাহবা না যাহ কর চিত্তে যাহা ভায়।
আমি যাব পিতৃবাসে আজ্ঞা দেহ তায় ॥
পিতৃবাসে মহোৎসব কন্যা যদি শুনে।
ধৈর্য্য হয়ে কেমনে থাকয়ে নিকেতনে ॥
অমান্যা আহূতা কত লইছে পূজন।
মান্যা হয়ে হবে কেন ধৈর্য্যাবলম্বন ॥
নিমন্ত্রণ অপেক্ষা করয়ে ভিন্ন ঠাঁই।
পিতৃবাসে কন্যা যেতে সে অপেক্ষা নাই ॥
এই হেতু যাব আমি পিতার বসতি।
কৃপা করি ত্রিপুরারি দেহ অনুমতি ॥
আমি গেলে পিতা মোর স্নেহে বশ হয়ে।
গৃহেতে লইবা মোরে আদর করিয়ে ॥
বিবেচনা ক্রমেতে উত্তম যাহা হয়।
সম্মান করিবা মোরে নাহিক সংশয় ॥
আমার সম্মান হৈলে শুন তথ্যকথা।
তোমার সম্মান তায় না হবে অন্যথা ॥
মোহান্ধ হইয়া পিতা যদ্যপি তোমায়।
জানিতে নারিলা কিবা ক্ষতি আছে তায় ॥
সেই অভিমানেতে না গিয়া যজ্ঞভূমি।
যজ্ঞভাগে অবজ্ঞা করহ কেন তুমি ॥
তিনলোকে তুমি সবাকার জ্ঞানদাতা।
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর বট কে করে অন্যথা ॥
মোর বাপে জ্ঞান দিয়া শুন ত্রিলোচন।
কেন বা যজ্ঞের ভাগ না কর গ্রহণ ॥
এই যজ্ঞে ভাগ আছে সর্ব্ব দেবতার।
ভাগে বিবর্জ্জিত নাহি তোমা বিনা আর ॥
তে কারণে জ্ঞান দিতে কহি পশুপতি।
শুনিয়া কহেন শিব শুন প্রিয়ে সতি ॥
যেই ভক্ত আমারে জানয়ে জ্ঞানদাতা।
তারে আমি জ্ঞান দিই না হয় অন্যথা ॥
মূঢ়মতি নিতান্ত অভক্ত যেই জন।
তারে আমি জ্ঞান নাহি দিই কদাচন ॥
মোরে ত্যজি যজ্ঞ করে দেবগণ সাথে।
তাহার দারুণ ফল হবে অচিরাতে ॥
মোর আজ্ঞা হেলা করে না যাইও সতি।
তুমি গেলে মোরে নিন্দিবেক প্রজাপতি ॥
মোর নিন্দা শুনে হবে তোমারে অসহ্য।
বল তবে যাওয়াতে হবেক কোন্ কার্য্য ॥
আর শুন সম্মান সে করিয়া তোমাকে।
একবার নিন্দা যদি করয়ে আমাকে ॥
মোর নিন্দা কথা সতি যদি শুন কানে।
কহ তব সম্মান থাকিবে কোন্‌খানে ॥
অতএব মোর আজ্ঞা করিয়ে লঙ্ঘন।
পিতৃযজ্ঞে সতি না যাইও কদাচন ॥
যেই নারী পতি আজ্ঞা অতিক্রম করে।
কখন তাহার সুখ না হয় সংসারে ॥
সতী কন সহস্র বলহ যদি মোরে।
তথাপি যাইব পিতৃ যজ্ঞ দেখিবারে ॥
আমি তথা গেলে প্রভু কর অবধান।
যদ্যপি করেন পিতা তোমার সম্মান ॥
পিতাকে কহিয়া তবে শুন পশুপতি।
অবশ্য দেয়াব যজ্ঞে তোমার আহুতি ॥
মোর অগ্রে তব নিন্দা করে যদি মূঢ়।
নাশিব তাহার যজ্ঞ শুন চন্দ্রচূড় ॥
শিব কৈলা যাওয়া তথা অনুচিত অতি।
অপমান বিনা মান না হইবে সতি।
মোর নিন্দা শুনি তুমি সহিতে নারিবা।
যাবেক তোমার প্রাণ তার কি করিবা ॥
সতী কৈলা আজ্ঞা তব হয় বা না হয়।
সত্য কহিলাম যাব পিতার আলয় ॥
শিব কৈলা মোর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া সর্ব্বথা।
পুনঃ পুনঃ কি কহিছ যাওনের কথা ॥

কিবা প্রয়োজন সত্য কহত সত্বর।
স্পষ্ট কহ করি তবে তাহার উত্তর ॥
দুরাত্মারা অসম্মানে কভু না ডরায়।
অসম্মান ভাব্য যথা তারা তথা যায় ॥
মান্য ব্যক্তি না যায় অপূজক আলয়।
অপূজকের যে পূজা সে পূজা মধ্যে নয় ॥
মোর নিন্দা শুনি সতী প্রীতি নাহি পাবে।
তবে মোর নিন্দকের গৃহে কেন যাবে ॥
সতী কৈলা তব নিন্দায় প্রীতি নাহি পাই।
নিন্দা শোনা ইচ্ছা করে আমি ত না যাই ॥
যেকালে তোমাকে ছাড়ি লয়ে দেবভাগ।
পিতা মোর আরম্ভ করিলা মহাযাগ ॥
যজ্ঞারম্ভ কালে তোমা না কৈলা আহ্বান।
সেইকালে হয়েছে তোমার অপমান ॥
তব অপমান হৈলে আমার কি নয়।
লোকেতে দেখিছে তাহা হয় কিনা হয় ॥
পতি পত্নী মধ্যে মান অপমান যার।
একের হইলে তাহা হয় দুহাকার ॥
দর্পে পিতা তোমাকে না করি নিমন্ত্রণ।
করিতে পারেন যদি যজ্ঞ সমাপন ॥
ধরাতলে তবে প্রভু হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
তোমাকে করিবা কেবা আহুতি প্রদান ॥
এই হেতু যাব আমি পিতৃনিকেতন।
এতে আজ্ঞা কর বা না কর ত্রিলোচন ॥
একান্ত যাইব আমি শুন কীর্ত্তিবাস।
যজ্ঞভাগ পাই কিংবা যজ্ঞ করি নাশ ॥
শিব কৈলা মানা করিলাম বার বার।
না শুনিলা কর তবে যে ইচ্ছা তোমার ॥
মন্দ বুদ্ধি আপনি করিয়া অপকর্ম্ম।
পরেরে দূষয়ে শেষে এই তার ধর্ম্ম ॥
দক্ষের তনয়া তুমি জানা আছে স্থির।
কেন বা না হবে মোর কথার বাহির ॥
যাহা বুঝ তাহা কর কহিলাম শিবা।
অনুমতি লওনের প্রয়োজন কিবা ॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস মহামুনি।
রামনিধি ভণে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥

২৮। ত্রিপদী।

শিববাক্যে ক্ষোভ পেয়ে, কোপে চক্ষু রাঙা হয়ে,
চিন্তা কৈলা দাক্ষায়নী সতী।
প্রার্থনা করিয়া পরে, পত্নী পেয়ে শিব মোরে,
মনে কৈলা সামান্যা প্রকৃতি ॥
কালানল সম নেত্রে, স্তব্ধ হৈল ক্ষণমাত্রে,
কোপেতে কাঁপয়ে ওষ্ঠাধর।
দেবীকে এমত হেরি, ভীত চিত্ত-ত্রিপুরারি,
হৈলা তবে শুন মুনিবর ॥
করালবদনা অতি, ভয়ানক দন্তপাঁতি,
মুহুর্মুহু অট্ট অট্ট হাস।
দেবীর দেখিয়া বেশ, দেব দেব ব্যোমকেশ,
মুগ্ধবৎ হৈলা পেয়ে ত্রাস ॥
কষ্টেতে মিলিয়া আঁখি, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি,
তদন্তরে শুন মহামতি।
হেমবাস ছিলা পরে, সহসা তা ত্যাগ করে,
বৃদ্ধাবস্থা হৈলা দেবী সতী ॥
দিগম্বরা মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা ভালে শশী,
লোহিত রসনা অবিরাম।
অনঙ্গে অলস অঙ্গ, চরণকমলে ভৃঙ্গ,
তনুরুহে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
মহাভীমা ঘোররাবা, কোটি-সূর্য্য-সম-প্রভা,
গলে মুণ্ডমালা শোভা করে।
উদয় কালের রবি, সমান অঙ্গের ছবি,
উজ্জ্বল কিরীটী শিরোপরে ॥
হেন ভয়ানক মূর্ত্তি, ধারণ করিয়া শক্তি,
নিজতেজে দীপ্তমানা সুখে।
অট্টহাসে মহাস্বনা, হইয়া উত্তিষ্ঠমনা,
দাণ্ডাইলা শিবের সম্মুখে ॥
দেবীর দেখিয়া কার্য্য, শিব হয়ে হত-ধৈর্য্য,
পলায়নে স্থির কৈলা মত।
যে দিকে পলায়ে যান, সম্মুখে দেখিতে পান,
ভয়ে শিব হৈলা মুগ্ধবত ॥
ধাবমান শূলপাণি, ইহা দেখি দাক্ষায়নী,
বারণ করেন বারবার।

ভয় নাই কীর্ত্তিবাস, উচ্চ শব্দে অট্টহাস,
হাস্য শব্দে তিষ্ঠে সাধ্য কার ॥
দেবীর আশ্বাসবাণী, হাস্যের নিস্বন শুনি,
যাওয়া থাক রহা সুদুষ্কর।
ধেয়ে গিয়ে অতি বেগে, ফিরি সর্ব্ব দিকে দিকে,
ভয়েতে বিভোল হৈলা হর ॥
ভয়ে অভিভূত পতি, দেখি দয়া করি সতী,
ইচ্ছা কৈলা পতিকে বারণ।
সর্ব্ব দিকে মহেশ্বরে, দেখা দিয়া তার পরে,
দশমূর্ত্তি করিলা ধারণ ॥
শিব যেই দিকে যান, সম্মুখে দেখিতে পান,
ভয়ানকা মূর্ত্তি পরাৎপরা।
অন্য দিকে ধেয়ে বেগে, দরশন পান আগে,
অন্য মূর্ত্তি অতি চমৎকার ॥
এইরূপে সর্ব্বদিকে, ভ্রমণ করিয়া বেগে,
নানামূর্ত্তি দেখি হয় ডর।
ভয় নাই হেন স্থান, কোন দিকে নাই পান,
শেষে আঁখি মুদি রৈলা হর ॥
ক্ষণান্তরে ত্রিলোচন, চক্ষু করি উন্মীলন,
সম্মুখে পাইলা দরশন।
নীল কাদম্বিনী আভা, কোটি সূর্য্য সম-প্রভা,
দিগম্বরা বিশাল নয়ন ॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ আভা, বদন-চন্দ্রিমা শোভা
হাস্যমুখী শোভে চারি কর।
অতি চমৎকার বেশ, এলিয়া পড়েছে কেশ,
পীনোন্নত যুগ্ম পয়োধর ॥
সদা শিবে দয়া করি, সতী এই মূর্ত্তি ধরি,
দক্ষিণ মুখেতে কৈলা স্থিতি।
এই মূর্ত্তি দরশনে, সভয় হইয়া মনে,
কহিতে লাগিলা পশুপতি ॥

তুমি কে কহতো মোরে, মোর সতী কোথাকারে
মোরে ফেলি গেলা এত দুঃখে।
এত শুনি সতী কন, নাহি দেখ ত্রিলোচন,
আমি সতী তোমার সম্মুখে ॥
কালীতারা ত্রিলোকেশী, ছিন্নমস্তা ভুবনেশী,
ধূমাবতী ত্রিপুরাসুন্দরী।
কমলা বগলাবধি, ষোড়শী মাতঙ্গী আদি,
দশমূর্ত্তি দেখ ত্রিপুরারি ॥
ইতিমধ্যে কালী আদ্যা, অপরাজে মহাবিদ্যা
হেঁহারাও চতুর্ব্বর্গদাত্রী।
সাবধানে শুন তবে, মহাবিদ্যা এঁরা সবে,
মুক্তিপদ দেওনের কর্ত্রী ॥
শুনি শিব কন তবে, প্রসন্না হইলা যবে,
বিশেষি পৃথক্ কহ নাম।
দ্বিজ রামনিধি ভণে, শুন সবে এক মনে,
দেবী পুরাইবা মনস্কাম ॥

২৯। পয়ার।

শিবের বচন শুনি হইয়া সদয়া।
বিশেষিয়া শিবেরে কহিলা মহামায়া ॥
তোমার সম্মুখে যিনি জলদবরণা।
ইনি কালী দেখ অতি ভীষণলোচনা ॥
ঊর্দ্ধেতে দেখহ যাঁরে শ্যামবর্ণা যিনি।
তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিনী ॥
তব সব্যভাগে দেবী মুণ্ড নাই যাঁর।
ইনি ছিন্নমস্তা নাম ভীষণ আকার ॥
এইতো ভুবনেশ্বরী তব বামে যিনি।
বিশেষিয়া সব নাম শুন শূলপাণি।
যেই দেবী দেখ পৃষ্ঠভাগেতে তোমার।
ইনিতো বগলা শত্রু করেন সংহার ॥

ক্রমশঃ

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মিরাস ছাড়িয়া যাব ময়না নগর।
আজি হতে তের দলুই তোমার চাকর ॥
কি বলিব লোক লজ্জা যাতে নাহি হয়।
ভৃত্য বলে পালন করিবে মহাশয় ॥
কিন্তু এক নিবেদন শুন সেন কই।
রায় গৌড়েশ্বরের চাকর মোরা হই ॥
ধর্ম্মশীল মহারাজা কৃষ্ণ পরায়ণ।
দানেতে উদার যেন হেলির নন্দন ॥
পুরুষ পাঁচ রমতি নগরে বাস করি।
সর্ব্বকাল আমাদিগের রাজার চাকুরি ॥
উভয়তঃ দুই দিক তবে ভাল হয়।
রাজাকে বলিয়া লয়ে চল মহাশয় ॥
সন্দেহ ঘুচিবে রাজার বারতা পাইলে।
তবে সে যাইব মোরা ময়না মণ্ডলে ॥
ডোমনীর বচনে কহেন তপোধন।
মেসোকে বলিয়া আমি আসিব এখন ॥
তুমি যদি মনে কর ময়না বসতি।
অম্বুজের সূতায় বাঁধিতে পারি হাতী ॥
দুঃখ নাহি পাবে গেলে ময়না ভুবনে।
সমুদ্রেতে জাঙ্গাল বাঁধিতে পারি ধনে ॥
তের দলুই আজি হতে আমার পরাণ।
নিশ্চয় কহিলাম ইথে সাক্ষী ভগবান ॥
মন দিয়া শুন ওহে কালুবীর ভাই।
গৌড়েশ্বর রাজাকে বলিতে চল যাই ॥
বিলম্ব না সয় সঙ্গে চল শীঘ্রগতি।
সকলে শুনিবে কিবা বলেন ভূপতি ॥
এত বলে রাউৎ ঘোড়ায় আশোয়ার।
বীর কালু সঙ্গে ধায় রাজার দরবার ॥
বেগে ধায় তুরঙ্গ গগনে উঠে রেণু।
ঘোড়ার আগে ধায় কালু হাতে তীর ধনু ॥
দ্রুতগতি দেখি যেন তারার পয়ান।
আঁখির নিমিখে পেল রাজার দিয়ান ॥

দল বলে দরবারে বসিয়ে গৌড়রায়।
বীর কালু লাউসেন প্রণাম করে পায় ॥
নত হল সেন রাজার চরণ যুগলে।
ভূপতি বলেন বাপু ফিরে কেন এলে ॥
সবিনয়ে সেন বলে রাজার হুজুরে।
ফিরে এলাম মেসো এক কার্য্য অনুসারে ॥
প্রজার পালনে তুমি রামগুণনিধি।
কল্পতরু দানেতে শীলেতে মহোদধি ॥
বুকে যোড় করে কয় লাউসেন কুমার ॥
রাতুল চরণে এক আরজ আমার।
ঘোড়া শিরোপা দিলে রাজ্য ময়নানগর।
আজ্ঞা হোক রমতির ডোম তের ঘর ॥
কালু বীরের প্রতাপ দেখিয়া এলাম রায়।
তেঁতুলের গাছ ভাঙ্গে বাটুলের ঘায় ॥
বড় বীর কালু সিংহ বলে সর্ব্বজনে।
ধাইল ঘোড়ার আগু দেখিলাম নয়নে ॥
গৌড়েশ্বর বলে কালু বটে বলবান।
তেরঘর ডোম জানি সবাই সমান ॥
লক্ষ্যার সমান কেবা তেজীয়ান আছে।
পায় ধরে হাতিকে তুলিয়া রাখে গাছে ॥
বিক্রমে বিশাল সবে কমি কেহ নয়।
তুমি যদি চাহ তবে দিলাম নিশ্চয় ॥
সর্ব্বকাল বনাদি চাকর ডোমগণ।
হাতে হাতে কালুকে করিল সমর্পণ ॥
মহামদ পাত্র ছিলা রাজার ডাহিনে।
রাজাকে বলিছে পাত্র গঞ্জন বচনে ॥
পাত্র বলে তোমায় কেন করেছে গোসাই
অজ্ঞান তোমার সম ত্রিভুবনে নাই ॥
ঘর ভেদী হতে নষ্ট লঙ্কার রাবণ।
নফর ছাড়িয়া দেয় এ কথা কেমন ॥
রাজা হয়ে পাত্রের মন্ত্রণা নাহি ধর।
আপনি পাইবে দুঃখ যা ইচ্ছা তা কর ॥

অযোগ্য লোকের মান বাড়াইলে রায়।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদ্যের পায়॥
রাজা দিলে পাত্রের বচন কোথা লাগে।
সেন হেথা যাত্রা করে চাপিয়া তুরগে॥
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে তীর।
সেনের ঘোড়ার আগু ধায় কালুবীর॥
পুনর্ব্বার রমতি নগরে দরশন।
উত্তরিলা যেখানে বসিয়া ডোমগণ॥
কর্পূর পাতর ছিলা বকুলের তলে।
কহ দাদা সমাচার লাউসেনে বলে॥
সেন বলে মোর সখা ধর্ম্ম গোঁসাই।
গুরুর আশীষে হল জয় সব ঠাঁই॥
লয়ে যেতে ডোমগণে কহিল রাজন।
চল অতঃপর সবে ময়না ভুবন॥
সেনের সঙ্গেতে তবে তের ডোম সাজে।
ডোমনী সকল তখন নাহি আসে লাজে॥
কালুবীর বলে সেন করি নিবেদন।
বউড়ি ঝিউড়ি কারো নাহিক বসন॥
ঘরে থাকে সবাই গুছিয়া পরে কাণি।
এত শুনি কহেন ময়নার গুনমণি॥
কি করিব এখন বসন কোথা পাব।
আগে আছে গোলাহাট বস্ত্র কিনে দিব॥
অলঙ্কার সহিত পরাব পাটের শাড়ী।
সবাকে পরাব শঙ্খ যত লাগে কড়ি॥
ধুতি যত আছিল দিলেন খানকত।
মেয়েরা পরিয়া আসুন এখনকার মত॥
লক্ষ্যা আদি ডোমনী যতেক ডোমগণ।
ময়নাকে যেতে হল সবাকার মন॥
গ্রাম ছেড়ে যেতে সবার সজল নয়ন।
রহিল আমড়া গাছ তেঁতুল বাগান॥
দশবার মিরাসেতে করিল প্রণাম।
শুভক্ষণে সবাই ছাড়িল নিজ ধাম॥
শ্রীহরি বলিয়া সবে যাত্রা করি যায়।
ডোমের ছাওয়াল সব শূকর চালায়॥
বেগে ধায় বালক ঠেঙ্গা করে ঘাড়ে।
চারি পানে শূকর ফিরায় পাড়ে পাড়ে॥
ঘর ভরি কালি ধলি বলে ছাড়ে ডাক।
দুই সারি শূকর চলিল লাখে লাখ॥
একি হল জঞ্জাল কর্পূর পাত্র বলে।
দেখ দাদা ভূদার চলেছে পালে পালে॥
ওগো দাদা এমন চাকরে নাহি কাজ।
তোমার সঙ্গেতে এসে বড় হল লাজ॥
ময়নাকে কেমনে যাইবে এনা বেশে।
লোকজন সবাই দেখিয়া পাছে হাসে॥
কদাচার এমন কেমনে যায় দেখা।
দলুই সব মোহর ভাঙ্গিয়া লউক টাকা॥
ভানুমতী মাসী মোর মেসো গৌড়েশ্বর।
পথ খরচ দিয়াছেন হাজার মোহর॥
এই সব মোহর ভাঙ্গিয়া সবে লেক।
বরা গুলা এইখানে কাননে ছেড়ে দেক॥
এত শুনে লাউসেন কালুবীরে কয়।
ঘুষ্টি গুলা ময়নাকে লইয়া যাওয়া নয়॥
মোহর ভাঙ্গিয়া দ্রব্য লহহে তোমরা।
ঘরে গড়াইয়া দিব সুবর্ণের বরা॥
ছাগল গাড়র দিব দুগ্ধবতী গাই।
বরাগুলা এইখানে রাখিয়া চল ভাই॥
কালুবীর শূকর ছাড়িয়া দিল পথে।
বনবরা কাননে হইল সেই হোতে॥
মোহর পাইয়া সবার হরষিত মন।
দেখাদেখি গোলাহাটে দিল দরশন॥
হাট করিবারে সবে হইল চঞ্চল।
দ্বিজরামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥

ত্রিপদী ছন্দেন গীয়তে।

লাউসেন দিল ধন, হরষিত ডোমগণ,
ভূদার ছাড়িয়া দিল বাটে।
দলুই দিগের তরে, নানা দ্রব্য কিনিবারে,
উপনীত হল গোলাহাটে॥
মোহর সকল লয়ে, বণিক দোকানে গিয়ে,
ভাঙ্গিয়া লইল টাকা কড়ি।
ডোমনী সকল রঙ্গ, সবার করেতে শঙ্খ,
কিনে দিল দিব্য পাটসাড়ী॥

শোভে সবার চরণেতে, পাতামল পাসুলিতে,
গলায় মাদুলী শতেশ্বরী।
দিল কিনে তারপরে, সুবর্ণ কঙ্কণ করে,
তাড়ু রসুনিয়া ঝাঁপাঝুরী॥
নাসিকা শোভিত নথে, প্রবাল গাঁথুনি তাথে,
বারণ মুকুতা শোভা করে।
হরষিত নারীগণা, শ্রবণে বউলি-সোণা,
শোভিত হইল অলঙ্কারে॥
বীরের হেতার যত, তাহা বা কহিব কত,
বাঁধা দিয়া খেয়েছে আকালে।
কিনে যত দ্রব্য জাত, সঙ্গে ময়নার নাথ,
নানা অস্ত্র কিনে কুতূহলে॥
কামান কৃপাণ ঢাল, টাঙ্গ টাঙ্গি করবাল,
শেল জাঠি ছুরী যমধর।
তরকট তীর গুলি, সোণা বাঁধা মুখনালী,
বেগে বিঁধে রায়াটী পাথর॥
অঙ্গুরী বলয় হার, দিল যত অলঙ্কার,
পদক তাবিজ কর্ণপুর।
চেলনাস গ্রাম টোপে, সোণালি বিষক থোপে,
ঝল মল ঝলকে চিকুর॥
স্বর্ণ চিরা পানে ভালে, পামরি পটুকা শালে,
শালের পাছড়া জামাজোড়া।
পাটের তেপরি পাতি, পরিতে লইল ধুতি,
থান কত অতলা সিগড়া॥
বুঝিয়া মনের মত, এইরূপে কিনে যত,
দেখা হল আক্ষটির থানে।
সুরঙ্গ সুঠাম দেখি, শারীশুক দুই পাখী,
সেন নিল পঞ্চাশ কাহনে॥
ধর্ম্মের করিতে পূজা, কিনিল লাউসেন রাজা,
আতপ তণ্ডুল নারিকেল।
মকরন্দ পানগুয়া, সুগন্ধি চন্দন চুয়া,
ঘৃত খণ্ড চিনি রম্ভা ফল॥
পুষ্প নিল মূল্য দিয়া, জুঁই নাগেশ্বর কিয়া,
অম্বুজ মল্লিকা চাঁপা হার।
করে সবে স্নান দান, মনেতে করিয়া ধ্যান,
পূজিল ঠাকুর করতার॥
জল পান করে সুখে. যাত্রা করে ময়নাকে,
ভাবিয়া ঠাকুর নিরঞ্জন।
ধর্ম্মপদ অরবিন্দে, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচণ॥

পয়ার ছন্দ।

গোলাহাটে লাউসেন করে স্নান দান।
নিজ দেশ ময়নাকে করিল পয়ান॥
দড়বড়ি আরোহণ ঘোড়ার উপর।
প্রিয় ভাই সঙ্গে যায় কর্পূর পাতর॥
তের দলুই সঙ্গেতে সাক্ষাৎ কালযম।
ঘোড়া শিঙ্গা সঘনে পুরিছে কালু ডোম॥
ডোমগণ ধাইল ডোমনীগণ সাথে।
চলেছে দক্ষিণ মুখে ময়নার পথে॥
ইরাক ফাঁদুনী করে বেগে ধায় ঘোড়া।
সেজেছে সেনের হাতে ভবানীর খাঁড়া॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগনে।
দপ্ দপ্ করে ফলা রবির কিরণে॥
গোলাহাট পশ্চাৎ করিয়া চলে সেন।
দেখাদেখি জামতি নগর পাইলেন॥
ঘোড়ার উপর দেখি তারা দীঘির পাড়ে।
উপনীত হল এসে জালন্দার গড়ে॥
সেন বলে শুন ওহে কালু সিংহবল।
এই গড়ে ছিল বাঘ নাম কামদল॥
এমন দুরন্ত বাঘ নাহি দেখি আর।
বিপরীত সংগ্রামে রাখিল করতার॥
কালু বলে সার কর ধর্ম্ম পদদ্বয়।
করিবেন ঠাকুর সকল ঠাঁই জয়॥
এত বলে সেনের ঘোড়ার আগে ধায়।
মঙ্গল কোট এড়ায়ে কালুচক পায়॥
কজুনা সরাই বর্দ্ধমান দিয়া গণ।
পার হয়ে দামোদর পাইল উচালন॥
ঘসিংঘাটা রাঙ্গা মেটা পশ্চাৎ করিয়া।
পারমাত গোবিন্দপুরে উত্তরিল গিয়া॥
কাশীযোড়া কুতঃপুর দ্রুত রেখে চলে।
উপনীত হল সবে পদুমার বিলে॥

কালিনীর গঙ্গার জলে লায় পার হয়ে।
চমরা ময়নায় সেন উত্তরিলা গিয়ে॥
কালিনী হইয়া পার পাইল ময়না।
দেশে এল লাউসেন পড়িল ঘোষণা॥
কাড়া পড়া বাজয়ে টমক ডিগ্ ডিগ্।
ঘোরতর শব্দে চমকে দশ দিক্॥
অযোধ্যাকে যেমন এলেন রামরাজা।
ধাইল সেই মত যে ময়নার প্রজা॥
দেখিতে রাজাকে চলে রাউৎ সকল।
সবা আগে দেখা করে জয়পতি মণ্ডল॥
সেনের চরণে গিয়া করিল জোহার।
লাউসেন জিজ্ঞাসে দেশের সমাচার॥
প্রজা সব কেমন আছেন বল শুনি।
আছেন কেমনে আমার জনক জননী॥
জয়পতি বলেন গোঁসাই কুশল সবার।
তোমা বিনা ময়না আছিল অন্ধকার॥
চিন্তা নাই সবাকে বলেন লাউসেন।
একে একে সবাকে আপান করিলেন॥
দুই সারি সহর বাজার এড়ে যান।
নগর দেখিতে সুরপুরের সমান॥
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
লাউসেন নৃপতি এলেন নিজ ঘরে॥
ভূতলে নামিল সেন ত্যজি অশ্ব রাজে।
কালু আদি তের দলুই বসিল দলিজে॥
শ্রান্ত হয়ে বসে যত ডোমনী সকল।
লাউসেন বলে শুন কালু সিংহবল॥
এক দণ্ড এখানে সবাই থাক বসি।
পিতা মাতার চরণে প্রণাম করে আসি॥
এত বলে দুই ভাই করিল পয়ান।
রামচন্দ্র বাঁড়ুয়া ধর্ম্মের গীত গান॥
দলিজে বসিলা তবে দলুই সকল।
লাউসেন কর্পূর গেলা অন্দর মহল॥
প্রণাম করিতে সেন ভাবে মনে মন।
জননী হইতে পিতা মহাগুরু হন॥
মহাবীর পরশুরাম বিদিত পুরাণে।
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়ে জননীর মাথা হানে॥
দশরথ সুত রাম জগজনে ঘুসি।
পালিতে পিতার সত্য হল বনবাসী॥
কর্ণসেন রাজা ছিল পালঙ্ক উপরে।
চরণে প্রণাম করে দুই সহোদরে॥
আনন্দিত কর্ণসেন পুত্রকে দেখিয়া।
আশীষ করিল রাজা প্রসন্ন হইয়া॥
ধন আয়ু বাড়ুক সংগ্রামে জয় হকু।
নিরবধি ধর্ম্মের চরণে মন রকু॥
পিতার চরণ ধূলি বন্দিয়া মাথায়।
প্রণাম করিল তবে জননীর পায়॥
রঞ্জাবতী হরষিত দেখে দুই সুতে।
হারাইয়া মাণিক পাইল যেন হাতে॥
বহুদিন হল গেলে গৌড় সহর।
তোমার বিহনে ছিল অন্ধকার ঘর।
অপত্য সমান স্নেহ আর নাহি দেখি।
পথ চেয়ে সাগর হইল দুই আঁখি॥
কহ বাপ কেমনে গৌড় পুরী গেলে।
কতক্ষণে কেমনে রাজার দেখা পেলে॥
মহামদ মামা তোমার আছেন কেমন।
যোড়হাতে লাউসেন করে নিবেদন॥
মন দিয়া শুন মা সকল সমাচার।
মামার গুণের কথা কি কহিব আর॥
অরিভাব দেখি যেন ভুজঙ্গ নকুল।
কংস রাজা ছিল যেন কৃষ্ণের মাতুল॥
ময়না এড়িয়া দৈবে গৌড়পুরী যাই।
জালন্দার গড়ে উত্তরিলাম দুই ভাই॥
সেই গড়ে বাঘ রাজা অভয়ার বলে।
গৌড়েশ্বর হেরে ছিল নব লক্ষ দলে॥
কামদল নাম ধরে মহা তেজিয়ান।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বত সমান॥
বিপর্য্যয় তর্জ্জনে পরাণ উড়ে যায়।
রাউতের খড়্গ যেন রসনা লোলায়॥
ফলা খাঁড়া ধরিয়া সম্মুখে দিলাম রণ।
হানা দিয়া মৃগাদনের বধিলাম জীবন॥
লেজ কাণ সঙ্গে নিলাম রাজাকে ভেটিতে
জল খেতে গেলাম তারাদীঘির ঘাটেতে॥

চরণে ধরিলগো দারুণ কুম্ভীরিণী।
জয় খড়্গ ধারে তার বধিলাম প্রাণী॥
জামতি নগরে তবে ষড় দুঃখ পেয়ে।
বারুই বধূ জয় করি বালক বাঁচায়ে॥
গোলাহাটে তবে করে সুরিক্ষা দলন।
গৌড় সহরে গিয়া দিলাম দরশন॥
বন্দী করিলেন মামা হস্তীচোর বলে।
বিপদ সাগরে মোরে প্রভু উদ্ধারিলে॥
বারণ বধিলাম তবে রাজার দরবারে।
আণ্ডির পাথার ঘোড়া রাজা দিল মোরে
বক্সিস ইনাম দিল ময়না নগর।
তার পর দিল রাজা ডোম তের ঘর॥
বিদেশেতে বেড়াতে কর্পূর কিছু নন।
বিপত্তি পড়িলে যেন মহীলতা হন॥
কর্পূর বলেন একি দাদার বড়াই।
আমা ছাড়া এক দণ্ড পথ চলে নাই॥
মিছা কথা কন দাদা তোমার নিকটে।
আমি বাঘ বধে ছিলাম চাপড়ের চোটে॥
এত বলে কর্পূর হাসেন খল খল।
নিশ্চয় দাদার বটে ধর্ম্মপক্ষ বল॥
যে সব কহিল দাদা সব সত্য বাণী।
হরষিতা হল শুনে রঞ্জাবতী রাণী॥
অপরূপ সুবর্ণ পিঞ্জর ছিল ঘরে।
শারী শুয়া দুই পক্ষী রাখিল পিঞ্জরে॥
সুবর্ণ পিঞ্জরে শুয়া ঘৃত অন্ন খায়।
মনোহর মহলে গোবিন্দ গুণ গায়॥
দুই পক্ষী দেখে লাউসেন আনন্দিত।
দলিজে কালুর কাছে হল উপনীত॥
দলুই সব সঙ্গেতে করিয়া লাউসেন।
পঞ্চ পাত্র সহিত দরবারে বসিলেন॥
প্রজাগণ লয়ে বসে জয়পতি মণ্ডল।
কাগজ হিসাব করে মুহুরী সকল॥
ধর্ম্মপদ অরবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥
দরবারে বসিলা সেন পরম কৌতুকে।
সমাচার গৌড়ের কহিল একে একে॥
তুরঙ্গ জায়গীর ময়না দিল মহীপাল।
ডোম তের ঘর দিল বিক্রমে বিশাল॥
জাইগীর সবাকে দিয়া করিব পালন।
আনন্দিত সেনের বচনে সভাজন॥
এত যদি কহিল ময়নার অধিকারী।
রাজার আজ্ঞাতে পাট্টা লিখিল মুহুরী॥
জমী দিল তের হাজার টাকার বিলাত।
করিল মোহর ছাপ ময়নার নাথ॥
মহাবীর কালু সিংহ সেনের সর্দ্দার।
আশি হাজার মোহর বৎসরে পুরস্কার॥
শিরোপা কাবাই দিল ফুঁপি যার হীরা।
বীরবালা বাঁধিল মাথায় স্বর্ণ চিরা॥
বক্তরি পামরি শাল সরবন্ধ পটুকা।
দুহেরি কুণ্ডল কাণে মুক্তার ঝলকা॥
নানা ধনে সম্মান করিল সবাকার।
মহল তুলিতে তবে চলিল বেল্দার॥
মহলের ঈশানে গড়ের ভিত্তি পাশে।
অপরূপ মহল তুলিল দিবস দশে॥
বিঘা দশ জমী বুড়ে তুলিল মহল।
চারিভিতে শোভিত গুবাক নারিকেল॥
নানাজাতি পুষ্পের বাগান মনোহর।
সুবর্ণের তাম্রচুড় চালের উপর॥
সাত বেড়া মহল দলিজ বারিদিকে।
সানবাধা সায়ের বাড়ীর পূর্ব্ব ভাগে॥
ময়নাতে আনন্দে রহিল ডোমগণ।
দাস দাসী নিযুক্ত হইল কতজন॥
প্রজা পালেন লাউসেন রামের সমান।
মহামদ পাত্র লয়ে কর অবধান॥
গৌড়েশ্বর তের দলুই দিয়াছিল সেনে।
সেই হতে পাতরের দুঃখ আছে মনে॥
গৌড় ভাঙ্গিছে পায় করিয়া নাবড়ি।
বাইশ মাস প্রজার উপরে করে কড়ি॥
খন্দ মূলে বেচে লয় গুড় কাপাস তিল।
মিনগুণাএ ঘর বেচে করিয়া তৌসীল॥
রাম সম প্রজা পালেন লাউসেন রায়।
গৌড় ভাঙ্গিয়া প্রজা ময়নাকে যায়॥

আসান পাইয়া প্রজা ময়নায় বসিল।
আনা করে সাধিতে বাহান্ন লাখ হল॥
এক দিন মৃগয়াতে যান গৌড়েশ্বর।
ভাবিত হইল দেখে গোউড় নগর॥
বার নাই প্রজার নমাসে কড়ি বিনে।
আচম্বিতে রাইয়ৎ পালিয়ে যায় কেনে॥
যেবা আছে প্রজা কারো চালে নাহি খড়।
রাজা বলে দুঃখ দেয় মাহুদা না বড়॥
নির্জ্জরা সমান পুরী ছিল গৌড়পুর।
পাত্র হোতে আমার রাজত্ব গেল দূর॥
মহামদ হোতে আমার ঘুচিল ভরম।
দরবারে বসিল রাজা হইয়া গরম॥
হেনবেলা উপনীত মাহুদা পাতর।
কোপযুক্ত হয়ে বলে রায় গৌড়েশ্বর॥
পাত্র মহামদ বসে রাজার দরবারে।
রাজা বলে কাগজ বুঝিয়ে দাও মোরে॥
ভাল মন্দ মোরে কিছু না দাও বারতা।
এবে জানি হলে তুমি দেশের বিধাতা॥
তুমি বল দেশেতে আমার আজ্ঞা খাটে।
অরাজক পুরী হল মনে কর বটে॥
রায়তের দণ্ড নিতে না বলি তোমায়।
কহ দেখি তবে কেন রায়ৎ পালায়॥
মহামদ বলে রাজা নিবেদন করি।
নিরবধি মহারাজা ঐ ভাবনায় মরি॥
মোরে ক্রোধ মিছে কর রায় গৌড়েশ্বর।
রায়ৎ পালায় তার শুন অবান্তর॥
কামরূপ কালিকা কাউরে অধিষ্ঠান।
আমার বচনে রাজা কর অবধান॥
কলিঙ্গা নামেতে কন্যা দাসী চামুণ্ডার।
হেতার বাঁধিলে কারো নাহিক নিস্তার॥
দাম দিত তখন তোমাকে সেই রাজা।
এখন হইল বড় দলবলে তেজা॥
প্রায় জড় করিলেক যতেক লস্কর।
আজি কালি সেজে আসে তোমার উপর॥
কলির রায়ৎ সব হইল সিয়ান।
বিপত্তি তোমার দেখে করেছে পয়ান॥
সেজে আসে লস্কর শুনি পরম্পরায়।
দেশ ছেড়ে প্রজা সব অতেব পলায়॥
বড়বীর লাউসেন বাধাল বীরবানা।
কাঁঙুরের সমরে প্রতাপ যাক্ জানা॥
চৌদ্দ সন খাজনা উশুল নাহি হয়।
দলবলে কাঁঙুর করিব চল জয়॥
লাউসেন প্রভৃতি লইয়া দলবল।
কাঁঙুর উপরে রাজা হানা দিব চল॥
পাত্রের বচনে রাজা ভাবিত অন্তরে।
রাজা বলে এ কথা হইতে তবে পারে॥
কোপ নিবারিয়া রাজা মহামদে কয়।
কহ পাত্র কিরূপে কাঁঙুর হবে জয়॥
মহামদ বলে রাজা কি তার ভাবনা।
লাউসেনে আনিবারে পাঠাও পরয়ানা॥
রাজার চাকর বলে নাহি ভাঙ্গে ঘুম।
ঘরে বসে খায় বেটা লাখ টাকার ভূম॥
ময়নার পারা দেশ জাইগীর মাহিনা।
না করে তোমার হিত কিসের ভাগিনা॥
সেনা মধ্যে এত আছে কাহার চাকুরী।
আজ্ঞা পেলে বেটাকে করিতাম দেশান্তরি
বলিতে লাগিল তবে গৌড়ের রাজন।
এমন সময় নয় এমন বচন॥
কাঁঙুর না হলে জয় বড় হল লাজ।
এই কর্ম্ম কর যাতে সিদ্ধ হয় কাজ॥
পরোয়ানা লিখি পাঠায় ময়না নগর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান মল্লভূমে ঘর॥
প্রবঞ্চনা করে যদি কহিল পাতর।
রাজার চড়াও হল কাঁউর উপর॥
লাউসেনে আনিতে কহিল নৃপমণি।
পাত্র লেখে পরোয়ানা রাজার আজ্ঞা শুনি
লিখন করিতে আজ্ঞা দিল গৌড়েশ্বর।
প্রথমে কৃষ্ণের নাম লিখিল পাতর॥
স্বস্তিক সকল লেখে মঙ্গল বিধান।
শ্রীযুক্ত লাউসেন রায় মহা বলবান॥
বীর অবতার তুমি সংসার ভিতর।
ধর্ম্মদাস কুলপদ্ম মহিমা সাগর॥

বিবরণ লেখেন শ্রীযুক্ত গৌড়পতি।
আশীর্ব্বাদ করি তব বাড়ুক উন্নতি॥
নবলক্ষ সেনা মধ্যে তুমি যোদ্ধা বড়।
কাঁউরের গড়েতে মহিম হল বড়॥
মহা বলবান তুমি প্রতাপে কেশরী।
তোমা হতে আমার ঘুচিবে যত অরি॥
ইনাম জাইগীর খেয়ে ময়না ভুবন।
ঘরে বসে থাক তুমি এ কথা কেমন॥
তের ডোম সহিত আসিবে ত্বরাপর।
নাবড়ি করিয়া পুনঃ লিখিছে পাতর॥
যদিস্যাৎ রাজার হুকুম হয় রদ।
তোমার মাতুল আমি পাত্র মহামদ॥
ব্রহ্মাকে অপেক্ষা নাহি দড় দড় কই।
খালাস করিব জমি হবে দেশ বই॥
বিঘা প্রতি খাজনা হিসাব করে নিব।
হাসন হুসেনে লয়ে ময়নায় বসাব॥
শ্রীমুখ করিয়া সায় করিল লিখন।
মনে হল ময়নাকে যাবেক কোন জন॥
দরবারে বসিয়া ভাবে গৌড়ের পাতর।
হেন বেলায় দেখা দিল ভাট গঙ্গাধর॥
পাত্র বলে এস রায় বসহে আসনে।
ভাবিত ছিলাম আমি তোমার কারণে॥
ময়না নগর তুমি নাহি গেলে নয়।
সেন এলে তবে সে রাজার কাজ হয়॥
এত বলে পাতর পরোয়ানা দিল হাতে।
পাঁচজনা কোমর বাঁধা লোক দিল সাথে॥
পাত্রের বচন রদ কার বাপে করি।
ঘোড়ার উপরে ভাট হল আশোয়ারি॥
বিদায় হইল লয়ে পথের সম্বল।
গৌড় রেখে পার হল ভৈরবীর জল॥
বর্দ্ধমান পশ্চাৎ করিয়া দামোদর।
পাঁচ দিনে গেল ভাট ময়না নগর॥
ময়না দেখিল যেন অমর বসতি।
পতিব্রতা নগরে সকল কুলবতী॥
কৃষ্ণ কথা বিনে আর অন্য মন নাই।
ভাগবত ভারত হোতেছে কত ঠাঁই॥
ব্রাহ্মণ সকল হন বেদেতে পারগ।
এক এক ব্রাহ্মণ যেন দৌজামের খগ॥
নিরবধি নিজালয়ে পাঠের বিচার।
ঘরে ঘরে অধ্যাপক চৌবাড়ি সবার॥
এইরূপে নগর দেখিয়া ভাট যায়।
বার দিয়া বসে ছিলা লাউসেন রায়॥
দিয়ানে আছিলা সেন লয়ে দলবল।
আশীষ করিল রায় পড়িয়া পিঙ্গল॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া লিখন দিল ভাট।
লাউসেন ভূপতি করিল পত্র পাঠ॥
জানিল যাইতে হল কাউর সংগ্রাম।
লঙ্কা জিনিবারে যেন চঞ্চল শ্রীরাম॥
সেন বলে কালুবীর শুন সমাচার।
কাউর জিনিতে এল পরোয়ানা রাজার॥
কালুবীর বলে রাজা চল সেজে যাব।
কলিঙ্গা কুমারী তোমায় বিবাহ দেওয়াব
ধর্ম্ম রাজা আপনি তোমার পক্ষবল।
কত তেজ ধরে রাজা রায় কর্পূর ধল॥
কালুর বচন শুনি ময়নার নাথ।
বিদায় হইতে গেলা মায়ের সাক্ষাৎ॥
যাবেন কাউর ময়নায় হল রব।
সাজ সাজ সঘনে ডাকিছে দলুই সব॥
রণ হবে রাত্রি যোগে কাউর উপর।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর॥
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
দানপতি করেছে রাজার আয়োজন।
ঢাকে কাঠি দেয় এসে বাইতি নন্দন॥

ইতি দেশাগমন পালা সমাপ্ত।

কামরূপ জয় ও কলিঙ্গার বিবাহ পালা।

লিখন আনিল যদি ভাট গঙ্গাধর।
জননীর কাছে কয় লাউসেন কোঙার॥
চোদ্দসন বাকী হল কাঁঙুরে খাজনা।
কর্পূর ধলে জিনিবারে আইল পরোয়ানা॥
বক্সিস মাহিনা মোর ময়নার বসতি।
অবশ্য রাখিতে চাই রাজার আরতি॥
পরোয়ানা লইয়া ভাট গঙ্গাধর এল।
সংগ্রাম করিতে মা কাঁঙুর যেতে হল॥
রঞ্জাবতী বলে শুনি কঠিন বচন।
শুনেছি দুর্গম বড় কাঁঙুরের রণ॥
গণ্ডকীর জল কেহ পার হতে নারে।
কামরূপ কালিকা আপনি রণ করে॥
দরিদ্রের ধন তুমি হাপুতির বাছা।
তোমা বিনে এ ঘরকন্না মোর মিছা॥
শালেভর দিতে বর দিল করতার।
তোমাবিনে আমার দিবসে অন্ধকার॥
লাউসেন বলে মা নিবেদন করি।
বিশেষে বিষম বড় রাজার চাকুরী॥
সাধু নিন্দা করিলে অনেক দুঃখ পাই।
লবণ খাইলে গুণ শুধিবারে চাই॥
জনম হইলে আছে অবশ্য মরণ।
সত্য মাত্র কেবল ঠাকুর নারায়ণ॥
দেহ ধরি সলিল বিম্বক সম নয়।
যশ অপযশ মাতা পৃথিবীতে রয়॥
কেবল ভরসা গো তোমার পদরজ।
তোমার আশীষ মোর অক্ষয় কবজ॥
পিতা মাতা চরণ বন্দিয়া সমাদরে।
আলিঙ্গন দিল ভাই কর্পূর পাতরে॥
বিদায় হইয়া চলে ময়নার রাজন।
দলুইগণে ডাক দিয়া আনাল তখন॥
তের দলুই সাক্ষাৎ যমের সম দেখি।
দেহ যেন দামিনী অরুণ বর্ণ আঁখি॥
লাউসেন বলে শুন কালু সিংহবর।
বিলম্ব না সয় চল কাঁঙুর উপর॥
জিনিতে কাঁঙুর কালি এসেছে লিখন।
কালু সিংহ বলে রাজা করহে সাজন॥
জিনে দিব কাঁঙুর ভাবনা কর নাই।
যম সেজে আইলে তার ভাঙ্গিব বড়াই॥
হনুমান বীর দেখ রামের কিঙ্কর।
কোন কর্ম্ম না করিল লঙ্ঘিয়া সাগর॥
গড়খান হানা দিয়া কবজ করিব।
কর্পূর ধল রাজাকে বাঁধিয়া আনি দিব॥
কালুর বচনে সেন হল হরষিত।
সাজন করেন তের দলুই সহিত॥
তের ডোম সঙ্গে সাজে ময়নার রাজা।
সুবর্ণের বুটা তোলা পায় মোজা॥
বীর বায় বীরদাপে তরঙ্গ বাড়িল।
সাজ সাজ সঘনে শব্দ পড়ে গেল॥
পরিধান চেলনা কোমর বাঁধে আগে।
তীর গুলি তরকট কষিল ডানি ভাগে॥
সাজ দেখে সেনের শমন পেল ডর।
দুয়ালে কষিয়া নিল ছুরী যমধর॥
তায় শোভা করে পেটি সুবর্ণের পান।
ঝলমল কিরণে হেলির গেল মান॥
ঢন ঢন শব্দ করে ঘাগর উর্ম্মাল।
শয্যা ঢালা বক্তরি উপরে দিল শাল॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড ১৩১৫ সাল, মাঘ। ১০ম সংখ্যা।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামতের সুন্দর নিষ্পত্তি না হওয়ায় আমার মনে উক্ত বিষয়ানুসন্ধিৎসা সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া আমি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের বহু পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা প্রসূত বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং পণ্ডিতবর মহাত্মা রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। অবশ্য বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত-মূলক এই দুই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা ও স্বকীয় যৎসামান্য অনুমান-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা সমীচীন বা সর্ব্বসম্মত হইবে এরূপ আশা করি না। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নির্ব্বিবাদ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের আশা করা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা মাত্র। আমার ন্যায় হীন-বুদ্ধি সামান্য ব্যক্তির কথা ত দূরে থাকুক, কোন সুপণ্ডিত প্রবন্ধ-লেখকও এরূপ আশা করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যেমন কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সাহস করিয়া সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না যে, ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট বা গৌরাঙ্গদেব বা কর্ম্মবীর আলেকজান্দার, পৃথ্বিরাজ বা প্রতাপসিংহ এতদিন পূর্ব্বে অমুক বংশে অমুকের গর্ভে ও অমুকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অমুক অমুক অলৌকিক অসামান্য কার্য্য দ্বারা ইতিহাসের পত্রে পত্রে স্বীয় স্বীয় অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, বা পাণিপথ, হল্‌দিঘাট বা ইউরোপীয় শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এতদিন পূর্ব্বে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণে সঙ্ঘটিত হইয়া জগতের ইতিহাসে পরমেশ্বরের কোন গূঢ় অভিসন্ধি সাধন জন্য কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া গিয়াছে, কোন ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতই সেরূপ সুনিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না, কোন্ ভাষা কতদিন পূর্ব্বে কি কারণে পরম্পরাক্রমে কোন্ ভাষা বা কোন্ কোন্ ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের আবির্ভাব বা কোনও সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধবিগ্রহাদি ঐতিহাসিক ঘটনার সংঘটন কাল সম্বন্ধে যেরূপ অঙ্কপাত সম্ভবপর, ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সমাধানে সেইরূপ সহজ অঙ্কপাত সম্ভবপর নহে। শেষোক্ত প্রশ্ন সমীকরণে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী পরিদৃষ্ট হয় না; সর্ব্বসময়েই সমীকর্ত্তা নিজ যুক্তি তর্ক ও অনুমানের সাহায্যে একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও ভাষাপণ্ডিতেরা নিজ নিজ মস্তিষ্কোত্থিত যুক্তি তর্ক ও অনুমান এবং স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুযায়ী পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যা-

লোচনা ও গবেষণা দ্বারা এক একটি মত উদ্ভাবন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহোদয়েরা একমত না হওয়ায় "মতভেদ স্থলে অধিকাংশের মত গ্রহণীয়" এই সনাতন নীতি অবলম্বন করিয়া দেশকালপাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক আমি যে মত সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

বৃথা ভূমিকার আড়ম্বর না করিয়া এক্ষণে "বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি" সম্বন্ধে আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আশা করি এই প্রবন্ধের পাঠকগণ আমার ভ্রম ও ত্রুটী সংশোধন পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ ও অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি বলিতে আজ কাল আমরা কি বুঝি তাহা অবশ্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বঙ্গদেশ প্রচলিত ভাষা ও লিপি যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অংশকে বঙ্গদেশ বলিয়া থাকি, তাহা কি অনাদি অনন্তকাল হইতে বা মনুষ্যের বাসভূমি হইয়া অবধি ঐ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে? ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম কি না? আমার বোধ হয় পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর দানে অসমর্থ। তুষারধবলিত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সুবিশাল রাজ্য আজ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত, তাহা যে এক সময়ে ঐরূপ নামে অভিহিত হইত না, তাহা উক্ত নাম হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অংশে বাস করিতেছি, তাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গ নামে আখ্যাত হইতেছে, ইহা স্থির। কিন্তু এই বঙ্গ নাম কত দিন হইতে প্রচলিত, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ নামের উল্লেখ আছে; সুতরাং মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্বে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে আনুমানিক পাঁচ ছয় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যেরা মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত অক্সস্ ও জ্যাক্সার্টিস্ নদীদ্বয়ের উৎপত্তি ভূমি বাক্রিয়ানা রাজ্যে বাস করিতেন। বংশবৃদ্ধিসহকারে তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কতক ইউরোপে, কতক পারস্যে এবং কতক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। জগদারাধ্য পিতৃপুরুষেরা সুললিত সুশ্রাব্য বেদগীতি দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া পঞ্চনদপ্লাবিত দেশ আর্য্যপদরজঃ দ্বারা পবিত্রীকৃত করিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতভূমি দ্রাবিড়, কোল ও তুরেরায়ান জাতির আবাসভূমি ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এই মত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে কিছু সত্য নিহিত থাকিতে পারে। হইতে পারে আর্য্য মহাত্মাদিগের শুভাগমনের পূর্ব্বে আজিকার বঙ্গদেশ কোনও অসভ্যজাতির ক্রীড়াভূমি ছিল। হইতে পারে পঞ্চনদবাসী আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে আদিম অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া নূতন নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করেন। ইহাও সম্ভবপর "বঙ্গ" নামক আর্য্যজাতির একশ্রেণী এই দেশ অধিকার করিয়া আপনাদিগের নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন এবং তদবধি ইহা বঙ্গনামে অভিহিত হইতেছে। যেমন ইউরোপে য়্যাঙ্গল্‌সদিগের নাম হইতে ইংল্যাণ্ড নামের সৃষ্টি, সেইরূপ হয়ত কোশল নামক আর্য্যশ্রেণী হইতে কোশলরাজ্য, বিদেহ হইতে বিদেহরাজ্য, মগধ হইতে মগধ এবং বঙ্গ হইতে বঙ্গদেশ ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি উল্লিখিত অনুমানগুলি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেশের

আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এক প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল এবং আর্য্যবঙ্গবিজেতা বা বঙ্গ-ঔপনিবেশিকেরা বিভিন্ন ভাষা লইয়া এই দেশে পদার্পণ করেন। আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীই হউন বা বিজেতা বা ঔপনিবেশিকই হউন, সংস্কৃত যে তাঁহাদিগের নিজস্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্য কোনও প্রাচীন ভাষার সহিতই তুলনা করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে সংস্কৃত তাহা হইতে উদ্ভূত। "মনুষ্যজাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন। কিন্তু মনুষ্যের আদি দেখিবার চেষ্টাও যেরূপ বাতুলতা, বাক্যকথন-ভাষার আদি নির্ণয়ের চেষ্টাও সেইরূপ। প্রকৃতি সৃষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। ইতিহাসই বল, বিজ্ঞানই বল, আদি বৃত্তান্তের গূঢ় রহস্যভেদে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যখন আর্য্য ঋষিরা বলিতেছেন, বেদ ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত, তখন আমরা বেদকেই মনুষ্যভাষার সর্ব্বপ্রাচীন অমর নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিয়া বঙ্গভাষার আদি বা বীজ তদ্‌গর্ভেই অনুসন্ধান করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও দুই একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। বঙ্গভাষা আদিম আর্য্যভাষা-সম্ভূত কি না, অর্থাৎ বঙ্গ আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা এদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, বঙ্গভাষা তাহা হইতেই উদ্ভূত কি না? ক্রফোর্ড, ল্যাথান, এণ্ডারসন, কে ও কল্ডওয়েল্ নামক কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিত গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ অর্থাৎ উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, পঞ্জাবী ও কাশ্মিরী সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আসে নাই, কোন অনার্য্যভাষা হইতে সম্ভূত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রচার করেন। আমি তাঁহাদিগের উক্তিও বিরুদ্ধবাদিগণের খণ্ডনকারী যুক্তির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

এই মতের সমর্থনকারীরা বলেন, "বঙ্গীয় হিন্দী কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। বিভক্তি ও ছত্রগুলির বিন্যাসপ্রণালী দ্বারাই কোন ভাষার আদি নির্ণয় সঙ্গত; কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে বাসহেতু তাহাদিগের ভাষা গ্রহণ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি চিহ্ন ও বিন্যাসপ্রণালীতে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্ত্তমান।" ডাক্তার 'কে'র মতে হিন্দীর 'কো' (যথা হামকো) ও বাঙ্গালার 'কে' (যথা রামকে) তাতার দেশীয় অন্ত্যবর্গ 'ক' হইতে আগত হইয়াছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল অনুমান করেন, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড় ভাষা হইতে উদ্ভূত। ডাক্তার হরন্‌লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরন্‌লি ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পরে বঙ্গভাষার বিভক্তি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিব এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ঐ সকল বিভক্তি অনার্য্যভাষা-সম্ভূত নহে; সংস্কৃত বা প্রাকৃতের রূপান্তর বা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে আমাদিগের দেখা উচিত ভারতবর্ষে যাহা কিছু প্রাচীনতম জ্ঞানের ভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের ভাণ্ডার, চতুর্দ্দিক

সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থ; তৎপরে ললিত-বিস্তর, রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি ইহারাও সংস্কৃত-প্রসূত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু অনার্য্য ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থ নাই। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, আর্য্যগণ জ্ঞানে অনার্য্যগণ অপেক্ষা বহু উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন; যেমন বাহুবলে সেইরূপ জ্ঞান-গৌরবে অনার্য্যগণকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের ভাষাও অনার্য্য ভাষা অপেক্ষা বহুল ঐশ্বর্য্যশালী ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল। এরূপ স্থলে যে গৌরবান্বিত সভ্যতাভিমানী আর্য্যগণ পদদলিত অসভ্য অনার্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন, তাহা বিকৃত-মস্তিষ্ক কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত ব্যক্তিও সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তজ্জন্যই ডাক্তার হরনলি, ডাক্তার কণ্ডওয়েলের বিকৃত মস্তিষ্কজ অনুমানকে ধিক্কার করিয়া বলেন, "আর্য্যগণ বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া সহসা ঘৃণিত অনার্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহারা যে সুদীর্ঘকাল সংস্কৃতজ প্রাকৃত ও পালি ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং নাটকাদির প্রাকৃত দ্বারা ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত অনার্য্যগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিগ্রহ করিয়াছিল; এতাবৎ কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে ঘৃণিত অনার্য্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্তি সময়ে আর্য্য ভাষার সুদীর্ঘকালব্যাপী অখণ্ড রাজত্বের পরে যে বিজিত অনার্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাসে অবশ্য মধ্যে মধ্যে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, বিজেতৃ-জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা নর্ম্মাণগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীজাতিরা আর্য্যাবর্ত্তে এবং ফরাসীগণ গলে; কিন্তু এই সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিত গণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন এবং উপনিবেশস্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাতন্ত্র্য গৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইতিহাসে কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না।"

(J. A. S. 1872, Part I, No. II, P. 122.)

এই সকল যুক্তিতর্ক দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, গৌড়ীয় ভাষামাত্রেই অনার্য্যভাষা-সম্ভূত নহে। গৌড়ীয় ভাষার মধ্যে কোনটিই যে আদিম ভাষা নহে, তাহাও নিশ্চিত। কারণ গৌড়ীয় ভাষা লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ কিংবা অন্য কোনও প্রমাণ বা নিদর্শন ইহাদিগের আদিমত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না। যদিও এই সকল ভাষার আদি ইতিবৃত্ত দুর্ভেদ্য যবনিকান্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল গৌড়ীয় ভাষার সৃষ্টির পূর্ব্বে এতদ্দেশে অন্ততঃ আর্য্যগণ মধ্যে অন্য প্রাচীনতর ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত বা প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। অনতিক্রম্য প্রাকৃতিক নিয়মে সংসারের সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে ভাষাও এই সাধারণ নীতির দাস। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত পুস্তকের সহিত কোনও আধুনিক পুস্তকের তুলনা করিলে শব্দগত, অর্থগত ভাবগত কতই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা

যদি আদিম ভাষা না হইল, তাহা হইলে ইহা কোন্ সময়ে কোন্ ভাষা হইতে সৃষ্ট হইল। কোন্ সময়ে এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। কারণ এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না বা পাওয়া যাইতে পারে না। অনেকে অনুমান করেন, বাঙ্গালা অক্ষর বা বাঙ্গালা ভাষা একদাই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে প্রথমে দেখিবার চেষ্টা করা যাক্, বাঙ্গালা অক্ষর কতদিন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে;—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ক কার তত্ত্বমুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী
কুণ্ডলী অঙ্ক সাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥
ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী
ত্রিকোণেমতৎ কথিতম্" ইত্যাদি।

"এক্ষণে আমি ক কারের তত্ত্ব নির্ণয় করিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকারা অর্থাৎ আঁকড়ি কুণ্ডলী নামক দেবতা এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা নামে ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জ্যেষ্ঠা নামে বিষ্ণুশক্তি এবং দক্ষিণকোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিত আছেন। ককার ত্রিকোণ ইত্যাদি।

ইহা যে বাঙ্গালা ককারের বর্ণনা, দেব নাগর ককারের নহে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। সকলেই জানেন দেবনাগর ককার ত্রিকোণ নহে। উক্ত তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে বঙ্গলিপি কামধেনু তন্ত্রের পূর্ব্বকালীন। এক্ষণে যদি স্মৃতি ও রামায়ণাদি পুরাণের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রকে অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অক্ষরকেও অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অনেক পণ্ডিত বলেন, তন্ত্রের ভাষা ও আলোচিত বিষয় ইহার বহু প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পণ্ডিতবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অভ্যুদয়ের অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি। সুতরাং তন্ত্রবিবৃত বাঙ্গালা অক্ষরের তৎপূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব বাঙ্গালা অক্ষর অন্যূন এক সহস্র বর্ষ বয়স্ক।

ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্য প্রকারেও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাষা প্রায় এক সহস্র বৎসর অতীত হইল সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলেন, "সুন্দর বনস্থ ভূমির মধ্য হইতে কখন কখন যে সকল তাম্রফলক পাওয়া যায়, তাহার একখানি দর্শন করা গিয়াছে। উহা রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকার কালে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্র স্বরূপ। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর নামক গ্রামের কোন জমিদার উহা পাইয়াছিলেন; উহার অক্ষর এরূপ নূতন প্রকার যে, অনেকে উহা পাঠ করিতে পারেন নাই। সেই অক্ষর না দেবনাগর না বাঙ্গালা। কতকগুলির দেবনাগরের, কতকগুলির বাঙ্গালার সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব অনুমান হয় উহা দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সন্ধিকালে লিখিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল, অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে

যে, ঐ সময়েই দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি বহু প্রাচীনতর, প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং বঙ্গলিপি যে দেবনাগর অক্ষর হইতে সৃষ্ট নয় বরং দেবনাগর অক্ষর হইতে প্রাচীনতর তাহা স্পষ্টক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ললিতবিস্তরে দেখা যায়, শিশু ছাত্র গৌতম বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। "বিশ্বকোষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৯৩০ শকের হস্তলিখিত একখানি কাশীখণ্ড আছে। উহার অক্ষর কুটিল অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি। সেনরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে ঐরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; উহা ন্যূনাধিক ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সকল লিপি মালার পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। ডাক ও খনার বচন সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের বঙ্গভাষার নিদর্শন। এতদ্দেশে প্রচলিত ডাকের বচন অপেক্ষাও প্রাচীনতর বঙ্গ-ভাষায় বিরচিত উক্তরূপ বচনের নমুনা নেপালে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ বিবিধ প্রমাণের পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাষা যে কেবলমাত্র এক সহস্র বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এক্ষণে ন্যায়রত্ন মহাশয় ও সেন মহাশয়ের মতের সামঞ্জস্য করা কিংবা ঐ উভয়ের মধ্যে কাহার মত গ্রহণযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ করা, আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে সেন মহাশয় যে তাঁহার মতসমর্থনের জন্য অধিকতর প্রমাণ প্রয়োগের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেন মহাশয়ের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত অধিকতর আধুনিক হওয়ায় প্রমাণাদি সংগ্রহে ন্যায়রত্ন মহাশয় অপেক্ষা তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আরও বোধ হইতেছে, সেন মহাশয় বঙ্গাক্ষর বলিতে আজকালকার ক, খ, গ'কে নির্দ্দেশ করিতেছেন না; যে লিপি ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাকেই বঙ্গলিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেন মহাশয় অনেক বিচারাদি দ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন "আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত, তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার সুবিধা নাই। অশোকের অনুশাসনে যে অক্ষর দৃষ্ট হয়, খৃষ্টের বহুপূর্ব্বে তাহা প্রচলিত ছিল। ইহাকে কেহ বা মৌর্য্যলিপি কেহ বা ইন্দপালি নামে অভিহিত করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দী মধ্যে অশোকলিপি পরিবর্ত্তিতাকার হইয়া "গুপ্তলিপি" আখ্যা প্রাপ্ত হইল। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দিগের অনুশাসন এই অক্ষরে লিখিত। গুপ্তবংশের অবনতির পর গুপ্তলিপি হইতে সারদা, শ্রীহর্ষ, কুটিল প্রভৃতি প্রাচ্যলিপির উদ্ভব হইল। সারদা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, শ্রীহর্ষ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যপ্রদেশে এবং কুটিল ও তল্লক্ষণাক্রান্ত অপরাপর প্রাচ্য অক্ষর পূর্ব্বভারতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সারদা অক্ষর হইতে কাশ্মিরী, গুরুমুখী ও সিন্ধী অক্ষরের উৎপত্তি। শ্রীহর্ষ হইতে দেবনাগরী ও অন্যান্য নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গলিপি, কুটিল ও মাগধাদি লিপি একবংশেরই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়।

সুতরাং বঙ্গলিপি গুপ্তলিপি সম্ভূত হওয়াই সম্ভব। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সুগুনিয়া পাহাড় হইতে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। দেড়-হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা চন্দ্রবর্ম্মার লিপি হইতে কতকটা জানা যায় (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৩ সাল ২৬৯ পৃষ্ঠা) অপর পক্ষে ললিতবিস্তর হইতে প্রমাণিত হইতেছে, বর্ত্তমান সময় হইতে ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বে মগধ-লিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি বিভিন্ন লিপি প্রচলিত ছিল। তখনও নাগর অক্ষ-রের উৎপত্তি হয় নাই, অথবা কোন অক্ষর নাগরী নামেও গণ্য হয় নাই (সাহিত্য পরি-ষৎ পত্রিকা ১৩০২ সাল, ৪৮১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন। বঙ্গলিপির রূপ অনেকটা চন্দ্রবর্ম্মার লিপিই যে কালহস্তে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ও পরিবর্ত্তিতাকার হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গলিপিরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার লিপিই বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন হইলেও ইহার বহুপূর্ব্বে বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীন বঙ্গাক্ষর যে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া পরিপুষ্টিলাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা ত একপ্রকার প্রমাণিত হইল। এক্ষণে বঙ্গাক্ষর যে আর্য্যাক্ষর হইতে উৎপন্ন, তাহা যে উর্ব্বর ভারতীয় আর্য্যমস্তিষ্ক হইতেই স্বতঃ-প্রসূত, বিজাতীয় মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, সে বিষয়ে দু একটা কথা কহিয়াই বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যদিও সৃষ্টি বিধ্বংসী কালের কঠোর আচরণে, পরস্বাপহারী কালান্তসম বহিঃশত্রু-গণের উপর্য্যুপরি অক্লান্ত তাড়নে, স্বদেশ-দ্রোহী অন্তঃশত্রুদিগের ভীষণ পীড়নে, প্রাচীন-তম লিপিমালার নিদর্শনমাত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, শৈলমালায় বা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে এ পর্য্যন্ত নয়ন-গোচর হয় নাই, তথাপি সূক্ষ্মদর্শী বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই অধ্যাপক ডসন্ সাহেবের সহিত সমস্বরে বলিবেন, "হিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবি-শ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। ভাষা-তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়া-ছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাঁহাদের নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়া-ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা সংখ্যাবোধক চিহ্নগঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" যদিও প্রিন্সেপ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর গ্রীকদিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত, উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ফিনিসিয়ান হইতে গৃহীত, টেলর প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত বলেন উহা সেরিয়া লিপির অনুরূপ, যদিও তাঁহারা স্ব স্ব মত সমর্থন জন্য বলিয়া থাকেন "এতদ্দেশের প্রাচীনতম লিপি এত সুন্দর ও সুগঠিত যে, উহা যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভারতীয় আদিম লিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোকলিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রকার নিদর্শন ভারতীয় শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্যই

রহিয়া যাইত; কারণ আদিম লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুগঠিত অশোক লিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে সূচিত রহিয়াছে"। তথাপি আমরা নিজ মত সমর্থন ও হিন্দু অক্ষরের মৌলিকত্ব প্রমাণের জন্য বলিব, "ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি পুরাতন স্থানে পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন কীর্ত্তির উপর এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার আর কোনও দেশে সঙ্ঘটিত হয় নাই। ভারতবর্ষ ক্রমাগত শত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া যে অতুলনীয় অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাই কি আশ্চর্য্য নহে? সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার কয়টী এখন বিদ্যমান? কাশীর ১০০ ফিট উচ্চ ধাতু নির্ম্মিত শিব বিগ্রহ কোথায়? এই সকল নষ্ট, বিধ্বস্ত, মন্দিরাদিতে ভারতীয় প্রাচীনতর ও প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন ছিল না কে বলিতে পারে? মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের ৮৪০০০ অনুশাসনের মধ্যে ৪০ খানি ব্যতীত পাওয়া যায় নাই। বাকীগুলি প্রাপ্ত হইলে ভারতীয় লিপিমালার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কত গূঢ় রহস্য উদ্ভাবিত হইতে পারিত কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে পঞ্জাবে হরপ নামক স্থানের স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি, আফগান্ প্রান্তে পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে "জরাসন্ধ কা বৈঠকে"র নিকট পার্ব্বতীয় পথের উপর উৎকীর্ণ প্রাচীনতম লিপি এই সকল অতি প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় লিপির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কি গূঢ় রহস্য ভেদ হইবে, কি অশ্রুতপূর্ব্ব, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব তত্ত্বের উদ্ভাবন হইবে? তদ্ভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অতঃপর আর ভারতীয় লিপিমালার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার আমাদিগের কোনই কারণ নাই। এই সূক্ষ্মদর্শী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পরমপূজ্য পিতৃপুরুষগণাবিষ্কৃত আর্য্যাক্ষরই যে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান কালের প্রচলিত বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন লিপিতে পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এবং কি বঙ্গাক্ষর, কি দেবনাগরী বা অন্যান্য নাগরী অক্ষর যাহা কিছু বল সমস্তই সেই আর্য্যলিপির সন্তান সন্ততি।

এক্ষণে প্রাচীনতম আর্য্যভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন এবং বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি বেদই মানব-ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন অমরনিদর্শন এবং বঙ্গভাষার আদিরূপ অন্বেষণ করিতে গেলে সেই বেদগর্ভেই তাহার বীজাঙ্কুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদে, তাহার পর রামায়ণাদির ভাষা (সংস্কৃত) বা রামায়ণাদির সংস্কৃত ভাষা, তৎপরবর্ত্তী পালি, গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত, চতুর্থ স্তরে বাঙ্গলা হিন্দী প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষা সমূহ। আমরা যেরূপ বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, লিখিবার সময় কখনও কি সেরূপ ভাষা ব্যবহার করি? লিখিত ও কথিত ভাষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সেন মহাশয় বলিতেছেন, "বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে

ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।" কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সূত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আয়ত্বাধীন লিখিত ভাষায় ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব ও ব্যাকরণাদির প্রতি যেরূপ লক্ষ্য থাকে, আপামর কথিত ব্যবহৃত ভাষায় সেরূপ থাকিতে পারে না। কালসহকারে লিখিত ভাষার নানাপ্রকারে ক্রমোন্নতি হওয়ায় কথিত ভাষার সহিত ক্রমশঃ পার্থক্য অধিকতর দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তাই, রামায়ণের ভাষা, ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটি ব্যবধান বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু উক্ত ব্যবধানের একটি সীমা আছে। তাহা অতিক্রম করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে এবং তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্যপল্লবে স্পৃহা ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে; তখন ভাষা-বিপ্লবের আবশ্যক হয়। যখন সংস্কৃতের সহিত কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। যখন পুনশ্চ লিখিত প্রাকৃতের সহিত কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতীর বাক্‌চেষ্টার শাসন করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চিরপ্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষিমাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপরে বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লক্ষেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গল্যায়ন, শিলাবংশ ইহারা সকলেই ব্যাকরণ-প্রণেতা। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি, ভাষা সম্বন্ধেও সেইরূপ সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার রূপান্তর।

এক্ষণে আমার বলিয়া রাখা উচিত যে, এস্থলে আমি যাহা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব, তাহা লিখিত ভাষা সম্বন্ধে। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, বঙ্গভাষার বা কথিত বঙ্গ ভাষার উৎপত্তিকালের নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতঃপূর্ব্বে আমি যতদূর সম্ভব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা একটি আদিম বা মৌলিক বা ইংরাজীতে যাহাকে "ক্ল্যাসিকাল্ ল্যাঙ্গুয়েজ" কহে, তাহা নহে। ইহা সুসভ্য আর্য্যবেশধারিণী অনার্য্য দ্রাবিড়, কোল্, ভীল বা অন্য কোনও পার্ব্বত্যজাতি-সম্ভূতা ভাষাও নহে। স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতের পর্য্যালোচনা দ্বারা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা সেন মহাশয় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোনও ভাষাই মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির ন্যায় কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে নাই। কালের বহু শতাব্দীব্যাপী চেষ্টায় ধীরে ধীরে মনুষ্যের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে বৈদিক সংস্কৃত হইতে পৌরাণিক সংস্কৃত, পৌরাণিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষা সমূহ এবং প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশের কথিত ভাষা,

লিখিত প্রাকৃত হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িল, তখনই কথিত বঙ্গভাষা একটু রূপান্তরিত হইয়া লিখিত বঙ্গভাষায় পরিণত হইল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন একদিন বা এক বৎসরে সঙ্ঘটিত হয় নাই। হরন্‌লি সাহেবের মতে ৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষা সমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ শক্তির পরাভবে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে, হিন্দু জাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল—প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত অধিক হইল যে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হয় নাই; উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, পরে আমরা যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহা হইতে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যাইবে, বঙ্গভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, যদিও ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উহা পরোক্ষভাবে সংস্কৃত সম্ভূত। সংস্কৃত বাঙ্গালার জননী নহেন, কিন্তু উহার পিতামহী বটে। প্রাকৃত—গৌড়ীয় প্রাকৃতই আমাদিগের মাতৃভাষার জননী। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত হইলেও, বাঙ্গালা যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। ডাক ও খনার বচনের ভাষা এবং পরাগলী মহাভারতের ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে। ইহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান না করিয়া প্রাকৃত আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। হয়ত যে সকল প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না। দণ্ডাচার্য্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে;—

"শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটি চান্যা চ তাদৃশী
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥"

কিন্তু ইহাও আবার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের কথিত ভাষা মাত্রকেই প্রাকৃত বলা হইত। অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষা যে পূর্ব্বকালে প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইত, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সঞ্জয় রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্দ্র দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে লিখিত আছে,—

"ভারতের পুণ্যকথা শ্রদ্ধা দূর নহে।
পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্র দাস কহে॥"

বিশ্বকোষ অফিসের ৩৪ নং পুঁথি কৃষ্ণকর্ণামৃত পুস্তকে "তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।" লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে

ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক॥"

ইত্যাদি।

এক্ষণে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি কতকটা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন, "আমাদের বোধ হয় না সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার জননী। বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে। সংস্কৃত গ্রন্থগণের মধ্যে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। বেদের সংস্কৃত দুরূহ, দুরুচ্চার্য্য ও শ্রুতিকটু। শ্রুতিকটু ভাষা সাধারণের প্রীতিকর না হওয়াতে রামায়ণ, সংহিতা, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য ও সুকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। বেদের সংস্কৃত কঠিন বলিয়া যেরূপ সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাণাদির কোমল সংস্কৃত সৃষ্ট

হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ উক্ত পুরাণাদির সংস্কৃত ও জনসাধারণের দুরুচ্চার্য্য বোধ হওয়াতে কোমলতর প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ (refined) এবং প্রাকৃত শব্দের অর্থ সাধারণ (common)। সংস্কৃত কোন সময়ে স্থলবিশেষে চলিত ভাষা ছিল। সংস্কৃত কেবল কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল—প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা উহার সম্যক্ উচ্চারণাদি করিতে পারিত না। প্রাকৃত লোকেরা ঐ সংস্কৃতকে অপভ্রষ্ট করিয়া যে ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল, তাহাই প্রাকৃত ভাষা নামে এক ভাষা হইয়া গিয়াছে। কৃতবিদ্য সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে অনেকাংশে বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থে অন্যত্র যাইতে হইবে না। আমাদিগের নিজের ভাষা এবং আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের এবং প্রতিবাসী ইতর জাতীয়দিগের ভাষার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে কর্ণপাত পূর্ব্বক তুলনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ সকল ভাষায় বাস্তবিক স্বরাদিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে।" ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও বলেন, "সংস্কৃত যেরূপ অতি প্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনিয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখ মাত্রও নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে উহার সৃষ্টিই হয় নাই।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যখন সংস্কৃতই একমাত্র ভাষা ছিল, যখন প্রাকৃতাদির সৃষ্টিই হয় নাই, তখন সাধারণ লোকে যদি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা কহিতে পারিত, তবে তাহারা পরে কিরূপে বা কি কারণে বা কি ঘটনা-পারম্পর্য্যে উক্ত ভাষায় কথা কহিতে ভুলিয়া গেল। আমার বোধ হয়, প্রথম হইতেই ইদানীন্তন কালের ন্যায় সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকগণ বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতে অপারগ ছিল। (উদাহরণ স্বরূপ—নিমন্ত্রণ স্থানে নেমন্তন্ন)। যখন সাধারণ লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যখন আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতের দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল, যখন দেশভেদে, আহার ভেদে উচ্চারণগত নানা বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইতে লাগিল, যখন লিখিত সাধুভাষাও উচ্চারণগত, ব্যাকরণগত নানা ভ্রমসঙ্কুল চলিত কথিত ভাষার সাতিশয় পার্থক্যবশতঃ লোকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল, তখনই ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষাখ্যা প্রাপ্ত হইল। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত যে সহজ, সে বিষয়ে সন্দেহই হইতে পারে না। সংস্কৃতে ষত্ব ণত্বের যে প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে, প্রাকৃতে সে গোলযোগ কিছুমাত্র নাই; প্রাকৃতে সকল স্থলেই এক দন্ত্য সকার, এক মূর্দ্ধন্য ণকার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আধুনিক ভাষাসমূহের ন্যায় প্রাকৃতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই। ইহার রচনা-প্রণালীও যে সহজতর, তাহা মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

"দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী
তন্মিথুনং নৃণাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং
সুমগ্রাহ্য নিবন্ধনেন॥"
(কুমারসম্ভব, ৭ম সর্গ।)

সরস্বতী দুই প্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্ব্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং সুমগ্রাহ্য নিবন্ধন অর্থাৎ প্রাকৃত দ্বারা পার্ব্বতীর।

খৃষ্টের প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজার অধিকার কালে এন্টিওকস্ প্রভৃতি যে গ্রীক রাজাদিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ভাষাও এক প্রকার প্রাকৃত। সুতরাং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান

হইতে পারে যে, তৎকালে প্রাকৃত ভাষাই দেশমধ্যে চলিত ভাষা ছিল এবং উক্ত ভাষা দেশভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, অর্দ্ধ মাগধী বা পালিভাষা পল্লীগ্রামের লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়ায় ঐরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে দেখা যায়, প্রাকৃত যেরূপ সংস্কৃত অপেক্ষা সহজতর, আবার বাঙ্গালা সেইরূপ প্রাকৃত অপেক্ষা সহজতর। কঠিন ও দুঃশ্রব ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, তজ্জন্য ভাষাগত সংযুক্ত শব্দের শিথিলতা সম্পাদন দ্বারা যেরূপ সংস্কৃত হইতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখোচ্চার্য্য প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ আবার প্রাকৃত হইতে সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণরূপ শিথিলতা করণোপায় দ্বারা অধিকতর সুখোচ্চার্য্য বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। "নত্যাদি" শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া "নদী আদি" করাকে সম্প্রাসরণ এবং "ধর্ম্ম" শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া ধরম্ করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। নিম্নে উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
অহম্	অহম্মি	আমি
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
গৃহ	ঘর	ঘর
অদ্য	অজ্জ	আজ
প্রস্তর	পথর	পাথর
লবণ	লোন	লুণ
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুড়া
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
বধূ	বহু*	বৌ
মস্তকং	মথয়	মাথা
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজলী
বৎস্য	বচ্ছ	বাছা
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ
হস্ত	হত্থ	হাত
পলায়ন	পল্লাণ	পালান
মক্ষিকা	মচ্ছি	মাছি
অত্র	এত্থ	এথায়
আদর্শ	আথরিস	আর্‌সি
তৈলম্	তেল	তেল
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা
জ্যেষ্ঠ	জেট্‌ঠ	জেঠা
স্নান	হ্ণান	নাহা

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংস্কৃত হইতে একবারে বাঙ্গালার উৎপত্তি হয় নাই, মধ্যে প্রাকৃতরূপ ব্যবধান নিশ্চয়ই বর্ত্তমান।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, আদি হইতেই লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল। তবে কালক্রমে কিরূপে বা কি কারণে প্রাকৃত, সংস্কৃতের আধিপত্য লোপ করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপিত করিল, এবং বঙ্গাদি গৌড়ীয় ভাষাসমূহই বা আবার কিরূপে প্রাকৃতকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপিত করিল, এ সম্বন্ধে সেন মহাশয়ের মত সঙ্গত বলিয়াই আমার বোধ হয়। তিনি বলেন, "ধর্ম্মবিপ্লবে প্রাচীন ভাব

* প্রাকৃত "বহু" প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—

"যাহার বহু ঝি দূরে যান্তি।
তাহার নিকটে বলে অসতী।"

ডাকের বচন।

ও ভাষার সংস্কার এবং নব ভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। ইতিহাসে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। রোমান যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে লাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণের পূর্ব্বকালে তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেরূপ প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" যেদিন জগদারাধ্য বুদ্ধদেব বেণুবৃক্ষমূলে বসিয়া শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিলেন, যে দিন গৌতম বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মোপদেশ গুলি প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হইলে প্রাকৃতজনমণ্ডলী উহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইবে না, সেই দিন হইতেই, বুদ্ধের সেই অনুজ্ঞা প্রচারের সময় হইতেই সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হইল। দেবভাষা দেব ও ঋষিগণের জন্য সেই দিন স্বর্গারোহণ করিলেন। বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হইল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, ভাষাও বিশৃঙ্খল ও শিথিল হইয়া পড়িল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের আদর্শ লোক-চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থানে শিথিল প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইল। কথিত ভাষাও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব ধারণ করিল।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সহকারে পুনঃ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। যথা প্রাকৃত চালুদত্ত, লাম, লাবণ, চলন, আবার বাঙ্গলা চারুদত্ত, রাম, রাবণ, চরণ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হইল। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষারই সংস্কৃতের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইল। তাহার বিশেষ কারণ, বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব কখনই একবারে লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল, যখন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র আর্য্যাবর্ত্তের দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিল এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনও হিউন্‌সঙ্ সমতট ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। কালে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালা প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্রের নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইল;—

"জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক বিষাণ বাদক
হুতাশভালক মহত্তর॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন,
ভুজঙ্গভূষণ, জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর॥"

পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাব বশতঃ সংস্কৃত উক্ত প্রদেশীয় ভাষাগুলির উপর ততদূর প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিতে পারে নাই, কিন্তু বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে বঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

এক্ষণে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নানা প্রকারে তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।

১। শব্দগত সামঞ্জস্য—

আমরা পূর্ব্বে কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছি, নিম্নে কতকগুলি উদারণ উদ্ধৃত হইল ;—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
দ্বারম্	দুয়ার	দুয়ার
তব	তুহ	তাহার
ত্বং	তুক্ষি	তুমি
দ্বয়ং	দুয়	দুই
সর্ষপ	সরিস্	সরিষা
যাবৎ	জেওক	যতেক
ছিন্ন	ছিন্দ	ছেঁড়া
হরিদ্রা	হলদ্দা	হলুদ
শয্যা	শেজ	শেজ

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতের "হোই" স্থলে বাঙ্গালা "হয়"; "পড়ই" স্থলে "পড়ে"; কিণই, করই, করে; বোলই বলে; নচ্চই নাচে, লগ্‌গ স্থানে লাগা; স্পষ্টরূপে উভয়ের সামঞ্জস্য প্রমাণ করিতেছে। বোধ হয়, নিমিত্তার্থক তুমন্ত "ভবিতুম" বা প্রাকৃত "হোহুম" হইতে এবং "হইয়া" অনন্তরার্থক ত্বাজন্ত, "ভূত্বা" বা প্রাকৃত ভবিঅ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেইরূপ সংস্কৃত ত্বাজন্ত শব্দের অনুরূপ প্রাকৃত শুনিঅ, লভিঅ, ভবিঅ, করিঅ ইত্যাদি স্থানে বাঙ্গালায় শুনিয়া, লভিয়া, হইয়া ও করিয়া হইয়াছে। প্রাকৃত 'অচ্ছি' র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা "হইয়ার" মিলনে "হইয়াছে" গঠিত হইয়াছে। এইরূপে দেখিতেছে, করিতেছে, ইত্যাদিও গঠিত হইয়াছে। শব্দের রূপান্তর অবলম্বনের পদ্ধতি বিচিত্র। চল খেল ইত্যাদি ধাতুর "ল" অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "ভলয়োর ভেদঃ" এই সূত্রানুসারে 'র' কারের 'ল' কারে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। সংস্কৃত "ভ্রমঃ" স্থলে প্রাকৃত 'বোল্লাম' দৃষ্ট হয়। করসি, থায়সি, করোন্তি, জানেন্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

"ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে।
দেবযানি পলাইল পুষ্পের ভিতরে॥"

সঞ্জয় আদিপর্ব্ব।

"চতুর্দ্দিকে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর।
হিরণ্য কশিপু মারি পিবত্তি রুধির॥"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ইত্যাদি।

সংস্কৃতের হি বাঙ্গালার শুধু হ তে পরিণত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের জানীহি স্থানে বাঙ্গালার জানিহ। প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বুঝাইতে 'হ'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি 'স' কার (শ, ষ, স), দুইটি জ (জ, য) এবং দুইটি ণ (ণ, ন) স্থলে একটি স, জ ও ন দৃষ্ট হয়। ইহাও প্রাকৃতের অনুরূপ।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রথম প্রাকৃতে, তৎপরে বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কতিপয় নিয়ম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

১। আন্তবর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে সংযুক্তবর্ণের আন্তক্ষর লুপ্ত হয় এবং আন্তবর্ণে আকার যুক্ত হয় ; যথা হস্তী—হাতি ; হস্ত—হাত ; কর্ণ—কাণ ; ভল্লুক—ভালুক।

২। কখন কখন আবার শেষ বর্ণেও আকার যুক্ত হয়। যথা চক্র—চাকা ; চন্দ্র—চান্দা—চাঁদা বা চাঁদ (বাঙ্গালা) ; পত্র—পাতা।

৩। কখনও বর্ণের শেষ আকার লোপ হয়। লজ্জা—লাজ ; ঢক্কা—ঢাক।

৪। আন্তবর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আন্তে 'ং' বা 'ন'কার থাকিলে, তাহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যথা বংশ স্থানে বাঁশ ;

ষণ্ড—ষাঁড় ; হংস—হাঁস ; দন্ত—দাঁত ; চন্দ্র—চাঁদ।

৫। কখন কখন অ স্থানে এ ; বঙ্গন—বেগুন ; আ স্থানে ই, পঞ্জর—পিঞ্জর ; সজ্ঞান—সিয়ানা। অ স্থানে উ, ব্রাহ্মণ—বামুন ; দ্বিপ্রহর—দুপুর ; ঔষধ—ওষুধ ; Beame's Comparative Grammarএ আরও অনেক সূত্র দৃষ্ট হয়।

৬। ট ও ড স্থানে ড় ; ঘোটক—ঘোড়া ; ঘট—ঘড়া ; ষণ্ড—ষাঁড় ; ভাণ্ড—ভাঁড়।

৭। স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হয় ;—চর্ম্মকার—চামার ; কুম্ভকার—কুমার ; নৌকা—নাও বা না ; মুখ—মু ; নাভি—নাই ; গাভী—গাই ; গ্রাম—গাঁ বা গাঁও। কথিত ভাষা এইরূপে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে এবং এখনও এইরূপে সর্ব্বদা সহজ আকারে পরিণত হইতেছে।

বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ প্রকরণও সংস্কৃতের মত।

১। বাঙ্গালা ১মা বিভক্তি সংস্কৃতের মত ; অনুস্বার বা বিসর্গ বর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু উহা প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়।

"শু আণহু ভিচ্চাণ কম্পকে শামীত্র নিরুণকেবি শোহেদী। মৃ কঃ। প্রাকৃতে কর্তৃবাচক তৃতীয়ান্তেও ঐরূপ 'ঐ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গালা কর্ত্তৃকারকে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা—

"শুনিয়া রাজা এ বোলে হইয়া কৌতুক।
সুগন্ধা অপ্সরা কেন হইল মৃগরূপ॥

সঞ্জয়, আদিপর্ব্ব।

প্রাকৃতে যেমন অনেক স্থলে দ্বিবচন বা বহুবচনে কেবল আকার যুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়, সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচন-বোধক নাম শব্দে আকার দেখা যায়।

"নরা, সজা বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদা, তের ছাগলা॥" খনা।

ম্যাক্সমুলার বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালা 'কে' আসিয়াছে। স্বার্থে 'ক' প্রাকৃতে অনেক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। উদাহরণ যথা—

(১) রথ হইতে ফাল (লাফ) দিয়া
চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে॥

কবীন্দ্র।

(২) "সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ
পতিকে সেবয়।"

সঞ্জয়।

এই ভাবে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোন্‌টি কর্ত্তা ও কোন্‌টি কর্ম্ম স্থির করা কঠিন হয় বলিয়া কর্ম্ম ও সম্প্রদানে বাঙ্গালার 'কে'র প্রয়োগ পরে প্রচলিত হইল। প্রাকৃতে ও গাথা ভাষায়ও মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' বাঙ্গালা 'র'কারে পরিণত হয়। 'ণ' সচরাচরই 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হয়। প্রাকৃত 'অগ্নীণ' স্থানে বাঙ্গালায় 'অগ্নির'। সপ্তমীর 'তে' সংস্কৃত 'তসিল' হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার—যথা গহনে, কাননে—প্রাকৃত ও বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে।

সন্ধি, সমাস ও লিঙ্গ সম্বন্ধে বাঙ্গালা প্রায়ই সংস্কৃতের অনুরূপ। ছন্দ সম্বন্ধেও বাঙ্গালা সংস্কৃতেরই অনুকরণ করিয়াছে। যথা—পয়ার শব্দটি পাদ (চরণ) হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে 'লাচাড়ী' (বোধ হয় লহরী শব্দের অপভ্রংশ) 'দীর্ঘছন্দ' বা অন্য কোনও রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট

হয়। বাঙ্গালার সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অনুকরণে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই) অলঙ্কার সম্বন্ধেও বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের নিকট ঋণী। এক্ষণে পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া নিশ্চয়ই স্থির করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে এবং পরোক্ষ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূতা। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালার আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের ভাষার সঙ্গে বঙ্গীয় আর্য্যদিগের কথিত ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় একটু অনার্য্যগন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে গন্ধটুকু এতই অল্প যে, বঙ্গভাষায় কোন্‌গুলি অনার্য্য শব্দ, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত সপ্তবিংশ সহস্র শব্দ মধ্যে অষ্ট শত শব্দ 'দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতজ বলিয়া বোধ হইতেছে। সেন মহাশয় বলেন, "ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পৌণে ইত্যাদি শব্দ যদিও দেশজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদ্য, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সহিত কোন না কোনরূপে সম্পৃক্ত।" অবশ্য দেশজ-আখ্যা বিশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। অনার্য্য দাস দাসীদিগের সংস্রবে তাহাদিগের কতকগুলি কথা যে ভাষামধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিক দিন বিভিন্ন ভাষা ভাষীর সংস্রবে ভাষা মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দ—সময়ে সময়ে idiomএরও প্রবেশ লাভ ইতিহাসে নূতন ঘটনা নহে। এই নীতি অনুযায়ী কতকগুলি আরবী, পারসী, উর্দ্দু, পর্টুগীজ এবং অধুনা ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গভাষায় কতকগুলি অনার্য্য শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে উহা অনার্য্য ভাষাসম্ভূত বলিতে হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে গ্রীক লাটিন ও সংস্কৃত ভাষাকেও অনার্য্য ভাষাসম্ভূত বলিতে হয়, কারণ ঐ সকল ভাষাতেও অনার্য্য শব্দের মিশ্রণ আছে। যাহা হউক, বঙ্গভাষা যে অনার্য্য ভাষাসম্ভূতা নহে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি তর্কে যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত বিষয়ের আলোচনায় বৃথা সময় ক্ষেপণ করিতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না। নিম্নে ছন্দ (ও অলঙ্কার) সম্বন্ধে আর ও দু'একটি কথা লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি।

সংস্কৃত ভাষা অশেষ ঐশ্বর্য্যশালিনী। পৃথিবীস্থ যে কোন ভাষার ভাণ্ডার অনুসন্ধান করা যাউক না কেন, সংস্কৃতের ন্যায় অগণনীয় ছন্দ, অলঙ্কারাদি ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। প্রথমে প্রাকৃত মাতার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মাতার অনুগ্রহাধিকারিণী হইবার পূর্ব্বেই গৌড়ীয় দুহিতা কর্ত্তৃক অপসারিতা হইলেন। এক্ষণে আমাদের দুঃখিনী বঙ্গভাষা জননী বয়োবৃদ্ধি সহকারে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী মাতামহীর ধনে ধনী হইয়া প্রতিভান্বিতা হইতেছেন।

বঙ্গকাব্যে ছন্দ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর। মিত্রাক্ষর ছন্দ আবার অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, ললিত ও একাবলী সচরাচর প্রচলিত। কিন্তু আদ্যকালের কাব্য রচনায় পয়ার ও ত্রিপদীই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় ছন্দের যে কোথা হইতে উৎপত্তি, তাহা স্থির করা একটু দুরূহ ব্যাপার বলিতে

হইবে। মিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে অর্থাৎ পদ্যের পদান্ত মিলাইতে বঙ্গকবি কোন্ ভাষার শরণাপন্ন হইলেন। আমার জ্ঞানানুসারে ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্য ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য জয়দেবের কাব্য রচনাতেই পদান্তের মিল দেখিতে পাই।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং॥
মায়াময় মিদং নিখিলং হিত্বা।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদল গত ইত্যাদি—

চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণি কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধমধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি
কেলিপরে॥ ইত্যাদি—

এইরূপ সংস্কৃত কবিতা দেখিতে না পাইলে মিত্রাক্ষরের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে আমাদিগকে বিশেষ গোলে পড়িতে হইত। কিন্তু এই সংস্কৃত কবিতাগুলি পড়িয়া বোধ হয়, শেষ সময়ের সংস্কৃত কবিগণ যমক অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে ও শ্রুতিমাধুর্য্যে মোহিত হইয়া উহার প্রচুর ব্যবহারে ও অক্ষরের মিল রক্ষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এবং বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণ উক্ত কবিগণের অনুকরণে মিত্রাক্ষর কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালার পয়ার শব্দ পাদ (চরণ) শব্দের অপভ্রংশ; ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও বলেন, গীতগোবিন্দের স্থলে স্থলে যে কতকগুলি গীত আছে, তাহাদিগের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা—রাধিকা তব বিরহে কেশব!

সরস মসৃণপি, মলয়জপঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং। ইত্যাদি।

অতি প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর গৃহে বিবাহোৎসবে ভাটগীতি প্রচলিত ছিল। "The institution of Bhats is as old as Indo-Aryan Civilization" Indo-aryans Vol. II. P. 293.

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবগীতি সুরসংযোগে গীত হইত। এই সকল গীতির অধিকাংশই পয়ারে রচিত। গানে অক্ষর লইয়া বাঁধাবাঁধি না থাকায় (মাত্রার দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকে বলিয়া) প্রাচীন পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। ক্রমে যখন কবিতা ও গানের পার্থক্য সংস্থাপিত হইল, সেই সময় হইতেই কবিতার যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইল। ছন্দ বল, অলঙ্কার বল, সংস্কৃত ভাষা সকল বিষয়েই প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী। বঙ্গভাষা ত এখনও সংস্কৃতের সহিত তুলনায় অগাধ জলধির একটি বিন্দুমাত্র।

"ত্রিপদী" সংস্কৃত শব্দ। এই ছন্দ গীত গোবিন্দের নিম্নলিখিত প্রকার গীতের অনুকরণে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। যথা—

"পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপয়ানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং॥

এক্ষণে সেন মহাশয়ের নিম্নলিখিত কয়টি কথা উদ্ধৃত করিয়া আমি ছন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিব। "সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকার ও সে ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। বাঙ্গালী ঝিনুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী প্রভৃতি যাহা কিছু বল, প্রকারভেদে নূতন ছন্দ উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই; কেবল

সংস্কৃতের অনুযায়ী পদ বিন্যাসের কৌশল দৃষ্ট হয়।”

অলঙ্কার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, দীনাহীনা বঙ্গভাষা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা মাতামহীর অগণ্য অলঙ্কারের কথঞ্চিৎ (কিঞ্চিৎ) প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন। শব্দালঙ্কার যথা—অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ এবং অর্থালঙ্কার যথা—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি, ব্যাজস্তুতি ইত্যাদি বঙ্গভাষা প্রচলিত অলঙ্কারগুলি সমস্তই যে সংস্কৃত হইতে গৃহীত, তাহা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সকলেই স্বীকার করিবেন।

উপসংহারে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রবন্ধের গুরুত্বের সহিত তুলনায় আমার জ্ঞান অতীব অকিঞ্চিৎকর। এরূপ অবস্থায় আমাকে বাধ্য হইয়াই কৃতবিদ্য বঙ্গ ও সংস্কৃতাভিজ্ঞ মহামান্য মহামহোপাধ্যায়দিগের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমার নিজত্ব বা নিজস্ব অতি সামান্যই আছে। আমাদিগের দরিদ্রামাতা বঙ্গভাষা ভিখারিণী অকৃতীসন্তানদিগের হস্তে অনেক নিগ্রহভোগ করিয়াছেন। এক্ষণে করুণাবিধান বিশ্বনিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে সুমতি প্রদান করেন। আমরা যেন তাঁহার কৃপায় স্বর্গাদপিগরীয়সী মাতার সেবা করিয়া শেষ জীবন কৃতার্থ করিতে পারি। আমরা মাতার অকর্ম্মণ্য দুঃখী সন্তান। তথাপি যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করি, তাহা হইলে ভিখারিণীর কিঞ্চিৎ দুঃখও কি দূর করিতে পারিব না? ভাষার উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি একসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। বাঙ্গালী জাতি নিজস্ব হারাইয়া অধঃপতিত। ভাষাও মস্তক তুলিতে অক্ষম। এ দুরবস্থায় শক্তিস্বরূপিণী মাতা ভিন্ন কে শক্তি দিবে?

মাগো, জাতির উন্নতি বিধান করিয়া ভাষার উন্নতি বিধান করুন এবং ভাষার উন্নতি বিধান করিয়া জাতির উন্নতি বিধান করুন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ফলবতী হউক।

শ্রীহরিধন গোস্বামী।

ভূস্বামিগণের ভবিতব্যতা।

অসিত পক্ষের ঐন্দবীকলার ন্যায় দিনে দিনে রাজা ও জমিদারবর্গ কেন যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছেন, অনেক সময় ইহা ঐকান্তিক চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। অচিন্তনীয় বিষয়ের আকস্মিক আবির্ভাব দেখিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা মানুষের স্বাভাবিক, তাই হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যে ভূস্বামিনিচয় একদিন উপচয়ের অনন্ত আস্পদ হইয়া দেশের দৃঢ়তর ভিত্তিস্বরূপ ছিলেন এবং দেশের আশ্রয় ভরসাস্থল ছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন এতাদৃশ দীন দশার ক্রীতদাস হইলেন কেন?

প্রণিধান করুন, দেখিতে পাইবেন, কেহ আজ আবহমান কালের অধিকৃত ভূসম্পত্তিটী দেনার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পথের কাঙ্গাল, কেহবা নিরপত্য হইয়া পুনাম নরকের ভীষণ যন্ত্রণায় অকালে কালের কবলে কবলিত, কাহারও বা পৈতৃক পৃথিবীটী উত্তাল তরঙ্গমালাকুল অকূল জলধি বক্ষে বাত্যান্দোলিত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় প্রমাণ দিক দেনায় যায় যায় করিতেছে। অকস্মাৎ কেন যে এরূপ হয়, ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি?

বলিতেও হৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। বেশি দিন নহে, অল্প দিন পূর্ব্বে যেখানে হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সদৃশ সৌধাবলী আকাশ ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছিল, আজ সেখানে দূর্ব্বাঙ্কুরাচ্ছাদিত স্তূপীভূত ভগ্ন ইষ্টকরাশি, স্বজনবর্গের সানন্দ কোলাহলের বিনিময়ে শিবাকুলের বিকট চীৎকার, গৌরাঙ্গীর সুরম্য হর্ম্ম্য—ভুজঙ্গীর ভীষণ গর্ত্ত, আর অসংখ্য যাচকের দেহি দেহি শব্দের পরিবর্ত্তে গভীর নিশীথে আজ পেচককুলের পৈশাচিক শব্দ মূর্ত্তিমান্।

অন্যদিকে দৃক্‌পাত করুন, দেখিতে পাইবেন, যিনি একদিন ইহজীবনেই ধনে মানে দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শত শত যাচকের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিয়া জয় শব্দের পাত্র হইয়াছিলেন, তিনিই আজ নির্ধন, নিরন্ন, এমন কি একবস্ত্র হইয়া ভিখারীর বেশে চির-প্রতিপালিতের দ্বারস্থ। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণী দেখিতে পাইবেন, যাঁহারা দেনার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন ও সম্পত্তিটী ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। নিজের অধিকার নাই। এমন কি স্বয়ং পর্য্যন্ত ভৃত্যের অধীন,—ভৃত্যের ক্রীড়া কন্দুক। হায়, কেন এরূপ হয়? অনেক হৃদয়বান্ পুরুষ অনেক সময় ইহার কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ বলেন সৎশিক্ষার অভাব, কেহ বলেন, চাটুকারের অমোঘ বাগুরা, কেহ বলেন অহরহঃ অসৎ সংসর্গ এবং কেহ কেহ বলেন ব্যসনের আতিশয্যই এ অধঃপাতের অনন্য কারণ। শাস্ত্রকারেরা—

দ্যূত মাংস সুরা বেশ্যা খেট চৌর্য্যপরাঙ্গনাঃ।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্বুধঃ॥

দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, খেট (মৃগয়া), চৌর্য্য ও পরস্ত্রী এই সাতটী ব্যসন বলিয়া নির্ব্বাচিত করেন। ব্যসনী ব্যক্তির নাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার প্রমাণার্থ তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার এই পদ্যটী দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেন।

“দ্যূতাৎ ধর্ম্মসুতঃ পলাদিহবকো মদ্যাদষ
দোর্ণন্দনাঃ।
চৌরঃ কামবশান্মৃগাস্ত করণাৎ স
ব্রহ্মাদত্তো নৃপঃ॥
চৌরত্বাৎ শিবভূতিরন্য বনিতা সঙ্গাদ্দশাস্যো
হঠাৎ।
এবৈক ব্যসনাহতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ণ
কো নশ্যতি॥”

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অক্ষ ক্রীড়ায়, ধর্ম্ম বক মাংসলোভে, যদুনন্দনগণ মদ্যপানে, চোর (সুন্দর) কামবশে, রাজা মৃগয়ায়, শিবভূতি চৌর্য্যে এবং অন্য বনিতা সহবাসেচ্ছায় লঙ্কেশ্বর দশানন বিপন্ন হইয়াছেন। ইহারা এই এক একটী মাত্র ব্যসনে এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। সব কয়টী একাধারে বর্ত্তমান থাকিলে কে না বিনষ্ট হয়?

সৎ শিক্ষার অভাব, চাটুকারের চাটূক্তি, অসৎ সংসর্গ ও ব্যসন বা বিলাসিতা এই চারিটীই ভূস্বামিগণের অধঃপতনের সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় অব্যভিচারী কারণ সন্দেহ নাই। কারণ সৎশিক্ষার অভাব বশতঃ সদসদ্বিবেক লুপ্ত হয়। সদসদ্বিবেক না থাকিলে চাটুকার আর প্রকৃত হিতৈষীর পরিচয় শক্তি তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন তোষামোদপরায়ণ নরপিশাচবর্গের আপাতমধুর বাগ্‌জালে আত্মপ্রশংসালোলুপ অন্তঃকরণটী আবদ্ধ হয়।

চাটুকারের সংখ্যা একে একে বৃদ্ধি পায়। প্রতিহারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান অমাত্য পর্য্যন্ত সকলেই মনিবের মনোরক্ষার্থ চাটুকার সাজিতে বাধ্য হন। সে অবস্থায় সুহৃদের সৎপরামর্শ তপ্ত কটাহে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থান পায় না। প্রত্যুত ঘোর শত্রুতার সূত্রপাত করে। কাজে কাজেই তৎকালে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণ বিরাগের পাত্র হইয়া বিতাড়িত হন। অসংখ্য চাটুকারে দুর্গ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে ভূস্বামীর চালক চাটুকার তাঁহার আর পরিণাম বলিতে হইবে না, স্বয়ং নীতিশাস্ত্রকারই বলিয়াছেন—

"কো বা দুর্জ্জন বাগুরাসু পতিতঃ
ক্ষেমেণ জাতঃ পুমান্"

দুর্জ্জনের বাগ্‌জালে পতিত হইলে কে বা সুখে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছে? কেহই নহে। চাটুকারের দল প্রাবল্য লাভ করিলে সতের সত্বা আর থাকে না। স্বার্থপরায়ণ, ভণ্ড, পাষণ্ড, ক্লীব, কীলক প্রভৃতি অসংখ্য অসৎ অনুচর অনুক্ষণ আজ্ঞাবহ হইয়া প্রভুর বল, মেধা, ধন, ধৈর্য্য, বীর্য্য অপহরণ করিয়া থাকে। সে কাপুরুষনিচয়ের নীচ ব্যবহার বিশদভাবে ব্যাখ্যাত করিয়া লেখনীকে দূষিত ও কলঙ্কিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল কীলকের কদর্থটীকে কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া বিরত হইলাম।

"সকীলক ইতি প্রোক্তো যঃ ক্লৈব্যা-
দাত্মনঃ স্ত্রিয়ং।
অন্যেন সহ সংযোজ্য পশ্চাৎ তামেব সেবতে॥

যে নিজের স্ত্রীকে অন্যের সহিত সংযুক্ত করাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে গ্রহণ করে, তাহার নাম কীলক। ধিক্ তাহাদের মনিবের মনোরক্ষা! আর ধিক্ তাহাদের সেই কদর্য্য উপার্জ্জন!

এইরূপে অসৎ সংসর্গের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অসৎ সংসর্গে না হইতে পারে এরূপ অধঃপাতই নাই। শাস্ত্রকারেরা বলেন—

অপনয়তি বিনয়মনয়ং
জনয়তি ক্ষয়ং সততং যশসঃ।
নিরয়ং চয়তি তরসা পুংসা;
মসতঃ সমাগমো জগতি॥

অসতের সংসর্গে বিনয়ের অপনয় হয়, যশের ক্ষয় হয় এবং নিরয়ের সঞ্চার হয়। সুতরাং ব্যসন বাসনা বিশ্বতোমুখী হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত ব্যসন সপ্তকের মধ্যে এক বার যদি দুই একটী প্রশ্রয় পায়, গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অমনি অবশিষ্ট সব কয়টী আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এইখানে কাব্যদীপিকার হাস্য-রসে উদাহৃত শ্লোকটী মনে আসে। কেহ এক জন কোন মাংস-লোলুপ ভিক্ষুককে মাংস ভোজন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে;—

ভিক্ষো! মাংস নিষেবনং প্রকুরুষে?
কিংতেন মদ্যং বিনা মদ্যং চাপিতব প্রিয়ং?
প্রিয় মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
তাসামর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং?
দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা;
চৌর্য্য হত পরিগ্রহোঽপি ভবতো?
নষ্টস্য কাঽন্যাগতিঃ?

প্রশ্ন—ভিক্ষো! মাংস ভোজন করিতেছ?

উত্তর—হাঁ, কিন্তু বিনা মদে তাহা বৃথা।

প্রশ্ন—মদও কি তোমার প্রিয়?

উত্তর—অহো! বারাঙ্গনাগণের সহিত প্রিয়।

প্রশ্ন—তাহারা যে অর্থাভিলাষিণী, তোমার ধন কোথায়?

উত্তর—দ্যূত বা চৌর্য্যের দ্বারা।

প্রশ্ন—দ্যূত ও চৌর্য্য তোমার আয়ত্ত নাকি?

উত্তর—আরে ভাই নষ্টের আর অন্য গতি কি?

একজন বিলাসী (ব্যসনী) ভিক্ষুকের উক্তি যখন এতাদৃশ, তখন অসংখ্য অসৎ পরিবৃত সমৃদ্ধিশালী বিলাসী যুবকের আর কথা কি? অথবা ব্যসন জন্য অধঃপতন সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যুক্ত্যন্তরের অবতারণা করা অনাবশ্যক। সাধারণের চক্ষে শত শত ধর্ম্ম বক, শত শত সুন্দর, শত শত ব্রহ্মাদত্ত, শত শত শিবভূতি, শত শত দশানন নিত্য নিত্য অবভাসিত হইতেছেন। তবে ভূস্বামিনিচয়ে চৌর্য্যটা হঠাৎ সংক্রমিত হয় না সত্য, কিন্তু চৌর্য্যের বিনিময়ে তাঁহারা যে ভীষণ ঋণের সৃষ্টি করেন, সেই ঋণ এক দিন তাহাদিগকে পাটচ্চর হইতেও অধম পদবীতে নীত করে। তাহার কারণ এই যে, যখন পাষণ্ডগণের পাশব প্ররোচনায় ইহাদের বিলাসের মাত্রা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তখন ইহারা সর্ব্বপ্রথমে পিতৃপিতামহের বহু কষ্টোপার্জ্জিত সঞ্চিত সদর্থরাশিকে আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত করিয়া ব্যসনবহ্নিকে দ্বিগুণিত করেন। পূর্ণাহুতি না দিয়া বাসনা পূর্ণ হয় না; অগত্যা উত্তমর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বশেষে যথা সর্ব্বস্ব উত্তমর্ণে অর্পিত করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণ যাগ সমাহিত করেন।

ইহ জীবনেই উচ্চাসন, ব্যসন, অধঃপতন ও অবমাননা সংঘটিত হইয়াছে, এতাদৃশ কয়েক জনই আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক হইয়া আমাদিগকে যুগপৎ ভীত, ব্যথিত ও বিস্মিত করিয়াছেন। অহো অপরিমিত অনিয়ত বিলাসের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! পাপ ব্যসন বাসনার কি অনির্ব্বচনীয় বশীকরণ শক্তি! লক্ষেশ্বর সর্ব্বস্ব হারাইয়া যাচকবেশে পরের দ্বারস্থ; তথাপি তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই, তখনও তিনি বুদ্ধি থাকিতে জড়, চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, হরি! হরি! তাদৃশ অবস্থাতেও ভিক্ষালব্ধ ধনে তিনি চিরসহচরী সুরাদেবী ও বারনারীর অর্চ্চনায় নিরত।

এই পাপব্যসনপরম্পরা কেবল এক পুরুষেই যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরত হয়, তাহা নহে। ব্যসনীর পুত্রপৌত্রাদিতেও বিষময় ফল প্রসব করিতে থাকে। নিরপত্যতা, নির্ব্বিন্নতা, চিররোগিতা প্রভৃতি বিবিধ বিপত্তিই এই বিলাসিতা বা ব্যসনের পরম্পরাগত বিষময় ফল।

অনিয়ত বেলায় অনুপযুক্ত মাত্রায় সুরাপান, দূষিত মাংস ভক্ষণ এবং সপ্তধাতুর সার স্বরূপ শুক্র ধাতুর অপরিমিতরূপে অকালে ক্ষয়, বহু রোগের নিদান। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য-চিকিৎসকগণ ও ইয়োরোপীয় খ্যাতনামা কার্পেণ্টার, ক্লার্ক, লেমাট, রবার্টসন প্রভৃতি ভূয়োদর্শী ডাক্তারগণ স্ব স্ব বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে এইগুলির মহীয়সী অপকারিতা বিবৃত করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, অযথাভাবে মদ্য মাংস নিষেবিত হইলে যকৃৎ বিকৃত হইয়া অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত করে, অপরিমিতরূপে শুক্রক্ষয় হইলে যদি একবার ধাতুদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি শারীরিক কি মানসিক উভয়বিধ যাবৎ বিকৃতিই ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাতরক্ত, শূল, উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত, অশ্মরী, নানাবিধ প্রমেহ, সোমরোগ, প্রমেহ, পীড়কা, বিদ্রধি, ভগন্দর, অর্শ, উপদংশ, শূকদোষ, বহুবিধ কুষ্ঠরোগ, বিসর্প, বিস্ফোটক, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অষ্টসপ্ততি প্রকার নেত্র রোগ, একাদশ প্রকার শিরোরোগ এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ নরক-যন্ত্রণাদায়ক

দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগসকল সেই মহাপাপেরই পরিণাম। ইহা চরকাচার্য্য প্রভৃতির মত।

ডাক্তারগণ বলেন, মুখমণ্ডলে ব্রণ, শরীরের নানাস্থানে কণ্ডু ও বিস্ফোটক, নয়নোপান্তে কালিমা, কপালস্থ চর্ম্মের সঙ্কোচ ও শৈথিল্য, শরীরের নানা স্থানে শিরার উদ্গম, শ্মশ্রুর বিরলতা, চক্ষু নিমজ্জন, মুখের কান্তিনাশ, স্বরের বিকৃতি, সুপ্তিস্খলন (স্বপ্নদোষ), পৃষ্ঠে ও মস্তকে বেদনা, দৃষ্টিক্ষীণতা, মলমূত্র ত্যাগ কালে বীর্য্যক্ষয়, শুক্রাধার কোষদ্বয়ের বিষমাকৃতি ও লম্বিতাবস্থা, নিদ্রাহানি, সর্ব্বদা তন্দ্রা, আলস্য, অপস্মার, বিমর্ষ, দীর্ঘনিশ্বাস, হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মূর্চ্ছা, জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস, পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহে এবং শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা, জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা, মনোবৃত্তিসমূহের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মনের চঞ্চলতা, বিবেচনাশক্তির অভাব, বুদ্ধিভ্রংশ, ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা, অশান্তি ও বিরক্তি, আত্মগ্লানি, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, মনের ক্লেশে নিয়ত অশ্রুপাত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন, নিয়ত ভীতি ইত্যাদি সব কয়টীই সেই ধাতুদৌর্ব্বল্যের বিষময় ফল।

উল্লিখিত চিকিৎসকেরা লিখিয়াছেন, জননেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি হইলেই মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটে; আর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিলেই মনুষ্যত্ব নাশ বা সর্ব্বনাশ হয়।

বিলাসোন্মত্ত অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী যুবা ব্যসনের নেশায় অহরহঃ আমোদপরতন্ত্র হইয়া উল্লেখিত নিদাননিচয় বুঝিয়াও ত বুঝেন না। অধিকন্তু আরও কয়েকটী ভীষণ নিদান তাহার সহিত সংযোজিত করেন। বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রতিপাদনার্থ ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুদিন রাত্রি জাগরণ, দিবা শয়ন, অসাময়িক ভোজন ও অবগাহন ইত্যাদি আশু অস্বাস্থ্যকর অকৃত্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এতাদৃশ অকালজ্ঞ উলূকরূপী ব্যসনী যুবা অর্থাৎ যাঁহারা দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবা করিয়া আর অনিয়ত বেলায় ভোজনাবগাহন করিয়া স্বীয় অসাধারণতার ডিণ্ডিম বিঘোষিত করিতেছেন, তাদৃশ অসংখ্য অবিমৃষ্যকারী নিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বিশদ লেখা অনাবশ্যক।

একেতো সুরা, মাংস, বারাঙ্গনা, পরাঙ্গনা ছিল, তাহার উপর আশু অস্বাস্থ্যকর রাত্রি জাগরণাদি নিদান নিচয় যোগদান করিয়া মাত্রার পূর্ণতা প্রতিপাদন করিল, নিদান পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ায় ক্রমে তত্তৎ নিদানজনিত এক একটী দুরারোগ্য রোগের সূত্রপাত হইতে লাগিল। রোগপরম্পরা সত্ত্বেও যুবক ঠেকিয়া শিখিলেন না, বুঝিয়া বুঝিলেন না, চিরাভ্যাসবশতঃ সেই বিষময় নিদান পূর্ব্ববৎ পূর্ণমাত্রায় সেবন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

কিন্তু হায়! সে আর কয় দিন, ক্রমে বিষক্রিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিল; শরীর ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম জর্জ্জরিত হইল; সর্ব্ব প্রথমে যুবা স্বর্গীয় সুখ-স্বাস্থ্যটীকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিলেন।

স্বাস্থ্যের অভাববশতঃ যুবকের আয়ু, ধন, ধর্ম্ম, মেধা ইত্যাদি যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, সবই অন্তর্হিত হইল।

তাহাতে কেহ জননেন্দ্রিয়ের বৈকল্য নিবন্ধন সন্তানোৎপাদিকা-শক্তি হারাইয়া পুন্নাম নরকের পথ পরিষ্কার করিলেন। কেহ অসহায় আত্মীয়বর্গকে অকূলে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করিলেন, কেহ অসাধ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া

জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলেন; কেহ বা নানাবিধ বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিয়া দিন কয়েকের জন্য কথঞ্চিৎ স্বয়ং স্বাস্থ্যলাভ করিলেও বিকৃত বিষসম্পৃক্ত বীর্য্যে যে কয়টী সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে কেহবা অল্পায়ু, কেহবা চিররোগী, কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া পিতার ন্যায় জ্বালাময় জীবন লাভ করিল।

এই পুত্রপৌত্রগণ যখন যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল, তখন বয়োধর্ম্মবশতঃ কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধবীর্য্য হইলেও আদর্শস্থানীয় পিতৃ-পিতামহের গুণানুচিন্তন করিয়া সেই নজিরে সেই সব ব্যসনের দাসত্ব স্বীকার করিল। একে চিররোগী, হীনবীর্য্য, তাহার উপর বিষময় ব্যসনের পূর্ণমাত্রা, জীর্ণ তরণী জলধির উত্তাল তরঙ্গে কয়দিন আর অস্তিত্ব লাভ করে? ক্রমান্বয়ে তাহারা বিলাসীর বিলাসময় অঙ্কের বিনিময়ে কালের কণ্টকময় ক্রোড়ে শায়িত হইল। ব্যসনী পিতৃ-পিতামহের সমারব্ধ ব্যসন-নাটকের এইখানেই যবনিকা পাত হইল। চিরদিনের জন্য চিরন্তন বংশটী লোপ পাইল।

যিনি যাহাই বলুন, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণচতুষ্টয়কে আপাততঃ অব্যভিচারিরূপে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। যাউক্ তাহার পুনরুদ্ঘাটন নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে বক্তব্য, হে ব্যসনবশীভূত! ঋণার্ত্ত! আধিব্যাধিপ্রপীড়িত! ভূস্বামিবৃন্দ! অধিক আর কি বলিব, প্রবন্ধের প্রথমে যে কয় শ্রেণী ভূস্বামীর মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দুর্লক্ষণ লক্ষিত ভূরি ভূরি ভূস্বামীর শোচনীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া ও শুনিয়া যদি আপনাদের অন্তরে অধুনা অণুমাত্র প্রতিচিকীর্ষার ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ভবিতব্যতার দোহাই দিয়া নিদ্রিত থাকিবেন না। সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা করুন, চাটুকারের চাটূক্তিরূপ কালকূট হইতে চিত্তকে রক্ষা করুন, ভণ্ড পাষণ্ড আদি অসৎ সংঘকে অচিরে বিতাড়িত করিয়া দুর্গকে নিষ্কলঙ্ক করুন, প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী স্পষ্টবক্তা প্রবীণ সজ্জননিচয়ে দুর্গ সমলঙ্কৃত করুন, এবং মহাপাপ ব্যসন-সপ্তকের সমূলোৎপাটন করিয়া পরমেশ্বরে পরমাভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র আনন্দ অনুভব করুন। দেখিবেন, অচিরে উপরাগান্তে শশাঙ্কের রোহিণী যোগের ন্যায় আবার সেই শান্তি, সম্পত্তি সমাদরে স্বয়ং সমালিঙ্গন করিবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অনেকে অশিক্ষিত হইয়াও বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরতা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং শিক্ষার অভাব যে ভূস্বামিগণের ভীষণ ভবিতব্যতা ও শোচনীয় পরিণামের বিশিষ্ট কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে না। কথাটা আপাত-সত্য, কিন্তু সেই প্রাচীন প্রবীণ মহাত্মগণের তাদৃশ সৎশিক্ষা না থাকিলেও সৎশিক্ষা জন্য যে সৎজ্ঞান, তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পূজন, অতিথি-সৎকার, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অনুদ্বেগকর বাক্য, অপ্রিয় সত্য, বেদাভ্যাস, মনঃপ্রসাদ, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

তাঁহাদের নীতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাঁহাদের সত্ত্বগুণ, সৎসাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা জানিতেন—

উৎসাহসম্পন্নম দীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় নিশ্চয়ং চ,
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ॥

দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগসকল সেই মহাপাপেরই পরিণাম। ইহা চরকাচার্য্য প্রভৃতির মত।

ডাক্তারগণ বলেন, মুখমণ্ডলে ব্রণ, শরীরের নানাস্থানে কণ্ডু ও বিস্ফোটক, নয়নোপান্তে কালিমা, কপালস্থ চর্ম্মের সঙ্কোচ ও শৈথিল্য, শরীরের নানা স্থানে শিরার উদ্গম, শ্মশ্রুর বিরলতা, চক্ষু নিমজ্জন, মুখের কান্তিনাশ, স্বরের বিকৃতি, সুপ্তিস্খলন (স্বপ্নদোষ), পৃষ্ঠে ও মস্তকে বেদনা, দৃষ্টিক্ষীণতা, মলমূত্র ত্যাগ কালে বীর্য্যক্ষয়, শুক্রাধার কোষদ্বয়ের বিষমাকৃতি ও লম্বিতাবস্থা, নিদ্রাহানি, সর্ব্বদা তন্দ্রা, আলস্য, অপস্মার, বিমর্ষ, দীর্ঘনিশ্বাস, হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মূর্চ্ছা, জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস, পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহে এবং শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা, জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা, মনোবৃত্তিসমূহের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মনের চঞ্চলতা, বিবেচনাশক্তির অভাব, বুদ্ধিভ্রংশ, ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা, অশান্তি ও বিরক্তি, আত্মগ্লানি, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, মনের ক্লেশে নিয়ত অশ্রুপাত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন, নিয়ত ভীতি ইত্যাদি সব কয়টীই সেই ধাতুদৌর্ব্বল্যের বিষময় ফল।

উল্লিখিত চিকিৎসকেরা লিখিয়াছেন, জননেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি হইলেই মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটে; আর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিলেই মনুষ্যত্ব নাশ বা সর্ব্বনাশ হয়।

বিলাসোন্মত্ত অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী যুবা ব্যসনের নেশায় অহরহঃ আমোদপরতন্ত্র হইয়া উল্লেখিত নিদাননিচয় বুঝিয়াও ত বুঝেন না। অধিকন্তু আরও কয়েকটী ভীষণ নিদান তাহার সহিত সংযোজিত করেন। বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রতিপাদনার্থ ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুদিন রাত্রি জাগরণ, দিবা শয়ন, অসাময়িক ভোজন ও অবগাহন ইত্যাদি আশু অস্বাস্থ্যকর অকৃত্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এতাদৃশ অকালজ্ঞ উলূকরূপী ব্যসনী যুবা অর্থাৎ যাঁহারা দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবা করিয়া আর অনিয়ত বেলায় ভোজনাবগাহন করিয়া স্বীয় অসাধারণতার ডিণ্ডিম বিঘোষিত করিতেছেন, তাদৃশ অসংখ্য অবিমৃষ্যকারী নিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বিশদ লেখা অনাবশ্যক।

একেতো সুরা, মাংস, বারাঙ্গনা, পরাঙ্গনা ছিল, তাহার উপর আশু অস্বাস্থ্যকর রাত্রি জাগরণাদি নিদান নিচয় যোগদান করিয়া মাত্রার পূর্ণতা প্রতিপাদন করিল, নিদান পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ায় ক্রমে তত্তৎ নিদানজনিত এক একটী দুরারোগ্য রোগের সূত্রপাত হইতে লাগিল। রোগপরম্পরা সত্ত্বেও যুবক ঠেকিয়া শিখিলেন না, বুঝিয়া বুঝিলেন না, চিরাভ্যাসবশতঃ সেই বিষময় নিদান পূর্ব্ববৎ পূর্ণমাত্রায় সেবন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

কিন্তু হায়! সে আর কয় দিন, ক্রমে বিষক্রিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিল; শরীর ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম জর্জ্জরিত হইল; সর্ব্বপ্রথমে যুবা স্বর্গীয় সুখ-স্বাস্থ্যটীকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিলেন।

স্বাস্থ্যের অভাববশতঃ যুবকের আয়ু, ধন, ধর্ম্ম, মেধা ইত্যাদি যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, সবই অন্তর্হিত হইল।

তাহাতে কেহ জননেন্দ্রিয়ের বৈকল্য নিবন্ধন সন্তানোৎপাদিকা-শক্তি হারাইয়া পুন্নাম নরকের পথ পরিষ্কার করিলেন। কেহ অসহায় আত্মীয়বর্গকে অকূলে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করিলেন, কেহ অসাধ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া

জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া আত্মঘাতী হইতে উন্মত্ত হইলেন; কেহ বা নানাবিধ বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিয়া দিন কয়েকের জন্য কথঞ্চিৎ স্বয়ং স্বাস্থ্যলাভ করিলেও বিকৃত বিষসম্পৃক্ত বীর্য্যে যে কয়টী সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে কেহবা অল্পায়ু, কেহবা চিররোগী, কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া পিতার ন্যায় জ্বালাময় জীবন লাভ করিল।

এই পুত্রপৌত্রগণ যখন যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল, তখন বয়োধর্ম্মবশতঃ কথঞ্চিৎ প্রবৃদ্ধবীর্য্য হইলেও আদর্শস্থানীয় পিতৃপিতামহের গুণানুচিন্তন করিয়া সেই নজিরে সেই সব ব্যসনের দাসত্ব স্বীকার করিল। একে চিররোগী, হীনবীর্য্য, তাহার উপর বিষময় ব্যসনের পূর্ণমাত্রা, জীর্ণ তরণী জলধির উত্তাল তরঙ্গে কয়দিন আর অস্তিত্ব লাভ করে? ক্রমান্বয়ে তাহারা বিলাসীর বিলাসময় অঙ্কের বিনিময়ে কালের কণ্টকময় ক্রোড়ে শায়িত হইল। ব্যসনী পিতৃ-পিতামহের সমারব্ধ ব্যসন-নাটকের এইখানেই যবনিকা পাত হইল। চিরদিনের জন্য চিরন্তন বংশটী লোপ পাইল।

যিনি যাহাই বলুন, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণচতুষ্টয়কে আপাততঃ অব্যভিচারিরূপে অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। যাউক্ তাহার পুনরুদ্ঘাটন নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে বক্তব্য, হে ব্যসনবশীভূত! ঋণার্ত্ত! আধিব্যাধিপ্রপীড়িত! ভূস্বামিবৃন্দ! অধিক আর কি বলিব, প্রবন্ধের প্রথমে যে কয় শ্রেণী ভূস্বামীর মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দুর্লক্ষণ লক্ষিত ভূরি ভূরি ভূস্বামীর শোচনীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া ও শুনিয়া যদি আপনাদের অন্তরে অধুনা অণুমাত্র প্রতিচিকীর্ষার ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ভবিতব্যতার দোহাই দিয়া নিদ্রিত থাকিবেন না। সংশিক্ষার সুব্যবস্থা করুন, চাটুকারের চাটূক্তিরূপ কালকূট হইতে চিত্তকে রক্ষা করুন, ভণ্ড পাষণ্ড আদি অসৎ সংঘকে অচিরে বিতাড়িত করিয়া দুর্গকে নিষ্কল্মষ করুন, প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী স্পষ্টবক্তা প্রবীণ সজ্জননিচয়ে দুর্গ সমলঙ্কৃত করুন, এবং মহাপাপ ব্যসন-সপ্তকের সমূলোৎপাটন করিয়া পরমেশ্বরে পরমাভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র আনন্দ অনুভব করুন। দেখিবেন, অচিরে উপরাগান্তে শশাঙ্কের রোহিণী যোগের ন্যায় আবার সেই শান্তি, সম্পত্তি সমাদরে স্বয়ং সমালিঙ্গন করিবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অনেকে অশিক্ষিত হইয়াও বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরতা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং শিক্ষার অভাব যে ভূস্বামিগণের ভীষণ ভবিতব্যতা ও শোচনীয় পরিণামের বিশিষ্ট কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে না। কথাটা আপাত-সত্য, কিন্তু সেই প্রাচীন প্রবীণ মহাত্মগণের তাদৃশ সংশিক্ষা না থাকিলেও সংশিক্ষা জন্য যে সংজ্ঞান, তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পূজন, অতিথি-সংকার, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অনুদ্বেগকর বাক্য, অপ্রিয় সত্য, বেদাভ্যাস, মনঃপ্রসাদ, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

তাঁহাদের নীতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাঁহাদের সদুদ্যম, সৎসাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা জানিতেন—

উৎসাহসম্পন্নম দীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় নিশ্চয়ং চ,
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ॥

অর্থাৎ "যাহার উৎসাহ আছে, ক্রিয়া বিধির জ্ঞান আছে, শৌর্য্য আছে, কৃতজ্ঞতা আছে ও দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে এবং যে ব্যক্তি অদীর্ঘসূত্রী ও ব্যসনে অনাসক্ত, লক্ষ্মী আপনিই বাস করিবার জন্য তাদৃশ পুরুষের কামনা করেন।"

তাঁহারা শিক্ষিত স্পষ্টবক্তা হিতৈষীকে সাদরে সহচর করিতেন। কারণ তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল

স কিং সখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ শৃণুতে স কিং প্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং
নৃপেষমাত্যেষু চ সর্ব্ব সম্পদঃ॥

অর্থাৎ যিনি স্বীয় প্রভুকে সাধু উপদেশ না দেন, তিনি কুৎসিত সখা আর, যে প্রভু হিতোপদেশ শ্রবণ না করেন, তিনিও কুৎসিত। নৃপ ও অমাত্য পরস্পর অনুকূল থাকিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিই সেখানে অনুরাগিণী হয়।"

তাঁহারা গল্প পুদ্গল (কার্য্যক্রমানভিজ্ঞ) মন্ত্রীর মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন না। যাঁহারা স্থিত কার্য্যের সমুদ্ভব, ভবিষ্য কার্য্যের সম্ভব ও অনর্থ কার্য্যের প্রতিঘাতার্থ মনন করেন, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিতেন। আত্মম্ভরি, বাক্যবাগীশ অশিক্ষিত অসৎ অনুচর তাঁহাদের পার্শ্বে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ব্যসন তাঁহাদের ত্রিসীমা স্পর্শ করিত না। তাঁহারা—

নিয়োগি হস্তার্পিত রাজ্যভারা
স্তিষ্ঠন্তি যে শৈল বিহার সারাঃ।
বিড়াল বৃন্দাহিত দুগ্ধকুম্ভাঃ
স্বপন্তি তে মূঢ় ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ॥

"যাহারা ভৃত্যের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শৈলবিহারমাত্রপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই সকল মূঢ়বুদ্ধি নরপতি বিড়ালবৃন্দের নিকট দুগ্ধকুম্ভ স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়।"

তাঁহারা এই সমস্ত উপদেশের অক্ষরে অক্ষরে সত্যতা উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁহারা শাস্ত্রমর্য্যাদানুসারে স্বাধিকৃত পৃথিবীকে পরিণীতা পত্নীর ন্যায় একান্ত রক্ষণীয়া মনে করিতেন। রক্ষাও করিতেন। পরিণীতা পত্নীর ন্যায় পৃথিবীকে অন্যের অধিকারে অর্পিত করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে দুর্গের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পৈশাচিক তাণ্ডব ছিল না, তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া কুলধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন। কারণ—

"ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভি ভবত্যুত
অধর্ম্মাঽভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ

কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হয়। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইয়া উঠে। স্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। সঙ্কর হইলে সেই কুল এবং কুলনাশক দুরাত্মাদিগের নরক হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পিতৃগণ লুপ্তশ্রাদ্ধ হইয়া ঘোর নিরয়ে নিপতিত হয়েন। এই সমস্ত ভগবদুক্তিতে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অধিক বলা অনাবশ্যক; তাঁহাদের যশস্বী দীর্ঘজীবনই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল।

তাই বলিতেছিলাম, আদর্শস্থানীয় প্রাচীন ভূস্বামিবৃন্দের তাদৃশ শিক্ষা না থাকিলেও সহজজ্ঞানের অভাব ছিল না।

কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কুলাচার ও দেশাচারের অবিরোধে শিক্ষাই সৎশিক্ষা, এবং যে সঙ্গ পাপব্যসনের দ্বারোঘাটন না করে, তাহাই সৎসঙ্গ।

আর্য্যজাতির তাবৎ শিক্ষা দীক্ষাই ধর্ম্মপ্রণোদিত; ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রবন্ধান্তরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিবার বাসনা থাকিল। স্থূলতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্য স্বাস্থ্যের অনুকূলতা অতি দক্ষতার সহিত নিহিত করিয়া স্ব স্ব অপূর্ব্ব ধীমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা ফলোপধায়কতা সঙ্গোপিত করিয়া একান্ত কর্ত্তব্যতাকে বিবিধ অর্থবাদের সহিত এবং অকারণে প্রচুর প্রত্যবায় প্রদর্শনের সহিত ব্যবস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ সর্ব্বদুঃখাকর স্বকাম ধর্ম্মের প্রসর বৃদ্ধি না করিয়া নিখিল শর্ম্মাস্পদ নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! দেশ কাল পাত্র বশে তাহা আজ অবজ্ঞার আস্পদ ও অবহেলার বিষয়। অনেক ব্রীড়াবিহীন ব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরেই প্রাচীন প্রণালীর কুসংস্কারত্ব প্রতিপাদনে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু সেই কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীনগণের সুখময় জীবনের সহিত স্বীয় ভীষণ দুঃখময় জীবনের যে কি তারতম্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। উন্নতি-পিপাসু হইলে যে স্বীয় দেশাচার ও কুলাচারকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। নানা অলঙ্কার ভূষিত বারাঙ্গনাকে দেখিয়া কুলাঙ্গনাগণের কুলটা হওয়া কি উচিত?

তাই বলিতেছিলাম, কৌলিক ধর্ম্মের অবিরোধে শিক্ষা দেওয়াই সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা। ব্যসনপরম্পরার অনিদান সুসঙ্গই সৎসঙ্গ।

উন্নতির ইচ্ছুক হইয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করি না, তবে ধ্রুব বিষয়ে অনাস্থা করিয়া অধ্রুব বিষয়ে ধাবিত হওয়া বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। পরিহিত বস্ত্রের শ্লথতাকে উপেক্ষা করিয়া উষ্ণীষ বন্ধনে ব্যগ্র হওয়া ব্রীড়াব্যঞ্জক নহে কি?

আমাদের বিশ্বাস, সৎশিক্ষা ও সতের সমাদর এবং অসৎ ও ব্যসনপরম্পরার মূলোচ্ছেদ ব্যতীত অবনম্যমান ভূস্বামিবৃন্দের পুনরুত্থান অসম্ভব।

কেবল ভূস্বামিগণের নিমিত্ত ভীষণ ভবিতব্যতা বা কুগ্রহগণের কুদৃষ্টি সৃষ্টি হয় নাই। অন্তশ্চর ও অন্তিকচর মূর্ত্তিমান্ গ্রহগণের নিগ্রহ সাধন করুন। অচিরে ব্যোমচর গ্রহগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।

পরিণীতা পত্নীর ন্যায় স্বাধিকৃতা পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ করুন; বসুন্ধরা কল্পলতার ন্যায় অচিরে নিঃসংশয় অভীষ্ট ফল প্রসব করিবে। আর আমাদের অনুরোধ নিম্নলিখিত শ্লোকটীর প্রতি দয়া করিয়া দৃক্‌পাত করুন। নীতি শাস্ত্র বলেন;—

"দুষ্টস্য দণ্ড সুজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাজ্যরক্ষা
পঞ্চৈব যজ্ঞা কথিতা নৃপাণাম্॥"

অলমিতি বিস্তরেন। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস প্রহরাজ মহাপাত্র।

কাশ্মীরের পথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বটোতী হইতে রামবন ১৭ মাইল পথ। ঘরাবর উৎরাই ছিল, সামান্য দুই একস্থানে চাড়াই ছিল। আমরা অতি উচ্চ পর্ব্বত গাত্রের পথে চলিয়া এক উচ্চ স্থান হইতে-রেখাবৎ বিখ্যাত 'চন্দ্রভগা' নদী অতি দূরতর পার্ব্বতীয় নিম্নপ্রদেশে দৃষ্টিগোচর করিলাম, যেন একটী বিশাল শ্বেত সর্প পর্ব্বতশ্রেণী দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থানে বহুদূর লম্বিত-ভাবে পড়িয়া আছে। বটোতী হইতে রাম-বনের মধ্যপথে চন্দ্রভগা নদীর গর্ভ হইতে অসঙ্গ ভাবে একটী পর্ব্বত উঠিয়াছে। সেই পর্ব্বতোপরি রাজা গজপতির কেল্লা নামে একটী প্রাচীন কেল্লা আছে। এই কেল্লাতে জম্মু ষ্টেটের যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবাসী-দিগকে নির্ব্বাসিত করা হয়, এইরূপ শ্রুত হই-লাম। বস্তুতও চন্দ্রভগা গর্ভে এই বিজন পার্ব্বতীয় প্রদেশে উহা দ্বীপান্তর বাসের উপ-যুক্ত স্থান অনুমান হইল। রাজা গজপতির কেল্লা এতদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ। কৌতুকাদি বশে এই প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা "রাজা গজ-পতির কেল্লায় স্থান দিব" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

ক্রমে নামিয়া আমরা যত চন্দ্রভগার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই নদী-প্রবাহের গভীর উচ্চনাদে আমাদের কর্ণ বধির করিতে লাগিল। আমরা তীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণীর উভয় কূলের বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ দিগন্তভেদী প্রতিধ্বনি দ্বারা সর্ব্বদা মুখরিত রহিয়াছে; এবং অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুগ্ধবৎ অম্বুরাশি উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া সর্ব্বদা যেন নৃত্য করিতে করিতে অবিরাম প্রখর বেগে প্রধাবিত হইতেছে। সে গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া সে গতি গুরুভার শিলা সবেগে বহন করিয়া কোথায় লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা কে জানে?

গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যেন সে গতি অযুত হস্তীর বলে প্রবাহিত হইতেছে। সে গতি ক্ষণমুহূর্ত্তে কত কত দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিয়া ও এক স্থানেই কত কত দেশের নিদর্শন দিয়া যেন সহাস্যবদনে মর-জগতের নশ্বরত্ব দেখাইতেছে এবং কালের গুরুত্ব জ্ঞাপন করিয়া উদাসীনভাবে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ স্থিরচিত্তে দর্শন করিলে মানসিক চঞ্চল বৃত্তি সকল স্রোতস্বতীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মনে হয়, এই তরঙ্গিণীর পবিত্র তরঙ্গে দেহ ভাসাইয়া দিয়া কৃতার্থ হই। তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব গমন-ভঙ্গী ও কূলের প্রাকৃতিক রমণীয়তা দর্শন করিতে করিতে নদীতীর দিয়া আমরা চলিয়াছি; পথশ্রান্তে ক্লান্ত থাকিলেও স্বভা-বের সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাহা আর অনুভূত হইতেছিল না। আমি দেখিলাম, সঙ্গীরাও কত প্রকার দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

ঈদৃশরূপে পথ চলিয়া বেলা প্রায় ১১টা ১২টার সময় রামবন নামক পড়াওতে আসি-লাম। এখানে অত্যন্ত গরম। ঠিক সম-তলের মতই বোধ হইতেছিল। এই চটীতে ৭।৮খানি দোকান আছে মাত্র, উহাতে থাকিবার স্থান না হওয়ায় চন্দ্রভগার পরপারে গিয়া একটী শিবালয়ের ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় লইলাম। এই স্থলে নদীর উপর

একটী ঝোলা পোল আছে; পারাপারের জন্য মাশুল দিতে হয়। পুলটী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। কাশ্মীর যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়া যাইতে হয়। শিবালয়ের ২০০।২৫০ ফিট নিম্ন দিয়া চন্দ্রভগা বহিয়া যাইতেছে। স্নান আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণকালে আমি ও মহন্তজী চন্দ্রভগার শোভা দর্শন করিবার জন্য তীরে অবতীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, প্রবল তরঙ্গ-প্রতিঘাতে জলকণা সমূহ বাষ্পাকারে নদীগর্ভে সর্ব্বদাই মেঘাকার হইয়া রহিয়াছে। অপরাহ্ণে সূর্য্য নামিয়া পড়ায় উহার উপর তদীয় কিরণ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হইয়াছে। নদীর তীরে ২০।২৫ হাত উপর পর্য্যন্ত বাষ্পরাশি দ্বারা ভূমি সিক্ত হইয়াছিল। ঐ সৈকত ভূমি মকমল সদৃশ ঘন তৃণাচ্ছাদিত। উহার উপরিভাগ যেন কেহ ছাঁটিয়া সমান করিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি জলকণা পতিত হইয়া মুক্তাখচিত মহামূল্যবান্ আসন বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। আমরা ইতস্ততঃ বিচ-রণ করিয়া অবশেষে নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া শ্রদ্ধাভাবে জল স্পর্শ ও পান করিলাম। জল অতিশয় শীতল, আমরা জলের মধ্যে অধিক-ক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। যেরূপ প্রখর স্রোত, তাহাতে জলের মধ্যে নামিতেও শঙ্কা হয়। মনে হয়, যেন স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনকালে শীত গ্রীষ্মের দ্বন্দ্ব-স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করিতেছিলাম, অর্থাৎ আমাদের একদিকে শীত ও অপর দিকে গরম বোধ হইয়াছিল। আমরা আশ্রয়-স্থানে আসিয়া শিবের আরতি দর্শন করিয়া শয়ন করিলাম।

২৯শে তারিখ রজনী প্রভাতে উঠিয়া আবার আমাদের পথ চলা আরম্ভ হইল। রামবন হইতে অল্প অল্প পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথমধ্যে চন্দ্রভগা নদীর তীর পরিত্যাগ করিয়া অপর আর একটী ক্ষুদ্রনদীর তীর দিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত গাত্রে সঙ্কীর্ণ পথে আমরা চলিতে লাগিলাম। এতদ্দেশীয় পর্ব্বতমালা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং অতিশয় উন্নত। পথ হইতে উচ্চে পর্ব্বতশিখর ও নিম্নে পর্ব্বতপাদের গভীরতা কিছুই আমাদের লক্ষ্যে আসিতেছিল না। স্থানে স্থানে পথের সঙ্কীর্ণতা ও নিম্নের গভী-রতা দেখিয়া মনের শঙ্কা উপস্থিত হইতে-ছিল। কিছুদূর চলিবার পরই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমেই বৃষ্টির প্রবলতা অধিক হইতে লাগিল। পথমধ্যে কোথাও দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান ছিল না। আমরা ভিজিয়া ভিজিয়া চলিতে বাধ্য হইলাম। পথও অতিশয় বিকট হইয়া উঠিল। উপর হইতে পাথর খসিয়া পড়িতে লাগিল, পাহাড় ধসিয়া পথ বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল; আমাদের অগ্র পশ্চাতে এইরূপ ক্রিয়া অবি-রাম হইতেছিল। প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরস্মরণপূর্ব্বক এইরূপ দুর্গম পথে আমরা চলিয়াছিলাম। অবশেষে আমরা একটী ভীষণ স্থানে উপস্থিত হইলাম; পথ সহিত পর্ব্বত ধসিয়া পড়ায় সেইস্থান অতিক্রম করিবার কোন উপায় ছিল না। পথ যেরূপ ঢালু হইয়া-ছিল, তাহাতে তাহার উপর দিয়া যাইতে কিছুতেই সাহসে কুলাইতেছিল না। যাহা হউক, সাহসে নির্ভর করিয়া আমরা সেই স্থানের উপর দিয়া দৃঢ়তার সহিত দুই হস্তে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করি-লাম। ঐ স্থানে চলিবার সময় কাদা, পাথর মিশ্রিত হইয়া আমাদের উপর পতিত হইতে-ছিল। এইরূপ অসমসাহসিকতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আমাদিগকে ৪।৫ মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হইত।

রামবন হইতে রামসুপড়াও ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা রামসু হইতে এক

মাইল পরে একজন সাধুর আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় পাইলাম। সাধুর দুইখানি মৃত্তিকা গৃহ ছিল। সাধু একখানি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমরা একটা আশ্রয় পাইয়া যেন বাঁচিলাম। বস্ত্রাদি সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং শীত বোধও অত্যন্ত হইতেছিল। বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছিল। আমরা যে ঘরে আশ্রয় লইয়াছি, তাহা মাটীর ছাদ, বৃষ্টির আধিক্যে ক্রমে ছাদ দিয়া জল চুয়াইতে আরম্ভ করিল। পরে ঘরে বাহিরে জল প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইল।

এইখানে আহারীয় দ্রব্যের কোনও দোকান ছিল না। সাধু আহারীয় দ্রব্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃষ্টির জন্য যোগাড় করিতে পারিলেন না। অদ্য আমাদের আহারীয় সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়িল দেখিয়া জামাতের কয়েকজন উদ্যোগী লোক সেই বৃষ্টির মধ্যেই এক মাইল দূরবর্ত্তী রামসু হইতে আটাদি সংগ্রহ করিয়া আনিল; তাহাও বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। যাহা হউক, কোনও ক্রমে অতি কষ্টে যাহা প্রস্তুত হইল, কাঁচা পাকা তাহাই সন্ধ্যাকালে আহার করিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল। তৎপরে শয়নের চেষ্টা করা গেল।

ভারতবর্ষের এক হিমাদ্রি গর্ভে সামান্য নগণ্য একটী কুটীরে সুদূর বঙ্গীয় আমিই একমাত্র বসিয়া আছি। মাতৃভাষার সহভাষী আর কেহই নাই। সুখ দুঃখের ভাব প্রাণ খুলিয়া ভাষায় প্রকাশ করি, তাহার উপায় নাই; তথাপি চিত্তে ধৈর্য্য ও বিরাগ ভাব থাকায় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও আমার এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব হইতেছিল, সকলেই স্বদেশকে ও স্বজনকে আপন বলিয়া এবং পরদেশকে ও পরজনকে পর বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রদেশী ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রে থাকিয়াও আমার হৃদয়ে তাহার বিপরীত ধারণা আসিয়া সুখ অনুভূত হইতেছিল। আমার বিচার-বুদ্ধি অতীত সুখভোগের বিষয় ও ভবিষ্যৎ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বিস্মরণ করিয়া দেওয়ায়, এক দিনের জন্য ঐ কুটীরই চিরবাসস্থান ও সেই প্রদেশকে স্বদেশ বলিয়া বোধ হইতেছিল। ঘরের অতি অল্প স্থান শুষ্ক ছিল, আমরা ২৪।২৫ জন লোক কোনও ক্রমে বসিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যুষে জাগিয়া দেখি যে, কে কাহার ঘাড়ে পা দিয়া শুইয়া আছে, তাহার কিছুই ঠিক নাই।

পরদিন আমরা রামসু হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী বানিহাল নামক স্থানে আসিলাম। অদ্যকার পথে চড়াই নামাই অধিক ছিল না। এই প্রদেশের প্রাকৃতিক পার্ব্বতীয় শোভা বড়ই সুন্দর। সতেজ কান্তিযুক্ত গুল্মলতায় নবভাবে পরিশোভিত ঘন নিবিষ্ট অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার উচ্চ স্থান হইতে কত কত নির্ঝরিণী মধুর ঝর ঝর শব্দে নিস্তব্ধ প্রদেশ মুখরিত করিয়া নিপতিত হইতেছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন দেবাদিদেব মহাদেবের জটা নিঃসৃত পবিত্র বারি সর্ব্বদা ক্ষরিত হইতেছে। আমরা এইরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটী ক্ষুদ্র কায়া নদীর তীর দিয়া এক উপত্যকা ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিকেই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতমালাবেষ্টিত হরিদ্বর্ণের ধান্য শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ক্ষেত্র সকল সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকায় রস সঞ্চারিত হইয়া শস্যকে সতেজ করিতেছে। এই উপত্যকাক্ষেত্র সমতল থাকায় নদীর বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া এই স্থানে মৃদু মন্দ গতিতে বহিয়া যাইতেছে, এত উচ্চে আসিয়াও যেন মনে হইতেছিল, আমরা সমতল ভূমিতেই রহিয়াছি।

এই স্থানে এই সময়ে শীত বর্ষা উভয়ই বিদ্যমান ছিল।

প্রায় বেলা ১০টার সময় আমরা বাণীহালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও একটী শিব মন্দিরে আশ্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু আমাদের আহারাদির সমাপনান্তে বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। অবিরত বৃষ্টি হওয়ায় এখানেও আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। বাণীহাল উপত্যকা খুব উর্ব্বর, এবং অন্যান্য পড়াও অপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু ও অনেক দোকান পাট আছে। এই বাণীহালই জম্বু ষ্টেটের শেষ সীমা অর্থাৎ ইহার পর হইতেই কাশ্মীর রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

প্রায় ২১।২২ ঘণ্টা অনবরত বৃষ্টি হইয়া পরদিন বেলা আন্দাজ ৯।১০ টার সময় বিরাম হইল। সেই হেতু অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের চলা বন্ধ রহিল।

বৃষ্টি অন্তে আমরা সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া বাণীহাল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এইখানেই আমরা কাশ্মীর মহারাজের ৬।৭ মাস বয়স্ক নব পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারিলাম। এই জন্য সমস্ত রাজ্য শোকগ্রস্ত হইয়াছিল। মহারাজের বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান হওয়ায় তিনি রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দুই হস্তে অর্থাদি বিতরণ করিতেছিলেন। কত লোকের আশায় ছাই পড়িল, কত লোক পাইয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই। এই সকল কারণেই সমস্ত রাজ্যে হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল।

অদ্য আমাদিগকে পীর পঞ্জাল নামক এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে। এই পর্ব্বতমালাই জম্বু ও কাশ্মীরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার পূর্ব্বপারে জম্বু রাজ্য ও পশ্চিম পারে কাশ্মীর রাজ্য। এই পর্ব্বতশ্রেণী দুই দেশের বহু প্রকার ভেদ জন্মাইয়াছে। আচার ব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা, এমন কি প্রাকৃতিক শোভাও সম্পূর্ণ পৃথক্। কাহারও সহিত কাহারও যেন মিশ খায় নাই। পূর্ব্বদিকে বাণীহাল পড়াও, পশ্চিমদিকে বৈরীনাগ পাড়া। উহার মধ্যস্থলে আকাশভেদী প্রাচীররূপে শিখর উন্নত করিয়া পীর পঞ্জাল বিদ্যমান রহিয়াছে। যেন এক দেশের বায়ু অন্য দেশে যাইবার উপায় নাই। দেখিলেই অতিশয় দুরারোহ বলিয়া মনে হয়। উহার উপর আরোহণের কিছু ভয়ও আছে, সময়ে সময়ে বরফ পড়ে ও প্রবল বায়ু চলিয়া বিপদ্ উপস্থিত করে। সেই জন্য পূর্ব্বেই সময় বিবেচনা করিয়া আরোহণ করিতে হয়। বিপদ্ হইতে বাঁচিবার জন্য বাণীহালের দিক্ হইতে চড়াইয়ে অর্দ্ধ মাইল পর পর ছোট ছোট এক একটী ডাক-ঘর আছে। উহাতে বিপদের সময় আশ্রয় লইয়া পথিকেরা জীবনরক্ষা করিয়া থাকে। উঠিবার দিকে এইরূপ নয়টী ঘর আছে।

বাণীহাল হইতে তিন মাইল উপত্যকা পথে চলিয়া আমরা পীরপঞ্জালের পাদমূলে আসিলাম। সেই স্থানেই একটী চটী ছিল। অধিকাংশ লোক এই চটীতে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পর্ব্বত আরোহণ করিলাম। কারণ পূর্ব্বাহ্ণকালে পীরের শিখর পরিষ্কার থাকে। অতিক্রমে কোনও আশঙ্কা ছিল না, অপরাহ্ণকালে প্রবল বায়ু প্রবাহিত ও বৃষ্টি হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল। এই দিন আমাদের চলিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। মধ্যাহ্নকালে আহারাদির ব্যবস্থা না করিয়াই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলাম, সেই জন্য পরে সকলকেই অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। পীর পঞ্জালে চড়িবার ও নামিবার দুইটী করিয়া পথ আছে। একটী অতি খাড়াই, অপরটী ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কয়েকজন দ্রুতগামী সাধু খাড়া

পথে চড়িতে লাগিল। আমিও তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইলাম।

জম্বুর পথে যত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছি, তাহার মধ্যে পীর পঞ্জাল সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ ও অধিক উচ্চ।

এই পর্ব্বতে চড়িতে কি প্রকার বলক্ষয় হয়, তাহা উপমা দ্বারা বর্ণনাতীত। সঙ্গীদের সহিত বসিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা আমরা পীরের শিখরোপরি আরোহণ করিলাম। পথমধ্যে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে মহন্তজি নিজের ঘোড়া দিয়া আমরা সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোড়ার কষ্ট দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা আমার আরও কষ্টকর বোধ হইল। অতএব মহন্তজির অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রবেশাবধি আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হইতেছিল। পীর পঞ্জালের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অসীম অনন্ত নভোমণ্ডলের মুখ দেখিতে পাইলাম।

সেই অনন্তের ছটা চতুর্দ্দিকে কত অসংখ্য ধবল তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ পার হইয়া কোথায় গিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনন্তের কোলে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বতচূড়ার উপর আমরা আসিয়াছি। রজতবর্ণের তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আকর সুবিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকা দূরে বিরাজিত। দর্শনমাত্রই এক অভাবনীয় আনন্দে আমার চিত্ত উন্মত্ত হইল।

যাহা হউক, পীরপঞ্জলের উপর হইতে সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা দেখিয়া লইলাম। এই স্থান হইতে দৃষ্ট রমণীয়তা পরিত্যাগ করিয়া নামিতে ইচ্ছা হইতেছিল না; কিন্তু অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া অবশেষে নামিতে বাধ্য হইলাম।

আমরা খাড়া পথে নামিতে আরম্ভ করিলাম। নামিবার সময় পায়ের কষ্ট ভিন্ন অন্য বিশেষ কষ্ট ছিল না। অতি দ্রুতবেগে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পীর পঞ্জালের পাদমূলে আসিয়া পৌছিলাম। পাদদেশেই একটী ভগ্নাবশেষ গ্রাম ছিল। এই গ্রাম অতিক্রম করিয়া দুই মাইল চলিয়া আমরা বৈরীনাগে আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইতে অল্পক্ষণ বাকী ছিল। দ্রুতগামী কয়েকজন সাধুর সহিত আমি অপর সকলের অগ্রেই আসিয়া একটী বৃহৎ উদ্যান মধ্যে চতুর্দ্দিক্ খোলা বাঙ্গলোতে আশ্রয় লইলাম। এই স্থান ব্যতীত আমাদের জামাতের সংকুলান হয়, এমন অপর স্থান পাওয়া গেল না। অপর সাধুদের পৌছছিতে প্রায় রাত্র ৮টা হইয়া গেল, কিন্তু কয়েকজন লোক ও ভারবাহী ঘোড়া আসিল না; সেজন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। অনেক চেষ্টার পরও তাহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘোড়া না আসায় শীতবস্ত্র অভাবে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল। বৈরনাগে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা শীত থাকে। তাহার উপর অদ্য বৃষ্টি হওয়ায় আশ্রিত গৃহের তলদেশ দিয়া একটী শীতল জলের খাল প্রবাহিত থাকায়, শীত আরও দ্বিগুণ বোধ হইতেছিল। সমস্ত দিন অনাহারে ও নিদারুণ পর্ব্বত আরোহণের শ্রম ইত্যাদি কারণে তৎকালে যে শারীরিক কিরূপ কষ্টভোগ হইতেছিল, তাহা ভুক্তভোগীরই অনুভবনীয়। যখন কষ্টের পালা আইসে, তখন কোনও প্রকার আয়োজনের ত্রুটী থাকে না। মহারাজের পুত্র বিয়োগ জন্য রাজবিধান দ্বারা ঐ দিন ক্রয় বিক্রয় একেবারে বন্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং আমাদিগের আহারীয় দ্রব্য পাওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না; কিন্তু অনেক চেষ্টা

করিয়া /৩ সের আটা সংগ্রহ হইল, তাহার দ্বারা ২০।২৫ জন লোক এক একখানি রুটী খাইয়া প্রাণ ধারণ করিল। জ্বালানি কাষ্ঠ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল, তাহা জ্বালাইয়া আমরা কোনও প্রকারে শীত নিবারণ করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি। পূর্ব্ব দিন আমাদের আহারাদি হয় নাই, এবং কয়েকজন লোক ও ভারবাহী ঘোড়া না আসায় অগত্যা আমরা সেই দিন সেইখানে থাকিলাম। এই দিন দোকান পাট খুলিবার হুকুম হইল, সুতরাং আমাদের আহারীয় দ্রব্য পাইতে কোনও কষ্ট হইল না। দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আহারের আয়োজন করা হইল। ভারবাহী ঘোড়া ও লোকেরা মধ্যাহ্নকালে এখানে আসিল, ঘোড়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে না পারায় পূর্ব্বদিন তাহাদিগকে পীড়ের চড়াইতে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। পথে তাহাদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল।

বেরীনালে দুইটী দেখিবার বিষয় আছে। একটী বৈরীনাগকুণ্ড অর্থাৎ একটী প্রবল প্রস্রবণ (কাশ্মীরী ভাষায় প্রস্রবণকে নাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকে)। ভূগর্ভ হইতে একটী কুণ্ড দিয়া অবিরাম গতিতে বহুতর জল প্রবল বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। দেখিলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইতে হয়; কারণ ভূগর্ভ হইতে এত জল কোথা হইতে আসিতেছে। কুণ্ডের চতুর্দ্দিক পাথরে বাঁধান, উহার উপর মুসলমান বাদসাহী আমলের একটী বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। দৈবযোগে অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হওয়ায়, এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ ভগ্ন বাড়ীর দেওয়ালে কুণ্ডের কিনারে দুইটী পাথরে "জাহাঙ্গীর বাদসাহের নাম ও ১৬৭৭ সংবতে নির্ম্মিত" খোদিত আছে। এতদ্দেশের লোকেরা কুণ্ডকে তীর্থরূপে মান্য করে। অপর বিষয়টী এই কুণ্ডের সম্মুখেই অতি বৃহৎ নানাপ্রকার ফল পুষ্পে পরিশোভিত একটী উদ্যান। কুণ্ড হইতে যে জলের খাল বাহির হইয়াছে, তাহা বাগানের নিকটে আসিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী উদ্যানের মধ্য দিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ও অপর দুইটী খাল বাগানের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ অত্যুচ্চ সফেদা বৃক্ষের দ্বারা উদ্যান প্রাচীরবৎ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছত্রাকার চনার বৃক্ষ শির অত্যুচ্চ করিয়া শীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকল বৃক্ষেরই স্কন্ধদেশে অতি বৃহৎ বৃহৎ কোটর আছে। ইহা দেখিলে মনে হয়, যেন যোগীদিগের সাধনস্থান। উদ্যান মধ্যে খালের উপর ঠিক মধ্যস্থলে ও শেষ প্রান্তে দুইটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাঙ্গলো আছে। মধ্যাহ্ন সময়ে উহার মধ্যে উপবেশন করিলে উহা স্বর্গীয় নন্দন কানন বলিয়াই ভ্রম হয়।

বৈরীনাগের প্রাকৃতিক শোভা কাশ্মীর মধ্যে প্রথম স্থানীয়। কোথাও খালি জমি দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই সবুজ বর্ণের তৃণ ও বৃক্ষে পরিশোভিত রহিয়াছে। মনে হয়, সর্ব্বদা এখানে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করি। বাগানস্থ বাঙ্গলো ভিন্ন ইংরেজদের থাকিবার জন্য অন্য বাঙ্গলো আছে। তাহাতে দেশী লোক থাকিতে পারে না। বৈরীনাগে অনেক কাশ্মীরী পণ্ডিতের বাস আছে; তাঁহারাও যাত্রীদিগকে বাড়ীতে স্থান দেন, এবং উহা দ্বারা পয়সা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। পীর পঞ্জাল পার হইয়া এক্ষণে আমরা কাশ্মীর দেশে পঁহুয়াছি। দেশের আবহাওয়া বদ-

লের সহিত মানুষের চেহারা, বেশভূষা, ভাষা, সমস্তই বদল হইয়া গিয়াছে। বৈরী-নাগ প্রস্রবণই তটনদীর অর্থাৎ ঝিলম বা বিতস্তা নদীর প্রধান উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিখ্যাত। ঝিলম নদীকে কাশ্মীরের লোকে ভট নদী বলিয়া থাকে। সমস্ত দেশের ভ্রমণকারী এই বৈরীনাগের শোভা দেখিতে আসিয়া থাকে। আমরা দুইটী মেমকে এখানে দেখিলাম। তাঁহারা এই স্থানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতেছে।

শ্রাবণের ১লা তারিখে আমরা রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া রওনা হইলাম। চলিতে অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছিল। এক্ষণে আমরা কাশ্মীর উপত্যকা সমভূমিতে আসিয়াছি। পর্ব্বত-পথের চড়াই উতরাইয়ের কষ্ট আর নাই। কত কত ক্ষীণকায়া নদী বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডে শরীর লুক্কায়িত করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে বহিয়া যাইতেছে। আমরা প্রভাতেই জ্যোৎস্নালোকে সেই সকল নদী পার হইয়া, অনন্তনাগের দিকে যাইতে লাগিলাম। সূর্য্যদেব রজনীর তমোরাশি দূর করিয়া শোভার আগার কাশ্মীর উপত্যকা-ভূমি উদ্ভাসিত করিয়া পর্ব্বতশিখরে উদিত হইল। সূর্য্য প্রকাশের সহিত কত কত নব নব স্বভাবের শোভা আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। গমনপথের উভয় দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত কেবলই হরিদ্বর্ণের ধান্যক্ষেত্র। সে বর্ণের বিচ্ছেদ নাই, যেন এক বর্ণেই উন্মুক্ত প্রান্তর রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানা রক্ত-বর্ণের ধান্যক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; এরূপ লাল ধানগাছ আর কোথাও দেখি নাই।

আমাদের দেশে সে সকল ফল (শেঁওনাক ইত্যাদি) দুষ্প্রাপ্য, তাহা পথপার্শ্বের বৃক্ষে অজস্র ফলিয়াছে; ফলভরে বৃক্ষশাখা অবনত ও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। চনার বৃক্ষসকল মধ্যে মধ্যে পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকদিগকে সুশীতল ছায়া দানে বিশ্রান্ত করিতেছে। চনার কাশ্মীর দেশজাত এক প্রকার বৃহৎ উন্নত বৃক্ষ; উহার শোভার খ্যাতি আছে। পথের দুই ধারেই বেঁথ গাছের কেয়ারী ও স্থানে স্থানে বেঁথবন বিদ্যমান রহিয়াছে। বেঁথ গাছ খুব বড় হয় না; ছয় সাত হাত লম্বা গুঁড়ি। স্কন্দ উপরি গুচ্ছমত কতকগুলি সরু সরু ডাল হয়, তাহা চারিদিকে ছত্রমত নত হইয়া পড়ে। ইহা সহজে মরে না, ডাল লাগাইলেই গাছ হয়। বেঁথবনের নীচে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করে না; সেই হেতু কোমল সবুজ বর্ণের ঘাস হয়; দেখিতে অতি সুন্দর মক্‌মল সদৃশ। মনে হয়, যেন প্রকৃতিদেবী শান্তির আসন বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য জলনালা ইতস্ততঃ পথমধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। সেই সকল জলনালার তীরে তীরে স্বাভাবিক তৃণকুলের সৌন্দর্য্য যেন সর্ব্বদাই হাস্য করিতেছে।

আমরা ছোট বড় অনেক পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিলাম। গ্রাম্য ঘর বাড়ী সমস্ত একই রকম; একতালা গৃহ কোথাও দেখিলাম না, প্রায়ই তিনতালা, চারিতালা গৃহ দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক বাড়ীতে একটীমাত্র গৃহ; বহু গৃহবিশিষ্ট বাড়ী পল্লীগ্রামে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এক গৃহই আয়তনে বড় ছোট হইয়া থাকে। সমস্তই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ, তিন চারতালা কাষ্ঠ দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। নীচের তলাগুলি অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ। সর্ব্বোপরি তলা উচ্চতায় বেশী। কাশ্মীর দেশের বাড়ীর ছাদ কোথাও সমতল হয় না; মটকা উচ্চ করিয়া দুইদিকে ঢালু করে। তক্তা, ভূর্জ্জপত্র ও মাটী সংযোগে ছাদ হইয়া থাকে। কাষ্ঠের

বড় বড় থামের উপর বাড়ী প্রস্তুত; এজন্য বাড়ীর তলদেশ শূন্য থাকে। গ্রামের মধ্যে গৃহ হইতে গৃহান্তরের তল দিয়া বহুতর জলধারা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গৃহবাসীদের জলের জন্য অন্য স্থানে যাইতে হয় না; গৃহে বসিয়াই জল পাইয়া থাকে। গ্রামগুলি প্রায়ই চনার বৃক্ষে পরিবেষ্টিত; বহির্দ্দেশ হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর। গ্রাম্য লোকদের বেশভূষা হিন্দু মুসলমান সকলেরই এক রকম। স্ত্রী, পুরুষের বেশেরও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সকলেই গলা হইতে পা পর্য্যন্ত পশমি লুই কাপড়ের মোটা জামা (কাশ্মীরী ভাষায় তাহাকে ফিরণ বলে) পরে। পুরুষেরা মাথায় সাদা পাগড়ী ব্যবহার করে; হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পাগড়ী বাঁধিবার সামান্য বিভিন্নতা আছে মাত্র। স্ত্রীলোকেরা মাথায় চাদর দিয়া পশ্চাদ্দিকে লম্বিত করিয়া দেয়, তদুপরি টুপী পরে। হিন্দুর সাদা টুপী, মুসলমানের লাল টুপী—এইমাত্র প্রভেদ। স্থানীয় লোকদের চেহারা যদিও কাল নহে, কিন্তু তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অতি মলিন ও অপরিষ্কার। কাশ্মীরের লোকেরা শীত নিবারণ করিবার জন্য এক প্রকার অগ্নি রাখিবার পাত্র ব্যবহার করে, তাহার নাম কাঙ্গরী। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই শীতকালে এক একটী কাঙ্গরী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা চলিতে চলিতে একটী বাড়ীর সম্মুখে মাটীর রোয়াক দেখিয়া বিশ্রাম জন্য বসিতে গিয়া দেখিলাম তাহার নীচে ময়লায় পূর্ণ রহিয়াছে। পরে জানিতে পারিলাম, এতদ্দেশের স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর দরজার বাহিরেই মলত্যাগ করে। ইহাদের লজ্জাশীলতা অতিশয় কম। বৈরী নাগ হইতে ১৬ মাইল দূর অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদ সহরে আমরা বেলা ১১টার সময় আসিলাম। সহরের অনতিদূরে একটী নদীর উপর পোল পার হইয়া আমরা সহরে প্রবেশোন্মুখ হইলাম। এই নদীর তীর হইতে সহর প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। সেই অর্দ্ধ মাইল পথের দুই ধারেই ঘন সন্নিবিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ অত্যুচ্চ সফেদা বৃক্ষ শোভিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া চলিবার সময় মনে হইতে লাগিল আমরা যেন কোনও গিরি-গুহা দুর্গে প্রবেশ করিতেছি। অনন্তর আমরা এক নাগ বা কুণ্ডের নিকট আসিলাম। এ কুণ্ডের নাম অনন্তনাগ বা অন্ধনাগ। পর্ব্বত গর্ভ হইতে নিয়ত নির্ম্মল স্বচ্ছ জল নির্গত হইয়া কুণ্ড পূর্ণ হইতেছে। পাশাপাশি দুইটী কুণ্ড আছে। আয়তন প্রায় এক বিঘা করিয়া হইবে। গভীরতা দুই আড়াই হাতের বেশী নহে; চারি দিকে পাথরে বাঁধান; উহাতে অনেক মৎস্য আছে। জল স্বচ্ছ বলিয়া প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কুণ্ডের কিনারে ধর্ম্মশালা আছে। উহাতে সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রী সকল আশ্রয় লইয়া থাকে। কুণ্ড দর্শন করিতে অনেক যাত্রীও আইসে। জামাতের লোক একে একে আসিয়া এইখানেই জমা হইল, এবং মধ্যাহ্নে স্নান আহারাদি করিয়া অদ্যই শ্রীনগর যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল।

এই অনন্তনাগ সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে ইচ্ছাবল বা অচ্ছোদবল নামক একটী স্থান আছে। ঐ স্থান হইতে দুইটী প্রবল উৎস বহির্গত হইয়া এক নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রস্রবণ দ্বয়ের নামই ইচ্ছাবল বা অচ্ছোদবল। এতদ্দেশের লোকেরা ভূগর্ভস্থ বৃহৎ উৎসকেই বল নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মুসলমান বাদসাহেরা এই স্থানের রমণীয়তা উপভোগের জন্য একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উদ্যান মধ্যে সুন্দর সুন্দর গৃহ সকল এবং উৎসের জলে বহুতর ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়া

ছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কাশ্মীর ভ্রমণকারী সকলেরই ইচ্ছাবলের সৌন্দর্য্য দর্শন করা উচিত। সকল ভ্রমণকারীই উহার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। আমারও সময়ান্তরে উহা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। উৎসের জল সর্ব্বদাই সমান বেগে বহির্গত হইয়া থাকে; তাহার কখনও ইতরবিশেষ হয় না। এত জল কোথা হইতে বাহির হয়, কিছুই অনুমান করা যায় না। কাশ্মীর উপত্যকায় এইরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জল-ক্রিয়া ও স্বভাবজাত ফলপুষ্পের শোভাই প্রধান দর্শনোপযোগী।

আমরা অনন্তনাগ পরিত্যাগ করিয়া দেড় মাইল দূরে থানাবল নামক স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলাম। অনন্তনাগ হইতে থানাবল পর্য্যন্ত পথের দুই ধারেই শ্রেণীবদ্ধরূপে উচ্চ উচ্চ সফেদা বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল; আমাদের পথ চলিতে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিতেছিল না। অবশেষে আমরা থানাবলে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভারবাহী ঘোড়াওয়ালাকে জম্মু হইতে থানাবল পর্য্যন্ত ৭৷৷০ টাকা ভাড়া দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। আমরা থানাবল হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলাম। এই থানাবলেই কাশ্মীরদেশীয় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নৌকা দেখিতে পাইলাম। আমাদের নৌকা স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিল। নৌকার মধ্যে আমরা আমাদের স্ব স্ব আসন বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলাম। নৌকারোহণে নদীর উভয় কূলের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আমাদের অনেক দিন পদব্রজে চলিবার কষ্ট দূর হইয়া গেল ও এক প্রকার সুখ অনুভূত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা নৌকারোহণ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমরা কিছু আহার করিয়া নৌকাতেই শয়ন করিলাম। পরদিন বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা শ্রীনগর রাজধানীতে পৌঁছিলাম। এখানে মহন্তজীর দশনামী এক মঠ (আখড়া) ছিল। আমরা নৌকা হইতে নামিয়া উহাতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। তূরীধ্বনি দ্বারা অমরনাথ মহন্তের আগমন বার্ত্তাও ঘোষিত হইল।

কপিলাশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী।

আদর্শ।

পৃথিবীতে এইরূপ লোক বিরল, যিনি কোন না কোন আদর্শকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া উন্নতির অন্তিম বা উপান্ত সোপানে উত্থিত হইয়াছেন। উন্নতির এত বড় ব্যাপারটাকে বাদ দিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ কেরাণীগিরি করিতে হইলেও একটা আদর্শ করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। আর যিনি এই বিষয়ে তাচ্ছীল্য করেন, তাঁহার ভাগ্যের কথা সকলেরই বিদিত আছে; সুতরাং ইহা লইয়া বিশেষণের ছড়াছড়ি করিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। উন্নতির অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই যে একটা আদর্শের প্রয়োজন আছে, ইহা সর্ব্বসম্মত বলা যাইতে পারা যায় সত্য; কিন্তু অনেকে মনে করেন, অধিকারিভেদে আদর্শ বিভিন্ন হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, যদি বিভিন্ন ব্যক্তির অনুষ্ঠীয়মান বিভিন্ন কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখা যায়, তবে ইহার সত্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হইবেন না। পক্ষান্তরে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির একই কার্য্যের প্রতি এই অধিকারিভেদটাকে টানিয়া আনিলে বিচার-বৈধুর্য্য ও বিচার-চাতুর্য্য লইয়া একটা মতামতের কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও এই কলহটা তরুকোটরবাসীর অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান হীরকখচিত সৌধবিহারীর অবস্থা পর্য্যন্ত মানবসমাজে আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার বিষয় সম্বন্ধে তথ্যের অনুসন্ধান বা মন্তব্য প্রকাশ করা, কখন কৃতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষে অনধিকারচর্চ্চায় পরিণত হইতে পারে না। আর সত্যাসত্যের বিশ্লেষণপূর্ব্বক সত্যকে মানুষের মনে প্রোথিত করা যে বিদ্যার গৌরব ও সাফল্য, ইহা বিশেষদর্শীকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিশ্চয়ই স্থূলবুদ্ধি বা অল্পপ্রজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিয়া কখন গৌতম, কপিল বা গদাধর হইতে পারে না, কিন্তু এইরূপে অগ্রসর হইয়া যদি তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অটল অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারে, তবে যে বিদ্বৎসমাজের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

কেহ যদি কোটি মুদ্রার অধিপতি হইতে যাইয়া দশ সহস্র মুদ্রাও আয়ত্ত করিতে পারে, তবে তাহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা কদাপি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবার নহে। মনে কর, 'হেমের' বুদ্ধি বড় মোটা, মাথাটা যেন অসার জিনিষে ভরা; কিন্তু সে যদি ধীরভাবে পরিশ্রম করিতে থাকে, তবে কি সময়ে হেমবৎ আদরণীয় হইবে না? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাকে অনেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখে, অধ্যবসায়ের মাহাত্ম্যে সে তাহাদের অপেক্ষাও উন্নত হইয়া উঠে। এইস্থলে এইরূপ একটা আপত্তি উঠিতে পারে, যখন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ উন্নতিলাভে সমর্থ, তখন কোন আদর্শ লইয়া পীড়াপীড়ির আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে মোটের উপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহারা পরিশ্রম কিংবা অধ্যবসায় দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়া থাকে, তাহারা অবশ্যই আমি অমুক উন্নত ব্যক্তির ন্যায় হইব, এইরূপ একটা দৃঢ় ধারণা করিয়া লয়, আর ইহাই আদর্শ অনুসরণের অর্থ। তবে এই স্থলে ইহা বলা অন্যায় নহে যে, আদর্শের তারতম্যে আদর্শকারীরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যাহার আদর্শ 'শকুনির' ন্যায় কপট-প্রকৃতির লোক, সে কখনও বিদুরের তুল্য ধার্ম্মিক হইতে পারে না। "চণ্ডাশোককে" আদর্শ করিয়া "ধর্ম্মাশোক" হওয়াও অত্যন্ত কঠিন বটে। মথুরার চোবেজীকে আদর্শ করিলেও বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজ পদ হইতে অধিক দূরে যাওয়া যায় না। আর পাঠশালার গুরুমহাশয়কে আদর্শ করিলে যে শুভঙ্করীর চতুঃসীমার বাহিরে যাওয়া সুকঠিন, ইহারও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যখন আদর্শের উৎকর্ষ ও নিকর্ষের উপর আদর্শ অনুসরণকারীর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে, তখন যিনি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাকে যে যোগ্য আদর্শ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু পাঁচু মুদির গুণধর পুত্রের পক্ষে 'জগৎ'শেঠ এবং ভোলা পূজারীর তথাবিধ দৌহিত্রের পক্ষে উদয়নাচার্য্য আদর্শ হইতে পারে কি না, ইহা বিচার্য্য স্থল। এইখানে অনেকেই বলিয়া উঠিতে পারেন যে—না, কখন তাঁহাদিগকে আদর্শ করিতে ইহারা অধিকারী নহে।

কিন্তু মানবীয় শক্তির কারুকার্য্যের প্রতি মনঃসংযোগ করিলে 'ইহারা অধিকারী নহে' বলিতে তাঁহাদেরই অনধিকার প্রতিপন্ন হইয়া যায়। ফলতঃ কাহার অভ্যন্তরে কোন্ শক্তি বিকাশোন্মুখ রহিয়াছে বা না রহিয়াছে, ইহা বুঝিয়া উঠা সহজ ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া ভাবি জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিতে গেলে যে, সকল স্থলেই সত্যের উদ্ঘাটনে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। শঙ্করের যুগে এমন কে ছিল যে, হামাগুড়ি অবস্থায় শঙ্করকে দেখিয়া দিগ্‌বিজয়ী বিদ্বান্ মূর্ত্তি যুবক শঙ্করকে বুঝিয়া লইতে পারিত? কালিদাসের যুগে কেবা "উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা যং বা" অবস্থার কালিদাসকে দেখিয়া শকুন্তলা ও মেঘদূতপ্রভৃতির প্রণেতা মহাকবি কালিদাসকে ধারণা করিয়া উঠিত?

মহত্তম আদর্শকে জীবনে পরিণত করাতে যে সকলেরই অধিকার আছে, ইহার আভাস পাওয়া গেল। আর ইহাতে কোন বিষয়ে অপকারের আশঙ্কা থাকিলেও উপকারেরই পরিমাণাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ যদি সাধনবৈকল্যে বা দৈবদুর্ব্বিপাকে অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য না হন, তথাপি তিনি যে এরূপ আদর্শ পরিগ্রহের ফলে কোন না কোন বিশেষ গুণ লাভ করেন, ইহা সুনিশ্চিত। আর যাঁহারা কোন উচ্চ পদ লাভ বা উদরান্নের সংস্থানেই ইতিকর্ত্তব্যতা নিঃশেষ করিয়া ফেলেন ও যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আদর্শই বিদায় হইয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর মতামত লইয়া এই বিষয়ে কোন মীমাংসা করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর মহোদয়েরা যে গুণটুকু লাভ করেন, তাহাতে পূর্ব্বানুসৃত আদর্শেরই মহিমা সূচিত হইয়া থাকে। তাহারা যদি হস্তপদ সঙ্কোচ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তবে কখন এই গুণের অধিকারী হইতে পারিতেন না। দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি অলসতাকে জীবনের প্রধান সঙ্গী করিয়া লন, তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে গৃহিণীর সম্মার্জ্জনী হইতে অব্যাহতি পাইলেও দীনতার করাল আক্রমণকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারেন না।

আদর্শ যোগ্যতম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলে তদনুসরণকারী ঐ আদর্শের অনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ যোগ্যতা লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া লন; সুতরাং তিনি উন্নতির কয়েকটা সিঁড়ি পার হইলেই আর অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন না, এইরূপ ইচ্ছাও থাকে না। ইহার ফলে ঐ ভূমিকাতে থাকিয়াই তাঁহাকে জীবনলীলার অবসান করিতে হয়। পক্ষান্তরে যোগ্যতম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শের অনুসরণ করিয়া কেহ যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকে তৎকালে অগ্রসর নাও হইতে পারেন, তথাপি অতৃপ্তিমূলক ঐ অভিলাষ তাঁহাকে সময়ান্তরে পুনরগ্রসর করিয়া তুলে। মানুষের যোগ্যতা যেরূপই হউক না কেন, উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিতেই হইবে। পর্ব্বতের উপরে উঠিতে না পারিলেও উপত্যকার সৌন্দর্য্য অনুভবজনিত সুখে তাহাকে বঞ্চিত করিতে হইবে না। যিনি দার্শনিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি মহর্ষি গোতমকে আদর্শ করুন, যিনি বীর হইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকেই আদর্শ করা উচিত এবং রাজনীতিজ্ঞ হইবার অভিলাষীর পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা কুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্য আদর্শ হউক। ইহাতে লাভ ব্যতীত অলাভ নাই। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা যখন জীবকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তখন

অযোগ্যতার আশঙ্কায় পড়িয়া নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

আর্য্যজাতি পুরাকাল হইতেই উন্নতিলাভের জন্য উচ্চ আদর্শ অনুসরণের আবশ্যকতা বুঝিয়া আসিতেছেন, তাই তাঁহাদের বেদে "আচার্য্য দেবোভব" উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই আচার্য্য পদে যে রাম শ্যামের অধিকার নাই, কিন্তু ইহা সদাচারসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বদ্বরের জন্যই নিয়মিত হইয়াছে, তাহাও "স গুরুসেবাভিগচ্ছেৎ সসিৎপাণিঃ শোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" উপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে। যোগসূত্রেও "বীতরাগধ্যানাদ্বা" সূত্রদ্বারা মহাপুরুষকে যে আদর্শ করা উচিত, ইহা বিহিত হইয়াছে। যখন লৌকিক বিষয়েও কাহাকে আদর্শ না করিয়া চলিলে কার্য্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য যে মহত্তম আদর্শ চাই, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। আদর্শ মহত্তম না হইলে আশানুরূপ সাফল্যলাভ হয় না বলিয়াই শাস্ত্র-প্রণেতারা স্বকীয় শাস্ত্রে গুরুর বিশিষ্ট লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। আর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত গুরুকে আদর্শ করিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইলে যে মহান্ লাভ হয়, ইহাতে কোন বিচারশীল ব্যক্তিই সন্দেহ আনিতে পারেন না। কেহ কেহ হয়ত বর্ত্তমান গুরুতা-ব্যবসায়ীদিগের আচরণ দেখিয়া গুরুকরণ প্রথাটাকেই সমূলে উঠাইয়া দিতে চাহিবেন। পরন্তু ধীরভাবে বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ব্যক্তিকে গুরু না করিয়া জীবন যাত্রা আরম্ভ করিলে মনুষ্যত্ব লাভই দুর্ঘট হইয়া উঠে। অবশ্যই প্রচলিত গুরুকরণ প্রথাটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; পড়ুক, তাই বলিয়া মূল জিনিষটার ধ্বংশ সাধন করা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা হইতে কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না যে, "তুমি রসমঞ্জরী নাম পাইলে, বিলাস সজ্জাধারী শ্রীকৃষ্ণের বদনে তাম্বুল অর্পণ করাই তোমার সেবা" ইত্যাদি অপরূপ গুরুকরণ প্রথার সমর্থন করা হইতেছে। আমরা ঐ গুরুকরণপ্রথার পক্ষপাতী, যাহার দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞানরাশির বিলোপ ও অভয়পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আশাকরি অনেক বিচারশীল পণ্ডিতই এইরূপ গুরুকরণকে উঠাইয়া দিতে সম্মত হইবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক কৃতবিদ্য লোকে আদর্শ অনুসরণের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও গুরু শিষ্য প্রথার বিরোধী হইয়া পড়েন। ইহার কারণ বর্ত্তমান গুরুদিগের অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের এই সম্বন্ধে উৎকট ঘৃণার আবির্ভাব। পরন্তু উদ্যানের কোন অংশে মনসা বৃক্ষ দেখিয়া সমস্ত উদ্যানকে তন্ময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বিশেষ দর্শীর কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যদিও তথাকথিত গুরুর সংখ্যা পৃথিবীতে অতীব কম, তথাপি কার্য্যসিদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে না; কারণ এক মহাপুরুষ কোটি কোটি লোকের আদর্শ হইতে পারেন। এইত গেল ধর্ম্মবিষয়ে আদর্শের কথা, আবার লৌকিক বিষয়ে আদর্শ হইবার যোগ্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি বসুন্ধরাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আর আদর্শকে যে, সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত, ইহাতেও কোন বিবাদ আসিতে পারে না। তবে সম্মান প্রদর্শনের প্রণালী বিভিন্ন রকমের। হিন্দুর সম্মান প্রণালীটা অহিন্দুর মধ্যে নাই এবং অহিন্দুরা যে প্রণালীতে আদর্শকে সম্মান করেন, তাহা হিন্দুরা পছন্দ করেন না। অধিকন্তু এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া একটা ঝগড়া ডাকিয়া আনা উচিত নয়। আমরা আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সুতরাং কাহাকেও যদি সম্মান করি, তবে তাঁহার প্রতি প্রণাম প্রভৃতি ব্যবহারের কোন একটা করিব। এইস্থলে

করমর্দ্দন প্রভৃতি বিজাতীয় ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে যাহারা স্বজাতির ব্যবহার মাত্রের প্রতি ঘৃণা ও বিজাতীয় যে কোন ব্যবহার হউক না কেন, সমাদর করেন, তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। এইরূপ অবস্থাতে যদি কেহ গুরুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তবে তাঁহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা অসভ্য বলিতে আমাদের কতদূর অধিকার আছে, তাহা পাঠকগণই স্বয়ং মীমাংসা করিয়া লইবেন।

অপ্রবুদ্ধ লোকের পক্ষে হৃদয়ে কোন একটা উচ্চ আদর্শ না থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে আপনাকে অবিচলিত রাখা অতীব সুকঠিন, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আমিই নিখিল শক্তির মূলাধার পরব্রহ্ম, এইরূপভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আপনা হইতে স্বতন্ত্র কোন না কোন আদর্শকে জীবনতরীর পরিচালক করিয়া লইতেই হইবে। যাঁহারা আপনাকে ভ্রমপ্রমাদশালী অল্পশক্তি জীব মনে করে, তাঁহারা আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া যদি কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কেননা এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ঐ কার্য্যের ভারটা এত গুরুতর হইয়া পড়ে যে, সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। আবার আদর্শানুসরণকারীর মধ্যেও অনেকে আদর্শের গুণকে বাদ দিয়া দোষগুলিকেই বাছিয়া আপনজীবনে পরিণত করিয়া লন। ইহার ফল তাঁহাদের পক্ষে বিষময় হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া একশ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে, যখন মনুষ্যের মধ্যে দোষ সম্পর্কশূন্য নিরবচ্ছিন্ন গুণের আধার কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন অলৌকিক আদর্শের দিকেই যাওয়া উচিত। এই শ্রেণীর মহোদয়েরা এইরূপ মনে করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু কল্পনাশক্তির প্রভাবে ঐ অলৌকিক আদর্শটাকে নির্দ্দোষ ও নিখিল সদ্‌গুণের আকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এইস্থলে বিবেক-চক্ষু খুলিয়া দেখিলে ঐ আদর্শটার মধ্যেও দোষের কালিমা আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে; না পড়িবে কেন, মানুষ যখন স্বয়ং দোষ সংপৃক্ত, তখন তাহার কল্পিত জিনিষ যে সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ হইবে, সেই আশা কোথায়? ইহার উদাহরণে অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিরাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে ঐ বাদীরা কল্পনার মহিমায় নির্দ্দোষ বলিয়া জানেন, কিন্তু কোন প্রকারেও তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়ালুভাব প্রভৃতির পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারা যায় না। সর্ব্বব্যাপিত্ব ও ব্যক্তিবিশেষত্বেরও এইরূপ দশা—অর্থাৎ নিরাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ইহা বলিলে পরস্পর বিশেষণের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ অল্পব্যাপী নিষ্ঠুর এবং অন্যায়কারী বুঝিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে আদর্শের দোষকে বাদ দিয়া গুণ গ্রহণ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। প্রত্যক্ষের জগত ছাড়িয়া কল্পনার জগতে যাও, অথবা আকাশের উপরে অদ্ভুত নগর প্রস্তুত কর, কোন প্রকারে নির্দ্দোষ বস্তু ধরিয়া উঠিতে পারিবে না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, একটা অদ্ভুত জিনিষ খাড়া করিয়া তুলিবে। এক্ষণে ইহা প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না যে, কল্পনার জগতেও নিরবচ্ছিন্ন নির্দ্দোষ বস্তু অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। আর এইরূপ সমস্যায় প্রত্যক্ষ জগতকে ছাড়িয়া দেওয়া কেবল উত্তেজনার প্রাবল্যেই হইতে পারে। অধিকন্তু ইহা কোন প্রকারে বিবেকের অনুমোদিত হইবার নহে। নির্দ্দোষ বস্তুকে মন ধরিয়া উঠিতে

পারে না বলিয়াই উপনিষদে "যন্মনসানমনুতে" উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাহাকে অনুসন্ধান করিতে মানব কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেই দোষসম্পর্কশূন্য বস্তু সে নিজেই বটে। সমাধিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু অন্তর্মুখ হইয়া বিচারে তন্ময় হইতে পারিলে ইহার আভাস অনেকেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুষুপ্তি অবস্থার বিষয়টা চিন্তা করিলে ইহা কি বুঝা যায় না যে, ঐ অবস্থাতে কোন প্রকার দোষ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না? যদ্যপি ঐ অবস্থাতে দোষের ন্যায় গুণও তাঁহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না, তথাপি তিনি স্বপ্রকাশ থাকেন বলিয়া ইহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। আর ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াই ঘোষণা করে "সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। যদি তিনি স্বয়ং প্রকাশ না হইতেন, তবে অবশ্য নির্গুণত্বটা প্রতিকূল হইয়া পড়িত। পক্ষান্তরে আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে মন স্পর্শ করিতে পারে না; কেবল তাঁহার আভাস দেয়।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, অজ্ঞানী মহলে যে নির্দ্দোষ বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এটা তাহাদের অহার্য্য জ্ঞান প্রসূত ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যখন শাস্ত্র ও যুক্তি আত্মাকেই নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, তখন তাহাদের ঐরূপ অস্বরূপ ভাবের মাধুরী লইয়া কালহরণ করা কি ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? মানুষ ভ্রান্তিপ্রণোদিত হইয়া আপনার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতেও চেষ্টা করে না। তাহারা স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবীকে পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকা তটিনীতে জল অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে যে তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আপনা হইতে অতিরিক্ত আদর্শ অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কেননা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যে, দোষসম্পর্কশূন্য ও স্বয়ং প্রকাশ, ইহা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীরাই অনুভব করিতে পারেন। আর যাহারা এই তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কেন ঐরূপ আদর্শ অন্বেষণে ব্রতী হইবেন? কি প্রকারেই বা তাঁহারা রাম শ্যামের কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যক্ষ বস্তুর পরিহারপূর্ব্বক কল্পনার কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তিবিশেষের জন্য পাগল হইয়া উঠিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানীর আদর্শ তাঁহার নিজ স্বরূপ—অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের আদর্শ। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ এই আদর্শকে ধরিতে পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত সে অজ্ঞানের হস্তক্রীড়নকই থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে শান্তি ও অনঘ আনন্দের ছবি দেখিতে পায় না। ইহাতে একমাত্র জ্ঞানীই অধিকারী। ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

শুরো যে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহে—(কাব্য)। শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা।

ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি কাব্য। কাব্যে যাহা যাহা থাকা উচিত, ইহাতে প্রায় তাহার অভাব নাই। অমিত্রাক্ষর হইলেও শব্দলালিত্যে কাব্যখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন ভাবুক কবি, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আমরা আরও দুই একখানি গ্রন্থে পাইয়াছি। গ্রন্থকার ইহাতে যে কয়টি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ফুটিয়াছে ভাল। তবে করুণরসাত্মক কাব্যে যেরূপ প্রস্ফুটন সম্ভব, সেইরূপই ফুটিয়াছে। "কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।" সুতরাং কাব্যে সম্পূর্ণতা লাভ অল্প কবির অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা এই কাব্যখানি পাঠে অপ্রীত হই নাই। পুস্তকখানিতে শিখিবার কথাও আছে।

বিজলী বা নারীভাগ্য—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীস্থ এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা বিজলী বা কাঞ্চনবালা পিতামাতার অঙ্কচ্যুত হইয়া রাজপুতানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর রাজ্যের কোন এক মন্দির মধ্যে ত্রয়োদশ বৎসরকাল অবস্থান করেন। তথায় হেমচন্দ্র নামক জনৈক যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়, সাক্ষাতে আনুরক্তি জন্মে। পরে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মন্দির-পুরোহিতের কুচক্রে তাঁহাকে বিতাড়িতা ও দস্যুহস্তে পতিতা হইতে হয়। ইহার পর তিনি সন্ন্যাসিবেশী জনৈক ভৈরবাচারীর আশ্রয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত মিলিতা হন, এবং স্বামিসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই এই উপাখ্যানের মূল আখ্যায়িকা। ইহাতে যে কয়টি স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইন্দুমুখীর চরিত্রই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আর পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে ললিত শীর্ষস্থানীয়। এই দুইটী চরিত্রের উৎকর্ষেই গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ভাল, ভাব ভাল, তবে একেবারেই যে দোষ কিছুই নাই, তাহা নহে। কিন্তু দোষ কোথায় নাই? চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, কমলে কণ্টক আছে; তথাপি চন্দ্র, কুসুম, কমল কাহার নিকট আদরণীয় নহে? আমরাও এই চিরানুগত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থের দোষ ভাগ সত্ত্বেও ইহাকে আদর করিতে বিরত হইলাম না।

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মাথায় তুলিয়া দিল সুবর্ণের চৌতলা।
ছত্রিশ আতর নিল বাঁধা বীরবালা॥
আশি মণের ভর ফলা বিশাই গঠন।
জয়-খড়্গ হেতার লইল তপোধন॥
এইরূপে বীর সব করিল সাজনি।
রাবণ জিনিতে যেন রামের উঠানি॥
আজ্ঞা পেয়ে বারাল ঘোড়ার করে সাজ।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুন ধর্ম্মরাজ॥
ঘোড়া সাজাইতে যদি কহিল রাজন্।
বাজী শালে বারাল দিলেক দরশন॥
ত্বরিতে তুরঙ্গ সাজায় স্মরিয়া শ্রীরাম।
বদনে দিলেক তুলে লোহার লাগাম॥
আগাড়ি পাছাড়ি দিয়া বাঁধিল যতনে।
আচ্ছাদিল বসন ঘোড়ার বিলোচনে॥
অঙ্গের মার্জ্জনা করে সুবর্ণের খড়রায়।
দুই হেরি সোণার নূপুর দিল পায়॥
সুরঙ্গ সোণার জিন বসাইল এঁটে।
জেরবন্দ মুগীর সোণালি দুমচিটে॥
গালবন্ধ বড় শিকল কড়ালি খেঁচনি।
ঝলমল ঘাগর ঊর্ম্মাল রণরণি॥
আট খোপ দুপাশে সোণার ঝলমল।
পেশবন্দ পাথর পুষ্তঙ্গ জলাজল॥
ঝুরি ঝাঁপা স্কন্ধে শোভে লোমের বেণানি
তায় বেড়া মণি মুক্তা প্রবাল গাঁথুনি॥
শিরে দিল গজকা চামর শিখি পাখে।
বদনে সোণার পাটা বিস্বকি ঝলকে॥
কপালে পদক সাজে অরুণের ছটা।
গলা বেড়া জিজির সোণার জয় ঘণ্টা॥
চলে যেতে চঞ্চল চরণে দিয়া লাল।
ঘোড়া লয়ে লাউসেনে যোগায় বারাল॥
ঘোড়া দেখে রাউৎ হল আনন্দ অপার।
আরোহণ ঘোড়ায় ভাবিয়া করতার॥
চড়ি পিঠে গোটা তিন ঝাড়িলেন কোড়া।
এরাক কেঁদে আকাশে উঠিতে চায় ঘোড়া
ঘোড়া বলে লাউসেন তেজে নই কমি।
থুড়ি লাফে সাগর লঙ্ঘিতে পারি আমি॥
পর্ব্বত করিতে গুঁড়া পারি পদাঘাতে।
সম্মুখ সংগ্রাম হলে ধৈর্য্য নাই পথে॥
সমর করিয়া জয় তবে খাই দানা।
সেন বলে এবার কাঁড়ুরে যাবেক জানা॥
বায়ু বেগে পার হল কালিনীর জল।
পাছু গোড়াইল তখন দলুই সকল॥
কালুবীর আগে ধায় বাঁশে দিয়া চড়া।
ঢিগ ঢিগ টমক নিশান বাজে কাড়া॥
পথে ধায় দলুই সব সাক্ষাৎ শমন।
কর্ব্বুর নাশিতে যেন রামের গমন॥
মাথার উপর তখন উড়ে শঙ্খচিল।
দেখাদেখি পার হল পদুমার বিল॥
কুতঃপুর এড়াইয়া চলে বেগবানে।
জানাবাজ বিষ্ণুপুর রাখিল ডাহিনে॥
ঘসিংঘ,টা রাঙ্গামেটা রাখিয়া ত্বরিত।
উচালন দীঘির পাড়ে হল উপনীত॥
আমিলা মোগল মারি সরাণে পয়ান।
দামোদর পার হয়ে পেল বর্দ্ধমান॥
তারাদীঘি গোলাহাট বামেতে রাখিল।
ভৈরবী গঙ্গার জল লায়ে পার হল॥
উপনীত হল সেন গৌড় ভুবনে।
রায় গৌড়েশ্বর তখন আছিল দিয়ানে॥
দরবারে বসেছে যেন দেবসভাবাসী।
মহুরী সকল বসে হাতে পত্র মসী॥
রায়ৎ মণ্ডল যত সীকদার ওদ্দার।
নবলক্ষ সেনাপতি বেষ্টিত দরবার॥
রাজার মাথায় উড়ে নবদণ্ড ছাতা।
ব্রাহ্মণ পড়েন কাছে পুরাণোক্ত কথা॥

মন্ত্রী মহামদ বসে রাজার দক্ষিণে।
নিরবধি খলতা বিরোধ যার মনে॥
কালুবীর আদি তের দলুই সহিত।
হেন বেলা লাউসেন দরবারে উপনীত॥
সহিস ধরিল তখন ঘোড়ার লাগাম।
লাউসেন নামিয়া করে রাজাকে প্রণাম॥
কোল দিয়া নরপতি বসাল আসনে।
বাড়ীর বারতা রাজা জিজ্ঞাসিল সেনে॥
নিরবধি তোমার মঙ্গল আমি চাই।
কেমনে আছেন কহ কর্ণসেন ভাই॥
কেমন আছেন রঞ্জা জননী তোমার।
লাউসেন বলে মেসো কুশল সবার॥
সকল আনন্দ হে তোমার প্রসাদাৎ।
পরোয়ানা গেছিল অতেব প্রণাম সাক্ষাৎ॥
মনে করে পাত্র সেনের বুকে নাহি ডর।
নির্ভয় বসিল রাজার আসন উপর॥
বাড়িল রিপুর বল কর্ম্ম হল তেড়ি।
কেমন করে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি॥
মামা বলে মোরে বেটা না করে সম্ভাষ।
এইবার কাঁঙুরে করিব সর্ব্বনাশ॥
পিপিড়া পালক বাঁধে মরণ নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥
লাউসেনে আসনে বসাল গৌড়পতি।
রাজার মাননা বড় লাউসেন প্রতি॥
রাজা বলে মহামদ শুন মন দিয়ে।
কাঁঙুর উপরে সাজ সেনাগণ লয়ে॥
কর্পূর ধল কাঁঙুরে খাজনা করে ভূট।
অবিলম্বে সাজাও তুরঙ্গ হাতী উট॥
কামতা করিব জয় নব লক্ষ দলে।
করযোড় হয়ে তখন মহামদ বলে॥
পাত্র বলে শুন রাজা মোর নিবেদন।
তুমি কেন সেজে যাবে কাঁঙুর ভুবন॥
অবধান কর ওহে নৃপ চূড়ামণি।
কামরূপা কাঁঙুরেতে বিরাজে আপনি॥
কর্পূর ধলের বেটী কলিঙ্গা রাউতি।
রণ করে তার সঙ্গে কাহার শকতি॥
যদিস্যাৎ ধেয়ে যায় পর দল সেনা।
নৃপতির সঙ্গেতে ভবানী দেয় হানা॥
ধর্ম্মের সেবক সেন সর্ব্বলোকে কয়।
লাউসেন কাঁঙুর করিয়া দেক্ জয়॥
কহিতে উচিত কথা ঠক হই আমি।
কোন কর্ম্ম করে খান লাখ টাকার জমি॥
যদি সেনের পক্ষবল শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর।
তবে সে জানিব বটে জিনিলে কাঁঙুর॥
এত শুনি গৌড়পতি সেন পানে চান।
দেখিয়া সেনের রূপ আকুল পরাণ॥
রঞ্জাবতী পুত্র পেলে শালে দিয়া ভর।
অনেক সাধের এই লাউসেন কোঙর॥
অস্ত্র ধরে কালিকা কাঁঙুরে রণ করে।
কেমনে পাঠাব আমি প্রলয় সমরে॥
গৌড়েশ্বর কহেন সেনের মুখ হেরি।
পারিবে জিনিতে গড় বল দড় করি॥
সেন বলে মেসো হে ভাবনা কর কি।
আজ্ঞা হোক্ যমের উপরে হানা দি॥
কবজ করিয়া দিব রায় কর্পূর ধলে।
যদি মন আছে মোর ধর্ম্ম-পদতলে॥
এ বোল শুনিয়া রাজার হরষিত মন।
লাউসেনের হাতে পান দিলেন তখন॥
পাত্র বলে তুমি রাজা ইন্দ্র সমতুল।
তোমার সমান কার আছে জাতিকুল॥
বুঝিলাম এবে তুমি হইলে অজ্ঞান।
কোন্ কার্য্যে দিলে সেনের হাতে পান॥
এত বলে পান কেড়ে লইল পাতর।
লাউসেন দুঃখিত হল দরবার ভিতর॥
কালুবীর তখন পাত্রের পানে চায়।
দুই আঁখি হল যেন জবাফুল প্রায়॥
লাউসেনের হাত হোতে পান কেড়ে লেয়
সর্ব্বকাল এই বেটা সেনে দুঃখ দেয়।
বাম হাতে মুড়িয়া গোঁফেতে দেয় পাক।
লোচন ঘুরায় যেন কুমারের চাক॥
শিঞ্জিনে টঙ্কার দিয়ে উঠে বীরবর।
মনে করে বেটাকে বিঁধিব এক শর॥

টঙ্কারের নিনাদে পাতালে কাঁপে ফণী।
ঘন ঘন গগনে উঠিয়া গেল ধ্বনি॥
এইখানে করিব আজি কাঁঙুরের রণ।
এত বলে কালুবীর জুড়িল পাটন॥
নব লক্ষ সেনা দেখে ভাবিল তরাস।
মহামদ বলে রাজা হল সর্ব্বনাশ॥
পান দেও মহারাজ লাউসেনের হাতে।
কুকর্ম্ম করেছি আমি কালুর সাক্ষাতে॥
পুনরপি পান দিল রায় গৌড়েশ্বর।
ধনুক রাখিল তবে কালুসিংহবর॥
তের ডোম সঙ্গে সেন হইল বিদায়।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাদ্যের পায়॥

লঘু ত্রিপদী।

কাঁঙুর জিনিতে, রাজার সাক্ষাতে,
বিদায় হইয়া যায়।
ঘোড়ার উপর, লাউসেন বীর,
সঙ্গে তের ডোম ধায়॥
ডাকে হান হান, ঠমক নিশান,
বাজে দড়মসা সানি।
দেখি লাগে শঙ্কা, জিনিবারে লঙ্কা,
চলে যেন রঘুমণি॥
বেগবানে ধায়, রামপুর প্রায়,
গৌড় পাছে রাখে দুর।
চলে শীঘ্র হয়ে, বামেতে রাখিয়ে,
সারদা বিমলাপুর॥
বিজয়া বিমলা, বাটী রেখে গেলা,
রসপুর সরাণ পাড়া।
রাজভাটী পেল, সমুখে দেখিল,
জঙ্গল খড়ি খাগড়া॥
ব্যাঘ্র ফিরে কত, গণ্ডা সাত শত,
সেন স্মরে নিরাকারে।
দুর্গম বিপিনে, চলে রাত্রি দিনে,
শঙ্কা কেহ নাহি করে॥
ধন পোতা রেখে, মুণ্ডমালা দেখে,
চলিয়াছে সব বীর।
না করে বিশ্রাম, পাশে কাটা গ্রাম,
পেলে গণ্ডকীর তীর॥
নহে বহুদুর, সমুখে কাঁঙুর,
অপরূপ দেখে তাতে।
কামরূপা বরে, গণ্ডকীর নীরে,
বান আসে আচম্বিতে॥
সর্ব্বলোক তাতে, কাঁঙুর যাইতে,
পরে হয়ে যেত তড়ে।
দেখে পরদল, গণ্ডকীর জল,
আকাশে পাতালে বাড়ে॥
সঙ্গে তের ডোম, যেন কাল যম,
সেন কহে নদী ঘাটে।
রক্তবর্ণ পয়, দেখে লাগে ভয়,
অনল উথলে উঠে॥
ভাসে খালি জলী, কর্ণে লাগে তালি,
বচন না যায় শুনা।
শব্দ হান হান, পর্ব্বত সমান,
ঢেউয়ের উপরে ফেনা॥
পেয়ে মহা ভয়, লাউসেন কয়,
শুন কালু সিংহবল।
জিনিতে কাঁঙুর, রাজা দিল ভার,
বড় দেখি অমঙ্গল॥
কহে কালু বীর, জোয়ারের নীর,
এই ঘাটে দেহ থানা।
মরিলে জোয়ার, গণ্ডকীর পার,
কাঁঙুরেতে দিব হানা॥
পড়িল কানাত, ময়নার নাথ,
বসে সেন গুণধাম।
সমুদ্রের ধারে, লঙ্কা জিনিবারে,
যেন রহে রঘুরাম॥
ধর্ম্মের চরণে, রামচন্দ্র ভণে,
চামটে যাহার বাটী।
কর অবধান, সৌরীর সন্তান,
গয়ঘড় বন্দী ঘাটী॥
গণ্ডকীর তীরেতে খাটায়ে তাম্বু ঘর।
এইরূপে রহিল যতেক বীরবর॥

লাউসেন বলে শুন কালুসিংহ বীর।
কেন শুকাইল নাহি গণ্ডকীর নীর॥
না মরিল গণ্ডকী দেখিয়া লাগে ভয়।
হেন বুঝি ভাইরে জোয়ার পারা নয়॥
কালুসিংহ বলে শুন লাউসেন রায়।
জল যেন আগুন কেমনে পারা যায়॥
প্রায় বুঝি আছে পারা ঈশ্বরীর বর।
কতবার হেরে গেছে গৌড়ের পাতর॥
যদি জল শুকান ঠাকুর করতার।
তবে সে কাঁঙুর জিনি গণ্ডকীর পার॥
কামরূপা ঈশ্বরীর বর আছে রাজা।
এত শুনি লাউসেন করে ধর্ম্ম পূজা॥
লাউসেন একমনে পূজেন ঠাকুর।
নানা ফুল ধূপ দীপ আমান্ন প্রচুর॥
আসন শোধন আদি করিয়া নিরাস।
পঞ্চ দেব ক্রমশঃ পূজিল ধর্ম্মদাস॥
পরাৎপর দেবতা পূজিয়া তারপর।
স্তব করে লাউসেন রঞ্জার কোঙার॥
নম নম নম ধর্ম্ম নম নিরাকার।
বিপদ্ সাগরে ডাকে সেবক তোমার॥
শূন্য দেব শূন্য মূর্ত্তি শূন্যেতে বসতি।
পরম পুরুষ ক্ষণে ক্ষণেতে প্রকৃতি॥
আগম বুঝিতে নাহি দেখি তব পর।
ত্রিগুণের ধাম তুমি ব্রহ্মা হরি হর॥
চারি যুগ আপনি থাকহ শূন্য বাসে।
হরি হর অজ উমা সেবেন উদ্দেশে॥
কাঁঙুর জিনিতে মন হইল চঞ্চল।
পার হোতে না পারি প্রভু গণ্ডকীর জল
এত স্তব কৈল যদি রঞ্জার নন্দন।
হনুমান্ বীরকে পাঠাল নিরঞ্জন॥
ব্রাহ্মণের বেশে হনু চলিলা সত্বরে।
লাউসেন যেখানে ধর্ম্মের পূজা করে॥
লাউসেনে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসে সমাচার।
গণ্ডকীর ঘাটে তুমি পূজা কর কার॥
কহ দেখি নাম কিবা কোন্ দেশে ঘর।
দ্বিজের বচনে রাজা যুড়ে দুই কর॥
লাউসেন নাম বাড়ী দক্ষিণ ময়না।
কাঁঙুর জিনিব বলে মনের বাসনা॥
গণ্ডকী হইয়া পার জিনিব কাঁঙুর।
একারণে ধর্ম্মপূজা শুনহে ঠাকুর॥
এমন বচন শুনি দ্বিজবর কয়।
কামরূপা থাকিতে কাঁঙুর নাহি জয়॥
যদি আনিবারে পার লাউসেন বালা।
সমুদ্র কাটারি আর কর জপ্য মালা॥
সগর রাজার আন সমুদ্র কাটারি।
তবে শুকাইবে রাজা গণ্ডকীর বারি॥
বলে যাই সন্ধান বিস্মৃতি হয় পাছে।
গৌড়েশ্বর রাজার মায়ের ঠাঁই আছে॥
ব্রহ্মার হাতের মালা যদি দেন রাণী।
তবে ছেড়ে কামরূপা যাবেন আপনি॥
কহিলাম বিশেষ কথা শুন যুবরাজ।
দুই দ্রব্য পাইলে তোমার হয় কাজ॥
লাউসেন কহেন তখন দ্বিজবরে।
দেবতার দ্রব্য কেন মানুষের ঘরে॥
কেমনে পাইল রাণী কহ অবান্তর।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা অবধান কর॥
ধর্ম্মপাল রাজা ছিল গৌড় নিবাসী।
বল্লভা নামেতে রাণী পরম রূপসী॥
নবীন যৌবন তাহে রাজার অঙ্গনা।
শিশুকাল হতে রাণীর দেবী উপাসনা॥
অতিথি সেবায় রাজা রত সর্ব্বকাল।
একদিন শিকারেতে যান ধর্ম্মপাল॥
বল্লভা রাণীর কাছে কহিল রাজন্।
সাবধানে করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
অতিথি বিমুখ যদি যায় মোর ঘরে।
নিশ্চয় কহিনু বনবাস দিব তোরে॥
এত বলে শিকার করিতে রাজা যায়।
নৃপতির সঙ্গে সেনা দশ মুখে ধায়॥
মৃগ বধিবারে যেন গেলেন শ্রীরাম।
বল্লভা রাণীকে হেথা বিধি হল বাম॥
বিধি বাম যখন মলিন হয় দশা।
সীমন্তিনীগণ সঙ্গে রাণী খেলে পাশা॥

পাশা খেলিবারে রাণী ভুলিল তখন।
অতিথিব সেবা বলে না করিল মন॥
বন্দিয়া ময়ূরভট্ট পদ শতদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
ধর্ম্মপাল রাজা এল করিয়া শিকার।
অতিথি বিমুখ গেছে পেল সমাচার॥
রোষযুক্ত নরপতি কাঁপে কলেবর।
কৃতাভিষেকাকে রাজা ভর্ৎসিল বিস্তর॥
না হল অতিথি সেবা বড় মনে দুখ।
রাজা বলে রাণী তোর না দেখিব মুখ॥
বল্লভা রাণীকে হল বিধাতা নৈরাশ।
ধর্ম্মপাল ভূপতি দিলেন বনবাস॥
রাজা যদি রাণীকে করিল বনচারী।
রহিল কাননে যেন জানকীসুন্দরী॥
দাসী সঙ্গে রাজরাণী রহিল কাননে।
দুর্গার চরণ পূজা করে এক মনে॥
এক মনে ঈশ্বরী পূজিল রাজরাণী।
বল্লভাকে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণী॥
বল্লভা ধরিল তখন চরণ দুখানি।
জগৎ জীবন তুমি অনন্তরূপিণী॥
যশোদা জঠরে যবে গোকুলে জন্মিলে।
পার কৈলে যদুনাথে যমুনা সলিলে॥
তোমা পূজে কৃষ্ণপতি পেলে গোপীগণে।
তোমা পূজে রঘুনাথ বধিল রাবণে॥
অসুর বধিয়া সৃষ্টি রাখিলে আপনি।
তোমা ছাড়া ভারত ভাগবত নাহি শুনি॥
দেখিয়া রাণীর ভক্তি ভগবতী কয়।
বর মেগে লহগো বিলম্ব নাহি সয়॥
অধোমুখ হয়ে কাঁদে বল্লভা সুন্দরী।
নেতের আঁচলে মুখ মুছান ঈশ্বরী।
চরণে ধরিয়ে রাণী গদগদভাষে।
এই বর দেহ যেন রাজা ভালবাসে॥
সহজে অবলা জাতি অশেষ জঞ্জাল।
বনবাসে এমনে থাকিব কতকাল॥
ভাল কিসে বাসেন আমার প্রাণপতি।
হের ধর ঔষধ কহেন ভগবতী॥
শিকার করিতে কালি আসিবে রাজন্।
অন্নেতে ঔষধ দিবে করিয়ে যতন॥
বিধাতা শঙ্কর যদি সেই অন্ন খান।
তোর কাছে আসিবে মদন পঞ্চবাণ॥
তবে যদিস্যাৎ অন্ন নাহি খায় ভূপ।
বশ হবে দেখিলে তোমার নিজরূপ॥
এত বলে ভগবতী হইলা বিদায়।
শিকার করিতে সাজে ধর্ম্মপাল রায়॥
রাজা যাবেন শিকার পড়িল দড়বড়ি।
ভারে ভারে বোহুল্যা লইল জাল দড়ি॥
রণভেরী ঘোড়া শিঙ্গা ভোরঙ্গ কাঁশর।
দড় মসা বাজে দামা ঢাকের রগড়॥
পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চাপিল ধর্ম্মরাজ।
আগে পিছে ধায় ধানুকী ফরিয়াজ॥
যেই বনে বল্লভা আছেন বনবাসে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগয়া উদ্দেশে॥
মুদী ঘরে বাঁধা দিয়ে সুবর্ণ কঙ্কণ।
দাসী সব করিল পাকের আয়োজন॥
জাল রেখে শিকার করিল মহীনাথ।
গোটা তিন শার্দ্দূল হরিণ গোটা সাত॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগন উপর।
বল্লভার কুটীর দেখিল নৃপবর॥
কাননে বেড়ায় রাজা তৃষ্ণায় বিকল।
বল্লভা রাণীর ঠাঁই খেতে গেল জল॥
সমাদরে দাসী লয়ে যোগাল আসন।
রাজাকে দেখিয়া রাণী হরষিত মন॥
কোটরাতে খণ্ড চিনি গঙ্গাজল লাড়ু।
সুশীতল জল দিল পুরে হেম গাড়ু॥
তরুতলে জল খেয়ে বসিল রাজন্।
বল্লভা সুন্দরী গেল করিতে সাজন॥
ধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইয়া চিত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নূতন সঙ্গীত॥

ত্রিপদী ছন্দ।

বশ হবে নৃপমণি, আনন্দিত রাজরাণী
ঔষধ করিতে গেল মন।

রাজা বসে তরুতলে, বল্লভা উননি জ্বালে,
অপরূপ করিতে রন্ধন ॥
ঘন কুচি করে রাখে, পুয়ালি নটে শাকে,
বড় বড়ি কাঁটালের মজি।
ফুল বড়ি তায় কিছু, গোটা কত সারি কচু,
বেসার লবণ চড়ায় বুঝি ॥
ঝাল দিয়া জাল ভাটি, পিঠালির কালে কাঠি,
ঘৃত দিয়া সাঁতুলে সুন্দরী।
বড়িতে বার্ত্তাকু সিম, সাঁতলনে দিয়া নিম,
সুকুতা রাঁধিল তদুপরি ॥
ভোজন করিবে ভূপ, হিঙ্গ ঝালে রাঁধে সুপ,
আদা ঝালে মানের বেসার।
দুগ্ধ গুড়ে ফুলবড়ি, ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি,
দুগ্ধ লাউ মরিচ সুচার ॥
বার্ত্তাকু করলা কলা, বেথশাক শশা মূলা,
ভাজিল নারেল পানিফল।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করি, অবশেষে রাঁধে ক্ষীরি,
দধি গুড়ে রাঁধিল অম্বল ॥
অন্ন রাঁধি কুতুহলে, বাড়িল স্বর্ণের থালে,
ঔষধের গুঁড়া দিয়া তাতে।
অপরূপ করে স্থল, রাখিয়া আসন জল,
দাসী গেল রাজাকে ডাকিতে ॥
মুখে মৃদু মন্দ হাসি, যোড়হাতে কয় দাসী
ভোজনেতে গা তোল রাজন্।
দাসীকে বলিল রায়, সেনাগণ কষ্ট পায়,
না পারিনু করিতে ভোজন ॥
জল খেতে নাহি স্থান, সেনা নাহি পায় প্রাণ,
এক দণ্ড কার্য্য নাহি রয়ে।
প্রাতঃকালেতে কালি, তোমারে বিশেষ বলি,
বল্লভাকে ঘরে যাও লয়ে ॥
এত বলে নরপতি, লয়ে সেনা ঘোড়া হাতী,
অবিলম্বে বাড়ীতে গমন।
ধর্ম্ম পদারবিন্দে, ভাবিয়ে ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন ॥
বাড়ী গেল ভূপতি কহিল গিয়া দাসী।
কাঁদিতে লাগিল তখন বল্লভা রূপসী ॥
মোরে না বলিয়া ঘর গেলা মহীপাল।
বড় সাধ ছিল রক্ষা হবে ঋতুকাল।
প্রাণ নাহি রয় মোর মহারাজ বিনু।
হরিসুত বাণেতে জর্জ্জর হল তনু ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন লয়ে স্বর্ণ থালে।
ভাসাইয়া দিল রাণী সমুদ্রের জলে ॥
ঐরূপে জলেতে ভাসিল স্বর্ণ থাল।
দেখিলেন তখন সাগর মহীপাল ॥
সাগর বলেন অন্ন লক্ষ্মীর রন্ধন।
সমাদরে অন্ন থাল করিল ভোজন ॥
ঔষধের গুঁড় ছিল অন্নের সহিত।
ভোজন করিতে হল মদনে পীড়িত ॥
ঋতু স্নান করে রাণী চলিল সত্বর।
ধর্ম্মপালের রূপ ধরে ধাইল সাগর ॥
রাজহংস গমনে শুকায়ে চলে কেশ।
পয়োধর ভারেতে হেলয়ে মধ্যদেশ ॥
উর্ব্বশী সমান রূপ বল্লভাকে দেখে।
অনিরুদ্ধ চলে যেন হরিতে ঊষাকে ॥
কুন্তীকে হরিতে যেন ধাইল ভাস্কর।
সেই মত পাছু তাড়া দিয়াছে সাগর ॥
ধর্ম্মপাল রাজা এল দাসী তখন হাসে।
কাতরে সাগর রাজা কুটীর প্রবেশে ॥
বলাৎকার রতি রস করিল রাজন্।
মত্ত হাতী যেমন প্রবেশে পদ্মবন ॥
মকরন্দ পানেতে মাতিল যেন অলি।
রতিশ্রমে রাণীর বদন হল কালি ॥
দেবতার তেজেতে সুন্দরী পেল ভয়।
রাণী বলে এজনা আমার পতি নয় ॥
তৃতীয় প্রহর গেল বল্লভা কাতর।
সাগরের ঔরসে জন্মিল গৌড়েশ্বর ॥
রাণী বলে কেবা তুমি পরিচয় দাও।
কদাচিত আমার পরাণনাথ নও ॥
কোন্ জনা বট তুমি কহিবে আমারে।
পতিব্রতা নষ্ট হল শাঁপিব তোমারে ॥
মোর দোষ নাহি যে সাগর রাজা বলে।
ঔষধের গুঁড়া কেন অন্নে দিয়াছিলে ॥

সমুদ্রের রাজা আমি নামেতে সগর।
বেটা হলে নাম থুয়া রায় গৌড়েশ্বর ॥
এমন বচন শুনি রাণী মনে ভাবে।
দ্রব্য কিছু আমাকে স্মরণ দিয়া যাবে ॥
তখন মাগিয়া নিল বল্লভা সুন্দরী।
কর জাপ্য মালা আর সমুদ্র কাটারি ॥
দাসী সঙ্গে রাজা রাণী গেলা নিজ ঘরে।
দশমাস দশদিন গেল তার পরে ॥
পুরোহিত নাম থুল গৌড়ের ঠাকুর।
রাজ্য করে ধর্ম্মপাল গেলা স্বর্গপুর ॥
লাউসেনে হনুমান্ কহিল সকল।
সেই দ্রব্য আন গিয়া শুকাইব জল ॥
উদ্দেশে কহিয়া হনু হইলা বিদায়।
গৌড়পুরী গেলা তখন লাউসেন রায় ॥
রাজার মহল বাড়ি সেনে হারানাই।
মফস্বল পথে গেলা বল্লভার ঠাঁই ॥
আই বলে প্রণাম করিল তপোধন।
বল্লভা বলেন নাতি কি কার্য্যে গমন ॥
লাউসেন বলে আই না কহিলে নয়।
যৌবন কালের কথা মনে কিছু হয় ॥
তোমার কৃপায় যে কাঙুর জয় করি।
করজাপ্য মালা দেও সমুদ্র কাটারি ॥
সেনের বচনে বুড়ি করে হেঁট মাথা।
কেমনে জানিল সেন সেকালের কথা ॥
লাউসেনে জানাল কেবল মায়াধর।
দুই দ্রব্য বারি করে দিল ত্বরাপর ॥
মিনতি করিয়া রাণী বলেন লাউসেনে।
এই কর্ম্ম করো যেন কেহ নাহি জানে ॥
আই নাতির রস কথা ইথে পাপ নাই।
আর আমি একথা কহিব কার ঠাঁই ॥
এত বলে লাউসেন করিল গমন।
পুনর্ব্বার গণ্ডকীতে দিল দরশন ॥
কাঙুর লইয়া সবে শুন অতঃপর।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান মল্লভূমে ঘর ॥
লাউসেন ছুঁয়াইল সমুদ্র কাটারি।
বাণ গেল তড় হল গণ্ডকীর বারি ॥
এক হাঁটু জলেতে ঘোড়ায় হল পার।
সেই হতে ঘোড়াঘাট নাম হল তার ॥
তের ডোম পার হল গণ্ডকীর নীর।
লঙ্কাপুরী যেমন প্রবেশে রঘুবীর ॥
লাউসেন বলে শুন কালু সিংহ ভাই।
যুক্তি বল কেমনে কাঙুর জিনে যাই ॥
কামরূপা থাকিতে কাঙুরে নাই ত্রাণ।
কালুবীর বলে রাজা কর অবধান ॥
জটাধারী দুজনাতে হইয়া সন্ন্যাসী।
কেমন কাঙুর গড় চল দেখে আসি ॥
সহর বাজার কোথা সংগ্রামের পথ।
কামরূপার চরণে করিব দণ্ডবৎ ॥
সমুদ্র লঙ্ঘিল যবে পবনতনয়।
উগ্রচণ্ডা ত্যাগ দিতে হল লঙ্কা জয় ॥
ভক্তের অধীন দুর্গা ভকতবৎসলা।
সেই মত ঈশ্বরী হবেন অনুকূলা ॥
এতেক শুনিয়া সেন রঞ্জার কোঙার।
যুক্তি মানি কালুবীরে প্রশংসে বিস্তর ॥
সন্ন্যাসীর বেশ তখন হল দুই জন।
মাথায় পিঙ্গল জটা বিভূতি ভূষণ ॥
অরুণ বসন সাজে কপালে তিলক।
অক্ষমালা নিল হাতে রঞ্জার বালক ॥
টাঙ্গী খাঁড়া তীর গুলি রেখে বীরবানা।
কালুবীর নিল হাতে ভাঙ্গের ঘোটনা ॥
লাউসেনের সঙ্গে চলে হইয়া নফর।
কুশাসন ব্যাঘ্রছাল স্কন্ধের উপর ॥
দলুই সব রহিলেন গড়ের বাহিরে।
গড় দ্বার পার হল ঠাকুর নফরে ॥
গড়খান চৌদিকে বেউড় বাঁশে বেড়া।
বিংশতি বাজার দেখে বিশাশয় পাড়া ॥
কামরূপার মন্দির দেখিল সদাকর।
পুষ্পের বাগান বেড়া রায়টী পাথর ॥
বেড়ের ভিতর কত জাপক সন্ন্যাসী।
তার মধ্যে কালুবীর লাউসেন তপস্বী ॥
দেখিলেন কামতা ময়নার অধিকারী।
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ কুমুদ কুমারী ॥

লোটনে ফুলের গাঁথা কপালে সিন্দুর।
অঙ্গে নানা আভরণ চরণে নপুর॥
দেবীর রূপেতে ঘর ঝলমল করে।
কালুবীর লাউসেন সম্মুখ হতে নারে॥
কর যাপ্য মালা সেন দেখাল সম্মুখ।
ভাসুর বলিয়া দেবী হল অধোমুখ॥
দেখিয়া ব্রহ্মার মালা লজ্জার কারণ।
দেউল ভাঙ্গিয়া দেবী কৈলাসে গমন॥
কৈলাসে গেলেন দেবী ছাড়িয়া কাঙুর।
গম্ভীরাতে বসিলেন ময়নার ঠাকুর॥
গড়ের বাহিরে ছিল দলুই সকল।
আনিলেন ডাক দিয়া কালু সিংহ বল॥
দুয়ারী সকল তখন না ছাড়ে দুয়ার।
পদাঘাতে কপাট ভাঙ্গিয়া হল পার।
লাউসেনের কাছে সবে উপনীত হল।
আস্তির পাথর ঘোড়া দুয়ারে বাঁধিল॥
কোমর কষিল সবে বাঁধিয়া হেতার।
কালুবীর দিল তখন ধনুকে টঙ্কার॥
দুয়ারি কহিল গিয়া কোটালের কাছে।
সমর করিতে কেবা কাঙুর এসেছে॥
কোথা হতে কেবা এল করিতে সংগ্রাম।
কপাট ভাঙ্গিয়া সবে প্রবেশিল গ্রাম॥
উভরড়ে ধাইল কোটাল এত শুনি।
সেনের দেখিয়া সেনা কহে কটু বাণী॥
কোথা থেকে এলি বেটা কোথা তোর ঘর
চুরি ডাকা দিবি পারা কাঙুর ভিতর॥
কালুবীর বলে বেটা শুন মন দিয়া।
ময়নার রাজা এল সাজন করিয়া॥
চৌদ্দসন কাউরে খাজনা হল বাকী।
এইবার কাঙুরের গড় রাখ দেখি॥
অবিলম্বে কোটাল চলিল পুনর্ব্বার।
রাজার হুজুরে গিয়া দিল সমাচার॥
সাজন করিয়া আসে রায় কর্পূর ধল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
কোটাল কহিল যদি নৃপতির পায়।
সংগ্রাম করিতে এল লাউসেন রায়॥
বচন শুনিয়া রাজা দম্ফে কাঁপায় মাটি।
সাজ সাজ দড়মসা দামায় পড়ে কাঠি॥
নানা বাদ্য বাজে সাজে নৃপসেনাগণ।
তোলপাড় করে রায় কাঁঙুর ভুবন॥
রায়বেণী গন্ধবেণী জম্বুরা ফুলাল।
ঘর্ঘরি মহরী কাড়া ফুকরে কাহাল॥
দগড় দগড়ি বেণু রুদ্র বীণা শানি।
কাঁসর করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ শুনি॥
সিন্ধুয়ান বরগো ভেরী রণভেরী কালি।
জয়ঢাকে বীর ডাকে কর্ণে লাগে তালি॥
ধূসরি মোহরি ঢাল খঞ্জরী খমক।
জগঝম্ফ বাদ্য বাজে সঘনে গমক॥
রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভোঁ ভোঁ।
শোক শিশুর উপরে দামামা ধোঁ ধোঁ॥
রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল।
মার কাট ডাক ছাড়ে রাউৎ সকল॥
যবন শোয়ার সাজে অসি চর্ম্ম হাতে।
হানা দিলে সংগ্রামে লাগাম খেঁচে দাঁতে॥
আশি হাজার খোজা সাজে বুকে লম্বা দাড়ি
মাথায় শোভিত টীয়া সোণার পাগুড়ি॥
চন্দ্রবীর সাজে তবে রাজার কোঙর।
কৃপাণ কামান গোলা গাড়ীর উপর॥
রজপুত চৌহান সিপাই সাজে ঢালা।
হানা দিলে সমরে গগনে উড়ে ধূলা॥

ক্রমশঃ

সাহিত্য-সংহিতা।

নবম খণ্ড] ১৩১৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

হিন্দুর পুনরুত্থান।

প্রথম প্রস্তাব।

মান্যবর সভাপতি এবং সভ্যমহোদয়গণ!*

অদ্য একটি গুরুতর, অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিষয় লইয়া আমি বিনীতভাবে আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম "হিন্দুর পুনরুত্থান।" মহোদয়গণ! নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই, যে হিন্দুজাতি একদা সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের সভ্য সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ভূতলে অতুল হইয়াছিলেন, যে হিন্দুজাতির কৃপাকটাক্ষ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া কত অগণ্য জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল, যে হিন্দুজাতির ধনে, ধর্ম্মোপদেশে, জ্ঞানে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশ ধনী, জ্ঞানী, সভ্য, শিক্ষিত ও ধর্ম্মতত্ত্বাভিজ্ঞ হইয়াছিল, আজি আমাদিগকে সেই প্রাচীন, পরাক্রমী এবং সনাতন ও সমুন্নত আর্য্য হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ লইয়া প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করিতে হইতেছে। যে হিন্দুজাতি সমুদয় জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল কারণ, যে হিন্দুজাতির ধনবলে, জনবলে, জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে বিশ্বমণ্ডল বলীয়ান্, সেই বীরাধিক বীর, ধার্ম্মিকাধিক ধার্ম্মিক, পণ্ডিতাধিক পণ্ডিত এবং দেবসমতুল্য হিন্দুর পুনরুন্নতির প্রসঙ্গ আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। হা হতোস্মি! কালে সকলই হয়! "হিন্দুর পুনরুত্থান" এই শব্দদ্বয় শ্রবণ মাত্রেই মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। জাগতিক কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে; যাহা কিছু সাংসারিক, তাহাই পতনোন্মুখ। হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, ধন, জন, যৌবন, সম্ভ্রম, অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতি নলিনীদলগত জলবৎ তরল। এত বড় বীর, এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী, এত বড় পুরাতন ও পরাক্রমী এবং এত বড় সমুন্নত ও সুশিক্ষিত জাতির যখন পতন হইয়াছে, তখন এই মায়াময় সংসারধামে কোন্ বিষয়টাকে নিত্য ও স্থায়ী বলা যাইতে পারে? হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে, মনোমধ্যে ঘোরতর বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনিত্য সংসারের সমুদয় বস্তুকে উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। হিন্দুর পতনের কথা ভাবিলে ইহাও বুঝিতে পারি, ইহলোকের যাহা কিছু তাহাই অনিত্য, কিন্তু সেই পরমারাধ্য পরাৎপর পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য ও শাশ্বত। তিনি কোটি কোটি যুগ পূর্ব্বেও যেমন, অদ্যও তেমনি এবং অনন্ত

* কাশীধামস্থিতা "তত্ত্বালোচনী সভা"র বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কালও তদ্বৎ; সুতরাং একমাত্র তিনিই নিত্য, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর ও মায়া-মরীচিকার সমতুল্য।

মহোদয়গণ! আমি অদ্যকার সভায় যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহার নামে দুইটি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "হিন্দু" এবং "পুনরুত্থান।" শেষোক্ত শব্দটি অর্থাৎ "পুনরুত্থান" শব্দটির অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পুনর্ব্বার উত্থান। এক বার উত্থান ও পতন না হইলে "পুনরুত্থান" শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। রাধা নাথ ভট্টাচার্য্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন—এইরূপ বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে, রাধানাথ ভট্টাচার্য্য অশ্বপৃষ্ঠে উত্থান করিয়াছিলেন, তাহার পরে ঘোড়ার পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন। উত্থান না হইলে পতন হয় না, সুতরাং হিন্দুরও একদা উত্থান হইয়াছিল ইহাই নিশ্চিত বাক্য। কিন্তু কেবল "উত্থান হইয়াছিল" বলিলেই যথেষ্ট হয় না; হিন্দুর পতনও যেমন বিস্ময়-কর, উত্থানও তেমনি কেবল বিস্ময়কর নহে, পরন্তু বিস্ময়কর হইতেও বিস্ময়কর। এমন আশ্চর্য্য উত্থান ও এমন অপূর্ব্ব পতন, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে কখন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অনেকে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রাচীন হিন্দুর কোন্ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল? পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য জাতির শাস্ত্র ও সাহিত্যে ইহার সুস্পষ্ট উত্তর লিখিত আছে। সমগ্র সংসার, প্রাচীন আর্য্য হিন্দুর অসাধারণ উন্নতির অকাট্য সাক্ষী। প্রাচীন হিন্দুজাতি যে কোন্ বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন নাই, তাহা জানি না; এমন কোন বিষয়ের কল্পনাও হয় না, যে বিষয়ে পুরাতন আর্য্য হিন্দু অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করেন নাই। কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ন্যায়, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষি, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, সংগীত, রাজনীতি, সমরনীতি, চিকিৎসা, বীরত্ব, সাহস, ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভগবৎ সেবা, চরিত্রবল, যোগ, ধ্যান, ধৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য্য, পরিব্রজন, দয়া, সহানুভূতি, বদান্যতা ক্ষমা, সত্যপরায়ণতা, স্পষ্টবাদিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য গুণে হিন্দু একদা ভূতলে অতুল ছিলেন।

হিন্দুর তুলনা হিন্দু অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী পূজন যথা জাহ্নবীর জলে॥

এইজন্য শ্রীশ্রীমৎ বিষ্ণুপুরাণ শাস্ত্রের মহানুভব মহর্ষি লিখিয়াছেন, পূর্ব্বজন্মের অপরিমিত পুণ্যবল না থাকিলে মানুষেরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না এবং ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনাবলে সিদ্ধ না হইলে পুনর্জ্জন্মে হিন্দুকুলে কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। ভবধাম হইতে অন্তর্দ্ধান হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে মহিয়সী মাদাম্ ব্লাভাটস্কি বলিয়াছিলেন Blessed be the man who calleth himself a Hindu অর্থাৎ ধন্য সেই মানব, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। মহোদয়গণ! এই জন্যই হিন্দুর হিন্দুয়ানী এত পবিত্র ধন এবং এত আদরের বস্তু। এই জন্যই হিন্দুস্থানের এত গৌরব ও এত সৌরভ। এই জন্যই প্রকৃত হিন্দু সন্তান তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রাণপণ যত্ন করেন। বাস্তবিক, ভারতভূমি যেমন পুণ্যভূমি, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করাও তেমনি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে এবং পুণ্যকুল হিন্দু কুলেই কেবল আদর্শ মানব ও আদর্শ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং এই কুলেই অসংখ্য অসংখ্য আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যদেহে দেবত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং অতঃপর যদি আর কখন আদর্শ মানব

জন্মগ্রহণ করেন—একাধারে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও সম্পূর্ণ দেবত্ব লইয়া মহাদর্শ জন্মগ্রহণ করেন—তাহা হইলে তিনি পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষের হিন্দুকুলেই জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য; সুতরাং সুপবিত্র হিন্দুকে যে কেহ হিন্দুয়ানী হইতে স্বতন্ত্র করিতে চায়, সে ব্যক্তি আমাদের দেশের, সমাজের ও জাতির পরমশত্রু, ইহা নিশ্চয়।

মহোদয়গণ! গ্রাম্য ভাষায় একটা পুরা-তন প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, লোকে বলিয়া থাকে, "যাহার গা শুদ্ধ ব্যথা, তাহার ঔষধ দিব কোথা?" অর্থাৎ যে রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক অংশ রোগগ্রস্ত এবং ব্যথায় ব্যথিত, তাহার শরীরের কোন্ অংশে ঔষধ দেওয়া হইবে আর না হইবে তাহা চিকিৎসকেরা সহজে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের অধঃপতিত হিন্দুর অবস্থা ঠিক তাই; এখনকার হিন্দু সকল বিষয়েই পতিত, সকল বিষয়েই ভাগ্য-হীন এবং সর্ব্বত্রই হীনাদপি হীন বলিয়া গণ্য। জনশ্রুতি আছে, এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী দেবীর পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদিত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছিল "হে মা পতিতপাবনী! হে মা দুঃখহারিণী! এই পৃথিবীতে আমার তুল্য আর কেহ দুঃখী নাই। আমার সকল বিষয়েই কষ্ট এবং সর্ব্ববিষয়েই অভাব; আমার অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, জলকষ্ট, চাকুরীর কষ্ট, ছাতাকষ্ট, জুতাকষ্ট, বাসভূমির কষ্ট, গামোছার অভাব, উড়ানীর অভাব, এমন কি পৈতাগাছটির অভাব পর্য্যন্ত আমি ভোগ করিয়া থাকি, অতএব হে মা! তুমি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার সর্ব্ব কষ্ট ও সর্ব্ব অভাব দূর কর।" সভ্য মহাশয়গণ! আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান হিন্দুর কষ্ট ও অভাব ঠিক এইরূপ, কিন্তু এগুলি সাংসারিক অভাব; ধর্ম্ম জগতে যাহা কিছু অভাব বলিয়া বোধ হয়, হিন্দুর সে অভাবও চূড়ান্ত পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুর পতন অত্যন্ত বিস্ময়কর ও নিতান্ত বিষাদ জনক। হিন্দু যেমন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তেমনি অতি নিম্নে পতিত হইয়া গিয়াছে। এখন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই হিন্দুর পুনরুত্থানের আর কি আশা ভরসা আছে? আশা ভরসা আছে কিনা তাহারই মীমাংসা করিবার জন্য অদ্যকার সভায় আমি উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং এই প্রসঙ্গটি প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আলোচনার যোগ্য। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, প্রাচীন ভারতের যদি কোন ঋষি, রাজা, বীর, পণ্ডিত, যোগী, মুনি অথবা অন্য শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান ভারতে আসিয়া উপ-স্থিত হন; পুরাতন ভারতের যে কোন লোক যদি আমাদের এখনকার এই ভারত-বর্ষে আসিয়া পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতে বাধ্য হইবেন, ইহাতো সে ভারত নয়! ইহাতো আমাদের সম-সাময়িক পুণ্যভূমি ভারতভূমি নয়! ইহাতো ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি, জ্ঞানভূমি, ঐশ্বর্য্যভূমি ভারতভূমি নহে! কোথায় আসিলাম! ইহা কি সেই জগন্মান্য দেবকুলবাঞ্ছিত ভারতবর্ষ? ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্মকল্পদ্রুম যুধিষ্ঠির যাহার নরপতি; ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতি যাহার বীর; কালিদাস, বাণভট্ট, বেদব্যাস, বাল্মীকি, ভারতী প্রভৃতি যাহার কবি ও লেখক; মহাভারত ও রামায়ণ যাহার কাব্য; বেদ ও বেদান্ত যাহার ধর্ম্মশাস্ত্র; চরক সুশ্রুতাদি যাহার বৈদ্যগ্রন্থ; দধীচি মুনি প্রভৃতি যে দেশে আত্মোৎসর্গের অতুল দৃষ্টান্ত; হরিশ্চন্দ্র, বলি, কর্ণ, প্রভৃতি যে দেশে দাতার দৃষ্টান্ত, ভরত মুনি যাহার সঙ্গীতাচার্য্য; কণাদ, কপিল প্রভৃতি যাহার

দার্শনিক, শতঘ্নী ও সুদর্শনচক্র যাহার অস্ত্র, হরধনু যাহার ধনু, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রান্তর যাহার যুদ্ধের মাঠ, শত অক্ষৌহিণী সেনা যাহার রক্ষক, যে দেশের কন্যাসমূহ সতীত্বে ও বীরত্বে জগতে অতুলনীয়া, ধ্রুব যে দেশে যোগী, প্রহ্লাদ যে দেশে ভক্ত, বাল্মীকি যে দেশে সাধক, কুবের যেখানকার ধনরক্ষক, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষী পণ্ডিত, পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ এবং স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে ব্রাহ্মণরূপে উপদেষ্টা, এই কি সেই পবিত্রাদপি পবিত্র স্বর্গভূমি ভারতবর্ষ? অহো হতোস্মি! কালের কি বিচিত্রা গতি! কালের কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা! এ সংসারে সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণস্থায়ী, সকলই পতনের দিকে প্রবহমান।

মহোদয়গণ! মানবশরীর যেমন দুইটি ভাগে বিভক্ত, সমাজও তেমনি দুইটি ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশরীরের এক অংশ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অধীন এবং আর এক অংশ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশীভূত। হিন্দুসমাজকে যদি মানব শরীরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে এবং বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত করা যায়। হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়। সমাজ শরীরের, ব্রাহ্মণ বর্ণ মস্তকস্বরূপ। মানুষের হাত, পা, অঙ্গুলি, কটিদেশ প্রভৃতি অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে শক্তিহীন হইলে অথবা অঙ্গুলি প্রভৃতি বিকল হইয়া গেলে তাহার মেধা বা বুদ্ধির উন্নতি পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, অথবা সে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে, সেই পরিমিত জ্ঞানের হ্রাসতাও হয় না, কিন্তু মানুষের মাথা যখন খারাপ হয়, তখন তাহাকে লোকে পাগল বলে; মাথা খারাপ হইলেই সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, উন্নতি সামর্থ্য প্রভৃতি বিকৃত হইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তখন সে ব্যক্তিকে আর কেহ বিশ্বাস করিতে বা তাহার হস্তে কোন গুরুতর কর্ম্মের ভার অর্পণ করিতে অথবা তাহার সহিত পরামর্শ করিতে, এমন কি তাহার সংসর্গে থাকিতে বা তাহাকে সম্মান করিতে, লোকে স্বীকৃত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজ শরীরে ব্রাহ্মণগণ মস্তকস্বরূপ। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু সমাজ অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণ যতদিন প্রকৃত সুবর্ণ থাকে, অর্থাৎ যতদিন বিশুদ্ধ, খাঁটি, নিখাদ সুবর্ণ বলিয়া কোন সুবর্ণ খণ্ড বিবেচিত হয়, তখন সেই সোণার সকলে আদর করে এবং সর্ব্বত্র তাহার যত্ন হয়, কিন্তু সোণাতে যতই খাদ মিশ্রিত হয়, ততই তাহার মূল্য কমে এবং ততই তাহার আদর ও যত্ন কমিয়া যায়; কেবল তাহাই নহে, তাহার ঔজ্জ্বল্যও হ্রাসতা প্রাপ্ত হয় এবং হীনপ্রভ হওয়ার জন্য ক্রমশঃ জঘন্যভাবে মলিন ও দুর্গন্ধ হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা সরল হৃদয়ে বলুন দেখি, বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণগণ খাদে ভরা মলিন সোণার অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন কিনা? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, বৃথা জাত্যভিমান পরিহারপূর্ব্বক, ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া, বুকে হাত দিয়া ব্রাহ্মণেরাই বলুন দেখি, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া "প্রকৃত ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতে পারেন? মাথা বিকৃত হইলে মানুষ পাগল হয়, সমাজের মস্তক স্বরূপ ব্রাহ্মণেরা খারাপ হইয়া গেলে সমাজও খারাপ হইয়া যাইবে, ইহাতো আশ্চর্য্যের কথা নহে। প্রকৃত কথা এই, পর্ব্বতদেহ নিঃসৃতা নির্ঝরিণীর

জল আদিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ, শীতল, সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকর ও নির্ম্মল থাকে, কিন্তু ঐ জল নির্ঝরিণী হইতে নির্গত হইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ধূলি, কর্দ্দম, আবর্জ্জনা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া মলিন হইতে মলিনতর হইয়া যায়; তখন ইহার স্বাদ, শৈত্য, স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা, স্বাস্থ্যকরতা প্রভৃতি গুণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়, অথবা একেবারে থাকে না। ব্রাহ্মণের অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শ্রেণীর অদূরদর্শী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বৃথা গর্ব্বী এবং লোভী ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, কলিকাতার কালীঘাটের কাটিগঙ্গা বা আদিগঙ্গা যতই শুখাইয়া যাউক, যতই ময়লা ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হউক, ইহার জল যতই অস্বাস্থ্যকর বা ব্যবহারানুপযুক্ত হউক, তথাপি ইহা গঙ্গা! ইহা আদিগঙ্গা! সুতরাং বরণীয় ও মাননীয় এবং পূজনীয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে তর্ক, ব্রাহ্মণে খাটে না। নিরপেক্ষভাবে এবং স্পষ্ট কথায় আমি সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, ব্রাহ্মণের এই বৃথা অহঙ্কারে, এই বৃথা জাত্যভিমানে, ব্রাহ্মণকুল আরও অসার হইয়া গিয়াছেন এবং দিনে দিনে অধিকতর উপহাসাস্পদ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এখনকার কালে এমন সহস্র সহস্র, অধিক কি লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কি নাই, যাহাদিগের দেহ, মন, মস্তিষ্ক, চরিত্র, শিক্ষা, ধর্ম্মবল, হৃদয়, আচার প্রভৃতির অবস্থা দেখিলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রণাম করিতে অস্বীকৃত হয় এবং ঘৃণার সহিত সেই ব্রাহ্মণের সংসর্গকে উপেক্ষা করিতে সম্মত হয়? খাদে ভরা সোণা যেমন যত্ন আদর ও মূল্য হারায়, তেমন তাহার ঔজ্জ্বল্যও হারাইয়া থাকে; ব্রাহ্মণের কেবল মানসিক, ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহাদের দেহের বর্ণ, বল, ঔজ্জ্বল্য, কান্তি ও সাত্ত্বিকতা এত কম হইয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে অনেক ব্রাহ্মণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশোৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমরা সন্দিহান হই। মনুষ্যজাতি চিরকালই গুণের পক্ষপাতী, ব্রাহ্মণ যতদিন বিবিধ গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন বা থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং অবশ্য থাকিবেন ইহা নিশ্চয়, কিন্তু গুণবিহীন হইয়া প্রণাম, সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবার চেষ্টা করিলে কেহ তাঁহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, পূজা প্রভৃতি হৃদয়ের জিনিষ; বল প্রকাশ করিয়া কেহ কাহাকে মানাইতে পারে না। তুমি যদি নিজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হও, লোকের মস্তক আপনা হইতেই তোমার সম্মুখে অবনত হইয়া যাইবে, কিন্তু "অহং ব্রাহ্মণ" "আমি ব্রাহ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিলে আজি কালিকার দিনে কেহ কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিবে না ও করে না, ইহা জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় নিত্য সত্য। আমি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন পাপ কেহ কখন করে নাই বা এমন কোন পাপের কল্পনা কেহ কখন করিতে পারে না। অথবা এমন কোন পাপের নাম নাই, যাহা ব্রাহ্মণসমাজে প্রবেশ না করিয়াছে। অথচ ব্রাহ্মণবর্গের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বরং পাপকে প্রশ্রয় দিয়া জাত্যভিমান রক্ষার জন্য এবং সমাজের উচ্চ স্থানকে অধিকার করিয়া থাকিবার জন্য এখনও ব্রাহ্মণগণ নিজের মহাপাপ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, বরং অধঃপতনের দিকে, উৎসন্নের দিকে, নরকের দিকে অগ্রসর হইতে সম্মত। ব্রাহ্মণ যে

কেবল নিজে মরিতেছেন তাহা নহে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রগণকে লইয়াও মরিতেছেন, ইহাই পরম দুঃখ। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, মহতেরা যে কার্য্য করে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, নিম্নশ্রেণীর লোকের তাহা অনুকরণ ও অনুধাবন করিয়া থাকে, সুতরাং দেখুন ব্রাহ্মণের দোষে কেবল ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজ, সমগ্র হিন্দুজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষকে অধঃপতনের দিকে পাঠাইয়া দিতেছেন। অতি দুঃখে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত গাহিয়াছিলেন—

"তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় কর কালো।
আমি বলি, তোমাদের গোঁসাই চেয়ে
কশাই অনেক ভাল॥"

সভ্যমহোদয়গণ! হিন্দুর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ—ব্রাহ্মণের পতন। শাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কি লিখিত আছে, তাহা আপনারা অবশ্য অবগত আছেন; তথাপি দুই একটা শাস্ত্রীয় উক্তির উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহামতি মনু মহর্ষি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহা দেবতা স্বরূপ। "বিদ্যা তপঃ সমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু" অর্থাৎ বিদ্যাতপ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ অগ্নি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) সমতুল্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম
স্বভাবজং॥

মনুসংহিতায় ইহাও লিখিত আছে—

"যং শিষ্টা ব্রাহ্মণাব্রূয়ঃ সধর্ম্ম
সাদশঙ্কিতঃ।"

মহর্ষি মনু সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্।
পিতা পুত্রৌ বিজানীয়াৎ ব্রাহ্মণন্তু
তয়োঃ পিতা॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্ক হয়েন, আর ক্ষত্রিয় যদি শত বর্ষ বয়স্ক হয়েন, তথাপি উভয়ের মধ্যে মান্য বিষয়ে পিতা পুত্রের ন্যায় পৃথক্ জানিতে হইবে। সভ্যমহোদয়গণ! তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখুন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের কতদূর সম্মান এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের আসন কত মহান্। রামায়ণে লিখিত আছে, অর্দ্ধ শত হস্ত দূর হইতে দেখিলে ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিয়া লওয়া যায়। পুরাণকারেরা বলেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলে অর্দ্ধ ঈশ্বর দর্শনের ফল হয়। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে, যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্ব আদৌ নাই, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ নহে, পরন্তু চণ্ডাল অপেক্ষা অধম এবং অস্পৃশ্য। মহাশয়গণ! এইরূপ ব্রাহ্মণের দ্বারাই হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণের পাপেই সমগ্র হিন্দু সমাজ মহা কুফল ভোগ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্য পূজ্য—চির পূজ্য—চির শ্রদ্ধেয়; কিন্তু বলুন দেখি, তাঁহাদের সংখ্যা কয়জন?

হিন্দুর পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি নিজে নিজে ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে সংশোধনের আশা ভরসা কোথায়? ব্রাহ্মণগণের এ বিষয়ে যে আদৌ চেষ্টা নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। দিনে দিনে, উত্তরোত্তর, ব্রাহ্মণের উন্নতি বা সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের বিবেচনায় ব্রাহ্মণগণ যেন অধিকতর জঘন্য হইয়া যাইতেছেন। সমস্ত দেশ—সমস্ত হিন্দু জাতি—তাঁহাদের

অবনতি ও অপরাধের কথা লইয়া বারংবার আলোচনা করিতেছেন, তথাপি ব্রাহ্মণবর্গের মোহনিদ্রা কিঞ্চিৎ মাত্র ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণগণ অবনত হইয়াছেন বলিয়া, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গলা কাটিয়া দিলে মানুষ যেমন বাঁচে না, ব্রাহ্মণগণেরও উন্নতির পথ বন্ধ হওয়ায় অপর তিন বর্ণও অসার হইয়া পড়িতেছেন, কারণ সমাজের শীর্ষস্থান কলঙ্কিত হইলে অপর সমুদয় স্থান কলঙ্কিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। ব্রাহ্মণের অধঃপতনের আর বাকি কিছুই নাই। দেখুন, জগন্মান্য, ব্রহ্মবীর্য্যোৎপন্ন, অসাধারণ অপৌরুষেয় সামর্থ্যশালী, সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বগুণের উৎসস্বরূপ, ব্রাহ্মণবর্গ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে এত দূর হীন হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন ভদ্রলোকের ঘরে—অধিক কি নিম্নশ্রেণীর শূদ্রের ঘরেও—"বামুন" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে পাচককে অর্থাৎ রশুইয়াকে স্মরণ হয়। যদি কেহ বলে, "আজ আমাদের ভোজনে সুবিধা হয় নাই কারণ বামুনটা আসে নাই"—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পাচক অর্থাৎ রশুইকারী লোকটা আসে নাই। বামুন এই শব্দটা এখন সর্ব্বত্র বেতনভোগী—দাসত্ববৃত্তি অবলম্বী—ব্রাহ্মণকে বুঝায়; বামুন শব্দটা এখন সর্ব্বত্র রান্নাঘরের ব্যবসায়ী রশুইয়াকে বুঝায়। ইহা অপেক্ষা বামুনের অধোগতি আর কি হইতে পারে? আমি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে পরিব্রাজন করিয়াছি এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে অসংখ্য গাড়োয়ান, কলের মুটে, কলের জল তোলা ভারী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের বাটীতে ব্যবহার জন্য গঙ্গাজলের ভারী, জুতার দোকানদার, ফেরিওয়ালা, মাংস-বিক্রেতা, ছুতার, কর্ম্মকার, দর্জ্জী, কশাই, শুঁড়ির দোকানদার, চাপরাশী, আর্দালী, কোচম্যান, বেশ্যার দালাল, আড়তের কয়াল, ডাকঘরের পিয়ন, স্বর্ণকার, পাখির পালক বিক্রেতা, মৃত জন্তুর অস্থি-বিক্রেতা, দপ্তরী, ছাপাখানার কম্পোজিটার, ছাপাখানার প্রেশম্যান্, হাঁসপাতালের ড্রেশার, ঘরের ঝাড়ুবর্দ্দার, মিউনিসিপাল মেথরদের সর্দ্দার, ইংরাজী হোটেলের কেরাণী, ঘোড়ার সহিস, বাজার সরকার প্রভৃতি অদ্ভুত পেশা অবলম্বী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইয়াছি। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট ও অর্থ কষ্ট দূরীকরণ জন্য—বিশেষতঃ সংসারস্থ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালন করিবার জন্য—ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণোচিত ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহাতেও তাঁহাদের নিন্দা করি না—কারণ অসময়ে ও দুঃসময়ে মানুষকে অভাব পূরণ জন্য সকল রকম কাজ করিতে হয়, ইহা সত্য—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সামাজিক বিধি বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া ইংরাজী হোটেলে, মুসলমানের হাতে বা খৃষ্টানের হাতে, অধিক কি ধেড়, চামার মেথর হাড়ী ডোম প্রভৃতির হাতে পাক করা গো-মাংস, শূকরমাংস প্রভৃতি অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া আবার সাধারণ সমীপে গর্ব্ব করিয়া বেড়ান? কোন্ বিধি অনুসারে বাজারের বেশ্যার ঘরে দিবারাত্র যাপন, সুরাপান, অধম পশুবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া আবার "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করেন? কোন্ বিধি অনুসারে রাশি রাশি মিথ্যাকথা, পুনঃপুনঃ জুয়াচুরি, জাল, কৃত্রিমতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে ঘোরতর রূপে অপরাধী হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন? মহাশয়গণ! আপনারা সমুদয় ভারতবর্ষের সেসন্ রিপোর্ট অর্থাৎ লোক সংখ্যার বিবরণী সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, সমগ্র ভারত মহাদেশের মধ্যে প্রত্যেক সতর

শত ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ রীতিমত তাহার মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং তের হাজার নয়শত একষট্টি ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, বিগত ত্রিংশ বর্ষকাল মধ্যে প্রত্যেক একলক্ষ ব্রাহ্মণ মধ্যে গড়ে ৩৩ হাজার চারিশত ৭১ জন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। খাস বাঙ্গালায়, অথবা পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বামুণের সংখ্যা শতকরা ২২ জন কম হইয়া গিয়াছে। এখন দেখুন, হিন্দুসমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণের দুর্গতি কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদের দুর্ম্মতি কি দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ বিষয়ে ব্রাহ্মণবর্গ এখন আর গৌরব করিতে পারেন? নিরপেক্ষভাবে বলিতে পারি, আজি কালিকার দিনে অসংখ্য শূদ্র, অসংখ্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর; অসংখ্য শূদ্র এখন অগণ্য ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব শিখাইয়া দিতে পারেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক কান্তি, অসাধারণ সামর্থ্য, চরিত্রবল, জ্ঞানবল, যোগবল, ধর্ম্মবল, মানসিক বল, আধ্যাত্মিক শক্তি, এখন আর কোথায়? শত সহস্র মূর্খ, অধার্ম্মিক ও নরকুলের কলঙ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ এক্ষণে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ব্রাহ্মণের মধ্যে যখন এত ম্লেচ্ছাচার, অধার্ম্মিকতা, মূর্খতা এবং চরিত্রহীনতা প্রবেশ করিয়াছে, তখন হিন্দুসমাজের পুনরুত্থানের আশা ভরসা কোথায়? মানুষ যখন নিজে নিজে সংশোধিত না হয়, তখন তিন প্রকারে সে ব্যক্তি সংশোধিত হইতে পারে। ১ম—ঈশ্বর দ্বারা। ২য়—রাজা দ্বারা। ৩য়—সমাজ দ্বারা। পরমারাধ্য ভগবান্, যে সকল কারণে এবং যে সকল উপায়ে মানবকে সংশোধিত করেন, তন্মধ্যে প্রধান কারণটির উল্লেখ করিতেছি। মনুষ্য যখন সর্ব্ববিধ উপায়কে অবলম্বন করিয়া পরিণামে হতাশ হইয়া নিরুপায় হয় এবং নিজের চেষ্টা বা অপরের সহায়তা দ্বারা কোন প্রকার সুফলপ্রাপ্ত হয় না, তখন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজের দেহ, মন ও আত্মা ভগবানে পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া এবং তাঁহাকে অগতির গতি ও নিরুপায়ের উপায় ভাবিয়া তাঁহার শরণাগত হয় এবং উদ্ধারের জন্য আত্মসমর্পণ করে, তখন পরম কারুণিক ভগবান্ তাহার উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা একথা কখনও কি ভাবিয়া দেখিয়া থাকেন? ভাবিয়া দেখা দূরে থাকুক, অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্য্যন্ত করেন না, অনেকে ঘোরতর নাস্তিক ও পাষণ্ড এবং অনেকে গায়ত্রীর অর্থ পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে। কপটতা, তামসিকতা, কৃত্রিমতা, বৃথা অহঙ্কার, বৃথা জাত্যভিমান, কদাচার, অধার্ম্মিকতা প্রভৃতি যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পাষণ্ডের দিকে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়। দ্বিতীয় উপায়ের নাম—রাজা। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজা বা সম্রাট্ মহোদয় বিদেশীয় জাতির লোক এবং অ-হিন্দু। রাজপুরুষগণ এবং রাজকীয় জাতির লোকেরা বিধর্ম্মী, সুতরাং রাজার দ্বারা ব্রাহ্মণের সংশোধন অথবা হিন্দুসমাজের পুনরুত্থান অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ—সমাজ। আমাদের হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান যুগাযুগান্তর ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিয়া আছেন। সেকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সহসা বা সহজে ব্রাহ্মণের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন, না, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণের প্রতি অপর বর্ণত্রয়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে,

ব্রাহ্মণকে অনেকে প্রণাম করেন না এবং ব্রাহ্মণাপেক্ষা আপনাদিগকে কোন মতে হীনতর বলিয়া বিবেচনা করেন না। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা শূদ্রবর্ণভুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হীনতর ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন, ইহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের দোষ নহে, ইহা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের নিজের দোষ। ব্রাহ্মণ যদি নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরের নিকটে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ মর্য্যাদা নষ্ট করে, তাহা হইলে কে তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারে, অথবা মর্য্যাদা দিতে স্বীকৃত হয়? মহাভারতানুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এবং তাঁহার জননী এতদুভয়ে হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণভক্তি বঙ্গের ঘরে ঘরে বিদিত ছিল, কিন্তু সেই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণের কদাচার ও অধার্ম্মিকতা দেখিয়া পরিণামে এবম্প্রকার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কপটাচারী, স্বেচ্ছাচারী, ভণ্ড ও পাষণ্ড ব্রাহ্মণকে দেখিলেই তাহার মাথার টিকি কাটিয়া লইতেন এবং আল্‌ময়রার ভিতরে তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া তাহাতে নম্বরওয়ারী টিকিট লাগাইয়া রাখিতেন, ঐ টিকিটে ভণ্ড বামুনের নাম ও অপরাধের পরিচয় লিখিত থাকিত। গদাই ঠাকুর নামে এক বামুনের ঘটনায় সর্ব্বপ্রথম এই নবীন প্রথা অবলম্বন করিতে সিংহ মহাশয় বাধ্য হইয়াছিলেন। এই গদাই ঠাকুরের সম্পূর্ণ কৌতুককর বিবরণ আমার "প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে, আপনারা তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। শুনা যায়, এইরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় প্রায় ৫১ জন ব্রাহ্মণের টিকি কাটিয়া আলমারীর ভিতরে যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কতকগুলির নাম, নম্বর ও অপরাধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। টিকি নং ১৩, অপরাধীর নাম—উমেশ ঠাকুর চূড়ামণি। অপরাধ—যবনী সংশ্রব, যবনীর গৃহে ভোজন এবং পরিণামে তাহার রূপার হাঁশুলি নাম্নী গহনা লইয়া পলায়ন। টিকি নং ১৯, অপরাধী কৈলাস ঠাকুর (তত্ত্বনিধি)। অপরাধ—যুগীর গৃহে অন্ন ভোজন ও জাল তমশুক লিখিয়া দেওয়া। টিকি নং ২৫, অপরাধ—জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশসাধন। অপরাধীর নাম কানাই ঠাকুর। টিকি নং ২৮, অপরাধী আশু ঠাকুর। অপরাধ—ভয়ানক মিথ্যা কথা দ্বারা সোণাগাছি ও মেছুয়াবাজারের বেশ্যাদিগের স্বর্ণালঙ্কার ফাঁকি দেওয়া। টিকি নং ৩২, অপরাধী গোবিন্দ বিদ্যানিধি। অপরাধ—মন্ত্রশিষ্যের বিধবা কন্যাকে বিপথগামিনী করা। টিকি নং ৩৩, অপরাধী—রামকান্ত বিদ্যাবাগীশ। অপরাধ—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীধর শিরোমণির সঙ্গে সুরাপান করিয়া গরাণহাটার মোড়ে এক ধোবার বাটীতে চারি দিন অবস্থান এবং তাহার ঘরে অশাস্ত্রীয় মতে ৺ শীতলাদেবীর পূজা করা। টিকি নং ৩৪, অপরাধী—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। সর্ব্ববিধ পাপের সর্দ্দার এবং বিশেষতঃ আদালতে পুনঃ পুনঃ মিথ্যা সাক্ষী দিয়া এখন পেশাদার সাক্ষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। অনেক ধনবান্ বড়লোকের বাগানের সঙ্গী ও জলপাত্রের দালাল। সভ্যমহোদয়গণ! আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক করে না; চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া যাহা দেখাইয়া দেওয়া হইল, তাহাই যথেষ্ট। এখন বুঝা উচিত, জগতে মেকি চিরদিন চলে না এবং ভণ্ডামীরও একটা সীমা আছে। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, বামুন কালাপাহাড় মুসলমান হইয়া যেমন হিন্দুর

হিন্দুয়ানী নাশের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিল, অসংখ্য ব্রাহ্মণ যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যেমন অগণ্য প্রকারে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, ভারতে ইউরোপীয় প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, খৃষ্টীয় প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাঁহার নিবাস বালীগ্রাম, নাম জগদীশচন্দ্র গাঙ্গুলী, বেগোর গাঙ্গুলী এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান, তিনিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাম রামমোহন রায়। যে সকল খ্যাতনামা হিন্দু, খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশসাধনে সমস্ত জীবন যাপিত করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় এখন যাহা গ্রেট্ ইষ্টারণ হোটেল নামে খ্যাত, সেকালে তাহা D. Wilson's Hotel অর্থাৎ উইলসন হোটেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও অনেকে ইহাকে উইলসনের হোটেল বলিয়াই অভিহিত করেন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এই হোটেলের সর্ব্বপ্রথম বড় বাবু একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে দুইজন বাঙ্গালী, বঙ্গদেশকে ইউরোপীয় জাতির অধীন করিবার জন্য স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিল, কোন কারণে এই সভায় তাহাদের নামোল্লেখ করিব না। যে সকল পণ্ডিত নবদ্বীপাধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেনকে কৃত্রিম পদ্মপুরাণের কল্পিত শ্লোক শুনাইয়া বলিয়াছিলেন যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগ অথবা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ বঙ্গদেশ মুসলমানের শাসনাধীন হইবে, ইহা বিধির বিধি, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন সেনা, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, পুরুষকার, রাজোচিত কর্ত্তব্য এবং স্বদেশ-প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলায়ন করেন এবং দেশটি মুসলমানের হস্তগত হয়। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। রাজা বল্লাল ও আদিশুরকে কিছু কাল যাঁহারা বৌদ্ধমতের পোষক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। অনেক কষ্টে সেন ও শূরবংশ পুনরায় স্বধর্ম্মে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশ, ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ করিয়া বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। সভ্যমহোদয়গণ! এখন বিচার করিয়া দেখুন, প্রায় সর্ব্বপ্রকার অনাচার ও অনিষ্টের মূলে ব্রাহ্মণ প্রভুই মূর্ত্তিমান্‌রূপে বর্ত্তমান। আবার শুনুন, পঞ্জাবের যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সম্রাট্ আকবরের অন্যতম সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, হিন্দু রাজাদের কন্যাকে বিবাহ করিলে অথবা হিন্দুর রমণীকে বাঁদী বা স্ত্রীরূপে উপহার গ্রহণ করিলে হিন্দুর দর্প খর্ব্ব হইয়া যাইবে, তাঁহার নাম ছিল পণ্ডিত শীউলা প্রসাদ, ইনি ব্রাহ্মণ। বোম্বাই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান একজন ব্রাহ্মণ; মাদ্রাজ প্রসিডেন্সীর মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টান মধ্যে গণ্য এবং আদি খৃষ্টানের বংশ ব্রাহ্মণ। সভ্যমহোদয়গণ! কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ-সমাজ মধ্যে প্রতি এক সহস্র ব্রাহ্মণের সংখ্যায় প্রায় ৯৯৯ জন সারস্বত ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রায় অন্য জাতিকে শিষ্য করেন না। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের রমণীরা অত্যন্ত সুন্দরী এবং বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়া রমণীগণ প্রায় পরীতুল্যা। দুষ্টাভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া সারস্বত ব্রাহ্মণেরা প্রথমে নিয়ম করিল, ক্ষত্রিয় শিষ্যের হাতের তৈয়ারি অন্ন গ্রহণ করিলে দোষ

নাই, কারণ শিষ্যগণ সন্তানসমতুল্য। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সারস্বত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় শিষ্যের অন্দরে পাক করা অন্ন ভক্ষণ করেন এবং কেবল তাহাই নহে শিষ্যসনে একাসনে অধিক কি এক পাত্রে অন্ন গ্রহণে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপত্তি উপস্থিত করেন না। কেবল তাহাই নহে, পুরুষ শিষ্য হইলে পুত্রবৎ হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক শিষ্য হইলে স্ত্রী সমতুল্যা হইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া লউন, শিষ্যের সঙ্গে এতটা মিশামিশি, এতটা মাখামাখি এবং অন্দরের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতার কারণ কি? কাশ্মীরে ইহা ব্রাহ্মণের নিত্য কীর্ত্তি। আর গুরুগাঁই নামক সেই প্রাচীন ও পাশবীয় প্রথাটা কি পুনরায় উল্লেখ করিতে হইবে? ইহাও কি ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি নহে? বল্লভাচারী বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে, গুজরাট, কাটিয়াগড়, মধ্যভারত, রাজপুতানা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে, স্ত্রীলোক প্রথমবার ঋতুমতী হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ গুরু কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট না হইলে সেই স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর মাথার কেশটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকারিণী হয় না। ইহাও ব্রাহ্মণেরই কীর্ত্তি। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার উপকূল প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, যুবতী স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি যতই সতী হউন না, ইহাঁরা ব্রাহ্মণের ভোগ্য এবং যখনই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করেন, তখনই ইহারা ব্রাহ্মণের নিকটে প্রেরিত হয়। ইহাও ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি। সভ্যমহোদয়গণ! এতক্ষণ যাহা বলিলাম বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট, পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কলঙ্কের কথা আর অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং ঘৃণার সহিত ইহাকে এই খানেই পরিত্যাগ করিলাম, নতুবা রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখিলেও কুলাঙ্গারদিগের কলঙ্কের ইতিহাস শেষ করা যায় না। এখন হৃদয়ে হাত দিয়া বলুন দেখি, ভগবানের দিকে তাকাইয়া বলুন দেখি, যদি অণুমাত্রও সত্য, ন্যায়, নিরপেক্ষতা ও ধর্ম্মভাব থাকে, তাহা হইলে বলুন দেখি, ব্রাহ্মণের পাপে কি হিন্দুসমাজ অধঃপতিত হয় নাই? এখনও কি হইতেছে না? ভাবুন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন হিন্দু রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না, ব্রাহ্মণের বেত্রাঘাত দণ্ড হইত না, জেলখানায় ব্রাহ্মণদিগকে কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে হইত না এবং ব্রাহ্মণ-কয়েদীরা ইচ্ছা করিলে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে পারিতেন, কিন্তু গোয়ালিয়র, ইন্দোর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুড়, মহিশূর প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুরাজত্বের শাসনকর্ত্তারা ব্রাহ্মণের ঘোরতর ম্লেচ্ছাচার ও জঘন্য চরিত্র দেখিয়া এমনই চটিয়া উঠিয়াছেন যে, এখন হিন্দু রাজার জেলখানায় ব্রাহ্মণের ফাঁসী হয়, বেতাঘাত দণ্ড হয়, ঘানি টানিবার হুকুম হয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণকে কেহ আদরও করে না। বলুন দেখি, ইহার পরে আর কি দেখিতে চান? অবনতির আর বাকি কি! এখনও যদি ব্রাহ্মণদিগের চক্ষু না ফুটে, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহকালও নষ্ট, আর পরকালও নষ্ট।

মহাশয়গণ! আপনারা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্রাহ্মণজাতি খারাপ হইল কেন? সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে হইলে, ইহা বলা আবশ্যক, ব্রাহ্মণের হীনতার বহুবিধ হেতু বিদ্যমান থাকিলেও, তিনটি প্রধান কারণকে আপাততঃ গণ্য করা যায়। ১ম কারণ—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। ২য়—ভারতে ম্লেচ্ছাধিকার; ৩য় কারণ—ব্রাহ্মণের নিজের দোষ।

এখন কথা এই, কিরূপে ব্রাহ্মণের পুনরায় ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে? কিরূপে ব্রাহ্মণবর্গ পুনরায় পূর্ব্ব ধর্ম্ম ও পূর্ব্বকালের

সাত্বিকভাব ও সাত্বিক আচার প্রাপ্ত হইতে পারেন? কিরূপে ব্রাহ্মণের আবার পূর্ব্বকার তেজ, পরাক্রম, শিক্ষা, দীক্ষা, সাত্বিকতা প্রভৃতি জন্মিতে পারে? আমি পুনরায় বলি, ব্রাহ্মণ নিজে চেষ্টা না করিলে ব্রাহ্মণের উদ্ধারের উপায় দেখি না। তবে একথা সত্য, সমাজ যদি একমত হইয়া অনাচার ও কদাচার ব্রাহ্মণের শাসন করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের কদাচার ও অপব্যবহার দমিত হইতে পারে। সমাজ যদি সাবধান হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে কোন ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী হইবে এবং জঘন্য প্রবৃত্তির অনুযায়ী হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও চরিত্র নষ্ট করিবে, সমাজ তাহাকে কোনমতে প্রশ্রয় দিবে না এবং তাহাকে বিবিধ উপায়ে দমন জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সংশোধন হইতে পারে এবং তাহা হইলে ব্রাহ্মণের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতিরও পুনরুত্থান হইতে পারে। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে হয় না? সমাজ-বৃক্ষের মূলেও ঘুণ ধরিয়াছে; এই বৃক্ষে আর সুস্বাদু ও সুরম্য ফল নাই, সুকোমল ও সুদৃশ্য পল্লব নাই, বিবিধ বিমানবিহারী সুকণ্ঠ বিহঙ্গবর্গ আর সুতান ধরে না এবং ইহার ছায়াতেও পরিশ্রান্ত পথিকের আর শ্রান্তি দূর হইয়া শান্তি লাভ হয় না। বস্তুতঃ সমাজের এমনই জঘন্য ও অসার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত মানুষ মরিয়া যায় তাহাতে দৃষ্টি নাই, কিন্তু একটা জঘন্য পূরীষকীট মরিলে অমনি "দেশ গেল, দেশ গেল," "সাধু সাবধান, সাধু সাবধান," "জাগো দেশ, জাগো সমাজ," "পৃথিবী রসাতলে যায়, গেল, গেল, দেশ গেল, জাগো, উঠো" করিয়া ভূতের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতে অথবা পাগলের ন্যায় অর্থশূন্য প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। মনে করুন, এক সচ্চরিত্র ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান, বিলাতে গিয়া, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক যত্নে, কষ্টে ও পরিশ্রমে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে পুনরাগমন করিল। এই ব্যক্তি যেমন সচ্চরিত্র তেমনি সুশিক্ষিত, সদাচার ও সমাজ-হিতৈষী এবং দেশ-হিতৈষী। ইনি ভারতে আসিয়া হিন্দুর দেব-দেবীকে মানেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করেন, স্বধর্ম্মের প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকেন এবং সরল চিত্তে হিন্দুধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অকপটভাবে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুসমাজে প্রবেশের জন্যও বিশেষ অভিলাষী। ইনি কালে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, কমিশনর, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইবেন এবং কালো চামড়া না হইলে বোধ হয় ছোট লাটের সিংহাসনও প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ এক হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ ভদ্রসন্তানের বাটীতে যদি কেহ এক গ্লাস জল খায় অথবা ইহার স্ত্রীর হাতের তৈয়ারী একটা পান খায়, অমনি সমাজ-বনের নেকড়ে বাঘেরা অথবা বরাহ কিংবা কুকুরেরা একেবারে বুক চাপড়াইয়া, চুল এলো করিয়া, গলা ছাড়িয়া দিয়া, চীৎকার করিতে থাকিবে—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! জাগো ভাই জাগো, জাগো ও উঠ, দেশ গেল, গেল, গেল; আর রক্ষা নাই, রক্ষা নাই; ভারতকে এবার জাগাইতে হইবে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে আবার জাগাইতে হইবে; পৃথিবী গেল গেল, আর সয় না; সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ। ভারত রসাতলে গেল, চন্দ্র সূর্য্য তিরোহিত হইল, বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল এবং হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদিকে ব্রাহ্মণ প্রভু এবং বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভু যে হিন্দুসমাজের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত নিত্য দুই বেলা চিবাইয়া খাইতেছেন তাহার কি কেহ খোঁজ খবর লয়? সেদিকে ভায়ারা একেবারে চুপ, একেবারে মৌনী ফকির! এদিকে কত শত সহস্র ব্রাহ্মণের বৃহতোদর মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা গরু, কাহন কাহন মুর্গী, আর পণ পণ শূকরমাংসের পিণ্ড, মুচী মেথর ডোম হাড়ী যবন ইত্যাদি কর্ত্তৃক পাক করা খাদ্যাদি প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার কেহ কি খবর লন? ইহাতে হিন্দু সমাজ নষ্ট হয় না, ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু সাধুচরিত, সুশিক্ষিত, বিনয়ী, সদাচার ও স্বধর্ম্মনিরত ভদ্রসন্তান বিলাতে গিয়া লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার ঘরে এক গেলাস জল খাইলে অমনি দেশ নষ্ট হয়, সমাজ নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয়, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নষ্ট হয়, আর সমগ্র বিশ্বমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! কি ধৃষ্টতা! কি ব্যভিচার! কি ভণ্ডামি! কি পাষণ্ডতা! এদিকে শত সহস্র ব্রাহ্মণের পেটে আবকারীর খোলা ভাঁটি ভরা আছে, গায়ের চামড়ার উপরে কোদালি দিয়া চাঁচিলে গণিকা-বাটীর বোধ হয় তিন ইঞ্চি প্রমাণ পুরু ময়লা পাওয়া যায়, আর হৃদয়টা দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পেনেল কোডের পাপ এবং ব্যবহার ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের সমুদয় অপরাধের তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য কাহারও দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, কিন্তু একজন সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হিন্দুসন্তান যদি দেবচরিত্র এবং ঋষিকল্প নবাব হেয়াৎ খাঁর সহিত কিংবা লর্ড রিপণের ন্যায় মহর্ষি সমতুল্য খৃষ্টানের সহিত করমর্দ্দন করে, অমনি ভণ্ডদের মুখ হইতে অথবা লেখনী হইতে বিকট চীৎকার উঠিল—"গেল, গেল, দেশ গেল, আর রক্ষা নাই, সাধু সাবধান! সাধু সাবধান! ভাই সব জাগো, উঠ, হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যায়। হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ধর্ম্মরাজ! তোমরা এক্ষণে সহায় হও, হিন্দুর হিন্দুয়ানী রাখ।" সভ্য-মহোদয়গণ! এখন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, এইরূপ ভণ্ডামী, এইরূপ কপটতা, এইরূপ জাল জুয়চুরী যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুর পুনরুত্থানের আশা কোথায়?

প্রকৃত কথা এই, হিন্দুর পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি সমাজ হইতে সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, স্বধর্ম্মানুরাগী, উচ্চপদস্থ, ধনবান্ ও সদাচারী এবং ধার্ম্মিক লোকদিগকে বাদ দেন, তবে কে সমাজ রক্ষা করিবে? জন কয়েক ভণ্ড লইয়া কি সমাজ বা ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহা আমার কথা নহে, ইহা দেশ শুদ্ধ লোকের কথা। যে সকল তপপ্রভাবশালী মহাযোগী ও মহাসাধু এখনও ভারতকে আলোকিত করিয়া গোপনে বা প্রকাশ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদেরও মুখে শত স্থানে শতবার শুনিয়াছি যে, নূতন ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত না হইলে হিন্দুর পুনরুত্থানের আশা প্রায়ই নাই। ইহা যোগীর বাক্য, ইহা মহাপুরুষদিগের বাক্য, সুতরাং ইহা ব্রহ্মবাক্য। আমি ভরসা করি, ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই কথাগুলিকে লইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অনেক অপ্রিয় কথা বলিতে হইল। এই জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত, কিন্তু কি করি, সত্যের ও ন্যায়ের খাতিরে, বিশেষ ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণকামনায়, আমাকে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই অপ্রিয় কথাগুলি বলিতে হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলে অনেকে দেখে না; গাত্রে গুরুতররূপে বলপ্রয়োগ না করিলে অনেকের ঘুম ভাঙ্গে না এবং অনেককে প্রকাশ্যভাবে লজ্জিত না করিলে

তাহার লজ্জা ঘুচে না। "বাপ্‌রে! ব্রাহ্মণ নিন্দা করিও না; ব্রাহ্মণের লক্ষ অপরাধ থাকুক, তবু ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতে নাই; মস্তক হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত পাপে পরিপূর্ণ থাকিলেও অথবা ঘোর নরককুণ্ডের পঞ্চাশ হাজার হাত নীচে ডুবিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণ সদাই শুদ্ধ," মহাশয়গণ! এরূপ ধারণা ও এবম্প্রকার বিশ্বাসের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সত্য, ন্যায়, সাহস, সৎযুক্তি ও স্পষ্টবাদিতার যুগ আসিয়াছে, এখন আর কেহ কাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, কেহ কাহাকে "যাদু" করিয়া যা' ইচ্ছা তা' করিতে বা বলিতে পারে না, সুতরাং ব্রাহ্মণবর্গের এখন খুব সতর্ক হওয়া উচিত। তবে এ কথা অবশ্য বলি এবং এখনও পুনরায় বলি, যাঁহারা অদ্যাপি প্রকৃত বাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যগুণের পালন করিয়া আসিয়া চরিত্রবল, সাধুতা, সদাচার ও সুশিক্ষার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা অবশ্য সমাজের পূজ্য ও বরণীয়। আমি এরূপ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটিও নিন্দার কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। সভ্যমহোদয়গণ! অনেককণ পর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কোন সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, পাঁচটি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এই পঞ্চ বিষয়ের নাম এই—ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বাহুবল ও ধর্ম্মবল। ধন, জন, বিদ্যা, শারীরিক সামর্থ্য এবং ধর্ম্মবল, এই কয়েকটি জিনিষ না থাকিলে কোন সমাজেরই সম্যক্ প্রকারে উন্নতি হইতে পারে না। ইহার একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতি প্রত্যেকটি যেমন দেহের পক্ষে পরমোপকারী, তদ্রূপ ধন, জন, বিদ্যা, বাহুবল ও ধর্ম্মবল এই পাঁচটির প্রত্যেকটি সমাজের শরীর ও সমাজের প্রাণরক্ষার পক্ষে পরম সহায়। মহাশয়গণ! সুখময় শরত ঋতুতে, শুভ্র শুক্ল পূর্ণিমায়, সনাতন হিন্দুর পবিত্র গৃহে যে আনন্দময়ী জগদম্বার মহোৎসবে পূজা হয়, সেই জগন্মাতা দুর্গামূর্ত্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। সংসারে বাস করিতে হইলে, যে সকল গুণ ও যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, জগন্মাতার দুর্গামূর্ত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে শিক্ষা করা যায়। মা দুর্গা মহাশক্তিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ মহাশক্তি। সংসারে বাস করিতে হইলে, দৈহিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন; যে সমাজে সুস্থ, সবল অর্থাৎ শক্তিমান্, দীর্ঘজীবী এবং রজোগুণসম্পন্ন আদর্শ দেহী মানব না থাকে, সে সমাজ কখনই উন্নত হইতে পারে না। যে সমাজে কেবল রুগ্ন, বলহীন, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ দেহধারী লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের অধঃপতন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অকাট্য সত্য। সুতরাং স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, শক্তি চাই, এইজন্য দেহরক্ষার প্রথম প্রয়োজন। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "আরোগ্যং মূলমুত্তমং" অর্থাৎ স্বাস্থ্য সকল ভালর মূল। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে শক্তি হইবে কোথায়? এই জন্য সুস্থ ও সবল লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়া আবশ্যক। কারণ দৈহিক শক্তি পরম সহায়। কিন্তু কেবল দৈহিক শক্তি থাকিলেই কি সমাজ উন্নত হয়? মানসিক শক্তি না থাকিলে কেবল দৈহিক শক্তি লইয়া মানুষ পশু হইয়া যায়, এইজন্য মানসিক শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। বিদ্যা ও সুশিক্ষা না হইলে মন কখন কি উর্ব্বর হয়? বিদ্যা ও সুশিক্ষা না থাকিলে মানসিক শক্তি কোথা হইতে হইবে? এইজন্য মহাশক্তিরূপিণী মাতা দুর্গার পার্শ্বেই বিদ্যারূপিণী—জ্ঞানরূপিণী—মা বীণাপাণি সরস্বতী বিদ্যমানা। কিন্তু কেবল দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তি

লইয়াই মানুষ কখন বাঁচিতে পারে না। লোকে কথায় বলে, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"; পেটে অন্ন না থাকিলে সংসার অন্ধকারময় হইয়া উঠে; অন্ন সংস্থান না থাকিলে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, সদ্‌গুণ, শিক্ষা, দীক্ষা এ সকলই মাটি হইয়া যায়, সুতরাং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা, সদুপায়ে, অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন। ধন না হইলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ধন না থাকিলে কোন সমাজেরই কখন উন্নতি হয় না। পেটে যাহাদের অন্ন নাই, শয়নের যাহাদের স্থান নাই এবং প্রতিদিনই যাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দমনের জন্য বিষম চিন্তা করিতে বাধ্য, এমন দরিদ্রাদপি দরিদ্র ব্যক্তিগণের দ্বারা কখন সমাজ রক্ষা হয় না, এইজন্য দেখুন, বিদ্যাবুদ্ধিদাত্রী মা সরস্বতীর পার্শ্বে ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বর্ত্তমানা। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য, বিদ্যা ও ধন থাকিলেই কি মানুষ যথার্থ মানুষ হয়? তাহা নহে। দৈহিক বল, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি অলস, ভীরু, নিরুৎসাহ, কাপুরুষ এবং ক্লীববৎ বিচরণ করে, তাহার শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন প্রভৃতিতে কোন কাজই হয় না। এইজন্য দেখুন, মা লক্ষ্মীর পার্শ্বে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি কেমন সুন্দর ভাবে দণ্ডায়মান। কার্ত্তবীর্য্য কার্ত্তিক যেন জ্বলন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, সাহস, যত্ন, পরিশ্রম ও বীরত্বের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। সভ্যমহোদয়গণ! শারীরিক বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি থাকিলেও মানুষ "আদর্শ মানুষ" হয় না; আর একটা জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন, সে জিনিষটা না থাকিলে মানুষের সমুদয় গুণ, সমুদয় শক্তি, সমুদয় চেষ্টা একেবারে অসার ও বিফল হইয়া যায়, সে জিনিষটার নাম ধর্ম্মবল। ঐ যে গজমুণ্ডধারী গণপতি মহারাজকে দর্শন করিতেছেন, ঐ সিদ্ধিদাতা গণেশ ধর্ম্মরূপে অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিরূপে ঐ মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। সিদ্ধির নাম ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নাম সিদ্ধি। সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলের নাম ধর্ম্মবল, এই একটির অভাবে আর সমুদয় বল একেবারে সারত্বহীন হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মকে অবশ্য আশ্রয় করা চাই। কথাগুলি ক্রমে ক্রমে আরও পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আসুন, আমরা সর্ব্ব প্রথমে, শিক্ষা লইয়াই আলোচনা করি। সত্য করিয়া বলুন দেখি, এখনকার শিক্ষা কি প্রকৃত শিক্ষা? প্রকৃত শিক্ষায় যে সকল গুণে মনুষ্য অলঙ্কৃত হয়, সে সকল গুণ এখন কোথায়? যে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন হিন্দুসন্তান সমগ্র জগত মধ্যে দীপ্তালোকরূপে শোভা পাইতেন, সে শোভা কোথায় গেল? সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল এক্ষণে একবার বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সন্তানের হিন্দুযুবার শিক্ষার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখুন, এ দেশে প্রকৃত সুশিক্ষা আদৌ নাই। বর্ত্তমান কালে এদেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি এই দুই ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করা যাউক। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এদেশে যাঁহারা শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, অথবা লোকের নিকটে যাঁহারা সুশিক্ষিত বা বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের একশত জনের মধ্যে প্রায় ৯০ জন ব্যক্তি মাতৃভাষা আদৌ প্রকৃতরূপে বুঝেন্ না এবং সম্পূর্ণরূপে জানেন না। অনেকে এখনও "আমি" লিখিতে গেলে আমী লেখেন; একখানা বাঙ্গালা পত্র লিখিতে

গেলে তিনশত তের প্রকার ভুল করিয়া বসেন। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, এক সময়ে এ দেশের সর্ব্বপ্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ছিল; তিনি এক মহা বিদ্বান্ বলিয়া সাহেব মহলে ও দেশীয় সমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি Kristo Das Pal এইরূপে নাম স্বাক্ষর ও নামের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন অবশ্য পরিণামে একজন সাহিত্য-সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ উপাধিরও তিনি যোগ্য ছিলেন; কিন্তু অনেক দিবসের চেষ্টার পরে তিনি বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনচরিত প্রণেতা যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, একদা তিনি সাগরদাঁড়ি গ্রাম হইতে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা লেখা আমার আসে না, তুমি আমায় একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।" ইত্যাদি। সে দিন এক সভায় গিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় অতীব প্রশংসা ও যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৭ বৎসরকাল মুন্সেফী করিবার পরে ৭ বর্ষকাল সব্‌জজের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া সভাস্থ সকলে শেষে এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন যে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। দুইটা কথা ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কহিতে যাইয়া সে ব্যক্তির প্রাণবায়ু কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং বোধ হয় আর কিছুক্ষণ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া যাইতেন। তাহার পরে একজন লক্ষাধিক টাকার আয়ের জমিদারের কথা শুনুন। তিনি যখন তাঁহার নাম দস্তখত করিতে বসেন, তখন বোধ হয় যেন ভূমিকম্প উপস্থিত হয়; চাকরেরা পাখা টানে, বাটীর ঝি-মাগী একটা পাণ ও এক গেলাস জল হাতে লইয়া দাঁড়ায়, গোমস্তারা কলমে কালি দিয়া তাহা বাবুর হাতে দেয়, তাহার পরে অনেক কাট্ খড়্ পোড়াইয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত ঘামে কাপড় ভিজাইয়া, বাবু তাঁহার নামের বানান করিয়া লিখিলেন পেতাব (প্রতাপ), তাহার পরে চন্দ্র লিখিবার সময় বাস্তবিকই আকাশের চাঁদের দিকে মুখ ফিরাইতে হইল, তখন গোমস্তা "হুজুর! এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তাহার পরে যাহা লিখিতে হয় আমরা লিখিয়া লইব।" বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, জয় মা কালী বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, এক গেলাস জল পান পূর্ব্বক পাণ চিবাইতে চিবাইতে পুনরায় দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। সভ্য-মহোদয়গণ! বাবুদের বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞানটা কিরূপ তাহা বুঝিলেন কি? সত্য কথা বলিতে হইলে ইহা স্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় দেশের লোক এখনও শিক্ষিত হয় নাই, অথচ ইহা সকলেই জানে No Nation can attain to greatness without literature of its own অর্থাৎ স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। তাহার পরে স্ত্রীশিক্ষার কথা ধরুন। মহাশয়গণ! আমি যদি আমার হৃদয় খুলিয়া কথা কই, তাহা হইলে ইহা অকপটচিত্তে বলিতে পারি, আমি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী নহি, অন্ততঃ যে শিক্ষায় স্ত্রীলোক সৌখীন হইয়া যায়, "বিবাহ বিভ্রাট" বা "স্বাধীন জেনানা" নাটিকার নায়িকা হইয়া যায়, যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা পরিয়া, বুট পরিয়া, পরপুরুষের সঙ্গে বাগানের ভিতর সায়ংকালে বা রাত্রে বেড়াইতে যায়, যে শিক্ষার দোষে রান্নাঘরে ঢুকিতে চায় না, আর বিলাতিনী মেমের মত খবরের কাগজ ও নাটক নভেল লইয়াই দিন কাটায়, আমি সে শিক্ষাকে বাঙ্গালা দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়া লোহিত সাগরের জলে অথবা মক্কার পাহাড়ের তলে ফেলিয়া দিতে চাই; আর এমন শিক্ষা যারা দেয়, অথবা এই রূপ শিক্ষার পোষকতা করে, কিংবা এই অতীব সর্ব্বনাশকরী শিক্ষার জন্য স্কুল বা পাঠশালা স্থাপন করে, তাহাদিগকে আমি দেশের মহাশত্রু বলিয়া গণনা করি। তবে কি আমি স্ত্রীশিক্ষার একেবারে বিরোধী? তাহাও নহে। আমি বিবেচনা করি, এ দেশের লোকেরা যখন স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দেন, তখন যেন মনে করিয়া রাখেন যে, ক কখন খ নয় এবং খ কখন ক নয়, সুতরাং যাহা পুরুষের পক্ষে ভাল, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নয়। What is same for the gander, is not same for the goose. যে শিক্ষায় স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিখিতে পারে; পতির সেবা, পিতামাতার সেবা, সন্তান-সন্ততির পালন ও শিক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, সতীত্ব রক্ষা, গৃহের সুবন্দোবস্ত রক্ষা, প্রভৃতি বুঝিতে পারে, যাহাতে তাহার সাত্বিক প্রবৃত্তির ও সাত্বিকী বুদ্ধির উদ্রেক হয়, যাহাতে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বুঝিতে পারে, যাহাতে কাহারও দ্বারা সহজে প্রতারিতা না হয়, যাহাতে সাহস, ধৈর্য্য, বিপদে নির্ভীকতা, পরিশ্রমপরায়ণতা প্রভৃতি শিখে, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তক সমূহ পড়িতে পারে, ঘরের টাকা কড়ির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে পারে, আবশ্যক হইলে খাতাপত্রও লিখিয়া লইতে সমর্থা হয়, আমি বিবেচনা করি, হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই সুশিক্ষার অভাবে নারীসমাজবৃক্ষে ঘুণ ধরিয়াছে; এবং যেখানে ইহার বিপরীত শিক্ষা হইতেছে, সেখানে কি কুফল প্রসূত হইতেছে তাহাও আমাদের জানিতে বাকি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কোরাণসরিফে জন্মান্তরবাদ।*

কেহ বা রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সেই সেই সময়োচিত সুখ সম্ভোগে জীবন কাটাইলেন; কেহ বা দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজন্ম দুঃসহ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া শীতে কম্পিত হইয়া, গ্রীষ্মে আতপে দগ্ধ হইয়া, বর্ষায় মস্তকে বারিধারা বহন করিয়া, মৃত্যুর শীতল অঙ্কে আশ্রয় লইল। কেহ বা জন্মান্ধ, চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগে অসমর্থ; কেহ বা জন্ম হইতেই খঞ্জ, অভিলষিত দেশে বা স্থানে যাইতে অসমর্থ; দয়ার সাগর ঈশ্বরের সর্ব্বত্র দয়াবর্ষণের নিদর্শন পাইয়াও যখন সর্ব্বত্র এইরূপ বৈষম্য দেখিতে পাই, তখন আর তাঁহাকে দয়াবান্ বলিতে পারি না। প্রাচীনকালে যেমন রোমের রাজারা মহিষীর সহিত প্রকাশ্য সভায় মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য দাসদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিতে

* সাহিত্য-সভার ৯ম বার্ষিক ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অনুমতি দিয়া কাতরদৃষ্টি দাসদিগের উপরে সিংহ ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুর আক্রমণে ও তাহাদিগের আর্ত্তনাদে আমোদ পাইতেন, ঈশ্বরও সেইরূপ কার্য্য করিয়া আমোদ করিতেছেন, মনে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে আর্য্যঋষিগণ সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন, আত্মা পূর্ব্বজন্মে যে সাধু কর্ম্ম ও অসাধু কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলে সেই সেই আত্মার পাপ ও পুণ্য জন্মিয়াছে। ইহজন্মে আবার সেই সেই আত্মার পুণ্যের ফল সুখ ও পাপের ফল দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, জন্মেরও আরম্ভ বা শেষ নাই; এক আত্মারই অনন্ত বার জন্ম হইয়াছে, মুক্তি না হইলে আবার অনন্ত বার জন্ম হইবে। এই জন্মান্তরবাদ, ন্যায়, বৈশেষিকে আছে, সাংখ্য, পাতঞ্জলে আছে, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসায় আছে। জন্মান্তরবাদ লইয়াই উপনিষদ্, জন্মান্তরবাদ লইয়াই তন্ত্র, জন্মান্তরবাদ লইয়াই স্মৃতি, জন্মান্তরবাদ লইয়াই পুরাণ ইতিহাস; হিন্দুর কোন্ পুস্তকে যে জন্মান্তরবাদ নাই, আমরা তো তাহা খুঁজিয়া পাই না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের চসমা চক্ষে লাগাইয়া হিন্দু পুস্তকের ও হিন্দুমতের আলোচনা করিতে যান, তাঁহারা কেবল জন্মান্তরবাদ কেন, দশহরা গঙ্গাস্নান হইতে ক্ষেত্রপালের পূজা পর্য্যন্ত সমস্তই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রস্তাবে তাঁহাদের সহিত আমার কোন বিচার বিতর্ক নাই। আপ্তবাক্য ছাড়িয়া দিয়া যুক্তি-তর্কবলে আমি এ প্রস্তাবে জন্মান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহি। হিন্দুর বেদ যেমন ঈশ্বরের স্বরচিত পুস্তক, হিন্দুরা বেদের উপরে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন, মুসলমানেরাও সেইরূপ কোরাণ সরিফের উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বেদে ও বেদমূলক-শাস্ত্রে যেমন জন্মান্তরের কথা আছে ও জন্মান্তরের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব আপত্তির খণ্ডন হইয়াছে, সেইরূপ মুসলমানের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণসরিফে যখন জন্মান্তরের কথা নাই, তখন কি করিয়া জন্মান্তরে আস্থা স্থাপন করা যাইবে? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কোরাণ সরিফ অবতরণের অনেক পূর্ব্বে বেদের অবতরণ হইয়াছে, কোরাণ সরিফে বেদোক্ত যে যে মতের খণ্ডন হইয়াছে, মুসলমানসম্প্রদায় অবশ্য সেই সেই বেদোক্ত-বাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। আর কোরাণ সরিফের দ্বারা বেদোক্ত যে যে বাদ খণ্ডিত হয় নাই, সেই সেই বাদ অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। "অপ্রতিষিদ্ধ মনুমতং ভবতি" যে মতের প্রতিষেধ করা হয় নাই, নবীন শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তেরও সেই প্রাচীন মত অনুজ্ঞাত ও অভিপ্রেত। ইহা কেবল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়ম নয়, মুসলমান শাস্ত্রেরও এই সিদ্ধান্ত। আমিরি পয়গাম্বর মহাত্মা মহম্মদের নিকটে কোরাণ সরিফে যে যে সুরার অবতরণ হইয়াছে, তাহা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পয়গাম্বরের নিকটে অবতীর্ণ যে যে সুরা নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সেই সুরার ব্যবস্থা অবশ্য মুসলমানদিগের নিকটে গ্রহণীয় নহে। আর যে সকল সুরা নিরাকৃত হয় নাই, পূর্ব্বোক্ত সেই সেই সুরা মুসলমানদিগের অবশ্য পালনীয় ও পূজনীয়।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, "অবতারাহ্য সংখ্যেয়াঃ"—অবতারের সংখ্যা নাই। মুসলমান-শাস্ত্রে অবশ্য অবতারের (পয়গাম্বরের) সংখ্যা আছে, কিন্তু এত অধিক সংখ্যা শাস্ত্রে কথিত যে, মুসা প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র শাস্ত্রোল্লিখিত পয়গাম্বরের দ্বারা সেই সংখ্যার কোনও ক্রমে পূরণ হয় না। কোরাণসরিফে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, যে দেশের অধিবাসীরা যে ভাষায় অভিজ্ঞ, সেই দেশে সেই ভাষা-ভাষী পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছে।* সুতরাং বলিতে পারি ভারতবর্ষের জন্য সংস্কৃত-ভাষা-ভাষী পয়গাম্বর আসিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। মহম্মদের নিকটে অবতীর্ণ আরবী ভাষায় নিবদ্ধ সুরার আদরের ন্যায় হিব্রু ভাষায় লিখিত সুরারও যখন মুসলমানের নিকট পূজা আছে, তখন সংস্কৃতে লিখিত বেদেরও আদর পাইবার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের নিকটে আবদার করিতে পারি। পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফেও জন্মান্তরবাদ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অনেকেরই বিশ্বাস, কোরাণসরিফের মতে আত্মার জন্ম আছে, বিনাশ নাই ও জন্মান্তর নাই। এই যে মাতৃগর্ভ হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, এই তাহার আত্মার প্রথম জন্ম, আর দ্বিতীয় জন্ম নাই, ইহার পূর্ব্বে এই আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহারা এই মতের পোষকতার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত আয়েত (বচন) উদ্ধৃত করেন।

দহরকাল নাম ছিয়াত্তর সুরা—

১। "ইহা নিশ্চয় যে মানবজাতির উপর দিয়া অনন্তকালের এমন এক সময় চলিয়া গিয়াছে যে, তৎকালে সে কিছুই ছিল না।"

২। "আমি নানা উপাদান মিশ্রিত রেতঃবিন্দু হইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি"।

মুরশলাত ৭৭ সুরা—

২০। "আমি কি তোমাদিগকে অতি তুচ্ছ জলবিন্দু হইতে গঠিত করি নাই?"

অলক মাংসপিণ্ড নাম ৯৬ সুরা—

২। "মানবকে তিনি ঘনীভূত রক্ত হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন।"

৩। তিন পর্ব্বত নাম ৯৫ সুরা—

৪। "ইহা সত্য যে আমি মনুষ্যজাতিকে অতি সুন্দর উপাদানে সৃজন করিয়াছি।"

অবস—অসন্তোষ প্রকাশ হইল নামক ৮০ সুরা।

১৯। "রেতঃ হইতে তিনি তাহাকে গঠিত করিয়াছেন।"

আমরা পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফ হইতে এই সকল উদ্ধৃত প্রমাণ ও এতৎ সমানার্থ অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়া বলিতে পারি না, কোরাণ সরিফের মতে আত্মার উৎপত্তি আছে। ঈশ্বর মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত। তিন পর্ব্বত নামক ৯৫ সুরাতে স্পষ্টতঃ লিখিত রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "আমি সুন্দর উপাদানে মনুষ্যজাতিকে সৃজন করিয়াছি।" এই বচনস্থ উপাদান শব্দের অর্থ উপাদানকারণ। উপাদান কারণেরই নামান্তর সমবায়িকারণ। কার্য্যের সহিত যে কারণের নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকেই সমবায়ি কারণ বলে। যেমন বস্ত্রের উপাদান কারণ বা সমবায়ি কারণ সূত্র। এক্ষণে জানা আবশ্যক, আত্মার সমবায়ি কারণ (বস্ত্রের সূত্রস্থানীয় কারণ) কি? এই সঙ্গে আবার জিজ্ঞাস্য আত্মা কোন্ পদার্থ।—দ্রব্য (Matter), গুণ (Attribute) বা কর্ম্ম (Action)? সংযোগে দ্রব্যরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যেমন সূত্রসমষ্টির সংযোগে বস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই সংযোগের ধ্বংসে আবার সেই কার্য্যের ধ্বংস হয়। যেমন সূত্র সমষ্টির সংযোগের ধ্বংস হইলে বস্ত্রেরও ধ্বংস হইয়া যায়। প্রাগুক্ত বচনে আছে, রেতঃ বিন্দু ও শোণিতে মানবের জন্ম হইয়াছে।

* হজরত ইসার হানকরী মোহন বলিতেছেন, আমি আমাদের মধ্যে অন্য এক দূতকে দেখিলাম, তাঁহার নিকট সকল জাতীয় সকল বংশীয় ও সকল ভাষায় কথোপকথন কারীদিগকে সুসমাচার জানাইবার নিমিত্ত ইত্যাদি।

বুঝিতে হইবে, এই উভয়বিধ পদার্থের সংযোগে যদি আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে আবার তাহার সংযোগে ধ্বংস হইলে আত্মারও ধ্বংস হইতে পারে। এটী দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য; ইহার ব্যভিচার হয় না। মানব শরীর অবশ্য কার্য্য, তাহার সমবায়ি কারণ পরমাণুসমষ্টি, সেই পরমাণু-সমষ্টির সংযোগে শরীরের উৎপত্তি হয় এবং পরমাণু-সমষ্টির ধ্বংসে শরীরের ধ্বংস হয়। আত্মাও যদি শরীরের ন্যায় জন্য দ্রব্য হইত, তবে ঐ প্রক্রিয়ায় শরীরের ধ্বংসে আত্মারও ধ্বংস হইত, ইহা স্বীকার করিবার সম্ভাবনা নাই। আত্মার ধ্বংস স্বীকার করিলে কেয়ামতের দিবস শরীরান্তর গ্রহণ হইবে কাহার? আর আত্মা যদি দ্রব্য না হইয়া গুণ বা ক্রিয়া হয়, তাহা হইলেও কোনরূপ উপপত্তি হয় না। রূপ প্রভৃতিকে গুণ ও স্পন্দন প্রভৃতিকে ক্রিয়া বলে। এ উভয়েই দ্রব্য-সমবেত, উভয়ের মধ্যে কেহই দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে অবস্থিতি করে না। দ্রব্য নাই, দ্রব্যরূপ আধার নাই, গুণ ক্রিয়া আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত কেহই দেখাইতে পারিবেন না। আশ্রয়-দ্রব্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি গুণ আর ক্রিয়া উৎপত্তির পরে অল্পক্ষণ থাকিয়াই আপনা আপনি বিনষ্ট হয়। আত্মার যখন কেয়ামৎ আছে, মহাবিচার আছে, তখন কি করিয়া মানব-আত্মাকে গুণ বলিব? ক্রিয়া বলিব? পক্ষান্তরে যে ভাব-পদার্থের উৎপত্তি আছে, নিশ্চয় তাহার বিনাশ আছে। ইহাও ন্যায়ানুমত। উৎপত্তি আছে, বিনাশ নাই এরূপ ভাব-পদার্থের সত্ত্বা আমরা জানি না, দার্শনিকগণ জানেন না, বৈজ্ঞানিকগণ জানেন না। সুতরাং উহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ—সকলেই মানবের উৎপত্তির কথা, আদিম মনুষ্য স্বায়ম্ভুবমনুর উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়াও আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আদিমের উৎপত্তি বা "আদমের" উৎপত্তি এক কথা। কোরাণ সরিফে যেরূপ শুক্র-শোণিত হইতে মানবের উৎপত্তি আছে, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি পুস্তকেও সেইরূপ শুক্র-শোণিত হইতে মানবের উৎপত্তির কথা আছে। "মানব" বলাতে আত্মা নয়, মানবীয় শরীর। শরীরই শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন, সংযোগেই শরীরের উৎপত্তি, সংযোগ ধ্বংসেই তাহার ধ্বংস। পূর্ব্বোল্লিখিত অলফ-মাংস পিণ্ড নামক ৯৬ সুরার তৃতীয় বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে আছে যে, "যে মানব আত্মাতে তিনি মহোন্নতির অসীম শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, সে মানবকে তিনি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটী পবিত্র কোরাণ সরিফের কথাই হউক, অথবা টীকাকারের কথাই হউক, ফল "মানব-আত্মা" বলাতে আত্মা মানব নহে বুঝা যাইতেছে। "রাজগৃহ" বলিলে আমরা কি বুঝি? রাজার গৃহ রাজ-গৃহ এইরূপ বুঝি। এখানে "মানব-আত্মা" এই পদেরও মানবের আত্মা, মানব-আত্মা এইরূপ বুঝি রাজগৃহ এই পদে আরও বুঝি রাজা ও গৃহ এক নয়। "রাজ-গৃহ" ও "মানবআত্মা" ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। ষষ্ঠীর অর্থ সম্বন্ধ। সম্বন্ধ বলিলেই দুইটী পদার্থের উপস্থিতি হয়। এক পদার্থে অভিন্ন পদার্থে সম্বন্ধ হয় না। "মানব-আত্মাতে তিনি মহোন্নতির অসীম শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন" বলাতে শক্তি দানের পূর্ব্বেও মানব-আত্মার বিদ্যমানতা বুঝা যায়। অবশ্য এই অংশটী কোরাণসরিফের বঙ্গানুবাদক বন্ধনীর ভিতরে নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং উহা আয়েতের অংশ নয়। আমি ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাননীয় মৌলবী তছলিম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল, মহোদয়কে

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তিনি কোরাণ সরিফের কথায় কথায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে, তাহাও প্রামাণিক টীকাকারদিগের মত। এস্থলে টীকাকারের বা ব্যাখ্যাকর্ত্তার ভ্রম আছে মনে করা যাইতে পারে না। দহরকাল নামক ৭৫ সুরার প্রথম আয়েতে আছে, "ইহা নিশ্চয় যে মানব জাতির উপর দিয়া অনন্তকালের এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে সে কিছুই ছিল না।" "সে কিছুই ছিল না" সে কথা পরে বিচার্য্য। "ইহা নিশ্চয় যে মানব জাতির উপর দিয়া এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে" এই অংশের অর্থ কি? ইহাও নিশ্চয় যে যাহার উপর দিয়া সেই সময় চলিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে সেও ছিল। সে না থাকিলে তাহার উপর দিয়া কোন কিছু চলিয়া যাইতে পারে না। আমার মাথার উপর দিয়া পাখী চলিয়া গেল বলিলে, যেমন সে সময়ে পাখিটী চাই, সেইরূপ সে সময়ে আমার মাথাটীও চাই, আমিও চাই; সেইরূপ যাহার উপর দিয়া সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন চাই, তেমনি যাহার উপর দিয়া সময় চলিয়া গিয়াছে, সেও সেই সময়ে চাই। কাজে কাজেই বলিতে হইবে, অনাদি অনন্ত সময়ের মধ্যে যে সময় চলিয়া গিয়াছে, সে সময়েও মানবজাতি ছিল। সময়ের যেমন আদি নাই, সেই পর্য্যন্ত মানবজাতি থাকিলে তাহারও তেমনি আদি নাই। সুতরাং তাহার সৃষ্টি হয় নাই। অবশ্য অনাদি সময় হইতে মানবজাতি আছে বলিয়া, পূর্ব্বে যে কিছুই ছিল না বলাতে, এই আয়েতের পূর্ব্বাংশের সহিত পরাংশের সামঞ্জস্য হয় না।

অসামঞ্জস্য হইলে, পূর্ব্বাপরের বিরোধ হইলে, লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ বলে, আনন্দের মৃত্যুর পরে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমরা এই বাক্যের কি অর্থ বুঝিব? আনন্দ বলিলে আমরা বুঝি আনন্দের দেহ-বিশিষ্ট তাহার আত্মা, বা আনন্দের আত্মবিশিষ্ট তাহার দেহ। আনন্দের মৃত্যুর পরে আনন্দের আত্ম-বিশিষ্ট দেহের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। সুতরাং মৃত্যুর পরে আনন্দকে দেখিয়াছি তাহার অর্থ, আনন্দের মৃতদেহকে দেখিয়াছি। লক্ষণার আশ্রয়ে এইরূপ অর্থ করা হইয়া থাকে। এ স্থলেও সেইরূপ মানব জাতি ছিল, ইহার অর্থ, মানবজাতির আত্মসমূহ ছিল। কিছুই ছিল না অর্থ, সেই আত্মসমূহের হস্ত, পদ কিছুই ছিল না, তাৎপর্য্য দেহ ছিল না। পবিত্র পুস্তক কোরাণ সরিফে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টির কথা আছে, সপ্তস্বর্গ, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টির কথা আছে, অগ্নি, বায়ু, জলের সৃষ্টির কথা আছে, কৈ আত্মার সৃষ্টির কথা তো কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বকরা সুরার ২৮ আয়েতে আছে, "তোমরা নির্জ্জীব ছেলে, খোদাতালা তোমাদিগকে জীবনদান করিয়াছেন"। দান অর্থ সৃষ্টি নয়, শরীরের ভিতরে জীবকে আত্মাকে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বা জীবাত্মাকে চৈতন্য বুদ্ধি-বৃত্তি দান করা, ইহার তাৎপর্য্য। আদমের সৃষ্টির সময়েও মৃণ্ময় মূর্ত্তির ভিতরে খোদার আজ্ঞায় আত্মা প্রবেশ করিয়াছিল, এইরূপ স্পষ্ট আছে। এই সকল কারণেও কোরাণ সরিফের মতে আমরা আত্মা অনাদি বিশ্বাস করি। মুসলমান মাত্রেই আত্মা অবিনশ্বর স্বীকার করেন; সুতরাং সে জন্য আর প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস মৃত্যুর পরে সমস্ত আত্মা গোরের ভিতরে অজ্ঞেয়ভাবে অবস্থিতি করে। একদিন সকলেরই মহাবিচার হইবে। সেই দিন সেই মহাবিচারের দিনে সমস্ত আত্মা আমার নবশরীর গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইবে। সেই দিনের মহাবিচারে পুণ্যবান্

অনন্ত স্বর্গও পাপী অনন্ত নরক লাভ করিবে। পুণ্যবানেরও আর পতন নাই, পাপীরও আর উত্থান বা উদ্ধার নাই। পবিত্র কোরাণ সরিফে সর্ব্বত্র পুনরুত্থানের, শরীরগ্রহণের কথা আছে। আমরা জন্মান্তরবাদী, মৃত্যুর পরে আমরাও পুনরুত্থানের কথা বলি, শরীরান্তর গ্রহণের কথা বলি। আত্মার শরীর গ্রহণের নামই জন্ম। মৃত্যুর পরে যখন অন্যের শরীরান্তর গ্রহণ আছে, তখন মুসলমানদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, আত্মার আত্মান্তর গ্রহণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আত্মার অনন্তবার জন্ম হইয়াছে, আবার অনন্তবার জন্ম হইবে, মুসলমানদিগের সহিত এই স্থানেই হিন্দুদিগের মতবিরোধ। তাঁহাদিগের মতে মৃত্যুর পরে একবারমাত্র শরীরান্তর গ্রহণ ও একবারমাত্র এক দিনে সমস্ত আত্মার মহাবিচার। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রত্যেক আত্মার মৃত্যুর পরেই বিচার হয়। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, মুসলমানদিগের এই বিশ্বাস পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ সরিফের মতানুযায়ী কি না। বকরা সুরার ৯৪ আয়েতে আছে যে, "বল যদি খোদাতালার নিকট অন্য লোক ব্যতীত তোমাদের জন্যই পরকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু ইচ্ছা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হ'ও"। বকরা সুরার ১৫৪ আয়েতে আছে, "যাহারা খোদাপথে মারা গিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা মৃত্যু বলিও না, বরং তাহারা জীবিত। কিন্তু তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না"। বকরা সুরার ১৬৪ আয়েতের তৃতীয় বচনের ব্যাখ্যায় আছে, তাহারাই খোদা সাক্ষাতের জন্য মৃত্যু কামনা করে। কোরাণ সরিফের এই সমস্ত ঈশ্বরীয় বাক্য হইতে আমরা কি বুঝিব? মৃত্যুর পরে যদি পাপী, পুণ্যবান্ সকলের পক্ষেই বিচারের জন্য তুল্যভাবে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচারের অপেক্ষা করিতে হয়। তবে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু কামনীয় অর্থ কি? দুই বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইলেও যাহা, দুই বৎসর পরে মৃত্যু হইলেও তাহা, সেই নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতীত, সেই দিনের মহা বিচার ব্যতীত, পুণ্যবানের ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হইবে না, সেইজন্য বলিতেছিলাম, একটী মাত্র দিনে সর্ব্বসাধারণের মহাবিচার হইবে না, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর পরে মহাবিচার হইবে। তাহা হইলে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা সঙ্গত হয়। মৃত্যু না হইলে ঈশ্বরের সন্নিধিলাভ হয় না, কেবল অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া দুঃখময় জগতে অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যু না হইলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিয়া অবিনশ্বর, অবিশ্রান্ত সুখ-সাগরে মগ্ন হইতে পারা যায় না। ঈশ্বর-প্রেমিকের পক্ষে, পুণ্যাত্মার পক্ষে মৃত্যুর পরেই সেই অধিকার লাভ হয়। সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে মৃত্যু কামনা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে; যে বকরা সুরার ১৪৮ আয়েতে আছে যে, "যে স্থানে তোমরা থাকিবে, তোমাদিগকে খোদাতালা একত্র করিবেন, মরশলাত সুরার ৩৮ আয়েতে আছে "এই দিবস পুণ্যাত্মাদিগকে পাপাত্মগণ হইতে এবং ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ করা হইবে, ইহাই বিচারের যুগ, দিবস।" "আমি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী দিগকে একত্রিত করিব" এই পূর্ব্বোক্ত দুইটী আয়েতে ও এই আকারের অনেক আয়েতে এক দিবসে যে সকলের মহাবিচার হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে আমরা এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, উল্লিখিত আয়েতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়েতে যে "পূর্ব্ববর্ত্তী" শব্দ আছে, তাহার অর্থ কি? বিচার-ক্ষেত্রে ত সকলেই এক সময়ে উপস্থিত হইবে; তবে আর পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী থাকিল কি করিয়া? যাহার অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়, তাহা হইলে অগ্রে পাপীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত পরবর্ত্তী-কালের মৃত পুণ্যাত্মার, আবার অগ্রে পুণ্যাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সহিত পরবর্ত্তী সময়ের মৃত পাপীর সমবেত করিবার সম্ভাবনা। অবশ্য পবিত্র কোরাণ সরিফের সেরূপ অর্থ নয়। যাঁহারা পুণ্যবলে স্বর্গে উন্নীত হইয়াছেন, তোমাদিগের যদি সেইরূপ পুণ্যবল থাকে, তবে তোমাদিগকেও স্বর্গে সেইরূপ উন্নীত করিব, তাঁহাদিগের সহিত তোমাদিগকে মিলিত করিব। পাপীর সম্বন্ধেও সেইরূপ একই কথা, যাহারা পূর্ব্বে নরকে পাতিত হইয়াছে, তোমরা পাপী হইলে তোমাদিগকেও সেই নরকে পাতিত করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত করিব, কোরাণ সরিফের এইরূপ অর্থই বোধ হয় ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসঙ্গত।

"তোমরা যে স্থানে থাকিবে খোদাতালা তোমাদিগকে একত্র করিবেন" একত্র করিবেন কোন্ স্থানে? শব্দশাস্ত্রে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন "যদ্" বলিলে সঙ্গে সঙ্গে "তদ্" শব্দের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। "তদ্" বলিলেও সেইরূপ "যৎ" শব্দের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। একটী আছে, অপরটী নাই, এরূপ স্থলেও সেই পদের অধ্যাহার (উহ্য) করিতে হয়। এখানে যখন "যে স্থানে" বলাতে "যদ্" শব্দ আছে, তখন আপনা আপনি "যদ্" শব্দের বিভক্তি লইয়া তৎশব্দের উপস্থিতি হইবে। শব্দবিজ্ঞানের এই নিয়ম, সুতরাং এই আয়েতের অর্থে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তোমরা যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানেই খোদাতালা তোমাদিগকে একত্র করিবেন। তাৎপর্য্য তোমরা যে স্থানেই কেন থাক না, যে স্থানেই কেন জন্মগ্রহণ কর না, পাপী হইলে পাপীদিগের সহিত, পুণ্যাত্মা হইলে পুণ্যাত্মাদের সহিত মিলিত হইবে, "ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ করা হইবে।" ইহারই বা অর্থ কি? পুণ্যাত্মা হইলেই যদি অনন্ত স্বর্গভোগ হয়; তবে ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা বলিয়া লাভ কি? আমরা কিন্তু এই আয়েতের অন্যরূপ অর্থ বুঝি। একান্ততঃ কেহই পুণ্যবান্ হয়েন না, একান্ততঃ কেহই পাপী হয় না। পাপ পুণ্য লইয়াই মনুষ্য-জীবন, পুণ্যবান্ হইলেও জীবনে একেবারে তাঁহাকে পাপস্পর্শ করে নাই, ইহা হইতে পারে না। পাপী হইলেও জীবনে কখনই সে পুণ্যানুষ্ঠান করে নাই, ইহাও হইতে পারে না। পুণ্যাধিক্য হইলেই মনুষ্য পুণ্যাত্মা নামের অধিকারী হন, পাপাধিক্য হইলেই মনুষ্য পাপী নামে অভিহিত হয়। সামান্য একটুকু পাপ করিল, আর তাহার অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা হইল, সামান্য একটুকু পুণ্য করিল, আর তাহার অনন্ত স্বর্গভোগের ব্যবস্থা হইল; ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের এরূপ বিসদৃশ বিচার হইতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি পাপ পুণ্য উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছে, পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফের মতে তাহার জন্য কোন্ লোকের ব্যবস্থা হইবে? তাহার পক্ষে স্বর্গবাস হইলেও অনন্তকালের জন্য হইতে পারে না; কোরাণসরিফে যে স্বর্গের বর্ণনা আছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায়, স্বর্গে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। নরকের বর্ণনা দেখিয়াও বুঝা যায়, নরকেও ক্ষণিকামাত্র সুখ নাই। সুতরাং পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গভোগ ও নরকভোগ না হইলে কোনক্রমেই উপপত্তি হয় না। পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গভোগ ও নরকভোগ বলিলে আবার কোরাণ সরিফে যে স্পষ্টতঃ অনন্ত স্বর্গ ও নরক আছে, কি করিয়া তাহার অর্থ হয়? এই আয়েতটী বুঝাইবার জন্য আমি এস্থলে আরও দুইটী

আয়েত উদ্ধৃত করিতেছি। বক্‌রা সুরার সপ্তম আয়েতে আছে যে, "খোদাতালা তাঁহাদিগের অন্তরে মোহর করিয়াছেন ও কর্ণে মোহর করিয়াছেন। আর তাহাদের চক্ষে আবরণ আছে" টীকাকার বলিয়াছেন, "তাহাদের অন্তরে মোহর থাকা প্রযুক্ত অন্তরে সত্য কথা প্রবেশ করে না, কর্ণে মোহর থাকা বিধায় সত্য কথা শুনিতে তাহারা বধির।" চক্ষে আবরণ নিবন্ধন সত্য পথ দেখিতে তাহারা অন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। দহর সুরার ৩০ আয়েতে আছে "কিন্তু আল্লাই যাহা ইচ্ছা করেন তাহার অন্যরূপ তোমরাও ইচ্ছা কর না" ঈশ্বর যদি চক্ষে ও কর্ণে ও অন্তঃকরণে আবরণ দিয়া কোন কোন মানবকে সৎপথ বুদ্ধিতে বাধা দেন, তবে আর তাহার জন্য সেই সেই মানবকে কেন দণ্ড ভোগ করিতে হয়? যদি মানবের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়িনী হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে যদি মানবের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলেই বা কেন পাপীর পক্ষে ঈশ্বরের দণ্ডের ব্যবস্থা? এই গভীর তত্ত্বটী বুঝিতে হইলে গভীর আলোচনার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনাদি, কাল অনাদি। সেই অনাদিকাল হইতে আত্মা আছে। আত্মা থাকিলেই আত্মার গুণ, ইচ্ছা ও সংস্কার প্রভৃতিও আত্মাতে আছে। যাহা হউক এ কথাগুলি পরে বক্তব্য। একটী উদাহরণ দেখাইলে এই আয়েতটীর স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন না, মৎস্য মাংসের গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা পলাণ্ডু ভক্ষণ করেন না, পলাণ্ডুর তীব্র গন্ধে তাঁহাদিগের নাসায় অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেই মৎস্য মাংস বর্জ্জন ও পলাণ্ডু বর্জ্জনকে কুসংস্কার মনে করিয়া মৎস্য, মাংস ও পলাণ্ডু ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে ঐ বস্তুত্রয়ে তাঁহাদিগের এত আসক্তি জন্মে যে, এক বেলাও ঐ বস্তুত্রয় ভিন্ন তৃপ্তির সহিত আহার হয় না। কোন দিন যে ব্যক্তি মদ্য স্পর্শ করে নাই, মদ্যপায়ী বন্ধুর একান্ত অনুরোধে সে এক দিন অতি অল্প পরিমাণে মদ্য পান করিয়া ক্রমে সেই মদ্যপায়ী বন্ধুকেও মদ্যপানে পরাস্ত করিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কি পুণ্যকর্ম্ম, কি পাপকর্ম্ম, যাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই আসক্তি জন্মিবে। আসক্ত হইলে আবার সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পাপ কর, পাপের প্রলোভনে তুমি উন্মত্ত হও, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি পাপী, তুমিও সেই পাপের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পার না। সুতরাং "ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তোমরাও তাহার অন্যরূপ ইচ্ছা করিতে পার না।" ঈশ্বর কেন পাপীকে পাপানুষ্ঠানে পাতিত করেন, ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য, পাপী যে কিঞ্চিৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল, এই পাপে পাতন তাহারই শাস্তি। যে যাহা চায়, তাহাকে ঈশ্বর তাহাই দেন। পাপে পাতনের নামই নরকে পাতন। ইহাই পাপের নরকভোগ। এই নরকভোগের শেষ হয় না। বাসনাবশতঃ উত্তরোত্তর পাপীর নরক বৃদ্ধি হয়। পাপী পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিতেও পারে না, তীব্র বাসনাও তাহার অন্তর্হিত হয় না। এক জন্মে কেন, শত শত জন্মেও ইহার পরিহার হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে জলের এক নাম "জীবন" দেখিতে পাই। আবার অনেকে বলেন, "অন্নই প্রাণ।" জীবন ধারণের কারণ বলিয়া জলের নাম "জীবন" হইয়াছে। প্রাণ ধারণের কারণ বলিয়া "অন্নই প্রাণ" বলা

হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ নরক ক্লেশের কারণ বলিয়া কোরাণ সরিফে পাপকেই নরক বলা হইয়াছে। কোরাণ সরিফের এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এই কথাটী বুঝাইবার নিমিত্তই তাহাতে অনন্ত নরকের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনন্ত স্বর্গও এইরূপ। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই সেই সংস্কারবশতঃ ক্রমে তাহাতে মানবের প্রবৃত্তি হয়, আবার অনুষ্ঠান হয়, আবার প্রবৃত্তি হয়, এই ভাবে পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গসুখের আস্বাদ গ্রহণ করেন। কোরাণ সরিফের এইরূপ অর্থই বোধ করি সঙ্গত। তাহা না হইলে স্বর্গের বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া দহর সুরার যে আঠার আয়েতে "জঞ্জবীল বারি যাহা সন্‌সবীল নামে খ্যাত" আছে, একথার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহম্মদ "সন্‌সবীল" শব্দের অর্থ "সৎপথ প্রদর্শনকারিণী স্রোতস্বিনী" লিখিয়াছেন। স্বর্গে আবার সৎপথ প্রদর্শনের আবশ্যকতা কি? স্বর্গেও কি সৎপথ, অসৎপথ আছে? থাকিলে স্বীকার করিতে হইবে, সেখানেও সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম আছে। সৎকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম থাকিলে আবার স্বীকার করিতে হইবে, সৎকর্ম্মের ফল পুরস্কার, অসৎকর্ম্মের ফল তিরস্কার আছে। সুতরাং স্বর্গেও পাপ, পুণ্য আছে। পাপ, পুণ্য থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবীতে পার্থক্য কি? আমরা যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করিতেছি, এইরূপ অনন্তকোটী ভূপৃষ্ঠ আছে, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডে হউক, আর অন্য ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, পাপ-পুণ্যের ভোগের জন্য আত্মার আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্মে যে সংসর্গ-বশতঃ বা অন্য কারণে প্রথম পাপে বা প্রথম পুণ্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাও তো পূর্ব্বোক্ত আয়েত অনুসারে ইচ্ছা ভিন্ন হয় নাই, তাহারই বা কারণ কি? কারণ, ঐ আত্মার যে প্রথম পাপে বা প্রথম পুণ্যে প্রবৃত্তি দেখিতেছি, ইহাও প্রথম প্রবৃত্তি নয়। প্রথম প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে সেই প্রথম প্রবৃত্তিটী ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী হয় নাই, ইহা বলিতে হয়। কোরান্ সরিফ ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে, জন্মান্তরে এই আত্মার এই কার্য্যে অনুষ্ঠান ছিল। সেই জন্য সংস্কার হইয়াছে, সংস্কার ছিল বলিয়াই আবার ইহজন্মে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সেই জন্মের সেই কর্ম্মেও জন্মান্তরের কর্ম্মজন্য সংস্কারবশতঃ সেই আত্মার প্রবৃত্তি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বজন্মেও আবার জন্মান্তরের কর্ম্মজন্য সংস্কারবশতঃ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই ভাবে ক্রমে চলিলে বুঝা যাইবে, আত্মার জন্মেরও আদি নাই, সুতরাং ঈশ্বর যে পাপীকে পাপে ও পুণ্যাত্মাকে পুণ্যে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে ঈশ্বরের সেইরূপ ইচ্ছাতে পক্ষপাতিতা বা যথেচ্ছাচারিতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, অনাদিকাল হইতে আত্মা আছে বলিয়া আত্মা অনাদি, এক্ষণে এই আয়েত দুইটী দেখিয়া স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, আত্মার জন্ম, শরীর পরিগ্রহও অনাদি। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, কোরান্ সরিফের নরকে সুখের লেশ নাই, স্বর্গেও দুঃখের বিন্দুমাত্র নাই, তাহার মীমাংসা কি করিয়া হয়? ঈশ্বরের বাক্য কি করিয়া সত্য হয়? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, সুখ থাকে থাকুক, দুঃখ না থাকে না থাকুক, তাহা দ্বারা কিছু আসে যায় না। দুঃখের উপলব্ধি ও সুখের অনুভূতিরই হইতেছে কথা। এক সময়ে দুইটী পদার্থের অনুভূতি হয় না, এইটী দার্শনিক সত্য, সুতরাং সুখানুভূতির সময়ে দুঃখানুভূতি হয় না। দুঃখানুভূতির সময়ে সুখানুভূতি হয় না।

পুত্র জন্মিল মানুষের সুখ হইল, সুখ হইল অর্থ সুখানুভূতি হইল। আবার পরক্ষণেই সেই পুত্রটীর বা অন্য আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি হইল। ঠিক সেই সুখানুভবের সময়ে দুঃখানুভব হয় নাই। যে জাতীয়ই কেন সুখ হউক না, তাহার অনুভবের সময়ে যখন বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকে না, তখন স্বর্গে দুঃখ নাই বলাতে দোষ হয় নাই। যে জাতীয়ই কোন দুঃখ হউক না, তাহার অনুভবের সময়ে যখন বিন্দুমাত্র সুখের অনুভব হয় না, তখন নরকে বিন্দুমাত্র সুখ নাই বলাতে দোষ হয় নাই। এই মানব জীবনে যখন প্রত্যেকেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখের ভোগ হইতেছে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি, তখন এই মানবজীবনকে বা এই ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে স্বর্গ নরক বলিতে পারি। আমরা যখন আরও অনন্তবার জন্মগ্রহণ করিব, তখন অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক বলাতে দোষ হয় নাই। সুখী ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায়, দুঃখী ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে সুখভোগ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে তাহাদিগের সুখদুঃখের তারতম্য হইয়াছে বলিতে হইবে। আর বলিতে হইবে, এই জন্যই কোরান্ সরিফে ঈশ্বর বলিতেছেন, "ভিন্নশ্রেণীর পুণ্যাত্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্ পৃথক্ করা হইবে।" এক সময়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সে সময়ে দাউল চাউল কিনিতে মানুষের আয়ে কুলাইত না, আর মাছ দুধ কিনিবে কি করিয়া? সেইজন্য গয়লা ও জেলেদের বড় কষ্ট হইয়াছিল, জেলেদিগের মধ্যে একটী জেলের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল, সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাহারা স্ত্রী পুরুষ দুইটী মাত্র প্রাণী মাছ পোড়াইয়া ও কচু পোড়াইয়া কোনরূপে দিনপাত করিত। শীতকাল, দুরন্ত শীত, অর্থাভাবে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে নাই, পুরাতন পুকুরের দল শুকাইয়া তাহাই গায়ে দিয়া রাত্রি কাটাইত। এইভাবে একদিন রাত্রিতে দুইজনে শয়ন করিয়াছিল, সেই সময়ে জেলেনী জেলেকে বলিল, তুমি বলিতে পার আমাদের অপেক্ষা জগতে দুঃখী কে আছে? জেলে রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, আমাদের অপেক্ষা জগতে দুঃখী কে আবার আছে? দুঃখের সময়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। জেলেনী হাসিয়া বলিল, তুমি বলিতে পারিলে না, কেন, রাণী ভবানী। রাণী ভবানী আমা অপেক্ষা দুঃখী। আমার তুমি আছ, রাণী ভবানীর স্বামী নাই। এই গল্পটীতে আমরা একটী মহামূল্য উপদেশ পাইতেছি। জগতে কেহই একান্ততঃ দুঃখী, কেহই একান্ততঃ সুখী নাই। যখন দুঃখানুভূতির সময়ে সুখানুভূতি হয়না, সুখানুভূতির সময়ে দুঃখানুভূতি হয় না, তখন সুখানুভূতির সময়ে স্বর্গভোগ, দুঃখানুভূতির সময়ে নরক ভোগ প্রত্যেক নরনারীর হইতেছে। আবার অনন্তজন্ম পর্য্যন্ত মানবের সুখদুঃখভোগ আছে, সুতরাং ক্ষুদ্র পুণ্যেরও জন্য অনন্ত স্বর্গ ও ক্ষুদ্র পাপেরও জন্য অনন্ত নরকভোগ হইতেছে। ক্ষুদ্র পুণ্যানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বশতঃ—আবার মানবের তাদৃশ পুণ্যে প্রবৃত্তি, ক্ষুদ্র পাপানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বশতঃ আবার তাদৃশ পাপে প্রবৃত্তি হয়; সুতরাং সেই সেই পুণ্যের ফলে সেই প্রকার সুখ স্বর্গ ও সেই সেই পাপের ফলে সেই প্রকার দুঃখ নরক পুনঃ পুনঃ হইতেছে। পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সুখদুঃখের তারতম্য হইতেছে, স্বর্গনরকেরও তারতম্য হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত আয়েতের অন্য প্রকার অর্থ করিলে কোন প্রকারে উপপত্তি হয় না? পূর্ব্বাপরে বিরোধ থাকিয়া যায়, ন্যায়পর ঈশ্বরের উপরে যথেচ্ছাচারিতা দোষের আরোপ করিতে হয়।

কোরাণোক্ত সপ্ত স্বর্গের ও স্বর্গের সোপান শ্রেণীরও উপপত্তি হয় না। নিম্নস্তরে যে আত্মা বাস করিবে, তাহার উচ্চস্তরের জন্য, নিম্নসোপানে যে আরূঢ় হইবে, তাহার উচ্চ সোপানের জন্য, স্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা হইবে। যতকাল তাহা হইবে, ততকাল সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ সেই আত্মার দুঃখের উপলব্ধি হইবে। সুতরাং স্বর্গেও দুঃখ আছে বলিতে হয়। ইন্‌শকার্ সুরার ১৯ আয়েত "ল তরকবুন্না তবকান্ আন্ তবক্" "নিশ্চয় তোমরা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আরোহণ করিবে" (সাহে কাদেরের অনুবাদ), "এক সোপান হইতে অন্য সোপানে অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আরোহণ করিবে" (মৌলানা আবদুল হক্কের অনুবাদ)।

"এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আরোহণ করিবে" (মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহম্মদের অনুবাদ) এই আয়েতটী হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত স্তবক শব্দের অর্থ পুষ্পগুচ্ছ। তবক্ ও স্তবক শব্দের আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। নিশ্চয়ার্থবাচক "কিল" শব্দের সহিত "ল" শব্দের ও উত্তরণকারী অর্থে প্রযুক্ত "তরক" শব্দের সহিত "তরফ" শব্দের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইজন্য আমরা উভয় শব্দের (স্তবক ও তবক শব্দের) অর্থগত ভেদ নাই, এইরূপ বলিতে কথঞ্চিৎ সাহস করিতেছি। এই আয়েতটির পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬, ১৭, ১৮ ও এই আয়েতের পূর্ব্বাংশ এইরূপ। "আমি রজনীর রক্তিম সময়ের শপথ করিতেছি এবং রজনী এবং যাহা আচ্ছন্ন করে (তাহার শপথ করিতেছি) এবং চন্দ্র যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার শপথ করিতেছি।" এই সকল আয়েতের সহিত যোগ করিয়া তরকা তবকের অর্থ করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মেরই উপলব্ধি হয়। অনুবাদক মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহম্মদ মহাশয় সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভাতের সঙ্গে মৃত্যুকে পুনরায় কেয়ামতের দিবসে জাগরণের তুলনা করিয়া এই আয়েতগুলির বিস্তীর্ণ ও বিশদ অর্থ লিখিয়াছেন। বিশ্বাসী মুসলমান ও হিন্দু ভ্রাতাদিগকে আমি সেই অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সেই তুলনাগুলির সঙ্গে আমি আর একটী তুলনার যোগ করিয়া এই আয়েতগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছি। সে আর কিছুই নয়, সন্ধ্যাকাল যেমন একবারমাত্র হয় না, রাত্রি যেমন একবারমাত্র হয় না, প্রভাত যেমন একবারমাত্র হয় না, চন্দ্রের ক্রমবর্দ্ধন ও ক্রমহ্রাস যেমন একবারমাত্র হয় না, সেইরূপ মৃত্যুও কেবল একবারমাত্র হয় না, জন্মও কেবল একবারমাত্র হয় না, শরীরের ক্রমবর্দ্ধন ও ক্রমহ্রাসও কেবল একবারমাত্র হয় না। সায়ংকালের মত, রাত্রির মত, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতেছে, প্রভাতের মত পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতেছে, চন্দ্রের পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধন ও ক্ষয়ের মত শরীরেরও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধন ও ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ অর্থই বোধ হয় সঙ্গত। ফজর নামক সুরার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আয়েতেও এইরূপ শপথ আছে। তৃতীয় আয়েতে যে "যুগ্ম" ও "অযুগ্ম" সংখ্যার শপথ আছে, তাহার তাৎপর্য্য যুগ্ম ও অযুগ্ম ভিন্ন সংখ্যা নাই। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে অসংখ্যও যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। এই আয়েতের দ্বারা অসংখ্যবার জন্মমরণের কথা বলা হইয়াছে। ফজর সুরার ২৭ ও ২৮ আয়েতে আছে (মরণকালে সাধু আত্মাদিগকে সস্নেহে বলা হইবে) "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা, সানন্দে তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আইস। অতঃপর আমার আজ্ঞাবহদিগের দলে ভুক্ত হও এবং অতঃপর আমার উদ্যানে প্রবেশ

কর।” যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করেন, অবতীর্ণ পুস্তকের আদেশমত কার্য্য করেন, তাঁহারাই যে ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী, তাহাতে সন্দেহ নাই। “তাঁহাদিগের দলে ভুক্ত হও” বলাতে তুমিও তাঁহাদিগের মত ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হও, এইরূপ বুঝাইতেছে। অতঃপর অর্থ ক্রমে ভজন সাধন করিলে “আমার উদ্যানে প্রবেশ করিবে” অর্থ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবে। মৃত্যুর অনেককাল পরেই যদি একসঙ্গে সকলের মহাবিচার হয়, তবে মৃত্যুর পরে সেই বিচারের পূর্ব্বে সাধু আত্মাকে “শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা” বলিয়া কি করিয়া সম্বোধন করা হইল? কি করিয়াই বা ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহীদিগের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার আদেশ প্রচারিত হইল? কি করিয়াই বা পাপীদিগকে মৃত্যুর পরেই বিচারের পূর্ব্বেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইবে?* অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, বিচার করিবার পূর্ব্বেও তিনি সকলের পাপ পুণ্য অবগত। সুতরাং মৃত্যুর পরেই তিনি পুণ্যবান্ ও পাপীদিগকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিতে পারেন। রাখিতে পারেন সত্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞ তাহাও সত্য, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের তবে আবার একটা মহাবিচারের অভিনয় কেন? পূর্ব্বেই তো পুণ্যাত্মার ঊর্দ্ধগতি ও পাপাত্মার অধোগতি নিরূপিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরেই বা কি করিয়া পাপী ও পুণ্যাত্মা স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফল বুঝিতে পারিবে?† মৃত্যুর পরেই সুকৃতি অনুসারে ঊর্দ্ধলোকে, ফেরেস্তাগণের সহিত, দুষ্কৃতি অনুসারে অধোলোকে জীনদিগের সহিত বিচারের পূর্ব্বেই মিলিত হয়।* হিন্দুশাস্ত্রে যেমন কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ উভয়বিধ পদার্থের প্রত্যেকের উপরে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, কোরান্ শরিফের ফেরেস্তা (দেবতা) জীন (অপদেবতা) সেইরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্তঃকরণের সদ্বৃত্তিগুলি ফেরেস্তা, অন্তঃকরণের অসদ্বৃত্তিগুলি সয়তানের সেনা বা জীন। পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে পরজন্মে সদ্বৃত্তির সহবাস, পাপকর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে পরজন্মে অসদ্বৃত্তির সহবাস ভিন্ন ইহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য বোধ হয় না। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ভগবানের সিংহাসন বহন করিবার জন্য চারিটী ফেরেস্তা নিযুক্ত। এ পৃথিবী ধ্বংসের পরে ঈশ্বরের সিংহাসন আটজন ফেরেস্তায় বহন করিবেন, এই হইতেছে কোরান্ শরিফের উপদেশ। মর্ত্ত্যলোক অপেক্ষা পুণ্যাত্মার না হয় স্বর্গে বহুবিধ অবিনশ্বর সুখসমৃদ্ধি লাভ হয় হউক, সেই যুগে ঈশ্বরের জাঁকজমকের প্রয়োজন কি? তাঁহার আটজন বেহারার পাল্‌কির ব্যবস্থা করিয়া কতটা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইবে? কেবল বাহক বৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয় না। সিংহাসনের জাঁকজমক্ চাই, ছত্রদণ্ডের জাঁকজমক্ চাই, পরিচ্ছদের জাঁকজমক্ চাই, কই তাহা তো পবিত্র কোরান্ শরিফে উল্লিখিত হয় নাই? আবার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র তিনি অবস্থিত, সকল পদার্থ তাঁহাতে অবস্থিত, কোরান্ শরিফে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন আবার কি? তাঁহার সিংহাসন বহনই বা কি? পুণ্যাত্মারা ইহজন্মে যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলে চারিজন ফেরেস্তা তাঁহাদিগের নিকটে ঈশ্বরকে ইহজন্মে উপস্থিত করেন, আবার আগামী জন্মে সেই সকল পুণ্যাত্মার নিকটে আটজন ফেরেস্তা ঈশ্বরকে উপস্থিত করিবেন, তাৎপর্য্য ক্রমে সদ্বৃত্তিগুলি সৎকর্ম্মের ফলে ঈশ্বরাভিমুখী হইবে, তাহার ফলে সেই সকল সৌভাগ্যশালী মানবের শীঘ্র ঈশ্বরোপলব্ধি হইবে, তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইবেন। গাশী (এ) আ-(ত) হ সুরার ২৪ ও ২৫ আয়েতে আছে, “আল্‌লাহ তাহাদিগকে অতি যন্ত্রণায় যন্ত্রণাগ্রস্ত করিবেন, আমারই দিকে নিশ্চয় নিশ্চয় ফিরিয়া আসিতে হইবে।” এই আয়েত দুইটীর আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, কোটী কোটী যুগ নরক ভোগ করিয়াও আত্মা আবার ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া থাকে। সুতরাং নরক হইতে উদ্ধার নাই, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ নহে। মহাপ্রলয়ের কথা হিন্দুশাস্ত্রে আছে, কোরান্ শরিফে আছে, বাইবেলে আছে, জেন্দাভেস্তায় আছে। মহাপ্রলয়ে অবিশ্বাস করি না, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পরে স্বর্গে বাস বা নরকে বাস অসম্ভব। কোরান্ শরিফের মহাপ্রলয়ের বর্ণনায় আছে, ঈশ্বরভিন্ন সে সময় কিছুই থাকিবে না, আকাশ পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে। ফেরেস্তাগণ ও জীবাত্মগণ সে সময়ে ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং স্বর্গের জন্য বা নরকের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট লোকের সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। আমি কোরান্ শরিফে জন্মান্তরবাদ বুঝাইতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছি। আর মহাপ্রলয়ের কথা তুলিয়া আমি সাহিত্য-সভার সহৃদয় উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। সৌভাগ্য থাকিলে বারান্তরে মহাপ্রলয় লইয়া উপস্থিত হইব। এই স্থানেই আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

* মুতফ এফীন সুরার প্রথম হইতে ২৭ সাতাইশ আয়েত পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

† নবা সুরার চতুর্থ এবং পঞ্চম আয়েত দ্রষ্টব্য।

* ইন্‌শকাক সুরার উনবিংশ আয়েতের বঙ্গানী দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্ত্তিক অবস্থা।

সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ,

যে জাতির অবস্থা ভাল, যাহাদের অন্নচিন্তা অন্যান্য চিন্তার সমতুল, তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে ফরাসি জাতির মত নিরুদ্ধ হইলেও সমভাবে থাকে। কিন্তু আদমসুমারির হিসাবমত বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। অতএব ইহাদের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইতেছে, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনা করিতে আমি প্রথমে নিম্ন শ্রেণীর ও পরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর কথা বলিব।

বঙ্গদেশে যে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে অথবা কোন মহকুমায় থাকিয়া আমরা বড় একটা তাহা বুঝিতে পারি না। পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলে, কিন্তু ঘোর সন্দেহের আবির্ভাব হয়। যেখানে পূর্ব্বে গোয়ালা-পাড়ায়, তাঁতি-পাড়ায়, কুমার-পাড়ায়, নিকিরী-পাড়ায় শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ বিরাজ করিত, সেখানে খানকত জীর্ণ কুটীর, অথবা সাবেক ভিটা, কিংবা একটা বেলগাছ কি চাঁপাফুলের গাছ বা সিউলিফুলের গাছ দেখিয়া মনে হয়, এগুলি যে জনহীন ভিটার পরিচয় দিতেছে, সে ভিটার অধিকারীরা কোথায় গেল? ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থদের বাটী সহজে ধূলিসাৎ হইবার নহে, সেই জন্য সেগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও কত অতীতের কথা স্মৃতিপথে আনিয়া দিতেছে। কত ঢালতলোয়ারধারী নিধিরাম

সর্দ্দার, ভজহরি সর্দ্দার, তাহাদের দ্বারে ছিল, কত বঙ্গীয় দাস দাসী, কত রায়ত জন ও প্রজা, কত পূজারী ব্রাহ্মণ, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনী, কত গাভী গোশালা ও রাখাল, কত চাল' কাঁড়িবার ও ডাল ভাঙ্গিবার গ্রাম সম্পর্কের স্ত্রীলোক—যাহারা এ সব গৃহ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল?

অনেকে বিদেশে চাকরী বা ব্যবসায় করিতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা ভদ্রলোক না ছোটলোক? ভদ্রলোক ছোটলোককে লইয়া যান নাই এবং ছোটলোকও ভদ্রলোকের ভরসায় বিদেশযাত্রী হয় নাই। অতএব একের বিহনে অপরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার ও জানিবার বিষয়। আমার দেশের ভদ্রলোক চিরকালই কায়িক পরিশ্রমে কাতর। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার অভাব পূরণার্থ শ্রমিকের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। তিনি যে বঙ্গের এক পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্য পল্লীতে না গিয়া বঙ্গদেশের কোন নগরে অথবা কোন বড় ব্যবসায়ের স্থানে গিয়াছেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তথাকার শ্রমিকেরা তাঁহার আগমনে সংখ্যায় বর্দ্ধিত না হইলেও নবাগত ব্যক্তির আগমনে যেরূপ বেতন বর্দ্ধিত করিয়া লইল, তাঁহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পল্লীর শ্রমিক সেই পরিমাণে স্বকীয় বেতনহ্রাস স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল যে কিছুকালের জন্য তথাকার শ্রমিক বঞ্চিত হইল এরূপ নহে, অনেকস্থলে তাহার সেই ক্ষতি চিরস্থায়ী হইল, কারণ তাহার পল্লীতে নূতন লোক-সমাগমের কোন সম্ভাবনাই হইল না; অধিকন্তু যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরিবারের অনুপযুক্ত ব্যক্তি অথবা বিধবা ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইল। এইরূপে পল্লীত্যাগ প্রায় তিন চারি পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম এই অনর্থের আরম্ভ হয়, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের পথ অপরে অনুসরণ করিলে অচিরে দেশের তরি-তরকারীর মূল্য দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইবে; তখন তাঁহারা মনে করেন নাই যে, তাঁহাদের মত বেতন পাইয়া তাঁহাদের ভাবী বংশধরেরা সে অর্থে আর সে পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে পাইবে না; তখন তাঁহারা ভাবেন নাই যে, যাহাদের লইয়া তাঁহার এই পল্লী গঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া শত শত শ্রমজীবী জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাঁহাদের ন্যায়পরতায় নির্ভর করিয়া সরল কৃষক নিজ গৃহ-উচ্ছেদকারী মামলায় লিপ্ত হয় নাই, অথবা বিজিগীষু, অর্থলিপ্সু ব্যবহারাজীবের প্ররোচনায় অলীক স্বত্বলাভের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হয় নাই, আজ তাঁহাদের অভাবে কুলালচক্র অচল, গাভী-প্রতিপালন অসম্ভব, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা সমলপঙ্কিল, রথ্যাদি গুল্মলতাদিতে সমাচ্ছন্ন, প্রজা দুর্ব্বল ও হতাশ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে ব্যয় করিয়া বিচারপ্রার্থী, তাঁহাদের অভাবে সর্ব্বত্রই নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান, সুখশান্তি ও সন্তুষ্টির সুধাস্বাদ বহু অতীতের কথা। তাঁহারা ভাবেন নাই যে, ছিদ্র পাইয়া ম্যালেরিয়া ও জরা আসিয়া নিজ সংহারপক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক দীঘির কালো জলে বসিবে, তাঁহারা ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের ভগ্নচূড় গৃহে আর দুর্নীতির শাসন হইবে না।

দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া তদ্বিনিময়ে অন্য সামগ্রী পাইবার আকাঙ্ক্ষা এইরূপে নিষ্ফল ও প্রতিহত হওয়ায় অনায়াসে অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধনসামগ্রী-লাভের বাসনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিল।

স্বর্ণকারের কর্ম্মশালা দিবসে রুদ্ধদ্বার হইয়াও দস্যুতস্করের সুবিধার নিমিত্ত রাত্রে কর্ম্মময় হইয়া উঠিল। নিজ বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করা উচিত কি না, এই চিন্তার আন্দোলনে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেল। এ দিকে পূর্ব্বকার ম্লেচ্ছ রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজার রাজত্ব সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আমাদের রাজার দেশের লোকেরা যে কেবল মুসলমানদের মত বলবীর্য্যবান্, এরূপ নহে; ইহাঁরা জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও সর্ব্ববিদিত ব্যবসায়ী। যেখানে যে সামগ্রীর অভাব, ইহাঁরা ব্যবসায়ের নিজেদের অথবা অপরের দেশ হইতে তাহা প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন; কিন্তু যে সামগ্রীগুলি আনিলেন, সেগুলি যে কেবল প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমনোহর এরূপ নহে, পরন্তু সেগুলি ধনবিজ্ঞান-সম্মত আপেক্ষিক ব্যয়ের (Comparative cost of production) তারতম্যানুসারে শ্রমবিভাগে উৎপন্ন ও প্রস্তুত বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ। ইংরাজগণের আবির্ভাবে মুসলমান অরাজকতা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া দেশীয় বণিক্‌গণের ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এদেশ হইতে কাঁচা মালগুলি বিদেশে রপ্তানী হইয়া তথাকার কল কারখানা সাহায্যে পাকা মালে পরিণত হইতে লাগিল। কলকারখানার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত কাঁচা মালের যথানিয়ম যোগান অপেক্ষা টান অধিক হইল; তন্নিমিত্ত কাঁচা মালের দরও চড়িয়া গেল এবং টাকার টান অনুভূত হওয়ায় সুদের হারও বর্দ্ধিত হইল। এজন্য পূর্ব্বেকার বণিকেরা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া মহাজনের কার্য্য করিতে লাগিল। নিরুদ্ধ বিলাসভোগ বাসনা, ভোগ সামগ্রীর বৈচিত্র্যে ও সুলভতায় উচ্ছৃঙ্খল হইল। বিলাসীর সহবাসে অনুৎপাদনকারীর বিলাস বাড়িল। নিত্য নব অভাব মোচনে নবনবোন্মেষিণী বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। স্থির-নিশ্চিত-পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ আবশ্যক উপযোগিতার অভাব পরিদৃশ্যমান হইল। হিন্দু শিল্পী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। শিক্ষা দীক্ষার কোন বন্দোবস্তে দেশীয় ভদ্রলোকের আস্থা দেখা গেল না। শ্রমিকের কর্ম্ম-সামর্থ্য ব্যর্থ হইল। কর্ম্মকর্ত্তারও অভ্যুদয় হইল না।

এ-দিকে পল্লীতে হাঁড়ি কলসী কিনিবার লোক নাই। পূর্ব্বে কুমারদের এমনি একতা ছিল যে, জমীদার জমী লইয়া গোলযোগ করিলেই ইহারা "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিত।" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই হাটে আর হাঁড়ি আমদানি হইত না; দেশের লোক মিলিয়া তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেন। আজকাল কয়লার জ্বালে সকল হাঁড়ি টিকে না। পরন্তু সহরে আনিবার অসুবিধা ও খরচ। এইজন্য অনেক স্থলে কুমারের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘাটালের মত কয়েকটী মাত্র স্থানের কুমারেরা সম্পূর্ণ শ্রম-সামর্থ্য দেখাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইলেও সমগ্র বাঙ্গালার কুম্ভকারদের কর্ম্ম-সংস্থান হইতেছে না।

তাঁতির অবস্থা জোলার অপেক্ষাও মন্দ। জোলারা কর্ম্মের অভাবে জমি কর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাঁতিরা তাহা এখনও করিতে পারে নাই। কেবল ধনী লোকেরই তাঁতের কাপড় খরিদ করা সম্ভব এবং বঙ্গদেশে ধনীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে; অধিকন্তু রাজসরকারে বা সভা-সমিতিতে দুই তিন পুরুষ হইতে কাটা কাপড়ের প্রচলন বদ্ধমূল হইয়াছে।

কাঁসা পিতলের বাসনের প্রচলন এখনও আছে, তথাপি এনামেলের বাসন প্রায় অর্দ্ধেক স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছে। একটী পিতলের গেলাস যতদিন চলে, চারিটী

এনামেলের গ্ল্যাস সে সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু পিতলের গ্ল্যাস ভাঙ্গিলেও উহা পিতলের দরে বিক্রীত হয়। অথচ এনামেলের গ্ল্যাস অব্যবহার্য্য হইলে তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। এই প্রকারে যে কেবল কাঁসারীর আয় কমিতেছে এরূপ নহে, যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী এনামেলের গেলাস ক্রয় করিতেছে, তাহাদেরও মোটের উপর ধননাশ হইতেছে।

বাঙ্গালী কামার আজকাল আর সকল পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রায় অনেক স্থান, খাঁড়া, কাস্তে, দা, কুড়াল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বাঙ্গালার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে নূতন দা অথবা বঁটী আমদানি হয়। দুর্গাপূজার সময় বলি দিতে কামার আবশ্যক হয়, কিন্তু দুর্গাপূজার ব্যয় প্রায় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ভাল ছুরি, কাঁচি ও ঢালাই কড়া ভারতের বাহির হইতে আসে এবং পেটা কড়া বেহার অঞ্চলে অল্প মজুরিতে প্রস্তুত হয়।

পল্লীগ্রামেও স্বর্ণকারের আবশ্যকতা এখনও অনুভূত হয়; হিন্দু গৃহে কন্যার জন্ম হইলেই স্বর্ণকার আবশ্যক। সহরে উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের সংখ্যা মোটের উপরে হ্রাস পাইতেছে। কারণ যাহারা অতিশয় দক্ষ ও কৃতকর্ম্মা তাহারাই সহরে আসিয়া অধিক নৈপুণ্য ও শ্রমসামর্থ্য দেখাইতে পাইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে পল্লীতে যে কয় ঘর স্বর্ণকার ছিল, এখন তাহার তুলনায় কিছুই নাই বলিলেই হয়।

কাঠের সিন্ধুকের পরিবর্ত্তে এখন লোহার ট্রাঙ্কের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে; তবে পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী চেয়ার টেবিল প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি প্রায় কর্ম্মকর্ত্তার শ্রমবিভাগ-বুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় বলিয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিরাই সম্পূর্ণ শ্রমসামর্থ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু পল্লীর সূত্রধরেরা গোশকটের চক্র অথবা লাঙ্গল নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পাইতেছে না।

এক্ষণে প্রস্তুতকারকদের ত্যাগ করিয়া একবার উৎপাদকদের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। বিবাদ বিসংবাদ আসিয়া শ্রম-বিভাগবিধিতে কর্ম্মসাধনে বাধা দিতেছে। কেবল নিড়ানে পটু বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারিতেছে না এবং কেবল গভীর কর্ষণে পটু যুবা কৃষক ভাল করিয়া জমী নিড়াইতে পারিতেছে না। উভয়ের সমবেত শ্রমসামর্থ্য কোন ভূমিই লাভ করিতেছে না। এ দিকে জমীদার মহাশয়-রাজধানীতে থাকেন বলিয়া ভাগাড়গুলি অস্থিকঙ্কালশূন্য। এইরূপে ক্ষেত্র সমুদায় সারবর্জ্জিত হইতেছে। তাহার উপর কৃষক শ্রমবিভাগ প্রথায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং জমীতে আর অধিক ফসল জন্মে না; যাহা কিছু জন্মে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সে তাহা নিজে কাটিতে পায় না; সেই জন্য অধিক মজুরী দিয়া তাহাকে কৃষাণ নিযুক্ত করিতে হয়। অপরকে অধিক মজুরী দিয়া কর্ত্তিত ধান্যে মহাজনের ঋণের সুদ বর্দ্ধিত করায় উৎপাদন-ব্যয় (Cost-of production) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং অধিক সুদে নিয়োজিত মূলধন হইতে লাভের হার ক্রমিক হ্রাস (Law of diminishing returns).পাইতে থাকে।

উৎপাদকের মধ্যে দেখা গেল তাহাদের লাভ এখন ক্রমিকই হ্রাস পাইতেছে, এবং প্রস্তুতকারকদের অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়;

কারণ যাহারা সহরে আসিয়া আধুনিক উন্নত উপায়ে সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে, এরূপ নিতান্ত উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই কর্ম্মসংস্থানহীন। হিন্দু ও মুসলমান জাতির অভাবমত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যাহারা জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা উহাদেরই আধুনিক ভিন্ন জাতীয় অভাব মোচন করিতে অক্ষম। আজ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইউরোপীয়দের অনুকরণে আপনাদের বাসনাপ্রীতিকর সামগ্রীতে মুগ্ধ। অতএব দেশের খরিদারগুলির ক্রয়সামর্থ্যও প্রাচীন শিল্পীর সাহায্যে আসিতেছে না। সচরাচর দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে লাভ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অনেকে পাটের চাষ করিতেছে বটে, তথাপি উন্নত কৃষি-পদ্ধতি আজিও প্রবর্ত্তিত হইল না; অধিকন্তু সস্তায় মূলধন-প্রাপ্তির কোন বিধিতেই দেশের ভদ্রলোকের আন্তরিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে পল্লীত্যাগী স্বদেশবাসী হইতে লাঞ্ছিত হইয়া হিন্দু উৎপাদক ও নির্ম্মাতা যে নূতন রাজা ও ইউরোপীয়গণের অনুষ্ঠিত নানাবিধ কার্য্যে নিজেদের সামর্থ্য দেখাইবে, তাহারই বা উপায় কৈ?

হিন্দু চিরন্তন সংস্কারের অধীন। ধর্ম্ম তাহার কর্ম্মে বাধা দিতেছে। মুসলমানের এক মনিব ছিল, এখন দুই মনিব হইয়াছে; তন্মধ্যে একের ব্যয়-সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ের অন্ততঃ দুইটী মুসলমান চাকর দরকার। আদালতের দপ্তুরি, পেয়াদা, ঘোড়ার গাড়ীর সহিস কোচুয়ান, রেল জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই মুসলমান। অল্প বেতনে হিন্দু তাহার ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারে না, তাই রামা শ্যামা আমাদের বাড়ীতে স্থান পায় না; নিকাতে ও এক পয়সার ছাতুতে সন্তুষ্ট কাহার, কুর্ম্মী অথবা উৎকল দেশের পাঁকালে অভ্যস্তকরণ জাতি তাহার স্থান লইয়াছে। রাজধানীতে আসিবার সময় আমরা ভজহরি সর্দ্দারকে আনি নাই, তাই সে দস্যুদলে আশ্রয় লইয়াছে। কৈ ছোটলোক হিন্দুকে ত বাড়ীতে দেখিলাম না, আদালতে দেখিলাম না, রেলে জাহাজে দেখিলাম না, আমরা এখন কাপুড়ে বাবু হইয়াছি, তবু তাহাকে কাটা পোষাকের দোকানে দেখিলাম না, তবে সে গেল কোথা? আজ দুই তিন পুরুষ হইতে তাহার রোজগারের পথ একেবারে বন্ধ। বাবুরা পল্লীত্যাগ করায় ম্যালেরিয়া তাহার প্রভু; জমীদার তাহার কাতর মর্ম্মবেদনায় কঠোর হাস্য উপহার দিতেছে; তাহার বিপদে আর ভিক্ষার হাট* বসে না; হিন্দু সংস্কার তাহাকে বাটী হইতে বাহিরে ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করিতে দেয় নাই—তাহার ধনভাণ্ডার বহুদিন হইতে শূন্য। চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াও পিণ্ডের ব্যবস্থায় হালের গরু ও যোথ জমা বাঁধা দিয়া সে তিনকুড়ি বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর যৌবন উদ্ভেদের পূর্ব্বে তাহার ইহলীলা সংবরণ হইয়াছে। তাই আজ ঘোষের পো—তেলির পোর পরিবর্ত্তে গয়লাবৌ তেলিবৌ আসিয়া আবেদন অভিযোগ করিতেছে, বহু পুরাতন মনিবের বংশধরের নিকট পূর্ব্বপুরুষের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে। পল্লীর শ্মশান এখনও কিন্তু তাহাদের কাতরধ্বনিতে বাবুদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। সমগ্র উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পরিবার নূতন রাজার

* পূর্ব্বে উৎপাদনকারী দরিদ্র হিন্দুর পিতৃশ্রাদ্ধাদির সময় ভিক্ষার হাট বসিত অর্থাৎ পটোল ওয়ালার বিপদুদ্ধারের জন্য সে দিন হাটে আর অন্য পটোলওয়ালা আসিত না এবং পূর্ব্বোক্ত পটোলওয়ালার পটোল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

আবির্ভাবে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী হইবার নিমিত্ত, অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত, যে ভ্রান্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইতেছিল, তাহার বশে আজ তাহাদের চিরমুখাপেক্ষী দরিদ্র হিন্দু পিতৃহীন, অসহায়, সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভদ্র হিন্দু নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া, এবং নিজেও অনুতপ্ত না হইয়া আজ লাট সভায় রাজার সহানুভূতি-প্রার্থী। তাই কবির কথায় বলিতেছি ;

"কিন্তু হায়! পল্লীগুলি—
সারা ভারতের প্রাণ—
হলে ধ্বংস, হবে ধ্রুব—
দেশলক্ষ্মী অন্তর্ধান!"
পল্লীবিলাপ।

"শ্রামিককে দেয় মূলধনের অনুপাতে শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক স্বরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে ; যথা—নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধনসম্পত্তির অধিকারী না হইলে সংসার-প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রামিকজাতি অর্থ দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, কুম্ভকার, গোপ প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে সেই নিয়ম আজিও প্রচলিত দেখা যায়। টাকার জোগাড় করিতে না পারাতে অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত বয়সে অর্থসংগ্রহ করিয়া বালিকাপত্নী লাভ করিয়া থাকে। সেই বালিকার যৌবনোদ্ভেদ হইবার পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই তাহার বৃদ্ধ স্বামীর লোকান্তর ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে ঐ সকল জাতির বংশবৃদ্ধি এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। আজি কালি অনেক গ্রামে একটীও কুম্ভকার বা কর্ম্মকার পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারগণের কঠোর নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্রদায়ের বংশলোপের অন্য একটী কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম-প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কি? দেশে যাহাতে শ্রামিকের সংখ্যা এবং তজ্জন্য জীবন-সংগ্রাম বৃদ্ধি না পায়। বিবেচনা করুন, দেশে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে না ; কিন্তু লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি বঙ্গদেশের শ্রামিকদের বংশবৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, তাহা হইলে মজুরী হ্রাস পাইত এবং বর্দ্ধমান জনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভূমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইলেও নানা কারণে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না, অথচ অন্য দেশে শ্রামিকদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশ ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ এবং একপ্রকার স্থিতিশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে উপায়ে এদেশে শিল্পজাত বা কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হইত, আজি বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ কলকারখানা ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্র সৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশীয় স্থিতিশীল শিল্পী তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিনিবহ উন্নত বিজ্ঞান-বলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাতে আমরা অন্য দেশের অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতেছি, তাহাতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে নিজকর্ম্মদোষে ও আমাদিগের নিজের বহুদর্শিতার অভাবে আমরা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য শ্রামিকদিগের দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ভূয়োদর্শন-বলে শ্রামিকদিগের বেতনসংস্থান বর্দ্ধিত করিবার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, অকর্ম্মণ্য আমরা বিজ্ঞানবলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কলকারখানা এবং শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রাদি সৃষ্টি না করিয়া বৈদেশিক সুলভ দ্রব্যসামগ্রী-লাভেই কৃতার্থম্মণ্য হইতেছি, তথাপি সরকার বাহাদুরের নিয়োজিত কামিং সাহেব ইত্যাদির বিজ্ঞজনোচিত মতের অনুমোদিত ব্যবস্থায় সুলভে বহুল পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী নবোদ্ভাবিত উপায়ে কলকারখানা সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং মূলধন না থাকিলে যে কার্য্যানুষ্ঠানের অভাবে শ্রামিকদের বেতন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন বংশ বৃদ্ধি হইতেছে না, শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান স্বরূপ মূলধনও পশ্চাৎপদ বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যার অভ্যুদয়ে যদি উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অথবা কাঁচা মালগুলি সুলভে পাকা মালে রূপান্তরিত করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলেই বর্দ্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশবাসী শ্রামিকের বেতনবৃদ্ধি হইবে, নচেৎ এতদ্দেশবাসী শ্রামিকের প্রাপ্য বেতন অন্য দেশবাসী শ্রামিক লইয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন ; আধুনিক বঙ্গদেশবাসী তাহাদের বেতন বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে তাহারা ক্রমে অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর* বেতন অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়াও কেহ কেহ সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, বা বিলাস-সামগ্রী উপভোগ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরব্ধ না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশের মূলধন বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

(১) সস্তায় ও সুগমে মালের গতিবিধি,
(২) সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন প্রাপ্তি,
(৩) কাঁচা মাল উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার,
(৪) এবং ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ† হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয়।

(১) এক রেল-বিস্তারে আজ পর্য্যন্ত ২৪০০ শত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষে ব্যয়িত হইয়াছে ; কত শত লক্ষ মুদ্রা খাল-খননে ও রথ্যা-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন খালে পর্য্যন্ত ষ্টীমার নৌকা এত অধিক যাতায়াত করে, পাকা রাস্তায় এত অধিক গরুর গাড়ী চলিতেছে এবং বহুবিস্তৃত রেলপথে মাল গাড়ীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, যে মালের গমনাগমন বিষয়ে ভারতবাসীকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না।

(২) মূলধন আমাদের দেশে সহজে

* ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

† ("Commerce of Nations" by C. F. Bastable).

অল্প সুদে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প ও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই। বিজাতীয় যে সকল ব্যাঙ্কে আমাদের ধনীদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহা ধনীদের হিসাবে জমা ও ব্যাঙ্কের হিসাবে ধার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে ধার করিয়া, তাহারা যাহাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের আবার ধার দেয়। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশিষ্টরূপে কোন ব্যবসায় চালাইতে পারি নাই। আমাদের বাজারসম্ভ্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া আমরা সহজে ধার পাই না। ব্যয় সংযম করিয়া লোকে যে মূলধনের সৃষ্টি করে, উহা নিজে ব্যবহার করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকে। এইরূপে দেশের অব্যবহৃত মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকর্ম্মা লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থ ব্যাঙ্কে জমা আছে যে, তদ্দ্বারা বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় বণিক্‌গণই এই অর্থের ব্যবহার করিতেছে। আমাদের দেশের অব্যবহৃত মূলধন লইয়া বিদেশীয় বণিক্‌গণ ব্যবসায় কার্য্য সুকর করিয়া লইতেছে। ফল কথা, আমাদের ব্যাঙ্কও নাই, বাজার-সম্ভ্রমও নাই, সুতরাং আমাদের দেশের অর্থ আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ধনীদের ধনভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ অংশ মূলধন করিয়া যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দস্তরমত ঐ অর্থের বিশ গুণ অর্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। নির্ম্মাতারা তাহাদের মাল দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে "ক্যাশ ক্রেডিট" পাইতে পারেন। বিশিষ্ট লোকের মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত ব্যবসায়িগণ ধার করিতে পারিবে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল ধনী একেবারে চাঁদা হিসাবে দান করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দান করিতে অপারক, তাঁহারা ব্যাঙ্ককে মধ্যস্থ করিয়া সুদের লোভে কৃতকর্ম্মা লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

"But ever let us beware of paternalism. Not charity but co-operation is the crying need of the hour" (H. H. The Gaikwar I. I. Conference.)

থিয়রি অফ্ ব্যাঙ্কিং (Theory of Banking) গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনামধন্য ম্যাক্‌লাউড (Macleod) সাহেব বলিয়াছেন, "Several professions require a certain amount of ready capital to start with. In England those who enter such professions must have the actual capital; in Scotland it is done by means of a credit guaranteed by their friends."

"These credits are granted to all classes of society to the poor as freely as to the rich. Everything depends upon character. Multitudes of men who have raised themselves from the humblest positions in life to enormous wealth began with nothing but a cash credit."

(৩) যথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তুত অথবা কাঁচা মাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্য-রক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, সুখের বিষয় সেই বাঙ্গালার জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত ভূমিগুলি সস্তায় বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরম্ভ হইবে। কাঁচা মাল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন

হইবে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, দুই তিন জন জমীদার মিলিয়া কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ স্ব স্ব মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও মূলধন অল্প সুদে পাইয়া খাটাইতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজার বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দিতে অনুমতি দিলে, ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহাদিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতান্ত আবশ্যক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিপুণ জমীদারদিগের আত্মীয়গণ যদি নিজ নিজ জমীদারিতে চাষের উন্নতি সাধন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাঁচা মালে দেশ ভরিয়া যাইবে।

"Motherland is the source of all wealth, manufacturing as well as agricultural, and manufacturing industries rise and fall with the produce of the land, and therefore the man who holds the the land of Bengal holds the key to his country's wealth."

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হ্যামিল্টন সাহেবের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

আমেরিকার ওয়াকার সাহেব বলেন, আমেরিকার প্রজা ও জমিদার নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। জমিদার খাজনা চাহিলে প্রজা তাহার জমি ছাড়িয়া দিয়া দূরদেশে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্প খাজনায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকে। এদিকে জমিদারও যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার জমির কোন বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্য অন্য প্রজা অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইবে, তাহা হইলে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

ভারতবর্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার সংখ্যাই অধিক। জমির খাজনা কি উপায়ে বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন না। চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া, কিংবা তাহার জমিতে তুল, রিয়া প্রভৃতির চাষে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদের বিঘা প্রতি বর্দ্ধমান ফসলের সেই বর্দ্ধিত ধনাগমের অনুপাতে খাজনা বাড়াইতে পারেন; কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই।

লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং সেই নিমিত্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নহে। ইংলণ্ডের গোধূমের দরের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৪০ খ্রী অব্দের যে দর ছিল, ১৮৯৪ খ্রী অব্দের প্রায় তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে। ইংলণ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও অন্য দেশে বিঘাপ্রতি অধিক ফসল ও মালের সুলভে পরিচালনই ইহার একমাত্র কারণ। অথচ যে সকল দেশে গোধূম উৎপন্ন হইতেছে, তথায় খাজনা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ ক্রমিকই অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানভূম ও সিংহভূম প্রদেশের জমির খাজনা সেলামীবাদে বিঘা প্রতি এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্তও দেখা যায়। তথাপি এই দুর্ম্মূল্য দেশের প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই সকল সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বঙ্গদেশীয় জমিদারও কত জমি পতিত রাখিতেছেন, তথাপি খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিবেন না। যে জমিদারের সকল জমিই প্রজাবিলিতে আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথায় মঙ্গলময়; কিন্তু যেখানে অনেক জমি পতিত আছে,

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না।

কলিকাতার দশ বার ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাওয়াতে তৎপ্রদেশস্থ প্রজাবর্গ জমি ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে; ইহাতে দ্রব্যসামগ্রী অধিক মহার্ঘ হইলেও তাহারা অধিক বেতন পায় বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জমিদারগণ ঐ সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক খাজনা পাইলেও প্রজাগণের ত্যক্ত জমির খাজনা হ্রাস করিতেছেন না—করিলে অল্প খাজনায় সেই সকল জমি অনায়াসে বিলি হইয়া যাইত এবং তৎসমুদায়ে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশে দ্রব্যসামগ্রী সুলভ হইত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারকে খাজনার জন্য ভাবিতে হয় না। তাঁহারা কলওয়ালাদের কাছে যাহা পান, তাহাতেই তাঁহাদের দেয় খাজনা বাদে লাভ থাকে; সেইজন্য তাঁহারা পতিত জমি সস্তায় বিলির উপর দৃষ্টি করেন না। পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে বোধ হয় আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না। বণিক্-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে ঐ সকল জমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তদুৎপন্ন ধনের বিনিময় করিয়া তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সঙ্গে দেশের ধনোৎপত্তি ও লোকপ্রতিপালনও হইতে পারে। অবশ্য এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ কলকারখানায় অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ পাওয়াতে ঐ সকল জমি ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়ের খাজনা কমাইয়া দিলেই অন্য গ্রাম হইতে শ্রামিক আসিয়া তথায় চাষবাসের অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে পতিত জমির উপর কর বসাইলে এই হয় যে, জমিদারগণ জমি পতিত না রাখিয়া অল্প হারে তাহাদের বিলি করিবেন, নচেৎ নিজেরা কৃষিকলেজের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে মনোনিবেশ করিয়া কাঁচা মালে দেশ পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা ধনোৎপাদনে সহায়তা করিবেন।

(৪) ব্যবহারিক শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক শিল্পের হাতে কলমে শিক্ষাবিস্তার না হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই যে দেশীয় কাঁচা মাল বিদেশে গিয়া প্রস্তুত মালে পরিণত হইতেছে, উহাকে এদেশে প্রস্তুত মালে পরিণত না করিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না।

যাহারা শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াও শিখিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সকলে শিল্প শিক্ষা করিয়া ধনোৎপাদনে পারদর্শী হইবেন। যে সকল পণ্য দ্রব্য স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, আজকাল অধিকতর কাট্‌তির নব বলে বলীয়ান্ হইয়া নব শিল্পীদের বুদ্ধিমত্তায় ব্যয়পরিমাণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে প্রস্তুত হইয়া অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া আজ উহা দেশে প্রস্তুত করিতে সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা ধনবিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অধিক বেতনভোগী বিদেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধা পাইলে, তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব মোচন করিতে পারিবে। ছোট ছোট আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প অল্প পরিমাণে

প্রস্তুত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মূলধনের আন্দাজ পাইবে, ব্যয়সংক্ষেপ শিখিবে, কাঁচামালের রূপান্তর করিতে শিখিবে, নচেৎ অসম্ভব। এইরূপে শ্রামিকদের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

এই সুবিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে একজন চাষবাস করিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনের প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমী চাষ করিতে পারে বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই জমী হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দশগুণ জমীর খাজনা দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই বা উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিবার তদুপযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্তু পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তারা কোন স্থানে অধিক ভূমি লইয়া তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিযুক্ত করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বুদ্ধিকৌশলে দশগুণ কর্ম্ম করিয়া সেই পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।*

কোনও গ্রামে একঘর গোয়ালা দেখা গেল। গোয়ালা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বারটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে দুগ্ধ দোহন করিয়া মাসিক ছয় টাকা মাত্র পায়; তাহার স্ত্রী চাকরী করিয়া মাসিক তিন টাকা পায় ও বেলা তিনটার সময় দুই তিন বাটীতে বাসন মাজিয়া বাটী আইসে; সেই জন্য গোয়ালা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করে। গোয়ালা কিন্তু এক স্থানে পাইলে হয়ত বেলা নয়টার মধ্যে চব্বিশটী গাভী দোহন করিতে পারে এবং তাহার স্ত্রী অন্নপাক করিয়া দিলে বারটী গাভীর সেবাও করিতে পারে। তাহার স্ত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতে না হইলে সেও চব্বিশটী গাভীর গোময়ের ঘুঁটিয়া দিতে পারে। ঘরের গাভী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়া গোয়ালা তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যসামর্থ্য দেখাইতে পারে না। কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হইলে ঐ গোয়ালা ও গোয়ালিনী উভয়ে মিলিয়া আন্দাজ বিশ টাকা বেতন পাইবার মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তা উহাদিগকে বিশ টাকা বেতন দিয়াও লাভ পাইতে পারেন। কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে এই সকল লোক নিজ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল-কারখানায় কার্য্য করিতেছে; অথবা যেখানে কল-কারখানা নাই, সেই সকল স্থানে থাকিয়া দারিদ্র্যদুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য মত কার্য্য করিতে পাইলে, বহু সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হওয়াতেই শাক শব্‌জী ও দুগ্ধ এত মহার্ঘ হইয়াছে। ইহারা কলে কাজ করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা সেই অর্থে পূর্ব্বের মত অধিক সামগ্রী ভোগ করিতে পাইতেছে না।

দেশবাসীর অন্ন সংস্থান ও অন্ন সংস্থান

*Let special pains be taken for the development of an honest, intelligent entrepreneur class who will be content to organise and manage our new industries without saping their life by demanding exorbitant profits—H. H. The Gaekwar's inausural address, The II Confence.

ঝাদে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন সামগ্রী ক্রয় করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তাহা সমাজের লক্ষ্য স্থল। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজগত স্বার্থ কখনই এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আসাম দেশে যে এণ্ডী অথবা ভাগলপুর অঞ্চলে যে বাফ্‌তা প্রস্তুত হইতেছে, উহা কখনই সমাজগত স্বার্থের অনুমোদিত হইতে পারে না। মহাজনের দাদনে প্রস্তুত হইয়া এই কাপড়গুলি অনেক হাত ফিরিয়া কলিকাতায় বড় বাজারে আসিতেছে এবং বিদেশী বণিক্ ইউরোপ ও আমেরিকায় গতিকেই এখানকার দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। এই যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, উহা কয়েকজন মাত্র মহাজনের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করিতে হইলে মহাজনদের লাভ অল্প হয়, অথচ এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত হইলে কাটতির আধিক্য অনুসারে বহুসংখ্যক দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়। ফলকথা দশ হাজার গজ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত না হইয়া শ্রম বিভাগে ও সমবেত মূলধনে পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর হইলে আড়াই গুণ অধিক শ্রামিকের কর্ম্ম-সংস্থান হয়। কিন্তু পঁচিশ হাজার গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় করায় লাভের সমষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে কি কম হইবে, ইহার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মহাজনেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী লাভ প্রাপ্তিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহা যদি অল্পপরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহাদের পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান-চিন্তা তাহাদিগকে যে বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সমাজ-স্বার্থ নিজে ইহাকে পরিপোষণ করিবে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা এইরূপ দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে দ্রব্যাদি সুলভে প্রস্তুত হয় এবং কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবীরা সুখে কালাতিপাত করে।

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। এদেশের তৈজসপত্র বহুকাল স্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইয়ুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্গুর। এদেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বহুকাল স্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের ধন সম্পত্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রীর ভোগ করা ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না, সেই জন্য ঐ সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহারা ধনোৎপাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী দৃশ্যমনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বা পরিশ্রমের ফলের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগান্তর তাহার সামান্য অংশও দেশে থাকে কি না সন্দেহ;—যদি থাকে, তাহা হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, এবং যে দেশে প্রস্তুতি কল্পে বিত্তবান্ বা কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের

চাষার মত ভোগ-বাসনা হওয়া উচিত। দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কৃত করে মাত্র। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে ভোগের খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত হয় বলা হয়। ইংলণ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎপাদন-বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্য একথা স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির যে পণ বাড়িতেছে এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে নিজের টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের পর একটী রঙচঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না।

সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে "রোজগার নাই বাবুয়ানী আছে।" সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই কথা প্রযোজ্য। চটের কলে ছুটির সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙিন জামা, উড়ানী, পায়ে মোজা, মুখে সিগারেট। আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, অধিকন্তু জুতা জামা ইত্যাদির ভোগবিলাসে তাহাদের ধন নাশ হইতেছে। সভ্য জগতে বাতি জ্বালিতে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশলাই আবশ্যক হয়, কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্যক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। চকমকি ব্যবহার না করিয়া সে মাসিক দুই আনার হিসাবে এক মণ ধান্যের বিনিময়ে এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিয়া থাকে! ইংলণ্ডের লোক প্রতি বার্ষিক আয় বিয়াল্লিশ পাউণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষে আয় প্রায় দেড় পাউণ্ড বা পনর মণ ধান্য!

যে দেশে, যে সময় যে অবস্থায় যাহার যে দ্রব্য ভোগ করা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সেই দ্রব্যের ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলে তাঁহার ধনের অপব্যয় হয় না। মিতব্যয় বলিলে অনেকে সঞ্চয়ের ভাবও অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু মিতব্যয় বাস্তবিক ব্যয় বিশেষের নাম। অল্পকাল ভোগসাধ্য সামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম অমিত ব্যয়। আহারীয় ও পানীয় একবার মাত্র ভোগে বিনষ্ট হয়, অতএব অনাবশ্যক অধিক মূল্যের ঐ জাতীয় সামগ্রী ভোগের নাম অমিত ব্যয়। নিতান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য সামগ্রী বিশেষ, যাহার ভোগান্তে কিছু পাওয়া যায়, অথবা যাহা সম্পত্তিরূপে পরিণত করা যাইতে পারে, উৎপন্ন ধনের বিনিময়ে ঐ সকল সামগ্রী গ্রহণ করাই মিতব্যয়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের international trade) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিমাত্রই নিজ নিজ কলা বিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী পরিচয় দিতে পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্ম্মভীরু কার্য্যক্ষম কর্ম্মকর্ত্তার (untrepreneuer) আবির্ভাব হইলে যতই দেশের অধিকাংশ শ্রামিকের

শ্রমবিভাগে কার্য্য-সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, ততই দেশে অধিক ধন উৎপাদিত হইতে থাকে এবং শ্রমিকেরও কর্ম্মসংস্থান হইয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বার্ত্তিক অবস্থা।

মানবমাত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্যত হয় এবং স্ব স্ব সমাজের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্নপ্রাশন, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি যে সকল সামাজিক প্রথা দেশবিশেষে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের অনুসরণে সমাজবিশেষে সকলেই যথাসাধ্য উত্তম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি বিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী বলেন। যে সমাজে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। এখন আমাদের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপের অভাব নাই। কিন্তু ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনান্তে বাহ্য আড়ম্বর হেতু ব্যয়াধিক্য বশতঃ অনেকেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্য ও স্থিমিতভাব পরিদৃশ্যমান। জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন সমাজের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আবার কোন কোন সমাজ বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন নিয়মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্যোগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কায়িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, তাহার নিকট তদ্বিনিময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী করিবার স্বত্ব, বা অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার জমি নাই, সে জমিদারকে জমি-ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু দিয়া পরিশ্রম সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই অর্থও নাই, সে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাষ আবাদ বা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ বা এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে অধিক মূল্যযুক্ত করিয়া লাভবান্ হইতেছে, কেহবা সামগ্রী রূপান্তরিত করিয়া বা অধিককাল মজুত রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে। আবার কেহ বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ঐ সামগ্রীর অংশ বা তুল্য মূল্য অর্থ গ্রহণ করিতেছে। কেহ বা ওকালতী বা চিকিৎসা করিয়া বা বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্য্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তৎসমস্তই বিনিময় সম্ভূত। যে ব্যক্তি কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, উহা তাহার কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি উদারন্নের সংস্থান করিয়াও পরিশ্রম ব্যবহার করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় অভাবমোচন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আরও নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করিতেছে, ইহা অবশ্যই কোন না কোন সামগ্রীর বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে ব্যক্তি উদ্যম ও অধ্যবসায় গুণে বা পরিশ্রম করিয়া, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী ভোগ করিয়া জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহার সেই অবলম্বিত বৃত্তিকে বঙ্গভাষায় ব্যবসায় বলা যায়। কোন ব্যক্তির কি ব্যবসায়—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি করেন, ইহাই বুঝায়। বস্তুতঃ ব্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে—যথা বি—অব—সো (উদ্যোগ করা, শেষ করা) বিশেষরূপে উদ্যমকরণ, অথবা শেষ পর্য্যন্ত উদ্যমকরণ বুঝায়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহা একটী মহাজনবাক্য। বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্যোগী পুরুষদের সমস্ত কার্য্যই বিনিময়সম্ভূত। এই বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর কর্ম্ম সামর্থ্য নিয়োজিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ওকালতী বা চিকিৎসা বা ভিন্ন জাতির কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ধনাগমের অন্যান্য অতিশয় প্রশস্ত কোন পথেই তিনি বিচরণ করিতে পশ্চাৎপদ। হাতে কলমে ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যায় তিনি কোন কালেই পারদর্শী ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ ভদ্রলোক অনেকে ব্যবসায় করিয়া লোকসান দিয়াছেন। এই সুজল সুফল রত্নগর্ভ বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, তাহাতে আমাদের কি পরিমাণ অংশ বর্ত্তায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বড় মুদিখানায় মুহুরীর যে অংশ আছে, বড় বড় সদাগরী অফিসে আমাদেরও সেই অংশ বর্ত্তমান। আমরা বঙ্গদেশের উৎপন্ন ও প্রস্তুত ধনের ভাগীদার হইতে যে পন্থা অনুসরণ করিতেছি, সে পথের পথিকে আজ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। মালের টান ধরিলে এবং যোগান কমিলে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু টান অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে মূল্য কমে। তাই আজ কুড়ি টাকার চাকরি খালি হইলে আবেদন পত্রে আফিস ঘর পূর্ণ হইয়া যায় এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। অন্যান্য সামগ্রী সস্তা হইলে লাভ কম দেখিয়া উহার যোগান আবার কমিয়া যায় এবং যত দিন না উহার মূল্য বাড়ে, তত দিন কেহ সে মাল বাজারে পাঠাইতে চাহে না; কিন্তু চাকুরে রূপ মালের আর যোগান কমিতেছে না। এ মালের অভাব আর অনুভূত হইতেছে না। কেবল বড় লোকের কন্যার বিবাহের সময় ইহাদের অধিক মূল্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

যে পথ আমরা অনুসরণ করিয়াছি, তাহারই ফলে গতিকে আমরা পল্লীত্যাগ করিয়াছি। অতএব পল্লীর ধন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাগানে তরিতরকারি দিয়া যাহা বিনামূল্যে পাইতাম, পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া যাহা ছিপে ধরিতাম, নারিকেল তাল যাহা পয়সা দিয়া কিনি নাই, গৃহের গোধন যাহার খাঁটি দুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া মস্তিষ্কের বলাধান হইত, আজ সেইগুলি পরিশ্রমের বিনিময়ে লব্ধ ধন নাশ করিয়া ক্রয় করিতেছি। পল্লী ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর প্রেতাত্মা শ্মশান হইতে বলিয়া দিতেছে "যে অর্থের নিমিত্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছ, তাহার অধিকাংশ না দিলে আর পূর্ব্বের মত খাদ্য সামগ্রী পাইবে না।" বাবুরা যখন পল্লীতে থাকিতেন, কৃষক ধান্যের সহিত তরিতরকারী উৎপন্ন করিয়া লাভবান্ হইত।

এখন সেই লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল ধান্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাহারা অক্ষম। তাই সে আজ বিদেশী বণিকের ক্রয়সামর্থ্য প্রার্থনা করিতেছে, নচেৎ ইহার উপর চাউলের মূল্য কমিলে তাহাকে চাউলের ব্যবসায়ে ইস্তফা দিতে হইবে।

কি অদ্ভুত নিয়ম! দেখিতে দেখিতে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়া গেল, আর পূর্ব্বের অর্থে পূর্ব্বের মত সামগ্রী পাওয়া যাইবে না। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা দ্বারাই ঐ দ্রব্যের মূল্যজ্ঞাপন করা হয়, অতএব অর্থের মূল্যজ্ঞাপন করিতে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়; যেহেতু অর্থই মূল্যজ্ঞাপক এবং ইহার পণনিরূপণকারী মধ্যস্থ কোন কিছুই নাই। সাধারণতঃ দ্রব্য-সম্ভারের পণের তারতম্যানুসারে অর্থের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে; কারণ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই উহার মূল্য। এবং অর্থও যখন ধাতুজ পণ্যদ্রব্যবিশেষ, তখন ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ চাউল বা যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে, উহাই অর্থের মূল্য স্বরূপ। যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অল্প অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থের মূল্য অধিক হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব অর্থের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য এবং দ্রব্যাদির মূল্য ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুলাদণ্ডের পাল্লার ন্যায়। যদি একটী উত্থিত হয়, অপরটী নিম্নগামী হইবে, এবং অপরটী উত্থিত হইলে অন্যটী নিম্নগামী হইবে।

কোন দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে বুঝায়, কিন্তু অর্থের আমদানী হইয়াছে বা উহা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, এরূপ কথা সাধারণতঃ শুনা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন দ্রব্য অর্থে ক্রীত বা অর্থ লইয়া বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, অর্থও ঐ দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত বা বিক্রীত হইয়া থাকে। যখন কেহ শস্য বা তূলা বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্রা ক্রয় করেন এবং যাঁহারা ঐগুলি ক্রয় করেন, তাঁহারা বিক্রেতৃগণকে অর্থ বিক্রয় করেন।

এই ত আমাদের "পথ ও পাথেয়।" পথিকের সংখ্যা অধিক বলিয়া পাথেয় আর অধিক পাওয়া যাইতেছে না; তাহার উপর ইহার ক্রয়কারিণী শক্তির কি অসম্ভব হ্রাস। এখনও কি এই অল্প মূল্যের সামগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদের এই পথ অনুসরণ করা উচিত। অন্যান্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে, সেইগুলির উৎপাদন ও প্রস্তুতিকল্পে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত নয় কি? আমরা দেখিতেছি যে আমাদের দেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে অধিক ধন সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে না ও সুদ কমিতেছে না। আমরা আরও দেখিতেছি যে, চরিত্রের গঠন হয় নাই বলিয়া আমাদের বাজার-সম্ভ্রম অল্প। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করিতে না পারিলে আমরা সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, এই জন্য প্রতিজ্ঞা-পালনে চেষ্টা করি না। আমাদের বাজার সম্ভ্রম অল্প বলিয়া আমরা অল্প সুদে বিদেশী মূলধন (কল কব্জা ইত্যাদি ধন সামগ্রী) ধারে ক্রয় করিতে পাই না। এইরূপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা ধনোৎপাদিনী শক্তির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই শক্তির বলে ব্যক্তিগত স্বার্থ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে দেশের অধিক মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে, অথবা বহুসংখ্যক লোক কার্য্য

বিশেষে শ্রম-বিভাগ প্রথায় নিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন ধনসামগ্রীর অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য পথগামী হইতে পারে।

এই অল্পক্রয়কারিণী শক্তি উপার্জ্জন করিয়া তদ্বিনিময়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আমরা ভোগের অথবা শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি, সেগুলি হইতে বিশেষ কোন ফল পাই না।

আমাদের সমাজ এখন নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। সমাজস্থায়িত্ব নামে শাশ্বত বা চিরন্তন। কালের প্রভাবে সমাজে নূতন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টি সমধর্ম্মান্বিত হইয়া মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইলে সেই সমাজে শ্রী পরিলক্ষিত হয়, এবং বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তনে সমাজ-শ্রী দূরে চলিয়া যায় এবং সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের মুখে নৈরাশ্য ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। আমাদের এই সমাজে এখন উহা সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সেই জনক জননী হইতে হয়। ইহাদের পুত্র কন্যাগুলি যে দুর্ব্বল ও মেধাহীন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এবং দুর্ব্বল ও মেধাহীন বালক বালিকা দ্বারা আর্য্য জাতির গৌরব যে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতএব দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা যুবকদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন যে স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত না হইয়া বিবাহ করা উচিত কি না তাঁহারা যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। অল্প বয়সে বিবাহ দিবার বাসনাস্রোত বিপরীতগামী করিতে তাঁহারাই একমাত্র সমর্থ। সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পরম্পরা সমধর্ম্মান্বিত করিতে আমরা তাহাদেরই মুখপানে চাহিয়া থাকি।

সামাজিক ক্রিয়াকল্পে অপব্যয় ও কৃত্রিম দান সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে সমাজের ব্যক্তিগণের মিলন হইয়া থাকে এবং সামাজিক উন্নতিকল্পে অথবা সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশে এরূপ মিলন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। এই সকল উপলক্ষে যাহার বাটীতে মিলন হইয়া থাকে, তাহাকে অবশ্য ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। এই ব্যয়ের সহায়তাকল্পে পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া যে লৌকিকতা দেওয়া হয়, তাহা এক প্রকার অপব্যয়, কারণ ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী উপঢৌকন দেওয়া হয়, উহার উপযোগিতা কি? পাকস্পর্শে বা শ্রাদ্ধে যে প্রকারের কাপড় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে কয়খানি ব্যবহারযোগ্য? সমাজের যে পরিমাণ অর্থ এই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য-সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, তাহাতে কি কর্ম্মকর্ত্তাদের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না? অবশ্য বাহককে অল্প বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া অনেক সমাজ কথঞ্চিৎ বহুদর্শিতার আভাস দিয়াছে, কিন্তু মূল অপব্যয়ের কি কোন প্রতিকার নাই? তুল্যমূল্য অর্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তাকল্পে কি ব্যয়িত হইতে পারে না? পরে যে অধিক মূল্যের সামগ্রী জামাতাকে দেওয়া হয়, বাস্তবিক কয়জন জামাতা তাহা পাইবার উপযুক্ত? যদি ভবিষ্যতে তিনি নিজে স্বাবলম্বন শিক্ষার পূর্ব্বে উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্রোত্তরীয় পাদুকা ও বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত করাইয়া লাভ কি? এই হঠাৎ পরিবর্ত্তন জানিয়া পরে তাহার অভাব অনুভব করা কি অকারণ দুর্ব্বহ ক্লেশভার বৃদ্ধি করা নহে?

"ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিতে হয় বলিয়া

কি আচ্ছাদন ও অলঙ্কারের মূল্যের কথা ব্যক্ত আছে? এক ব্যক্তির সংসারের উপকারকল্পে যে কন্যাদান বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা কি যথেষ্ট নহে? কারুণ্যের উদয়েই ত দান হইয়া থাকে—এই দানের উপর আবার জুলুম কেন?

একেই ত আমাদের এই হতভাগ্য সমাজে ধনীর সংখ্যা অতীব অল্প এবং বর্দ্ধিষ্ণু। দুই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত দরিদ্রের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অল্প ছিল, যখন বেশ ভূষা ও বাহ্য আড়ম্বর অপব্যয় মনে করিয়া পূর্ব্বেকার গৃহপতি গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ ও গোলাজাত ধান্যে পরিপোষিত হইয়া নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া ভবিষ্যৎ ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, যখন উৎপন্ন ধনের মিতব্যয়িতা জানিতেন অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে এরূপ ধন গ্রহণ করিতেন যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথবা যাহার ভোগান্তেও মূল্য পাওয়া যাইত বা যাহা সম্পত্তিরূপ মূলধনে রূপান্তরিত হইতে পারিত, তখন সমাজের সেই স্বচ্ছল অবস্থায় যে সকল আচার ব্যবহার করিয়া লোকে কৃতার্থম্মন্য হইতেন, এখন এই দুর্দ্দিনেও আমরা ততোধিক ব্যয় করিতে একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প! সমাজের এখনকার ভ্রান্ত নিয়মগুলি বিমূঢ়ের ন্যায় অনুবর্ত্তন করিবার আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে জ্বলন্তবহ্নি শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের সিদ্ধান্তের অনুরূপ, অথবা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালকের কার্য্যপরম্পরার সমতুল্য, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

যিনি সন্দেহ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি এখন অর্থের মূল্য কি প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয় নাই? নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১০০ টাকা বেতনের চাকুরি গ্রহণ করিয়া আত্মীয়স্বজনের কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ কাল ৩০০টাকায় তাহা লাভ করিতে পারেন না। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। এখন যিনি ২০০ শত টাকা পাইয়া থাকেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ৬০ টাকা পাইতেছেন অর্থাৎ পূর্ব্বে ২০০ টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাইতেন, এখন প্রায় তাহার এক তৃতীয়াংশ পাইতেছেন, এবং এখন যিনি পঞ্চাশ টাকা পাইতেছেন, বাস্তবিক তিনি পূর্ব্বেকার প্রায় ১৭।১৮ টাকা পাইতেছেন। আজকাল একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শতকরা অধিক লোক ৫০৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহেন। যে সমাজের অবস্থা এখন এইরূপ, সে সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়-সংযম-বিধি প্রবর্ত্তিত না হইলে অধিক পরিবারে যে অশিক্ষিতের ও ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত ব্যক্তির অধিক আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কার্য্যপরম্পরার ফলসমষ্টিতে সমাজশরীর গঠিত হয়। অতএব অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অনুপযুক্ততা নিবন্ধন সমাজশরীর যে দিন দিন ক্ষীণ ও ভঙ্গুর হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সামাজিক ব্যক্তিমাত্রকে উপযুক্ত করিতে মূলধন আবশ্যক এবং মূলধন ব্যয় সংযমের ফল। অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ব্যাপারে অপব্যয় হইলে আবশ্যক কার্য্যে ব্যয় করিবার ধনসংস্থান শূন্য হয়। এ কারণে বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া কন্যাকে ত শিক্ষা দেওয়াই হয় না, অধিকন্তু নিজ বংশধরের শিক্ষাতেও বাধা উপস্থিত হয়। অনেকে হয় বাল্যবিবাহের ফলে শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত হওয়ায় নিজে শিক্ষালাভ করিতে পারেন

নাই, অথবা কর্ম্মের সাকল্যে শিক্ষিত হইলেও নিজে শিক্ষা দিবার অবকাশ পান না, অথচ বেতন অল্প এবং কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া শিক্ষকও নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহা সামান্য অসুবিধা নহে।

আজ উক্ত অসুবিধা জন্য তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যে কত অশিক্ষিত লোক বর্ত্তমান, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। এই কারণেই দুই একটী অনূঢ় শিক্ষিত যুবকের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেককেই প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই নিমিত্তই সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে অধীর হইয়া পড়েন। ব্যক্তি মাত্রেরই সৎপাত্রে কন্যাদানের ইচ্ছা বলবতী হওয়া অবশ্য দোষের কথা নহে, বরং সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু এই ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত অভিলাষ পূর্ণ করিতে গৃহস্থ যাহাতে সর্ব্বস্বান্ত না হন, তাহা কি সমাজের লক্ষ্যীভূত নহে? স্বীকার করি আজি কালিকার এই ভীষণ জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত ব্যক্তিরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যোগ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, উপযুক্ত হওয়া কঠিনতর ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়। মলিনমুখ, করতলন্যস্তগণ্ড, নৈরাশ্যে স্তিমিতহৃদয়, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, নিজ পুত্রকে জীবনসংগ্রামে বিজয়ী করিতে, কিরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, তাহা কি উপলব্ধি করা সুকঠিন?—এই দরিদ্রপ্রধান দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদন ও নিজসংসারমঙ্গলসাধন কল্পে দরিদ্রের ব্যয়সংযমে ও বহু ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ, যদি কন্যার সহিত অন্য গৃহে চলিয়া গেল, তাহা হইলে সে পরিবারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কতটা আশা করা যাইতে পারে? একেই ত এই শ্রীহীন সমাজে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর এই সমাজ-নিয়মে যদি দরিদ্রকে অধিকতর দরিদ্র করা হয়, এবং উল্লিখিত অপব্যয়গুলি সমাজানুমোদিত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহাদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিবাহের পূর্ব্বে স্বাবলম্বন* যে একটী অপরিহার্য্য অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া পূর্ব্বে বিবেচিত হইত, তাহা একেবারে আমাদের চিন্তাপথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, স্বাবলম্বনশিক্ষার অভাবে শতকরা কত নবীন জনক যে কিরূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহা সহৃদয় অনেক পাঠকেই অবগত আছেন। আজকাল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করিবার সময় গোয়ালার নিকট ভাড়া করিয়া অথবা অন্য স্থান হইতে অজ্ঞাতকুল ক্ষুদ্রকায় বৃষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহার উপর সমাজ বন্ধন শিথিল হওয়াতে এবং দেশের ধন বৃদ্ধির উপায় দেশীয় লোকের বিদিত না থাকাতে

* যে জাতির উপনয়ন হয়, তাহাদের বিবাহের বয়স একপ্রকার বহুকাল হইতে স্থির আছে। গুরুর নিকট উপনীত হইলে তাহাকে বেদ ও বেদাঙ্গাদি পড়িতে হইত। সেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপন হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হইত অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে আগমন করিলে সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কিন্তু কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন! এখন সেই দিবসে সেই অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া শিষ্যকে যে সকল কথা বলান হয়, তাহা কি বাস্তবিক ধর্ম্মভীরুর কার্য্য? এখন তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যায় ত্রয়ীবিদ্যা শিক্ষা করা হয়, এবং একদিন ভিক্ষায় স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। পূর্ব্বে মহানাম্নী ব্রত, গৌদানিক ব্রত এবং আরণ্যক ব্রত সমাপনে রীতিমত স্বাবলম্বন শিক্ষার পর সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সমাপিত হইত এবং সমাবর্ত্তনের পর যুবক বিবাহের উপযুক্ত হইত। তখনই ব্রহ্মচারী সংসারী হইবার পাত্র হইতেন। এখন কয়জন উপনয়নের পর দশ বার বৎসর শিক্ষা করে এবং শিক্ষার পর স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত হয়?

শত শত গাভী নগরীর কসায়ের হস্তে অর্থের নিমিত্ত বিক্রীত হইতেছে। যে প্রকারের সদ্যোপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গোখাদকদের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলে সেই প্রকারের বৎস সহ গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান বঙ্গদেশে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস পাইতেছে। এইরূপে যে পরিমাণ ধননাশ হইয়াছে, তাহার যদি সমষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের সমান হইবে! গো-জাতির ধ্বংস হেতু দুগ্ধ ও অন্যান্য সামগ্রী মহার্ঘ হওয়ায় কয়জন জনক তাহাদের পুত্রকন্যার শারীর ও মানসিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার ও পানীয় দান করিতে সমর্থ? ডাক্তারগণ বলেন, ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা অপেক্ষা পুত্রের অধিক আহার্য্যের প্রয়োজন; এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, এদেশে অল্পবয়স্ক বালকদের মৃত্যুর হার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে আহার ও পানীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া ভবিষ্যৎ যুবক ধনোৎপাদনে সমর্থ হইবে, তাহার কিরূপ সংস্থান করিয়া যুবকগণ বিবাহ করিতে উন্মত্ত হয়েন? এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে অনর্থক মেধাহীন দুর্ব্বল সন্তান সন্ততির আবির্ভাবে সহায়তা করা কি স্বজাতির গৌরব-রক্ষার অন্যতম উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? দরিদ্র পিতার এরূপ অসার সন্তানের আবির্ভাবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্যা যে, নিম্নশ্রেণীর মত ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা যে, ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া পড়িবে ও অতৃপ্তির ভীষণ আর্ত্তনাদে দেশ যে আলোড়িত হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে যে সকল উপায় বিবৃত হইল, দেশে ঐগুলির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইলে দেশের যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং হিন্দুজাতির সংখ্যা যে আর অধিক হ্রাস না পাইয়া আবার বৃদ্ধিলাভ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিবার কারণ দেখা যায় না। তাহা হইলে ভারতের গৃহে গৃহে আবার সুখসমৃদ্ধির বাসন্তী-কৌমুদী হাস্য করিবে; ভারত হইতে এই দারুণ জীবনসংগ্রাম ও অতৃপ্তির লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ বিদায় লইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করালমূর্ত্তি তখন ভারতে আর আবির্ভূত হইবে না। কমলার কৃপাকটাক্ষে ও বীণাপাণির বাঞ্ছিত বর লাভে বঙ্গদেশের হিন্দুজাতি মাত্রই সুখ শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, বোধ হয় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইতেছে। আমি আপনাদিগকে আর অধিকক্ষণ আটক না করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণরূপ গলগ্রহ হইতে শীঘ্রই উন্মুক্ত করিব। এইবার

দানধর্ম্ম ও দারিদ্র

সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া আপনাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব।

সভাপতি ও সভ্যমহোদয়গণ,

পরিশ্রমলব্ধ ধনসামগ্রীর বা অর্থের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী না পাইলে কেহ সহজে উহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু দয়ার বা করুণার উদয় হইলে প্রাপ্ত ধনে নিয়োজিত পরিশ্রমের কথা মনে উদিত হয় না। পরোপকার-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ দান করিয়া থাকে। এই দান করিবার প্রবৃত্তি সকলের নাই বলিয়া দাতার যশঃ সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হয়; কিন্তু যাঁহারা স্বগৃহে বিপন্নের বা আতুরের সাহায্যে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং যশোলাভ বা উপাধি-লালসায় যাঁহারা সময়ে সময়ে মুক্তহস্ত হয়েন, তাঁহারা

দান করিয়াও প্রকৃত দাতার পরোপকার জন্য দান বা আত্মবিস্মৃতি সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন না।

দানের সহিত পরোপকার-ধর্ম্ম এরূপ ভাবে বিজড়িত যে, "যে কোন উপায়ে দান কর—কেবলই দান কর—দানের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই" এই সকল মত সমর্থন করিয়া যে কোন প্রচারকই প্রচার করুন না কেন, তাঁহার শ্রোতারা একতানমনা হইবেন; কারণ সকলেরই মনে হইবে যে, তিনি মানব জাতির যথার্থ কল্যাণ কল্পনা করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কারুণ্যের কোমল রসে বিগলিত হইয়া জনহিতকর কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সমাজের দুঃখ যাতনা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু "এই প্রকার দান ভাল, এই প্রকার মন্দ" এ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, মানব-মন উহা দানকাতরতার লক্ষণ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া তিনি তর্কে জয়ী হইলেও মনে হয় যে, দানে বাধা দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প এবং সঙ্কীর্ণতার আবরণ করিতে তর্কপ্রপঞ্চের সাহায্য লইতেছেন। অনশনে প্রাণত্যাগ হইতে পারে, অনাহারে ক্লেশ পাইবে, এ কথা মনে ভাবিতেও কষ্ট হয় এবং সাধ্য থাকিতে উহার নিবারণকল্পে চেষ্টা না করিলে যেন পাপ করিতেছি মনে হয়। এই ভয়ে হিন্দুসমাজে "দিও কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিত" কথার প্রচলন হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত দানকাতর, তাহাদিগকেও হিন্দুসমাজে দান করিতে হয়; কারণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্ম এবং তীর্থদর্শনে গিয়া দান না করিলে সুফল লাভ হয় না। মহা মহা তীর্থস্থান ব্যতীত প্রতি গ্রামেই হিন্দুর দেবতা আছেন এবং গ্রামবাসী অনেককেই সময়বিশেষে তথায় পূজা দিতে যাইতে হয়। দান করিবার ইচ্ছা থাকিলে তথায় দানের উপযুক্ত পাত্রেরও অভাব নাই এবং ধর্ম্মের সহিত দানের এমনই সম্বন্ধ যে, উপযুক্ত পাত্রে দান না করিলে পূজায় ফল লাভ হয় না বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হয়। দানকল্পে কি অদ্ভুত সমাজবিধি! ইংলণ্ডে কিন্তু এলিজাবেথের সময় হইতে আইনের সাহায্যে দরিদ্রকে দান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে মহকুমা বা পরগণা বিশেষের বিত্তবান্‌কে তথাকার দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ-কল্পে আইনসঙ্গত দণ্ডের ভয়ে চাঁদা দিতে হইত। ঐ চাঁদার টাকায় এক এক পল্লীসমাজ তথাকার দরিদ্রভরণভার গ্রহণ করিতেন। ব্যক্তিগত কারুণ্যের বিকাশ হইবার আশায় দরিদ্র ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না বলিয়াই এই সকল সামাজিক দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই নিমিত্তই আমাদের দেশে পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল। তথাকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিকট সাধু সন্ন্যাসীর এবং শ্রমাসমর্থ আতুরদের অন্ন-সংস্থান হইত। দানের পাত্রাপাত্র বিচারভার অধিকারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। এই অধিকারী গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী দ্বারা গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ নির্ব্বাচিত হইতেন। এখন সে দান নাই, সে নির্ব্বাচনে যত্নও নাই।

মানব-হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি যত দিন জাগরূক থাকিবে, ততদিন এক প্রকার দানে মানব কখনই সন্তুষ্ট থাকিবে না। সামাজিক দান করিয়াই কারুণিক ব্যক্তি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহার দানের যে কত প্রকার পাত্র, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জাতীয় লোকের দয়ায় সামাজিক দান ব্যতীত ব্যক্তিগত দানেরও ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। কিন্তু ভিখারী বুঝিতেও বলিহারি। তাহারা গুপ্ত দান ও সামাজিক দান উভয় দানেরই পাত্র হয়। কূটনীতিও তাহাকে একপ্রকার

দান প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। ভিক্ষা যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ভিক্ষা-লাভের অভূতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিতে শিক্ষা করে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে সন্ন্যাসী ফকিরকে দান করা হইত, এখন সে কারণে তাহাদিগকে আর দান করা হয় না। পূর্ব্বে তাহারা আকাঙ্ক্ষা ও বিলাসবাসনা ত্যাগ করিয়া সমাজকে সৎশিক্ষা প্রদান করিত; পরন্তু তাহারা এখনকার বাক্‌পটু, চতুর, চটুল সন্ন্যাসী ফকিরের মত ভণ্ড ছিল কি না সন্দেহ। অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইলে তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাঘাত হইবে এবং তাহাদের অনুকরণে দেশে ধর্ম্মপ্রাণ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে ভাবিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দানবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সে বিধির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে সকল সন্ন্যাসী ফকিরকে কষ্টার্জ্জিত অর্থের একাংশ প্রদান করি, তাহাদের কয়জন ধর্ম্মচর্চ্চা করে? তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর ও ভেক কত যে সরলচিত্তকে মোহিত করে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। যে দেশে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থব্যয় সমাজানুমোদিত নহে, সে দেশে দেবতার দোহাই দিয়া যে কত কপট ধার্ম্মিক ও সেবায়েত প্রতারণা-সাহায্যে অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধন অনায়াসে ভোগ করিতেছে, তাহার কথাই বা কি বলিব? যে দেশে ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে কতকবার বিনীত হইতে হয়, কতবার মনে আশঙ্কা হয়—বুঝিবা শাপভ্রষ্ট হই—যে দেশে পাপমুক্ত হইতে অথবা নিজ কল্যাণ সাধন করিতে কিছু না দিয়া বঞ্চিত করিতে সদাই আশঙ্কার উদয় হয়, সে দেশের ভিখারী, প্রাতঃকালীন আহার সমাপনপূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে যে হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইয়া আপন ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু "জয় রাধে" বলিয়া কঙ্কণবলয়াভরণা বৈষ্ণব-কন্যা অথবা "ভিক্ষা দাও মা" বলিয়া নধরকায় যুবা যখন আমাদের অনুকম্পার পাত্র হইয়া ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিতে থাকে, তখন সমাজে অলক্ষিত ভাবে যে অকল্যাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা কি ভৃত্যাভাবে ব্যতিব্যস্ত গৃহস্থ অনুভব করিতে অক্ষম?

স্বীকার করি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রম-বিনিময়ে তাহারা অল্পধন উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু মজুরী অল্প হইলে অন্য নানাধিব ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান হইয়া পুনরায় যে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, একথা কে না বুঝিতে পারে? পূর্ব্বে এক টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া যাইত, এখন তাহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; অথচ পরিশ্রম বিনিময়ে উপার্জ্জিত বেতনেরও পরিমাণ-বৃদ্ধি হইতেছে না। অতএব সেই বেতনে পূর্ব্বাপেক্ষা এক চতুর্থাংশ লোকের অন্ন সংস্থান হইবার কথা। যে দেশে ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে না, সে দেশে বেতনের এই অল্প ক্রয়কারিণী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অপাত্রে দান করাও সঙ্গত নহে। অনেকে বলেন, দেশের বিত্তবান্ ব্যক্তিরা যদি কেবল অপরিহার্য্য নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ভোগেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিরে উদ্বৃত্ত অর্থে ভিক্ষা দান করিলে দেশের দারিদ্র্য-নাশ হইতে পারে; কিন্তু দেশীয় নির্ম্মাতা ও প্রস্তুতিকারকদিগকে ধর্ম্মসঙ্গত উপার্জ্জনে বঞ্চিত করিয়া অলস ব্যক্তির অন্ন সংস্থান করিলে পূর্ব্বোক্ত লোকদিগের মধ্যে কি দারিদ্র্য আহ্বান করা হয় না? ফলতঃ এই সকল উপায়ে দেশে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই নিমিত্ত দানের পাত্র নির্দ্ধারণ করা কেবল যে সময়সাপেক্ষ, এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণসাধনচিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইলে উহা সম্পূর্ণ বিচারসাধ্য।

যখন আমরা ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অলীক সামাজিক ভয়ে, অথবা পাপমুক্ত হইতে কিংবা নিজ কল্যাণ-সাধন করিতে ইতস্ততঃ করি, তখন অবশ্য সমাজের কল্যাণ আমাদের মনে সকল সময় স্থান পায় না। বাস্তবিক সামাজিক জীব হইয়া সমাজের কল্যাণ না দেখা কি স্বার্থপরতা নহে? যদি সামাজিক দানে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যক্তিগত দানের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তাহা হইলে সে দানের কথা প্রকাশ করায় লাভ কি? শ্রমসমর্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে বিনা পরিশ্রমে তাহার অন্ন সংস্থান হইবে, দুষ্ট ভিক্ষাব্যবসায়ীকে এ কথা কেন জানিতে দিবে? এ রাজসিক দানে নিজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। এই জন্যই সাত্ত্বিক দান সমাজের মঙ্গলময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাহা জানিতে না পারিলে, শ্রমসমর্থ অলস জগৎ উহা কিরূপে অবগত হইবে। ইহাতে যে কেবল নিজের রজোগুণ হ্রাস পাইবে এরূপ নহে, সমাজের কল্যাণ অলক্ষিত ভাবে সাধিত হইবে বলিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বর কেবল উহার বিষয় জানিবেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহামতি ম্যালথাস্ এককালে মহাপুরুষকণ্ঠনিঃসৃত অকাট্য প্রমাণসূচক বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের দীন-বিধির (poor Law) বিভীষিকায় পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া যে দানবিধি প্রচলিত ছিল, তাহারই ফলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায়, স্যার ম্যাথিউ হেল সেই দানসংগৃহীত বিপুল অর্থে ওয়ার্ক হাউস অর্থাৎ আবেশন সকল প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলে। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যবশতঃ ১৭২৩ সালে আইন সাহায্যে তাঁহার পরামর্শ প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সামাজিক দানের হিসাব নাই। ইংলণ্ডের পল্লী সমাজে যে সকল দানের ব্যবস্থা আছে, তাহার বাৎসরিক বিবরণ হইতে এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, দানভাণ্ডার যতই পূর্ণ হইবে দেশে ভিখারীর সংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে দেশে দানবিধি নাই, সে দেশে ভিখারীও অল্প। পরিশ্রম না করিয়া অপরের উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশের অধিকারী হইতে পারিলে পরিশ্রম করিয়া যে ধনলাভ করিতে হয়, এ ধারণা চিরজীবনে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। রোগ না থাকিলে লোকে হাঁসপাতাল যায় না, কিন্তু অন্নবস্ত্রাভাব না থাকিলেও লোকে দাতার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট বস্ত্র বা তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া উহা অন্যের নিকট বিক্রয় করে, কিম্বা তদ্বিনিময়ে অন্য কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বা ধনীর যেরূপ অভাবের সীমা হইতে পারে না, সেইরূপ দরিদ্রও আপন অভাব অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। ফলতঃ দানের ভাণ্ডার থাকিলে এবং দাতার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইলে ভিখারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃতকর্ম্মা শ্রমজীবী শ্রমাসামর্থ্য জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে উদর পূর্ণ করে। ইহার ফলে শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস হয়, উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন সামগ্রীতে দেশের অভাব পূর্ণ হয় না; অপিচ দারিদ্র্য-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যক্তি নিচয়ের সমবায়ে যে দানসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাতে আবেশন (work-house) সংস্থাপিত হয়। কেবল শ্রমাসমর্থ ব্যক্তি যে তথায় আশ্রয় লাভ করে এরূপ নহে,

কর্ম্মসংস্থানহীন অথবা অঙ্গহীনের মধ্যে যাহাদিগের দ্বারা শ্রমবিভাগে যে পরিমাণ কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকেও কর্ম্ম করাইয়া নিজোপার্জ্জন সুখ অনুভব করিতে দেওয়া হয়। পদহীন কলে সেলাই করে, হস্তহীন পাদদ্বয়ের সাহায্যে কল চালনা করে; অলস ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়া কর্ম্মগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের মতে এরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, প্রকাশ্যে ভিক্ষা চাহিলে অথবা অকারণ ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহারা দণ্ডনীয় হয় এবং তাহাদিগকে কর্ম্মগৃহে লইয়া গিয়া কর্ম্ম করাইয়া অন্নদান করা হয়; যাহারা শ্রমাসমর্থ তাহাদিগকে অন্নসত্রে (alms-house) প্রেরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে গোরক্ষিণী সভা ভিন্ন ইতর দরিদ্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত অন্য কোন সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। গোধনবৃদ্ধিতে যে দেশের ধনাগম হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং উহার প্রতিপালনে বলিষ্ঠকায় হইতে করীষকারিণী বৃদ্ধারও যে অন্নসংস্থান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

একটী মাড়োয়ারী সমাজ সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে ভদ্র লোকদের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গো-মহিষাদি পোষণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্য ছিন্ন মূলে জলসেচনের ন্যায় বলিতে হইবে; কারণ যে প্রকারের সদ্যোপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গো-খাদকের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিয়া তাহাদের রক্ষক ও সেবকদের অন্ন সংস্থান করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলেই সেই প্রকারের দুগ্ধবতী গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং যেগুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে! ঐ সকল জীবের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছেন; অস্থিসংগ্রহকারীরা তাহাদিগের কঙ্কালগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে এদেশের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে কারণে বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল কারণের বিষয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এখন কেবল ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিতে অনেক গোরক্ষিণী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে; কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে দেশে গাভীর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসী যে কেবল গাভী বিক্রয় করিয়া ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতেছে এরূপ নহে, অপরের গাভী সেবা করিবার সুযোগও পাইতেছে না। গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে তাহারা আর পূর্ব্বের মত দুগ্ধ খাইতে পাইতেছে না, কাজেই তাহারা শারীরিক ও মানসিক বলে বঞ্চিত হইয়া আপনারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় ও মেধাহীন সন্তান-সন্ততিতে বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেশে দরিদ্রতা আহ্বান করিতেছে।

দলে দলে আগত যত অপাত্র ভিক্ষুককে দান করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দরিদ্রতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রতীকার কল্পে নির্দ্ধারিত উপায়ে দান করা সমাজের সকলেরই বিবেচনার বিষয়। এক কলিকাতা সহরে মুষ্টিভিক্ষারূপে যে চাউল দান করা হয়, উহার সমষ্টির মূল্য বৎসরে যে

কত লক্ষ টাকা, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ অর্থে উহাদের মধ্যে যাহারা শ্রমসমর্থ, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইলে দেশের কি উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না? এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে অলসকে কি কর্ম্মঠ করা যায় না? আগাছার ডাল না কাটিয়া সমূলে উৎপাটিত করিলে দারিদ্র্য-দুঃখ কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। নচেৎ তাহারা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে। উহাতে পরের উপকার করা দূরে থাকুক, সমাজের অপকার সাধিত হইবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে আত্মপ্রসাদ ত পরের কথা, সমাজ-কল্যাণও সুদূরপরাহত হইবে।

দেশে কমলার বরপুত্র বিলাস-পরতন্ত্র পরোপকার-প্রবৃত্তিশূন্য মানবের অসদ্ভাব নাই। কত শত মহাত্মার বাহিরে একপ্রকার, ভিতরে আর একপ্রকার; প্রবঞ্চকদের পক্ষে ইহাদের অনেকের ধনভাণ্ডারদ্বার অবারিত। কিন্তু এই হতভাগ্যদিগকে উপাধিলোভ ও সমাজখ্যাতি দেখাইয়া রাজপুরুষ ও দেশহিতৈষিগণ কত না শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লয়েন। ইহাদিগের এই প্রকার দান কিন্তু সর্ব্বদাই মঙ্গলময়, কারণ দেশহিতৈষী বুদ্ধিমানের প্রয়োচনায় উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের এই মতের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। হাঁসপাতাল, বৃহৎ পুষ্করিণী খনন, ব্যবহারিক শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি জনহিতকর বৃহদনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির দানে উহা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও উহার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু জগতে অধিক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল এবং উহাদের মধ্যে দানশীলের সংখ্যা আরও বিরল। মহম্মদ মহশীন্ বা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ-দান এবং এজ্রা বা শ্যামাচরণ লাহার হাঁসপাতালে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ঐ জাতীয় দানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইলে জগতের কল্যাণ-সাধনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। অতএব যিনি যে পরিমাণে দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের দেয় অর্থের সমষ্টি সংগৃহীত হইলে অতি সত্বর জগতের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের মত দেশে যখন এক বৎসর ফসল নষ্ট হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধনের অভাবে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত হইতে হয়, তখন শ্রামিকদের কর্ম্মসংস্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। অনেকে শ্রামিককে স্থানান্তর করা উচিত বলিয়া প্রচার করেন, অনেকে চাঁদা করিয়া তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, অনেকে কিন্তু তাহাদের দিয়া বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শ্রামিকদিগের স্থানান্তরিত করিলে যে দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, সেই দেশের শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হ্রাস হইতে থাকে। যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সাহায্যে নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহাদের আগমন প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশে যথাসময়ে লোকাভাব হইবে ও তথায় শ্রামিকদের বেতন অযথা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অল্পসংখ্যক বলিয়া সে দেশে অধিক ধনোৎপত্তি হইবে না।

চাঁদা করিয়া শ্রামিকদের জীবনধারণের সংস্থান করা ও ভিক্ষা দেওয়া একই কথা। ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে মূলধন অল্প হইবে বা

বৃদ্ধি পাইবে না এবং মূলধন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মূলধনের অভাবে কার্য্যানুষ্ঠান রহিত হইলে শ্রামিকের ভবিষ্যৎ আশামূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে না দিয়া চাঁদার অর্থে স্থানান্তরে যাওয়া পর্য্যন্ত বা বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করা শ্রেয়ঃ।

বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ যে সকল কার্য্য অপরাপর সকলে করিতেছে, সেই কার্য্য করাইয়া লইলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা হয়। এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজা এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মালামালের পরিচালনের সুবিধাপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় না এবং কর্ম্মসংস্থান হেতু শ্রামিকেরা সাহায্য (relief) পাইয়া থাকে।

এতাবৎ যে সকল দানের কথা বিবৃত করা হইল, আমাদের ভদ্রগৃহের পুরুষ বা কন্যা ঐরূপ সাহায্য কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। ইংলণ্ডেও ঐ জাতীয় লোকের দুঃখ-নিবারণের উপায় দেখা যায় না। স্কট্‌লণ্ডদেশে কিন্তু চরিত্রবান্ দরিদ্রকেও অর্থ সাহায্যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতে এরূপ কার্য্যকরী বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল যে, তাহার কল্যাণে ভদ্র ঘরের লোকে অন্নবস্ত্রের অভাব বড় একটা অনুভব করিতে পারেন নাই। একান্নবর্ত্তিতার কল্যাণে কেবল যে নিতান্ত আত্মীয় স্বজন একত্রে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সুখে দিনাতিপাত করিতেন এরূপ নহে, কত দূর কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীও অন্নজল বস্ত্র ও আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে সংসারের অন্য লোকাপেক্ষা অভিন্ন ভাবিয়া ঐরূপে কালহরণ করিয়া গিয়াছেন। অথচ চরকায় সূতা কাটিয়া অনাথা বিধবা কখন গৃহপতির গলগ্রহরূপে অবস্থান করেন নাই।

স্বীকার করি কলে সূতা কাটার ব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর চরকার সূতায় লাভ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ধনাগমের সহায়তাকল্পে আত্মীয় অনাথ ও অনাথারা কি কোনরূপে উপযোগী নহেন? এখনকার গৃহপতির মূলধনের সাহায্যে সেলাইয়ের কলে অথবা মোজার কলে কেবল পেট-ভাতায় কি তাঁহারা বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর কিংবা মোজা তৈয়ারি করিয়া বাজার পরিপূর্ণ করিতে পারেন না? পল্লীগ্রামে তেঁতুল কাটিয়া তাল করিয়া কি পর্ব্বতাকার করিতে পারেন না? সস্তায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আম কাটিয়া অল্প শিক্ষাসাধ্য চাট্‌নি করিয়া কি সমগ্র পৃথিবীর চাট্‌নি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না? অথবা মসলা চূর্ণ করিয়া পরিমাণমত সংমিশ্রণপূর্ব্বক ইউরোপ ও আমেরিকার অভাবমত মসলা অল্পমূল্যে সরবরাহ করিতে পারেন না? তাঁহারা সকলই পারেন এবং তাঁহাদিগকে গলগ্রহও হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রম-বিভাগ-প্রথায় ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন।

আমাদের সমাজকর্ত্তারা ভূয়োদর্শন গুণে যে সকল সমীচীন রীতির প্রচলন বিষয়ে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, আজিকালি তাঁহাদের বংশধরগণ বিলাসপরতন্ত্র ও দৃষ্টিহীন হইয়া এবং পৃথক্ থাকিয়া, পরদুঃখকাতরতাকে স্বার্থোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়, কলিকাতায় থাকিয়া পৃথক্‌ভাবে আত্মোন্নতির পথ অনুসন্ধান করেন; কিন্তু

তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভার কে গ্রহণ করিবে। যাহা সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ আহ্বান করা কখনই দূরদর্শিতার লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ কিছু দান করিয়া মনে করেন, সমাজের কল্যাণ সাধন করিলেন, অথবা আত্মীয়স্বজনের উপকার করিলেন; কিন্তু দান কার্য্যকর বা সার্থক না হইলে দেশের অর্থনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং দানকাতরতা তাহার অন্যতম ফল। ভিক্ষুক হইতেই বা কাহার সাধ? যাহাকে সমাজ ভিক্ষুক হইতে দেয় নাই, আজ তাহাকে ভিক্ষুক সাজিতে বলা যে কেন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

আত্মা এক না অনেক?

স্মরণাতীত কাল হইতে আত্মার স্বরূপ লইয়া আর্য্যমনীষীদিগের মধ্যে কতই বিচার না চলিতেছে; কতই গ্রন্থ না প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি প্রতীচ্য ভাবের এই অভ্যুদয় ও বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির যুগেও আত্ম-বিদ্যার গবেষণা চলিতেছে। যাঁহারা এক সময়ে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, দেখিতেছি তাঁহারাও এক্ষণে অন্তর্মুখ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ দেখিয়া ভরসা করিতে পারা যায় যে, "অপরা" বিদ্যা "পরা" বিদ্যাকে মেদিনী-পৃষ্ঠ হইতে কোন প্রকারে বিদূরিত করিতে পারিবে না। "অপরা" বিদ্যায় যতই কেন নব নব ভোগ বিলাসের শাবর মন্ত্রে জনতাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক না, কিছুতেই "পরা" বিদ্যার কল্যাণপ্রসূ ও শান্তিপ্রদ উপদেশকে অন্ততঃ বিচারশীল ব্যক্তিরা ভুলিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশবাসীরা ইতঃপূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর ভক্তির খুটিনাটি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। যদিও রামমোহন রায়ের সময় হইতে উপনিষদী বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছিল, তবুও বড় কেহ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেবল এইমাত্র হইয়াছিল যে, কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদকে অবজ্ঞা করিতে ও অভিনব মনগড়া নিরাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের মহিমা গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। অবশ্যই এই গীতিকা নিষ্ফলে যায় নাই। কেননা ব্রাহ্মসমাজ তাহার ফল স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই ফলটা হিন্দুসমাজের পক্ষে সরস হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। যাহা হউক, এক্ষণে বাঙ্গালীরা যে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে শিখিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যগ্রতা তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে গীতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, উহাও বেদান্তানুরাগ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভগবান্ শঙ্করও গীতাকে বেদান্তের প্রস্থান বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আর

বেদান্তশাস্ত্র যে আত্মতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা তদধ্যায়ীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মার একত্ব বেদান্তশাস্ত্রের অভিধেয় হইলেও অনেকেই ইহাকে নানাত্মবাদে লিপ্ত করিবার প্রয়াসে ত্রুটী দেখান নাই। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সম্বন্ধে বড় বড় পুঁথিও লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ পুঁথিগুলি অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিপাদক শঙ্করভাষ্য প্রভৃতির ন্যায় সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এইত গেল পুরাকালের কথা। আবার বর্ত্তমান সময়েও সাময়িক পত্র প্রভৃতিতে কেহ না কেহ নানাত্মবাদের কোলাহল করিয়া থাকেন। যদিও এই কোলাহলে বিশেষদর্শীর কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তবুও অল্পদর্শীর মন তরঙ্গায়িত হইতে পারে, এইজন্য আমরা এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে সত্যের মীমাংসা করিয়া লইবেন।

আত্মার মৌলিক রূপের সহিত পরিচিত হইলে আত্মা এক বা অনেক ইহা বুঝিতে সুযোগ ঘটিয়া আসিবে, সুতরাং প্রথমে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আত্মা যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত দেহ হইতে পৃথক্ একটা অপরিণামী বস্তু, এই বিষয়ে কোন আস্তিক সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একত্ব বা অনেকত্ব লইয়া বিবাদ থাকিলেও তিনি যে অজর, অমর, নিত্য চেতন বস্তু এই বিষয়ে তাঁহারা একমত। বর্ত্তমান সময়েও যে আস্তিক আর্য্যেরা আত্মার নানাত্ব লইয়া কোলাহল করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মাকে উৎপন্ন জিনিষ মানিয়াও অনন্ত বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহাদের কথার কোনই অর্থ নাই। কেননা যে বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে এই মতটা দার্শনিক যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া কোন প্রকারেই বিদ্বন্মণ্ডলীর উপাদেয় হইতে পারে না। আত্মা বলিতে যখন একটা অপরিণামী বস্তু বুঝা গেল, তখন পরিবর্ত্তন স্রোতে যে সকল জিনিষ যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিতে পারা যায় না। আর বৈদ্যুতিক অণুকে বাদ দিয়া নিখিল জড় বস্তুই অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতেছে। সুতরাং অপরিণামী বলিয়া আত্মাকে অণু সংগঠিত কোন জিনিষ বলা যাইতে পারে না। অণুকে আত্মা বলিলে তাহার মৌলিক অপরিণামিত্ব কোন প্রকারে বজায় রাখিতে পারিলেও এক এক শরীর অসংখ্য অণুর মিশ্রণে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যেক শরীরই অসংখ্য আত্মার লীলাভূমি হইয়া পড়িল। আর এইরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা প্রভৃতির উৎপত্তি সামঞ্জস্য ও তদীয় নিয়ম সুশৃঙ্খলা রক্ষা করাও অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে অণু বিনষ্ট না হইলেও তাহার স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন তাঁহাকে আত্মার স্থানে অভিষিক্ত করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পর গুণ বা স্বভাব বিনিময়ের আপত্তিটা আসিয়া পড়ে! অর্থাৎ স্বতঃই পণ্ডিত মূর্খে পরিণত এবং মূর্খ পণ্ডিতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে; কেননা, অণুরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ আত্মা অরিরত প্রবেশে বা নির্গমনে রত রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝা গেল যে, অণুকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই জন্য বৈজ্ঞানিক শক্তিকে আত্মা বলিবার অধিকারটা বিলুপ্ত হইল না। শক্তিকে আত্মার আসনে বসাইলে ভূতগুলিও আত্মার অধিষ্ঠান ভূমি হইয়া পড়ে, কেননা উহাদের মধ্যে শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার নহে; কারণ আত্মা সর্ব্বব্যাপী। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য-ধীরাঃ" শক্তির আত্মপদ স্বীকার করিলে তাহার মৌলিক রূপ এক হওয়াতে আত্মারও মৌলিকরূপ এক হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এক শক্তির বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বস্তুতে যে কার্য্য হইতেছে, ইহাও বিজ্ঞান বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থাতেও যদি কেহ প্রাণি-জগতে যে শক্তির পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া উহার কারণীভূত শক্তিকেও এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়া লন, তবে আত্মারও প্রকারান্তরে নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু এই সিদ্ধান্তটাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত করা সহজ ব্যাপার নহে। আর কোন প্রকারে প্রমাণিত করিতে পারিলেও কার্য্যকারিত্বের দিক্ দিয়াই শক্তির ভিন্নতা প্রতিপন্ন হইবার কথা, কিন্তু মূল স্বরূপের দিক্ দিয়া নহে। এখন দেখিতেছি, শক্তির মূল স্বরূপটা যেরূপ একত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ইহাতে ভিন্নতা কোন প্রকারে উহার অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে আত্মা ও শক্তির তাদাত্ম্য স্বীকার করিলে আত্মা লইয়া যে নানাত্বের বিবাদ চলিতেছে, তাহারও উপশম হওয়া উচিত হইলে কি হয়? অনেকেই "আমার পাঁঠা আমি লেজে কাটিব" নীতির অনুসরণ করিতেছেন। যেরূপ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আত্মতত্ত্বের পর্য্যবসান করিলে তাহার একত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইতে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টির প্রত্যাহারেও সেইরূপই ঘটে কি না, ইহার আলোচনা করা যাউক। যখন আত্মা যে পরিণতির পরপারস্থ একটা জিনিষ, ইহা আস্তিকমণ্ডলীর পক্ষে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তর্জগতের মধ্যে যাহাকে ঐরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইব, তাহা ব্যতীত অপর কাহাকেও আত্মা বলিয়া সনাক্ত করা উচিত নহে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাগুলির মধ্যে যাহাকে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিতে দেখি না, কিন্তু একই মৌলিকরূপে সকল ঘটনায় বা জিনিষে যে অনুস্যূত থাকে, অথবা যাহা ব্যতীত কোন ঘটনা বা জিনিষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইবার নহে, তাহাকেই মহিমান্বিত আত্মপদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য জানা উচিত। ব্রহ্মবিদ্যার অবলম্বন-ভূমি ও তদ্ অভিধেয় বলিয়া দেখিতেছি, ঐরূপ জিনিষ এক মাত্র জ্ঞানই হইতে পারে; কেননা, তাহা ব্যতীত আন্তরিক সমস্ত বস্তুই সাময়িক। সুখদুঃখ প্রভৃতি যে কোন জিনিষ আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, ঐগুলির মধ্যে কাহাকেও অপরিবর্ত্তনীয় ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া ধরিতে পারি না। মনে কর, রামের পর্য্যায়ক্রমে সুখ, দুঃখ, শোক, ভয় হইতে লাগিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সুখ হইল, ঐ মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী ভাবগুলির অভাব; এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক ভাবের অভ্যুদয়কালে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভাবই থাকে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না যে, রামের ঐ সমস্ত ভাবই পরিবর্ত্তনশীল এবং একে অপরের সহযোগী নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানকে একই রূপে অর্থাৎ প্রকাশরূপে ঐ সকল গুলিতে অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা সুখের প্রকাশরূপ জ্ঞান হইতে দুঃখের প্রকাশরূপ জ্ঞানের পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। অন্তর্জগতের সম্বন্ধেই আর বহির্জগতের সম্বন্ধেই বল, প্রত্যেক ঘটনার সহিতই জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহা ব্যতিরেকে কাহারও অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবার নহে। এমন সময় বা ঘটনা অনুসন্ধানে পাই না, যাহাকে জ্ঞান প্রকাশ না করিয়া দিতেছে, ও যাহাতে উহা নাই। যেরূপ জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার প্রত্যেক ঘটনায় জ্ঞান অনুস্যূত থাকিয়া তাহার প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তদ্রূপ সুষুপ্তিতেও বটে। সুষুপ্তিতে যে এইরূপ ভাবে জ্ঞান থাকে, তাহার প্রমাণ "আমি সুখ পূর্ব্বক শুইয়াছিলাম। কিছুই জানিতে পারি নাই" এইরূপ স্মৃতি। যদি এই স্মৃতি সম্বন্ধে আপত্তি হয় যে, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিস্থলে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থার শেষ ও সুষুপ্তি অবস্থার প্রারম্ভে ইন্দ্রিয় গুলির শিথিলতাজনিত এক প্রকার সুখ হইয়া থাকে এবং ঐ সুখটাকে পুনঃ জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্মরণ করে। সুতরাং এই স্মৃতিটা সুষুপ্তি অবস্থার সুখানুভূতির কোন খবর

আনিয়া দেয় না। তথাপি এই আপত্তিটীকে ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। কেননা জাগ্রত অবস্থার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তি ভঙ্গ পর্য্যন্ত সুখ ছাড়া অন্য কোন জিনিষের অনুভব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না; আর দেখিতে পাই যে, একটা কোন বিরোধী মনোবৃত্তির অভ্যুদয় না হইলে কোন প্রকারে পূর্ব্বোৎপন্ন মনোবৃত্তি লুপ্ত হইবার নহে। সুতরাং এই সুখানুভূতিটা যে সমস্ত সুষুপ্তি কাল ব্যাপিয়াই হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে জ্ঞানটাকে মনোবৃত্তি বা বিষয়ের সহিত মিলাইয়া তাহার উপর অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ চাপাইতেও ত্রুটী করেন না। ইহার কারণ অগ্নিতে ইন্ধন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় লোকে যেরূপ ইন্ধনের ন্যায় দৈর্ঘ্য প্রভৃতি পরিমাণবিশিষ্ট মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানকে মনোবৃত্তি বা বিষয়ের সংস্রবে আনিয়া ঐ উভয়ের প্রকাশ করিতে দেখায় ঐ গুলিকে একাকার করিয়া তুলে এবং বিশ্লেষণ ব্যাপারে প্রয়াস করিতে চাহে না। বিষয় বা মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া দেখিলে অবশ্যই ঐ দোষগুলির অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের প্রকাশকে ঐ দোষে লিপ্ত করা যায় না। আর করিলেও ইহা বিচারশীলতার পরিচায়ক নহে। এইরূপে প্রকাশরূপ জ্ঞানের ঐ দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং সকল অবস্থা ও ঘটনায় জ্ঞান অনুস্যূত থাকে বলিয়া তাহাকে আত্মা বলিয়া ধরিতে কোন আশঙ্কা রহিল না। পক্ষান্তরে জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহাকে আত্মা বলিলে এটা কোথায় আছে, সপ্তম স্বর্গে না সপ্তম পাতালে, এইরূপ সন্দেহের বিভীষিকাটা চলিয়া গেল। আর উপনিষদেরও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

জ্ঞানকে আত্মা মানিলে যেরূপ তাহার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে কোন প্রতিবন্ধক রহিল না, তদ্রূপ তাহার মৌলিক রূপের একত্বও নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানের মৌলিক রূপ যে বস্তুমাত্রের প্রকাশ, ইহার আভাস পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, জ্ঞানের বিষয় গুলিই কেবল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু উহাদের প্রকাশরূপ জ্ঞান একই ভাবে একই স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। জল ও অনলের জ্ঞানে একমাত্র জল ও অনল এই বিষয়াংশেরই পার্থক্য দেখিতে পাই, উভয়ের প্রকাশ অংশে কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই, যে প্রকাশ জলের, সেই একই প্রকাশ অনলের। যেরূপ বিষয়ভেদে জ্ঞানের ভিন্নতা প্রমাণিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞাতৃভেদেও জ্ঞানের পার্থক্য নাই। "যদুর" জ্ঞানের বিষয়গুলি অবশ্যই "দিনুর" জ্ঞানের বিষয় হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু উভয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানকে কিছুতেই ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে বা ধরিতে পারি না। রামের প্রকাশরূপ জ্ঞানটা কৃষ্ণবর্ণ, আর শ্যামের প্রকাশরূপ জ্ঞানটা শ্বেতবর্ণ, এইরূপ আশ্চর্য্য ধারণা বিকৃতমস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভবপর। জ্ঞানের মূলতত্ত্ব ধরিতে না পারিয়া অনেকেই তাহাকে সাময়িক ও নানাত্ব দোষে লিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। কিন্তু ইহার কারণ বিচারোদাসীন্য বা বিচারবিভ্রাট। পক্ষান্তরে যখন বেদান্তশাস্ত্রে "দৃশিস্বরূপং গগনোপসংপবং সকৃদ্বিভাত্যত্বজমেকমক্ষরং অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তমোম্" অর্থাৎ "যাহা আকাশবৎ সূক্ষ্ম, একবারেই প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছেন, যাহা এক অনাদি, পরিণামশূন্য পরমবস্তু, যাহার নির্লেপত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বে কোন সন্দেহ নাই, সেই জ্ঞানস্বরূপ ওঁকারবেদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মা আমিই বটি" এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়; তখন আত্মনানাত্ববাদের গৌরব কি প্রকারে করিতে পারি। যদিচ উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা ভেদবাদের বিজয় লাভ অসম্ভব। কেননা "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেবাদেহং ব্রহ্মাস্মীতি" ইত্যাদি উপনিষদে অভয় পদ (মুক্তিপদ) প্রাপ্তির কারণ অভেদ জ্ঞান বলা হইয়াছে। এইজন্য নিম্ন অধিকারীকে দেহাত্মবুদ্ধি হইতে বিমুখ ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে উন্মুখ করিবার উদ্দেশে "শামাচন্দ্র" নীতিতে আত্মভেদের অবতারণা অর্থাৎ যাঁহারা চৈতন্যকে দেহ প্রভৃতি উপাধির সহিত মিলাইয়া একটা

অভিনব আত্মা করিয়া লইয়াছেন, ভ্রান্তিজ্ঞান অপনোদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'অন্তর্মুখ করিবার জন্য এইরূপ উপদেশ। বেদান্ত শাস্ত্র যে ছোট বড় সকলকে একই মাপের কোট পরাইতে উপদেশ দেয় না, তাহা তদধ্যায়ীকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ সমন্বয় না করিলে ভেদ ও অভেদের প্রতিপাদক বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্তের উপদেশ উন্মত্তের জল্পনায় পরিণত হইয়া পড়িবে। এই স্থলে দ্বৈতবোধক বাক্যকে মুখ্য, আর অদ্বৈতবোধক বাক্যকে গৌণ বলিলেও কিছু ফলোদয় হইবার নহে; কেননা অদ্বৈত জ্ঞানকেই মুক্তির অব্যবহিত কারণ বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মার স্বরূপকে ধরিয়া উঠিতে পারেন না। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সচরাচর বলিতে দেখা যায় যে, জ্ঞানের পথ বড় জটিল। কিন্তু ইহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, জটিল হইলেও এই পথ ব্যতীত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। বেদ ঘোষণা করিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার গবেষণায় পরিশ্রম করিয়াও অবশেষে উপাসনা বা ভক্তির দোহাই দিয়া ভেদবাদের চতুঃসীমার বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হন না। জিজ্ঞাসা করি, যদি বিচার-শক্তি অদ্বৈত ব্রহ্মকেই সত্য এবং তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানকে পরমপদপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, তবে তাহার প্রতিকূলে উপাসনা বা ভক্তির লোভটাকে সঙ্কোচিত করা কি বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? এই শ্রেণীর কোন না কোন মহোদয় জীবাত্মার মূল স্বরূপটাকে শুদ্ধ নিরুপাধিক ও নির্গুণ মানিয়াও পরব্রহ্ম হইতে তাহার পার্থক্য ঘোষণা করেন এবং অদ্বৈতবাদের উপর এইরূপ অভিযোগ আনেন যে, জীব নিজের স্বরূপটাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরব্রহ্ম হইয়া পড়িলে বৈনাশিকের আপত্তি আসিয়া পড়ে অর্থাৎ আপনাকে বিনাশ করিবার জন্য জীব অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে যায়। এই পার্থক্য ঘোষণাটাকে আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যুক্তির সহিত মিলাইতে পারিলাম না। পারিব কি প্রকারে? ভেদজ্ঞানের মূলে উপাধি বা গুণই দেখিতে পাই। ফলতঃ আজ পর্য্যন্ত দার্শনিক জগতে এমন কোন যুক্তি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা নির্গুণ বা নিরুপাধিক বস্তুর ভিন্নতা বুঝাইয়া দিতে পারে। পক্ষান্তরে ঐ আপত্তিটাও যে আকাশের দুর্গস্থানীয়, ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; কেননা অবিদ্যোপাধিক চৈতন্যকেই অদ্বৈতবাদ জীব বলিয়াছে, কিন্তু চৈতন্যকে বাদ দিয়া কেবল অবিদ্যা উপাধিকে নহে। সুতরাং অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পরে জীব উপাধিটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেও তাহার মূলস্বরূপ চৈতন্য সেই একই ভাবে বর্ত্তমান থাকে। বোধ হয়, আপত্তিকারীর অদ্বৈতবাদের বিদ্বেষটা অতিমাত্রায় চড়িয়াছে, তাই আপত্তি উত্থাপন কালে দিক্‌শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই স্থলে সত্যের অনুরোধে বলিতেছি যে, এইরূপ শত শত আপত্তির অবতারণা করিলেও সত্যানুসন্ধিৎসু মনীষীরা কখন অদ্বৈতবাদের উপর ভক্তি হারাইয়া আপত্তিকারীদিগকেও স্বর্গের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। আর বিদ্যামূর্ত্তি শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, রাম, শ্যামের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার অবজ্ঞা করিতে পারেন? আত্মার প্রকৃত স্বরূপটা একমেবাদ্বিতীয়ং হইলেও তাঁহার উপাধিগুলি অনেক, এই জন্য কৃতবিদ্য লোকেরাও বিচার-বৈধুর্য্যে পড়িয়া উপাধির অনেকত্বটাও আত্মার আসন স্বরূপে সংশ্লিষ্ট করেন। আবার এই শ্রেণীর মধ্যে ঐ স্বরূপটাকে বুঝিয়া লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহও দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে না পাইবার কারণও যে নাই তাহাও নহে; কেননা ইহাকে বুঝিয়া লইতে হইলে প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিতে হয়, পশ্চাতে বিচারার্থ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উপচয় ও আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা হউক, আত্মার উপাধিগুলি অনেক বলিয়াই যে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সকলেই যে আত্মার

মূলতত্ত্বকে ধরিয়া লইবে, এইরূপ আশা করিতেও পারা যায় না। অধিকন্তু ইহা বিবেচ্য যে, সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া এতবড় গুরুতর বিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত কি না। আজ কাল দেখিতেছি যে, "স্থানীপুনাকে" নীতিটা অজাতশ্মশ্রুদিগকে পর্য্যন্ত নিজের আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। যে কোন অতি গভীর তত্ত্ব হউক, দুই চারি পাতা উল্টাইয়াই অনেকে সাধারণ সমক্ষে আপন সিদ্ধান্তটা ব্যক্ত করিতে চাহেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে এই নীতিটার সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অথবা গভীর হইতে গভীরতম তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে ইহার সমাবেশ করিতে যাওয়া অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচায়ক হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গবেষণা এরূপ সহজ নহে যে, রাম শ্যাম পর্য্যন্ত ইহার অন্তস্তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ প্রবৃত্তিটা অবশ্যই কোন না কোন সময়ে তাহাদিগকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিবে। ইহা অতীব সত্য যে, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া কেহই মূলতত্ত্বের সহিত পরিচিত বা প্রকৃত কল্যাণের মার্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই শক্তি অনুসারে ইহার অনুশীলন আবশ্যক। পরন্তু এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, স্ব স্ব অধিকার হইতে অধিক বলিয়া যেন কেহ আপনাকে বিশ্বাস না করিয়া বসেন। আজকাল কতকগুলি লোককে যে অনধিকারচর্চ্চায় লিপ্ত হইতে দেখিতে পাই, তাহার মূলেও এই বিশ্বাসই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই ত গেল স্তোকগ্রাহীর কথা, আবার যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না ও সংযুক্ত অক্ষরের সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিতেও গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন, তাঁহারাও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে সিদ্ধহস্ত; সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে যদি কোন বিশেষদর্শী উক্ত অভিনয়গুলিকে অনধিকারচর্চ্চায় পরিণত বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না। অবশ্যই প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটা দিন দিন বাড়িতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু গাছে না উঠিতে এক কান্দি এইরূপ নীতির অনুসরণ করা যে এক প্রকার অবিদ্যার অধীনতা, তাহা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নহে?

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও তন্ত্র পর্য্যন্ত আর্য্যগ্রন্থগুলিতে যে অদ্বৈতবাদের মহিমা গীত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে বাতুলের প্রলাপ বা মনোরাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কোন প্রকারেই বিচারশীলের কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। তবে অবশ্যই ইহা স্বীকার্য্য যে, ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে গেলে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। পাঠক, আত্মার আগন্তুক বা ঔপাধিক রূপটা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাঁহার মৌলিকরূপ যে অভিন্ন ও একত্বরসে পরিপূর্ণ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, এক্ষণে উপসংহারে এইমাত্র নিবেদন করা যাইতেছে যে, কেহ যেন "শ্যেনকর্ণ" নীতির অনুসরণপূর্ব্বক অযথা ভেদবাদের দিকে যাইয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত না করিয়া তুলেন। অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্বরূপের বিচার করিতে পারিলে অবশ্যই মাহেন্দ্রক্ষণের আগমনে তাহার মূলতত্ত্ব যে একমেবদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম, ইহা বুঝিয়া লইতে সমর্থ ও অভয়পদ প্রাপ্ত হইবেন।

ওঁ তৎসৎ—

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী

ধর্ম্মমঙ্গল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

হাজার হাজার ঢালি হাতে করি খাঁড়া।
যমের সমান সাজে দিয়ে গুম্ফ মোড়া।
জয়মল্ল বীর সাজে টানে বাঁশ গোটা।
পাথর বিন্ধিয়া পাড়ে দিয়ে চূণের ফোঁটা॥
সঙ্গে সব ধনুকী চামর বাঁধা বাঁশে।
নূতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে॥
ধায় সব করিকাল করিয়ে বীরপণা।
ফলঙ্গ মারিয়া যায় যত ছড়িখানা॥
রাইবেঁশে পাইক হাজার হাজার ধায়।
মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায়॥
কর্পূর ধল সাজিল চাপিয়া গজমাথা।
আড়ানি শোভিত শিরে সাজে ধবল ছাতা
সরিষা না যায় তল সেনার চাপনে।
পাখুরিয়া ঘোড়া সব চলে কানে কানে॥
হেলাইয়া শুণ্ড চলে যত করিবর।
গণ্ডেতে সিন্দুর মুণ্ডে লোহার মুদ্গর॥
আগু দলে সেনাপতি বেঁটেনিল বাট।
চলিল রাজার সঙ্গে চারি লক্ষ ঠাট॥
রণভরে চলে রথী দেখি বিপরীত।
কনক কলস চূড়ে পতাকা শোভিত॥
বার ভূঞ্যা চলে ঘোড়া করিয়া ফাঁদুনি।
আচ্ছাদিত ধূলায় গগনে দিনমণি॥
তের দলুই যেখানেতে লাউসেন কোঙর।
ঘেরিল চোবেড়ে গিয়া রাজার লস্কর॥
বারণ উপরে রাজা ডাকে হান হান।
অনিরুদ্রে যেমন ঘেরিল গিয়া বাণ॥
লাউসেনে ডাকিয়া কর্পূরধল কয়।
কাঁঙুর জিনিতে এলে বুকে নাহি ভয়॥
আমার প্রতাপ পারা নাহি শুন কাণে।
তিনবার মান্ধাতা হারিয়া গেছে রণে॥
তোর রাজা গৌড়েশ্বর পরাভব মোরে।
কাঁঙুর জিনিতে এলে মরিবার তরে॥
সেন বলে খাজনা হিসাব করে দিবি।
নতুবা আমার ঠাঁই পরাণ হারাবি॥
ঘরে বসে মনে কর আমি বড় তেজা।
হানা দিয়া এইবার ফাঁড়ুরে হব রাজা॥
দুই বীরে বলাবলি আগুন সমান।
বাণ জুড়ে ধনুকে শিঞ্জিলে দিল টান॥
সাঁই সাঁই গগনমণ্ডলে খেলে বাণ।
বাণে বাণে কাটাকাটি পড়ে ঝন ঝান॥
জল যেন বরিষে পড়িছে তীরগুলি।
ঢাল মাথে দিয়ে সব আগাইল ঢালি॥
পাছু ছিল কালুবীর হল আগুয়ান।
সমর দলিয়া চলে পর্ব্বত সমান॥
দক্ষের সমরে যেন বীরভদ্র ধায়।
হনুমান্ বীর যেন প্রবেশে লঙ্কায়॥
কুম্ভকর্ণ ধায় যেন শ্রীরামের ঠাটে।
আথালি পাথালি কালু সেনাগণে কাটে॥
বড় বড় রাউৎ ডাকিছে মার মার।
সম্মুখে ফরিকাল নড়ে এগার হাজার॥
বার হাজার সিপাই নড়িছে ঝন্‌ঝনে।
আকাশে উঠিল ধূম মহাসোর রণে॥
হেঁড়ে তাল সমান গোলায় ছাড়ে গুল।
পড়িছে কালুর গায় যেন জবাফুল॥
খোরাসান, পাঠান, মোগলে দেয় তাড়া।
হস্তিগুলা কাটে কালু যেন কলা ফোঁড়া॥
টলমল পৃথিবী করিছে পদভরে।
কাঁপিল রাজার সেনা কালুর সমরে॥
রক্ত নদী উছলে অবনী ভেসে যায়।
দালবন্দ রাউৎ পড়িছে গায় গায়॥
ভাবিয়া ময়ূর ভট্ট পদ শতদল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥
প্রলয় সমর করে কালু সিংহবর।
না পারে নড়িতে আর রাজার লস্কর॥

ধানুকী পালিয়া যায় ভাবিয়া তরাস।
রায়বেঁশে পলায় ফেলিয়া রায়বাঁশ॥
ফরিকাল বন্দুকী যত ধায় উভরড়ে।
ঘোড়া ফেলে মোগল লুকাল বাঁশঝাড়ে॥
বিপাক পড়িল বড় কাঙুর ভুবনে।
কর্পূরধল লুকাল দেবীর ফুলবনে॥
রণজয় করিল ময়নার অধিকারী।
সমাচার পেলে তখন কলিঙ্গসুন্দরী॥
কাঁদে রামা কলিঙ্গা করিয়া মনস্তাপ।
সেনের সমরে পারা মল মোর বাপ॥
রণে সাজে বাউতি পড়িল তড়াবড়ি।
বারাল সাজন করে যোগাইল ঘুড়ি॥
ছত্রিশ আতর রামা বাঁধিল ত্বরায়।
যাত্রাকালে স্তব করে অভয়ার পায়॥
উর উর উর দেবী উরগো ভবানী।
নগেন্দ্রতনয়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী॥
শিবজায়া মহামায়া বিশাললোচনা।
দিগম্বরী লোলজিহ্বা বিকটদশনা॥
রক্তবীজে বধ কৈলে বিস্তার বদনে।
দানব দলনী বলে বলয়ে পুরাণে॥
কৃপা করি উর শম্ভু নিশুম্ভনাশিনী।
রঙ্গিনী মঙ্গলা কালি দেবী কাত্যায়নী॥
ঘন ঘন গগনে ছাড়য়ে হুহুঙ্কার।
কাঁঙুর মণ্ডল হল ঘোর অন্ধকার॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে উরিলা বিশালা।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধানা গলে মুণ্ডমালা॥
সাক্ষাৎ হইলা দেবী পারেন্দ্রবাহনে।
কলিঙ্গা কাঁদিয়া ধরে অভয়া চরণে॥
সেনের সহিত যাই করিতে সমর।
পার কর ভগবতী বিপদ্ সাগর॥
অভয়া বলেন বাছা কোপ কর দূর।
প্রাণনাথ হবে তোমার ময়নার ঠাকুর॥
স্বামী হবে লাউসেন বিধাতার লেখা।
লজ্জা খেয়ে সমরে কেমনে দিবে দেখা॥
কলিঙ্গা বলেন, যদি সমরে জিনেন।
তবে সে আমার স্বামী হইবেন সেন॥

দেবী সঙ্গে চৌষট্টি যোগিনী সেনা লয়ে।
সংগ্রাম স্থলেতে বামা উত্তরিলা গিয়ে॥
সমরে নামিলা যদি কলিঙ্গা অবলা।
কালুবীর বলে এবে লাউসেনের পালা॥
কলিঙ্গায় লাউসেনে বেজে গেল রণ।
গগনে কৌতুক দেখে যত দেবগণ॥
লাউসেন বাণ এড়ে তারা হেন ধায়।
কলিঙ্গার বদনে চুম্বন গিয়া খায়॥
লজ্জা পেয়ে কলিঙ্গা সুন্দরী বাণ এড়ে।
লাউসেনের চরণে প্রণাম করে পড়ে॥
লাউসেন বাণ এড়ে নামে হারাবলি।
আলিঙ্গন দিয়া ছেঁড়ে বক্ষের কাঁচলি॥
তা দেখিয়া অভয়া করেন হেঁটমাথা।
বচন বলিলে বেটী নাহি শুন কথা॥
কলিঙ্গাকে লয়ে গেল অন্দর ভিতর।
রণউভা লয়ে হেথা কালু সিংহবর।
কর্পূরধল আছিল দেবীর ফুলবনে।
শূকর বন্ধন করে বাঁধিল রাজনে॥
ধনুকের হুলে তারে বেঁধে মহাবল।
জোহার জোহার ডাকে দলুই সকল॥
রাজা বলে কালুবীর শুন নিবেদন।
লাউসেনে কলিঙ্গা করিব সমর্পণ॥
বন্ধন ঘুচায়ে মোর জীবন বাঁচাও।
যত বাকী খাজনা হিসাব করি লও॥
লাউসেনে বলে কালু বুকে যোড় হাত।
কলিঙ্গাকে বিবাহ করহ মহীনাথ॥
নাম হবে দ্বিগুণ উজ্জ্বল যেন সোণা।
মহামদের মুণ্ডে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা॥
কালুর বচন শুনি সেন দিল সায়।
কর্পূরধলের কালু বন্ধন ঘুচায়॥
কর্পূরধল যোড়হাতে বলে লাউসেনে।
অশৌচেতে কন্যা দান করিব কেমনে॥
খুড়া জেঠা জ্ঞাতি বন্ধু মরিল সমরে।
লাউসেন স্মরণ করিল মায়াধরে॥
চারি মেঘে ডেকে পান দিলেন ঠাকুর।
গগনে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর॥

কাঁঙুরেতে করিল পীযূষ বরিষণ।
নৃপতির সেনাগণ পাইল জীবন॥
আনন্দের সীমা নাই কাঁঙুর মণ্ডল।
দুবাহু তুলিয়া নাচে রায় কর্পূরধল॥
কন্যা দান দিব বলে ধর্ম্মের কিঙ্করে।
বাসা দিল লাউসেনে ডাকি সমাদরে॥
কলিঙ্গার বিভা বলে পড়িল ঘোষণা।
দ্বারেতে দুন্দুভি বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা॥
বুঝিয়া পুরাণ মত বেদের বিহিত।
অধিবাস আদি করে রাজ-পুরোহিত॥
কন্যা দিতে মহারাজ হইল চঞ্চল।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥

ত্রিপদী ছন্দ।

জয় জয় জয়, মঙ্গল বাদ্য হয়,
করেন গঙ্গাদি বাসন।
যতে এয়ো সখি, হরিদ্রা আমলকী,
কন্যার অঙ্গে বিলেপন॥
সুগন্ধি নানা ফুলে, চাঁচর কুন্তলে,
বাঁধিল কবরী বেণী।
চন্দনের রেখা, সিন্দূর অলকা,
কৌতুকে দিছেন রমণী॥
ত্বরায় নৃপমণি, বন্ধুগণে আনি,
প্রাঙ্গনে বাঁধিল ছাঁদলা।
করিয়া দিব্য বেদী, চৌদিকে কলাউদি,
খাটাইল বনমালা॥
দুন্দুভি বাজে শানি, খঞ্জরী বেণা বেণী,
আনন্দ রাজার ভবনে।
মধ্যহ্ন সূর্য্য যেন, যতেক ব্রাহ্মণ,
বসিল আবিক আসনে॥
পরিয়া শুক্ল বস্ত্র, আসনে কুশহস্ত,
নৃপতি আনন্দিত মন।
স্বস্তিক বাচন, মাধব স্মরণ,
করিল সঙ্কল্প রচন॥
ঘটেতে আবাহন, পূজিলা গজানন,
সূর্য্য বিষ্ণু মহেশ্বরে।
গৌরী পূজিয়া, করিল ষষ্ঠী পূজা,
মার্কণ্ডে পূজে তার পরে॥
মহী গন্ধ আদি, ক্রমে যথাবিধি,
ললাটে কন্যার ছুঁয়ান।
সূত্র বাজন করি, প্রশস্ত পাত্র ধরি,
নির্ম্মাল্য ফেলিল পান॥
হইল শঙ্খ ধ্বনি, ঘণ্টার ঢনঢনি,
কনক সিঁতি দিল শিরে।
অঙ্গনাগণ গিয়া, জলধারা দিয়া,
কন্যাকে লইল ঘরে॥
ভবদেব বুঝি, দেবাদি পূজি,
ঘৃতে দিল বসুধারা।
জপিয়া আয়ুষ্য মন্ত্রে, নান্দিমুখ তন্ত্রে,
সেরে নিল করি ত্বরা॥
দ্বিজে বেদগান, অম্বর করিয়া দান,
বরণ করিল সেনে।
করিতে স্ত্রী-আচার, লইয়া গেলেন বর,
হরিষে জয় জয় ধ্বনি॥
সম্পুটিয়া হাতে, প্রদক্ষিণ নাথে,
কলিঙ্গা করে সাতবার।
ছাউনি দুজনেতে, সেনের গলেতে,
দিলেক চাঁপার হার॥
গঙ্গার জল কুশে, অম্বিকা অভিলাষে,
করিল কন্যা সমর্পণ।
যৌতুক নানা ধনে, তুষিয়া লাউসেনে,
করিল গ্রন্থি বন্ধন॥
অরুন্ধতি সারি, পাণিগ্রহণ করি,
লজ্জা হ'ল তার পরে।
আসি বামভাগে, জলধারা আগে,
দিয়া নিল বাসঘরে॥
ক্ষীরান্ন ভোজনে, বাসরে শয়নে,
রহিল লাউসেন বালা।
অনাদ্য করি ধ্যান, রামচন্দ্র গান,
সমাপ্ত হইল পালা॥

কলিঙ্গার বিবাহ পালা সমাপ্ত।

লাউসেন কলিঙ্গা বিদায় ও কানাড়ার সম্বন্ধ পালা।

সেনে দিল কন্যাদান কাঁঙুরের রাজন্।
নানা ধনে জামাতার তুষিলেন মন॥
কুলঘরে লাউসেন কলিঙ্গা রূপসী।
পুষ্পে ডাকে ভ্রমর প্রভাত হলে নিশি॥
কোকিল পঞ্চম গায় ডাকে তাম্রচুড়।
প্রভাতে সেনের ত্বরা যাইতে গৌড়॥
বাস ঘরে গা তুলিল লাউসেন রায়।
সুবর্ণের জলপাত্র নফর যোগায়॥
মুখ পাখালিল রাজা ভৃঙ্গারের নীরে।
বিরোচনে প্রণাম করিল যোড় করে॥
স্নান করিলেন তবে জাহ্নবীর পয়।
একমনে পুজিল ঠাকুর জ্যোতির্ম্ময়॥
বরকন্যা বিদায় কারণ হল রব।
দেখিতে ধাইল নগরের লোক সব॥
কলিঙ্গাকে বেড়িয়া কাঁদেন যত সখি।
পাটরাণী কাঁদেন সজল দুই আঁখি॥
তোমা না দেখিলে ঝি এ প্রাণ হবে শেষ।
কেমনে পাঠাব দূর পাঁচ রাজার দেশ॥
আর দেখা না হইবে অভাগী জননী।
কলিঙ্গা করিয়া কোলে কাঁদে পাটরাণী॥
সই সেঙ্গা তিনী যত খেলিবার সখী।
কলিঙ্গার বিদায়ে বিদরে যায় ছাতি॥
কেহ করে সুরেশ মুছিয়া চাঁদমুখ।
কেহ দেয় আঁচলেতে থাকিয়া যৌতুক॥
মাসী পিসি কাঁদে যত রমণী সকল।
ঘোড়া শিঙ্গা পুরে হেথা কালুসিংহ বল॥
ধাঁউ ধাঁউ নিনাদ উঠিল দামামায়।
সাজন করিয়া সেন নিজ দেশ যায়॥
বিয়াল্লিশ বাজনা বাজে নৃপতির ঘরে।
বাড়াল সাজাল ঘোড়া আণ্ডির পাথরে॥
সেন সঙ্গে কর্পূর ধন আপনি সাজিল।
চৌদ্দসনের খাজনা হিসাব করে নিল॥
সিন্ধুকে পুরিয়া ধন উটের উপর।
ভাই বন্ধুগণ সঙ্গে সাজিল সত্বর॥
হস্তী পিঠে চলে কেহ অশ্বে আরোহণ।
পালকী উপরে কেহ করিল সাজন॥
আণ্ডির পাথর ঘোড়া যোগাল বাড়াল।
চড়িলা তুরঙ্গ পিঠে লাউসেন পাল॥
জনক জননী আদি গুরুজন গণে।
দণ্ডবৎ কলিঙ্গা করিল সাবধানে॥
চাপিলে চৌদানে কলিঙ্গা রূপবতী।
বিদায় হইয়া সেন চলে শীঘ্রগতি॥
দেখিতে দেখিতে গড় পাছু রেখা যায়।
বাঁশে ভর দিয়া কাথু ঘোড়ার সাজে ধায়॥
গণ্ডকী হইল পার দুই প্রহর বেলা।
পালাকাটা গ্রাম এড়ে পেল মুণ্ডমালা॥
পাঁচদিনে ধনপোতা পেল সেনাগণ।
দেখিল জাঙ্গল খড়ি খাগড়ার বন॥
বামে রেখে রাজবাটী চলে যায় ঘোড়া।
জাতৃদ্বীপে পাইল বম্পুর সরাণ পাড়া॥
বিজয়া বিমলা বাটী দক্ষিণে রাখিয়া।
সারদা বিমলা পুরে উত্তরিল গিয়া॥
রামপুর পাছু রেখে গৌচাপ রসন।
নিশানদার নিশান পুরিছে ঘনে ঘন॥
বীর কালু ঘোড়া শিঙ্গা পুরিছে সঘনে।
কাঁপিল গোড়ের মাটি দড় শানি শানে॥
টমক ধামসা বাজে উটের উপর।
পঞ্চপাত্র চমকিত রাজা গৌড়েশ্বর॥
দিয়ানেতে আছিল কোটাল ইন্দ্রজাল।
ক্রোধ যুত হল দেখা গৌড়ের ভূপাল॥
ঘর দল পর দল কিছুই না জানি।
আচম্বিতে গৌড়ে কেন বাদ্যরব শুনি॥
চমকিত হয় যদি রাজার দরবার।
কোটাল বারতা বুঝা দিল সমাচার॥
ইন্দ্রজাল বলে সবে শঙ্কা কর দূর।
লাউসেন বীর এল জিনিয়া কাকুর॥
জিনে এল কাঁঙুর সেনের দলবল।
সেন সঙ্গে এলেন ভূপতি কর্পূর ধল॥

হরষিত হল শুনে রায় গৌড়েশ্বর।
মহামদের মুণ্ডে যেন পড়িল বজ্জর॥
কৃষ্ণ হল লাউসেন আমি কংসরায়।
ভাগিনা বাড়িল বড় কি হবে উপায়॥
মনে ছিল কাঁঙুরেতে ঘুচাইব পাপ।
ফিরে এল লাউসেন একি মনস্তাপ॥
সাত পাঁচ এইরূপে ভাবে খলমতি।
লাউসেন লয়ে কিছু কর অবগতি॥
খাটাইল তাম্বুঘর ভৈরবীর তটে।
কর্পূর ধলে লয়ে যান রাজার নিকটে॥
সেনে ঘেরা তখন চলিল দুইজনে।
উপনীত লাউসেন রাজার দিয়ানে॥
লাউসেনে দেখে সবে হইয়া মোহিত।
ইন্দ্র জিনে যেমন আইল ইন্দ্রজিত॥
প্রণাম করিল সেন নৃপের চরণে।
গা তুলিয়া গৌড়েশ্বর বসাল আসনে॥
কর্পূর ধল দরবারে হইল উপনীত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম্মের সঙ্গীত॥
উটের উপরে লয়ে খাজনা সকল।
উপনীত দরবারে ভূপতি কর্পূরধল॥
রাজার চরণে ধল করিল প্রণাম।
হেন বেলা কহেন ময়নার গুণধাম॥
জিনে এলাম মহারাজ কাঁঙুর অবনী।
তোমার শরণাপন্ন ধল নৃপমণি॥
এই রাজা সাক্ষাতে কর্পূরধল নাম।
কাগজ বুঝিয়া লহ কাঁঙুরের দাম॥
রাজা বলে কর্পূর ধল কহ সমাচার।
রাবণ অধিক হে তোমার অহঙ্কার॥
সাতবার গৌড়সহরে দিলে হানা।
কোথা এখন তোমার রহিল বীরপণা॥
গঞ্জন বচন যত বলে গৌড়েশ্বর।
লজ্জায় কর্পূরধল না তুলে অধর॥
আসান করিল রাজা হাতে দিয়া পান।
দরবারে ধলের পুনঃ বাড়াল সম্মান॥
হরিদ্রা বসন ছিল লাউসেনের গায়।
বিবাহের চিহ্ন দেখে কহে গৌড়রায়॥
শালিপুত্র বলিয়া কহেন গদ্যচ্ছলে।
কহ বাপু লাউসেন শ্বাশুড়ে কবে হলে॥
এই বেলা বলিলে বাদ করাইব দূর।
লাউসেন বলে মেসোর উঠিল ঢেকুর॥
যে যেমন ব্যক্তি এমন ধর্ম্মের উদয়।
পূর্ব্ব অনুসারেতে কহেন মহাশয়॥
সেনের বচনে হাসে নৃপ সভাজন।
যোড় হাতে কর্পূরধল করে নিবেদন॥
কর্পূরধল বলে রাজা কর অবধান।
কলিঙ্গা নামেতে কন্যা সেনে দিলাম দান॥
লইলাম শরণাপন্ন তোমার সকলি।
বৈবাহিক বলিয়া দুজনে কোলাকুলি॥
আসনে বসাল রাজা বলিয়া বেহাই।
শিরোপা দিলেন লক্ষ টাকার কাতাই॥
করিলেন বেবাক দেশের দাম দিয়া।
কাঁঙুর গেলেন ধল বিদায় হইয়া॥
ময়নাকে লাউসেন বিদায় হয়ে যান।
তের দলুই সঙ্গে চলে যমের সমান॥
সেন চড়ে ঘোড়ায় কলিঙ্গা চতুর্দ্দলে।
গৌড় সহর খান পাছু রেখে চলে॥
তরণীতে পার হয়ে ভৈরবীর ঘাটে।
পাছু রেখে শীতলপুর চলে গোলাহাটে॥
জামতি নগর তারাদীঘি দেসরাণ।
সম্মুখেতে দেখে জালন্দার গড়খান॥
পাঁচ দিনে ফজলা সরাইএ উপনীতি।
মঙ্গল কোটের রাজার নাম গজপতি॥
লয়ে গেল লাউসেনে সমাদর করি।
বিভা দিল নামে কন্যা অমলা সুন্দরী॥
রথ গজ ঘোড়া দোলা নানা দ্রব্য জাতে।
বনিতা সহিত বিদায় হইলা প্রভাতে॥
দামামা দগড় কাড়া ফুকরে নিশান।
কর্জ্জনা রাখিয়া পাছু পেল বর্দ্ধমান॥
কালিদাস নামে রাজা বর্দ্ধমান বাসী।
লাউসেনে বিভা দিল বিমলা রূপসী॥
বাসর বঞ্চনে হল রজনী প্রভাত।
বিদায় হইয়া চলে ময়নার নাথ॥

তিন নারী চতুর্দ্দোলে পূর্ণ শশধর।
নৌকায় হইল পার বাঁকা দামোদর॥
মান্দারণ কাশিযোড়া পশ্চাৎ করিয়া।
ময়না নগরে সেন উত্তরিল গিয়া॥
কাঁঙুর জিনিয়া এল রঞ্জার নন্দন।
ময়নার লোক শুনে হরষিত মন॥
সমাচার পেয়ে রঞ্জা হরিষ অন্তরে।
পুত্রবধূ নির্ম্মচিয়া নিল নিজ ঘরে॥
বাজিশালে বাড়াল বাঁধিল লয়ে হয়।
বিদায় হইয়া কালু গেল নিজালয়॥
ময়নাতে রহিল দুর্ল্লভ সদাকর।
গৌড়েশ্বর রাজ নিয়া শুন অতঃপর॥
সভা করে দরবারে বসিল গৌড়েশ্বর।
দেবতা সমাজে যেন রাজা পুরন্দর॥
নবলক্ষ সেনা বসে রাজার দিয়ানে।
বারভূঞ্যা ষোলপাত্র বসে সাবধানে॥
বিশাশয় মণ্ডল বসিল তার কাছে।
রাজার দক্ষিণে মাহুপাত্র বসে আছে॥
ব্রাহ্মণ সকল বসে সাক্ষাৎ তপন।
ভারত শুনেন রাজা হয়ে একমন॥
যেকালে গোকুলে হরি যশোদানন্দন।
দেব অরি কংশরাজ বধের কারণ॥
যশোদা সমান কেবা আছে ভাগ্যবতী।
যাঁর কোলে নারায়ণ অখিলের পতি॥
প্রাঙ্গনে খেলেন কৃষ্ণ সঙ্গে শিশুগণ।
কৌতুকে করিল হরি মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
তা দেখিয়া ব্রজ শিশু যশোদাকে কয়।
মৃত্তিকা খাইল আজি তোমার তনয়॥
মিথ্যা নাহি বলি মাতা দেখ বিদ্যমান।
ধাইল যশোদা রাণী আকুল পরাণ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া কাঁদে যশোদা সুন্দরী।
বাহু প্রসারিয়া রাণী কোলে নিল হরি॥
বদনে অঙ্গুলি দিয়া বলে নন্দরাণী।
কেন বাছা মৃত্তিকা খাইলে যাদুমণি॥
কি খাইলে বদন মেলরে বাছা ধন।
বদনেতে নন্দরাণী দেখে ত্রিভুবন॥
এই অধ্যায় ভারত পড়িল দ্বিজবর।
হরষিত সভাজন রাজা গৌড়েশ্বর॥
সাঙ্গ হল ভারত শুনিল লোক সব।
হেনকালে নটী এল করিতে তাণ্ডব॥
তাল মানে নাচে নটী রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে॥

ত্রিপদী ছন্দ।

রাজার দরবার মাঝে, নটিনী মোহিনী সাজে,
আইল তাণ্ডব করিবারে।
নবীন যৌবন ছাঁদে, দেখি মন মৃগ কাঁদে,
বাড়ী তার রমতি নগরে॥
পূর্ব্বে দেবকন্যা ছিল, শাপেতে নটিনী হল,
তিলোত্তমা কিবা সে উর্ব্বশী।
বদন শারদ বিধু, জব জব করে মধু,
বিজলী ঝলকে যেন হাসি॥
হরষিত নৃপমণি, নাচে ভাল রামজানি,
গান করে মধুরস ভাষা।
ফিরানি চলন বাঁকি, খঞ্জনীয়া যেন পাখী,
ঝলমল আভরণ বেশা॥
সপ্তস্বরা বীণা বেণী, মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি,
করতাল ররাব খঞ্জরী।
স্বর অতি সুধা বই, তাথই তাথই থই,
তাল রাখে নাচে বিদ্যাধরী॥
বস্ত্র আদি আভরণ, পাইল অনেক ধন,
সভাজনে করিয়া মোহিত।
তালমান অঙ্গ ভঙ্গ, দেখিয়া নটির রঙ্গ,
গৌড়েশ্বর মদনে পীড়িত॥
কটাক্ষ মদন বাণে, চাহিয়া রাজার পানে,
জর জর করিল শরীর।
রাজা হল অচেতন, মোহিনী দেখিয়া যেন,
হরসুতে বিরিঞ্চি অস্থির॥
আকুল হইয়া কয়, নাহি করে লজ্জা ভয়,
মনে বড় হয়ে অভিলাষী।
ভজিব গণিকা রতি, পাটরাণী ভানুমতী,
করাইব বেউশ্যার দাসী॥

বড় সাধ হল মনে, বঞ্চিব বেউশ্যা সনে।
নিকটে মহল তুলে দিব।
কি করে সরমমান, বদনে যোগাব পান,
আঁখি আড় নটী না করিব॥
যত কহে নৃপমণি, মহামদ পাত্র শুনি,
বলে কিছু গঞ্জন বচন।
ধর্ম্ম পদ অরবিন্দে, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥
নটী দেখে গৌড়েশ্বর মদনে আকুল।
মহামদ বলে রাজা হইলে বাতুল॥
দেখিলে বেউশ্যা হয় পুণ্যের উদয়।
পরশ করিলে পাপ পুরাণেতে কয়॥
তিনকাল গেছে তোমার এককাল বাকী
বৃদ্ধকালে কেন রাজা বিপরীত দেখি॥
গলায় তুলসী মালা হরির ভজন।
এতকাল শুনিলে ভারত উপাখ্যান॥
রাজা পাপে রাজ্য নষ্ট গিন্নি পাপে ঘর।
আমার বচনে রাজা অবধান কর॥
পরকাল রুদ্ধ কর পাপে দিয়া মতি।
মন দিয়া শুন রাজা আমার ভারতি॥
সাজন করিয়া চল সিমলার গড়।
হরিপাল রাজার বেটী কুমারী কানড়॥
কানড়া সমান কেবা রূপবতী আছে।
কোন্ ছার সুন্দরী নটিনী তার কাছে॥
দ্বাদশ বৎসর করে অভয়ার পূজা।
সেই মেয়ে বিভা দিব সেজে চল রাজা॥
সুন্দরী ভজিব বলে যদি মনে জান।
এতদিন আমাকে বলেন নাই কেন॥
বুড়া বলে কানড়া মনেতে নাহি করে।
বলে ছলে বিভা দিব কি করিতে পারে॥
তবে মিছে নাম ধরি মহামদ খল।
অধিবাস করে হাতে সুতা বেঁধে চল॥
পাত্রের বচন শুনি বলে গৌড়েশ্বর।
ঘটক পাঠায়ে দাও সিমলা নগর॥
লোক লাজ হয় পাছে মনে ভয় করি।
সমাচার পেলে যেন অধিবাস সারি॥
ভাট গঙ্গাধর যাক্ বলে মহীপাল।
প্রবোধ ব্রাহ্মণ যাক্ জয়পতি ঘোষাল॥
অধিবাস সজ্জা আর ভেট আয়োজনে।
এক শত ভারী যাক্ ঘটকের সনে॥
নটিনীকে পাত্র দিল বিদায় করিয়া।
গঙ্গাধর ভাটকে আনিল ডাক দিয়া॥
মহামদ পাত্র বলে শুন গঙ্গাধর।
সিমলার গড়ে রাজা হরিপাল শিখর॥
তার কন্যা কানড়া হয়েছে ইচ্ছাবতী।
ঘটক হইয়া যাও সিমলা বসতি॥
অধিবাস করিতে রাজাকে বল গিয়ে।
গৌড়েশ্বরে বিবাহ দেওয়ায় সেই মেয়ে॥
তবে যদি না শুনে হরিপাল নৃপমণি।
নব লক্ষ সেনা লয়ে করিব সাজনি॥
সাত গড় সিমলাতে রাজার মহল।
বিমলা নদীর জলে ডুবাব সকল॥
লিখনেতে লিখিল সকল বিবরণ।
ঘটকের হাতে দিল করিয়া যতন॥
ভেট ঘাট লয়ে যেতে একশত ভারি।
কোটাল সহরে দিল ধরিয়ে বেগারি॥
ভার সাজায় ভারীগণ করে বড় ঘটা।
কুন্‌কুন্ কস্তুরী চুয়া চন্দন আবাটা॥
তাম্বুল গুবাক আদি হরিদ্রা চিরুণি।
দেখিয়া ভুলিতে চায় রাজার রমণী॥
ডাব দশ লইল বাহন নারিকেল।
মিঠাই সন্দেশ চিনি দধি রম্ভা ফল॥
অধিবাস সজ্জা আদি বস্ত্র আভরণ।
এইরূপে লইলেক অনেক আয়োজন॥
রাজপুরোহিত সঙ্গে চলে ভট্টরায়।
সম্মুখে কাহার এনে পাল্‌কী যোগায়॥
অপরূপ পাল্‌কী দেখিতে মনোহর।
মণিমুক্তা শোভা করে প্রবাল পাথর॥
কাঞ্চনের ঝাঁপা ঝুরি পাটের গাঁথুনি।
ঝলমল করে থোপ যেন দিনমণি॥
আরোহণ হয়ে চলে সিমলা ভুবন।
আগে পিছে ধায় তবে ভারী শতজন॥

গৌড় পাছু রেখে উপনীত কাশীপুরে।
চলে ভাট বঙ্গভাটি পদ্মাবতী ধারে॥
দশ দণ্ড বেলা হল উপর গগন।
কৌষিকী কনকপুরে দিল দরশন।
গোরকপুর বনজ বসতি রেখে যায়।
বিমলা নদীর ঘাটে পার হয়ে লায়॥
সিমলার গড়ে রায় হল উপনীত।
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় ধর্ম্মের সঙ্গীত॥

একাবলী ছন্দ।

বিমলার ঘাটে পেরিয়ে লায়।
সিমলা গড় দেখে ভট্টরায়॥
স্থানে স্থানে কত দেখে দেহারা।
সাতগড় দেখে পর্ব্বত পারা॥
বেউড় বাঁশে বেড়া চৌদিকে গড়।
সপ্ততাল জল না হয় তড়॥
রক্ষক দুয়ারী সহর বেড়া।
তেষট্টি বাজার বিরাশি পাড়া॥
আগে পিছে চলে শতেক ভারী।
রাজ্য দেখে যেন নির্জ্জরা পুরী॥
সঙ্গেতে ভারী লয়ে ভেট ঘাট।
রাজার দরবারে উত্তরে ভাট॥
বসেছে দিয়ালে হরিপাল রাজা।
পঞ্চপাত্র আদি মণ্ডল প্রজা॥
আশীষে ভট্ট করে কর বন্দে।
কবিতা পড়িল পিঙ্গল ছন্দে॥
অভ্যর্থনা করে বসাল প্রায়।
বাড়ী কোন্ দেশে জিজ্ঞাসে রায়॥
ভেট দ্রব্য অধিবাসের ত্বরা।
হেন বুঝি কারো বিবাহ পারা॥
ভট্ট বলে মোর গৌউড়ে ঘর।
ছত্রপতি রাজা গৌড়েশ্বর॥
প্রজার পালনে যেমন রাম।
মন্ত্রী মহামদ পাত্রের নাম॥
রাজা গৌড়েশ্বর বিভার তরে।
ঘটক করিয়া পাঠাল মোরে॥
কানড়া নামেতে তোমার কন্যা।
রূপে গুণে রামা পরম ধন্যা॥
তোমার ভাগ্যের না দেখি ওর।
গৌড়পতি হবে জামতা তোর॥
পাত্র দিল মোরে লিখন নেয়।
অধিবাস করে বিবাহ দেয়॥
এত শুনি রাজা আনন্দ মনে।
দ্বিজ রামচন্দ্র সঙ্গীত ভণে॥

পয়ার।

ভাট গঙ্গাধর এত কহিল বচন।
সর্ব্বলোক হল শুনে হরষিত মন॥
ভাগ্য করে মানে রাজা হরিপাল শিখর।
জামাতা হইবে মোর রায় গৌড়েশ্বর॥
জাতিপাতে আমা হতে নিরমল ফুল।
কুমুদের মাঝেতে যেমন পদ্মফুল॥
হরিপাল শিখর বলে শুনহে ঘটক।
বিবাহ দিয়াব ইথে না হবে আটক॥
এতদিন কানড়া পূজিল গৌরীহর।
স্বয়ংবরা হবেন শুনেছি পরস্পর॥
কানড়াকে জিজ্ঞাসিয়া আসি মহাশয়।
তবে অধিবাস আমি করিব নিশ্চয়॥
সমাদরে দলিজে সবাকে দিয়া বাসা।
অন্তঃপুরে গেল রাজা করিতে জিজ্ঞাসা॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নানা আয়োজনে।
ভবানী পূজেন রামা হয়ে একমনে॥

ক্রমশঃ

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বহ্নিকোণে দেখ যারে বিধবা আকৃতি।
শুনহ ইহাঁর নাম দেবী ধূমাবতী॥
নৈর্ঋত কোণেতে দেখ ত্রিপুরাসুন্দরী।
বায়ুকোণে মাতঙ্গী নামেতে ভয়ঙ্করী॥
ঈশানে ষোড়শীদেবী শুন মৃত্যুঞ্জয়।
আমিতো ভৈরবী ভীমা না করিও ভয়॥
ইহাঁরা আনন্দময়ী নিত্যানন্দ করী।
ভক্তিতে পূজিলে নিত্য ভবার্ণবে তরি॥
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা বাঞ্ছাপূর্ণ হয়।
শুন সদাশিব ইথে নাহিক সংশয়॥
মারণোচ্চাটন আর ভ্রমণ করায়।
স্তম্ভন করেন কিংবা মনে ক্ষোভ পায়॥
মুগ্ধ করি রাখে বশ থাকয়ে সকল।
সুহৃদ্ভেদ জন্মে আর ঘটে অমঙ্গল॥
ইহাঁদের সাধনে এতেক কর্ম্ম হয়।
শুন ত্রিলোচন ইথে নাহিক সংশয়॥
এই যত দেবী সব গোপনীয়া অতি।
প্রকাশ্য কদাচ নন পশুপতি॥
ইহাঁদের মন্ত্র যন্ত্র পূজা হোমবিধি।
তুমি তা কহিবা শুন শিব গুণনিধি॥
স্তব ও কবচ পুরুশ্চর্য্যার বিধান।
তোমা বিনা কহে হেন কেবা আছে আন
তুমি বিনা বক্তা নাই কহি এই পাকে।
তদুক্ত আগমশাস্ত্র খ্যাত হবে লোকে॥
বেদ আর আগম আমার দুই হস্ত।
ইহাতে ধারণ আমি করিয়ে সমস্ত॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জগত সংসার।
নিতান্ত জানিবে দুই হস্তেতে আমার॥
বেদাগম যে না মানে শুন চন্দ্রচূড়।
হস্ত হৈতে অধোগামী হয় সেই মূঢ়॥
বেদ বা আগমশাস্ত্র করিয়া লঙ্ঘন।
কোন কর্ম্ম কেহ যদি করে কদাচন॥
বেদাগমবহির্ভূত যেই দুরাচারী।
তাহার উদ্ধার আমি করিতে না পারি॥
বেদাগম দুই শাস্ত্র মঙ্গলকারণ।
দুরূহ দুর্বোধ বড় জেন ত্রিলোচন॥
বড়ই দুর্গম দুই নাহি পারাবার।
সুধীর পণ্ডিত লোকে বুঝা অতি ভার॥
দুই মত ঐক্য করি করে বিবেচন।
সুপণ্ডিতে করিবেক ধর্ম্ম আচরণ॥
অতএব বিচক্ষণে আগম কি বেদ।
ভ্রান্তিক্রমে কদাচিত না করিবে ভেদ॥
আমাতে অর্পিত মন করে ভক্ত যত।
সভায় ফিরিবে যেন বৈষ্ণবের মত॥
মন্ত্র যন্ত্র কবচাদি গুরুদত্ত যাহা।
গোপনে করিবে যত্নে অপ্রকাশ্য তাহা॥
প্রকাশে সিদ্ধির হানি অশুভ নিশ্চিত।
তেকারণে সাধকের গোপন বিহিত॥
এ হেতু কৈলাম তোমা শুন মহামতি।
তব প্রিয়তমা আমি তুমি প্রিয়পতি॥
মোর পিতৃযজ্ঞে যদি তুমি নাহি যাও।
তার দর্প নাশি যেয়ে মোরে আজ্ঞা দেও॥
অনুমতি কর মোর এই অভিলাষ।
পিতৃ দক্ষযজ্ঞে গিয়া করি যজ্ঞ নাশ॥
কালীর বচন শুনি দেব পশুপতি।
শিব কহিলেন, তাঁরে ভীত হয়ে অতি॥
তুমি যে প্রকৃতি পূর্ণা জানি যে তোমারে।
মোহে যত কহিছি তা ক্ষমহ আমারে॥
তুমি আদ্যা পরাবিদ্যা সর্ব্বজীবে স্থিতা।
স্বতন্তরা শক্তি তুমি বিশ্বের পূজিতা॥
যে কর্ম্ম করিবা কিংবা কোনখানে যাবা।
তাহাতে নিষেধ বিধি যোগ্য আছে কেবা॥
দক্ষযজ্ঞ নাশিবারে যাবে তুমি শিবা।
নিষেধ করিতে তোমা মোর শক্তি কিবা॥

মোহে যত কহিয়াছি আমি তব পতি।
সকল ক্ষমহ মোরে হয়ে হৃষ্টমতি॥
যাহা ইচ্ছা তাহা কর যেই লয় মনে।
পুরাণ প্রমাণ দ্বিজ রামনিধি ভণে॥

৩০। লঘু ত্রিপদী॥

শিবের বচন, করিয়া শ্রবণ,
জগদম্বা তদন্তরে।
অন্তরেতে সুখী, হয়ে হাস্যমুখী,
কহিতে লাগিলা হরে॥
তোমরা যাবত, প্রমথ তাবত,
লয়ে এথা থাক তুমি।
পিতা দক্ষ ঘরে, যজ্ঞ দেখিবারে,
সম্প্রতি চলি যে আমি॥
শিবে ইহা কয়ে, ত্বরান্বিতা হয়ে,
তারা যিনি ঊর্দ্ধে ছিলা॥
আপন শরীরে, মিলাইয়া তাঁরে,
ক্ষণে একরূপা হলা॥
শুন তপোধন, অন্য অষ্ট জন,
গেলা অন্তর্দ্ধান করি।
দেখিলা শঙ্কর, যাওনে সত্বর,
ইচ্ছা কৈলা সুরেশ্বরী॥
দেখি ত্রিলোচন, নন্দীশ্বরে কন,
রত্নময় আন রথ।
রথের বাহন, যুত পঞ্চানন,
অযুতেক সংখ্যা মত॥
শিব আজ্ঞামত, আনিলেন রথ,
প্রমথের অধিপতি।
অর্দ্ধক্ষণ মাঝ, দিলা সব সাজ,
অযুত কেশরী যুতি॥
কাঞ্চন বিমান, পর্ব্বত সমান,
রত্নজালে শোভা তার।
রথে নানাবিধি, ধ্বজ পতকাদি,
তাহে নানা অলঙ্কার॥
বায়ুবেগে যায়, হেন সিংহ তায়,
অযুত সংখ্যার মত।
নন্দী বিচারিয়া, আপনি জুতিয়া,
সাজন করিলা রথ॥
সে রথে তখন, কৈলা আরোহণ,
কালী ভীমা দক্ষবালা।
যেন মেরু পরে, দেখে সবে ডরে,
যুগান্তের মেঘমালা॥
জগত সংহার, হৈল চমৎকার,
সকলে সভয় অতি।
নন্দী বুদ্ধিমন্ত, চালাইলা রথ,
পবন জিনিয়া গতি॥
হইয়া শোকার্ত্ত, পরম দুঃখার্ত্ত,
মহেশ কৈলা ক্রন্দন।
কালী কোপান্বিতা, দেখি চমৎকৃতা,
হৈলা প্রাণী সর্ব্বজন॥
রবি ভীত হেন, ধরাতলে যেন,
সহসা পতন হয়।
কালীর যে কোপ, সিন্ধু পালা ক্ষোভ,
ব্যাকুলিতা দিক্‌চয়॥
প্রখর পবন, ভেদিয়া তপন,
সহসা ধরণীতল।
উল্কাপাত কত, দেখি বহু শত,
হৈলা মহা অমঙ্গল॥
রথ অর্দ্ধক্ষণে, দক্ষের ভবনে,
উপনীত হৈল গিয়া।
সতী দরশনে, ভয় পেয়ে মনে,
পুরবাসী যত মেয়ে॥
মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা, শুভ পয়োধরা,
গলিত চিকুর ভার।
রথে হৈতে উলি, সতী গেলা চলি,
মায়ের নিকটে তাঁর॥
মায়েরে দেখিয়ে, গলবস্ত্র হয়ে,
প্রণমিলা পদতলে।
দক্ষের গেহিণী, প্রসূতি আপনি,
সতীকে লইলা কোলে॥
বহুদিন পরে, দেখিয়া কন্যারে,
ঘুচিল মনের দুঃখ।

ভাসি অশ্রুজলে, আপন অঞ্চলে,
মুছিয়া সতীর মুখ॥
স্নেহে পুনঃ পুনঃ, বদন চুম্বন,
করিয়া প্রসূতি কন।
মোর ভাগ্য অতি, তুমি পেলে পতি,
দেব দেব ত্রিলোচন॥
পতি পেয়ে তাঁরে, আমা সবাকারে,
শোক মহার্ণবে ফেলি।
ত্যজি সব মায়া, হইয়া নিদয়া,
শিব সঙ্গে গেলা চলি॥
স্বয়ং আদ্যাশক্তি, পরমা প্রকৃতি,
ত্রৈলোক্যজননী তুমি।
তোমা প্রসবিয়ে, তোমার মা হয়ে,
ধন্যতো হয়েছি আমি॥
কৃপা করি মোরে, এলে মোর ঘরে,
দেখিল সকল লোক।
চিরদিন পরে, দেখিয়া তোমারে,
আজি দূরে গেল শোক॥
তব পিতা যিনি, মন্দবুদ্ধি তিনি,
শিবেরে না দিয়া ভাগ।
শিবের মাহাত্ম্য, না জানিয়া তত্ত্ব,
শিব নিন্দি করেন যাগ॥
মোরা বারে বারে, কহিলা দক্ষেরে,
আন সতী চন্দ্রচূড়।
শ্রেষ্ঠ মুনি যত, কহিলেন কত,
নাহি নিমন্ত্রিলা মূঢ়॥
সুতী কন শুনি, দেবদেব যিনি,
যজ্ঞেশ্বর সর্ব্ব যাগে।
তাঁরে করি হেলা, যজ্ঞ আরম্ভিলা,
পিতা লয়ে দেবভাগে॥
দেবদেব ভিন্ন, এ যজ্ঞ সম্পন্ন,
নির্ব্বিঘ্নে কদাচ হয়।
কহে আর লোকে, বিঘ্ন হবে মখে,
মোর চিতে ইহা লয়॥
শিব হর্ত্তা কর্ত্তা, বিধির বিধাতা,
ত্রিভুবনে যিনি পূজ্য।
নাহি পূজি হরে, যে কর্ম্ম যে করে,
নিষ্ফল তার সে কার্য্য॥
পিতা প্রজাপতি, বিজ্ঞতম অতি,
কার বোলে ইহা হয়।
মূর্খের মন্ত্রণা, হবেক যন্ত্রণা,
ভালর লক্ষণ নয়॥
বর্জ্জি শিব ভাগ, করিছেন যাগ,
পিতা লয়ে দেবগণে।
শিব কৈলে কোপ, যজ্ঞ হবে লোপ,
দ্বিজ রামনিধি ভণে॥

৩১। পয়ার ছন্দ।

শুনিয়া সতীর কথা দক্ষপত্নী কন।
শুন বাছা রাত্রে যাহা দেখেছি স্বপন॥
অতি ভয়ানক স্বপ্ন কৈতে লাগে ডর।
শরীর লোমাঞ্চ হয় তুমুল সমর॥
দক্ষ যথা যজ্ঞ করে দেবগণ সাত।
তথা কোন দেবী শিবা আইলা অকস্মাৎ॥
মুক্তকেশী দিগম্বরী শ্যামা মেঘ আভা।
চতুর্ভুজা অট্টহাসা ত্রিনয়ন শোভা॥
তাঁরে দেখি চমকিয়া দক্ষ পেয়ে ভয়।
জিজ্ঞাসা করিলা তাঁরে করিয়া বিনয়॥
কে তুমি কাহার কন্যা কহ শুনি মাতা।
কি কারণে হেন বেশে তুমি এলে হেথা॥
শুনিয়া কহিলা দেবী না জানিলা তুমি।
তুমি পিতা তোমার তনয়া সতী আমি॥
এত শুনি দক্ষ শিবে নিন্দিলা অশেষ।
কোপে দেবী যজ্ঞানলে করিলা প্রবেশ॥
তদন্তরে ক্ষণমধ্যে যমদূতবৎ।
কোটি কোটি ভীমকর্ম্মা আইল প্রমথ॥
আইল পুরুষ এক উগ্রকর্ম্মক্ষম।
ভয়ানক মূর্ত্তি যেন কালান্তক যম॥
সেই এসে বিষ্ণু আদি যত দেবগণে।
পরাভব সবাকে করিয়া মহারণে॥
ভূত লয়ে যজ্ঞ ভেঙে করে লণ্ডভণ্ড।
করাঘাতে ছিণ্ডিয়া ফেলিল দক্ষমুণ্ড॥

যজ্ঞকুণ্ড তটে দক্ষ কবন্ধের মত।
মহাকোপে হৈল দক্ষে খাইতে উদ্যত ॥
কৌপীন পরণ সর্ব্বে জটাভার মাথে।
বিভূতি সর্ব্বাঙ্গে শূল পাশ অসি হাতে ॥
রক্ত পান করে কেহ নাচে গায় হাসে।
দেখি পুরবাসী সব কাঁপয়ে ত্রাসে ॥
কান্দিয়া ব্যাকুল সর্ব্বে করি হাহাকার।
ইহা দেখি দয়া বড় হইল ব্রহ্মার ॥
শিবেরে করিয়া স্তুতি নিজে ব্রহ্মা গিয়া।
পুন আসি যজ্ঞস্থানে সদাশিবে নিয়া ॥
ব্রহ্মা কৈলা শিব মোরে সুপ্রসন্ন হও।
যজ্ঞ পূর্ণ কর প্রভু দক্ষেরে বাঁচাও ॥
ব্রহ্মার বচনে শিব প্রাণে বাঁচাইলা।
শিব নিন্দা ফলে দক্ষে ছাগমুণ্ড দিলা ॥
রাত্রিশেষে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি।
সেই শ্যামা রূপেতে এসেছ আজি তুমি ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি আমি তা দেখি প্রত্যক্ষে
ভবিতব্যে তাহা বা ঘটায় আজি দক্ষে ॥
যা দেখেছি স্বপনে তা দেখি সে সকল।
ও মা স্বপ্ন কদাচ না হবেক বিফল ॥
শিবনিন্দা ফল পেয়ে দক্ষ প্রজাপতি।
তবে ঘুচিবেক তার সেই দুর্ম্মতি ॥
তোমাদিকে জানিবেক শান্তি যবে পাবে।
শিবনিন্দা মতি তার অচিরাতে যাবে ॥
হে পুত্রি হে বাছা তুমি চিরজীবী হও।
তব হানি কদাচ না হবে সুখে রও ॥
স্বপনে যাহার মৃত্যু হয় দরশন।
আয়ু বৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের লিখন ॥
তুমি যার হও তার নাহি হয় শোক।
সেই সদানন্দ ধন্য ভাগ্যবান্ লোক ॥
আমি তব ত্যাজ্যা নহি শুন মোর বাণী।
না ছাড়িহ মোরে আমি তোমার জননী ॥
শিব কন নারদ শুনহ স্থির হয়ে।
এরূপ সম্মান সতী মার কাছে পেয়ে ॥
মাতৃ আজ্ঞা লয়ে শীঘ্র করিয়া প্রণতি।
যজ্ঞশালে দক্ষের নিকটে গেল সতী ॥

সতী যদি যজ্ঞশালে করিল গমন।
বিতর্ক করিল দক্ষ পুরবাসিজন ॥
মহাভাগবতে কৈলা ব্যাস ভগবান্।
দ্বিজ রামনিধি কহে পুরাণ প্রমাণ ॥

৩২। ত্রিপদী ছন্দ।

সতী গেল যজ্ঞশালে, পুরবাসী হেনকালে,
পরস্পর কহে সর্ব্বজন।
কনক গৌরাঙ্গী সতী, কোটি চন্দ্র জিনি দ্যুতি,
ত্রৈলোক্য সুন্দরী বরাননা ॥
এবে মহাদ্ভুত হেরি, সতীরূপ ভয়ঙ্করী,
মুক্তকেশী নবঘন-প্রভা।
ভীষণ দশনচয়, বীরবাহু চতুষ্টয়,
কোপে তিন চক্ষু রক্ত আভা।
না বুঝিতে পারি মর্ম্ম, পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম,
বদন দেখিয়া লাগে ত্রাস ॥
এরূপেতে হেথা কেনে, হেন বুঝি অর্দ্ধক্ষণে,
কোপে এ ব্রহ্মাণ্ড হবে গ্রাস ॥
এঁর অপমান করে, দেবগণে এনে বরে,
যজ্ঞ করিছেন প্রজাপতি।
কোপ করে আসে শিবা, আজি তার ফল দিবা,
দক্ষেরি বা হয় কি দুর্গতি ॥
সংহারে যেজন হর্ত্রী, ব্রহ্মা বিষ্ণু নাশকর্ত্রী,
যাহা হৈতে সর্ব্ব লোপ পায়।
যজ্ঞ নাশে সেই জনে, কি করিবা দেবগণে,
বিষ্ণু কহ কি করিবা তায় ॥
পুরবাসী ইহা বলে, ওথা দক্ষ যজ্ঞশালে,
কালী গিয়া হৈল উপনীত।
দেখিলেন শিবদ্বেষী, যজ্ঞেতে আছয়ে বসি,
হইয়া পরম হরষিত ॥
কালী দেখি দেবগণ, ঋষি মুনি সর্ব্বজন,
গুরু আদি কম্পমান্ হয়ে।
সবে হয়ে স্থির আঁখি, নিজ নিজ কর্ম্ম রাখি,
কালীপানে সর্ব্বে রৈল চেয়ে ॥
প্রধান দেবতা যত, পটে চিত্র করা মত,
মৌনে স্থির রৈলা সর্ব্বজন।

সাক্ষাতে দক্ষের ডরে, কেহ না প্রণাম করে,
সভাস্থ যতেক দেবগণ ॥
সংহারকারিণী দেবী, অন্তরে ইহাই ভাবি,
মনে মনে সবে প্রণমিলা।
দক্ষ দেখিলেন তবে, কর্ম্ম ছেড়ে রৈলা সবে,
দেবগণ যেরূপ হইলা ॥
কালী যজ্ঞ সভা দেখি, প্রসন্ন করিয়া আঁখি,
সব দিক্ কৈলা নিরীক্ষণ।
দক্ষরাজ যজ্ঞশালে, অকস্মাৎ হেনকালে,
দেবীকে করিলা দরশন ॥
কালীমূর্ত্তি ত্যক্তবাসা, কোপযুতা এলকেশা,
ধূমাঞ্জন সম অঙ্গ ছবি।
দেখিয়া নাগরে ডর, চন্দ্র সূর্য্য বৈশ্বানর,
সদৃশ নয়না মহাদেবী ॥
দেবমূর্ত্তি দরশনে, দক্ষ অতি ভীত মনে,
জিজ্ঞাসিলা মধুর বচনে।
কে তুমি দুহিতা কার, পতি কহ কে তোমার
হেথা এলে কোন্ প্রয়োজনে ॥
তোমাকে চিনিতে নারি, সতী অনুমান করি,
কেবা আসি দরশন দিলে।
হেন মোর হয় মতি, কিংবা মোর কন্যা সতী,
শিবের আলয় হৈতে এলে ॥
সতী কৈল একি কথা, আমি সতী শুন পিতা,
না জানিলা কন্যা আপনার।
তোমার তনয়া আমি, আমার জনক তুমি,
তোমাকে করি যে নমস্কার ॥
দক্ষ কৈলা একি ওমা, তুমি যে হয়েছ শ্যামা,
হা সুতে এমন কেন হলে।
তপ্ত কাঞ্চনের আভা, শরচ্চন্দ্র সম শোভা,
ত্রৈলোক্যসুন্দরী তুমি ছিলে ॥
পূর্ব্বে মোর নিকেতনে, যেমন কবিতা মনে,
থাকিতে উত্তম বস্ত্র পরি।
সে কন্যা কি হেন সাজে, আজি এলে সভামাঝে
ত্যক্তবস্ত্রা হয়ে দিগম্বরী ॥
কোপযুতা দেখি যেন, ভীষণলোচনা কেন,
কেনবা হয়েছে মুক্তকেশা।
হয় মোর হেন মতি, অযোগ্য পেয়েছ পতি,
তাহাতে তোমার হেন দশা ॥
তুমি মোর কন্যা বট, তোমা প্রতি স্নেহ খাট,
ইহা না বুঝিবা কদাচন।
শিবসীমন্তিনী তুমি, এজন্যে তোমাকে আমি,
এ যজ্ঞে না কৈল নিমন্ত্রণ ॥
আপনি এসেছ যবে, ভালই করেছ তবে,
রেখেছি তোমার জন্যে যাহা।
বিচিত্র বসন আর, নানাবিধ অলঙ্কার,
গ্রহণ করহ সব তাহা ॥
হা সুতে প্রাণের সমা, ত্রিজগতে নিরুপমা,
রূপবতী সতী বরাননে।
শম্ভুকে পাইয়া পতি, দুঃখিনী হয়েছি অতি,
হা দুহিতে হায় সুলোচনে ॥
শিব কন শুন মুনি, দক্ষের মুখেতে শুনি,
কথা শিবনিন্দকের অতি।
শিবের শুনিয়া ব্যঙ্গ, কোপেতে জ্বলিয়া অঙ্গ,
মনে এই চিন্তা কৈলা সতী ॥
যজ্ঞ আদি অর্দ্ধক্ষণে, পিতা সহ দেবগণে,
করিবারে পারি ভস্মসাৎ।
কিন্তু পিতৃহত্যা হয়, মনে করি এই ভয়,
নতুবা হইত অচিরাৎ ॥
অতএব কর্ত্তব্য নয়, দেবাদিকে মায়া হয়,
এমত চিন্তিয়া দাক্ষায়ণী।
কেহ না দেখিলা তথী, সৃষ্টি কৈলা ছায়া সতী,
আপনার সদৃশ তখনি ॥
ছায়া সতী সৃষ্টি করি, কৈলা তারে মহেশ্বরী,
আমি যাই আপন আবাস।
মোর এক কর্ম্ম কর, আমার বচন ধর,
এই যজ্ঞ তুমি কর নাশ ॥
আমার পিতার সাথে, কথা উপস্থিত মতে,
কবে তুমি বিচারি বিশেষ।
মোর পিতৃমুখে শুনি, শিব নিন্দাকর বাণী,
যজ্ঞ অগ্নি করিয়া প্রবেশ ॥
মর্ম্ম কথা শুন তুমি, ইঁহার তনয় আমি,
ইতে সদা মদগর্ব্বে পূর্ণ।

পিতা এই অহঙ্কারে, সতত নিন্দেন হরে,
এই দর্প শীঘ্র কর চূর্ণ॥
তুমি অগ্নি প্রবেশিবে, শুনিয়া আসিবা তবে,
হর হয়ে শোকেতে কাতর।
যুদ্ধে যিনি দেবগণে, আর এই জনার্দ্দনে,
যিনি যজ্ঞ রক্ষণে তৎপর॥
যজ্ঞ করি লণ্ডভণ্ড, পিতার পরাণ দণ্ড,
শিব করিবেন ক্রোধ মনে।
হাস্যমুখে এত বলি, অন্তর্দ্ধান কৈলা কালী,
ছায়া রাখি রামনিধি ভণে॥

৩৩। পয়ার ছন্দ।

অন্তর্দ্ধান হয়ে কালী গগনে থাকিলা।
মুনি ঋষি দেবগণ কেহ না দেখিলা॥
দেবীর মায়ায় সর্ব্বে হইয়া মোহিত।
নিকটেও থাকি না জানিলা কদাচিৎ॥
গগনমণ্ডলে কালী গেলেন যখন।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ ভেরী হৈল মহাস্বন॥
গগনেতে গিয়া কালী রহিলা যেখানে।
অতিশয় পুষ্পবৃষ্টি হইল সেখানে॥
যেথা যজ্ঞে প্রতিমূর্ত্তি ছায়া সতী ছিলা।
কোপে ছায়াসতী দক্ষে কহিতে লাগিলা॥
মোহে কি নিন্দিছ আমা আর পশুপতি।
গুণ কহ শুভ যদি ইচ্ছহ দুর্ম্মতি॥
যে জিহ্বায় নিন্দা কর দেব দেব শিব।
ওহে মহামূর্খ কেটে ফেল সেই জিভ॥
চিরদিন নিন্দু দেব সভায় পিনাকী।
তার ফল উপস্থিত আজি এই দেখি॥
যে নিন্দয়ে ত্রৈলোক্য কারণ মহেশ্বর।
তার মাথা কাটিয়া ফেলেন প্রভু হর॥
দেবীর বচন শুনি দক্ষ প্রজাপতি।
কহিলা দেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অতি॥
তুমিত বালিকা বুদ্ধি অল্পই তোমার।
মোর অগ্রে হেন পুন না কহিও আর॥
জানি শিবে দুরাচার শ্মশানেতে স্থিতি।
স্ববুদ্ধে করেছ কর্ত্তা ভূত অধিপতি॥
কি কব দুর্ম্মতি তুমি পাইতেছ দুঃখ।
যোগ্য পতি হইলে লইতে বহু সুখ॥
আমি দক্ষ জানে মোরে দেব দেবী সব।
নাহি সহে মোর অগ্রে শিবে কর স্তব॥
ছায়াসতী দক্ষেরে কহিলা পুনর্ব্বার।
এখন মঙ্গল যদি চাহ আপনার॥
আমার বচন শুন পাপ মতি ত্যজ।
ভক্তি করি দেবদেব সদাশিবে ভজ॥
পুন যদি নিন্দ পরমাত্মা মৃত্যুঞ্জর।
শিব তোমা সহ যজ্ঞ নাশিবা নিশ্চয়॥
দক্ষ কৈলা মূঢ়বুদ্ধি কন্যা তুমি মোর।
এক্ষণেতে হও মোর চক্ষু অগোচর॥
সদাশিবে পতি তুমি পেয়েছে যখনি।
মনে করি তুমি কন্যা মরেছ তখনি॥
তব পতি শিব নাম কর বার বার।
তুষানলে অঙ্গ যেন জ্বলয়ে আমার॥
কুপুত্রী হয়েছ তুমি শিবে উপগতা।
তাহাতেই আমার হয়েছে হেঁট মাথা॥
শিবে মালা দিয়েছিলে স্বয়ংবর কালে।
তোমা দেখি অঙ্গ মোর দহে কোপানলে॥
অতএব দুরাত্মিকে যাও যথা পতি।
আমার দৃষ্টির বার হও শীঘ্রগতি॥
তোমার বদন আমি না দেখিব আর।
ভর্ত্তৃ গুণ না কহিও অগ্রেতে আমার॥
শিব কৈলা নারদ শুনহ আর বলি।
দক্ষবাক্যে কোপযুতা হয়ে ছায়াকালী॥
ভয়ানক মূর্ত্তি হৈলা জ্বল ত্রিনয়না।
মস্তক নক্ষত্র লোকে বিস্তারবদনা॥
সহস্রেক মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম আভা।
যুগান্ত কালের যেন মহামেঘ-প্রভা॥
আপাদলম্বিত বিরাজিত কেশপাশ।
কোপোদ্দীপ্ত অঙ্গ মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস॥
দক্ষেরে কহিলা পুন গম্ভীর বচন।
কেবল না হব আমি তব অদর্শন॥
তোমা হৈতে হইয়াছে মোর এ শরীর।
ইহা সহ হই তব দৃষ্টির বাহির॥

ইহা বলি ছায়া সতী কোপ করে শেষ।
দেবাদি সাক্ষাতে কৈলা অগ্নিতে প্রবেশ॥
ভূমিকম্প হৈল বায়ু বহিলা তুমুলে।
সূর্য্য ভেদি মহা উল্কাপাত ধরাতলে॥
ক্ষণমাত্র ব্যাকুল হইলা দিক্‌গণ।
মেঘেতে করিলা সপ্ত রক্তবরিষণ॥
দেবগণ বিবর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ।
যজ্ঞের কুণ্ডের অগ্নি হইলা নির্ব্বাণ॥
শৃগাল কুক্কুরে যজ্ঞ ঘৃত খায় সব।
শ্মশানসমান হৈল যজ্ঞের মণ্ডপ॥
ম্লান হয়ে দক্ষ ঘন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তখন চিন্তিল মনে হৈল সর্ব্বনাশ॥
পুনরপি যৎসামান্য রূপে তদন্তর।
যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত হৈলা শুন মুনিবর॥
মহেশের ভয়েতে তাবৎ দেবগণ।
সকলে হইয়া অতি সশঙ্কিত মন॥
দেবতা মহর্ষি মুনি যে কেহ আছিলা।
পরস্পর সকলেতে কহিতে লাগিলা॥
অমঙ্গল যেই বার্ত্তা যেন বায়ুভরে।
নিশ্চয় ক্ষণেক মধ্যে দূরেতে সঞ্চরে॥
দূরেতে যদ্যপি দেব দেব ত্রিলোচন।
অদ্যই শুনিবা সতী দেহ বিসর্জ্জন॥
দক্ষেরে কহিলা সর্ব্বে এই বড় ডর।
জগত সংহারকর্ত্তা দেব দেব হর॥
না জানি তাঁহার আজি হৈল মহাকোপ।
কারে কি করিবা কিংবা সৃষ্টি হয় লোপ॥
সভা হৈতে নারদ উঠিয়া ততক্ষণে।
কৈলাসে গেলেন শীঘ্র রামনিধি ভণে॥

৩৪। লঘু ত্রিপদী।

নারদ মহর্ষি, কৈলাসেতে আসি,
দেবাদিদেবে প্রণমি।
অশ্রুপূর্ণ আঁখি, সম্মুখেতে থাকি,
কহিলা নারদ আমি॥
দক্ষালয় হৈতে, অতি ত্বরান্বিতে,
এসেছি তোমার ঠাঞি।
প্রভু তুমি কর্ত্তা, তথাকার বার্ত্তা,
শুনেছ কি শুন নাই॥
দক্ষযজ্ঞ যথা, গিয়াছিল তথা,
তোমার বল্লভা সতী।
তব নিন্দা শুনি, কোপ করে তিনি,
শরীর ত্যজিলা তথী॥
দক্ষ শোকাকুলি, সতী সতী বলি,
খেদ করি পুনঃ পুনঃ।
পুন যজ্ঞে মন, আহুতি গ্রহণ,
করিছেন দেবগণ॥
মুনি মুখে শুনি, দুঃখকর বাণী,
দেব দেব ত্রিলোচন।
হয়ে শোকাকুলি, হাহা সতী বলি,
ক্রন্দন করিয়া কন॥
শোকের সাগরে, ভেয়াগিয়া মোরে,
কোথা গেলা প্রাণেশ্বরী।
তোমার বিহনে, থাকিব কেমনে,
কিরূপে পরাণ ধরি॥
কেন গেলা সতি, পিতার বসতি,
একেকালে অন্মশোধ।
আমি বহুমতে, নিষেধিলা তাতে,
তুমি মোরে কর ক্রোধ॥
তুমি ত্যজি মোরে, গেলা কোথাকারে,
প্রাণের বল্লভা সতী।
গেলে ইরি তরে, ঘৃণা করি মোরে,
আমার কি হবে গতি॥
মনে পেয়ে তাপ, এমতি বিলাপ,
শিব কৈলা বহুতর।
একে সতী শোক, তাহে হয়ে কোপ,
কাঁপিতে লাগিলা হর॥
ক্রোধ হবা মাত্র, রক্তবর্ণ নেত্র,
হৈলা দেব ত্রিলোচন।
প্রাণী যত ছিলা, সবে ক্ষুব্ধ হৈলা,
ত্রিজগতে যত জন॥
সবে সশঙ্কিত, হৈল চমকিত,
কোপবান্ দেহি হরে।

মনে পেয়ে ভয়, না জানি কি হয়,
ধরণী কাঁপিলা ডরে ॥
ঊর্দ্ধে নেত্র থাকা, জ্বলি উঠি শিখা,
অগ্নি হৈল রাশি সম।
অগ্নি হৈতে বীর, হইলা বাহির,
কালান্তক যমোপম ॥
মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, জলবৈশ্বানর,
সমান অঙ্গের প্রভা।
তপন দহন, শশী ত্রিনয়ন,
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা ॥
কোটি সূর্য্যদ্যুতি, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি,
শিরে শোভে জটাভার।
পরম পুরুষ, কেবা তাঁর সম,
ক্ষমতা কি কব তাঁর ॥
তিনি বার তিন, শিবে প্রদক্ষিণ,
করিয়া তাহার পরে।
হয়ে প্রণিপাত, করি জোড় হাত,
কহিতে লাগিলা হরে ॥
মোর পিতা তুমি, কি করিব আমি,
ব্রহ্মাণ্ড সচরাচর।
তুমি দেখ বসি, অর্দ্ধক্ষণে নাশি,
যদি আজ্ঞা কর হর ॥
কর অনুমতি, কিংবা সুরপতি,
আর শ্রেষ্ঠ দেবভাগে।
যম আদি করে, সর্ব্বে কেশে ধরে,
আনি গিয়া তব আগে ॥
প্রতিজ্ঞা আমার, সত্য অঙ্গীকার,
নিবেদন শুন তবে।
কহ একেবারে, যাহারে যাহারে,
দমন করিতে হবে ॥
শুন ত্রিলোচন, করিব দমন,
যদিও সে ইন্দ্র হয়।
বিষ্ণু যদি তার, হন সহকার,
তিনি হৈবা পরাজয় ॥
এই কথা শুনি, দেব শূলপাণি,
বীরে কৈলা হয়ে আর্দ্র।

প্রমথের পতি, হৈলা মহামতি,
তব নাম বীরভদ্র ॥
যাহ দক্ষ বাস, যজ্ঞ কর নাশ,
তোমাকে দিলাম ভার।
তার সহায়তা, করে যে দেবতা,
সমুচিত দিবে তার ॥
আমাকে বর্জ্জন, করে দেবগণ,
যাইয়া দক্ষের পুর।
আজ্য ভোগ করে, তুমি সে সবারে,
মেরে করে দিবে দূর ॥
আর দিয়া মন, শুন বাছাধন,
তোমাকে কহি যে কথা।
দক্ষ নিরন্তরে, আমা নিন্দা করে,
কাটিবা তাহার মাথা ॥
শুন মোর পুত, সঙ্গে যূথে যূথ,
লইয়া প্রমথভাগ।
বিলম্ব না সয়, যত শীঘ্র হয়,
নাশ গিয়া দক্ষ যাগ ॥
বীরভদ্রে শূলী, এই কথা বলি,
নিশ্বাস ছাড়িলা রাগে।
প্রমথের গণ, দিল দরশন,
আসিয়া শিবের আগে ॥
ভীমকর্ম্মা যত, যুদ্ধে বিশারদ,
মুয়ল পাষাণ ধরে।
গদা অসি পাশ, দেখে লাগে ত্রাস,
ত্রিশূল কারো বা করে ॥
তাহাতে বেষ্টিত, হয়ে বীরভদ্র,
প্রদক্ষিণ করি হরে।
দণ্ডবৎ হয়ে, দানা সঙ্গে লয়ে,
চলিলা দক্ষের ঘরে ॥
প্রমথ প্রসাদ, ছাড়ে সিংহনাদ,
করে কক্ষ বাদ্য গাল।
হেসে নেচে গেয়ে, ধূলা উড়াইয়া
চলিল প্রমথপাল ॥

ক্রমশঃ